রাজাকার সমগ্র

মুনতাসীর মামুন



রাজাকার, আলবদর, শান্তি কমিটির সদস্য, আল-শামশ– বিভিন্ন নামের গ্রুপ কিন্তু মূলত তারা একই– স্বাধীনতা বিরোধী। ১৯৭১ সালে এদের কাজ ছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে মুক্তিকামী মানুষদের দমন। এদের মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত ছিল রাজাকার-রা, এবং বাংলাদেশে এই নামটি তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পরিচিত। সাধারণত: স্বাধীনতা বিরোধীদের এদেশে রাজাকার নামেই অভিহিত করা হয়। খুন, জখম, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, আগুন লাগিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, হানাদার বাহিনীকে পথ দেখিয়ে দেওয়া এমন কোন জঘন্য কাজ নেই যা করেনি রাজাকার বা আলবদররা। এবং এদের একটা বড় অংশ ছিল বাংলাদেশ জামাতী ইসলামীর সদস্য বা রিক্রুট। একারণেই বঙ্গবন্ধু জামাতে ইসলাম বা ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং এদের শাস্তি দিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে এদের বিচারের জন্য [যুদ্ধাপরাধীদের] আইন করেছিলেন।

১৯৭৫ সালে লে. জে. জিয়াউর রহমান এদের পুণর্বাসিত করেন, পুষ্ট করেন এবং পরবর্তীকালে তার পত্নী বেগম জিয়া এদের ক্ষমতায় নিয়ে যান। এরা হলেন রাজাকার বন্ধু।

১৯৭২ সাল থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিদায়ের জন্য দাবি উঠছে। বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে। তরুণ সমাজ মহাজোট-কে এ কারণে ভোট দিয়েছে।

গত দু'যুগ ড. মুনতাসীর মামুন যেমন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন, তেমনি যুদ্ধাপরাধীদের নানা কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার থেকেছেন, জনমত গড়তে সাহায্য করেছেন। গত দু'দশক ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রাজাকার ও রাজাকার বন্ধুদের নিয়ে রচনার সংকলন রাজাকার সমগ্র। রচনাগুলি বিচ্ছিন্ন হলেও গত দু'দশকে বাংলাদেশে রাজাকারদের উত্থানের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাবে। এ গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধের পাঠকদের জন্য এক অনবদ্য সংকলন। বর্তমান সময়ের জন্য আরো বেশি অপরিহার্য।



আলোকচিত্র নাসির আলী মামুন

মুনতাসীর মামুনের জন্ম ১৯৫১ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এম. এ., পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। লেখালেখি করছেন ১৯৬৩ সাল থেকে। ছাত্রজীবনে জড়িত ছিলেন ছাত্র-আন্দোলনে এবং ১৯৬৯ সাল থেকে এ-পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন প্রতিটি সাংস্কৃতিক ও গণআন্দোলনে। স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম ডাকসু নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সম্পাদক। একই সময়ে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি। তাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ডাকসু'র মুখপত্র 'ছাত্রবার্তা'। এছাড়াও বাংলাদেশ লেখক শিবির ও বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের ছিলেন তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও যথাক্রমে প্রথম যুগ্ম আহ্বায়ক ও যুগ্ম সম্পাদক। ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন তিনিও একজন। এছাড়াও তিনি জড়িত বিভিন্ন একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। বাংলাদেশে লেখালেখির জগতে মুনতাসীর মামুন একটি বিশিষ্ট নাম। সমসাময়িককালে তাঁর মতো পাঠক নন্দিত লেখক খুব কমই আছে। গল্প, কিশোরসাহিত্য, প্রবন্ধ, গবেষণা, চিত্রসমালোচনা, অনুবাদ ইত্যাদিতে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও সেই সাথে রাজনৈতিক ভাষ্যে অর্জন করেছেন বিশেষ খ্যাতি। উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭০। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, ড. হিলালী স্বর্ণপদক পুরস্কার, প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৩), মার্কেন্টাইল ব্যাংক স্বর্ণপদক ইত্যাদিতে তিনি সম্মানিত।

স্ত্রী ফাতেমা মামুন ছিলেন একজন ব্যাংকার।



রাজাকার সমগ্র

রাজাকার সমগ্র

মুনতাসীর মামুন



অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ananyadhaka@gmail.com



প্রকাশক ☐ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ☐ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ ☐ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
তৃতীয় মুদ্রণ ☐ মার্চ ২০১৩

স্বত্ব ☐ লেখক
প্রচ্ছদ ☐ রফিকুন নবী

কম্পোজ ☐ তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ☐ পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

দাম ☐ ৫৫০.০০ টাকা

ISBN 984 70105 0166 7

Razakar Samogra by Muntassir Mamoon
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
3rd Edition : March 2013, Cover Design : Rofiqun Nobi
Price : 550.00 Taka Only

U.K Distributor ☐ **Sangeeta Limited**
22 Brick Lane, London

U.S.A Distributor ☐ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Hights, N.Y. 11372

Canada Distributor ☐ **Anyamela**
300 Danforth Ave., Toronto (1st floor) suite-202

Kolkata Distributor ☐ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

অনলাইনে পাওয়া যাবে ☐ রকমারি.com
www.rokomari.com

উৎসর্গ

অধ্যাপক জারিনা রহমান খান

সূ চি প ত্র

ভূমিকা / ১১
শোক প্রস্তাব ও শহীদদের প্রতি অবহেলা / ২৩
সাম্প্রদায়িকতাকে রুখে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় এগিয়ে যাবেই / ২৬
মুরতাদ জামাতি ও পাকিস্তানি দালালদের প্রতিরোধ করুন / ৩০
আমার মৃত্যুও যেন না হয় সেই বাংলাদেশে / ৩৪
কিছু ঘৃণা রেখো মনে / ৪০
বাংলাদেশে ফেরা / ৪৩
জোরালো বিশ্বাস নেই যাদের / ৪৮
তোষামোদ ও হুঙ্কার / ৫২
জামাত, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং বিএনপি ও আওয়ামী লীগ / ৫৬
যুদ্ধক্ষেত্রে চুপ করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় / ৬০
একমাত্র আওয়ামী লীগের পক্ষেই সম্ভব / ৬৭
মোনায়েম খান শহীদ হলে আমরা কী? / ৭২
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কারচুপি! / ৭৮
বড় আল বদরদের কী হবে? / ৮০
ওদের কাছে মুক্তিযুদ্ধও বিতর্কিত? / ৮৪
ধেড়ে আলবদরদের কী হবে? / ৮৬
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ন্যায্য বিচার কি পাওয়া যাবে? / ৮৮
প্রীতিলতা ও পলাশীর যুদ্ধ এবং আফগান তালেবান / ৯১
পাকি দালালদের নতুন টার্গেট / ৯৫
রাষ্ট্রপতিকে পাদুকা প্রদর্শন ঃ যা হবার তাই হয়েছে! / ৯৯
ক্ষমতায় থাকলে শ্রদ্ধাঞ্জলি না থাকলে অগ্নিপূজা / ১০২
খতিব সরকার বনাম বাংলাদেশ সরকার / ১০৪
জবাই কর জবাই কর / ১০৮
সাঈদী বচন ও এক বিধবার আর্তি / ১১২
মিন্টো রোডে মহামিলন ঃ শেষ ভড়ংবাজিও শেষ / ১১৫
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে কি সম্পূর্ণ হবে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়? / ১১৮
ধর্মের রাজনীতি, রাজনীতির ধর্ম / ১২১
মানুষ যখন সংখ্যা তখন আপনি কি নিরাপদ? / ১২৫

যা বলার ছিল বলেই যাব জল্লাদের চোখে চোখ রেখে / ১২৯
যেভাবে এখন চলছে বাংলাদেশ / ১৩২
এখনো বলছি ভবিষ্যতেও বলব তুই রাজাকার! / ১৩৭
এ কোন বিভ্রান্ত রাজনীতির বেড়াজাল? / ১৪১
গো. আযমদের অর্জন এক খেলাতেই শেষ / ১৪৬
বোমা থাকবে না তো কি মিষ্টির প্যাকেট থাকবে? / ১৪৯
বোমাবাজির গণতন্ত্র / ১৫৩
কেমন লাগে ভাইসব, রক্তে ভেজা হাতে হাত মেলাতে? / ১৫৬
রাজনীতিতে সংঘাত ও মেরুকরণের বছর / ১৬০
জাগো ওঠো দাঁড়াও বাংলাদেশ / ১৬৭
জেনারেল, আলবদর ও ধর্ম / ১৭০
তারা সোচ্চার আমরা নিশ্চুপ / ১৭২
হামুদুর রহমান রিপোর্ট প্রকাশ– আমাদের কী? / ১৭৫
মামলা হলে হাইকোর্ট ভবনে গিয়ে কোথাও লুকালেই হয়! / ১৭৮
ইনকিলাবকে কেন সবাই প্রশ্রয় দিয়েছে, আশ্রয় দেয়? / ১৮০
বিজয়ের মাসে পাকি বাংলা সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ / ১৮৫
কে কার 'দালাল' সেটি স্পষ্ট হলো! / ১৮৯
তাহলে কি বাংলাদেশ হয় নি? / ১৯২
গিকা চৌ এটা কী বললেন! / ১৯৫
আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঁচব তো? / ১৯৯
রাজাকে রাজার মতো ঢাকায় থাকতে দেয়া যায় না / ২০২
রাষ্ট্র কি এক ব্যক্তির কাছে জিম্মি? / ২০৫
নতুন ফতোয়া– বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ অবৈধ সন্তান! / ২০৭
দেশটির সর্বনাশই তাদের কাম্য! / ২১০
আমরা কি মসজিদে মুসলমান খুনের ইসলাম চাই? / ২১৩
সবাই মুরতাদ হলে ঈমানদার কে? / ২১৮
এবার কি হবে, ভাইজান? / ২২২
বিকৃত পশুশক্তির প্রতি আমাদের ধিক্কার / ২২৫
সাকাচৌর কান্না, আমিনীর চিৎকার, অন্যদের মৃদু হাসি / ২২৮
বোমা মেরে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না / ২৩২
আততায়ী দাঁড়িয়ে দুয়ারে / ২৩৫
রাজাকার নিয়ে কীভাবে অন্ধকার থেকে আলোয় নেবেন? / ২৩৮
স্থায়ী বিএনপি-তালেবান সরকার গঠনে অস্থায়ী বিএনপি-তত্ত্বাবধায়কের চেষ্টা! / ২৪১
খালেদা জিয়ার পাকা ধান কেটে নিচ্ছে নিজামী–সুবাহান! / ২৪৪
আদালতের কাঠগড়ায় শৃঙ্খলিত মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতা / ২৪৭

রাজাকারের সার্টিফিকেটে দেশপ্রেমিক? / ২৫১
বাংলাদেশে কি তৈরি হচ্ছে গৃহযুদ্ধের পটভূমি? / ২৫৫
ইতিহাস নিয়ে মারামারি– ধান্দাবাজদের আবির্ভাব! / ২৬০
এই জাতির বোধ / ২৬৫
রাজনীতিক হলেই কি অসত্য বলতে হবে? / ২৭০
তালেবান কি হাওয়া হয়ে গেল? / ২৭৩
৩০ বছরের অর্জন কি পাকিস্তানবাদ? / ২৭৭
একজন যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যু / ২৮১
রিভিউ এভাবে বাংলাদেশকে চিত্রিত করছে কেন? / ২৮৪
তালেবানী রাষ্ট্র ও মহিলা প্রধানমন্ত্রী সমাচার / ২৮৮
ভাবমূর্তি বিনষ্টের আর বাকি কী? / ২৯২
আবারো লিন্টনার এবং আবারো ভাবমূর্তির সমস্যা / ২৯৫
আওয়ামী লীগারদের তাহলে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হোক / ৩০০
নিজামীর পলায়ন ॥ দিগন্তে সামান্য আশার আলো / ৩০৪
কার সরকার? / ৩০৭
বাঙালি ও বাংলাদেশ নিয়ে ইয়ার্কি বন্ধ করুন / ৩১১
আবারো সাকাচৌ / ৩১৬
বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার আরেকটি প্রচেষ্টা? / ৩২০
ভিক্ষুকের আবার মান-অভিমান! / ৩২২
আমিনী-নিজামীদের ইসলাম ও আমাদের ইসলাম / ৩২৬
পাকিরা পাকি-ই, বাংলাদেশের পাকিরাও তা-ই / ৩৩১
স্বদেশে গোলাম আযমদের প্রত্যাবর্তন / ৩৩৪
বিচারকরা কি শুনেছেন আমিনীর হুংকার? / ৩৩৭
বিএনপি কীভাবে জামাতের বি টিমে পরিণত হলো / ৩৪০
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও রাজনীতি / ৩৪৩
আক্রান্ত হুমায়ুন আজাদ : বিপন্ন মুক্তচিন্তা / ৩৪৯
আমরাও কি কমবেশি দায়ী নই? / ৩৫৬
মার্চের ভাবনা / ৩৬২
ট্রাম্পকার্ড হারিয়ে যাওয়ায় এলো বাংলা ভাইয়ের শাসন / ৩৬৫
বোমা থাকবে না তো কি তবারুক থাকবে? / ৩৭২
অধ্যাপক-বিচারকরাও যখন অসত্যের বেসাতি করেন / ৩৭৭
দুই ভগ্নদূতের প্রত্যাবর্তন এবং ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ষড়যন্ত্র আবিষ্কার / ৩৮৩
‘বিচার পাই না তাই বিচার চাই না’ / ৩৮৯
তিন অধ্যাপক কতল করলেই কি ইসলামি মূল্যবোধ জিন্দা হবে? / ৩৯২
চুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধ দখল / ৩৯৬

সব সংবাদই দুঃসংবাদ / ৪১১
আমাদের বিজয় দিবস, তাদের? / ৪১৩
বিসমিল্লাহ বলে ডিসেম্বর থেকে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু / ৪১৭
নীল নকশা, ধর্ম ব্যবসা ও বুটের তলায় বাঙালি সংস্কৃতি / ৪২১
বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে লাফালাফি বন্ধ কেন? / ৪২৫
প্রতিরোধ করুন অথবা দেশ ছাড়ুন নয়তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকুন / ৪২৯
ক্ষমতায় আছেন মাসুদ মিয়ারা / ৪৩৫
গ্রেনেড-বোমার দেশে / ৪৪০
অন্ধদের দিয়ে বাংলাদেশের উন্নতি হবে না / ৪৫২
সাকাচৌ'র বিশাল গোস্‌সা / ৪৫৬
জঙ্গিরা এ দেশে থাকবে / ৪৬০
নিজেরা নিজেদের ধরবে কীভাবে? / ৪৬৬
জঙ্গিবাদ, বোমাবাজি পছন্দ করলে অবশ্যই জোটকে সমর্থন করুন / ৪৭২
জঙ্গি কেন হয়, জঙ্গি কেন থাকবে? / ৪৭৫
'কই উনি তো শহীদ হলেন না' / ৪৮১
ধর্ম, হেরোইন ও রাজনীতি / ৪৮৬
নিজামী এখন কী করছে? / ৪৯১
বীরশ্রেষ্ঠের প্রত্যাবর্তন ও নষ্টামীর রাজনীতি / ৪৯৪
তারা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? / ৪৯৮
৩২ বছর পর শাস্তির মুখোমুখি বঙ্গবন্ধুর খুনি মহিউদ্দিন / ৫০৪
মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা ঃ উচ্চতর আদালত ও সরকারের দায়বদ্ধতা / ৫০৮
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা জরুরি / ৫১৩
দুটি বিষয় ও সামান্য ক'টি প্রশ্ন / ৫২০
পাকিস্তানবাদ বনাম বাংলাদেশ / ৫২৩
গণতন্ত্র ও যুদ্ধাপরাধ একসঙ্গে নয় / ৫২৯
রাজাকারদের জন্য আলাদা গোরস্থান চাই / ৫৩৫
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতেই হবে / ৫৩৯
একাত্তরের গণহত্যার বিচার / ৫৪৩
নিজামী 'ওলি' হলে আমরা সবাই ফেরেশতা / ৫৪৬
যে দেশে রাজাকার বড় / ৫৪৯
১৯৭১ সালে বিজয়ীদের সঙ্গে থাকতে চাই / ৫৬০
পরিশিষ্ট / ৫৬৫

ভূমিকা

'রাজাকার', 'দালাল', যোগসাজশকারী বা 'কোলাবরেটর', 'আল-বদর, 'আল-শামস' শব্দগুলির সঙ্গে ১৯৭১ সালের আগে বাঙালির কোনো পরিচয় ছিল না। দালাল শব্দটির সঙ্গে অবশ্য পরিচয় বাঙালির অনেক দিনের। তবে, ১৯৭১ সালে 'দালাল' বা 'দালালি' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিভিন্ন গ্রুপের গঠন, গ্রুপের সদস্যদের মন-মানসিকতার ভিত্তিতে উদ্ভব হয়েছে শব্দগুলির।

১৯৭১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে দালাল কে? ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দালাল অধ্যাদেশ 'বাংলাদেশ কোলাবরেটরস স্পেশাল ট্রাইব্যুনালস অর্ডার ১৯৭২' জারি করা হয়। এতে দালাল বা যোগসাজশকারী বা কোলাবরেটরদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে–

"১। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশে বেআইনি দখল টিকিয়ে রাখার জন্য সাহায্য করা, সহযোগীতা বা সমর্থন করা।

২। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দখলদার পাকবাহিনীকে বস্তুগত সহযোগীতা প্রদান বা কোন কথা, চুক্তি ও কার্যাবলীর মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করা।

৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের চেষ্টা করা।

৪। মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী জনগণের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৫। পাকবাহিনীর অনুকূলে কোন বিবৃতি প্রদান বা প্রচারণায় অংশ নেয়া এবং পাকবাহিনীর কোন প্রতিনিধি, দল বা কমিটির সদস্য হওয়া। হানাদারদের আয়োজিত উপনির্বাচনে অংশ নেয়া।"

উল্লিখিত সমস্ত গ্রুপই এর আওতায় পড়ে। যে অর্থে রাজাকার, কোলাবরেটর, আল-বদর বা পাকিস্তানপন্থী–সবাইকে দালাল বলা হয়।

রাজাকার বাহিনী বা রাজাকারদের সংগঠন করেছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালে জুন মাসে রাজাকার অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। পূর্বতন আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে এ দল গঠিত হয়। কিন্তু পরে বিভিন্ন শ্রেণীর পাকিস্তানপন্থীরা এই বাহিনীতে যোগ দেয়। এরা ছিল সশস্ত্র। হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবেই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। জেনারেল নিয়াজী এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন যে, রাজাকার বাহিনীর তিনিই স্রষ্টা। তারা যথেষ্ট খেদমত করেছে পাকিস্তানী বাহিনীকে, যে কারণে তাঁর বইটি তিনি তাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করেছেন।

আল-বদররা ছিল ডেথ স্কোয়াড। রাজাকার বাহিনীর পরপরই এটি গঠিত হয়। তবে, রাজাকার অধ্যাদেশের মতো কোন আইনগত বিধান এর ভিত্তি নয়। কিন্তু, পাকিস্তানী বাহিনীর প্রেরণায় এরা সংগঠিত হয় এবং হানাদার বাহিনীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল গভীর। আল-বদর বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ হানাদার বাহিনীই যুগিয়েছে। রাও ফরমান আলির নোটে আল-বদরদের উল্লেখ আছে। অবশ্য, সরকারিভাবে পাকিস্তানী বাহিনী তা অস্বীকার করেছে। আল-বদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন বর্তমান জামায়াত ইসলামের নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ৭ নভেম্বর ১৯৭১ সালে তারা 'আল-বদর দিবস' পালন করে। ১৪ নভেম্বর ১৯৭১ সালে নিজামী 'দৈনিক সংগ্রাম'-এ আলবদর বাহিনী সম্পর্কে লেখেন–

"... আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকসেনার সহযোগিতায় এদেশের ইসলাম প্রিয় তরুণ ছাত্র সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আল-বদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তিন শত তের জন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদর যোদ্ধাদের সেইসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আল-বদরের তরুণ মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ, সেই সর্বগুণাবলী আমরা দেখতে পাব।"

"পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গঠিত আল-বদরের যুবকেরা এবারের বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তাদের তেজোদ্দীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচী দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম। তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।"

অথচ, এই নিজামী এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে, আলবদর বলে কিছু ছিল না এবং নিজামীর সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার কারণ নেই। বর্তমান জামাতের নেতাদের প্রথম ৬/৭ জন সরাসরি আলবদর হাইকমান্ডে ছিলেন।

আমাদের কথা না হয় বাদ দিলাম। পাকিস্তানের গবেষকরা কী বলছেন? নাসর তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৭১ সালে ছাত্র সংঘ সেনাবাহিনীর সাহায্যে দু'টি প্যারামিলিটারি সংস্থা গঠন করে–আল-বদর এবং আল শামস। বাঙালি গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তা গঠিত হয়। আলবদরের অধিকাংশ সদস্যরা ছিল ছাত্র সংঘের, মুহাজিরদের মধ্যে থেকেও তারা সহায়তা পায়। ছাত্রসংঘের প্রধান বা নাজিম-ই-আলা মতিউর রহমান নিজামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলবদর ও আল শামস সংগঠন করেন। [Seyyed Vali Reza Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution : The Jama 'at-I-Islam of Pakistan, Berkeley (USA), 1994, p. 66]

রাজাকারদের সঙ্গে আলবদরদের খানিকটা তফাৎ ছিল। রাজাকাররা সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, পাকিদের পথ দেখিয়ে দিয়েছে গন্তব্যে, সংঘর্ষ হলে খুন করেছে, লুটপাট ও ধর্ষণও করেছে, বেগতিক দেখলে পালিয়েছে। অনেকে যুদ্ধকালীন

দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়েও রাজাকার হয়েছে, কিন্তু আল-বদরদের লক্ষ্য ছিল স্থির। প্রকৃতিতে তারা ছিল অতীব হিংস্র ও নিষ্ঠুর। তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণভাবে নিকেশ করে দিতে চেয়েছে। কারণ, তারা অনুধাবন করেছিল, যে ধরনের শাসন তারা করতে চায়, বুদ্ধিজীবীরা হয়ে উঠবে তার প্রধান প্রতিবন্ধক। মুক্তিযুদ্ধতো ছিল একটি আদর্শগত লড়াইও। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল বাংলাদেশ তত্ত্বে বিশ্বাসী যা পরে প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৭২ সালের সংবিধানে। দালালরা ছিল পাকিস্তান তত্ত্বে বিশ্বাসী। এই তত্ত্বে যারা বিশ্বাসী তাদেরও বিভিন্ন পর্যায় ছিল। রাজাকারদের মন-মানসিকতা বুঝতে হলে পাকিস্তান তত্ত্ব বা প্রত্যয় এবং এর বিভিন্ন পর্যায়ের খানিকটা ব্যাখ্যা দরকার। তা হলে বুঝতে পারব, কারা দালালি করেছে, কেন করেছে?

বাকি রইল আল-শামস। এরা আল-বদর ধরনেরই আরেকটি স্কোয়াড। হত্যাই ছিল যাদের মূল লক্ষ্য।

২.

এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একধরনের স্বাতন্ত্র্য বোধ কাজ করেছে সেই ষষ্ঠ শতক থেকেই। ১৯৪৭-এর আগে এই আঞ্চলিকতা বোধ রূপান্তরিত হতে থাকে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদে। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, বাঙালি হলে আগে মুসলমান হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান চেয়েছিল। গত শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হয়েছিল। সম্প্রদায় হিসেবে সে ছিল অধস্তন। একজন বর্ণহিন্দু একজন শূদ্রের সঙ্গে যে ব্যবহার করে একজন মুসলমানের সঙ্গেও সে ব্যবহারে কোন তারতম্য ছিল না।

আজিজুর রহমান মল্লিক ও সৈয়দ আনোয়ার হোসেন একটি প্রবন্ধে বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা দিয়েছেন—"মুসলমানদের এই পৃথক পরিচয় দাবি বাহ্যত ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির বলে প্রতীয়মান হলেও মূলতঃ তা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক সমাজ-পরিবেশে একটি প্রান্তিকীকৃত (marginalised) অর্থাৎ ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। এর ফলে, উপমহাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জনসংখ্যার অবস্থানগত বাস্তবতা এখানকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, যেখানে হিন্দুরা ছিল প্রায় সকল সুযোগ সুবিধার অধিকারী এবং মুসলমানরা ছিল ন্যায্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উঠতি বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমান অর্থনৈতিক সুবিধা পেয়েছিল। মুসলিম লীগ ছিল নেতৃত্বে। কিন্তু সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিতে বাঙালি মুসলিম লীগ নেতারা ছিল অধস্তন। অন্যদিকে, বাঙালি হিন্দুদের দেশত্যাগ বেশ একটা বড়সংখ্যক বাঙালি মুসলমানকে সুযোগ করে দিয়েছিল সম্পদের ভিত্তি গড়ার। রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল যাদের সুবিধাটি তারাই পেয়েছিল। এভাবে আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কায়েমি স্বার্থ। তবে, পাকিস্তানী আদর্শকে সামনে রেখে অর্থাৎ ধর্মকে ব্যবহার করে 'ইসলামপন্থী' বেশ কিছু দলের সৃষ্টি হয়, যেমন—জামায়াত ইসলাম,

নেজামে ইসলাম প্রভৃতি। মুসলিম লীগের সঙ্গে এদের লড়াইটা ছিল আদর্শ থেকে ক্ষমতা করায়ত্তের।

এর বিরুদ্ধে সংস্কৃতির প্রশ্নেই দ্বন্দ্বটি প্রকট হয়ে ওঠে ১৯৪৭-এর পর থেকে, যার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। এর সঙ্গে যুক্ত হলো অর্থনীতি। মধ্যবিত্ত তো বটেই, সাধারণ বাঙালির প্রসারণের সুযোগই সংকুচিত হয়ে গেল। ফলে, সাংস্কৃতিক সত্তায় স্বাধীনতা ও প্রসারণের দাবিতে এগিয়ে এল পাকিস্তান কাঠামোর ভেতরেই অন্যান্য দল, যার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ প্রধান।

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সবসময় ইসলামকেই শোষণ ও কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। শাসকদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হলেই তা দেখা হতো ইসলামদ্রোহী হিসেবে। সমীকরণটি ছিল এরকম–ইসলামের বিরোধিতা মানে ভারতকে সমর্থন। ইসলামের প্রতীক পকিস্তান হিন্দুদের প্রতীক ভারত। পাকিস্তানী শাসকদের বিরোধিতা করার অর্থ হলো হিন্দুত্ব সমর্থন। কেন্দ্রের অধস্তন বাঙালি সহযোগীরাও তা বিশ্বাস করত এবং প্রচার করত (যেমন মুসলিম লীগ, জামায়াত)। অধস্তন হলেও তারা তৃপ্তি পেল এই ভেবে যে, তারাও ক্ষমতার সহযোগী, কখন কখনও অংশীদার এবং সুযোগে অর্থনৈতিক উপায়েরও সুবিধাভোগী। তবে, তাদের সবাই অর্থনৈতিক সুবিধার অংশীদার ছিল তা নয়, কিন্তু মনোজগতে যে আধিপত্য সৃষ্টি করেছিল দল তা ভাঙা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পর পাকিস্তান প্রত্যয়ে নতুন কিছু উপাদান যুক্ত হলো। ধর্ম ছাড়াও শাসনের উপাদান হিসেবে সৃষ্টি হলো আমলা, বিশেষ করে সামরিক আমলাতন্ত্রের আধিপত্য। এর আগে আমলাতন্ত্র, বিশেষ করে সামরিক আমলাতন্ত্র কর্তৃক সিভিল সমাজ রাজনীতিবিদদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা, অভ্যন্তরীণ লুটের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ (বিশেষ করে পাকিস্তানবিরোধী)। এ আদর্শ, আরো অনেক বাঙালিকে যুক্ত করতে পেরেছিল শাসকদের সঙ্গে।

এই সামগ্রিক বঞ্চনার আবেগ পাকিস্তানের পরিসরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মনে সেই পুরনো আঞ্চলিকতার রেশ ফিরিয়ে আনে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ একটি একক যা বাংলাদেশ। শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা বা স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা তারই প্রতিফলন। ছয় দফা প্রত্যাখ্যাত হলে সৃষ্টি করা হয় 'পাকিস্তান'-এর বিপরীতে সোনার বাংলা মিথ। আঞ্চলিকতা বোধ উত্তরিত হয় জাতীয়তাবাদে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সোনার বাংলার স্বপ্ন মেনে নিতে থাকে। প্রশ্ন ওঠে সোনার বাংলা শ্মশান কেন? লিখেছেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর–"এভাবে পুনর্নির্মিত, পুনর্গঠিত হয়েছে ইতিহাসের দিক থেকে মৌল এবং স্থায়ী এক প্রতিরোধ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের মধ্যে। সোনার বাংলার এই নির্মাণের ফলে পাকিস্তানের কেবল নীরব, স্তব্ধ, মৌন, এই ধারণা যায় বদলে। এটি বদলে দেয় পরিস্থিতি এবং সাব অলটার্ন বাঙালিদের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস,

সংস্কৃতি, সমাজের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে স্পষ্ট হতে শুরুকরে দ্বৈরথের সম্মুখীন হয়ে, নিশ্চিতভাবেই জাতীয়তাবাদী ইতিহাস তত্ত্বের ভিত্তিতে।"

শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেয়। মানসিকভাবে বাঙালি প্রস্তুত হয়ে ওঠে দ্বৈরথের জন্য। অন্যদিকে, ১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোজগতে পরিবর্তন আসা শুরু করলেও পাকিস্তান আদর্শের ধ্বজাধারীরা তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। কারণ, তাদের ধারণা ছিল মনোজগতে এবং কায়েমি স্বার্থ কেন্দ্রগুলিতে তাদের আধিপত্য কেউ ভাঙতে পারবে না, তা অটুট।

৩.

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। পাকিস্তান আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে বাংলাদেশ আদর্শ। পাকিস্তান আদর্শ যারা অটুট রাখতে চেয়েছিল তারা গুরুত্ব দেয় পেশিশক্তির ওপর। পরিণামে শুরু হয় তাদের ভাষায় 'গৃহযুদ্ধ'। বাংলাদেশ আদর্শের পতাকাবাহীদের ভাষায় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তান আদর্শবাদীদের জন্য বিপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে যাঁরা নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা মানসিক কষ্টের শিকার হলেও নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তান আদর্শের বিপর্যয় হিসেবেই দেখেছিলেন। কারণ, তাঁদের কাছে কখনও মনে হয়নি বাঙালি পরিচয়টি প্রথম, পাকিস্তানি পরিচয় আসে তার পরে।

রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা ফিরতে চায়নি। কারণ, পাকিস্তান আদর্শ ও কেন্দ্রের সেনাবাহিনীর শক্তি তাদের কাছে ছিল অজেয়। তাদের মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের আদর্শ জয়ী হলে তাদের স্থান থাকবে না। এরচেয়ে পাকিস্তানে অধস্তন হিসেবে ক্ষমতার সহযোগী হওয়া ছিল শ্রেয়। এখানে আদর্শ বা ধর্মের প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু সেটি গৌণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি কি মুসলমান ছিল না? বা ইসলামে বিশ্বাস করত না? তবে, ধর্মটিকে ঢাল হিসেবে রাখা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে। তারা যা করেছে তা কি ইসলামি আদর্শে অনুমোদিত? ফলে, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে যা করার করেছে। ডঃ সাজ্জাদ হোসায়েনের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সাধারণ আল-বদরের মতো অস্ত্রহাতে ঘোরা। কিন্তু লক্ষ্য ছিল এক। ফলে, যার যার অবস্থান থেকে সে সে কাজ করে গেছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানী দালালদের, দালালদের মধ্যে অবস্থাগত কারণে আবার বিভিন্ন গ্রুপের। এর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র ও ফ্যাসিস্ট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে জামায়াত ইসলাম ও তার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রসংঘ। পাকিস্তানের অ্যাকাডেমিশিয়ান আব্বাস রশীদ 'পাকিস্তান মতাদর্শের পরিধি' শীর্ষক প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"উলেমাগোষ্ঠীর নিকট আইউব খানের নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে সামরিক বাহিনী এবং সনাতনপন্থী সংগঠনের মাঝে অসম হলেও পারস্পরিক ফলপ্রসূ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে, সনাতনপন্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে অগঠিত, অসংঘবদ্ধ উলেমাগোষ্ঠী নয়

বরং তাদের স্থান ইতিমধ্যে দখল করে নেয় সুসংগঠিত জামাত-ই-ইসলামী। জামাত-ই ইসলামীর নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞকে কেবল সমর্থনই করেনি, তাদের কর্মী ও সদস্যরা শান্তিকমিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সামরিক বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট এই শান্তি বাহিনীর দায়িত্ব ছিল বিদ্রোহ দমনে সামরিক কর্মকর্তাদের সহায়তা করা। আদর্শগত পর্যায়েও জামাত-ই-ইসলামীর সমর্থন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সামরিক বাহিনী স্বাগত জানিয়েছিল সর্বান্তকরণে।" তাই আমরা দেখি, আল-বদর ও আল-শামসদের মধ্যে জামায়াতের কর্মীই বেশি।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই দালালদের দ্বারা গঠিত হয় শান্তি কমিটি। ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১ সালের 'দৈনিক পাকিস্তানে'র সংবাদ অনুসারে "স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রচনাকারীদের দূরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।" এরস দস্যরা ছিল পাকিস্তান আদর্শের অনুসারী বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এলিট, যারা অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ করতে যায়নি। অন্যান্যের তুলনায় শান্তি কমিটির সদস্যর ছিল বলা যেতে পারে 'নরমপন্থী'। কিন্তু হত্যাকান্ডের পরিকল্পনায় বা অংশগ্রহণে তারা নিষ্ক্রিয় ছিল না অনেক ক্ষেত্রে।

বিভিন্ন পেশায় বা পদে থেকে এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে যারা হানাদারদের সহযোগিতা করেছে সেই সময়, তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে 'কোলাবরেটর' হিসেবে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক অনেকেই ছিলেন।

এরপর ছিল রাজাকার। আসলে এর শুদ্ধ উচ্চারণ 'রেজাকার'–ফারসি শব্দ। 'রেজা' হল স্বেচ্ছাসেবী, 'কার' অর্থ কর্মী। এক কথায় স্বেচ্ছাসেবী। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় হায়দরাবাদের নিজাম অনিচ্ছুক ছিলেন ভারতের সঙ্গে মিলনে। আত্মরক্ষার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার নাম দেয়া হয়েছিল রেজাকার বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জামাত নেতা এ. কে. এম. ইউসুফ শব্দটি ধার করেন এবং খুলনায় রেজাকার বাহিনীর সূত্রপাত করেন। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী, ৯৬ জন জামাত কর্মী নিয়ে এই বাহিনীর সূত্রপাত যা পরে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী–"প্রশাসনিকভাবে এই বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ যারা 'পাকিস্তান' ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঙালী হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল, দ্বিতীয়তঃ যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল এবং তৃতীয়তঃ গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়–এ ধরনের লোককে প্রলুব্ধকরণ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"

রাজাকার বাহিনী যাদের নিয়েই গঠিত হোক না কেন, এই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত জামায়াতে ইসলামী। আবু সাইয়িদ তাঁর 'সাধারণ ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আজম' গ্রন্থে জনৈক রাজাকারের পরিচয়পত্র তুলে দিয়েছেন যেখানে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে–

"This is to certify that Mr. Haroon-ur-Rashid Khan, S/o. Abdul Azim Khan, 36 Purana Paltan Lane, Dacca-2 is our active worker. He is true Pakistani and dependable. He is trained Razakar, He has been issued a Rifle No-776 ... with ten round ammunition for self-protection.

Sd/-illegible
In Charge
Razakar and Muzahid
Jamat-E-Islam
91/92 Siddique Bazar, Dacca."

রাজাকারদের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা দেয়া, মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করা প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে এরাই ছড়িয়ে পড়েছিল। সে কারণে, বাঙালিদের কাছে রাজাকার শব্দটি বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

আবু সাইয়িদ জানাচ্ছেন, আল-বদর বাহিনীর গঠনের সূত্রপাত জামালপুর শহরে। পাকিস্তান বাহিনী ২২ এপ্রিল জামালপুর দখল করে নিলে, জামালপুরের ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। "জামালপুর মহকুমায় আল-বদর বাহিনী কর্তৃক ৬ জন মুক্তিবাহিনীকে হত্যার মাধ্যমে তাদের 'কৃতিত্ব' প্রকাশিত হয়ে পড়লে জামায়াত ইসলামী নেতৃত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, রাজাকারদের চেয়ে উন্নতর মেধাসম্পন্ন রাজনৈতিক সশস্ত্র ক্যাডার গড়ে তোলার সুযোগ বর্তমান। আগস্ট মাস হতেই সারাদেশে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আল-বদরে রূপান্তরিত করা হয় এবং নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ও ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষে তাদের বুদ্ধিজীবী হত্যার তালিকা দিয়ে অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য পাঠান হয়। তাদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে বুদ্ধিজীবী হত্যায় নামান হয়।"

২৫ নভেম্বর ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। জানাচ্ছেন সাইয়িদ, "এই পরিষদে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের 'চীফ একসিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ) আফরাফুজ্জমান সহ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী খুনী আল-বদর কমান্ডাররা অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশের শুরুর সদস্য সামসুল হকের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটির সদস্যরা ছিল–

১. মোস্তফা শওকত ইমরান। ২. নূর মোহাম্মদ মল্লিক। ৩. এ. কে. মোহাম্মদ আলী। ৪. আবু মোঃ জাহাঙ্গীর। ৫. আশরাফুজ্জামান। ৬. আ.শ.ম. রুহুল কুদ্দুস। ৭। সর্দার আবদুস সালাম।"

আল-বদরদের কার্যকলাপ সুবিদিত। এ বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। এভাবে বাংলাদেশ আদর্শের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, তাদের সৃষ্ট বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে।

৪.

১৯৭১ সালেতো বটেই, তারপর তিনদশক পর্যন্ত, এ দেশে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি কীভাবে কাজ করে বা মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে সে ব্যাপারে গভীরভাবে কেউ চিন্তা করেছেন বলে জানি না।

আগেই উল্লেখ করেছি মুক্তিযুদ্ধের বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বা স্বায়ত্ত্ব শাসনেরও বিরোধিতা করেছেন অনেকে ১৯৭১ সালের আগে। ঐ বিরোধিতা, যুক্তির খাতিরে অগ্রহণযোগ্য এমন বলা যাবে না। কিন্তু, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর এবং স্বাধীনতার পর এ যুক্তি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সংবিধানের প্রথম পাতাতেই লেখা আছে–

"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের (সংশোধিত পাঠ) মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।"

এরপর স্বাধীনতাসংক্রান্ত কোন বিষয় আদালতের এখতিয়ারে পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু, বাংলাদেশ যেহেতু পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ সেহেতু এখানে এর উল্টোটাই ঘটেছে। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই স্বাধীনতাপক্ষের ও বিপক্ষের শক্তি আছে। এ প্রশ্ন অবশ্যই অনেকে করতে পারেন যে, স্বাধীনতালাভের পর একটি দেশে আবার স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি হয় কীভাবে? পৃথিবীতে, এদেশেই একমাত্র সরকার ও বিরোধীদল একই সঙ্গে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির সঙ্গে নমনীয় ব্যবহার করে। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই স্বাধীনতার বিপক্ষে পত্রিকাসমূহ অবাধে প্রকাশিত হয় এবং স্বাধীনতার বিপক্ষীয়রা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদ্গার করে যেতে পারছে।

শুধু তাই নয়, প্রাক্-মুক্তিযুদ্ধ পর্বের পাকিস্তান প্রত্যয়ের বিভিন্ন উপাদান আবার যুক্ত হচ্ছে রাজনীতিতে। বাংলাদেশ আদর্শের বিপরীতে সে বিষয়গুলি তুলে ধরাহচ্ছে, যা দেশের ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর। এই আদর্শের নাম দেয়া যেতে পারে পাক-বাংলা আদর্শ। এ আদর্শের যারা ধারক তাদের বাংলাদেশ অস্তিত্ব মেনে নিতে হচ্ছে। কিন্তু, বাংলাদেশ আদর্শ তাদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না হীনম্মন্যতার কারণে। কায়েমি স্বার্থ যা সৃষ্টি হয়েছে গত ত্রিশ বছরে তা বজায় রাখতে গেলেও পাক-বাংলা আদর্শ ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এর প্রধান উপাদান পাকিস্তানে বিশ্বাস, ভারতকে ইহজগতের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা কিন্তু ভারতকে গোপনে সুযোগ দেয়া, ইসলাম ধর্মকে ক্ষমতা দখলের স্বার্থে ব্যবহার করা, সামরিক আধিপত্যে বিশ্বাস ইত্যাদি। এই আদর্শের স্রষ্টা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রুরা। এদের পুনর্বাসিত করে জিয়াউর রহমান এই আদর্শের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন, পরে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ তাঁকে

অনুসরণ করেন। এঁরা এসব উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করেন কাকুল কালচার। কাকুলে যৌবনে তারা প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন এবং তা মগজে গেঁথে গিয়েছিল। সেটিরও আবার ক্লোন তৈরিতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন। পাকিস্তান আদর্শের স্রষ্টাদের অনেকের মৃত্যু হলেও তাদের দলে নতুন ক্লোন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ক্লোনরা যে সবাই সে আদর্শে বিশ্বাসী তা নয়। তারা বিশ্বাসী কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখা, স্বার্থের নতুন মানচিত্র তৈরি করায়।

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানী অ্যাকাডেমিশিয়ান পারভেজ আলী হুদোভয় ও আবদুল হামিদ নায়ার 'পাকিস্তানের ইতিহাস পুনর্লিখন' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন–"দেশ বিভাগের ৩০ বছর পর পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পুনর্জাগরণে এটাই প্রমাণ করে যে ধর্মীয় কোন মহৎ উদ্দেশ্য নয়, রাজনৈতিক মতলববাজিই এখানে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করেছে। সমাজের চিরস্থায়ী সামরিকীকরণের জন্য চাই একজন চিরস্থায়ী শত্রু। অনেক কারণেই পাকিস্তানের অন্যান্য প্রতিবেশীরা এই কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। অপরদিকে ভারত ও পাকিস্তানের শাসকবর্গ এই পারস্পরিক শত্রুতা ও উত্তেজনাকে একটি অপরিহার্য রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে দেখে আসছে।"

এখানে সৃষ্ট পাকি ক্লোনরা ঠিক একই কাজ করছে কিনা সচেতন নাগরিক মাত্রই তা বিচার করতে পারবেন। গত বিশ বছরে এ দেশে সৃষ্ট নতুন রাজনেতিক দলগুলির নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতিই এর প্রমাণ।

এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা হলে হয়তো কিছু জানা যেত। কিন্তু হয়নি এবং তথ্যের স্বল্পতাও লক্ষণীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের কার্যকলাপের বিবরণ সংগ্রহ করা এখন প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরাই এগুলি নষ্ট করে ফেলেছে বা ফেলছে। মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ বছর পর, এ. এস. এম. শামসুল আরেফিন 'রাজাকার ও দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা' প্রণয়ন করেছেন যার প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। আরেফিন লিখেছেন–

"বিভিন্ন পরিচয়ে এদের ভাগে ভাগ না দেখিয়ে গড়পরতা সবাইকে 'দালাল' পরিচয়ে চিহ্নিত করার প্রয়াসের পেছনে একটা কারণও রয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণ যেটি তা হলো, যে সব সরকারী কাগজের আলোকে এই তালিকাটি প্রস্তুত হয়েছে সেই সবের ছক অভিন্ন ছিল না। কোথাও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অপরাধের কারণ সংক্ষেপে বলা হয়েছে, কোথাও শুধু বলা হয়েছে কোলাবরেটর অথবা দালাল অথবা পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী। কোন কোন তালিকায় তাদের পরিচয় এরূপও রয়েছে যে, "Arrested Razakars, All-Badars and Mujahids' অথবা, 'Arrested on .... as they were either members of Razakars, Al-Badars, Al-Shams or Mujahid organisation and also supported the Pak Army in killing innocent public, looting, arson etc."

এ পরিপ্রেক্ষিতে এক কথায়, মোটাদাগে স্বাধীনতাবিরোধীদের আমি 'রাজাকার' নামে অভিহিত করেছি। রাজাকার, আগেই উল্লেখ করেছি, যারা বাংলাদেশে ছিল এবং মানুষ এই নাম ও তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত। জাহানারা ইমামের 'ঘাতক দালাল নির্মূল' আন্দোলন শুরু হলে রাজাকার নামটি আরো পরিচিত হয়ে সাধারণে ভাষ্যে

চলে আসে। হুমায়ূন আহমেদের একটি নাটকে সংলাপ ছিল–'তুই রাজাকার'। এসব কারণে, স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তি সে আলবদরই হোক বা দালালই হোক পরিচিত হয়ে ওঠে রাজাকার হিসেবে। জামায়াত ইসলাম, বাংলাদেশের আমীর গোলাম আযম অবশ্য সম্প্রতি বলেছেন, তাঁরা 'রাজাকার' ছিলেন না, ছিলেন 'রেজাকার'। হতে পারে রেজাকার শুদ্ধ, কিন্তু মানুষের কাছে অশুদ্ধ রাজাকারই পরিচিত। তাই আমিও রেজাকার-কে রাজাকারই লিখলাম।

উপরে সংকীর্ণ অর্থে রাজাকার প্রত্যয়টির বিশ্লেষণ করেছি। বর্তমান গ্রন্থে প্রত্যয়টি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যারা রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থন করছে বা তাদের আদর্শকে মোটা দাগে সমর্থন করে ভিন্ন ভিন্ন নামে [দল, প্ল্যাটফরম, গোষ্ঠি] বা রাজাকারবাদকে যারা রাষ্ট্রীয় দর্শনের অন্তর্গত করতে চাইছে তাদেরও এক অর্থে রাজাকার হিসেবে সম্বোধন করা যেতে পারে।

৫.

গত দু'দশক রাজাকার ও রাজাকারি দর্শনের বিরুদ্ধে লেখালেখি করছি। গ্রন্থাকারে ও পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত রাজাকার সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে যে সব লেখা প্রকাশিত হয়েছে তারই সংকলন *রাজাকার সমগ্র*। সংকলিত লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক *একতা*, সাপ্তাহিক *যায় যায় দিন*, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, *দৈনিক ভোরের কাগজ* এবং *দৈনিক যুগান্তরে*। এর অধিকাংশ আবার আমার পূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। শুধু ২০০৫-০৮ সালের মধ্যে লেখাগুলি কোথাও সংকলিত হয় নি। তবে, *রাজাকারের মন* [দুই খণ্ড], মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে যে সব লেখা সংকলিত হয়েছে তা এখানে সংকলিত হয় নি। এখানে সংকলিত হলো ১২৯টি প্রবন্ধ।

লেখাগুলি প্রুফ দেখতে গিয়ে একটি নতুন বিষয় অনুধাবন করলাম। গত দু'দশকে রাজাকারদের নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে যা আর মনে নেই। অনেক তথ্য আরো নতুন করে চোখে পড়ল। সে পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি, এ গ্রন্থ গত দু'দশকের রাজাকারদের কর্মকান্ডের ধারাবাহিক বিবরণ।

সংকলিত অনেক লেখায় পুনরাবৃত্তি আছে। তা স্বাভাবিক। রাজাকাররা তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে গেছে শাসকদের ছত্রছায়ায় এবং আমরা তার প্রতিবাদ করেছি এবং করছি। কিছুই মূলত: বদল হয়নি। নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে মাত্র। তবে, পাঠকরা গ্রন্থটি পড়লে একটি বিষয়ে হয়ত অবাক হবেন যে, রাজাকাররা তো বটে তাদের প্রশ্রয়দানকারি ও সমর্থক শাসক গোষ্ঠি, রাজনীতিবিদরা অহরহ সাধারণ মানুষকে অসত্য তথ্য প্রদান করেছেন, অসত্য মন্তব্য করেছেন। এবং এসব অসত্য তথ্য যে তারা দিচ্ছেন বা মন্তব্য করছেন তা প্রমাণিত হওয়ার পরও তারা কোন দায় দায়িত্ব নেন নি। এবং সাধারণ মানুষও জবাবদিহিতা চায় নি। ফলে, নতুন উদ্যমে অক্লান্ত ভাবে তারা অসত্য বলে গেছেন যা পুরো রাজনেতিক কাঠামেটিকে নষ্ট করে ফেলেছে। রাজনীতির মূল আদর্শ হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রতারণা।

জনগণ অসচেতন খানিকটাতো বটেই কিন্তু এলিট মহলও নিশ্চুপ থেকেছে। অথবা, এমনও হতে পারে প্রাক ১৯৪৭ সালে ডানপন্থার যে বিস্তার ছিল, ১৯৭১ সালে আমরা মনে করেছিলাম তা সংকুচিত হয়েছে। তা' হয়নি, বরং ১৯৭৫ সালের পর তার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। জিয়াউর রহমান রাজাকারদের মুক্ত করেছিলেন সেই ডানপন্থাকে শক্তিশালি করতে যাতে তার শাসন দীর্ঘ হয়। তিনি এই ধারণার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, ১৯৪৭ সালের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় নি, ১৯৭১ সাল একটি বিচ্যুতি মাত্র। তার শাসন দীর্ঘ হয় নি বটে তবে তার উত্তরসূরিরা সেই ধারা এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং জনগণের একাংশ সেই ডানপন্থার অন্তর্গত হয়েছে। সামরিক এবং বেসামরিক শাসকরা কোন না কোন ভাবে তাদের প্রশ্রয় দিয়েছে, এমনকী ২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশনে জামাতের নিবন্ধনের জন্য যে শুনানী হয় তাতে নির্মূল কমিটির পক্ষে আমরা বলেছিলাম [পরিশিষ্ট] আইনের ভিত্তিতে দেখলে নির্বাচন কমিশন বিধিমালা অনুযায়ী জামাতকে নিবন্ধন দেয়া যায় না। একমাত্র শক্তির ভিত্তিতেই তা দেয়া যায়। এবং নির্বাচন কমিশনও সেই ভিত্তিতে তাদের নিবন্ধন দিয়েছে।

১৯৭২ সাল থেকেই আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন করে আসছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে কিনা জানি না তবে স্বাধীনতা বিরোধীরা উচ্চপদে আসীন হলেও রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী হিসেবেই পরিচিত হবে। নৈতিক সামাজিক স্বীকৃতি তারা পাচ্ছে না। এটিই এখন হতে পারে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। তবে, এটি স্বীকার্য যে বিভিন্ন লেখালেখি, মিডিয়ার সহায়তা ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনের ফলে রাজাকারদের সম্পর্কে গণসচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই জাহানারা ইমামকে। পরবর্তীকালে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির, কাজী মুকুল প্রমুখের নেতৃত্বে আন্দোলন সজীব রয়েছে এবং আগের মতো মসৃণ গতিতে তারা সবকিছু করতে পারছে না। যারা রাজাকারদের রক্তে ভেজা হাত মিলিয়েছে তারা তাদের অন্ধ সমর্থকদের সমর্থন হয়ত পাচ্ছে কিন্তু বৃহত্তর সমাজ তাদের গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করছে।

রাজাকাররা কী করেছিল, কী করেছে এবং কী করতে পারে সেটি তুলে ধরার জন্যই প্রকাশিত হলো *রাজাকার সমগ্র*। *অনন্যার* মনিরুল হক এ বিষয়ে প্রস্তাব আনেন এবং আমি সানন্দে তা গ্রহণ করি। রঞ্জন নন্দী অতি দ্রুত কম্পোজের কাজ সম্পন্ন করে এবং তপন দেও অতি দ্রুত প্রুফ দেখে দিয়েছেন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণেই বইটি দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব হলো। তারা সবাই আমার ধন্যবাদার্হ।

ভবিষ্যতে রাজাকার সমগ্রের আরেকটি খন্ড প্রকাশ করার আশা রাখি।

মুনতাসীর মামুন

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ
২০০৯

শোক প্রস্তাব ও শহীদদের প্রতি অবহেলা

গত ছাব্বিশে মার্চ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও ঢাকা নগর জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে 'বাংলাদেশ '৭১' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। কুড়ি বছর আগের ঘটনার সার সার দলিল চিত্র। ফিরে যাই নিজ যৌবনে। আবার অনুভব করি রক্তে চঞ্চলতা, ছবির পর ছবিতে ফুটে উঠেছে ক্রোধ, হত্যাযজ্ঞ, বেদনা। একটি ছবির সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াই। চতুর্দিকে ছড়ানো মানুষের লাশ, দিগন্তে উড়ছে শকুন।

প্রদর্শনী ছেড়ে যখন বেরিয়ে আসি তখনো মনে ঘুরে ফিরে আসে ঐ লাশের সমারোহ আর শকুনের পাল। বাংলাদেশে কি সব সময় থাকবে এমনি লাশের সমারোহ আর দিগন্তে উড়বে শকুন?

স্বাধীনতা যুদ্ধে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে মানুষ। বিদেশী সেনাদের সাহায্য করেছে দেশী সহযোগীরা। প্রথম সরকার তাদের অনেককে ক্ষমা করলেন। পরবর্তী সরকার সম্মানের সঙ্গে তাদের করলেন পুনর্বাসন। এখানে উল্লেখ্য, যারা জড়িত ছিলেন নীতি নির্ধারণে, তাদের স্বজন হারানোর বেদনা ছিল না। পাঠ্য পুস্তক বদলে যেতে লাগলো। বদলে যেতে লাগলো গণমাধ্যম, সংবাদপত্রের সুর। সেই অগণিত লাশের কথা আর কারো মনে রইল না। তাদের স্বীকৃতির প্রশ্নে আজ সভা-সমিতি করে প্রস্তাব নিতে হয়।

একজন কখন লাশ হয়? উত্তরাধিকারীর জন্য সে কী রেখে যাচ্ছে, এ প্রশ্ন যখন তাকে বিদ্ধ করে তখন সে আর গুলি বা বেয়নেটের পরোয়া করে না। এভাবে গত চল্লিশ বছর লাশের পাহাড় জমেছে বাংলাদেশে। লাশ হওয়ার আগে মানুষ যে স্বপ্নের কথা বলে, নেতারা সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উত্তেজিত করে, যখন সে লাশ হয়ে যায় তখন সে স্বপ্নের কথা সবাই ভুলে যায়। স্বপ্নের এই অবমাননা তথা মানুষের এই অবমাননা, প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আবার উত্তাল হয়ে ওঠে রাজপথ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে নেতারা তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল, মানুষের স্বপ্নের মর্যাদা দিয়েছিল, অগণিত লাশের কথা মনে রেখেছিল, তাই তাদের সমাজ আজ স্থিতিশীল, বিশ্বের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ তাদের করুণা প্রার্থী।

নব্বইয়ের গণআন্দোলন, জাতীয় সংসদ অধিবেশন প্রসঙ্গে এ লম্বা ভূমিকা করতে হলো। নব্বইয়ের গণআন্দোলন এমন একটি আন্দোলন যেখানে স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর দুটি প্রজন্ম এক সঙ্গে প্রবলভাবে রাজপথে লড়েছে। লাশ হয়ে ফিরেছে। এ অভ্যুত্থানের সাফল্যে আমরা দিশেহারা হয়ে অপার আনন্দ করেছি যা ষোলই ডিসেম্বরের সঙ্গে শুধু তুলনীয়। আমাদের সেই বহু লাশ ও স্বপ্নের ফসল, সংসদ

অধিবেশন বসল। এবং মনে হল আসনে আসীন হয়ে সবাই আবার বিস্মৃত, ভুলে গেছেন অগণিত লাশের কথা।

টেলিভিশনের সামনে উদগ্র আগ্রহে বসে আশা করেছিলাম, প্রথমেই গত এক দশকের শহীদদের প্রতি যথাযথভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পর শুরু হবে অন্যান্য কাজ। কিন্তু তা হয়নি, বিরোধী দলের নেতাদের তীব্র প্রতিবাদের মুখেও যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়নি।

সংসদ নেত্রী যিনি গণআন্দোলনেরও নেত্রী তাঁরই তো প্রথম সেই সম্মান প্রদর্শনের কথা। সংসদের যে মুদ্রিত শোক প্রস্তাব আছে আমার কাছে তাতে প্রস্তাবের আগে 'মাননীয় স্পীকার' সম্বোধন করা হয়েছে। তাহলে স্পীকার প্রস্তাব করলেন কী কারণে?

শোক প্রস্তাবে কি শহীদদের নাম নেই? আছে, যেনো রাখতে হয় সে কারণেই। অথচ বেশ বড় আকারে শোক প্রস্তাব আছে একজন সংসদ সদস্যের যিনি ছিলেন গত সংসদের সদস্য এবং যে সংসদের বৈধতা স্বীকার করে না বাংলাদেশের দুটি বড় দল। পেছনের দুটি পাতায় শহীদদের তালিকা, শুনেছি, এই নামগুলো প্রদান করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তারা কোনো শহীদ সম্পর্কে এক লাইনের পরিচয়ও দিতে পারলেন না। অন্যদের বাদ দিই, এমন কি ডাঃ মিলনের উপরও এক প্যারাগ্রাফ দেওয়া গেলো না, যাঁর মৃত্যু এনে দিয়েছিল আন্দোলনে নতুন গতি এবং যার ফল এই সংসদ।

শোক প্রস্তাব নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে তখন প্রধানমন্ত্রী নিশ্চুপে ফটোজেনিকভাবে বসে ছিলেন। দেখি আর মনে হয়, ক্ষমতা মানুষকে কিভাবে বদলে দেয়। আর আমরা তো এও দেখেছি, আজ যার গলায় ফুলের মালা কাল সে কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকে ভিক্ষুকের মতো করুণার আশায়।

অথচ এ নিয়ে তো বিতর্কের অবকাশ ছিল না। লাশের অবমাননা আরো চোখে পড়ে, যখন বিতর্কের ইতি টানতে বাধ্য করা হয় ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট ব্যবহার করে। বিরোধী দল যখন শোক প্রস্তাব নিয়ে আকুল আবেদন জানাচ্ছেন তখন হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী বললেন মোনাজাত করতে। জামায়াত চাইল জুমার নামাজের কথা বলে অধিবেশন মুলতবী করে প্রসঙ্গের ইতি টানতে।

দু পক্ষই কেন প্রসঙ্গের ইতি টানতে চেয়েছিল? কারণ, এই পবিত্র শহীদদের তালিকায় জামায়াত তাদের কর্মীদেরও নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে, যারা নিহত হয়েছেন দলের অন্তর্কলহে। এভাবে সত্যিকার শহীদ ও ভণ্ড শহীদ এক হয়ে যায়; বাংলাদেশে প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়া মিশে যায়। হয়তো এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতো দেখেই প্রধানমন্ত্রী মোনাজাতের কথা তুলেছিলেন। জামায়াত তার চরিত্র অনুযায়ী কাজ করেছে যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে শঠতা। কিন্তু অন্যরা? বিএনপি আজ জামায়াতের দোস্ত, তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। তারা তাদের কাজ করবেই। কিন্তু স্বাধীনতার ধ্বজাধারী আওয়ামী লীগ ও অন্যরা। শোক প্রস্তাব থেকে যারা শহীদ হননি তাদের নাম বাদ দেওয়ার দাবি জানানো উচিত ছিল। পরের দিন যখন আবার আনুষ্ঠানিকভাবে শোক প্রস্তাব নেয়া হয় সেদিন এ প্রসঙ্গে দাবি আনা ছিল জরুরী। এ কথা বোধ হয় আমাদের মনে রাখা

প্রয়োজন যে, জামায়াত ও আলবদরদের প্রতি নমনীয়তা দেখিয়ে আমরা আজ কোথায় দাঁড়িয়েছি। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য, সংসদে যারা আছেন তাঁদের কোনো আত্মীয় গণআন্দোলনে শহীদ হয়েছেন বলে জানা নেই। স্বজন হারানোর বেদনা, জ্বালা তিনিই বোঝেন, যার স্বজন হারিয়েছে। চট্টগ্রামে সরকারী হিসাবেই একদিনের গুলি বর্ষণে শহীদ হয়েছিলেন একুশজন। যিনি গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি উচ্চপদেই আছেন, তার বিচার কোনো দল চায়নি এখনো।

পরদিন শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কিন্তু মূলকথা হলো, ঐ যে লাশের প্রতি তাচ্ছিল্যের ব্যাপারটি রয়েই গেল। ধরে নিতে পারি, নেতৃবর্গের কর্মকাণ্ড দেখে, স্বপ্ন দেখে যারা লাশ হয়েছিলেন তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। তাদের সন্তানরা, পরিজনরা নিঃস্ব হয়ে ভিক্ষুক হয়ে আবার করুণাপ্রার্থী হবে। সেই বায়ান্নো থেকে এই প্রক্রিয়া চলছে। আজ চল্লিশ বছরেও সে প্রক্রিয়া আমরা রোধ করতে পারিনি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও মানুষের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন এখনো শেষ হয়নি। রাজপথ কি আবার হয়ে উঠবে উত্তাল? নাকি মানুষ আর নামবে না বিশ্বাসঘাতকতা ও লাশের প্রতি অবমাননা দেখে?

না, রাজপথ আবার উত্তাল হবে, মানুষ আবার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাস্তায় নামবে। উত্তরাধিকারীদের জন্য লাশ হবে। আর বাঙালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতিরোধ করা, তা যে ক্ষেত্রেই হোক। শুধু তাই নয়, সংগ্রামেরও দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে তাদের। এই নববর্ষের প্রাক্কালে স্পষ্ট অনুভব করছি রাজপথ আবার ভরে উঠবে লাশে। গ্রাম গ্রামান্তরে, সারা বাংলাদেশ ছেয়ে যাবে স্মৃতিসৌধে। দিগন্তে উড়ছে শকুন। এত লাশ আমরা রাখব কোথায়?

১৯৯১

সাম্প্রদায়িকতাকে রুখে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় এগিয়ে যাবেই

সকালে দেখি মাদ্রাসার ব্যানার হাতে শ-দুয়েক তরুণ শ্লোগান দিয়ে মিছিল করছে। পরনে তাদের পায়জামা-পাঞ্জাবি ও মাথায় টুপি। কিন্তু হাতে তসবির বদলে লোহার রড ও লাঠি। মিছিলটিতে বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে। বাবরি মসজিদ ভাঙার মতো জঘন্যতম কাজ এবং মসজিদটি রক্ষায় ভারত সরকারের ব্যর্থতার জোরালো প্রতিবাদ অবশ্যই হওয়া উচিত। যে-কোনো ধর্মীয় উপাসনালয় ভাঙারই প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কিন্তু হাতে লোহার রড বা লাঠি কেন? লাঠি ও লোহার রড থাকার কারণ বোঝা গেল বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। বেছে বেছে দোকান লুট হতে লাগল। এদের সঙ্গে যোগ দিল লুটের অপেক্ষায় থাকা দুষ্কৃতকারীরা। মন্দিরে মন্দিরে চলল হামলা। পরদিন জানা গেল সারাদেশ জুড়ে ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছে, মন্দির ভাঙা হয়েছে। এবং সবখানে হামলাকারীদের চরিত্র ছিল এক।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে কি এ ধরনের ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হয় যে ছাত্ররা রড হাতে অন্য সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ভাঙবে, লুট করবে বা রাজনৈতিক দলের অফিসে আগুন জ্বালাবে? শুধু-তা-ই নয়, ধার্মিক মুসলমানদের পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবি ও টুপির তারা অবমূল্যায়ন করছে। এ পোশাক পরে তারা ১৯৭১ সালে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তাদেরই দেশের মুসলমানদের ওপর এবং এখনো চালাচ্ছে। আমরা তো আগে দেখেছি ও জানি, পাজামা-পাঞ্জাবি ও টুপি পরিহিত মানুষ মানবিক ধর্মের প্রতীক এবং তার হাতে যদি কিছু থাকে তাহলে তা হয় তসবি।

বাংলাদেশে মুসলমানত্ব ও ইসলামরক্ষার একচেটিয়া ইজারা এসব মাদ্রাসার ছাত্র, জামায়াতে ইসলাম, ফ্রিডম পার্টি ও তাদের অনুসারী ছোট ছোট দল বা আল-বদরীয় মুখপত্র 'ইনকিলাব'কে দেওয়া হয়নি। তাদের ভাবটা এই এবং তাদের দলীয় মুখপত্র সব দৈনিক পত্রিকা পড়লে মনে হয় তারা ছাড়া বাংলাদেশে ইসলাম সম্পর্কে সবাই অজ্ঞ। মুসলমান আমরাও এবং ধর্মকর্ম আমরাও কিছুটা জানি। ধর্মের নামে হানাহানি বা বিকৃতায়ন বাংলাদেশে হওয়ার কথা ছিল না। হয়েছে সামরিক শাসনজাত কারণে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদী সংগঠনের পুনরুজ্জীবনে এবং আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতাদের দায়িত্বহীনতার কারণে। মাদ্রাসায় যদি ধর্মের নামে এই শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে হয় মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করতে হবে : না হয় এ ধরনের মাদ্রাসা চলবে কি না তা সরকারকে ভেবে দেখতে হবে। ইসলাম ধর্মের একজন অনুসারী এবং রাষ্ট্রের একজন করদাতা হিসাবে এ দাবি আমি করতে পারি। কারণ, আমার বাবা-দাদা ধর্মভীরু মুসলমান। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন ইসলাম মানবতার ধর্ম,

হানাহানির নয়। যারা ইসলামকে হানাহানির ধর্ম হিসাবে তুলে ধরে তারা ইসলামদ্রোহী, মুরতাদ। যুক্তিতর্ক দিয়ে ইসলাম শিক্ষা বা বোঝা মুরতাদ হওয়া নয়। ধর্মদ্রোহী তারাও যারা ভেঙেছে বাবরি মসজিদ।

বাবরি মসজিদ নিয়ে গত কয়েক বছর ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে এবং এর জের হিসেবে, আশ্চর্য, পাকিস্তানে নয়, বাংলাদেশে দাঙ্গা হচ্ছে। অনেক ভারতীয় শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি এ ঘটনায় তারা বিরক্ত। তারা ভারতীয় জনতা পার্টি তো বটেই, কংগ্রেস ও অনেক বামপন্থীর ওপরে বিরক্ত। কারণ, এদের প্রশ্রয়ে আজ এ অবস্থা।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সবসময়ই কোনো-না কোনোভাবে বিরাজ করেছে উপমহাদেশে। কিন্তু ১৯৪৭ সাল ছাড়া কখনো তা এত তীব্র ও সংঘাতময় হয়ে ওঠেনি যা হয়ে উঠেছে গত কয়েক বছরে। মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা ভেবেছিলাম যে সাম্প্রদায়িকতা আর কোনো সমস্যা নয়। ভারতের ঘন ঘন দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আমাদের একধরনের আত্মতৃপ্তিও ছিল মনে। আমাদের এ-কথা কখনো মনে হয় নি যে, মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা যে ভুল করেছি তাতে সমস্যা চাপা পড়েছিল মাত্র। প্রথম যে ভুলটি হল তা হল শেখ মুজিব কর্তৃক রাজাকার অনেককে ক্ষমা ঘোষণা। এরকম ক্ষমাপ্রদর্শনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। তারপর এল সামরিক শাসন। সামরিক শাসকরা নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে বেছে বেছে রাজাকার-আলবদরদের পুনর্বাসন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী শক্তি হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করলেন জামায়াতে ইসলামীকে। বাংলাদেশের সামরিক শাসকরা বাংলাদেশ ও বাঙালিজাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তা পূরণ করতে কতদিন লাগবে কে জানে! এখন এসেছে বিএনপি। তারা জামায়াতের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে। বিএনপির কিছু কিছু এম.পি. প্রায়ই বলে থাকেন তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দল। ভাগ্যের পরিহাস মুক্তিযুদ্ধের এই নতুন তাত্ত্বিক ফ্রেমের অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা ও বিরোধীদের মিশ্রণ-এ-কথা শুনে যেতে হল। তাঁদের ধারণা, তারা ছাড়া দেশের অধিকাংশ মানুষ ছাগল। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকার কে তা বোঝে না। যা হোক, এভাবে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার চাষ শুরু হয়েছে এবং বেগম খালেদা জিয়া তাদের ফসল তুলতে সাহায্য করছেন যার প্রমাণ গত কয়েকদিনের ঘটনাবলি।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটের যে ব্যাপার থাকে সেটির অপব্যবহার এর কারণ। ভোটের সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষীরা অশিক্ষিত পশ্চাৎপদ সমাজে ধর্মীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে, যাতে তারা ভোট টানতে পারে। ভারতে একসময় কংগ্রেস ও বামপন্থী দলসমূহ ভারতীয় জনতা পার্টিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এখন এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন কীভাবে তাদের গ্রাস করল তা তো আমরা চোখের সামনেই দেখলাম। পাকিস্তানে একই ব্যাপার হবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও এই রক্ষাকবচ থাকা উচিত যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টি বা উসকানির সাজা হতে পারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড। কারণ, ধর্মপ্রাণ একজন হিন্দু বা মুসলমান পরস্পরের গলা কাটতে উদ্যত হন না। কারণ, সত্যিকারের ধর্ম তা

বলে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের কথা ধরুন। সেখানে কি জাতিবিদ্বেষী নাৎসি বা ফ্যাসিষ্টদের গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল? হয়নি। এবং তাই তারা অনেকটা মুক্ত হতে পেরেছে সভ্যতা বিধ্বংসী এসব শক্তির হামলা থেকে। বিএনপি ভারতের ক্ষমতাসীনদের মতো একই কাজটি করতে যাচ্ছে। তবে, আগে বিএনপি বললে জামায়াত করত। এখন জামায়াত বলে, বিএনপি তা পালন করে। একই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র- সবখানে বিএনপিপন্থীরা জামায়াতকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করছে। এ প্রশ্রয়দান কী বিপদ ডেকে আনবে অচিরেই তাঁরা তা বুঝবেন।

বহুদিন পর নির্মূল কমিটিই জামায়াতের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রতি জনসমর্থন বাড়ছে। মাসখানেক আগে সমন্বয় কমিটি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ ও গোলাম আযমের ফাঁসিসংক্রান্ত চার দফা দাবি আদায়ে হরতাল ডেকেছিল। শেষ মুহূর্তে তারা বাবরি মসজিদের ঘটনার প্রতিবাদও এর সঙ্গে যুক্ত করে। বেগম খালেদা জিয়া তা প্রতিরোধের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। হরতাল হতই। জামায়াত তা জেনে পুরনো কৌশলে একই দিনে হরতালের ডাক দিয়েছিল। খালেদা জিয়া ভেবেছিলেন তাঁর জনসভা দেখে যে, জনগণকে তিনি যা বলবেন তা-ই হবে। এরশাদও তা-ই ভাবতেন।

কিন্তু প্রসঙ্গ সেটি নয়। আমরা লক্ষ করছি সমন্বয় কমিটির চার দফা দাবির প্রতি জনসমর্থন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জামায়াতে ইসলাম-শিবির-ফ্রিডম পার্টির তৎপরতা অসম্ভব বেড়ে গেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে। আহমদিয়া মসজিদ পোড়ানো হয়েছে, কোরআন পোড়ানো হয়েছে, শিয়া-সুন্নি, আহমদিয়া, হিন্দু-খ্রিস্টান দাঙ্গা শুরু হয়েছে। এ সবই করা হচ্ছে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর জন্য। সরকার তাদের সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক-এসব অপরাধের জন্য সন্ত্রাস দমন আইনে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। শুধু তা-ই নয়, বেছে বেছে তারা বাংলাদেশের পরিচিত প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার অধিকারী বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় প্রচার চালাচ্ছে। বাবরি মসজিদের ঘটনা তাদের বড়রকমের সুযোগ এনে দিয়েছে। গত সাত-আট তারিখে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল, গত বাইশ বছরে তা হয়নি। লক্ষণীয় এই যে, আবুধাবীতে উটের পিঠে বাংলাদেশী শিশুকে যখন শেখরা ব্যবহার করে, পাকিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যে বাঙালি তরুণীদের দিয়ে যখন পতিতাপাড়া খোলা হয়, তখন তারা নিশ্চুপ থাকে। অথচ মানুষ আশরাফুল মখলুকাত। উপাসনালায় থেকেও তার স্থান উঁচু। তার অবমাননা তো ধর্মকেই অবমাননা। হরতালের দিনও তারা হিংস্র জন্তুর মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। প্রশ্ন হল, বাবরি মসজিদের ঘটনায় তাদের পিতৃভূমি মধ্যপ্রাচ্যে বা আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোতে বা তুরস্কে কেন মানুষজন অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ের ওপর হামলা করেনি বা মানুষ হত্যা করেনি- এ বিষয়গুলো ভেবে দেখলেই জামায়াত-ফ্রিডম পার্টির রাজনীতি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

জামায়াত-ফ্রীডম পার্টির ব্যাপারে আমাদের ধারণা পরিষ্কার। কিন্তু পরিষ্কার ধারণা

নেই আমাদের দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের সম্পর্কে। নব্বইর অভিজ্ঞতার পরও তাঁরা ত্বরিত ব্যবস্থা নেননি সংখ্যালঘুদের রক্ষায়। ড. আহমদ শরীফ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বা কবি শামসুর রাহমানকে যখন কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করা হয় তখন তাঁরা তার প্রতিবাদ করেননি। জামায়াত যখন কোরআন পুড়িয়ে দেয় তখনও তারা জামায়াতের বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার করে তোলেনি। তাহলে ব্যাপারটা কি এই যে, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ বা অসাম্প্রদায়িকতা বা প্রগতিশীলতার কথা ততটাই বলবেন যতটায় তাদের কাজ হয়ে যায়?

উপসংহারে বলতে পারি, দেশে এখন দুটি পক্ষ। মুক্তিযোদ্ধা পক্ষ ও রাজাকার পক্ষ। ৮ (ডিসেম্বর, ১৯৯২) তারিখের হরতাল প্রমাণ করেছে যে মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে জনসমর্থন বেশি। সমন্বয় কমিটির দাবি এখন জনদাবি। ভারত অনেক মাশুল দিয়ে বুঝেছে যে, সাম্প্রদায়িক দল তোষণের অর্থ নিজেদের বুকে ছুরি মারা। তা-ই তারা এখন সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ করার কথা সক্রিয়ভাবে চিন্তা করছে। আশা করি, সরকারপক্ষ অনুধাবন করবেন যে, মানুষ আজ কী চায়। অনুধাবন করতে না পারলে তাদেরই ক্ষতি। কারণ, এ বিজয় দিবসে মানুষ আবার শপথ নেবে আরেকটি বিজয় ছিনিয়ে আনার।

১৯৯২

মুরতাদ জামাতি ও পাকিস্তানি দালালদের প্রতিরোধ করুন

দুটি ছবি, প্রায় একই রকম। তবে, ঘটনার ব্যবধান প্রায় একুশ বছর। প্রথম ছবিটি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের। রাতে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আগুন ধরিয়ে দিয়েছে চকবাজারে। হত্যা, লুণ্ঠন ছাড়াই তারা পুড়িয়ে দিয়েছে পবিত্র কোরান শরিফ। এ সবকিছুই করেছে তারা ইসলাম রক্ষার নামে। ছবিটি সংকলিত হয়েছে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ও ঢাকা নগর জাদুঘর সংকলিত 'ঢাকা ১৯৭১'-এ।

ওই ১৯৭১ সালে, পাকিস্তানি ও হানাদার ইসলামরক্ষীদের অন্যতম সহযোগী ছিল গোলাম আযমের নেতৃত্বাধীন জামাতে ইসলাম। হানাদারবাহিনীর সঙ্গে হত্যা-ধর্ষণ লুটতরাজে তারাও পিছপা হয়নি। পাকিস্তানিরা নেই, কিন্তু জামাতিরা আছে। ধর্মের নামে যাবতীয় দুষ্কর্ম করে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এখনও তাদের অব্যাহত। গ্রামে যেমন বলে, রক্তের দোষ। এর প্রমাণ, কয়েকদিন আগে বাচ্চা জামাতিদের বখশিবাজারে আহমদিয়া মসজিদ আক্রমণ, লুটপাট। অবশ্য ধর্ষণের জন্য কোনো মহিলা তারা পায়নি। শুধু তা-ই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত কোরান শরিফের দুর্লভ সংগ্রহ তারা পুড়িয়ে দিয়েছে। পুড়ে যাওয়া কোরান শরিফের ছবি ছাপা হয়েছে ভোরের কাগজে।

জামাতের কথিত মাওলানা ড. আহমদ শরিফকে মুরতাদ বলেন, ফাঁসি দাবি করেন। কোরান শরিফ পোড়ানো মানে আল্লা-রাসুলের গায়ে হাত দেয়া। ড. আহমদ শরীফ কি গত চল্লিশ বছরে কোনো কোরান শরিফ পুড়িয়েছেন? না। জামাতিরা গত চল্লিশ বছরে কয়েকবার কোরান শরিফ পুড়িয়েছে, ভবিষ্যতেও পোড়াবে। তাহলে মুরতাদ কে? প্রতিটি জামাতি মুরতাদ। এই মুরতাদরা বাংলাদেশে এখনও কীভাবে বসবাস করছে? সরকারই-বা কীভাবে এই মুরতাদদের রক্ষা করছে? নাকি সরকারও পরিচালিত হচ্ছে মুরতাদদের প্রভাবে? আমদের স্লোগান হওয়া উচিত- 'কোরান পোড়ানো মুরতাদদের নির্মূল করো'।

বখশিবাজারে যে আহমদিয়া মিশন আছে তা-ই অনেকের জানা ছিল না। তাঁরা নিরিবিলি তাঁদের ধর্মকর্ম করে যাচ্ছেন। এরকম আরও অনেক সম্প্রদায় আছে বাংলাদেশে, যারা নিরিবিলি নিজ-নিজ ধর্ম পালন করেন ও দেশগঠনে অংশ নেন, যেমন বাহাই, ইসমাইলিয়া। গত চার দশকে এঁদের হামলার কথা কেউ ভাবেনি। পাকিস্তানে যখন জামাতিদের পিতা মওদুদীর নেতৃত্বে কাদিয়ানিদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়, তখনও এ অঞ্চল মুক্ত ছিল সে সন্ত্রাস থেকে। হিন্দু-মসুলমান দাঙ্গা হয়েছে মাঝে মাঝে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তা থামানো হয়েছে। এগুলো পুরনো বিষয়। কিন্তু গত কয়েক মাসের ঘটনা লক্ষ করুন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হামলা হচ্ছে, ইসলামরক্ষায় কিছু সাংবাদিক ও তাদের পত্রিকা এবং কথিত মাওলানারা সক্রিয়

হয়ে উঠছে। এগুলো কি 'স্বতঃস্ফূর্ত', নাকি পূর্বপরিকল্পিত?

এসব ঘটনা শুরুর সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করুন। গত কয়েক মাসে দ্রুত কিছু ঘটনা ঘটছে যা শাসকদল ও জামাতিদের অনুকূলে নয়। এগুলো হল- নির্মূল কমিটির আন্দোলন, জোর করে সন্ত্রাস দমন আইন পাস ও বিরোধীদলের সংসদ বর্জন, ইনডেমনিটি আইন বাতিল, রোহিঙ্গা শিবিরে ঝামেলা, পুশইন বা পুশব্যাক ইত্যাদি।

অতীতের অভিজ্ঞতা বলে, দেশে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে একটি মহল নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সরানোর জন্য অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উপরে যে-আন্দোলনগুলোর উল্লেখ করলাম এগুলো জামায়াত ও সরকারের বিরুদ্ধে। ফলে জামাত তাদের থেকে মনোযোগ ফেরাতে চাইছে অন্যদিকে। আর সরকার তো তাদের সহযোগী শক্তি। এখানে বলে রাখা ভালো, জামাতের সবসময় একজন পিতার দরকার হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রে তা হয় সরকারই। ইংরেজ আমলে ছিল ইংরেজ, পাকিস্তানি আমলে ছিল পাক সামরিক সরকার, এখন বিএনপি। তবে, বর্তমানে কে যে কার পরিকল্পনা কার্যকর করছে তা বোঝা মুশকিল হয়ে উঠছে। ফলে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, এখন ঘটছে তার অনেকটাই পূর্বপরিকল্পিত।

সেনাকর্মকর্তা যারা বাংলাদেশ শাসন করেছেন গত পনের বছর, তাঁরাই স্বাধীনতাবিরোধী ও প্রকৃত ধর্মবিরোধীদের বড় একটি অংশকে সংহত করেছেন ধর্মের নামে। সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এরা শক্তি জুগিয়েছিল। এরা একই শক্তি, পরিচিত বিভিন্ন নামে- যেমন জামাত, ফ্রিডম পার্টি, দৈনিক ইনকিলাব প্রভৃতি। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক তোষণে এরা গোকুলে বেড়েছে।

নির্মূল কমিটিই গত দু-দশকে প্রথমবারের মতো তাদের কার্যকরভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে। প্রথমে নির্মূল কমিটিকে হালকাভাবে নিলেও এসব শক্তি এখন আর নির্মূল কমিটিকে হালকাভাবে নিচ্ছে না, বিশেষ করে গোলাম আযমের গ্রেফতারের পর। তারা বুঝেছে নির্মূল কমিটিকে ঠেকাতে না পারলে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। যার ফলে হঠাৎ দেখি, শুধু হিন্দু-মুসলমনাই নয়, সুন্নি-কাদিয়ানি, হিন্দু-খ্রিষ্টান সব রকমের দাঙ্গার শুরু, আহমদ শরীফকে মুরতাদ ঘোষণা। এবং সমস্ত স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিই এক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ। ঐক্যবদ্ধ নয় শুধু বিপক্ষের মানুষেরা। সরকার এদের মদদ দিচ্ছে এ কারণে যে, তাদের ধারণা, সাধারণ মানুষের মনে ইনডেমনিটি বা সন্ত্রাসদমন আইন বা দু-জন মন্ত্রীর প্রতিটি বক্তব্য নিয়ে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে তা হ্রাস করা। না হলে, সন্ত্রাসদমনের নামে কিশোররা গ্রেফতার হয়, কিন্তু আহমদিয়া কমপ্লেক্স আক্রান্ত হওয়ার পরও বাচ্চা জামাতিদের সন্ত্রাসী হিসেবে গ্রেফতার করা হয় না কেন? গণআদালতের ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা প্রত্যাহারের চুক্তি সত্ত্বেও তা মানা হয় না কেন? বরং গোলাম আযমকে শ্বশুরবাড়ির আদরে রাখা হয় যখন তিনি ছিলেন জেলে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে এসব শক্তি, প্রগতির পক্ষের সবাইকে 'ভারতীয় দালাল' বলা শুরু করেছে। ভারতবিরোধী একটি

প্রচারণা গত চল্লিশ বছর ধরে এদেশে বর্তমান। এ বিরোধিতার ভিত্তি কী, তা যারা বিরোধিতা করেন তারাই বলতে পারেন। পাকিস্তান বা অন্য কোথাও মুসলমান নিগৃহীত হলে তারা যতটা না আপ্লুত হন তার চেয়ে বেশি হন ভারতে কিছু হলে। এর মনস্তাত্ত্বিক দিক থাকতে পারে, কিন্তু কিছু কিছু ইন্ধনের সূত্রও আছে যা স্বার্থন্বেষীরা ব্যবহার করে। লক্ষণীয় যে, 'ভারতীয় দালাল' তাঁদেরই বলা হয় যাঁরা বিএনপি জামাতের বিরুদ্ধে বা সউদি পাকিস্তানি স্বার্থের বিরুদ্ধে। যাঁরা প্রগতির পক্ষে বা উগ্র জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে তাঁরাও আখ্যায়িত হন 'ভারতীয় দালাল' নামে। এ প্রচারে কয়েকটি পত্রিকা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিক বা এলিট মহলের একাংশ সোচ্চার। কিন্তু 'ভারতীয় দালাল' কারা? যাদের সময় আবাধে ডিম আসে তারা, না প্রগতির পক্ষে যাঁরা তারা? যুক্তির খাতিরে ধরে নিলাম প্রগতির পক্ষে যাঁরা তাঁরা। তাহলে যারা এ প্রচার চালাচ্ছে তারা নিশ্চয় পাকিস্তানি দালাল। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সুতরাং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে আমাদের এখন শ্লোগান হবে-'পাকিস্তানি দালালদের নির্মূল করুন, বাংলাদেশ রক্ষা করুন।'

কিন্তু 'ভারতীয় দালাল' প্রত্যয়টির যথেচ্ছ ব্যবহারে মনে হয় এখন এর ধার কমে গেছে, তাই জামাত ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নিয়ে এসেছে 'মুরতাদ আহমদ শরীফ' প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে আবদুল মান্নানের 'ইনকিলাব'। পত্রিকাটি এরশাদের আমলে দাঙ্গা লাগিয়েছিল। দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্টের ব্যাপারে এ প্রত্রিকার ভূমিকা প্রবল। শুধু তা-ই নয়, এরশাদের সবেচেয়ে বড় সহযোগী ছিল এ পত্রিকা ও এর মালিক। লক্ষণীয় যে, সবচেয়ে বেশি সরকারি বিজ্ঞাপন পায় এ পত্রিকাই। এর অর্থ আশা করি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। সাংবাদিকদের একাংশও চমৎকারভাবে তাদের সাহায্য করছে। আমাদের দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও এলিট এবং 'শিক্ষিত' বলে চিহ্নিত সাংবাদিকদের একটি অংশকে দেখুন। 'ইনকিলাব' ও 'মিল্লাত' বারবার মিথ্যা খবর ছাপায়, সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে এবং বিপদে পড়লে মাপ চায়। এ সাংবাদিকেরা এদের ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেন না। বরং দেখেছি, ব্যক্তিবিশেষ এ কারণে প্রতিকার চেয়ে আইনের আশ্রয় নিলে তাঁরা নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন। একই সঙ্গে এদের অনেকে আলবদরের নিমক খেয়ে বাইরে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেন। সমাজের আরেকটি প্রভাবশালী অংশ এলিট বলে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ (যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের)বাইরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লেখেন, বলেন ও ভেতরে এইসব রাজাকারকে নিয়ে দল করেন। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, জামাত-ফ্রিডম পার্টি বা সাংবাদিক-শিক্ষক ব্যবসায়ীদের একাংশ সবাই মিলে একই সূত্রে গাঁথা; ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে সচেষ্ট।

এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করেও সরলভাবে প্রশ্ন করতে পারি- ইসলামে মসজিদে হামলা বা কোরান পোড়ানো জায়েজ কি না? তা যদি না হয় তাহলে যারা এগুলো করে তারা মুরতাদ কি না? এবং যারা তাদের প্রশ্রয় দেয় তারাও মুরতাদ কি না? উত্তর হবে- হ্যাঁ। দুঃখের বিষয়, আমরা যারা এসব মুরতাদের বিরোধী তারা কখনও ঐক্যবদ্ধ ছিলাম না এবং এসব মুরতাদ পাকিস্তানি দালালদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখেও

দাঁড়াইনি। কিন্তু এখন বোধহয় সময় ফুরিয়ে আসছে। এরা সবাই এখন হাত মিলিয়ে মরণ-কামড় দিতে উন্মুখ। কারণ, লক্ষ করুন তাদের দাবিনামা কীভাবে বাড়ছে ঃ

১. বিভিন্ন দাঙ্গার পর এখন জামাতি ও তাদের সহযোগিরা দাবি করছে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করার। সঙ্গে গোলাম আযমের মুক্তির জন্যেও সভা করছে। [গোলাম আযম তারপর মুক্তি পেয়েছে।]

২. সংসদে বিএনপি এমপি-দের কেউ কেউ 'মুরতাদ শরীফ' সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু দাঙ্গাকারী জামাত সম্পর্কে নিশ্চুপ।

৩. বিএনপি এমপি এখন বিদেশে নিজেকে পরিচয় দেন পাকিস্তানের পার্লামেন্টের এমপি হিসেবে।

৪. মাওলানা বলে কথিত সাঈদী এখন ফতোয়া দিয়েছে ড. আহমদ শরীফের বই পোড়ানোর ও আহমদ শরীফের মতো সবাকে নির্মূলের জন্য।

৫. সরকারের মন্ত্রীরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অসত্য বক্তব্য রাখছেন যা প্রকারান্তরে পাকিস্তানি পক্ষই সমর্থন।

খুব শিগগিরই হয়তো তারা বলবে, জামাতি এবং বিএনপি ও ফ্রিডম পার্টি ছাড়া সবাই অমুসলিম। আর এদেশে তারাই রাজনীতি করতে পারবে যারা সউদি আরব ও পাকিস্তানের পক্ষে।

বিএনপিতে নাকি মুক্তিযোদ্ধারা আছেন? যদি থাকেন, তাহলে তাদের এমপি-রা কেন পাকিস্তানের পার্লামেন্ট সদস্য বলে পরিচিত হতে চান বা সংসদে জামাতের বা মুরতাদদের সহযোগী হয়ে কাজ করেন বা তাদের মন্ত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস কেন প্রচার করেন? তাঁরা কি সাংবাদিক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সেই অংশের মতো যাঁরা সামান্য রুটির টুকরোর জন্য আত্মা বিকিয়ে দেন? মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতিবিদরা তো এ আচরণ করতে পারেন না। কারণ, অন্তিমে তাঁরাও তো রক্ষা পাবেন না।

বাংলাদেশে এখন সময় এসেছে নির্ণয় করার যে কারা এদেশে থাকবে। মুরতাদ বা পাকিস্তানি দালালরা না অন্যরা? অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক এরা। আমাদের বেছে নিতে হবে আমরা কী চাই। এবার যদি কোরান-পোড়ানো এই মুরতাদ ও পাকিস্তানি দালালদের আমরা রুখতে না পারি তাহলে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে। আমাদের প্রতিপক্ষ শুধু বাঙালি জাতীয়তাবাদ কেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও বিরোধী। যদি কেউ ভেবে থাকেন যে, মুরতাদ বা পাকিস্তানি দালালদের সঙ্গে যুদ্ধে আমি নিরপেক্ষ তাহলে ভুল করবেন। যাঁরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ছিলেন তাঁরা জানেন জামাতি মুরতাদ ও পাকিস্তানি দালালরা কী জিনিস। তারা কি আবার ভুল করবেন? যদি করেন তাহলে আমি-আপনি যারা মুক্তিযুদ্ধের, গণতন্ত্রের, প্রগতির, সামাজিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারের পক্ষে তাদেরকে হয় নির্বংশ হতে হবে নয়তো নির্বাসনে যেতে হবে। হয়তো ভাববেন, না হয় নির্বাসনেই যাব। কিন্তু জানেন কিনা জানি না, শেকড়হীন মানুষের চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেই। না হলে তিন-চারশো বছর পরও আলেক্স হ্যালিকে লিখতে হয় কিনটা কুনটির গাথা?

১৯৯২

আমার মৃত্যুও যেন না হয় সেই বাংলাদেশে

সারাটা বছর তাদের হাতে ছুরিটা লকলক করে। ছুরিটা এত চকচকে যে রোদে ধরলে তা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এই চকচকে ছুরি দিয়ে তারা বাংলাদেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়- রাজশাহী ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের পায়ের রগ কেটে দেয়; ফটিকছড়ি, রাউজান থেকে রংপুর বা এককথায় টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ধর্মপ্রাণ, সাহসী ও সংগ্রামী মানুষের পিঠে বিঁধিয়ে দেয় সেই ছুরি।

শুধু একটি মাস তাদের হাতের ছুরি গোঁজা থাকে ট্যাঁকে। এই ডিসেম্বরে তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। একটু ভুল বললাম। ফেব্রুয়ারি, মার্চেও তারা ঝিম মেরে থাকে। তবে আজকাল ফেব্রুয়ারিতেও 'ভাষা সৈনিক গোলাম আযম' এ ধরনের দু-একটি চিকা মারে দেয়ালে, মার্চেও যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু ডিসেম্বরে একবারে চুপ। কেন? কারণ, এই ডিসেম্বরেই হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে যায় বাংলাদেশের, মানুষগুলো সব নড়েচড়ে ওঠে। এই ঘুম ভাঙা মাসে, দেশের রাজনীতিবিদরাও ভয়ে থাকেন, জামাতি পক্ষের সরকার বিমর্ষ বোধ করে আর পাকিস্তানি দালালরা সন্ত্রস্ত থাকে। আবার হবে নাকি একাত্তর? আবার সারা বাংলাদেশ জুড়ে কি শ্লোগান উঠবে-'জয় বাংলা বাংলার জয়-হবে হবে হবে, হবে নিশ্চয়'। সারাবছর পাকিস্তানি দালাল ও জামাতিরা যা অর্জন করে, এক ডিসেম্বরে তার সব ভেসে যায়। এ প্রক্রিয়া চলছে গত সতের বছর। তবে, এতে খুশি হওয়ার কিছু নেই। সব ভেসে যাওয়ার অর্থ একবারে সব ভেসে যাওয়া নয়। প্রতি বছর শতকরা একভাগ রক্ষা করতে পারলেও সতের বছরে সে অর্জন করেছে সতের ভাগ। এই সতের ভাগের বিরুদ্ধে আজ আমাদের নতুন করে আন্দোলন করতে হচ্ছে।

জামাত বা পাকিস্তানি দালালদের এ অর্জনের পিছে আমাদের অবদানও কম নয়। আমরা বলতে আমি বাংলাদেশের বিশাল জনসমষ্টি এবং শহুরে নাগরিকদের একটি অংশ, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতার অংশীদার নয় অথচ প্রতিটি আন্দোলনে আত্মাহুতি দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত করছি না। তাদের ঈমান আমাদের থেকে পাকা। আমি আমাদের কথা বলছি, যাদের অধিকাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র ও ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত- যারা স্বাধীনতার পর কোটিপতি হয়েছি, পত্রিকার মালিক-সাংবাদিক হয়েছি। এদের মধ্যে সামরিক শাসক এবং সামরিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যারা, তারাই সবচেয়ে বেশি মদদ দিয়েছে পাকিস্তানি দালাল ও জামাতিদের। এদের মধ্যে ১৯৭৫ সালের কর্নেল ফারুক-রশীদ থেকে জেনারেল এরশাদ সবাই আছেন। আজ প্রচারমাধ্যম এবং বিএনপির নেতারা জেনারেল জিয়ার কথা বলার সময় অজ্ঞান হয়ে যান। কিন্তু পাঠক, আপনারা কি ভুলে গেছেন বাংলাদেশে 'আলবদর' হিসেবে খ্যাত আবদুল মান্নান ও

আব্দুল আলীমকে এবং রাজাকার শাহ্ আজিজকে কে প্রথম মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন? আপনারা কি ভুলে গেছেন এখানকার প্রখ্যাত বাম রাজনীতিবিদরা এরশাদের হাতে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানি দালালদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? বিএনপি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে। তাতে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু তার মানে কি জামাতের সঙ্গে যোগ দিতে হবে? আওয়ামী লীগ-বিরোধীতা মানে কি পাকিস্তানি দালালদের প্রতিষ্ঠা করা? এ মাত্রাটা রাজনীতিতে বিএনপিই যুক্ত করেছে। দুর্ভাগ্য, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ এ দলে থেকে সারা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করছে। তাদের শুধু বলতে চাই, মানুষকে এত বোকা ভাবার কারণ নেই। একই সঙ্গে রাজাকার-আলবদরদের কর্মসূচি কার্যকর করা হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত বলা হবে এবং মানুষ তা বিশ্বাস করবে, সে সময় বোধহয় এখন আর নেই।

এসবের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ বা কমিউনিষ্ট পার্টি সাধারণ মানুষকে তেমনভাবে মবিলাইজ করেনি। একটি উদাহরণ দিই। এরশাদের আমলে, বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মসূচির সমান্তরালে জামাতও একই কর্মসূচি দিতে থাকে এবং নিজেদের স্বৈরাচারের বিরোধী হিসেবে প্রমাণে সচেষ্ট থাকে। বিরোধীদলগুলো তখন তা উৎসাহিত করেছে। ওই সময় একজন সাংবাদিক, শাহরিয়ার কবিরই এর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন, যার মাশুল তাঁকে আজ দিতে হচ্ছে। কিন্তু তখন যা ভুল হওয়ার তা হয়ে গেছে। রাজনীতিবিদরা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন হরিণ মাংস খায় না; আর বাঘ খায় না ঘাস। রাজনীতিবিদরা যদি মানুষকে সচেতন করে তুলতেঁন তাহলে আজ আমাদের এ অবস্থা হত না।

আমাদের অধিকাংশই প্রো-স্টাবলিশমেন্ট বা ক্ষমতাবানের পক্ষে। আমি যে কমিউনিটির সদস্য বা যে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি। সেখানে অধিকাংশ শিক্ষক প্রো-স্টাবলিশমেন্ট নয় এমন কথা বলা যাবে না। শুধু তা-ই নয়, দেখেছি আমাদেরই শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও সহকর্মীরা ক্ষুদ্র স্বার্থ ও স্বল্প ক্ষমতার লোভে বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাতি শিক্ষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দল করছেন। শুধু তা-ই নয়, গত তিন বছর দেখা গেছে, প্রবলভাবে জামাতি ঝোঁকসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ। ভোটের জন্য জামাতি শিক্ষকদের তোয়াজ করতে করতে তারা অস্থির করে ফেলেছেন। শুনেছি, একজন মেধাবী ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়েও জয়েন করতে না পেরে আক্ষেপ করে বলেছিলেন- বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শিক্ষক রিক্রুট করা হয় না, ভোটার রিক্রুট করা হয়। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না, এসব কারণেই সুযোগ পেয়ে একজন শিক্ষক জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিল।

সাংবাদিকরা প্রায় সবসময় সরকার-বন্দনা করেছেন। শেখ মুজিবের আমল থেকে এ পর্যন্ত পত্রিকাগুলো পড়ে দেখুন, তাহলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যার ফলে, গত সতের বছরে সরকারসমূহ যখন জামাত ও পাকিস্তানি দালালদের শক্তিশালী করছে তখন সংবাদপত্রগুলোও তাতে সোৎসাহে অংশ নিয়েছে। কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা তাদের প্রথম সংখ্যা থেকেই বিরোধিতা করে আসছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ও অসাম্প্রদায়িকতার।

আলবদরের নিমক খান, কিন্তু বাইরে মুক্তিযুদ্ধের ও স্বৈরাচারবিরোধিতার কথা বলেন এমন নেতা সাংবাদিক ইউনিয়নে কম নয়। গাড়ি-বাড়ি তাঁদের হয়েছে, তাঁদের অনুসারীদের নয়। অতি সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ দিই। বিচিত্রার নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার কবিরকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে তিনি নির্মূল কমিটির সঙ্গে যুক্ত বলে। কিন্তু সাংবাদিক ইউনিয়ন তার প্রতিকার চায়নি বা তেমন সচেষ্ট হয়নি প্রতিবাদে। কবি শামসুর রাহমান যখন এরশাদের স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে চাকরিতে ইস্তফা দেন, তখন সাংবাদিকরা তাঁকে অভিনন্দনও জানাননি।

রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত যাঁরা, সবচেয়ে ক্ষমতাধর বা দেশের নীতিনির্ধারণের কাণ্ডারি- সেই আমলা, সামরিকবাহিনীর কর্তা এবং পুলিশ সবসময় নির্যাতন করেছে সাধারণ মানুষকে। ঢাকা নগর জাদুঘরের একটি প্রদর্শনী ও এরশাদ আমলের আরেকটি প্রদর্শনীতে দেখেছি ১৯৪৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়ের বৈশিষ্ট্য- রাজপথে নিরস্ত্র জনতা, অন্যদিকে সশস্ত্র পুলিশ তাদের পেটাচ্ছে। অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ দিই। জামাত ও নির্মূল কমিটির সমাবেশ হলে দেখি পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মূল কমিটির কর্মীদের ওপর আর ঘিরে রাখে জামাতিদের। সমষ্টিগত এই নির্যাতনের জন্য কর্তাব্যক্তিরা সবসময় পার পেয়ে যান এবং সরকারে যাঁরা থাকেন তাঁরাই তাদের সাহায্য করেন। সাম্প্রতিক আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক। স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে খ্যাত উচ্চপর্যায়ের আমলাদের পুনর্বাসন কে করেছে?

তবুও কেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ গণআন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও পরে রাজনীতিবিদদের দিকে তাকিয়ে থাকেন? এদেশের ইতিহাসে একটি অদ্ভূত ব্যাপার হল, যে -কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন প্রথমে শুরু করেন লেখক-সাংস্কৃতিক কর্মী, ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ। পরে যোগ দেন রাজনীতিবিদরা। সাংস্কৃতিক কর্মীরা সবচেয়ে কম আত্মা বিক্রি করেছেন এদেশে এবং তাই এক অর্থে তাঁরা মাইনোরিটি। ছাত্রদের একটি অংশের কথা বলেছি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দশ থেকে পনের ভাগ সক্রিয়ভাবে অংশ নেন আন্দোলনে। বাকিরা নিষ্ক্রিয়, তবে হয়তো সমর্থক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার প্রযোজ্য। এঁরাও মাইনোরিটি। সাংবাদিকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ, বিশেষ করে তরুণরা সোচ্চার। বাকিরা যা-যা করার তা করে নিয়েছে। সাংবাদিকরাও মাইনোরিটি। লেখক-শিল্পীদের বেলাও একই বিষয় প্রযোজ্য। এই মাইনোরিটির জন্যই সাধারণ মানুষ এখন বিশ্বাস করে শিল্পী-সাহিত্যিক, ছাত্র-শিক্ষক ও সাংবাদিকদের।

এই মাইনোরিটি বাংলাদেশে সবসময় গণবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে। মার খেয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে থেকেছে, আস্তে আস্তে সাধারণ মানুষ তাদের কথা উপলব্ধি করেছে। তাদের মিছিল স্ফীত হয়েছে, তারপর রাজনীতিবিদরা এসেছেন, সম্পন্ন করেছেন আন্দোলন। মেজোরিটি হয়ে তাঁরা ক্ষমতায় বসার পর আবার মাইনোরিটির ওপর নেমে এসেছে খড়্গ।

এই মাইনোরিটির একটি আদর্শ আছে। সেটির ভিত্তি সততা, ইনটেগ্রেটি; তারা সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে, তারা বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িতকতা ও প্রগতিতে। আর এ সবই হচ্ছে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। এই ধারাটি প্রকৃত অর্থে ১৯৭১ সালে মেজোরিটিতে পরিণত হয়েছিল।

এই মাইনোরিটিতে প্রবলভাবে ভয় করে সামরিক শাসক, মুরতাদ জামাতি এবং পাকিস্তানি দালালরা। তাদের এই ভয়ের বহিঃপ্রকাশ ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর যা এখন শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস নামে পরিচিত। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি, অনেকে প্রশ্ন তোলেন, সারা দেশে অগণিত শহীদ হয়েছেন, কিন্তু এদের বাদ দিয়ে বিশেষভাবে ১৪ ডিসেম্বর পালনের অর্থ কী? কাউকে বাদ দিয়ে কিছু পালন করা হয় না। ১৬ ডিসেম্বর তো সেই নাম-না-জানা শহীদদের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। ১৪ ডিসেম্বরটি প্রতীক সেই মাইনোরিটি ধারা যাদের ওপর শাসকরা সবসময় ক্রুদ্ধ। এই ধারাটিকেই ১৯৭১-এ পাক হানাদার বাহিনী ও জামাত হত্যা করতে চেয়েছিল আলবদর-নেতা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে। এখনও যে তারা তা করতে চাচ্ছে না তা বলি কীভাবে? এর আলামত কি চারদিকে নজরে পড়ছে না?

দুই

গত সতের বছরে নির্মূল কমিটিই প্রথম মুরতাদ জামাতি ও পাকিস্তানি দালালদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ওই-যে সেই মাইনোরিটি, তাঁরাই শুরু করেছিলেন আন্দোলন। অনেকেই তখন এ নিয়ে হাসাহাসি করেছেন, বলেছেন, এটি বালখিল্যতা। কিন্তু গণআদালতের দিন দেখা গেল এটি হয়ে গেছে বেগবান একটি ধারা। তখনই প্রমাদ গুণেছে মুরতাদ জামাতি, আলবদর ও পাকিস্তানি দালালরা।

গত এক বছর এ ধারা যত বেগবান হচ্ছে, ততই এরা চাইছে বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে। রগকাটা, ছুরি বসিয়ে দেয়া ছাড়াও তাদের পত্রিকাগুলো ক্রমাগত অসাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ব্যক্তিত্বদের চরিত্র হনন করছে। ড. আহমদ শরীফ তাদের কাছে মুরতাদ, কারণ প্রকাশ্যে তিনি ধর্মান্ধতার সমালোচনা করেন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু লেখা হবে, কারণ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় এবং বাংলা একাডেমীতে থেকে জালেমদের কাছে তিনি মাথা নোয়াননি। ফয়েজ আহমদ, শামসুর রাহমান সবাই ভারতীয় দালাল, কারণ তাঁদের কবিতা, কর্মকাণ্ড সবই জামাতি এবং পাকিস্তানি চেতনার বিরুদ্ধে। আজকে 'দালাল' সৈয়দ শামসুল হক, কারণ তিনি মুক্তিযুদ্ধের ওপর 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' ও 'নীল দশংন' নামে দুটি অসামান্য কাব্যনাটক ও উপন্যাস লিখেছেন। শুধু তা-ই নয়, কতটা জালেম হলে জাহানারা ইমামকে জামাতি নেতারা বলতে পারে, একুশ বছর পর কোন্ মা কাঁদে তার পুত্রের জন্য। যদি জামাতি বা পাকিস্তানি দালালদের সন্তানদের হত্যা করা হত, তাঁদের স্ত্রী ও কন্যাকে তাঁদের সামনে ধর্ষণ করা হত সেই ১৯৭১ সালে, তখন তাঁরা এ-কথা বলতেন কি না তা জানার ইচ্ছা রইল।

এতেও মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে না পেরে জামাতি ও পাকিস্তানি দালালরা আহমদিয়াদের দুটি মসজিদ ও কোরআন পোড়াল, দাঙ্গা বাধাল।

আমাদের দুঃখ এই যে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কেউ- রাজনৈতিক দল হোক, আর নির্মূল কমিটি হোক- এ প্রচারের বিরুদ্ধে তুমুলভাবে এটা তুলে ধরল না যে ড. আহমদ শরীফ মধ্যযুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান তুলে ধরেছেন, যা ছিল অবিকৃত এবং যা নিয়ে শুধু মুসলমানরাই গর্ব বোধ করে না, মৌলবাদীরাও তা ব্যবহার করে। আপনারা কি জানেন যে, তিনি সম্পাদনা করেছেন 'রসুল বিজয়'? এ কথাও তারা বলল না যে, কোরান পোড়ানো আর ইসলাম ধর্ম গুঁড়িয়ে দেয়া একই ব্যাপার।

ভারতের বাবরি মসজিদের ঘটনা জামাতিদের ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জন্য বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর জন্য। বাবরি মসজিদের ঘটনা যে ভারত সরকারের শৈথিল্যের কারণে ঘটেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং তা যে কতবড় অন্যায়, ধর্মপরায়ণ সবাই তা স্বীকার করবেন। কিন্তু ভারতে কিছু ঘটলে দায়দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে পড়বে কেন? খবরের কাগজে দেখেছি, সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে ব্যাপকভাবে মন্দির নষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং লুটপাট করা হয়েছে, তাতে জামাত ও পাকিস্তানি দালালদের হাত ছিল। ইসলাম কি বলে প্রতিবেশীর বাড়ি চড়াও হতে? ইসলাম কি বলে অন্যের উপাসনালয় ভাঙতে? ইসলাম কি বলে প্রতিবেশীর বাড়ি লুটপাট করতে? হ্যাঁ, জামাতিদের মওদুদীবাদী ইসলাম তা বলে। সে ইসলামে বলে ১৯৭১ সালের মতো গণহত্যা করতে, ধর্ষণ করতে। আমার আপনার ধর্মপ্রাণ মুসলমানের, রসুলের ইসলাম এগুলো করতে বলে না; আসল ইসলাম বলে এগুলো নাফরমানি কাজ। কিন্তু ধর্মের নামে গত কয়েকদিনে আমাদের দেশে এসব অধার্মিক কাজ হয়েছে।

ভারতে বিজেপি চেয়েছিল অস্থিতিশীলতা এনে ক্ষমতায় যেতে। জামাতের নেতারা বিজেপির নিন্দা করেনি, নিন্দা করেছে কংগ্রেসের। তাদের সঙ্গে বিজেপির আঁতাতটা পরিষ্কার। অর্থাৎ আমরা ভারতে, তোমরা বাংলাদেশে গণ্ডগোল করো, গোলাম আযমের বিচার তা হলে হবে না; দাঙ্গা বাধাও, তাহলে ভারত থেকে কয়েক কোটি অবাঙালি মুসলমান পাঠিয়ে দেয়া যাবে, তাতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও নাজুক হবে। আর সরকার তো তোমাদের পক্ষে।

কিন্তু বিজয় দিবসের আগে একটি অসামান্য হরতাল ও অভূতপূর্ব মানববন্ধন প্রমাণ করেছে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ফেরানো যায়নি। এখানে মন্দির ধ্বংস হয়েছে সত্যি, কিন্তু প্রতিবেশীকে বাঁচাতে প্রতিবেশী এগিয়ে এসেছে এটাও সত্য। প্রাণহানি প্রায় হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা ও বিশ্বাস এখনও আছে আমাদের মধ্যে। এখন তা শুধু প্রজ্জ্বলিত করার সময়। হরতাল ও মানববন্ধন আমরা জানি জামাতকে থমকে দাঁড় করিয়েছে।

আগেই বলেছি, ডিসেম্বরে জামাতি ও পাকিস্তানি দালালদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। এ ডিসেম্বরে তারা আরও মরিয়া হয়ে উঠবে। এ বছরটি তারা মনে করেছে তাদের জন্য সুসময়। চারদিকে অস্থিরতা, সরকার পক্ষে, অতএব যেভাবে হোক বাংলাদেশ নাম

মুছে ফেলতে হবে। এজন্য আরও দাঙ্গা, রায়ের বাজারের মতো হত্যা হতে পারে। আমি মনে করি আমাদের জন্যও এটি সুসময়, কারণ দেশে এখন দুটি পক্ষ- মুক্তিযুদ্ধপক্ষ ও রাজাকারপক্ষ। কে কোন পক্ষের সে-বিষয়েও আর কোনো অস্পষ্টতা নেই। এতদিন রাজাকারপক্ষের অনেককে আমরা মুক্তিযুদ্ধপক্ষ মনে করে ভুল করেছি। এখন আর সে কুয়াশা নেই। আমরা শুধু রাজনৈতিক দলগুলোকে সমস্ত অস্পষ্টতা ঝেড়ে এগিয়ে আসতে বলব মুক্তিযুদ্ধের পক্ষকে এগিয়ে নিতে। এটাই তাদের শেষ সুযোগ। কারণ রাজাকারপক্ষ এলে দেশে আর মুক্তিযুদ্ধপক্ষ বলে কিছু থাকবে না।

আমাদের সময় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। রাজাকারপক্ষকে রোখার দায়িত্ব এখন টগবগে তরুণদের। ১৯৭১ সালে তারাই রাজাকার আলবদর পক্ষকে রুখেছিলেন। আজকের তরুণদের শুধু বলব- হে যুবক, তুমি একবার স্মরণ করো তোমার পিতার কথা, যাকে রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে বা যশোরের গণকবরে পাওয়া গেছে। হে যুবক, তুমি একবার স্মরণ করো তোমার মার কথা, যিনি তোমার ছোটভাইকে বাঁচাতে গিয়ে বেয়নেটবিদ্ধ হয়েছেন। হে যুবক, একবার স্মরণ করো তোমার বড়বোনের কথা, যাকে এই রাজাকাররা খানসেনাদের হাতে তুলে দিয়েছিল ভোগের জন্য। আজ এ চৌদ্দ ডিসেম্বর রায়ের বাজারের বধ্যভূমি দেখেও কি তুমি বলবে, সেই সাংবাদিকের মতো, যে রাজাকারের হাতে তার শহীদ পিতার কথা ভুলে প্রেসক্লাবে ঘোষণা করেছিল- গোলাম আযমের বিচারের জন্য আমরা যুদ্ধ করিনি। যদি তা-ই বল, যদি আমরা আর না-ই পারি রাজাকারপক্ষের পরাক্রমের কাছে, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে বলব- আমার মৃত্যুও যেন না হয় সেই বাংলাদেশে।

১৯৯২

কিছু ঘৃণা রেখো মনে

ত্রিশের দশকে গণনাট্য সংঘের কর্মকাণ্ড যখন তুঙ্গে এবং ব্রিটিশ শাসন যখন ভাঙনের মুখে তখন শাসকদের নিপীড়নও হয়ে উঠেছিল জোড়ালো। ওই সময়, একটি গান খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল-'বিচারপতি, তোমার বিচার করবে এবার এই জনতা।' না, ভুল বুঝবেন না, আক্ষরিক অর্থে এটি গ্রহণ করলে আমরা ভুল করব, রূপক অর্থেই বিচারক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। এ বিচারপতি অর্থ শাসক শ্রেণী। এ গান তখন তরুণদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, যেমন ১৯৬৯-৭১ সালে অনেক গান আমাদের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিত।

ঘৃণা যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখনই এ ধরনের গানের সৃষ্টি। কবিরা বলেন, ভালোবাসার অন্য পিঠ ঘৃণা। হবে হয়তোবা। তবে, ভালোবাসা যেমন প্রয়োজন, প্রয়োজন তেমনি ঘৃণাও, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তো বটেই। ১৯৫২ সালে আমরা বাংলা ভাষাকে ভালোবেসেছিলাম আর ঘৃণা করেছিলাম নাজিমুদ্দিন, নূরুল আমিন ও তাদের পশ্চিমা প্রভুদের নীতিকে। 'বাংলা' স্বীকৃত হয়েছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। আজ নাজিমুদ্দিন বা নূরুল আমিনের কথা কেউ বলে না, তাঁদের সমাধিতে ফুল দিতেও কেউ যায় না। অন্যদিকে বরকত, জব্বারের নাম তারার মতো জ্বলজ্বল করে, তাঁদের সমাধি ভরে ওঠে ফুলে ফুলে। বরকত ছিলেন নিম্নবিত্ত ঘরের অজানা এক ছেলে। আর জব্বারও নিম্নপদের অজানা এক কর্মচারী। ইতিহাস প্রথমক্তোরা প্রভাবিত করেননি, করেছেন অজানা মানুষরা।

১৯৬৯ সালে স্বায়ত্তশাসন, আগরতলা-মামলা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে 'পূর্ব পাকিস্তানের' মুক্তির জন্যই ভালোবেসে মানুষ নেমেছিল রাস্তায়। প্রবল প্রতাপান্বিত আইয়ুব খান ও মোনেম খানের আমলে এমন হতে পারে তা কেউ কল্পনাও করেননি। কিন্তু মানুষের ঘৃণা এত উদ্দাম হয়ে উঠল যে, কেউ তাদের রুখতে পারেনি। মানুষ ভালোবেসেছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে। মানুষের ভালোবাসা তিনি বুঝে, ভালোবেসেই প্রতিদান দিয়েছিলেন। আইয়ুব-মোনেমের নাম এখন কেউ মুখে আনে না, আনলেও ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে। অথচ সেই তরুণ আসাদ বা কিশোর মতিউরের নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। মানুষ এখনো তাঁদের ভালোবেসে আপ্লুত হয়। মুক্তিযুদ্ধের আগে, আরেকটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল। প্রধান বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী সামরিক শাসক টিক্কা খানকে গভর্নর হিসেবে শপথ পড়াতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর বাসায় সামরিকবাহিনী হুমকি দিয়েও এসেছিল। তিনি অনড় থেকেছেন প্রথমে। আইন তাঁর কাছে তখন নিছক আইন হয়ে থাকেনি। আইন ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছিল

নৈতিকতা, ভূখণ্ডের সমষ্টিগত ভালোবাসা পূরণ ও কল্যাণ, সিভিল শাসন প্রয়োগের ভালোবাসা। বি. এ. সিদ্দিকী পরবর্তীকালে সেই মুসলিম লীগেই ফিরে গেছেন কিন্তু ওই একটি কারণে, বাঙালি এখনো তাঁকে মনে রেখেছে। ১৯৭১ সালে বাঙালি এত ভালোবেসেছিল পরস্পরকে ও বাংলাদেশকে যা আর আগে কখনো বাসেনি। আর অফুরন্ত ঘৃণা উগরে দিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, তাদের ভৃত্য মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম বা শাহ আজিজুর রহমান, গোলাম আযম, খান এ. সবুর খান, আব্বাস আলী, দেওয়ান আবদুল বাসেত, মতিউর রহমান নিজামীদের প্রতি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, ভূখণ্ডের প্রতি ভালোবাসা যত প্রবল হয়ে উঠেছিলো ঘৃণা তত হয়ে উঠেছিল জোরাল সেইসব হিংস্র হায়েনাদের প্রতি। এ ঘৃণা প্রবল না-হলে প্রায় ক্ষেত্রেই অস্ত্রহীন মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে সম্ভব হত না কিছু করা। ঘৃণাই তখন বাঁচিয়েছিল বাঙালিকে।

কিন্তু সমস্যাটা হল বাঙালির ভালোবাসা বা ঘৃণা কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী নয়। একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের সময়ই বলা যেতে পারে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অন্য কোনো সময় নয়। যদি তা হত দীর্ঘস্থায়ী তাহলে ইতিহাস হত অন্যরকম।

স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব ফিরলেন। ভালোবাসায় ঢেকে দিতে চাইলেন সবাইকে। রাজাকাররাও ক্ষমা পেল। হয়তো একটা পর্যায়ে চলে গেলে মানুষের আর ঘৃণাবোধ থাকে না। তিনি হয়ে ওঠেন অতিমানব। কিন্তু তাঁর সেই ভুল, মহানুভবতার কারণে আমরা আজ সর্বস্বান্ত হওয়ার পথে। তাঁর ভালোবাসা প্রমাণ করেছে- ভালোবাসা অপাত্রে দিতে নেই। যে যে-ভাষা বোঝে তার সঙ্গে সে-ভাষায়ই কথা বলতে হয়। যে ভালোবাসা বোঝে না, তাকে অফুরন্ত ভালোবাসা দিলে কী হতে পারে চিন্তা করে দেখুন।

এরপর, দু-দশক বাংলাদেশের মানুষ তেমন ভালোবাসেনি, ঘৃণাও করেনি প্রবলভাবে। হ্যাঁ, আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি- কেউই ভালোবাসা বা ঘৃণার প্রাবল্যে ভেসে যায়নি। আর সে-কারণেই, বাংলাদেশে একসময় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তাঁরা, যারা বিরোধিতা করেছিলেন বাংলাদেশের। শুধু তাই নয়, যারা এখনো অনুতপ্ত নয় ১৯৭১ সালের কর্মকাণ্ডের, তারাও নির্বাচিত হয়েছেন সংসদে। আলবদরের পত্রিকা-অফিস সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে ঢাকার কেন্দ্রস্থলে। তাদের সংখ্যা কম, কিন্তু তারা নিয়ন্ত্রণ করছে কৌশলগতভাবে প্রয়োজনীয় অনেক স্থান। এমন কি সরকারি দলও তাদের নিয়ন্ত্রণে। বাঙালি যেন ঘৃণা করতেও ভুলে গেল। শুধু ভালোবাসা মানুষকে মানুষ করে কি না জানি না, তবে ঘৃণা না-থাকলে সম্পূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না বলেই বুঝি। জামাতের কর্মী রগ কাটতে এলে যদি বলি ভালোবাসি, বসনিয়ার মুসলমানরা যদি গুলির মুখে সার্বদের বলে ভালোবাসি বা ধর্ষণোদ্যত সার্ব সৈনিকদের যদি বসনিয়ার মুসলমান রমণী বলে ভালোবাসি, তাহলে বাংলাদেশের অন্যদের এবং বসনিয়ার অস্তিত্বও এতদিন থাকত না।

মুক্তিযুদ্ধের পর রাজাকারদের ঘৃণার স্রোতে না-ভাসিয়ে দেয়ায় বাংলাদেশে এখন ইসলাম, মানবিকতা, স্বাধীনতা, অস্তিত্ব সব বিপন্ন। তাদের নিয়ন্ত্রণ যে এখন কোন্ পর্যায়ে চলে গেছে তা বাঙালি এখন অনুধাবন করছে। বছরখানেক আগে মাত্র, তাদের

ভালোবাসা যে বিপজ্জনক তা সংহতভাবে তুলে ধরেছে নির্মূল কমিটি। বাঙালির আশার কথা, আবার তারা ঘৃণা করতে শিখছে। মানুষের বোধ জেগে উঠছে। আসলে জেগে ওঠাই তো উচিত। যে ভূখণ্ডের স্বাধীনতার পর্যায়ে আসতে লেগেছে কয়েকশ' বছর, মাত্র ২২ বছরের মাথায় তার অস্তিত্ব যদি বিপন্ন হয়ে ওঠে তাহলে তা হবে হাজার বছরের অন্যতম ট্র্যাজেডি। এ ট্র্যাজেডি ঘটলে উত্তরাধিকাররা তো বটেই, বাইরের বিশ্বও ক্ষমা করবে না বাঙালিকে, করবে ঘৃণা। এই ট্র্যাজেডি থেকে উৎরানোর উপায় '৫২, '৬৯ বা '৭১-এর মতো দেশকে ভালোবাসা আর দেশ-বিরোধীদের ঘৃণা করা। '৭১-এ ঠিক যেমনটি হয়েছিল, পরিবারের কেউ যখন পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে, পরিবারের অন্যরা তাকে ঘৃণা করেছে, সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছে অনেক কিছুকে। এখনো আবার সে-সময়টি ফিরে এসেছে। সে-সময়ের কথা বললাম এ কারণে যে, ২৬ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটেছে তাতে শাসক ও তাদের সহযোগিদের পাকিস্তানি আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। আশার কথা এই যে, এর বিপরীত ঘৃণাও ছড়িয়ে পড়ছে। এ ঘৃণায় এখন ঢেকে দেয়া উচিত তাদের, যারা গোলাম আযমের নাগরিকত্বের খবর শুনে উল্লসিত হয়; সেসব রাষ্ট্রীয় কর্মচারিদের যারা উৎফুল্ল হয়ে কোলাকুলি করে নিজামীর সঙ্গে (দ্র. গত সপ্তাহের একতা), যে-মন্ত্রী বন্দনা করে গোলাম আযমকে, যে আলবদরদের পত্রিকা সাগ্রহে কেনে বা যারা বলে, এতদিন পর আবার কেন পুরনো বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি বা সেইসব বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, পেশাজীবীদের যারা সমন্বয়ের রাজনীতির নামে ভালোবাসে রগকাটায় ওস্তাদ জামাত-শিবিরদের। সে-ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে। বাঙালি আবার ঘৃণা করতে শিখুক, আর একবার প্রমাণ করুক- সে নির্বোধ মানুষ নয়, সে বোধী মানুষ, সে ঘৃণা করতে জানে। আবার যুদ্ধ সমাপ্ত হলে না হয় সে ভালোবাসায় ঢেকে দেবে বাংলাদেশকে।

১৯৯২

বাংলাদেশে ফেরা

অনেকের কাছে হয়তো মনে হচ্ছে সময়টা ১৯৭১ সালের মতো। মনে হতেই পারে। রাষ্ট্রের শীর্ষে একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। গো. আযম নিরাপদে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। টিক্কা খানের সহযোগী সহায় সম্পত্তি ফিরে পেয়ে খোদ মতিঝিলেই জাঁকিয়ে বসেছে। পাকিস্তানি ভাবাদর্শী এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় যিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের চিঠিতে থুতু ছিটিয়েছিলেন তাঁকে পাঠানো হয়েছে বিশ্বসভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি করে। জামাত-শিবির সমর্থকেরা বিএনপি-আওয়ামী লীগ ও ছাত্রমৈত্রীর ছেলেদের হত করছে কিন্তু গ্রেফতার হচ্ছে না। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ে স্বাধীনতার বাইশ বছর প্রথম খাস জামাতি প্যানেল শিক্ষক-সমিতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিত করছে এবং ইন্টারেস্টিং যে তাদের প্রধান কর্মকর্তার নামের শেষে যুক্ত আছে শামস্ শব্দটি।

১৯৭১ সালের পর যারা পরাজিত হয়েছিল, তারা, তাদের এজেন্ট এবং ভাবশিষ্যরা ১৯৭৫ সালের পর থেকে চাইছেন বিভিন্নভাবে ১৯৭১ সালের পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে। সংখ্যালঘু তারা। সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিজয়ী হয়েছেন ১৯৭১ সালে। ১৯৭৫-এর পর থেকে তারা চাইছেন সে-বিজয়কে অক্ষুণ্ন রাখতে যদিও অনেক ক্ষেত্রে পরাজিত হচ্ছেন তারা।

১৯৭৫ সালের পর থেকেই এই দ্বন্দ্ব চলছে নিরন্তর এবং এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনা দুরূহ। ১৯৭১ সালের পরাজিতরা উচ্চপদে, নিম্নপদে আছেন, যারা ঘাপটি মেরে বসেছিলেন এতদিন তারাও বেরিয়ে আসছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নিজেদের অবস্থা সংহত করছেন আর বিভিন্নভাবে ১৯৭১ সালের অবস্থা সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। কারণ, তাদের মনের জ্বালা মেটেনি। ফেব্রুয়ারি এলে, মার্চ এলে বা ডিসেম্বর এলে তাদের থিম সঙ হয়ে ওঠে 'আগুন জ্বালাইস না আমার গায়।' এ মাসগুলোর শুরুতে বা এইসব মাসে তারা কিছু 'অবস্থা' সৃষ্টি করতে চায়, তাগিদ অনুভব করে, মনের তাগদ বাড়ানোর চেষ্টা করে।

এ-কথা মনে হল কয়েকটি কারণে। ঢাকা শহরে বিজয়ের মাসে কিছু পোস্টার চোখে পড়ল। একটিতে লেখা আছে-'২৪ ডিসেম্বর- শুক্রবার বাদ জুমা- আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত- স্থান: মানিক মিয়া এভিনিউ- উদ্বোধন করবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস। মুসলিম বিশ্বের ওলামা মাশায়েখ-এর শুভাগমন- ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুওয়ত, বাংলাদেশ।' এ সম্মেলনের প্রধান দাবি আহমদিয়াদের অমুসলমান বলে ঘোষণা করতে হবে।

বিএনপির চেয়ারপারসন, সংসদে সরকারি দলের নেত্রী ও আমাদের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত কয়েকমাসে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বলেছেন, বাংলাদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হতে পারে বটে কিন্তু এখানে সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের অধিকার সমান। কারণ, তাদের পরিচয় বাংলাদেশী। একেবারে সংবিধানসম্মত কথা যা আমাদের আশ্বস্ত করেছে। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে দেশের প্রেসিডেন্ট কীভাবে একটি পক্ষ নিতে পারেন? পক্ষ নেয়ার প্রশ্ন উঠত না যদি-না সংগঠনটি এমন একটি ন্যাক্কারজনক নির্দিষ্ট শ্লোগান নিয়ে অগ্রসর না হত। কিন্তু সংগঠনটি সেই পক্ষ নিয়েছে যা সংবিধানেরও অবমাননা। রাষ্ট্রপতির তাদের সম্মেলন উদ্বোধন করার অর্থ তাদের পক্ষ সমর্থন করা বা মদত দেয়া।

কিন্তু না, শেষ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির দফতর জানিয়েছে রাষ্ট্রপতি সম্মেলনে যাচ্ছেন না। আসন্ন একটি দাঙ্গা হয়তো রোধ হলো। কারণ রাষ্ট্রপতি এ সম্মেলন উদ্বোধন করলে, জামাতিরা মনে করত, রাষ্ট্র এখন সম্পূর্ণ তাদের কর্তৃত্বে যা তারা চাচ্ছে। এবং তারপর দিনই তাদের 'হুকুমত' কায়েমের অভিযান শুরু হত। বিজয়ের মাসে যে ধরনের 'অবস্থা' সৃষ্টি করতে চায়' স্বাধীনতাবিরোধিরা এটি তার একটি উদাহরণ। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় এ ধরনের সম্মতি জ্ঞাপনের আগে খোঁজ নেয় না, কোন্ সংগঠনের উদ্দেশ্য কী? যাক, শেষ মুহূর্তে সচিবালয় বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। আমরা মনে করি, রাষ্ট্রপতি বিতর্কিত হতে পারেন কিন্তু রাষ্ট্রপতির পদটিকে যাতে বিতর্কিত করা না-হয়। আমরা ধরে নিচ্ছি রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আমলারা 'দল নিরপেক্ষ' এবং সে-মতো তারা কাজ করলেই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

কাদিয়ানী বা আহমদীয়াদের হুমকি প্রদান শুরু করেছে জামাতি ও তাদের এজেন্টরা। এবং স্থিতিশীলতা বিনষ্টের উদ্যোগ নিয়েছে বিজয়ের মাসে তা হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন। কিন্তু এ প্রজন্মের অনেকে হয়তো জানে না যে, জামাতিদের প্রধান নেতা মওদুদী, এক সময় ব্রিটিশ এজেন্ট এবং ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির সময় ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। ভারত বিভাগের অনেক পরে তিনি পাকিস্তানে আসেন এবং দৃষ্টি আকর্ষণ ও নিজের আসন পাকা করার জন্য কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা শুরু করেন। এ দাঙ্গায় বহু নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। পাকিস্তানের আদালত এ কারণে তাকে ফাঁসির আদেশ দেয় এবং জেনারেল আইয়ুব খান এসে তাকে মাফ করে দেন।

এতদিন কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে জামাত কিছু বলেনি। কিন্তু এখন বলছে। এখন অর্থাৎ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনের পর। এ আন্দোলনের ফলে, দেশের আনাচে-কানাচে জামাত ও স্বাধীনতাবিরোধিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে। জামাতিরা অস্ত্র নিয়ে নেমেছে। গত কয়েক বছরে নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু নিরস্ত্র মানুষ সশস্ত্র জামাতিদের প্রতিরোধ করছে। এখন সংসদে জামাতিরা প্রায় নিশ্চুপ। গত পৌর-নির্বাচনে একটি আসনও তারা পায়নি। ১৪ ও ১৬ ডিসেম্বর সারাদেশে এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের সহযোগী (বর্তমান সংসদ সদস্য) ও ১৯৭১ সালে আলবদর বাহিনীর নেতা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে যাঁরা

নিহত হয়েছেন তাঁদের স্মরণে বধ্যভূমিতে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছে। বিজয় সৌধে লক্ষ লক্ষ লোক গেছেন। বাড়িতে বাড়িতে উঠেছে জাতীয় পতাকা। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আওয়ামী লীগের বিজয় মিছিলে সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী লক্ষাধিক লোক যোগ দিয়েছেন। সেজন্য জামাত জরুরি মনে করছে এ ধরনের আয়োজনের যা পরিচালনা করবে তারা বা তাদের এজেন্টরা। সাম্প্রদায়িক স্লোগান দিয়ে সরল-সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করবে। বেছে বেছে তাদের পুরনো সঙ্গীসাথীদের তারা একত্র করছে এবং এমন অবস্থা দেখাতে চাচ্ছে যে, ১৯৭১ সাল ফিরে এল বলে। যেমন, বিজয় দিবসে ঝালকাঠিতে বিজয়স্তম্ভে নাকি তারা স্লোগান দিয়েছে 'সকল রাজাকার ভাই ভাই, আমরা আছি তোমরা নাই।'

যারা আছে তাদেরও থাকার কথা ছিল না। আমাদের সামান্য একটি ভুলের জন্যে গত প্রায় ১৮ বছর আমাদের অসামান্য ক্ষতি হয়েছে। প্রতিপক্ষকে, প্রতিপক্ষ হলেও মানুষ ভাবতে আমরা ছিলাম অভ্যস্ত, ঘাতক নয়। এখনো আমরা তাই ভাবি, আর ঘাতক নিঃশব্দে তার কাজ সমাধা করে।

খতমীদের কথা আগে শেষ করি। খতমে নবুওয়তের বাংলাদেশ শাখার আমির জনাব ওবায়দুল হক ডিসেম্বরের শুরুতে করাচি পৌঁছেছেন। তিনি ঢাকার বায়তুল মোকাররমের ইমাম। লাহোরের 'দি ডেইলি পাকিস্তান' ৫ ডিসেম্বর জানিয়েছে তাকে সেখানে স্বাগত জানান করাচি জামাতের আমির সাঈদ আহমদ, নাযেমে অলা মহম্মদ সানওয়ার ফারুক প্রমুখ। এখানে উল্লেখ্য মজলিসের সদর-দফতর মুলতান। জনাব ওবায়দুল হক এখানে প্রায়ই কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এবং সরকার কাদিয়ানীদের স্ট্যাটাস নির্ধারণের জন্য যে কমিটি করেছে তারও তিনি সদস্য। ফলে, কমিটির ফলাফল সম্পর্কে অনেকে ধারণা করে ফেলেছেন।

বায়তুল মোকাররম চলে আমাদের টাকায়। মসজিদের খতিবের বেতন দেয়া হয় আমাদের টাকায়। সরকারি কর্মচারী তিনি। সরকারি বিধি-অনুযায়ী তিনি এ ধরনের কাজ করতে পারেন কিনা তা ভূতপূর্ব আমলা ও বর্তমান ধর্মমন্ত্রী জনাব কেরামত আলীর কাছে জিজ্ঞাস্য। আরো জিজ্ঞাস্য, কোরান পোড়ানো কি ধর্মসম্মত? অপরের উপাসনালয় দখল কি ইসলাম সম্মত? অথচ বাচ্চা জামাতিরা গতবছর তাই করেছিল। মজলিসও প্রকারান্তরে তাই করতে চাচ্ছে জামাতের এজেন্ট হিসেবে। তাদের সঙ্গে যে জামাতের সম্পর্ক নিবিড় তা বোঝা যায় জামাতের আমির কর্তৃক জনাব ওবায়েদকে স্বাগত জানানোর মধ্যদিয়ে।

দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জামাতি-নেতারা সম্প্রতি কয়েকটি ঔদ্ধত্যমূলক বিবৃতি দিয়েছেন। এ-কথা সকলেরই জানা যে, ১৯৭১ সালে মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে গঠিত আলবদর বাহিনীর সদস্যরা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল।। সেই নিজামী আহ্বান জানিয়েছে, মর্যাদার সঙ্গে বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের। জার্মানির নাৎসীরাও কখনো বলেনি যে, যেসব ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছে তাদের স্মরণে একটি দিন মর্যাদার সঙ্গে পালিত হোক। শুধু তাই নয়, বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য জামাতিদের দায়ি করা নাকি 'রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা।' জামাতের ঢাকা

মহানগরীর আমির বলেছেন, 'বুদ্ধিজীবীদের জন্য তাদের মায়াকান্না দেখে আমরা আশ্চর্য হই।'

জামাতের আমির গোলাম আযম বিজয় দিবসের বাণীতে দেশবাসীকে হেদায়েত করেছেন এভাবে-'স্বাধীনতা মানুষের সহজাত কামনা। প্রায় দুশ বছরের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশের গোলামি থেকে স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও এর ফসল জনগণের দুয়ারে পৌঁছেনি বলেই ১৯৭১-এ আবার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজন হয়। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশেও জনগণ একইভাবে বঞ্চিত হয়ে রইল।' দুর্ভাগ্য যে, বেঁচে থাকতে যুদ্ধ-অপরাধীর বাণী শুনে যেতে হল স্বাধীনতা সম্পর্কে এবং তাও আবার বিজয় দিবসে! এ বাণীতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ আবারও স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। গোলাম আযমের ধারণা তখন পাকিস্তানিদের সঙ্গে আবার মিলিত হওয়া যাবে। তাই কি? আমরা অবশ্য মনে করি এ ধরনের আরেকটি যুদ্ধ হলে মন্দ হয় না এবং তখন আমরা ভুল করে প্রতিপক্ষকে মানুষ মনে করব না। শিল্পী কামরুল হাসান বিষয়টি সত্যদ্রষ্টার মতো অনুধাবন করেছিলেন। তাই তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন সেই অমর পোস্টারের এই বাণী-'ওরা মানুষ হত্যা করছে। আসুন আমরা জানোয়ার হত্যা করি।'

এই যে ঔদ্ধত্য, এটি তারা দেখাবার সাহস পেয়েছে ১৯৭৫ সালের পর থেকে-যখন থেকে তাদের পুনর্বাসন শুরু হয়েছে। জামাত এখন ভাব দেখাতে চাচ্ছে, তারাও দেশের জনসমষ্টির অংশ এবং মূল স্রোতে প্রবাহমান। সুতরাং তারাও বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবসে বাণী দিতে পারে। কারণ, অন্যেরা কি তা দিচ্ছে না? এভাবে বিভ্রান্ত করে তারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইছে। কিন্তু ভেবে দেখুনতো, ১৯৭১ সালে তারা ভুল করেছে, অপরাধ করেছে এবং এ কারণে তারা অনুতপ্ত এ-কথা কি কখনো বলেছে? শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের দুটি প্রধান দল নামের আগে বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহার করে। জামাত করে শেষে। অর্থাৎ পাকিস্তানে হচ্ছে মূল দল, বাংলাদেশেরটি তার শাখা-যেমনটি ছিল ১৯৭১ সালের আগে।

কিন্তু ইতিহাস বলে তো একটি বস্তু আছে যা জামাত, বিএনপি বা আওয়ামী লীগের নির্দেশে চলে না। এবং সে রায়টি বড় নির্মম। আজ একজন রাজাকারের পুত্র সে যত উচ্চপদেই আসীন হোক, যত প্রবল বিত্তশালী ও প্রভাবশালী হোক না-কেন, পরিচয় দেয়ার সময় বলতে হবে তার জনক রাজাকার বা আলবদর। পঞ্চাশ বছর পরও অবস্থা তাই থাকবে। এবং সমাজে সে গৃহীত হবে না তেমনভাবে, যেমনভাবে গৃহীত হয় অন্যেরা। অন্যদিকে, একজন মুক্তিযোদ্ধার পুত্র, নিরন্ন নিঃস্ব হলেও জনকের নাম বলার সময় সে চোখ তুলেই বলতে পারবে। একটি উদাহরণ দিই, বাংলাদেশে পুত্রের নাম কেউ মীরজাফর রাখে না। এখন বা ভবিষ্যতে জামাতি ছাড়া কেউ পুত্রের নাম গোলাম আযম বা মতিউর রহমান নিজামী রাখবে না। নিরস্ত্র মানুষের হয়ে ইতিহাসই এ প্রতিশোধ নিয়েছে।

কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, আসলে আমরা কি ক্লীব হয়ে গেছি? বা আমাদের রাজনীতিবিদরা জামাতিদের সঙ্গে ভোজ খেতে খেতে কি নিস্তেজ হয়ে গেছেন? তাই যদি

হয় এবং অপমানের যদি যোগ্য উত্তর তারা না-দিতে পারেন তাহলে তাদের বাদ দিয়েই আমাদের নেতৃত্ব খুঁজে নিতে হবে। নয় কি?

পাকিস্তানপন্থীরা বা পাকিস্তানী দালালরা আরো কেন মনে করছে ১৯৭১ ফিরে এল বলে? সেটার কারণ খোঁজা যাক।

গত ১৪ ডিসেম্বর সরকার তিনটি অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। একটি হল রায়েরবাজারে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন। ১৯৭২ সালে এ ধরনের একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। পরে তা হারিয়ে যায়। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের ওপর ডাকটিকেট প্রকাশ এবং পাঁচজন শহীদের নামে পাঁচটি রাস্তার নামকরণ। যদি ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলতেন, যাঁদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিসৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল, তাঁদের মর্যাদা অটুট রাখার জন্যে আজ থেকে বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারীদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হল তাহলে বেগম জিয়াকে এ মুহূর্তে মালা দিয়ে বরণ করা যেত। কিন্তু তা তো হবার নয়। এবং একই সঙ্গে নিহতকে সমবেদনা ও ঘাতকদের সঙ্গে করমর্দন নিহতকেই অপমান করার নামান্তর। অবহেলাও শ্রেয়, অপমান নয়। এবং এই একই কারণে, স্বাধীনতাবিরোধীরা মনে করে তারা তাদের মনজিলে পৌঁছবে, আবার ১৯৭১ সাল আসবে এবং এবার তারা বিজয়ী হবে।

তাই আজ বাইশ বছর পর, আজকের এই বিজয় দিবসে বলতে বাধ্য হচ্ছি, শহীদের জন্যে শোক বা বিজয়ের আনন্দ কোনোটিই স্পর্শ করছে না। শোক পাথরচাপা পড়ে গেছে, আনন্দ পরিণত হয়েছে বেদনায়। আজ, ১৬ ডিসেম্বর হওয়া উচিত প্রতিশোধ নেয়ার দিন। অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক পথে। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারদের উদ্দেশ্য যদি হয় কেন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তা ভুলে পাকিস্তানি 'ভাই'দের কোলে বসা এবং যদি নিয়মতান্ত্রিক পথ তারা ভঙ্গ করে তাহলে তাদের মতো করেই অপমানের প্রত্যুত্তর দিতে হবে।

নিজেদের দেশে আমরা কেন উদ্বাস্তু হব? কিন্তু, নিজেদের এখন উদ্বাস্তুই মনে হয়। সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ফয়েজ আহমদ এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি সভায় সুন্দর একটি মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা বাংলাদেশে ফিরতে চাই।' আমরা ফিরতে চাই সেই বাংলাদেশে যেখানে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনলে কারো 'দেলে জখমী' হয় না, সেই বাংলাদেশে যেখানে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা উসকে দেন না এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, সেই বাংলাদেশে যেখানে প্রধানমন্ত্রী আপসহীন স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে। আমরা ফিরে পেতে চাই না সেই বাংলাদেশ, যেখানে সেনাপ্রধানরা ক্ষমতা দখল করে নিরস্ত্র মানুষকে দমিয়ে রাখতে চায়, কাজ করে স্বাধীনতাবিরোধীদের পক্ষে। সেই বাংলাদেশে আমাদের ফিরিয়ে নেয়ার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃত্বের, (যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে দাবিদার) নতুন প্রজন্মের, আমরা অংশীদার হব যাদের মিছিলের। ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত। বিজয় মিছিল আগেও বেরিয়েছে কিন্তু তারপর একটি জায়গায় গিয়ে থেমে গেছে। এখন বিজয় মিছিলকে নিয়ে যেতে হবে বাংলাদেশের উদ্দেশে। আমরাও প্রস্তুত বাংলাদেশে ফিরে যেতে। আপনারা?

১৯৯২

জোরালো বিশ্বাস নেই যাদের

গোলাম আযম মুক্তি পেয়েছেন। এটা কোনো বিস্ফোরণমূলক খবর না। এ ধরনের একটি প্রক্রিয়া গত দেড় দশক ধরে চলছিল, যা এখন পূর্ণরূপ পেয়েছে। প্রয়াত জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা করায়ত্ত করে মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকারী ও হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর অন্যতম সহযোগী জামাতে ইসলামীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। একত্রিশ ভাগ ভোট পেয়ে 'জনগণের ম্যান্ডেট' নিয়ে বেগম খালেদা জিয়া যেদিন জামাতকে সাথি করে ক্ষমতায় গেলেন, সেদিন সবাই এ ধারণাই করেছিল যে, বিএনপি তাজিমের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকারী দলকে পুনর্বাসিত করবে। করেছেও। আর দল পুনর্বাসিত হলে দলপতি বাদ যাবে কেন?

অন্য আরেকটি দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। জেনারেল জিয়ার সময় গোলাম আযম বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তখন থেকে তিনি এ দেশে আছেন। বাসায় থাকতেন, মাঝে মাঝে গোপনে গোপনে এদিক সেদিক সফরও করতেন। কিছুদিন ধরে ছিলেন জেলে। বাংলাদেশের বাইরে তো আর যাননি। ফলে, অবস্থার খুব একটা হেরফের হয়নি। আদালত টেকনিক্যাল কারণে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব দিয়েছে। আইনের এই ত্রুটি (যদি হয়ে থাকে) ১৯৭৩ সালেও ছিল। এখনো তা রয়ে গেছে। তাঁকে ছেড়েছেও আদালত টেকনিক্যাল পয়েন্টে। গোলাম আযম ও তার দল যে মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করেনি এবং বাংলাদেশ চায়নি তা কিন্তু অপ্রমাণিত হয়নি। আর আমাদের মূল বক্তব্যও তার সঙ্গে জড়িত। আমরা যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিচার চেয়েছি। তাঁর নাগরিকত্ব ও মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে আমরা বিচলিত নই। বরং দেশী যুদ্ধাপরাধী হিসেবে মামলা আরো জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা। এ দাবি থেকে আমরা নড়িনি। নড়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই।

তবে, অবস্থার সামান্য হেরফের হয়েছে। কারণ, মুক্তি পেয়ে গোলাম আযম যা বলেছেন, বা গোলাম আযম মুক্তি পাওয়ার পর জামাত যা করছে তা ১৯৭১ সালের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেটাই আশঙ্কার কারণ।

গোলাম আযম যেদিন ছাড়া পেলেন সেদিন জামাত কর্মীরা নাজিমউদ্দিন রোড দখল করে রেখেছিল। সন্ধ্যায় দেখি মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোলাম আযমকে। তার বাসার গলিতে বসেছিল জামাত কর্মীরা। হাতে লাঠি, তাতে আবার পেরেক পোঁতা। বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাদের। ভোরের কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী 'গজারী লাঠির সঙ্গে পবিত্র জাতীয় পতাকা বেঁধে তারা ওই জাতীয় পতাকা কখনো দুমড়ে-মুচড়ে রাস্তায় ফেলে রাখে। আবার কখনো ওই জাতীয় পতাকাকে ব্যবহার করে বসবার কাপড় হিসেবে।'

বিশেষ আদালত গঠনের প্রশ্নে বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গোলাম আযম বলেছেন, 'তারা আগে গঠন (বিশেষ আদালত) করুক না কেন। তারা যদি আদালত গঠন করতে পারে করুন। করলে পরে দেখা যাবে তারা আমাকে নেয়ার ক্ষমতা রাখে কিনা?'

একই কাগজের সূত্রে জানা গেছে রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজের শিক্ষক নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'গোলাম আযমের মুক্তিই প্রমাণ করেছে আমরা একাত্তরে ভুল করিনি। একাত্তরের ভূমিকার জন্যেই আজ এ দেশে গোলাম আযমের এত জনপ্রিয়তা।' শুধু তাই না, পরের দিন জামাত কর্মীরা হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নির্মূল কমিটির কর্মীদের ওপর। সেই ছবিও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে, ১৯৭১ সালের স্থান থেকে গোলাম আযমরা খুব একটা নড়েননি। প্রয়োজনে ১৯৭১ সালের জামাত যা করেছে এখনো তাই করবে। উপরোক্ত ঘটনা/বক্তব্য তার সামান্য প্রমাণ।

গোলাম আযমের মুক্তি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে যারা দাবি করেন তাদের একটি মূল প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলোকে দাঁড় করিয়েছে। এ প্রশ্নের সুরাহা না-করে তাদের পক্ষে রাজনীতি নিয়ে এগোনো কতটা সম্ভব হবে জানি না, অন্তত আমাদের জেনারেশন বেঁচে থাকতে।

এর সঙ্গেই জড়িত রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা। ১৯৪৭ থেকে এ পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের মৌল বৈশিষ্ট্যটি হল বিশ্বাসহীনতা অর্থাৎ কোনোকিছুর প্রতি জোরালো বিশ্বাসের অভাব।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত, দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ, সিভিলসমাজ গড়ার জন্য সাধারণ মানুষ রাজনীতিবিদদের সহায়তা করতে চেয়েছে। রাজনীতিবিদরাও সে-মতো কাজের অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই অংশ হয়ে গিয়েছেন। ক্ষমতায় যারা যাননি তারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন। এ. কে. ফজলুল হক. সোহরাওয়ার্দি, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান কেউ এর ব্যতিক্রম নন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বা সিভিলসমাজ গড়ার স্বার্থে নিজেদের সামান্য স্বার্থ বিসর্জন দিতেও কেউ রাজি হননি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত রাজনীতিবিদদের আগে এগিয়ে গেছেন ছাত্র, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্তও একই ঘটনা ঘটেছে। জে. এরশাদ নয়বছর যথেচ্ছাচার চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন রাজনীতিবিদদের জোরালো বিশ্বাসের অভাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধীদের ক্ষমা করে সঠিক কাজটি করেছিলেন এ-কথা কেউ বলবে না। কিন্তু জামাতকে নিষিদ্ধ করে সঠিক কাজ করেছিলেন। এ-কথা জামাতের বর্তমান রগকাটা রাজনীতি দেখলেই বোঝা যায়। পরবর্তীকালে সামরিক শাসকরা যেমন, জে. জিয়া বা জে. এরশাদ জামাতকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ছাড়া, বাংলাদেশে জামাতের পক্ষে

টিকে থাকা কঠিন, এখনো। পূর্বসূরিদের মতো, খালেদা জিয়াও একই কাজটি করছেন জোরালোভাবে। সে কারণেই গোলাম আযম এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিতে পারেন। বেগম জিয়া বারবার একটি কথা বলেন, জনগণের ম্যান্ডেটের কথা। জনগণ কি তাঁকে ম্যান্ডেট দিয়েছিল বিতর্কিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি করার বা জামাতকে তাজিমের সঙ্গে পুনর্বাসন করার? জামাত কখনো সিভিলসমাজের পক্ষে নয়। হলে, তারা সামরিক শাসকদের সহায়তা গ্রহণ করত না। ইসলামের পক্ষে তো নয়ই- যতই বলুক-না তারা ইসলামের পক্ষে। জামাত বলেছে, গোলাম আযম বিশ্বের নেতৃত্ব দেবেন এ জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। সবার কথা বাদ দিই, মুসলিম বিশ্বই কি মুখিয়ে আছে তার নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে? ইন্দোনেশিয়ার ইসলামি রীতিনীতি ও সৌদী রীতিনীতি এক নয়। এক নয় বাংলাদেশ ও আলজিরিয়ার। তবে হ্যাঁ, ইসলাম যদি হয় হত্যাকারীর, ধর্মব্যবসায়ীর, উন্মত্ততা ও প্রতিশোধের, রগকাটা ও ধর্ষণের, তবে অবশ্যই তারা নেতৃত্ব দেবেন। তবে, এ ধরনের ইসলাম অন্য ইসলামি দেশগুলো মেনে নেবে কিনা সন্দেহ।

গোলাম আযম যেদিন মুক্তি পান, সেদিন নাজিমুদ্দিন রোড মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের দখলে থাকত, যদি তাদের বিশ্বাস জোরালো হত। লক্ষ্যে পৌঁছার বিশ্বাস থাকলে, জামাত কর্মীরা তোপখানা রোডে হামলা চালাতে সাহস পেত না। বিশ্বাস জোরালো হলে- কেউ প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে বলার সাহস পেত না '৭১ সালে ভুল করিনি।' এসব দলের রাজনীতিবিদরা এখনো মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তাই, যদি বলি, এখনও কোনোকিছুর প্রতি তাদের তেমন কোনো জোরালো বিশ্বাস নেই তাহলে কতটুকু ভুল হবে? যদি থাকতই, গোলাম আযমের কথা বাদ দিই, তথ্যমন্ত্রী বেতার-টিভি সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তাতেই লংকাকাণ্ড বেঁধে যেত।

গত দুদিন, আমি ও আমার এক বন্ধু সমাজের বিভিন্নপর্যায়ের মানুষজনের সঙ্গে আলাপ করেছি যারা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। তারা বিএনপি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। কারণ, তাদের অনেকেই এখন বিএনপিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে মনে করেন না। অবশ্য দুর্বলভাবে অনেকে বলেছেন, বিএনপিতেও মুক্তিযোদ্ধা আছেন। থাকতে পারে। তবে, একজন সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা তো মুক্তিযোদ্ধার মতোই আচরণ করবেন। যারা তেমন আচরণ করেন না, তাদের কী বলা হয়? মানুষজনের অনেকের আশঙ্কা, বিএনপি-জামায়ত এখন পুরনো দিনের ন্যাপ-সিপিবির মতো হয়ে যাবে। জামাতের কর্মীরা বিএনপিতে আর বিএনপি'র কর্মীরা জামাতে হয়তো যোগ দেবেন। ইতিমধ্যে রাজশাহীতে বেশকিছু জামাতকর্মী যোগ দিয়েছে বিএনপিতে। তখন হয়তো বিএনপি-র মুক্তিযোদ্ধা অংশ জামাতের মুক্তিযোদ্ধা অংশ বলে পরিচিত হবে। সুতরাং এ বলে সান্ত্বনা পাওয়ার কিছু নেই। বরং জামাত ও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিচারের প্রশ্নের প্রয়োজনে লড়াইটা করতে হবে বিএনপি-জামাতের বিরুদ্ধে।

মানুষজনের ক্ষোভ তাই বিএনপির প্রতি নয়, ক্ষোভ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল বলে পরিচিত শক্তির ওপর। কেননা, গোলাম আযম ও জামাত প্রশ্নে শর্তহীন কোনো

জোরালো বিশ্বাসের পরিচয় তারা দিতে পারছে না। আর বিএনপি তো রাজনৈতিক বিশ্বাসই ভঙ্গ করেছে।

রাজনৈতিক দলগুলো মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। মানুষের মনে তারা বিশ্বাসের ভিত গড়তে পারছে না। বরং বিশ্বাসহীনতা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে একটা সময় আসবে যখন বাংলাদেশ পরিচিত হবে বিশ্বাসহীনদের দেশ হিসেবে। আর যে-জাতির কোনো কিছুতে বিশ্বাস নেই, জোরালো বিশ্বাস নেই, সে-জাতি জগতে কোনো স্বীকৃতি পায় না।

১৯৯২

তোষামোদ ও হুঙ্কার

মাননীয় যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রমের নিশ্চয় মনে আছে ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের কথা। তিনি তখন তরুণ এবং তখন আরেকজন তরুণ মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে তিনি এবং তাঁর সাথিরা চট্টগ্রামে সপক্ষ অর্থাৎ পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে বিপক্ষ অর্থাৎ মাতৃভূমির জন্য অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। পক্ষ ত্যাগ একজন মানুষের জীবনের সন্ধিক্ষণ। সঠিক সময়ে যারা সঠিক পক্ষ বেছে নিয়েছেন তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করেছেন ইতিহাস। ১৯৭১ সালের ক্রান্তকালীন সময়ে অলি আহমদরা ঠিক পথটি বেছে নিয়েছিলেন বলেই তখন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। সামরিক একনায়কতন্ত্র উৎখাত করে জনশাসন, ধর্মান্ধতা উৎখাত করে প্রগতি, সাম্প্রদায়িকতা উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষতা- এক কথায় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁরা জীবনবাজি রেখেছিলেন। সামনে ছিল অনিশ্চয়তা, অন্ধকার। কর্নেল আহমদ, আপনার কি তখন বুক কেঁপেছিল? না, কাঁপেনি, বরং অমিত বিক্রমে লড়াই করে উপাধি পেয়েছেন 'বীর বিক্রম'। বাংলাদেশের স্বল্প কজন বীর বিক্রমের মধ্যে আপনিও একজন। আপনি ঈর্ষাযোগ্য।

ক্ষমতায় এসে জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতা সংহত ও কেন্দ্রীভূত করার জন্য রাজনীতি শুরু করেন, তখন অলি আহমদ জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের শাসনে বিশাল স্বপ্নে ফাটল ধরাই হয়তো এর কারণ। অথবা হতে পারে ওই দলে ছিল সামরিক কর্তাদের আধিপত্য, তাই সামরিক কর্তারা ওই দলেই বোধ করেছেন স্বাচ্ছন্দ্য। অথবা জিয়াউর রহমানের প্রতি ভালোবাসা বা আনুগত্যও এর কারণ হতে পারে। তবে, এগুলো মূখ্য বিষয় নয়। জনাব আহমদের কাছে বিনীত জিজ্ঞাসা, যেদিন জিয়াউর রহমান শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী, যাদু মিয়াকে সিনিয়র মন্ত্রী ও আবদুল আলীমকে মন্ত্রী করেছিলেন সেদিন আপনার কেমন লেগেছিল? কারণ, এর মাত্র কয়েক বছর আগে জানপ্রাণ বাজি রেখে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। কর্নেল, আপনার কি সে-সময় একবারও মনে পড়েনি, এরা কয়েক বছর আগে আপনার সাথি মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিয়েছে হানাদার পাকবাহিনীর হাতে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে, ধর্ষণ করেছে আপনার পরিচিত-অপরিচিত মা-বোনদের। এদের কারো রক্তের দাগ তখন শুকোয়নি।

বাঙালি ধর্ষিতা রমণী, পোড়া ঘর-বাড়ি-গ্রাম, শকুন-কুকুরে খাওয়া মৃতদেহ দেখে দেখেই তো অমিত তেজে লড়াই করেছিলেন। অপমানের শোধ নিতে চেয়েছিলেন। ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্তের দাগ তখন দগদগে, যখন রাজাকার আলবদরদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তাদের যখন মন্ত্রী করা হয় এবং একই সঙ্গে দল করতে হয়েছে, তখন কি

একটুও অপমানিত বোধ করেননি কর্নেল বীরবিক্রম? পরিবার-পরিজনের সামনে কি দাঁড়াতে একটু গ্লানি বোধ করেছিলেন? আপনি বোধসম্পন্ন লোক, আর গ্লানি অনুভব করে একমাত্র বোধসম্পন্ন লোকই। এ প্রশ্ন বিএনপির অধিকাংশ কর্তাকে করা যাবে না বা করবও না। কিন্তু আপনাকে করছি। কারণ, সরকারে আপনি সৎ হিসেবে পরিচিত, যোগ্যমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত, যিনি রাস্তাঘাট উন্নয়নে খালি নিজ দলের এম.পি-দেরই বিবেচনা করেন না। এ জিজ্ঞাসার আরেকটি কারণ, ভারত সফর শেষে আলবদরীয় তত্ত্বের সমর্থক 'ইনকিলাব'-এর আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে আপনার ঘোষণা, শেষ হুঙ্কার-'আমি মুক্তিযোদ্ধা'।

আজকের আলোচনার সূত্রপাত সে কারণে। ঘটনাটি ঘটেছে কয়েক সপ্তাহ আগে, কিন্তু এখনো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে এবং এখনো তা প্রাসঙ্গিক ও আরো কয়েক সপ্তাহ পরে এটিই আবার আলোচনার মূখ্য বিষয় হয়ে উঠবে।

বিএনপি সমন্বয়ে রাজনীতির প্রবক্তা। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে মিলে কর্নেল আহমদরা চালু করেছিলেন সমন্বয়ে রাজনীতি। বিপরীতধর্মী দুটি বিষয়ে কীভাবে সমন্বয় হয়? যদি হয়ই, তাহলে ১৯৭১ সালে কেন আপনারা যুদ্ধে গিয়েছিলেন? এর অর্থ সমন্বয় হয় না। বিপরীতধর্মী দুটি বিষয়ের সমন্বয়ের চেষ্টার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের বিষয়টিই হয়ে ওঠে মূখ্য।

১৯৭৫ সালের পর তাজিমের সঙ্গে নিজের মা-বোনের ধর্ষণকারী ও পিতা-ভাইদের হত্যাকারীদের যখন তখতে বসানো হয়, তখন হয়তো আশা ছিল এরা বশংবদ থাকবে এবং প্রয়োজনে গুণ্ডাবাহিনীর কাজ সমাপন করবে। কিন্তু তারা থেকেছে কি? এরশাদের সময় 'মাওলানা' মান্নান কি বিএনপিতে ছিল? ইনকিলাব লিখেছে-'কর্নেল সাহেব, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা। শহীদ জিয়ার আদর্শ বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের জন্য ইনকিলাব দীর্ঘ সাত বৎসর ধরে আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।' কথাটা কি সত্যি? তাই যদি হয় এতদিন এরশাদের হয়ে লড়াই চালিয়েছে কে? পুরো ব্যাপারটা প্রায় ভৌতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার বিরুদ্ধে বিষোদগারের বেশে কিছুদিন পরও গত ১৬ জুন সেই 'ইনকিলাব'-এ অস্থায়ী ব্রিটিশ হাইকমিশনার জর্জ ফিনলেসন-এর একটি চিঠি ছাপা হয়েছে-'আপানারা যে পত্রের উল্লেখ করেছেন তা একটা বানোয়াট ব্যাপার। এটা দুঃখজনক যে, আপনার পত্রিকা এ ধরনের একটা কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা রিপোর্টকে গুরুত্ব দেয়া উপযুক্ত মনে করেছে।' একজন কূটনীতিবিদ কতটা ক্ষুব্ধ হলে এ ধরনের চিঠি লিখতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সঙ্গে যেসব দেশে ভালো সম্পর্ক আছে বা থাকা দরকার, সেসব দেশের ক্ষেত্রেই এক ধরনের সংবাদপত্র অযথা আক্রমণ করছে, যাতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে ছায়া পড়ে। কোনো পত্রিকা যদি এ ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আপনার সরকার, যে সরকারে আপনি একজন মন্ত্রী, সে পত্রিকায় সর্বাধিক বিজ্ঞাপন দেয় কি ভিত্তিতে? এতে কী দেশের মর্যাদা বাড়ে? তথ্যমন্ত্রী তো আপনার সহকর্মী। আসলে এ প্রশ্নগুলো হয়তো উঠত না। কারণ, এতদিন 'ইনকিলাব'

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের, বিরোধীদলকে গালাগাল দিয়েছে। আপনাদের দেয়নি। এর হিসাবটাও সোজা। যে দল, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদল বা গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিপোষণ করে, সেটি আর যাই হোক, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল যে নয় তা তো নিশ্চিত। পত্রিকাটি এখন আপনাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করছে, যেহেতু প্রকাশ্যে না হলেও আড়ালে আড়ালে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন, রাজাকারী শাসনে অংশ নিয়ে গ্লানি বোধ করেন।

বিএনপি'র অনেকে, জামাতী, রাজাকার ও আলবদর এবং ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলকারী সমন্বয়পন্থীদের অনেকের একটি প্রধান যুক্তি- মুক্তিযুদ্ধ যা চুকেবুকে গেছে, তা নিয়ে মাতামাতি করা কেন? শুধু তাই নয়, একটি 'নন-ইস্যুকে' প্রধান ইস্যু করা হয়েছে। সেগুলো বাদ দিয়ে উৎপাদনের রাজনীতি করা উচিত। এগুলো যদি নন-ইস্যুই হয় তাহলে কি আর বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকে? এ ইস্যুর সমাধান ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমন্বয়ের রাজনীতি করেও নয়।

অলি আহমদ বীর বিক্রমের বিরুদ্ধে 'ইনকিলাব'-এর ক্রুদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভারত সরকার তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছে। আগ্রহ সহকারে ভাব বিনিময় করেছে। মনে হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীও বাস্তবতা মেনে, ভারতের সঙ্গে সমস্যাগুলোর মীমাংসা করে, সুস্থ পররাষ্ট্রনীতি গড়ে তুলতে চান। কিন্তু সমন্বয়ের রাজনীতি করলেও জামাত বা স্বাধীনতাবিরোধীরা তা মানবে কেন? ভারত বিরোধিতা তো তাদের মূখ্য পুঁজি। আর তারা জানে যে সমন্বয়ের নামে তাদের তোয়াজ করবে এ সরকার, দরকার হলে পা ধরে সালামও করবে। সুতরাং অপপ্রচার এমন পর্যায়ে উঠেছিল, সমমনা মন্ত্রীদের নিয়ে কর্নেলকে প্রেস কনফারেন্স করতে হল। 'ইনকিলাব' কেন এ কাজটি করেছে? এর উত্তরে অলি আহমেদ বীর বিক্রমকে বলতে হল–'আমি মুক্তিযোদ্ধা' বলেই। এ যেন দেয়ালে পিঠ ঠেকে-যাওয়া একজন আহত যোদ্ধার হুঙ্কার।

অর্থাৎ বিষয়টি অলি আহমেদ ও তাঁর সমমনা অনেকে অনুধাবন করেছেন। পত্র-পত্রিকায়, সংসদের বক্তৃতায় এ-কথাগুলো আসছে। তাঁরা হয়তো এটাও অনুধাবন করছেন যে মুক্তিযোদ্ধা-জামাত-ইনকিলাব-সংগ্রামের সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়; তারা এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, হাতে পায়ে ধরলেও নামবে না। ইতিহাসের অতি সাধারণ ছাত্র হিসেবে একটি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি, তোষামোদ করে কিছু অর্জন সম্ভব নয়। হিটলারকে চেম্বারলেনের তোষামোদ করার কারণে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার সাহস পেয়েছিল। এখানে তা সম্ভব নয়। আর এটি অনুধাবন করেই হয়তো তাকে মরিয়া হয়ে, রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গি করে বলতে হল-'আমি মুক্তিযোদ্ধা'। কর্নেল অলি আহমদ যে বিএনপি'র একজন প্রথম সারির নেতা, একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী, এসব পরিচয় হঠাৎ হারিয়ে গেল। তিনি নিজেও ভুলে গেলেন সেসব পরিচয় দিতে, তাঁর অন্তিম পরিচয় হয়ে উঠল-'আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা'। এ-কথা বলার সঙ্গেসঙ্গেই যেন সব গ্লানি ঝরে গেল, বোঝা গেল এ পরিচয় দিতে তিনি এক সময় গর্ববোধ করতেন- যা ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আজ থেকে পঞ্চাশ বা একশ বছর পরে, আমাদের অনেকের বা অলি

আহমদের উত্তরপুরুষ তাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে গর্ববোধ করবে এ বলে যে, তিনি ধনা, বা বিএনপি নেতা বা মন্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। কর্নেল অলির উত্তরপুরুষরা আরেকটু এগিয়ে বলতে পারবে- তিনি ছিলেন একজন বীর বিক্রম, সে তখন যত হতদরিদ্রই-হোক-না কেন। আর একজন আব্বাস আলী, নিজামী বা মান্নানের উত্তরপুরুষ রাষ্ট্রপতি, ধনী, অতি প্রভাবশালী যাই হোক-না কেন, পূর্বপুরুষের কথা বলতে গেলে মাথাটা খানিকটা হেট করে বলতে হবে, পূর্বপুরুষ ছিল বিশ্বাসঘাতক, আলবদর, রাজাকার।

ইতিহাসের একটি গল্পে আছে- সম্রাট আলেকজান্ডার ভারতীয় রাজা পুরুকে পরাজিত করার পর, বন্দি পুরুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কেমন ব্যবহার আশা করেন? পুরু জবাব দিয়েছিলেন প্রাণের ভয় না-করে, রাজত্বের চিন্তা না-করে যে, 'রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার'। গল্পের মর‍্যালটা বোধহয় এই যে, জীবনে আত্মমর্যাদা রক্ষাটাই প্রধান ও পবিত্রতম কর্তব্য, অন্য কিছু নয়।

একজন মুক্তিযোদ্ধা, তিনি বিএনপি বা যে দলই করুন (জামাত বা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদল হিসেবে চিহ্নিত ব্যতীত), প্রশাসনে বা ব্যবসায়ে থাকেন, ধনী বা দরিদ্র হন, তিনি যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার মতোই আচরণ করেন, যেমন করেছিলেন ১৯৭১ সালে-আমাদের আশা এই একটিই। দল, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, মন্ত্রিত্ব যেন সে-চেতনাকে আচ্ছন্ন না-করে-যেমন করেনি ১৯৭১ সালে। এখন সময় এসেছে অলি আহমদের সেই হুঙ্কার সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার-'আমি মুক্তিযোদ্ধা।'

১৯৯২

জামাত, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং বিএনপি ও আওয়ামী লীগ

জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মতিউর রহমান নিজামীর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তিনি খানিকটা নার্ভাস বোধ করছেন। ১৯৭১ সালের আলবদরের নেতার এহেন নার্ভাস বোধের কারণটা কী? পাকিস্তানে জামাত একটি সিটও পায়নি বা সৌদিআরব মৌলবাদীদের অর্থসাহায্য বন্ধ করে দিচ্ছে- এসব খবরই কি নার্ভাস হওয়ার কারণ? সরাসরিভাবে এসব খবর নার্ভাসের কারণ নয়। মূল কারণ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে এবং সংসদে জামাত বাদে সব এমপি এ বিষয়ে ইতিবাচক মত রেখেছেন, সমস্যাটা সেখানেই। জামাত কারো সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। অনেকটা পরগাছার মতো। পাকিস্তানে এতদিন সরকারি দল ও সেনাধ্যক্ষরা জামাতকে সমর্থন দিয়েছিল। নির্বাচনে তাই তারা দু-একটি আসন পেয়েছিল। সাম্প্রতিক নির্বাচনে কেউ সমর্থন দেয়নি সুতরাং তারা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এটিও তাদের নার্ভাসনেসের পরোক্ষ কারণ। ১৩ অক্টোবর এ পরিপ্রেক্ষিতে ভোরের কাগজ-এর প্রতিবেদকে জামাতে ইসলামীর সহকারী মহাসচিব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান যা বলেছেন তা থেকে এ বিষয়ে কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, 'ওই নির্বাচন বাংলাদেশের জামাতের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। যদিও আমাদের নেতা-কর্মীরা কিছুটা আশাহত হয়েছেন। তাছাড়া এখানে পাকিস্তানি নির্বাচন সম্পর্কে ইনফরমেশন গ্যাপ ছিল।' ইনফরমেশন গ্যাপের সঙ্গে আশাহতের ব্যাপারটা বোঝা গেল না।

গত দেড় দশকে বাংলাদেশে জামাতকে পুনর্বাসিত করেছেন জেনারেলরা, সাধারণ মানুষ নয় এবং সে কারণে এতদিন জামাত যা খুশি তা করতে পেরেছে। এখনো পারছে, কেননা সরকারি দল প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন জানাচ্ছে।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করলেই জামাত মুখ থুবড়ে পড়বে। বিএনপি এমপিদের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জামাতকে তাই নার্ভাস করে তুলেছে। সে কারণে ২২ অক্টোবর চট্টগ্রামে মতিউর রহমান নিজামী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন-'ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি পরিহার করলে কারো সাথেই শিবিরের সংঘাত হবে না, এ গ্যারান্টি দিতে পারি।' এর অর্থ, এতদিন যেসব সংঘাত হয়েছে তাতে শিবিরের ভূমিকা ছিল।

বাংলাদেশে জামাত বা নকল ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রবক্তাদের কথা মনে হলে কিছু দৃশ্য ভেসে ওঠে। এসব দৃশ্য মনোহর নয় মোটেই। তাদের কথা মনে হলেই ভেসে ওঠে, ছুরি হাতে একটি লোক ইতি-উতি শিকার খুঁজছে বা লোহার রড বা গজারির লাঠি হাতে অন্য

ধর্মাবলম্বীর উপাসনালয় ভাঙতে চলছে বা ফতোয়া দিয়ে কোনো নারীকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। এক্ষেত্রে একজন জামাতি, ফতোয়াদানকারী ইমাম বা 'ছাহাবা পরিষদ' একই কাতারের লোক এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে জামাতের সঙ্গে এদেরও এক কাতারে ফেলে দেখতে হবে। কারণ, ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবি জোরদার হয়ে উঠলে এর বিরুদ্ধে জামাতের সঙ্গে এরাও জোট বাঁধবে। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, বাবরি মসজিদ ভাঙার পরের দিন ঢাকা শহরে মন্দির ও হিন্দু মালিকানাধীন দোকানগুলোতে হামলা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল কিছু মাদরাসার ছাত্র। শুধু ঢাকায়ই নয়, সারাদেশেই এবং সবখানেই হামলাকারীরা ছিল একই রকম। বাংলাদেশের মাদরাসাগুলোতে কি এ ধরনের শিক্ষা দেয়া হয় যে, ছাত্ররা উপাসনালয় ভাঙবে এবং রাজনৈতিক দলের অফিস জ্বালাবে?

আসলে আমাদের জোরালোভাবে বলা উচিত, বাংলাদেশের মুসলমানত্ব ও ইসলাম রক্ষার একচেটিয়া ইজারা জামাতে ইসলামী, এসব মাদরাসার ছাত্র ও কিছু সাম্প্রদায়িক এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দেয়া হয়নি। মুসলমান আমরাও এবং ধর্মকর্ম আমরাও জানি। ধর্মের নামে অর্ধম, হানাহানি, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা এবং বিকৃতায়ন শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক রাজাকারদের ক্ষমা ঘোষণার পর; সামরিক শাসনজাত কারণে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদী ও প্রগতিবিরোধী সংগঠনের পুনরুজ্জীবন এবং আমাদের বড় বড় রাজনৈতিক দল ও নেতাদের দায়িত্বহীনতার কারণে।

মাদরাসায় যদি ধর্মের নামে এই শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে মাদরাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার করে সত্যিকারের ইসলাম শিক্ষার শিক্ষাক্রম চালু করা উচিত। যারা ইসলামকে মানবতার ধর্মের বিপরীতে হানাহানির ধর্ম হিসেবে তুলে ধরে, তারা ইসলামদ্রোহী, মুরতাদ, যুক্তি-তর্ক দিয়ে বা বোঝা মুরতাদী নয়।

ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি বেশ কিছুদিন ধরে জানিয়ে আসছে নির্মূল কমিটি, আওয়ামী লীগ এবং এখন বিএনপির সব এমপি। এর পক্ষে জনমতও গড়ে উঠছে। এ দাবি যত জোরদার হয়ে উঠবে সাম্প্রদায়িক শক্তির তত মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করবে এবং করছেও। যেমন, গত এক বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিবিরের হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে, আহমদীয়াদের দুটি মসজিদ পোড়ানো হয়েছে, পবিত্র কোরআন পোড়ানো হচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বাধাবার উসকানি দেয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগে, ছাহাবা পরিষদ তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে সমাবেশের ডাক দিয়েছে। আহমদীয়াদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি করা হচ্ছে। দৈনিক ইনকিলাব-এ দাবি করা হয়েছে, আহমদীয়া মসজিদে ডিশ অ্যান্টেনা বসিয়ে ধর্মবিরোধী কাজকর্ম চালানো হচ্ছে। আহমদীয়ারা বলছেন, ডিশ অ্যান্টেনার মাধ্যমে তারা লন্ডন থেকে তাদের নেতার খুতবা শোনেন মাত্র। প্রশ্ন হচ্ছে-যারা অনবরত ইসলামের কথা বলে, ইসলামের ধ্বজাধারী মনে করে, তারা কেন আরবীতে উটের দৌড়ে বাঙালি দুধের বাচ্চাকে ব্যবহারের কারণে বা পাকিস্তানের পতিতালয়ে বাঙালি নারী পাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে না? মানুষত আশরাফুল মখলুকাত। উপাসনালয়ের

চেয়েও বড়। কোরআন পুড়িয়ে বা রগকেটে কীভাবে তারা ইসলামের কথা বলে? প্রশ্ন আরো আছে, আরব, আফ্রিকা, এশিয়ার অন্যান্য মুসলমানপ্রধান দেশে বাবরি মসজিদ ভাঙার কারণে অন্য ধর্মাবলম্বীর উপাসনালয় ভাঙা হয়নি বা মানুষের ওপর হামলা হয়নি। কারণ, সেখানে সরকার এসব ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ প্রশ্রয় দেয়নি। শুধু তাই নয়, ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী শক্তিকে কেন অন্যান্য মুসলমান দেশে এখন দমন করা হচ্ছে? কারণ, ধর্মান্ধতা মানুষকে পিছিয়ে দেয়। বাঙালি মুসলমানদের এ-কথাগুলো ভেবে দেখা উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আরো একটি কথা বলা যায়। বাংলাদেশে, বাংলা ভাষায় কোরআনের এখন পর্যন্ত ভালো একটি সঠিক অনুবাদ বের হয়নি। যারা প্রকৃত ইসলামকে ভালোবাসেন তাঁদের এ কাজে এগিয়ে আসা উচিত। শিশু-কিশোরদের জন্যও প্রাঞ্জল ভাষায় কোরআনের একটি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহলে সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারবেন প্রকৃত ইসলাম ও জামাতের ইসলামের মধ্যে তফাৎ কী। ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য এটিও হতে পারে একটি কৌশল।

ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলেই ইসলামতত্ত্ব রক্ষা পায় না, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র কল্যাণ বয়ে আনে না। নেপালের কথা বিবেচনা করুন। পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। গত ৩০ বছর চলেছে সেখানে স্বৈরশাসন। ৮০ ভাগ মানুষ সেখানে বাস করে দারিদ্র্য সীমার নিচে। পশ্চিম এশিয়া তো ৮৫ ভাগ মুসলমান। কিন্তু সেখানকার শাসকদের স্বৈরশাসন, বিলাস অবিচারের কথা কি কারও অজানা? শুধু তাই নয়, মৌলবাদ এক সময়ে চরম সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয় এবং তা পথ করে দেয় ফ্যাসিবাদের।

নিজামী বলেছেন সেই সাংবাদিক সম্মেলনে, 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলেও ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারবে না.....। এজন্যই তারা বিএনপির কাঁধে ভর করে এ আইন করতে চাচ্ছেন। ধর্মপ্রাণ মানুষের এই দেশে তা খুবই কঠিন।' শুধু তাই নয়, দেশের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসের জন্য বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে তিনি যৌথভাবে দায়ী করেন।

তাঁর এই উক্তি বিশ্লেষণ করা যাক। আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসী বলার কারণ আছে। কারণ তারা জামাতবিরোধী। কিন্তু তাদের দোস্ত বিএনপি? হয় নিজামী মরিয়া হয়ে এখন হুমকি দিচ্ছেন বিএনপিকে, নয়তো বিএনপির ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে তিনি বিএনপির সন্ত্রাসী কার্যকলাপের গোপন কথা জানেন। প্রিয় দোস্তদের এ ধরনের অভিযোগ বিএনপি'র জন্য সুনাম হানিকর। এখন বিএনপিকে হয় জামাতের এই হুমকি মেনে নিতে হবে, নয় এ অপমানের উত্তর দিতে হবে। এর জবাব বিএনপি কিভাবে দেয় আমরা তা দেখতে চাই।

নিজামী বলেছেন, ধর্মপ্রাণ মানুষ এই নিষিদ্ধকরণ দাবি মেনে নেবে না। জামাত যদি মানুষের কাছাকাছি হত বা জামাতের ইসলাম যদি মানুষের পছন্দসই হত তাহলে বিএনপি-আওয়ামী লীগ নয়, জামাতই হচ্ছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। শুধু তাই নয়, পৌরসভা নির্বাচনে কমপক্ষে একটি আসন হলেও তারা পেত। নিজামী আরো বলেছেন, আওয়ামী লীগ ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারবে না। তার থেকে এক পা এগিয়ে কামারুজ্জামান বলেছেন, 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কোনো বাপের বেটা নিষিদ্ধ করতে

পারবে না। বিএনপি-আওয়ামী লীগও বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার মুখে নিয়ে নির্বাচনে জিতেছে।'

বিসমিল্লাহ মুখে নেয়ার সঙ্গে নিষিদ্ধকরণের কী সম্পর্ক? জামাতও তো বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার মুখে নিয়ে নির্বাচন করেছিল। তাহলে তারা জেতেনি কেন? তাছাড়া, তারা বোধহয় ভুলে গেছেন যে, ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগই ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিল। তবুও আমরা মনে করি, নিজামীদের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া উচিত যে, ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের বিল সংসদে পেশ করবে। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের বক্তব্যের জন্য আমরা অপেক্ষা করব।

সবশেষে, আমরা শুধু একটি কথা বলতে চাই, এ ধরনের শক্তিসমূহের সঙ্গে যে কোনো ধরনের আপস আমাদের জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

যুদ্ধক্ষেত্রে চুপ করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়

অনেকে মনে করেন মাটিই সব, মানুষ নয়। দেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে কিছু মাটি। যারা এটি মনে করেন, তাদের কাছে মানুষ তেমন বিষয় নয়, মাটি থাকলেই হল। যেমন, ১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর জেনারেলরা বলেছিলেন- মানুষ চাই না, মাটি চাই। গোলাম আযমও নাকি একবার বলেছিলেন , দেশ কী? যে দেশের মাটিতে থাকি সেটিই দেশ। এটি অবিকল উদ্ধৃতি নয়।

গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া জনমত মেরুকরণে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ বিরোধী, পাকিস্তানপন্থী ও জামাতিরা বিলক্ষণ খুশি হয়েছে। তাদের কাছে মনে হয়েছে এটি তাদের নৈতিক জয়। বাকিরা যে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। হাইকোর্ট যখন এ বিষয়ে রায় দিয়েছিল তখনই একটি ধারণা জন্মেছিল যে, আইনে ফাঁক আছে এবং সে ফাঁক দিয়ে গোলাম আযম গলে যাবেন। আর আমাদের দেশে যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত খুব একটি জরুরি তা হয়তো অনেকের মনে হয় না। সুপ্রিমকোর্ট রায় দিয়েছে। আমরা মেনে নিয়েছি। সে বিষয়ে মন্তব্য করছি না। এটর্নি জেনারেল বলেছিলেন, 'গোলাম আযম যিনি রাজাকার এবং আলবদর বাহিনী গঠন করে এদেশের মুক্তিযুদ্ধে নরহত্যা, ধর্ষণের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে আজ নাগরিকত্ব পেলেন।' আমরাও তাই মনে করি।

প্রেস কমিশনের বিচারপতি সুলতানুজ্জামান বলেছেন, আদালতের রায় নিয়ে যে নানা কথা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। এতে আদালতের সম্মানহানি হয়। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেন যিনি সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা এবং মুজিব আমলে আইনমন্ত্রী ছিলেন, বলেছেন- 'ঘাতক গোলাম আযম স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারে না। স্বাধীনতার শত্রু ও গণহত্যার নায়ক নরপিশাচ গোলাম আযমের বিষয়টি এদেশের কোটি জনতার কাছে মীমাংসিত সত্য, আদালতের রায় জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে যে কেউ এটা ভাবতে পারে। এরকম চিন্তা করার অধিকার রয়েছে।....আদালত সামরিক শাসনকে বৈধ বলে রায় দিয়েছে। কিন্তু জনগণ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। সফলভাবে সামরিক শাসন হটিয়েছে।'

এ মামলায় নিজ থেকে ড. কামাল হোসেন বা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম উপস্থিত হয়ে সে সময়ের ও আইন প্রণয়নের পটভূমি বলার অবকাশ ছিল কিনা জানি না। তাদের ব্যাখ্যা হয়তো এ মামলায় নতুন মাত্রা যোগ করত।

বিচারকদের রায় নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার নিশ্চয় মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত।

আইন মানুষের তৈরি, মানুষ আইনের তৈরি নয় এবং আইনে ত্রুটিও থাকতে পারে। রায় যিনি দেন তিনিও মানুষ। এ কারণে, সামরিক শাসনামলে, সামরিক শাসন যে অবৈধ এ কথা বলার সাহস তাদের থাকে না, কিন্তু পরে তা নিয়ে সোচ্চার হন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, পাকিস্তানের প্রখ্যাত বিচারপতি মুনির তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছিলেন- তমিজউদ্দিন খানের মামলায় সরকার পক্ষে যে রায় হয়েছিল সেটি খানিকটা প্রভাবিত। স্ট্যানলি ওলপোর্ট, ভুট্টোর ওপর বই লিখতে গিয়ে ভুট্টোর বিচারকদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। বিচারকরা সবাই ছিলেন পাঞ্জাবি এবং সবাই ভুট্টোকে প্রথমেই সিন্ধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রধান বিচারপতি মিয়া তোফায়েল ছিলেন জামাতপন্থী; ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল তার ভুট্টোর প্রতি। এ সমস্ত রায় নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। আসলে দেশকে যদি নিছক মাটি হিসেবে কল্পনা করি তাহলে চিন্তার পরিপ্রেক্ষিত এমনই হবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন, দেশ মানে মাটি ও মানুষ, তখন নিছক আইন নয়, সামগ্রিকভাবে দেশটি উঠে আসে। ১৯৭১ সালের পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে গোলাম আযমের ব্যাপারে কোনো মীমাংসা হতে পারে না। এটর্নি জেনারেল তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, 'গোলাম আযমকে বিচার করতে হবে নিছক আইন প্রয়োগের কথা ভেবে নয়, ১৯৭১ সালের পরিস্থিতির কথা ভেবে।' কয়েকদিন আগে গ্রিস তাদের প্রাক্তন রাজা কনস্টানটাইনের নাগরিকত্ব বাতিল করেছে। কারণ, তাদের অভিযোগ, প্রাক্তন রাজা প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রের পক্ষে উস্কেছিলেন কয়েকদিন আগে। রাজা বলেছেন, বংশানুক্রমে তিনি গ্রিক নাগরিক। এটি বাতিল করা যায় না। কিন্তু তা বাতিল করা হয়েছে এবং তার পক্ষে কেউ কোনো কথা বলেনি।

আমরা মনে করি গোলাম আযম নাগরিকত্ব পাওয়ায় পরিস্থিতির কোনো বদল হয়নি। বরং ভালো হয়েছে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধ-অপরাধী হিসেবে তার বিচার করাটা বরং সহজ। বিদেশী নাগরিক হলে তাতে জটিলতা হত। আর জনদাবি তো গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নয়, গণদাবি হল তার বিচার। দুটি বিষয় পুরোপুরি আলাদা। পত্রপত্রিকায় এখনো যেসব প্রতিক্রিয়া নজরে পড়ছে তাতেও এমতই প্রতিফলিত হয়েছে। রাজনীতিবিদরা যথার্থই বলেছেন, 'কোনো আদালতের রায়ে বাংলাদেশ হয়নি।'

গোলাম আযম যে দেশকে নিছক মাটি মনে করেন তা বোঝা যায় বিবিসির বাংলা বিভাগের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। তিনি বলেছেন, বাংলাটা ঠিক নয়, ইংরেজিতেই বলবেন। বাঙালি সংস্কৃতি, মানুষের প্রতি মনোভাব এতেই প্রতিফলিত। অথচ, জামাত দেয়ালে শ্লোগান লিখে- ভাষা সৈনিক গোলাম আযম। ভণ্ডামি আর কাকে বলে!

আওয়ামী লীগের চিফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, 'গোলাম আযম নাগরিক কি নাগরিক না- এটা আমাদের বক্তব্য নয়। যুদ্ধঅপরাধী হিসেবে তার বিচার করতে হবে। সুপ্রিমকোর্টের রায়ে একাত্তরে গণহত্যা, নারী ধর্ষণের অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।'

বিএনপির মেজর আখতারুজ্জামান (অব). বলেছেন, 'স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে

প্রতিহত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

এটাই মূল বিষয়। এবং বিষয়টি আরো সামনে চলে এসেছে ধর্মব্যবসায়ীদের 'কোরআনের ইজ্জত' রক্ষার জন্য হরতাল আহবানে। দৈনিক ইনকিলাব এ বিষয়ে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

বিষয়টি কাকতালীয় কোনো ঘটনা নয়। পূর্বপরিকল্পিত। আর এতে ইন্ধন যোগাতে সাহায্য করেছেন তসলিমা নাসরিন। লেখক হিসেবে যদি তাঁর দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা থাকত তাহলে যত্রতত্র যা-তা তিনি বলে বেড়াতেন না। বিশেষ করে, আরবি না জেনে, ইসলামধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা মন্তব্য অর্বাচীনরাই করে। তসলিমাকে পুঁজি করে ধর্মব্যবসায়ীরা পরিকল্পিতভাবে এগিয়েছেন। বিভিন্ন কারণে তাদের ইস্যু দরকার। ইস্যু তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তারা তো ইসলামকে অশান্তিময় ধর্ম করে তুলছে। ইসলাম তো শান্তি আর যুক্তির ধর্ম। আর ইসলামের একটি মূল বিশ্বাস- বিচারের মালিক আল্লাহ, মানুষ নয়। তাহলে দৈনিক ইনকিলাব পরিচালিত সহিংস এই 'মুরতাদ বিরোধী' আন্দোলনে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে সহিংস সব মন্তব্য তুলে ধরেছেন, তসলিমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন- এই যে বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নেওয়া-এটি আবার আমাদের অনুভূতিতে আঘাত হানছে। কারণ, আমরা তো ইসলামকে ন্যায় ও শান্তির ধর্ম বলি। কোরআন থেকে বিতর্কের উদ্দেশ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু যারা ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা করেছেন, তারা জানেন কোরানকে সামগ্রিকভাবে নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হয়। এক্ষেত্রে তসলিমা আর ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি মৌলিক মিল আছে। সামগ্রিকভাবে কোরআনকে তারা দেখেননি। প্রশ্ন আরো আছে। ইসলামের মওদুদী ব্যাখ্যা কি বাংলাদেশের সবাই মানেন? আলেমরা তো অনেকে বলেছেন, ওই ব্যাখ্যা ইসলামপন্থী নয়। ইনকিলাবও মওদুদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে খবরকে প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু, এখন দুপক্ষই এক। কারণ, তারা একটি ইস্যু নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে চায়। এভাবে ইনকিলাব, জামাত, ফতোয়াবাজ, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা একত্রিত হয়েছে এবং বিষয়টিকে রাজনৈতিক করে তুলেছে।

এ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতিও। ইনকিলাব ও তার সমর্থকদের আক্রমণের লক্ষ্য তিনটি- প্রগতিশীল মানুষ বা পত্রপত্রিকা, যেমন আহমদ শরীফ, সুফিয়া কামাল বা দৈনিক জনকণ্ঠ। এনজিও যেমন, ব্র্যাক। তাদের অর্থের পথে এরা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এনজিওরা (দান হিসেবে) কর রেয়াত হিসেবে ক্যাপিটাল গুডস পান। যেমন, প্রেস। এ প্রেস দিয়ে যখন ব্যবসা করা হয় তখন অন্যান্য প্রেস প্রতিযোগিতায় হটে যেতে বাধ্য হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এটি ঠিক নয়। ইনকিলাব বা অন্যান্য যাদের প্রেস আছে এবং মার খাচ্ছে তারা এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নয়। কারণ, অন্যদের ব্যাংক ঋণ নিয়ে প্রেস বা মুদ্রণব্যবসা করতে হয়। এছাড়া এনজিওর তৃণমূল পর্যায়ে নারীকে আধিপত্য মুক্ত হতে সাহায্যে করছে, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছে। এই সচেতনতা ও শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা মোটেই যুগোপযোগী

নয়। এবং হিসাব নিলে দেখা যাবে একটি প্রাথমিক স্কুল একটি মাদ্রাসা চালানোর গড় খরচ বেশি। মাদ্রাসার ছাত্রও কমে যাচ্ছে। ধর্মান্ধ যুক্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করেন এটি তাদের পছন্দ হওয়ার কথা নয়। ফলে, ইনকিলাবের পক্ষে এদের ও এনজিওদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা সহজ হয়েছে। তাদের ডাকা হরতাল উপলক্ষে সাপুড়েদের মিছিল বেশ চমক সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের ঘটনা প্রথম। গ্রামাঞ্চলে জরিবুটির চিকিৎসা করে যারা উপার্জন করছিল, এনজিওদের সেবামূলক কার্যক্রমের কারণে সেগুলো উঠে যাচ্ছে। জনকণ্ঠ এর বিরুদ্ধে বিপুল জনমত সৃষ্টি করেছে। ফলে, জরিবুটিঅলারা কেন মিছিল করেছে তা বোধগম্য। ইনকিলাব-জনকণ্ঠের দ্বন্দ্বের আরেকটি কারণ সার্কুলেশন। জনকণ্ঠ এখন সার্কুলেশনের দিক থেকে দ্বিতীয়। স্বাভাবিকভাবেই ইনকিলাবের তা পছন্দ নয়। আর জামাত এদের সঙ্গে মিলে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। কারণ প্রগতিশীল লোক, সংগঠন তাদের প্রধান শত্রু।

ইনকিলাব ও ধর্মব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ বিষয়টিকে রাজনৈতিক করে তাদের পক্ষে জনমত সংগঠন ও ক্ষমতা সংহত করছে। এভাবে তারা ক্ষমতার দিকে এগোতে চাচ্ছে। এবং এ উপলক্ষে আগামী ৩০ জুন হরতাল আহ্বান করা হয়েছে। গত দুসপ্তাহ ধরে এ পরিপ্রেক্ষিতে মিটিং মিছিল চলছে।

অন্য কোনো সময় হরতাল ডাকা হলে খোদ প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রতিমন্ত্রী সবাই হরতালকে বিনিয়োগবিরোধী বলে আখ্যা দিতে থাকেন। যেন একদিনের হরতালে অর্থনীতি বিনষ্ট হয়ে যাবে; হরতালের সঙ্গে বিনিয়োগের সম্পর্ক নেই। এখন প্রশ্ন, ইনকিলাব ও অন্যদের হরতাল তাহলে বিনিয়োগবিরোধী নয়? বিনিয়োগবিরোধী হলে তো সরকার প্রতিক্রিয়া জানাত। চেম্বার অফ কর্মাস প্রতিনিধিরাও এ বিষয়ে একই পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু এবার তারাও চুপ। তাহলে চেম্বারের প্রতিনিধিরাও মনে করেন যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কেউ হরতাল ডাকলে বিনিয়োগবিরোধী। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কেউ ডাকলে তা বিনিয়োগবিরোধী নয়। এদের উদ্দেশ্য করেই সম্প্রতি জাপানি বিনিয়োগকারীরা বলেছিলেন, নিজের দেশে যদি স্বদেশীরা বিনিয়োগ না করে তাহলে তারা কীভাবে আশা করবে যে, বিদেশীরা বিনিয়োগ করবে?

সরকারের নিশ্চুপ থাকার অনেক কারণ আছে। বিরোধীদল তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে। এখন ফতোয়াবাজরা যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু ও বিরোধীদের পার্লামেন্ট বর্জন ইস্যু থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেয় তাহলে মন্দ কী? এটি কি বিশ্বাস্য যে, বাংলাদেশে যে কেউ, যে কাউকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিতে পারে এবং সরকার চুপ থাকে? এটি কীভাবে সম্ভব হল যে, মহিলা বিষয়ে ইউএনডিপি রিপোর্ট সম্পর্কে মহিলা মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য ও ফতোয়াবাজদের মন্তব্যে তেমন কোনো তফাৎ নেই? আরো লক্ষণীয়, ইনকিলাব সবচেয়ে বেশি সরকারি বিজ্ঞাপন পায়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য। মুজিব আমলে দাউদ হায়দারের দায়িত্বহীন এক কবিতার জন্য যখন ধর্মব্যবসায়ীরা সুযোগ পেয়েছিল এক হওয়ার, সরকার তখনই বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। ফলে ধর্মব্যবসায়ীরা একত্রিত হওয়ার সুযোগ আর পায়নি। বর্তমান সরকার তা করেনি

এবং করবেও না। কারণ, তারা চায় এ ধরনের ইস্যুগুলো জীবন্ত থাকুক। এতে তাৎক্ষণিকভাবে হয়তো তাদের কিছুটা লাভ হচ্ছে কিন্তু তারাই এ আগুনে জ্বলবে। কারণ পরিস্থিতি ক্রমশ সংঘাতের দিকে যাচ্ছে এবং একবার সংঘাত শুরু হলে তা বিপদজনক হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের মনে রাখা উচিত, মালয়েশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া, যেসব মুসলিম-প্রধান দেশে উন্নতি হয়েছে, সেসব দেশ সরকার সবসময় ধর্মব্যসায়ীদের দমন করেছেন। একটি বিষয় শুধু বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ কেন পিছু হটছে। আমরা তো তাঁকে নির্বাচিত করেছিলাম দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সচেতন ও সাধারণ মানুষের মনে তাই প্রশ্ন জেগেছে, এই যে এতদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফতোয়াবাজরা হরতাল ডেকেছে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ তা প্রতিরোধ করছে না কেন? রাজনৈতিক দলগুলো তেমন সরব নয় কেন?

১৯৪৮ সাল থেকে গত গণআন্দোলন পর্যন্ত যা দেখা গেছে তা হল- গণবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ সবসময় প্রথমে করে সংস্কৃতিকর্মী ও ছাত্ররা। তা তাদের সংখ্যা যত মুষ্টিমেয়ই হোক না কেন। কারণ তারা ক্ষমতাপ্রত্যাশী নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর লড়াই ক্ষমতার জন্য, সুতরাং তাদের অনেক অঙ্ক কষতে হয়। যদি তাতে ভোটের প্রশ্ন জড়িত থাকে তাহলে তো কথাই নেই।

প্রশ্নটি উঠেছে মূলত আওয়ামী লীগকে নিয়ে। বংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক সবচেয়ে বড় দল আওয়ামী লীগ। সিভিল সমাজ গঠনের যারা প্রধান ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। আর কেউ না আসুক, তারা কেন এ ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতিরোধ এগিয়ে আসছে না বা সৈয়দ শামসুল হকের ভাষায় দৃশ্যমান কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না? তারা কি কৌশলগত কারণে জামাত ও জাতীয় পার্টিকে হাতে রাখতে চায়? যদি চায়ই তাহলে বিএনপির আর দোষ কী? এককথায় আওয়ামী লীগের ভূমিকা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এতে প্রগতিবাদীরা হতাশ বোধ করছেন, হতাশ বোধ করছেন আওয়ামী লীগ কর্মীরাও।

এসব প্রশ্নের উত্তর শেখ হাসিনাই দিতে পারবেন। শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছা আমার পক্ষে সহজ কাজ নয়। তবুও ভাগ্যক্রমে একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা এবং সাহস সঞ্চয় করে, নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে দুএকটি প্রশ্ন করতে পারি কিনা? সহাস্যে তিনি বললেন, অবশ্যই।

আমি বললাম, দেশের পরিস্থিতি আপনি অবগত আছেন। ধর্মব্যবসায়ীদের উত্থান কি আমাদের জন্য শুভ? শোনা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ জামাত ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধেছে। এবং জামাতকে যেহেতু আওয়ামী লীগ চটাতে চায় না সেহেতু হরতালের বিরুদ্ধে কিছু বলছে না।

শেখ হাসিনা ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, সবসময় আপনারা আমার সমালোচনা করেন। হরতাল প্রতিরোধের জন্য যেসব কমিটি হয়েছে তাতে কি আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি নেই? (কথাটা অবশ্য ঠিক। ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন মায়া ঘোষণা করেছেন, হরতালের দিন প্রতিরোধ করবেন এবং সবাই যাতে

তাতে যোগ দেন)। আমি তো কয়েকদিন আগেও বলেছি-'সময় এসেছে স্বাধীনতা সপক্ষের সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। তা না হলে মুক্তিযুদ্ধ করাটাই অন্যায় হবে। গোলাম আযম সম্পর্কেও আমি নির্দিষ্ট বক্তব্য দিয়েছি। তাহলে আঁতাত করলাম কোথায়?'

তিনি আরো ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'নির্বাচনের আগে বেগম জিয়া গোলাম আযমের সঙ্গে সিট ভাগাভাগি করে পার্লামেন্টে গেছেন, খবরের কাগজে এ বিষয়ে রিপোর্টও উঠেছিল। তখন তো আপনারা কিছু বলেননি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বলে তো তারাও দাবি করে।'

আমি বললাম, 'বিএনপিকে মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার পক্ষের শক্তি বলে মনে করলে তো আপনাকে আর এই প্রশ্ন করতাম না।'

তিনি বলেন, 'আপনাদের কী মনে হয়, জেনারেল জিয়া এদের পুনর্বাসন করেছেন, সংবিধান সংশোধন করে তাদের রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছেন। একই ধারা অনুসরণ করেছে বেগম জিয়া। ফলে, দেশ সংঘাতের দিকে এগুচ্ছে।'

'পার্লামেন্টে জামাত, জাতীয় পার্টির সদস্যরা তো ভোটে নির্বাচিত হয়েছে। সংসদে কি জনপ্রতিনিধি হয়ে আমরা বসিনি? পার্লামেন্টে যদি জামাত না থাকত, জাতীয় পার্টি না থাকত তাহলে না হয় হত। আমি বিরোধীদলীয় নেত্রী। পার্লামেন্টের প্র্যাকটিস তো আমাকে মানতে হবে। ফলে, এ কারণে কিছু আমাদের গলাঃধকরণ করতে হচ্ছে। পার্লামেন্টের প্র্যাকটিস অস্বীকার করতে পারছি না। কিন্তু আমাদের যে নীতি আদর্শ, যে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি তাতে আমরা অটল। এ প্রশ্নে বা মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই। আমি কখনই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সমর্থন করি না এবং তা জাতির জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনে না। জিয়া এটার গোড়াপত্তন করে স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে আসার ফলে এ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস এক জিনিস। রাজপথের রাজনীতি হচ্ছে বাস্তবতা। আমাদের নীতি আদর্শ পরিষ্কার।'

অনেকে বলেছেন, জাতীয় পার্টি যাদের বিরুদ্ধে এত রক্তক্ষয় করলেন এখন তাদের সঙ্গে আবার দহরম মহরম চলছে?

'এ বিষয়টিতে আমি সবাইকে দৃষ্টি দিতে বলব' বললেন শেখ হাসিনা-'গত নির্বাচনে অনেক সিটে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টির কনটেস্ট হয়েছে, বিএনপির সঙ্গে জাতীয় পার্টির নয়। জাতীয় পার্টির অনেককে নমিনেশন দিয়ে বিএনপি তাদের পুনর্বাসিত করেছে। রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে। আমরা তা করিনি। তবুও বলবেন জাতীয় পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধেছি? জাতীয় পার্টির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক হওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি এবং আমরা তা করিনি। বরং বিএনপি যাদের সঙ্গে আমরা জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি তারাই আজ আমাদের ওপর হামলা করছে, নির্বাচনী জয় ছিনিয়ে নিচ্ছে। সন্ত্রাস দমন মামলায় হয়রানি করছে। বিএনপির হত্যা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আজ বাধ্য করেছে আমাদের আন্দোলনে যেতে। তাই কারো আদর্শের সঙ্গে আমাদের মিল না-থাকা সত্ত্বেও ভোটের অধিকার রক্ষা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য একত্রে

বসতে বাধ্য হয়েছি। নিশ্চয় আরো লক্ষ্য করেছেন বিএনপি তার বক্তব্য স্বৈরাচারকে যতটা না আক্রমণ করে, আওয়ামী লীগকে করে তার চেয়ে বেশি। আগে তো আমরা বিএনপির সঙ্গেই ছিলাম। এখন বাধ্য হয়েছি অন্যদের সঙ্গে বসতে। এর জন্য বিএনপি দায়ী।'

'কিন্তু' বললাম আমি, 'আপনিও তো বিএনপিকে এখন যতটা আক্রমণ করছেন, স্বৈরাচারকে ততটা করছেন না।'

'কারণ', বললেন শেখ হাসিনা, 'স্বৈরাচারকে যে-যে কারণে আক্রমণ করতাম বিএনপি এখন তাই করছে। এবং কোনো কোনো বিষয়ে এরশাদকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নির্বাচিত কোনো সরকার যদি স্বৈরাচারী রূপ পরিগ্রহ করে তাহলে তা ভয়ঙ্কর হয়। গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে সত্যিকার চেষ্টা না করে যে বিকৃত মানসিকতা দেখাচ্ছে তাতে গণতন্ত্রের ওপরই অনেকের আস্থা চলে যাচ্ছে।'

হরতাল যে কেউ ডাকলেই হয়। এবারও হবে। ইনকিলাবে যতবার জনকণ্ঠ পোড়াবার কথা উদ্ধৃত হয়েছে, ইনকিলাবের বিরুদ্ধে কোথাও তা হয়নি। প্রগতিবাদীরা কারো ফাঁসিই চায়নি। কিন্তু যদি আমরা মনে করি- শুধু মাটি নয়, মানুষও এবং যে কারণে দেশের অন্য নাম মায়াবতী, তাহলে এই হরতাল প্রতিরোধের হরতাল হিসেবে পালন করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে চুপ করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

একমাত্র আওয়ামী লীগের পক্ষেই সম্ভব

ধর্মব্যবসায়ীরা আসলে কী চায় তা বোঝা গেল অবশেষে। না, 'অবশেষে' শব্দটি ব্যবহার করলে একটু ভুল হবে। অনেকদিন ধরেই তাদের মৌল মতলব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু এত স্পষ্ট ভাষায় তারা এতদিন তা ব্যক্ত করেনি। করল গত ২৯ জুলাই, মানিক মিয়া এভিনিউতে।

প্রথমে তারা কথাবার্তা শুরু করেছিল ড. আহমদ শরীফ, জাহানারা ইমাম, শামসুর রাহমান, তসলিমা নাসরিন, ব্লাসফেমি আইন ইত্যাদি নিয়ে। তাদের সমর্থন দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে জামায়াতে ইসলামীও একই কথা বলে আসছিল। ২৯ জুন তাদের মধ্যে মিল-মহব্বত পাকা হয়ে গেল। মাঝখানে ধর্মব্যবসায়ীদের জোট সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ ও জামায়াতের মধ্যে যে খানিকটা 'ঝগড়া' হয়েছিল, বোঝা গেল তা ছিল প্রেমিক-প্রেমিকার অভিমান। এখন থেকে জামায়াতে ইসলাম ও ধর্মব্যবসায়ীদের জোটকে এক করে দেখাই শ্রেয়। জামায়াত অবশ্য ব্যবসায়ী হিসেবে পুরনো। গত ২৯ জুলাই, মানিক মিয়া এভিনিউতে জামায়াতের প্রধান ফ্রন্ট সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ থেকে কিছু ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছে। এ ঘোষণা শোনাবার জন্য বাস ট্রাকে করে মাদ্রাসার ছাত্র ও পীরের অন্ধ মুরিদদের নিয়ে আসা হয়েছিল। যার নাম দেয়া হয়েছে লং মার্চ। এ সম্মেলন প্রমাণ করেছে, এক. ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাতে পুঁজির পরিমাণ কম নয় এবং কেউ -না কেউ এই পুঁজি অকাতরে যোগাচ্ছে। দুই. এরা গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এবং এখন সংঘাত শুধু শহরাঞ্চল নয়, গ্রামাঞ্চলেও শুরু হবে। অচিরেই তা ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে।

২৯ জুলাইর সমাবেশে বায়তুল মোকাররমের খতিব ওবায়দুল হক বলেছেন, 'পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একদল লোক গাদ্দারি করে পাকিস্তান ভেঙেছিল। এখন আবার তারা গাদ্দারি শুরু করেছে দেশকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য।' (৩০ জুলাই, ভোরের কাগজ)।

যারা পাকিস্তান ভাঙার জন্য ডাক দিয়েছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন-তাদের মধ্যে আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, জেনারেল ওসমানী প্রমুখ। এমনকি মওলানা ভাসানীও। আর ছিলেন অগণিত মুক্তিযোদ্ধা। তারা যে সব দল করতেন বা তাদের অনুসারীরা এখনো অন্য কেউ তাদের নেতা বা দলের মৃদু সমালোচনা করলেও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন-আমরা এখন দেখতে চাই, প্রকাশ্য জনসভায় 'গাদ্দার' বলার পর তারা কী বলেন বা দল কী করে? শুনতে চাই সেসব মুক্তিযোদ্ধার

জবাবও যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য জীবন বাজি রেখেছিলেন। আমাদের আরো মনে রাখা দরকার, জনাব হক সুবিশাল মঞ্চে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খেতে খেতে (মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও পীরের মুরিদরা তখন বসেছিল খরতাপের নিচে পীচঢালা রাস্তায়) যে, জায়গায় দাঁড়িয়ে এ-কথা বলেছেন সে-জায়গাটিও এমন একজনের নামে রাখা হয়েছে, বাংলাদেশ সৃষ্টিতে যাঁর অবদান কম নয়। সমাবেশ চলাকালীন ধর্মব্যবসায়ীরা সংসদ ভবনে আক্রমণ চালায়। আমাদের আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই সংসদের জন্য এক দশক ছাত্র-জনতা নিরন্তর লড়াই করেছেন, শহীদ হয়েছেন।

একই সমাবেশে চরমোনাইর পীর বলেন, 'যারা মৌলবাদী নয় তারা জারজ মুসলমান।....এ সংবিধান মানা যায় না'। (৩০ জুলাই, ভোরের কাগজ)। চরমোনাইর পীরের কাছে কি সবিনয়ে প্রশ্ন করা যায়- বাংলাদেশে, তার ভাষায় এত কোটি কোটি (কেন না, অধিকাংশই তাদের অনুসারী নয়) জারজ মুসলমান পয়দা হল কীভাবে?

যেসব পীর অশ্লীল কথা বলতে ভালোবাসেন তারা প্রকৃত মুসলমান কি না তা বিবেচনার সময় এসেছে। যারা মুক্তিযোদ্ধাদের গাদ্দার বলে ও সংবিধানকে অস্বীকার করে তাদের দেশদ্রোহী কেন বলা যাবে না তাও বিবেচনার সময় এসেছে। বিবেচনায় এসেছে এসব রাষ্ট্রদ্রোহী কথাবার্তা আর প্রকাশ্যে বলতে দেওয়া হবে কিনা তাও। আন্দোলন করতে গিয়ে শুধু পুলিশ ও ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে মার খাব ও গাড়ি ভাঙব, না সক্রিয়ভাবে তাদের প্রতিরোধ করা জরুরি- তাও ভাবার সময় এসেছে। বিবেচনা করার সময় এসেছে অশ্লীল কথাবার্তা বলায় দক্ষ পীর বা রাষ্ট্রবিরোধী মন্তব্য যিনি করেন তার পিছে নামাজ পড়া জায়েজ কি না। কারণ, আমরা এতদিন জেনে এসেছি, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। নিজেদের মুরোদ থাকলে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম না বা করার হয়তো দরকারও হত না। ১৯৭১ সালেও যারা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন তাদের কাউকে কিছু বলে দিতে হয়নি। নিজেরা যা কর্তব্য ভেবেছিলেন তাই করেছিলেন এবং স্মরণ করা-বাঞ্ছনীয় যে, এ জোটের নেতৃবর্গ, যেমন শর্ষিনার পীর বা আনোয়ার জাহিদ, ঘাতকদের পক্ষে ছিলেন। অন্য যারা বক্তৃতা দিয়েছেন তাদের পরিচয়ও অজানা নয়।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশে সরকার গঠন করেছে যে দল সেই বিএনপি এদের পুনর্বাসিত করে সযত্নে লালন করেছে বিরোধীদের বিরুদ্ধে, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে আন্দোলন শুরু হয়েছে তাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য। এখন বিএনপি তাদের ব্যবহার করছে। অনেকে বলতে পারেন জামায়াত ও জাতীয় পার্টিও বিরোধীদল। আওয়ামীলীগও তাই বলছে। তাত্ত্বিকভাবে তা ঠিক হলেও বাস্তবে তা নয়। এবং বাংলাদেশে তত্ত্ব ও বাস্তবের দূরত্ব অনেক। বামপন্থীরাই এর প্রমাণ।

জামায়াতও আজকাল একই ধরনের হুমকি দিচ্ছে খোলা ভাষায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আলবদর বাহিনীর নেতা কামরুজ্জামান কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছেন, 'সত্তরের নেয়া সিদ্ধান্ত চুরানব্বই সালে পাল্টে দিলেও বলার কিছু থাকবে না।' তাহলে

কি পাকিস্তান আসন্ন প্রায়? আশঙ্কা করছি ১৪ আগষ্ট হয়তো এসব মহল থেকে এসব বিষয়ে আরো স্পষ্ট ঘোষণা আসবে। তবে, মতিউর রহমান নিজামীকে এতদিন খুনি আলবদরদের নেতা হিসেবে জানতাম, কিন্তু এখন জানলাম তিনি সত্য বলতেও নারাজ। তিনি বলেছেন, গোলাম আযমের জনসভা উপলক্ষে নিহত পাঁচজনই জামায়াতের কর্মী (জনকণ্ঠ)। সত্যি ঘটনা কী তা দেশবাসীর অজানা নয়। এরা যখন আবার ইসলাম নিয়ে কথা বলে তখন ধর্মব্যবসায়ী বা মোনাফেক ছাড়া তাদের আর কী অভিধা দেয়া যায়? শুধু তাই নয়, খ্রিস্টানদের ব্ল্যাসফেমি আইন নিয়েও তারা মাতম করছে। জানি না খোদা তাদের কবে হেদায়েত করবেন।

গোলাম আযমকে নিয়ে এরকম গোলমাল হবে সবাই জানত। তিনিই একমাত্র রাজনৈতিক নেতা যার অন্য নাম ঘাতক, যুদ্ধাপরাধী। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি রাস্তায় নামলে তার ওপর সাধারণ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। তিনিই একমাত্র নেতা যাকে সবসময় সশস্ত্র জামায়াতি ক্যাডার ও সশস্ত্র পুলিশ দেহরক্ষী হিসেবে ঘিরে থাকে। এবং তিনি যেখানেই যান, সেখানেই রক্তপাত হয়। ১৯৭১ সাল থেকে এ প্রক্রিয়ার শুরু। গোলাম আযম আর ভ্যাম্পায়ারে তফাৎ কী তা নির্ণয় করা মুশকিল।

চট্টগ্রামে তাকে নিয়ে কী ঘটনা ঘটেছে তা সবার জানা। সুতরাং এর পনুরাবৃত্তি করব না। সেখানে তিনি কিন্তু এবার সত্য একটি স্বীকারোক্তি করেছেন, 'বিএনপি সরকারের সঙ্গে আমাদের তেমন কোন বিরোধ নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি একমাত্র বিরোধ।.....সরকার, বিরোধী দল পুলিশবাহিনী সহযোগিতা না করলে আজ আমি এখানে আসতে পারতাম না।'

সরকার অথবা বিএনপি যে তাদের সমর্থক এবং এ দুটি দলের নামও যে অনেক ক্ষেত্রে সমার্থক তা কে না জানে। চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ বা বিরোধীদল যে নিষ্ক্রিয় তাও অজানা নয়। আর বর্তমান পুলিশবাহিনী ও জামায়াতি সশস্ত্র ক্যাডারদের মধ্যে পার্থক্য যে শুধু পোশাকের তাও আর অজানা নয়। এখানে আরো উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে আওয়ামী লীগের মিছিলে পুলিশ একাত্তরের মতো গণহত্যা করেছিল, তখন যে পুলিশ কমিশনার ছিলেন, তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর অব., খালেদা জিয়া তাকে প্রমোশন দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। বর্তমানে যার আমলে গো. আযমকে রক্ষা করতে গিয়ে যে হত্যাকাণ্ড চালানো হল, তিনিও সামরিক বাহিনীর অব.। এবং ঘটনা কাকতালীয় না মনে করলেও আশা করা যায় তিনিও শিগগিরই প্রমোশন পাবেন।

চট্টগ্রামের ঘটনা এবং পরবর্তীকালে ২৯ জুলাইর ঘটনায় একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠছে, রাজনৈতিক দলসমূহের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে ঘাতক জামায়াত ও ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের সংহত করে শক্তি প্রদর্শন করছে। বৃহৎ দুটি দল হয়তো ভাবছে, এ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা তাদের ক্ষমতায় থাকতে অথবা আসতে হয়তো সহায়তা করবে। তারা তেমন ভাবতেই পারেন। মুসলমান হলেই ধর্মব্যবসায়ী বা জামায়াতিদের অনুসরণ করবে বা ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বললে ভোট ব্যাংকে টান পড়বে-এটি স্বচ্ছ ধারণা এমন বলা যায় না। রাজনীতির মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন

বিএনপিকে খতম করো অথবা আওয়ামী লীগকে খতম করো। যেন জামায়াত, জাতীয় পার্টি বা ধর্মব্যবসায়ীরা তাদের থেকে উত্তম। কিন্তু এটি বলা বোধহয় বাঞ্ছনীয় যে, কোনো ঘাতকশক্তিকে সন্তুষ্ট করে কেউ ক্ষমতায় যেতে পারেনি, গেলেও থাকতে পারেনি।

জামায়াত, ধর্মব্যবসায়ীদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগও এখন আলোচনার বস্তু। অবস্থা অনেকটা পরাবাস্তব ছবির মতো। শেখ হাসিনা আবারও যা বলেছেন তার মূল কথা, পার্লামেন্টে পার্লামেন্টারি প্র্যাকটিস, রাস্তায় প্রতিরোধ। এ তত্ত্ব এখনো মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। হলে চট্টগ্রামে গোলাম আযম বিরোধী আন্দোলনে যথেষ্ট সমর্থন না দেয়ার অভিযোগে জানাজায় অংশ নিতে এসে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হতেন না চট্টগ্রামের দুই জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ নেতা মেয়র মহিউদ্দিন ও আতাউর রহমান খান কায়সার (জনকণ্ঠ)। রাস্তাঘাটে, হাটে-মাঠে আওয়ামী লীগ কর্মীরাও মানুষের এত প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতেন না। আবার এটাও ঠিক, ধর্মব্যবসায়ী ও পুলিশের হাতে যারা লাঞ্ছিত হচ্ছেন বা নিহত হয়েছেন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রলীগ কর্মী।

এরকম ঘোলাটে পরিস্থিতিতেও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, ছাত্র, সংস্কৃতিসেবী ও পেশাজীবীদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর একধরনের চাপা টেনশন চলছে। হয়তো একসময় তা মতান্তরে পরিণত হতে পারে। জামায়াত এখন বলতে পারে, সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ বলতে পারে- পুলিশ, বিরোধী দল, সরকার আমাদের সহায়তা করছে-শুধু গুটিকয় ছাত্র, পেশাজীবী ও কলমজীবী ছাড়া। সুতরাং এখন সবচেয়ে অনিরাপদ এরাই। সম্মিলিত ও বিচ্ছিন্ন সব হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারেন ছাত্র, পেশাজীবী এবং দুই রাজনৈতিক দলের সমালোচনাকারীরা। তবে কৌতুকবহ দিক হচ্ছে এর মধ্যেও জামায়াত চরম স্যাডিজমের বা ধর্ষকামের পরিচয় দিচ্ছে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুই দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে।

তা সত্ত্বেও বলব, এই সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশই গত চল্লিশ বছরে সবসময় এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রথম প্রতিবাদ করেছে; রাজনৈতিক দল পরে যোগ দিয়েছে। এ কারণেই, নিরস্ত্র ছাত্ররা এমনকি ছাত্রলীগ কর্মীরাও সশস্ত্র জামায়াত কর্মী ও পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিহত হয়েছে। এরা মাইনোরিটি। এদের ভোট ব্যাংক নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা বাঞ্ছনীয় যে, এরা কখনো কারো নির্দেশে চালিত হয়নি এবং সিভিল সমাজে মাইনোরিটি হয়েও কম প্রভাবশালী নয়। তাদের মতামত একেবারে উপেক্ষা করা কতটা ঠিক জানি না। এদের অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, আওয়ামী লীগ ছাড় দিয়ে কীভাবে লাভবান হল? জামায়াত কি বিএনপি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে? মোটেই না। গোলাম আযমের উপরোক্ত উক্তি তার প্রমাণ। বিএনপি, জামায়াত, ধর্মব্যবসায়ীরা কি ভোট দেবে আওয়ামী লীগকে? তাও নয়। তাহলে ভোট বাড়ল কই হ্রাস পাওয়া ছাড়া?

উপদেশ দেয়া আমাদের উচিত নয়। তাই সে পথেও যাব না। শুধু বলব, এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে বিস্ফোরণ ঘটবে। কারণ, বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেয়া

হবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। এবং খালি হাতে কেউ লড়াইয়ে নামবে এমন ভাবারও কোনো কারণ নেই। পুলিশ ব্যারাকে বাস করেন না। পরিস্থিতি এমন চলতে থাকলে তারাও হয়তো নিরাপদে থাকতে পারবেন না এবং ধর্মব্যবসায়ীদেরও ছেড়ে দেয়া হবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

আমার অগ্রজ বন্ধু কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইনের একটি মন্তব্য দিয়ে শেষ করি। তিনি বলেছিলেন, গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে দু-কারণে বাংলাদেশের নাম ওঠা উচিত-

এক. মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী একটি দলকে এ দলগুলো তোয়াজে ব্যস্ত;

দুই. মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী এবং এখনো সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া দলটি গত দু-দশক ধরে ক্ষমতার বাইরে।

এমনটি বাংলাদেশ ছাড়া কোথাও ঘটেনি। বিষয়টি বিবেচনায় আনা দরকার। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের। কারণ পরিস্থিতি যতই ঘোলাটে হোক, মূল রাজনীতি একটি- আওয়ামী লীগ বা অসাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী। বাকিটি তার বিরোধী। আওয়ামী লীগ কি বিবেচনায় আনবে যে, দু-ফ্রন্টে লড়াই করতে হবে। না হলে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নটি গৌণ বিষয়ও হয়ে যেতে পারে। অনেকে যুক্তি দিতে পারেন, দু-ফ্রন্টে একসঙ্গে লড়াই করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু এ-কথাও ইতিহাসে প্রমাণিত হয়নি যে দু-ফ্রন্টে লড়াই করা বেকুবের কাজ। শক্তি থাকলে সেটা করা যায়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের মধ্যে এখনো একমাত্র আওয়ামী লীগের পক্ষেই সেই কাজটি করা সম্ভব।

২.৮.১৯৯৪

মোনায়েম খান শহীদ হলে আমরা কী?

আজকাল গুরুত্বপূর্ণ খবর এত বেশি থাকে যে, অনেক খবরই আর পত্রিকায় জায়গা করতে পারছে না। বা পারলেও খবরের ডামাডোলে হারিয়ে যাচ্ছে। এ খবরটিও ছিল সেরকম একটি খবর। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, খবরটি একটি পত্রিকা ছাড়া আর কেউ ছাপেনি। গুরুত্বসহকারে, সচিত্র সংবাদটি ছেপেছিল একটিমাত্র পত্রিকা যার পরিচিতি এ ধরনের উদ্যোক্তা হিসেবে। পত্রিকাটির নাম-'ইনকিলাব'। ইনকিলাব'-এর গত ১১ তারিখের সংবাদে জানা গেল, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গণধিকৃত গভর্নর আবদুল মোনায়েম খানের মৃত্যুবার্ষিকী ঘটা করে পালিত হবে হোটেল প্রীতম-এ। এর আয়োজক মোনায়েম খান স্মৃতি সংসদ।

আমি যেহেতু 'ইনকিলাব' কিনি না সেহেতু সংবাদটি অগোচরেই থেকে যেত। শুধু আমার কেন, অনেকেরেই। কিন্তু ঐদিন ভোরেই প্রখ্যাত কলাম-লেখক মহিউদ্দিন আহমদ বেশ উত্তেজিত স্বরে সংবাদটি পাঠ করে শোনালেন। বললেন, "আপনারা তো ইনকিলাব পড়েন না। আমি পড়ি, কারণ এদেশে পাকিস্তানপন্থীরা কী ভাবছে বা কী করবে তা এই পত্রিকা পড়লে জানা যায়।" আমি বলি, যদ্দুর মনে পড়ে, গতবছরও এ ধরনের সংবাদ ও আয়োজনের কথা শুনেছি। তা কী করা? তিনি বললেন, এ সব আর বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেওয়া যায় না। তারপর একইভাবে তিনি বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডার, সংস্কৃতি-জগতের বিভিন্ন গুরুকে সারাদিন টেলিফোন করতে লাগলেন। এই গৌরচন্দ্রিকার কারণ আছে। সেটিই আলোচনার মুখ্য বিষয়।

'ইনকিলাব'-এর জন্ম মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাঁদায়। প্রথম থেকেই পুরো পত্রিকাটিতে একটি 'ইসলামী লেবাস' আছে। তাই মাদ্রাসা শিক্ষক ও অনেক ইসলাম-পছন্দ লোক ইনকিলাব কেনেন। প্রতি সপ্তাহে এর বিনোদন পাতায় আধা-সেক্স-আধা-ভায়োলেন্সের কাহিনীর ছবি থাকে। এভাবে সেক্স, রিলিজিয়ন আর ভায়োলেন্সের মিক্সচার হচ্ছে 'ইনকিলাব'। আর কে না জানে অর্ধশিক্ষিত পাঠকমাত্রই এসব উপাদানের ভক্ত। 'ইনকিলাবের' কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করার কারণ মোনায়েম খান সংক্রান্ত খবরাদি দুদিন ধরে এ পত্রিকাটি ছাড়া অন্য কেউ ছাপেনি।

'ইনকিলাব'-এর প্রতিষ্ঠাতা-মালিক ১৯৭১ সালে আলবদর হিসেবে খ্যাত আবদুল মান্নান। অনেকে তার নামের আগে মওলানা শব্দটি ব্যবহার করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এর বিরোধী। মওলানা শব্দটি জড়িত সম্মানিত আলেম ব্যক্তির সঙ্গে। আলবদর হিসেবে যে পরিচিত, সাম্প্রদায়িক হিসেবে যে চিহ্নিত, তার নামের আগে তো মওলানা শব্দটি যোগ হতে পারে না। আরো আছে। যদ্দুর মনে পড়ে, ষাটের দশকে, তার এই মওলানা

শব্দ ও ব্যবহার এবং মাদ্রাসা ডিগ্রির পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে মামলা হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছিল এ দুটি ক্ষেত্রেই জালিয়াতি করা হয়েছে। আদালতে অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালে আলবদর বাহিনীর প্রধান মতিউর রহমান নিযামী একবার বলেছিলেন, আজকাল টুপি-দাড়ি দেখলেই লোকে মারতে আসে। তিনি ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন যে, প্রগতিশীলরা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এমনভাবে চিহ্নিত করছে যাতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। না, লোকে যদি মারতেও আসে (যা সত্য নয়) তা অন্য কারণে। কারণ এই টুপি পরে, দাড়ি রেখে, ইসলামের কথা বলে কি মুক্তিযুদ্ধে মানুষকে হত্যা করা হয়নি, ধর্ষণ করা হয়নি? এখনো কি এই টুপি পরে, দাড়ি রেখে ধর্মের নামে অসহায় নারীদের গ্রামাঞ্চলে চাবুকপেটা করা হচ্ছে না?

আলবদর-রাজাকারদের বিশেষ করে আবদুল মান্নানকে আর্থিক-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাত, জেনারেল জিয়াউর রহমান বীরোত্তম। কারণ, পিছিয়ে-পড়া মাদ্রাসা-শিক্ষকদের ওপর সাংগঠনিক প্রভাব ছিল আবদুল মান্নানের। মাদ্রাসা শিক্ষকদের আবার প্রভাব আছে গ্রামাঞ্চলে ধর্মভীরু মানুষদের ওপর। সুতরাং মান্নানকে তিনি নিজ প্রভাব ও স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করতে চাইলেন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিনিময়ে। তাছাড়া মান্নান সবসময় সামরিক শাসকদের পক্ষে কাজ করেছে। জিয়া ভেবেছিলেন, সেদিক থেকেও সে নিরাপদ। তারপর থেকে মান্নানের পুনরুত্থান আমরা লক্ষ্য করি। যেহেতু সরকার তার পৃষ্ঠপোষক, অচিরেই তার একটি অর্থনৈতিক সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি হয়ে যায়। 'ইনকিলাব' প্রকাশিত হতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, প্রচারের ক্ষেত্রেও তার অবস্থান সুদৃঢ় হয়। আর কেউ না-জানুক, আবদুল মান্নান জানতেন, বাংলাদেশে অর্থশালী ও ক্ষমতাশালীদের টিকি কেউ ছুঁতে পাবে না।

একটি কথা আমরা অনেকদিন বলে আসছি। কেউ গুরুত্ব দেননি, তবুও আবার বলছি- ইনকিলাবকে সংবাদপত্র হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়? সংবাদপত্র নিরপেক্ষ হবে আমরা তা বলি না। কিন্তু 'ইনকিলাব'-এর অবস্থান পক্ষে -বিপক্ষে নয়, একবারে অন্য পক্ষে। কোনো সংবাদপত্র যদি নিয়ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরোধী, প্ররোচনামূলক সংবাদ ছাপায় তাকে কি সংবাদপত্র বলা যায়? কোনো পত্রিকা যদি বছরে কয়েকবার অসত্য খবর ছাপায় এবং তা ফাঁস হয়ে গেলে মার্জনা চায় তা-কে কি সংবাদপত্র অভিধা দেয়া উচিত? কোনো পত্রিকা যদি নিরন্তর এমনভাবে সংবাদ পরিবেশন করে যা দেশবিরোধী, সংবিধান বিরোধী, তাহলে তাকে সত্যিকার অর্থে সংবাদপত্র বলা যায় কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। এ সব বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 'ইনকিলাব ঃ অপসাংবাদিকতা' গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে, আমি শুধু দু-একটির উল্লেখ করব-

১. গোলাম আযমের বিচার নিয়ে আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন 'ইনকিলাব'-এর প্রথম শিরোনাম ঃ "ভারতের কালো থাবাকে আড়াল করার জন্য নতুন করে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা- ফারাক্কার ক্রুদ্ধ হিংস্র ছোবলের মুখে যাদানিকের রহস্যময় নীরবতা।"

সংবাদে লেখা হল-"নতুন করে বাংলাদেশের দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সম্মানিত নাগরিকের বিরুদ্ধে তথাকথিত গণতদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে একদিকে ঘাদানিকের মুখোশ খসে পড়েছে, অন্যদিকে গণআদালতি প্রেতাত্মারা নারকীয় উল্লাসে নৃত্য শুরু করেছে।"

একাত্তরের রাজাকার ও আলবদররা 'ইনকিলাব'-এর চোখে বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তি। প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকেরা ভারতের দালাল। উল্লেখ্য, সিআইএ'র নয়।

২. গো. আযমের মামলার সময়ই ইনকিলাব পরলোকগত এটর্নি জেনারেলের বক্তব্যকে 'সংবেদনশীল' ও 'অত্যন্ত বিতর্কিত' বলে উল্লেখ করেছিল। এর অর্থ বাংলাদেশ যে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, আলবদর-রাজাকাররা যে খুন-ধর্ষণ করেছে এসব তথ্য 'সংবেদনশীল' ও 'বিতর্কিত'। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় যারা বিশ্বাস করেন তাদের পক্ষে এটি বলা সম্ভব?

৩. আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, বছরখানেক আগে বেআইনি অস্ত্র আমদানি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল পাকিস্তানি নাগরিক ফয়সল। এ ব্যাপারে সব পত্রিকা খবর করলেও ইনকিলাব ছিল নিরুত্তাপ (এ খবরের কোনো ফলোআপ হয়নি? সে মামলা বা ফয়সলের কী হল?)। যদি এটি ভারতীয় নাগরিক রামবাবু করতেন তাহলে যতদিন রামবাবুকে ফাঁসিতে লটকানো না হত ততদিন এ বিষয়ে সংবাদ থাকত। 'ইনকিলাব'-এর কাছে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস নয়- পাকিস্তানি সৈনিকদের আত্মসমর্পণের দিনমাত্র। সুতরাং এর মালিক বা পত্রিকাটির আদর্শ উদ্দেশ্য চরিত্র স্পষ্ট। পাকিস্তানচক্রের মুখপত্র না হলে বাংলাদেশে একমাত্র এই পত্রিকাটি কেন মোনায়েম খানের নামের আগে শহীদ শব্দটি ব্যবহার করবে? বা কেন এ সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন ছাপবে?

মোনায়েম খানের পরিচয় নতুন করে দেয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ইনি সেই গভর্নর যিনি নিজেকে আইয়ুব খানের 'খিতমদগার' হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন। ইনিই সেই গভর্নর যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনে মদদ যুগিয়েছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবদুল হাইকে বলেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের সময় এই ধিকৃত ব্যক্তিটি পদত্যাগে বাধ্য হয়। মোনায়েম খানের মৃত্যুবার্ষিকী এর আগেও মোনায়েম খান স্মৃতি সংসদ পালন করেছে। জিন্নাহর বার্ষিকীও পালিত হয়েছে। একমাত্র 'ইনকিলাব' এসব খবর গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে। আসলে, পাকিস্তানী চক্র এগুলি প্রতীক হিসেবে, টেস্ট কেস হিসেবে ব্যবহার করে সমাজে জায়গা করে নিতে চাচ্ছে। এবারও তাই করেছে। শুধু তাই নয়, মোনায়েম খানকে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। আমরা কেউ গুরুত্ব দিইনি। এসব বিষয়ে কথা বলতে গেলে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেই সবাই গুরুত্ব দিতে বলেন। রাজনৈতিক ডামাডোল বাংলাদেশে ২৫ বছর ধরে চলছে। আরো ২৫ বছর চলবে। কিন্তু আপাত গুরুত্বহীন বিষয়গুলিই এক বা দেড় দশক পর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন,

জামাতের বিষয়টি। প্রথমদিকে জামাতের বিবৃতি, সভাকে সবাই গুরুত্বহীন মনে করত, হাস্যকর আখ্যা দিত এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই মনোযোগ রাখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হত। তারপর এখন যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম প্রকাশ্যে জনসভা করে। বিএনপি ও তার প্রতিষ্ঠাতা একসময়ের মুক্তিযোদ্ধা ও রাষ্ট্রপতি এবং আলবদর আবদুল মান্নানের পৃষ্ঠপোষক জেনারেল জিয়াউর রহমানের কল্যাণে তো আমাদের এসব দেখতে হল।

মোনায়েম খানের জন্য যদি পারিবারিক মিলাদ করা হয় তাতে কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু তাকে শহীদ আখ্যা দেয়া ও তার স্মরণে প্রকাশ্যে সভা করা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অনুরাগীদের প্রতি এক ধরনের চ্যালেঞ্জ জুড়ে দেওয়া, শক্তি পরীক্ষা করা। জনমত পর্যবেক্ষণ করা। প্রশ্নগুলি এভাবে উত্থাপন করা যায়- মোনায়েম খান শহীদ হলে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলাম ও আছি (এবং মোনায়েম খানের হত্যার সংবাদ আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল সেই অন্ধকার সময়ে) তারা কী? মোনায়েম খানের হত্যাকারী মোজাম্মেল হক বীরপ্রতীকও প্রশ্ন তুলেছেন, মোনায়েম খান যদি শহীদ তাহলে তিনি তো নিছক হত্যাকারী। তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি তাকে গ্রেপ্তার করবেন? আর রাষ্ট্রীয় সম্মান 'বীরপ্রতীক' তো তাঁকে দেয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের জন্য, মোনায়েম খানকে হত্যার জন্য। আমাদের কথা বাদ দিই। আমরা চুনোপুঁটি। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান বীরোত্তম কি তাহলে নিছক হত্যাকারী (বিএনপি নেতা বিচারপতি টি এইচ খান ছিলেন প্রস্তাবিত মোনায়েম খান স্মৃতিসভার প্রধান বক্তা) বেগম জিয়া কী বলেন? আমাদের সেনাপতি জেনারেল নাসিম মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরপ্রতীক। তাহলে তাঁর অবস্থান কী? অন্যান্য বীরোত্তম, বীর প্রতীকদের? আমরা আসলে এসব বিষয় তলিয়ে দেখি না। বাংলাদেশ বিরোধীরা তা দেখে এবং সেভাবে প্রস্তুত হয়ে নিজেদের স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে। একভাবে বিচার করলে দেখবেন, ইনকিলাবের এই আচরণ (অর্থাৎ শহীদ শব্দটি ব্যবহার করা) সংবিধান বিরোধীও। কিন্তু টি এইচ খান যেহেতু প্রধান বক্তা হিসেবে নিমন্ত্রিত ছিলেন তাই তা সংবিধান বিরোধী নয়। আবদুস সামাদ আজাদ থাকলে সংবিধান বিরোধী হত।

'ইনকিলাব'এই সংবাদটি ছাপার পরদিন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির একটি তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সভা হয়েছিল। আমন্ত্রিত বেশ কয়েকজন সাংস্কৃতিক গুরু ও সেক্টর কমান্ডার অবশ্য আসেননি। আমরা ভেবেছিলাম, জনাপঞ্চাশেক মানুষ হবে এবং তা-ই যথেষ্ট। কিন্তু শ-তিনেক মানুষ হয়েছিলেন সেই তাৎক্ষণিক সভায় এবং বক্তা যে ক'জন ছিলেন তাঁরা কেউ অপরিচিত নন। এবং সবাই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এই প্রয়াস ও এর ইন্ধন যোগানকারী হিসেবে 'ইনকিলাব'কে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করি। কোনো পত্রিকায় কারো বিরুদ্ধে অসত্য, মানহানিকর কিছু ছাপলে সে ব্যক্তি যদি আদালতের দ্বারস্থ হন তখন সাংবাদিক নেতারা উপদেশ দেন প্রেস কাউন্সিলে যাবার। কারণ সবাই জানেন প্রেস কাউন্সিলের কোনো ক্ষমতা নেই এবং পত্রিকার কিছুই হবে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সাংবাদিক নেতাকে

(আওয়ামী বা বিএনপি যে পক্ষেরই হোন না কেন) দেখিনি, ইনকিলাব-এর সংবিধান বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী, অসত্য খবর প্রকাশের কারণে ভর্ৎসনা করতে। এর কারণ কী? অর্থ না ভোট? তবে এটা আমরা জানি, প্রভাবশালী কিছু সাংবাদিক নেতা ইনকিলাব গ্রুপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যেমন, মোনায়েম খানের স্মরণসভার প্রতিবাদে যে সভা হয়েছিল তার খবর মাত্র চারটি পত্রিকা ছেপেছে এবং গুরুত্বসহকারে একমাত্র জনকণ্ঠ। আর কেউ নয়। শুধু তাই নয়, অনেক পত্রিকা 'ইনকিলাব' শব্দটিও ছাপাতে চায় না। যেন, তা ভাশুর আর কী!

আমরা জানি, সাংবাদিকরা সবাইকে উপদেশ বিতরণ করলেও একপক্ষ এরকম করতে পারে। আমরা এও জানি, নিম্ন আদালতে 'ইনকিলাব'-এর বিপক্ষে মামলা করে কিছুই হবে না। আজ পর্যন্ত যত মামলা হয়েছে 'ইনকিলাব'-এর বিরুদ্ধে তার একটিরও কি সুরাহা হয়েছে? আমরা এও জানি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন একসময় মোনায়েম-ভক্ত এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন। সুতরাং তিনি থাকতে, 'ইনকিলাব'-এর টিকিটিও কেউ ছুঁতে পারবে না। আমরা জানি, নিরন্তর এসব সংবাদ ছাপা হলেও 'ইনকিলাব'-এ সরকারি বিজ্ঞাপন বেশি যাবে। কিন্তু আমরা এও তো জানি, ১৯৬৯-৭১ সালে ক্রুদ্ধ মানুষ গণবিরোধী মর্নিং নিউজ- দৈনিক বাংলা পুড়িয়ে দিয়েছিল। কয়েকদিন আগে, দিনাজপুরে মানুষ এসবি অফিস পুড়িয়েছে, পুলিশকে ধাওয়া করেছে, আর ইনকিলাব অফিস পুড়িয়েছে। মানুসের রুদ্ধ ক্রোধকে খাটো করে দেখতে নেই।

'ইনকিলাব' গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতে না পারে, আমরা করি। সেহেতু ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি দুটি প্রস্তাব রাখতে চাই।

১. ইনকিলাব ধর্মের অপব্যখ্যা দেয়, মানুষকে বিভ্রান্ত করে, সুতরাং ধর্মপ্রাণ বা প্রগতিশীল ব্যক্তি মাত্রেরই 'ইনকিলাব'-কে পরিহার করা উচিত। আপনার দেয়া পাঁচটি টাকা ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মের বিরুদ্ধে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে। এটি বিবেচনা করে দেখুন।

২. যেসব সংস্থা 'ইনকিলাব'-এ বিজ্ঞাপন দেন তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীদের, সংবিধান বিরোধীদের সহায়তা করেন। এটি করা কতটুকু শ্রেয়? কারণ তারা যদি এটিকে শ্রেয় মনে করেন তাহলে সেই সংস্থার পণ্যকে বয়কট জানানোর আহ্বান জানানোও শ্রেয়।

এবার সেই ছোট সভাটির কথা বলি। স্মরণসভা হওয়ার কথা ছিল প্রীতম হোটেলে (এর কর্ণধার স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে খ্যাত, ঢাকার সবচেয়ে এলিট ক্লাবের সভাপতি। তাকে নির্বাচিত করতে এলিটদের লজ্জা হয় না)। প্রতিবাদের কথা শুনে তারা উদ্যোক্তাদের ফিরিয়ে দেন। উদ্যোক্তারা এরপর যান সুন্দরবন হোটেলে। তারাও প্রতিবাদের কথা শুনে পিছিয়ে যান। সভা যখন চলছে তখন শুনি উদ্যোক্তারা গেছেন শেরাটনে। সেখানেও একই উত্তর– না। এই প্রথম উদ্যোক্তারা সভা করতে পারেনি। এবং এই প্রথমবার 'ইনকিলাব' এ বিষয়ে আর কোনো সংবাদ ছাপেনি।

ছোট এই সভার তাৎপর্য হল, স্বাধীনতার শত্রুদের নৈতিক কোনো ভিত্তি নেই।

সুতরাং পাঁচজন রুখে দাঁড়ালেও তারা থমকে দাঁড়ায়। আমরা গত দু-দশক রুখে দাঁড়াইনি। এগুলিকে আগাছা মনে করেছি। কিন্তু একবারও ভাবিনি শস্য রক্ষা করতে হলে আগাছা বারবার পরিষ্কার করতে হয়। কারণ আমাদের মনে রাখা দরকার জামাতের পর যদি কেউ আমাদের জাতিগতভাবে ক্ষতি করে থাকে এবং করছে তা হল এই পত্রিকা। এ ধরনের ইনকিলাবী যে-কোনো প্রচেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যে-কোনো তৎপরতা, এই রাজনৈতিক ডামাডোলেও প্রতিরোধ করা উচিত। এবং তা সফল হবেই কারণ পরাজিত হবার অবকাশ আমাদের নেই।

১৭.১০.১৯৮৫

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কারচুপি!

বাঙালির ইতিহাস থেকে দু'জনের নাম মুছে ফেলা অসম্ভব। একজন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন বাংলা ভাষাকে শুধু নতুন রূপ দিয়ে দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠা করেনি বিশ্ববাসীর কাছেও তা পরিচিত করেছিলেন। অন্যজন, বাঙালির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন- একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গেয়ে, আর বঙ্গবন্ধুর নামে শ্লোগান দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে সাভারে ও বুদ্ধিজীবী হত্যা স্মরণে মিরপুরে স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। মিরপুরে স্মৃতিসৌধটি বঙ্গবন্ধু উদ্বোধন করেছিলেন এবং এই স্মৃতিসৌধে তখন স্বাভাবিকভাবেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। কীভাবে?

স্মৃতিসৌধে যে ফলক ছিল, তাতে লেখা ছিল-

“উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই”
কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তারপর নিচে ছিল-এই স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান [আক্ষরিক উদ্ধৃতি নয়]।

কয়েকদিন আগে আমরা কয়েকজন মিরপুর স্মৃতিসৌধে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম ফলকটি ঠিক আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটি নেই। শুধু তাই নয়, স্মৃতিসৌধ উদ্বোধক অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর নামও নেই।

আমরা যারা প্রথমে এখানে এসেছিলাম তাদের মনে হল এরকমটি তো হওয়ার কথা নয়। আমরা কি ভুল করছি? কিন্তু সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক ও শিল্পী হাশেম খান ও উপস্থিত আরও কয়েকজন জানালেন, না ভুল নয়। তারা নিজে দেখেছেন স্মৃতিসৌধটি যখন উদ্বোধন করা হয় তখন এ দু'জনের নাম ছিল।

১৯৭৫ সালের আগে এটি হওয়া সম্ভব নয়। তারপর শাসকরা এ দু'টি নাম মুছে দিয়েছেন। এবং এমন একটি জায়গা থেকে যেখানে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিকৃতিকরণ শুরু হয় ১৯৭৫ সাল থেকে। স্মৃতিফলক থেকে নাম মুছে দেয়া এর একটি উদাহরণ। কিন্তু শাসকদের মাথায় একবারও আসেনি যে, যার গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং যিনি বাংলাদেশের স্থপিত তাঁর নাম কি বাংলাদেশ

থেকে মুছে ফেলা সম্ভব? মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই কারচুপি কি এখনো আমদের সহ্য করতে হবে?

মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তীর শুরুতে সারাদেশে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছে। আনাচে কানাচে বিজয় মেলা হচ্ছে, মহিলা মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক তারামন বিবিকে খুঁজে বের করা হয়েছে, 'মুক্তির গান' মুক্তি পেয়েছে।

এইদিনে আমাদের দাবী মুক্তিযুদ্ধের বিকৃতায়ন প্রতিরোধ করুন। মিরপুর স্মৃতিসৌধের অবমাননা রোধ করে মূল ফলকে যা ছিল তা উৎকীর্ণ করা হোক। মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি বা নির্ভয়ের সংস্কৃতির চর্চা শুরু হোক।

১৪.১২.১৯৯৫

বড় আল বদরদের কী হবে?

"আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে হাত-পা বাঁধা।....."

"আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির টিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটা অংশ কাটা।.....মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর।......"

"মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি জলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির টিবির মধ্যে মৃত কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।"

রায়েরবাজারের বধ্যভূমি দেখে এসে এই প্রতিবেদন লিখেছিলেন অধ্যাপিকা হামিদা রহমান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী এক বছর খবরের কাগজের পাতা ওল্টালে এ ধরনের প্রচুর বধ্যভূমির খবর জানা যাবে। ঢাকার রায়েরবাজার বধ্যভূমি যেখানে আমাদের বরণীয় বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল তা এই সমস্ত বধ্যভূমির প্রতীক। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মূলত জড়িত ছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা, যাদের প্রধান অংশ ছিল জামাতে ইসলামী কর্মীরা। এদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল রাজাকার বাহিনীর, ডেথ-স্কোয়াড নামে খ্যাত আলবদর বাহিনী ও আলশামস বাহিনী। আলবদরদের হাতে নিহত হয়েছিলেন এ দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা। মাত্র পঁচিশ বছর। কিন্তু বাংলাদেশ এসব ঘটনা মনে রাখে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ পঞ্চাশ বছর। গত এক মাস ধরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নানাভাবে স্মরণ করা হচ্ছে নাৎসীদের কর্মকাণ্ড ও বিজয়ী যোদ্ধাদের। এ কথাই ঐসব স্মরণসভায় বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ইউরোপ কেন, বিশ্বে যেন ঐ নাজিবাদ আবার প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যেসব চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে সেগুলোতে নাৎসি সহযোগীদের প্রতি সাধারণ মানুষের আচরণও দেখানো হচ্ছে। সেসব পুরোনো কথা। এখনো বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের খুঁজে বের করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। মানবতার প্রতি ঘৃণ্য অপরাধ যেন আর সংঘটিত না হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭ সালের জেনেভা চুক্তি করা হয়েছে এবং ইউরোপে যে কোনো যুদ্ধাপরাধীকে পাওয়া গেলে সে আইনের আওতায় তার বিচার হচ্ছে। আর এ পটভূমিকায়ই বাংলাদেশের তিনজন যুদ্ধাপরাধীকে সম্প্রতি শনাক্ত করা হয়েছে।

ব্রিটিশ রিপোর্টার ডেভিড বার্গম্যান বাংলাদেশে ছিলেন বেশ কিছুদিন। উদ্দেশ্য,

ব্রিটেনে বসবাসরত বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের শনাক্ত করে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা। তাঁর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ব্রিটেনের টেলিভিশন সংস্থা 'টুয়েন্টি টুয়েন্টি' 'ডেসপ্যাচেস' সিরিজে বাংলাদেশের তিনজন যুদ্ধাপরাধীকে নিয়ে ৫০ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছে। হাওয়ার্ড ব্রাডবার্ন এর পরিচালক। কয়েকদিন আগে ইংল্যান্ডের চ্যানেল ফোরে এই তথ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হলে ব্যাপক আগ্রহ ও আলোচনার সৃষ্টি হয়।

তথ্যচিত্রটির মূল প্রতিপাদ্য ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যার সঙ্গে জড়িত তিন ব্যক্তি- চৌধুরী মঈনুদ্দীন, লুৎফর রহমান ও আবু সাঈদ এখন লন্ডন ও বার্মিংহামে বসবাস করছে। ইংল্যান্ডের বাঙালি সমাজে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে মৌলবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে নানা উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। সুতরাং ১৯৫৭ সালের জেনেভা চুক্তি অনুসারে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ব্রিটেনে তাদের বিচার হওয়া উচিত।

ডেসপ্যাচের প্রথমেই দেখা যায়, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে রায়েরবাজার বধ্যভূমির সামনে দাঁড়িয়ে তখনকার তরুণ সাংবাদিক এনায়েতউল্লাহ খান ক্রুদ্ধস্বরে প্রতিশোধ কামনা করছেন। আরো পরে দেখা যায়, প্রবীণ এনায়েতউল্লাহ খান রায়েরবাজারের স্মৃতিচারণ করছেন। এর মাঝে চব্বিশটি বছর পার হয়ে গেছে। জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালে যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে সমন্বয়ের রাজনীতি শুরু করলেন। আরো অনেকের মতো ক্রুদ্ধ এনায়েতউল্লাহ খানও ক্রোধ ভুলে সমন্বয়ের রাজনীতিতে যোগ দিলেন। এভাবে পিঠে ছুরি মেরে অনেকে আমাদের ক্রোধ দমনে বাধ্য করেছিলেন। ক্রোধ দমন করা যায়। কিন্তু বেদনা? অপমান?

আগামী ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের ২৫ বছর পূর্ণ হবে। এবং আমরা দেখব, ১৯৭১ সালে আমরা যেসব স্বপ্ন দেখেছিলাম তার অধিকাংশই পূরণ হয় নি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি, কিন্তু খুব কম সময়ই ব্যয় করি তাদের জন্য, যারা আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।

প্রত্যেক জাতির জাতীয় বীর থাকে। আমাদের নেই। থাকলেও স্বীকার করি না। পৃথিবীর সব দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রথম যে কাজটি করা হয় তা হল জাতীয় বীরদের প্রতি স্মৃতি তর্পণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একমাত্র ব্যতিক্রম। এখানে যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতাবিরোধীদের সম্মানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি করা হয়, এ জাতি তা মেনে নিয়েছে। এবং এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে স্বাধীনতা জাদুঘর হয়নি, কিন্তু সামরিক জাদুঘর হয়েছে।

এ সমস্ত কর্মকাণ্ড হয়েছে আমাদের বা মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের নেতৃত্বেই। এর ফলে কায়েম হয়েছে প্রগতিবিরোধী শাসন। মৌলবাদের থাবা ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই আমরা নিশ্চুপ থেকেছি। কারণ, আমাদের অনেকে এর বিনিময়ে ইউনিফর্মধারী ও ইউনিফর্মহীন বা ইউনিফর্ম প্রভাবিত শাসকের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছি। তবে, এ কথা বলা ভুল হবে যে, নিরস্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ এতে অপমানিত বোধ করে নি, বেদনাবোধ করে নি। অপমান ও বেদনাবোধের কারণ, যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে,

গণহত্যা ও গণধর্ষণ করেছে তাদেরকেই সম্মানের সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাহলে ১৯৭১ সালে লড়াইটা হয়েছিল কার বিরুদ্ধে এবং কেন?

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন জাহানারা ইমাম। সরকারের অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই এর বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালে যারা পরাজিত হয়েছিল তারা, তাদের এজেন্ট ও ভাবশিষ্যরা ১৯৭৫ সালের পর থেকে চাইছে বিভিন্নভাবে ১৯৭১ সালের পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে এবং এ কাজে তারা সফলও হচ্ছে।

গত ২৫ বছরে স্বাধীনতাবিরোধীরা যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্য কোনো দেশে তা সম্ভব হয়নি। অনেক কিছু আমরা ভুলে গেছি। কৃতঘ্ন জাতি হিসেবে ইতোমধ্যে আমরা পরিচিত হয়েছি। 'ডেসপ্যাচ' দেখে মনে হল এবার লজ্জাহীন জাতি হিসেবেও আমরা পরিচিত হব। গত ২৫ বছরে একজন যুদ্ধাপরাধীর কেশমাত্র আমরা স্পর্শ করতে পারিনি। অথচ, অন্য দেশে আমাদের দেশের যুদ্ধাপরাধীদের শনাক্ত করে বিচারের আয়োজন চলছে। ইতোমধ্যে ব্রিটেনের অগ্রগণ্য রাজনীতিবিদরা এই তিনজনের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি তুলেছেন। এটর্নি জেনারেল স্যার লয়েলের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে।

'ডেসপ্যাচ' থেকে যে বিষয়টি আমাদের এবং নির্মূল ও সমন্বয় কমিটির শিক্ষণীয় তা হল অভিযোগ উত্থাপনের পদ্ধতি। ডেভিড ব্রিটেনে বসবাসরত যে তিনজনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে শনাক্ত করেছেন- তাদের মধ্যে একজন ছিল ঢাকায় আল বদরের অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দীন। অপর দুজন সিলেটের লুৎফর রহমান ও আবু সাঈদ। তিনি এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণাদি যোগাড় করে এমনভাবে মামলা দাঁড় করিয়েছেন যে, এদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বর্তমান যা অবস্থা তাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না। কিন্তু শহীদ পরিবাররা বিচার চায়। ব্রিটেনে যুদ্ধাপরাধীদের স্থান নেই। ঐ তিনজন যুদ্ধাপরাধী এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। মঈনুদ্দীন বলেছে, 'আমি কখনো আল-বদর ছিলাম না। গণহত্যার সঙ্গেও জড়িত নই।' প্রশ্ন জাগে, যদি তা নাই হয় তাহলে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের পর পর কেন দেশ ত্যাগ করেছিল? এবং ডেসপ্যাচ প্রদর্শিত হওয়ার পর কেনই বা গা ঢাকা দিয়েছে?

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, ডেপুটি স্পিকার ছিলেন স্বাধীনতাবিরোধী। পার্লামেন্টে জামাতের সদস্যের সংখ্যা ২০। এবং যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম এখন মুক্ত নাগরিক। শুধু তাই নয়, লন্ডনের একটি পত্রিকায় খবর এসেছে চৌধুরী মঈনুদ্দীনকে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্বও দেওয়া হয়েছে। আল বদরের হাইকমাণ্ডের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা এখন স্বচ্ছন্দে রাজনীতি করছে। এদের মধ্যে আছে মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী, মোহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, আশরাফ হোসাইন, মোহাম্মদ শামসুল হক, আ.শ.ম রুহুল কুদ্দুস, সরদার আবদুস সালাম, আবদুল জাহের, মোহাম্মাদ আবু নাসের প্রমুখ।

লন্ডনে যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে এদের তুলনায় তারা তুচ্ছ। ছোট আল বদরদের বিচার হয়তো শুরু হবে। কিন্তু ঢাকার এই বড় আল বদরদের কী হবে?

প্রজন্ম '৭১-এর ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা লন্ডনে ডেসপ্যাচের প্রদর্শনী উপলক্ষে বলেছেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যেন এ কারণে ইতস্তত বোধ না করে।.....গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নামে জামাত বাংলাদেশে শক্তিশালী সংগঠন হয়ে উঠছে এবং এ দলের অনেক সদস্যই যুদ্ধাপরাধী হিসেবে পরিচিত। দুঃখের বিষয় ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন এদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায়। গণতন্ত্রের নামে এ ধরনের আচরণ এ ব্যবস্থার প্রতিই হুমকি হয়ে উঠবে।' এখানে উল্লেখ্য, মার্কিন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'স্পেশাল ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামের' আওতায় কোলাবরেটর হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল আসাদকে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। অথচ, মানবাধিকারের এখন একজন প্রধান প্রবক্তা যুক্তরাষ্ট্র।

অনেকে বলেন, এত বছর পর আজ এসব প্রশ্ন কেন? যারা এ কথা বলেন, ধরে নিতে হবে তারা স্বজনহারা হন নি, বাংলাদেশের অগণিত শহীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ নেই এবং তারা পরোক্ষভাবে যুদ্ধাপরাধী ও বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে যে উগ্র মৌলবাদী 'আন্দোলন' চলছে তার সমর্থক। যুদ্ধাপরাধী তো বটেই, এদের প্রতিরোধও বাঞ্ছনীয়। এক ব্রিটিশ মন্ত্রী বলেছেন, যে জাতি তার অতীত ভুলে যায় তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কারণ সে তার আত্মপরিচয় হারায়। ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা সুন্দর একটি কথা বলেছেন, বাংলাদেশের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি হবে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি উপায়।

আমরা মনে করি বাংলাদেশে, সমাজে রাষ্ট্রে শান্তি স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে হলে, মৌলবাদীদের অন্ধকার যুগ ফিরিয়ে আনার এ চেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। সময় এখনো ফুরিয়ে যায় নি। সারা বিশ্বে আবার মানবতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আহ্বান হবে, বাংলাদেশে বড় আল-বদরদের বিচারের দাবি তোলা। রাজনৈতিক দল যদি আমাদের সমর্থন না দেয়, নিরস্ত্র আমরা কিছু করতে না পারি, ঐসব অপরাধী ও তাদের সঙ্গে যারা রাজনীতি করছে বা সহায়তা করছে অন্তত তাদের পথে থুতু তো ফেলতে পারি।

৯.৫.১৯৯৬

ওদের কাছে মুক্তিযুদ্ধও বিতর্কিত?

অত্যন্ত বেদনাহত চিত্তে আজ এ লেখা লিখতে হচ্ছে। বেদনাহত এ কারণে যে, এ মাস বিজয়ের মাস, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের রজতজয়ন্তীর মাস। আমাদের অনেকের সুখ-দুঃখ-বেদনা-আবেগে ঘেরা এ মাস। আর এ মাসেই প্রকাশ্যে একটি গোষ্ঠীর মুখপত্র ঘোষণা করল মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে বিতর্কিত।

যে পত্রিকায় এ মন্তব্য করা হয়েছে সে পত্রিকাটি আপনাদের পরিচিত 'দৈনিক ইনকিলাব'। এর প্রধান উদ্যোক্তা মুক্তিযুদ্ধের একজন সুপরিচিত বিরোধী। এবং অভিযোগ আছে যে 'আল বদর' বাহিনীর সঙ্গে তিনি ছিলেন যুক্ত। অবশ্য এ বিষয়ে সঠিক তথ্য দিতে পারবেন জামায়াতে ইসলামীর নেতা মতিউর রহমান নিজামী, যিনি ১৯৭১ সালে ঐ বাহিনীর প্রধান ছিলেন। ১৯৭৫ সালের পর এই ব্যক্তির উত্থান। কারণ সামরিক শাসকরা এদের পুনর্বাসিত করেছিল এবং যে কারণে তারা আজ এ মন্তব্য করতে পারছে। বিএনপি যা তাদের পুনর্বাসিত ও জাতীয় পার্টি যা এদের প্রতিষ্ঠিত করেছে তারাও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে 'বিতর্কিত' বলে নি, কটূক্তি হয়তো করেছে।

৩০ নভেম্বর দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম-"স্কুল-মাদ্রাসার পাঠ্য বই ও রেফারেন্স বই সরবরাহ ঃ এডিবি ঋণের ২ কোটি টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত।" সংবাদে বলা হয়েছে, "আর ভাগ-বাটোয়ারার পরিকল্পনাকে পাকাপোক্ত করতে এ আয়োজনের সাথে যুক্ত করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া এবং বর্তমান সরকারের ৪ জন মন্ত্রী ও ৫ এমপির লিখিত বিতর্কিত বই।"

বই সরবরাহ নিয়ে অনিয়মের কথা আমরা শুনেছি। আরও শুনেছি, এ তালিকায় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বইও নেই। সংবাদটি যদি এ বিষয়েই হতো আপত্তি ছিল না। কিন্তু তারপর মন্তব্য করা হয়েছে। "বিতর্কিত বইয়ের অন্তর্ভুক্তির খবর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বইসমূহ মরহুম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখা।" বইগুলো কী-

১. ওয়াজেদ মিয়া : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু তথ্য।

২. মেজর (অব) রফিক: লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে।

৩. মেজর জেনারেল (অব) শফিউল্লাহ : বাংলাদেশ অ্যাট ওয়ার।

৪. ওবায়েদুল কাদের : শেখ মুজিব ও পাকিস্তানের কারাগারে। প্রভৃতি।

তালিকার অনেক বই আমরা পড়েছি এবং তা মুক্তিযুদ্ধের উপাদান। এগুলো কিভাবে বিতর্কিত হয়? মুক্তিযুদ্ধকেই শুধু পত্রিকাটি বিতর্কিত বলে নি, বঙ্গবন্ধুকেও বিতর্কিত বলা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীন বাংলাদেশই বিতর্কিত। বাংলাদেশ কেন

পাকিস্তানের অংশ নয়- এ খেদই প্রকাশিত হয়েছে এসব মন্তব্যে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রদায়িকতার ইঙ্গিতও লক্ষণীয় একটি মন্তব্যে-"এ ছাড়াও বই ক্রয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০টি এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লিখিত ৪টি বই। তিনি তো মুসলমান।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ১০টি বই। তিনিতো হিন্দু। নজরুলের ৪টি বই। তিনিতো মুসলমান। বাংলাদেশ সরকার ও সরকারী দল আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে এ মাসে মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তী পালন করছে। অথচ যে গোষ্ঠী বা পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করছে না সে পত্রিকায়ই সরকার প্রচুর বিজ্ঞাপন দিয়েছে। [এই সংখ্যাটিই দেখুন] এবং শেখ হাসিনার জনসভার বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিদেশ মিশনে 'ভোরের কাগজ' বা 'জনকণ্ঠ' না গেলেও 'ইনকিলাব' যায়। বিএনপি বা জাতীয় পার্টির আমলে হলে না হয় এটি মেনে নেয়া যেতো। কিন্তু যে সরকার মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে, তার আমলেও এ ধরনের প্রশ্রয় দেয়া হবে, যারা মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখায়।

অনেকে বলবেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটি প্রযোজ্য। আমরা বলব না। দেশের অস্তিত্ব নিয়ে, স্বাধীনতা নিয়ে যারা প্রশ্ন করে তাদের ক্ষেত্রেও একই নিরিখে দেখা হবে? আর কোনো দেশেই তা হয় না।

সবশেষে বলব, জাতি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর এ পত্রিকার বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নেয়াই উচিত নয়? অন্যদের কথা বাদ দিই, আজ রজতজয়ন্তীকে মুক্তিযোদ্ধারা কী বলেন? না হলে রজতজয়ন্তীর মূল বিষয়টিই অর্থহীন হয়ে যায়।

২.১২.১৯৯৬

ধেড়ে আলবদরদের কী হবে?

গতকাল দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত 'লন্ডন প্রবাসী তিন যুদ্ধাপরাধীকে ধরে আনার প্রক্রিয়া শুরু'-মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তীতে সবচেয়ে আনন্দদায়ক সংবাদ বলে মনে হয়েছে। চৌধুরী মঈনুদ্দিন, আবু সাঈদ ও লুৎফর রহমান নামে তিন ঘাতক লন্ডনে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা যে যুদ্ধপরাধী এ খবর পেয়ে ব্রিটিশ টেলিভিশন রিপোর্টার ডেভিড বার্গম্যান তাদের যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করেন। গত বছর তার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ব্রিটেনের টেলিভিশন সংস্থা 'টুয়েন্টি ঃ টুয়েন্টি' তাদের 'ডেসপাচেস; সিরিজে এই তিন যুদ্ধপরাধীকে নিয়ে ৫০ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করে। হাওয়ার্ড ব্রাডবার্ন-এর পরিচালক। গত বছর ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশে তথ্যচিত্রটি প্রচার হলে ব্যাপক আগ্রহ ও আলোচনার সৃষ্টি হয়। এবং বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ বিচারের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিভিন্ন কারণে বিষয়টি এরপর চাপা পড়ে যায়। সমন্বয় কমিটি ও নির্মূল কমিটির আন্দোলনেরও ভাটা পড়ে। আমাদের মনে হয়েছিল যারা বিশ্বের কাছে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যে তিনজনকে তুলে ধরা হয়েছে আমরা কি তাদের বিচার করতেও অক্ষম? কিন্তু না, সংবাদ অনুযায়ী, 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গত সপ্তাহে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়া শুরুর জন্য। শিগগিরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কূটনৈতিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেবে।' শুধু তাই নয়, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি তিন যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন।' খবরটি যদি সত্য হয় তাহলে বলবো রজতজয়ন্তীতে দেশবাসীকে দেওয়া বর্তমান সরকারের এটি বড় উপহার।

১৯৭১ সালে ঢাকায় আলবদরের অপারেশন ইনচার্জ ছিল চৌধুরী মঈনুদ্দিন। অপর দুজন সিলেটের। আলবদরের হাইকমান্ডের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তারা এখন স্বচ্ছন্দে বাংলাদেশে বসবাস ও রাজনীতি করছে। এদের মধ্যে আছে আলবদর বাহিনীর নেতা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী, মোহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, আশরাফ হোসাইন, মোহাম্মদ শামসুল হক, আ শ ম রুহুল কুদ্দুস, সরদার আবদুস সালাম, আবদুল জাহের, মোহাম্মদ আবু নাসের প্রমুখ। লন্ডনে যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তারা এদের তুলনায় তুচ্ছ। এসব ছোট আলবদরদের বিচার শুরু হবে। সান্ত্বনা পাচ্ছি এতে। কিন্তু দেশে বিচরণকারী এই সব ধেড়ে আলবদরদের কী হবে?

অনেকে বলেন, যুদ্ধাপরাধ যুদ্ধাপরাধ বললে কী হবে। প্রমাণপত্র কই? বিচারের

জন্য প্রমাণপত্র চাই। সারাদেশের মানুষ দেখল এরা খুন করে বেড়িয়েছে তবুও প্রমাণপত্র চাই। তবে এ পরিপ্রেক্ষিতে বলব, 'ডেসপাচ' থেকে যে বিষয়টি আমাদের এবং নির্মূল ও সমন্বয় কমিটির শিক্ষণীয় তাহল অভিযোগ উত্থাপনের পদ্ধতি। ডেভিড এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণাদি যোগাড় করে এমনভাবে মামলা দাঁড় করিয়েছেন যে, এদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে এই বড় আলবদরদের সম্পর্কে প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে বিচার করা অসম্ভব হবে না।

অনেকে বলেন, এত বছর পর আজ এসব প্রশ্ন কেন? যারা এ কথা বলেন, ধরে নিতে হবে তারা স্বজনহারা হন নি, বাংলাদেশের অগণিত শহীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ নেই এবং তারা পরোক্ষভাবে যুদ্ধাপরাধী ও বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে যে উগ্র মৌলবাদী আন্দোলন চলছে তার সমর্থক। যুদ্ধাপরাধী তো বটেই, এদের প্রতিরোধও বাঞ্ছনীয়।

আমরা মনে করি বাংলদেশে, সমাজে, রাষ্ট্রে শান্তি স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে হলে, মৌলবাদীদের অন্ধকার যুগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা প্রতিরোধ করতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। সারা বিশ্বে আবার মানবতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠছে। আর এ ধারাবাহিকতাই বর্তমান সরকার ১৯৭৫ সালের হত্যাকারীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। ১৯৭৫ -এর ঘাতকদের বিচার হলে ১৯৭১ -এর ঘাতকদের হবে না? ১৯৭১ সালের ঘটনা কি মর্মান্তিক নয়?

তবুও শেখ হাসিনাকে, ভোরের কাগজের খবরের পরিপ্রেক্ষিতে জানাই অভিনন্দন। একটি প্রক্রিয়া তো তিনি শুরু করেছেন। তিনি যদি ধেড়েদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করেন তাহলে তা হবে রজতজয়ন্তীতে '৭১-এর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি ১৯৭৫-এর ঘাতকদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন- তিনি কি ১৯৭১ এর ঘাতকদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন না?

৩.১২.১৯৯৬

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ন্যায্য বিচার কি পাওয়া যাবে?

কয়েক দিন আগে রাজশাহীতে দলীয় কর্মীদের এক সভায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় আলবদর বাহিনীর প্রধান ও বর্তমানে জামাতে ইসলামীর সম্পাদক মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলন দমনে সন্ত্রাসী কায়দায় পুলিশ ব্যবহার করছে।" (সংবাদ, ১-৬-৯৭)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাতপন্থী ভিসিকে অপসারণ করা হয়েছে। নতুন ভিসি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের। তবে, সেটি বড়কথা নয়, সরকার মনে করেছে জামাতপন্থী ভিসি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাঁকে অপসারণ করা দরকার। এই অপসারণের পর জামাতপন্থী ছাত্র-শিক্ষকরা এক হয়ে মোর্চা গঠন করে এবং ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। এই ত্রাসের রাজত্বকেই নিজামী 'আন্দোলন" বলেছেন। এটি কীসের আন্দোলন? ভিসিকে অপসারণ এবং তাদের পছন্দসই ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসানো। বর্তমান ভিসি কীভাবে পুলিশ ব্যবহার করেন? যদি ব্যবহারই করতে পারতেন তাহলে ক্যাম্পাসে নিশ্চয় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলই থাকত।

নিজামী সংক্রান্ত খবরটি পড়ে মনে হল, কিছুদিন আগেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল খবরের শিরোনাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্রান্ত খবর তখনই কাগজে প্রধান শিরোনাম হয় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমুল একটা কিছু ঘটে। রাজশাহীতে তা হয়েছিল। বেশ কয়েকদিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছিল তার খবর। এখন ভিতরের পাতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত খবর ছাপা হয়। অর্থাৎ খুনোখুনি ঘটছে না সেখানে ঠিকই তবে খুনোখুনির পরিবেশ বিরাজ করছে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সাম্প্রতিককালে যা ঘটেছে তার সঙ্গে খানিকটা পার্থক্য আছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার। আমরা ধরে নিতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু হলে তা হয় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ঘটলে তা ঘটে ছাত্রশিবিরের সঙ্গে অন্যদের। যদ্দুর মনে পড়ে, কয়েকদিন আগে জামাতে ইসলামীর এক নেতা ঘোষণা দিয়েছিলেন, জামাত আর চুপ করে বসে থাকবে না। তার কয়েকদিনের মধ্যেই রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। চট্টগ্রামে কিছুদিন টালমাটাল হবার পর এখন খানিকটা শান্ত। কিন্তু, রাজশাহী এখনো অশান্ত। সেখানকার শিক্ষকরা জানিয়েছেন, সন্ধ্যার পর তাঁরা ঘর ছেড়ে বের হন না শিবিরের বোমা ও গুলির ভয়ে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রা.বি.) ঘটনার পার্থক্য

হল-শিবির কর্মীরা একযোগে সারা ক্যাম্পাসে আক্রমণ চালায়। তারা ভিসি ও অন্যান্য শিক্ষকের বাসভবন আক্রমণ করে। জামাতবিরোধী শিক্ষকদের পরিবার পরিজনকে লাঞ্ছিত করে, শিক্ষকদের হত্যার চেষ্টা চালায়। এ জন্য তারা ব্যবহার করে বোমা এবং গুলি। এ ধরনের ঘটনা যে বর্তমান সরকারের আমলে ঘটতে পারে তা অভাবনীয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক জানিয়েছেন, ঐ দিন ঘটনাচক্রে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. আলমগীর ঐখানে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে দ্রুত তিনি ক্যাম্পাসে আসেন। পুলিশ প্রশাসন তখন সক্রিয় ভূমিকা পালন করা শুরু করে এবং যাতে তারা সক্রিয় থাকে তার নির্দেশ তিনি দেন। এরপর শিক্ষকদের ঘরবাড়ি দেখেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। শিক্ষকরা বলেছেন, আমরা তাঁকে নিছক ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করব না। ঐ মুহূর্তে তিনি সাহস দেখিয়ে যে ভূমিকা রেখেছেন- তা না রাখলে আমরা অনেকেই মারা পড়তাম। কথা হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ড. আলমগীরের মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়। তা সত্ত্বেও জরুরী মুহূর্তে তিনি যদি ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারেন-তাহলে শিক্ষামন্ত্রী সেখানে গেলে কি পরিস্থিতির আরও উন্নতি হতো না? বলতে পারেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো অহরহ এ রকম ঘটনা ঘটছে, তাই বলে কি মন্ত্রীকে সবখানে দৌড়াতে হবে? না, তা হবে না। আমরা তা বলছিও না। কিন্তু ঘটনাটি ছিল অস্বাভাবিক ও অভাবনীয়। আজকাল কোথাও ধর্ষণ হলে বা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছুটে যান। রাজশাহীতে তিনি একবার গিয়েও জিজ্ঞেস করতে পারলেন না, পুলিশের সামনে কীভাবে প্রকাশ্যে ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীরা অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়ায়? কেন তৎকালীন পুলিশ কমিশনার কোনো ব্যবস্থা নেন নি? কাজে গাফিলতির জন্য তাঁকে বদলি করাই কি যথেষ্ট? আমরা ভুলে যাই, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি যাতে ক্ষমতায় আসে তার জন্য শিক্ষক-ছাত্ররা কী ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁরা তো বিনিময়ে কিছুই চান নি। কিন্তু, এই সরকার থাকতেও গুটিকয় জামাতী ক্যাম্পাসে যা তা করবে এবং সবাইকে মুখ বুজে থাকতে হবে এবং সরকার কোনো জোরাল ভূমিকা গ্রহণ করবে না-এ কেমন কথা? এ পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেছিলেন, এই কি ন্যায্য বিচার?

এ ঘটনার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রজ ও অনুজ কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁদের চোখেমুখে এখনো ভয় ও উদ্বেগের ছাপ। একজন জিজ্ঞেস করলেন, বেদনাহতভাবে, 'আপনারা কিছু করবেন না?' আপনারা বলতে তিনি ঢা. বি. শিক্ষক সমিতির কথা বলছিলেন। শিক্ষা বা জাতীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে ঢা. বি. শিক্ষক সমিতি সবসময় এগিয়ে আসে। প্রতিবাদ জানায়, মৌন মিছিল করে। এটি ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার শুষ্ক একটি বিবৃতি ছাড়া তারা আর কিছুই জানায়নি। একেবারে নির্বিকার ও নিশ্চুপ। সমিতির একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে আমি মুখ নিচু করে থেকেছি। বলেছি, ঢা.-বি.-বি. ব্যাপার হলে নিশ্চয় তারা কিছু করত। তিনি বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় ফেডারেশন?' না, তারাও নিশ্চুপ। সহকর্মীর এ জিজ্ঞাসার কারণ, দু-ক্ষেত্রেই এখন যাঁরা আছেন তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের দল হিসাবে পরিচিত। এ কারণেই তাঁদের বেদনাবোধ। না, আমরা কেউ এগিয়ে আসি নি যখন আমার বন্ধু-সহকর্মী লাঞ্ছিত

হয়েছেন। না, আমরা কেউ এগিয়ে আসিনি তখন। এখনো আমার বন্ধু সহকর্মীরা দিনে ভীত মুখে ঘুরে বেড়ান, রাতে ঘর ছেড়ে বেরোন না। না, কোনো দল, সংগঠন, আমরা জোরালভাবে বলি নি, কেন এ আমলেও শিবির কর্মীদের সন্ত্রাস আমাদের সহ্য করতে হবে? এটি আমাদের চরিত্র।

সন্ত্রাস দমনে সরকার আন্তরিক– এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু, রাজশাহী বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস তো ছোট একটি ঘেরাও করা এলাকা। সেখানে কিছু ছাত্র-অছাত্র প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে ঘুরছে এবং পুলিশ (সরকার) তাদের কিছুই করতে পারছে না- এতো অবিশ্বাস্য। তাহলে প্রশ্ন ওঠে- প্রকাশ্য ঘটনায় তারা কিছু করতে পারছে না, অপ্রকাশ্য সন্ত্রাসী তাহলে কীভাবে ধরা পড়ে, যেমন সুইডেন আসলাম? বা এত ক্ষুদ্র এলাকায় যদি সন্ত্রাসী নির্মূল না করা যায় তাহলে সারাদেশে কিভাবে নির্মূল করা যাবে সন্ত্রাস? শিবিরসন্ত্রাসীরা কি এতই শক্তিশালী যে, তারা রাষ্ট্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্রের? এতো অনেকটা বুকে বসে দাড়ি উপড়াবার মতো।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, রা.বি.তে এখন শিবিরের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু, জামাত আবার কিছু একটা ঘটাতে চাচ্ছে। নিজামীর সভা ও বক্তব্য তার প্রমাণ। স্বীকার করে নেয়া ভালো, আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং সরকার কেউ-ই এ ঘটনায় জোরাল ভূমিকা রাখি নি। সরকারের যেখানে নিতান্ত কঠোর হওয়ার কথা সেখানে হয় নি। নিরস্ত্র অসহায় শিক্ষকদের প্রতি ন্যায্য বিচার করিনি। আবারও রা. বি.তে হয়তো এমন ঘটনা ঘটবে। সে সূত্রেই রা.বি.র সেই শিক্ষকের প্রশ্নেরই প্রতিধ্বনি করছি- 'ন্যায্য বিচার কি পাওয়া যাবে না?'

১৯৯৬

প্রীতিলতা ও পলাশীর যুদ্ধ এবং আফগান তালেবান

বেশ কটি হরতাল/ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছে। উপলক্ষ কী? প্রথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ধরা যাক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ছাত্রীনিবাসের নাম রেখেছে 'বীর কন্যা প্রীতিলতা'। এ অঞ্চলের যাঁরা বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের নামে ছাত্র/ছাত্রীনিবাসের নাম রাখা ঐতিহ্যে পরিণত হওয়ার দরকার ছিল, যা হয় নি। প্রীতিলতার আগে আর কোনো মহিলা কি দেশের জন্য এমন আত্মাহুতি দিয়েছেন? তাঁর নামে, বাংলাদেশের যে কোনো একটি ছাত্রীনিবাসের নাম অনেক আগেই হতে পারত। ঢাকাতে হতে পারত, রাজশাহীতে হতে পারত। ঢাকায় ফয়জুননেসা হল হয়েছে। সামগ্রিক অবদান দেখতে হলে দুজনের আকাশ-পাতাল তফাৎ। আসলে এ ধরনের নামকরণের আগে মনে হয়, আমাদের প্রথম যে চিন্তাটি আসে তা হল ব্যক্তিটি মুসলমান কিনা। হয়তো অন্যান্য দেশেও তাই। যা হোক, সংবাদপত্রে দেখলাম, নাম দেয়ার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে একটি ছাত্রীনিবাসের নাম খালেদা জিয়া হল। জানি না, জাতীয় জীবনে তাঁর কি অবদান। সাধারণত অসাধারণ কিছু না করলে, জীবিতকালে রাজনীতিবিদদের নামে কোনো কিছুর নামকরণ করা হয় না। তবে বাঙালির তোষণক্ষমতা প্রশ্নাতীত। অনেক সময় তা লজ্জা ও নির্লজ্জতার ভেদরেখা রাখে না।

বর্তমান সরকার আসার পর ভেবেছিলাম, জামাত-শিবির, ইনকিলাবিদের দৌরাত্ম্য কমবে। কারণ এ সরকারের আমলেও যদি তাদের মস্তানি অব্যাহত থাকে তাহলে আর বিএনপি সরকারের সঙ্গে পার্থক্য কী? শিক্ষাঙ্গনের ক্ষেত্রে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে শিবির-ইনকিলাবিদের ঘাঁটি হিসাবে ধরা হয়। আসলে, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আবাসিক স্ট্যাটাস আর থাকা উচিত নয়। ছাত্রাবাস নির্মাণ করলে যদি তা শান্তির নিলয় না হয়ে, হয়ে ওঠে অশান্তিবাস তা হলে তা নির্মাণ না করাই ভাল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস দুয়েক আগে শিবিরের সন্ত্রাসীরা যে দক্ষযজ্ঞ চালিয়েছিল তা শিক্ষাঙ্গনের ইতিহাসে বিরল। এবং তাও করেছিল পুলিশের সামনে, নির্ভয়ে। পরে পুলিশ কমিশনারকে বদলি করা হয়। আমাদের এখন প্রশ্ন করা উচিত কর্তব্যে অবহেলার জন্য সরকারি চাকুরেদের শুধু বদলি করাই যথেষ্ট কিনা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রীর অসম্ভব নীরবতা সবাইকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখির পর রাজশাহীতে বোধ হয় এই প্রথম জামাত-শিবির সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় অভিযান শুরু হয়েছে। এবং তা যে জামাত শিবিরকে কি ক্ষুব্ধ করেছে তা তাদের মুখপত্র 'সংগ্রাম' ও 'ইনকিলাব' দেখলে বোঝা যায়।

রাজশাহীতে এখন তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডেকেছে।

এই মরিয়া হয়ে ওঠার একটি 'চেইন-রিঅ্যাকশন' আছে যার প্রতিফলন ঘটেছে চট্টগ্রামে। প্রীতিলতার নামে ছাত্রীনিবাসের নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডেকেছে। বিএনপি নেতা মীর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের নেতৃত্বে ৫২ জন আইনজীবী এক বিবৃতি দিয়েছেন যা প্রণিধানযোগ্য-"ওই মহিলা এতদঞ্চলের জাতিসত্তার বিকাশ ও শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়নের চরম বিরোধী ছিলেন।" এতে বলা হয়, "১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে কলকাতার লেজুড়বৃত্তি ছেড়ে ঢাকা কেন্দ্রিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়। মুসলমানসহ সাধারণ মানুষের দ্রুত উন্নয়ন সহ্য করতে না পেরে প্রীতিলতা গংরা বঙ্গভঙ্গ রদের সন্ত্রাসী আন্দোলন শুরু করে। তাদের সে আন্দোলন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ছিল না, তা ছিল এতদঞ্চলের মুসলিম উন্নয়নবিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলন।.....জনমতকে উপেক্ষা করে একজন বিতর্কিত ও মুসলমানবিদ্বেষী মহিলার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হলের নামকরণ উদ্দেশ্যেমূলক।"

উপর্যুক্ত একটি বাক্যও সঠিক নয়। বঙ্গভঙ্গের সময় প্রীতিলতার জন্ম হয় নি। তিনি প্রাণবিসর্জন দেন ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঘটনায় এবং সে লড়াই ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। বঙ্গভঙ্গের সময় পক্ষে-বিপক্ষে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই ছিল। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঢাকার 'নবাব' সলিমুল্লাহ। ব্রিটিশরা তাঁকে এ কারণে কয়েক লাখ টাকা দিয়েছিল। এ সম্পর্কিত ছাপান দলিলপত্র আছে। আবার বিপক্ষে ছিলেন কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মুসলমানত্বের দিক থেকে সলিমুল্লাহ থেকে তিনি ছিলেন অনেক ওপরে। আসলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর, অজ্ঞ দেখে মিথ্যাচার করে পার পাওয়া যায়। ধর্ম ব্যবসায়ীরা, সাম্প্রদায়িক মানুষেরা এই অজ্ঞতাকে ব্যবহার করেছে। এবং দেখা যাচ্ছে, বিএনপি এ ক্ষেত্রে জামাতকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে আহ্বান জানাব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটকে সমর্থন জানাতে এবং বিনএনপি'র মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরতে।

২২ জুন বিএনপি সিলেটে হরতাল ডাকে। ২৩ জুন ছাত্রদল সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করে। কারণ, 'বাজেটে শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অবৈধ মামলায় হয়রানি' করার প্রতিবাদে। উল্লেখ্য, বাজেট এখনও পাস হয়নি এবং শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে এ আশঙ্কা প্রকাশ করে বাজেট ঘোষণার পরদিনই আবার আমাদের অনেকে প্রতিবাদ জানিয়েছি। হয়ত মূল্যবৃদ্ধি হবে না। আর অবৈধ মামলা, "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তে প্রমাণ মিলেছে ওই তথ্য যথাযথ নয়। শুধু তাই নয়, দেখা গেছে কথিত হয়রানিমূলক মামলায় ১১০ টি দায়ের করা হয়েছে বিএনপি আমলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দায়ের করা মামলার সংখ্যা ৬৪টি। তাছাড়া, বিএনপি মহাসচিবের দেয়া তথ্যের মধ্যে ৫১ টি মামলার হদিস মিলে নি অর্থাৎ ৩৬৬টি মামলার ভিতর ৩১৫টি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।" [জনকণ্ঠ, ২২.৬]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইস্যু জোরালো নয়। মূল বিষয় ২৩ জুন আওয়ামী লীগ

সরকারের এক বছর পূর্ণ হবে। আওয়ামী লীগ সভা করবে। পত্র-পত্রিকায় এদিনটি ফলাও করে প্রচার হবে। বিএনপি বা জামাতের পক্ষে তা কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। এই সহ্য না হওয়ার আরেকটি উদাহরণ, ২৩ জুন পলাশী দিবস পালন। এ উদ্দেশ্যে যে সব বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে তাতে কারা এ দিবস পালন করছে তার নাম নেই। শ্লোগান হচ্ছে- আর পলাশী নয়। পত্রিকার বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে ধর্মব্যবসায়ীদের মুখপত্রে। ২২ তারিখ প্রেসক্লাবে বেগম জিয়া এ উপলক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। সুতরাং কারা এর উদ্যোক্তা তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

পলাসী দিবস পালন বা প্রীতিলতার নামে ছাত্রী নিবাসের নামকরণের আপত্তির মাধ্যমে বিএনপি-জামাত জানাতে চাচ্ছে, এগুলো জাতীয়তাবাদ বিরোধী। 'আর পলাশী নয়'-এ শ্লোগানের অন্তর্নিহিত অর্থ, বিএনপি'র পরাজয়ের মাধ্যমে "বাংলার রবি অস্তমিত হইয়াছে।" আওয়ামী লীগ হচ্ছে ইংরেজ। সুতরাং, আর পলাশী হতে দেয়া যাবে না। এ দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, বাংলাদেশজাত সবকিছুকেই তুলে ধরতে হবে। তাই যদি হয়, তাহলে সিরাজউদদৌলার বাঙালিত্ব নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন। যাইহোক, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে সাহায্য করেছিলেন হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল আর বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিলেন মুসলমান সেনাপতি মীর জাফর। এবং পলাশীর প্রান্তর বাংলাদেশে নয়। আর প্রীতিলতা? তিনি জন্মেছিলেন চট্টগ্রামে, ছিলেন বাঙালি, যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। যেসব ভদ্রলোক ও ছাত্র বিএনপি দর্শনে বিশ্বাসী, তাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা এসব প্রশ্নের উত্তর কি? উত্তর নেই। জ্ঞান পাপীদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক চলে না। তারা বিশ্বাসী পেশীতে। সেখানে যুক্তিতর্কের কোন স্থান নেই। উপর্যুক্ত উদাহরণগুলি অনেকের কাছে সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু তা একেবারে তুচ্ছ করার বিষয় নয়। এ উদাহরণগুলি থেকে একটি প্যাটার্ণ বেরিয়ে আসে। তা হলো, বিএনপি জামাত আগের চেয়ে এখন আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পরস্পর মিত্র তারা আগেও ছিল, এখন সে মৈত্রি আরও গাঢ় হয়েছে। আলোচনা করে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছে। শত্রু হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিসমূহ। সে পরিপ্রেক্ষিতে, আওয়ামী লীগের সরকার গঠন গণতন্ত্রের স্বার্থেও তাদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ, এমন কোন ইস্যুও পাওয়া যাচ্ছে না যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে আলোড়িত করা যাবে। সুতরাং, তারা বিভিন্ন অ-ইস্যু বেছে নিয়ে, বিভিন্ন জায়গায় অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষাঙ্গন সম্পর্কে আমাদের ক্ষুদ্র একটি বক্তব্য আছে। সরকার যদি চায় শিক্ষাঙ্গনে শিবির-সন্ত্রাস থাকবে না তাহলে কি শিবিরের পক্ষে সন্ত্রাস চালান সম্ভব? তারা কি রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র? তাই যদি হয়, তাহলে সে রাষ্ট্র ভেঙ্গে দেয়াই যুক্তিযুক্ত। সরকার সক্রিয় হলে এরা পিছু হটতে বাধ্য। সম্প্রতি রাজশাহীতে পুলিশ সক্রিয় হয়েছে এবং শিবির মস্তানরা ধরা পড়ছে। সাধারণ মানুষও এখন এগিয়ে আসছে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী রাজশাহীতে শিবিরের হুমকি অকার্যকর হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ সরকারে দোদুল্যমানতা না থাকলে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। চট্টগ্রামে পুলিশ সক্রিয় হবে, এ খবর পেয়ে এখন জানা গেল, শিবির ধর্মঘট প্রত্যাহার করে পাঁচদিনের

গণযোগযোগ কর্মসূচি দিয়েছে। তারা এতই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে, ২৩ জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষণা করেছে, "পুলিশ বাধা দিলে আমরা হবো আফগান তালেবান।....বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে বহিরাগতদের এনে তারা ক্যাম্পাসে জমায়েত করছে বলে জানা যায়। [এবং তারা] এখন তালেবানের ভূমিকা গ্রহণের হুমকি দিচ্ছিল তখন ক্যাম্পাসে অবস্থান করছিল পুলিশের বিরাট বহর। বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকরাও শিবিরের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে রোববার এ ব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছেন।" [সংবাদ, ২২.৬]

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলব, সরকার যদি তালেবানি কর্মকাণ্ড সহ্য করতে না চান তা হলে অবিলম্বে সেখানে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। অ-ইস্যুকে ইস্যু করার সুযোগ দেয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সন্ত্রাস/হুমকি যে রকমই হোক, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা উচিত। ক্ষমতার মোহ, ধর্ম ব্যবসা, অজ্ঞতা, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিলে অন্তিম পরিণতি কি হয় তা প্রতিফলিত হয়েছে নির্মূল কমিটির সাম্প্রতিক এক পোস্টারে। ইনকিলাবের এক অনুষ্ঠানে বেগম জিয়া মধ্যমণি। একপাশে বহুবার দলবদলকারী ও ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সহযোগী হিসেবে পরিচিত আনোয়ার জাহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের সময় বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী আলবদর স্কোয়াডের প্রধান মতিউর রহমান নিযামী। অন্যপাশে বহুবার দলবদলকারী মওদুদ আহমেদ ও ১৯৭১ সালে আলবদর সহযোগী হিসেবে পরিচিত, যুদ্ধাপরাধী, বর্তমানে ইনকিলাবী 'আন্দোলন'-এর নেতা রাজাকার আবদুল মান্নান। শুধু তাই নয়, একই কারণে এক সময়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান নিষিদ্ধ জামাতকে রাজনীতির অনুমতিই শুধু দেননি, যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। দুদিনের ক্ষমতার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা ও একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীর কি পরিণতি!

২৫.৬.১৯৯৭

পাকি দালালদের নতুন টার্গেট

'দৈনিক ইনকিলাবের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। ইনকিলাবের জন্মের পর থেকেই শুরু হয়েছে এই ষড়যন্ত্র।' লিখেছে ১ জুলাইয়ের ইনকিলাব। উপর্যুক্ত সংবাদটির শিরোনাম 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ঃ ভারতীয় দালালরাই ইনকিলাবে বিজ্ঞাপন বন্ধের পক্ষে মত দিয়েছে।' ষড়যন্ত্র যদি চলত তাহলে 'ইনকিলাব' গত ১২ বছর ধরে বেরুত না। সমস্যা হচ্ছে 'ইনকিলাব' বিরোধিরা ষড়যন্ত্রে অভ্যস্ত নয়। যদি তারা ষড়যন্ত্রে অভ্যস্ত হতেন তাহলে নিজেদেরকে তারা সবার টার্গেট হিসেবে দাঁড় করাতেন না। আর জন্মের পর থেকে যড়যন্ত্র; পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা মাদ্রাসার গরিব শিক্ষকদের টাকা মেরে মূলধন জোগাড় করেছে। বাংলাদেশের স্বৈরাচারী শাসক বলে খ্যাত লে.জে.(অবঃ) এরশাদ বলেছেন, 'দাড়িঅলা খচ্চর' তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে 'ইনকিলাব' প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ সামরিক শাসক, পতিত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্যোক্তাদের ষড়যন্ত্রে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই। স্বাধীনতার পর যাদের বর্জ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল, সেই পাকি দালালদের পুনর্বাসিত করা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জিইয়ে রাখা। কারণ, এতে সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসকদের সুবিধা হয়।

পাকি দালালদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আমরা সচেতন ছিলাম না। আমরা কিছু ভুল করেছিলাম। স্বাধীনতার পর স্বাধীনতা বিরোধীদের দেশে থাকতে দেয়া উচিত হয়নি। খোমেনি ইরানে পদার্পণ করে শাহপন্থিদের সাফ করে দিয়েছিলেন। তাই নির্বিবাদে ইরানে 'ইসলামী বিপ্লব' চলছে। হানাদার পাকি দালালদের প্রিয় সংগঠন জামাত যখন গর্ত থেকে বেরিয়ে ইতিউতি তাকাচ্ছে তখন আমরা সাবধান হইনি। তার পরিণাম তো দেখছি-ই। ইনকিলাবি বা পাকি ষড়যন্ত্র এতদিন চলতে দেয়া হয়েছে আর তাই রাজনীতি আজ বিদ্বেষময় হয়ে উঠেছে।

'দৈনিক দিনকাল' নয় এখন 'ইনকিলাব' হয়ে উঠেছে পাকিপন্থী, রাজাকারপন্থী, সাম্প্রদায়িকদের প্ল্যাটফর্ম, যার মধ্যে অন্তর্গত বিএনপি, জামাত এবং তথাকথিত ইসলামপন্থি দলসমূহ। এটি যাতে পাঠকরা অনুধাবন করেন তাই 'ইনকিলাব' বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতা পক্ষের চারজন বুদ্ধিজীবী। বিজ্ঞাপন দেয়ার অর্থ পৃষ্ঠপোষকতা করা। রাজাকারী মতবাদ যাতে পৃষ্ঠপোষকতা না পায় সেজন্যে তারা 'ইনকিলাব'-এ বিজ্ঞাপন না দেয়ারও অনুরোধ জানিয়েছিলেন। 'ইনকিলাব' তখন চারবুদ্ধিজীবীকে টার্গেট করে। কিন্তু দেখা যায়, তাতেও কিছু হচ্ছে না, সার্কুলেশন কমছে, বিজ্ঞাপন কমছে। তার ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের প্রস্তাব- ইনকিলাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর কোনো বিজ্ঞাপন যাবে না। এ ঘোষণার একটি প্রতীকী দিক

আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান যখন প্রস্তাব পাস করে ইনকিলাব-এ বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়- তার অর্থ এ পত্রিকায় গোলমাল আছে, অর্থাৎ এটি পত্রিকা নয়। সমাজে, রাষ্ট্রে এ প্রস্তাব প্রভাব ফেলবেই। প্রস্তাব পাসের দিনই বোধহয় ইনকিলাব-এর উদ্যোক্তাদের শরীরে বিছুটি পাতা ঘষে দেয়া হয়েছে। তাদের নতুন টার্গেট এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার প্রতিবাদী শিক্ষকগণ। তারই প্রতিফলন দেখছি গত কয়েক দিনের ইনকিলাব-এ। অশালীন ভাষার আরেক নাম 'ইনকিলাবী ভাষা'। সে ভাষায় পত্রিকাটি আজকাল কী লিখছে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি-

১. 'গত শনিবার ২৮ জুন জনৈক সাদ উদ্দিন নামক একজন শিক্ষক এবং মান্নান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় ইনকিলাবকে নিয়ে লেগে পড়েন।....এই সাদ উদ্দিন এবং মান্নান চৌধুরী তাদের বক্তব্যে বলেন যে, ইনকিলাব নাকি স্বাধীনতা বিরোধী এবং (তাদের ভাষায়) ৪ জন বরেণ্য বুদ্ধিজীবীকে হেয় করা হয়েছে।'

অধ্যাপক সাদ উদ্দিন চল্লিশ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। 'ইনকিলাব'- এ যারা সাংবাদিকতা করেন তাদের অনেকের জন্মের আগে থেকেই। তিনবার বিশ্ববিদ্যালয় ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিটি গণআন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। ইনকিলাবী ভাষায় তিনি হলেন 'জনৈক'। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার মওলানা ও আলবদরদের সহযোগিতায় পাকি হানাদাররা অধ্যাপক সাদ উদ্দিনকে যখন জেলে নিয়ে যায়, তখন ইনকিলাবের জন্মদাতারা পাকি হানাদারদের পদলেহনে ব্যস্ত ছিল। রাগটা ওইখানেই।

মান্নান চৌধুরী হলেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, ঘাতক দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটির সচিব। ইনকিলাব-এর ভাষ্য অনুযায়ী 'সিন্ডিকেটে' নয় সিনেট সভায় অধ্যাপক সাদ উদ্দিন ইনকিলাবে বিজ্ঞাপন না দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং অধ্যাপক চৌধুরী তা সমর্থন করেছিলেন। নিতান্ত অসুস্থ মনের না হলে কেউ এ ধরনের বাক্য লিখতে পারে কারো সম্পর্কে!

২. ইনকিলাব-এ বিজ্ঞাপন না দেয়ার অন্য অর্থ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাকশালী ভূত আশ্রয় নিয়েছে।' [৩.৭]। অধ্যাপক সাদ উদ্দিন বাকশালে ছিলেন না। বরং উপাচার্য বলেছেন, তিনি নিরপেক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারিদের মধ্যে নিরপেক্ষ হওয়ার অবকাশ কম। নিরপেক্ষ থাকার অর্থ মুক্তিযুদ্ধের অপর পক্ষকেও পরোক্ষ সমর্থন দেয়া। সুতরাং 'বাকশালী ভূত' এল কোথায়!

সংক্ষেপে শুধু বলতে চাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে কাজটিই করেছে যা তার করা উচিত ছিল অনেক আগেই। কারণ এ প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলার প্রতিষ্ঠান, পেছনে ফিরে যাওয়ার প্রতিষ্ঠান নয়।

এরপর 'ইনকিলাব' তার সমর্থকদের জমানো প্রতিবাদ ছাপিয়েছে। এ ধরনের কিছু প্রতিবাদ বোধহয় তাদের কাছে জমা থাকে। কারণ সব ইস্যুতে প্রতিবাদের ভাষা ও সুর একই রকম; শুধু ইস্যুর বিষয়টি বদলে যায়।

কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য অন্য। 'ইনকিলাব'-এর পক্ষে রাজনৈতিক দলের মধ্যে

জামাত শুধু সমর্থন দিয়েছে (১০/১২ জন সদস্য সম্বলিত দলগুলোকে রাজনৈতিক দল হিসেবে ধরছি না)। বিএনপি এখনো দেয় নি। তবে হয়তো দেবে। ছাত্রদল ইতিমধ্যে রাজাকার পাকিদের পত্রিকাটিতে জোরালো সমর্থন দিয়েছে যা নিতান্ত দুঃখজনক। আধুনিক কোনো দল, প্রগতি বিরোধী দলকে সমর্থন করতে পারে না। করলে তার সদস্যদের সঙ্গে তালেবান সদস্যদের কোনো পার্থক্য থাকে না। শুধু তাই নয়, ওই সংখ্যায় শুধু আজিজ পাইপস, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও গোপালগঞ্জের বিচারকের ছোট তিনটি বিজ্ঞাপন আছে [ক্লাসিফায়েড অল্প কিছু বাদে]। আমাদের অনুরোধ আজিজ পাইপসের শেয়ার হোল্ডাররা কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করুন কোনো মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পত্রিকায় সংস্থায় বিজ্ঞাপন যাবে? প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতিও একই অনুরোধ থাকবে। বঙ্গবন্ধুর 'দেশ' গোপালগঞ্জের বিচারক এম এ শহীদুর রহমান কি বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্যে এর চেয়ে জনপ্রিয় কোনো পত্রিকা খুঁজে পান নি? পরের দিনও প্রায় একই অবস্থা। 'এরোমেটিক' সাবান বিক্রেতারা হালাল সাবানের বিজ্ঞাপন দিয়েছে শুধু। যারা ইনকিলাব-এ বিশ্বাস করেন না তারা এরোমেটিক ব্যবহার করবেন কিনা ভেবে দেখুন। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল ও পৃষ্ঠপোষকরা [বিজ্ঞাপনদাতারা] ইনকিলাব থেকে দূরে থাকতে চাইছে।

৩. টেলিভিশনের ওপরও ইনকিলাব ক্ষিপ্ত। ইনকিলাবী ভাষায়-'বাংলাদেশ টেলিভিশন অনুষ্ঠানে ইনকিলাবের নাম ধরে ইনকিলাবের বিরুদ্ধে হলাহল উদগীরণ, টেলিভিশন তথা সমস্ত সরকারি তথ্য মাধ্যমের নীতিমালার জঘন্য বরখেলাপ। কোন্ ধরনের কথা সম্প্রচারিত হবে এবং কোন্ ধরনের কথা হবে না-সে সম্পর্কে টেলিভিশনের সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন রয়েছে। টেলিভিশনের নিজস্ব অনুষ্ঠানে টিভির প্রতিষ্ঠা সাল থেকে '৯৭ সাল পর্যন্ত এই ৩৩ বছর সুদীর্ঘ সময়ে কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতার নাম ধরে কোনোদিন কোনো গালাগালি করা হয় নি।

টেলিভিশন একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এমন একটি প্রতিষ্ঠানে যাতে কোন দল, নেতা বা পত্রিকাকে যদি স্বাধীনতার শত্রু বলে অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে সে অভিযোগ অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। কারণ, এটি একটি গুরুতর অভিযোগ। স্বাধীনতার বিরোধিতা করা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সর্বোচ্চ শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড।'

দুইযুগ পর টেলিভিশন সঠিক আচরণটিই করেছে। এতদিন টিভি ছিল পাকিপন্থিদের মুখপত্র। এই প্রথম টিভিতে সত্য কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ গোলাম আযম যুদ্ধাপরাধী সে কথা বলা হয়েছে। জামাত মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দল- তা বলা হয়েছে। সত্য কথা কি গালাগাল? গোলাম আযম বা নিজামী স্বাধীনতার শত্রু না মিত্র? বাংলাদেশ টেলিভিশন আগে এ ভূমিকা নেয়নি দেখে আজ ইনকিলাবীদের দৌরাত্ম্য আমাদের দেখতে হচ্ছে। 'ইনকিলাব' একটি খবর দেয়নি, সেটি আমিই দিচ্ছি। ২৫ জুন টিএসসি-তে জাহানারা ইমামের ওপর যে আলোচনা অনুষ্ঠান হয় তা প্রায় আধঘন্টা ধরে বাংলাদেশ বেতার প্রচার করেছে।

চারজন বুদ্ধিজীবী যখন ইনকিলাব বর্জনের আহ্বান জানান তখন অনেকে এটিকে

হাস্যকর বলেছিলেন, গণতন্ত্রসুলভ আচরণ নয় বলেছিলেন। নির্মূল কমিটির আন্দোলনের সময়ও এ ধরনের কথাবার্তা আমরা শুনেছিলাম। গণতন্ত্রে ফ্যাসিবাদী প্রবক্তা, মুক্তিযুদ্ধের চেতান বিরোধী প্রবক্তার কোনো স্থান নেই। আজ দেখা যাচ্ছে সেই চারজনের আহ্বানে অনেকেই সাড়া দিচ্ছেন। তার প্রতিক্রিয়া তো 'ইনকিলাব'-এ দেখছি। বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠকরা ক্রমেই বর্জন করছে পত্রিকাটি; বিদেশি মিশনগুলোতে এ পত্রিকা সরবরাহ বন্ধের পথে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে আহ্বান জানিয়েছে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাতে সাড়া দেবেই বলে আশা রাখি। রাজনৈতিক গোষ্ঠী, দলও দু'বার ভাবছে এখন 'ইনকিলাব'-কে সমর্থন দিতে।

যারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে বড় বড় কথা বলেন তাদের জিজ্ঞেস করি, ইনকিলাব যখন মিথ্যা সংবাদ ছাপে, চরিত্র হনন করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিনাশ ঘটায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী সংবাদ ছাপে, পাকি দালালদের বড় করে তোলে, তখন আপনারা কি 'ইনকিলাব'-এর বিরুদ্ধে বলতে লজ্জা পান? এগুলো হচ্ছে হিপোক্র্যাসী। আমরা 'ইনকিলাব' ও এধরনের পত্রিকার বিরুদ্ধে বলি এবং বলব- কারণ এগুলো পত্রিকা নয়। কৈ আমরা তো অন্য কোনো পত্রিকা বর্জনের আহ্বান জানাই না। আমরা কখনো পাকি দালাল, সাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের প্ল্যাটফর্ম-কে সমর্থন করতে পারি না। 'ইনকিলাব' তাদের একটি প্ল্যাটফর্ম, পত্রিকা নয়- এটিই সবাইকে মনে রাখতে বিনীত অনুরোধ জানাই।

৭.৭.১৯৯৭

রাষ্ট্রপতিকে পাদুকা প্রদর্শন ঃ যা হবার তাই হয়েছে!

আমরা বললে মনে করা হয়, এরা তো বলবেই। রাজনীতির তারা কী বোঝে? অযথা কতিপয় বুদ্ধিজীবী সরকারের সমালোচনা করে। এখন ঘটনা ঘটেছে, আরও ঘটবে। এখন আমরা বলতে পারি, এই তাদের রাজনীতির বুঝ? আর এই বুঝের কারণেই এসব রাজনৈতিক নেতা বিভিন্ন সময় আমাদের বিপাকে ফেলেছেন। একথা মনে হল সংবাদপত্রে রাষ্ট্রপতিকে পাদুকা প্রদর্শনের খবর পড়ে। এ ঘটনার বিশ্লেষণ অনেকে অনেকভাবে করবেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার একটি সরল কথাই মনে হয়েছে-যা হবার ছিল তাই হয়েছে। আমরা ছাত্রদের পড়ানোর সময় মান্ধাতা আমলের একটি পদ্ধতি ব্যবহার করি- ঘটনার কারণ ও তাৎক্ষণিক কারণ। কারণ আকস্মিকভাবে কোনোকিছু খুব কমই ঘটে। ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর মধ্যে পবিত্র অনুষ্ঠান পণ্ড ও রাষ্ট্রপতিকে পাদুকা প্রদর্শন ও নিক্ষেপ আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। এর উৎপত্তিও বিকাশ হয়েছে এবং হচ্ছে অনেকদিন থেকেই।

না, আমি ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করতে চাই না। ঐ সময় পাকি মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ও স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতার কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছিল-তা আমরা জানি। মুক্তিযোদ্ধা শব্দটি তখন থেকেই বিতর্কিত হয়েছে। বর্তমান ঘটনার শিকড় নিহিত এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময়। ঐ সময় দুই প্রধান জোটের পাশাপাশি জামায়াতও আন্দোলন শুরু করে এবং দুই জোটই জামায়াতকে আন্দোলনের অংশীদার করে তোলে। অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধী ও ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষণকারীদের দল হিসাবে পরিচিত জামায়াতকে সামাজিক ও রাজনৈতিক একসেপটেন্স দেয়া হয়। আমরা তখন দুই জোটেরই সমালোচনা করেছিলাম এবং এ কথাও বারবার বলেছিলাম-বাঘ কখনো ঘাস খায় না। ১৯৯০ সালের নির্বাচনের সময় আমরা দেখলাম বিএনপি জামায়াতের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গঠন করল। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে যে বিএনপি একটি ফল্‌স ধারণা দেয় তা আবারও প্রমাণিত হল। জাহানারা ইমাম যখন ঘাতকদালালবিরোধী আন্দোলন শুরু করলেন তখন বিএনপি 'মুক্তিযোদ্ধা'রা ঘাতকদের পক্ষাবলম্বন করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা আনল ২৪ বরেণ্য বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে। বিএনপির এই পক্ষাবলম্বন জোর মদদ যোগায় যুদ্ধাপরাধী, ঘাতক, পাকি দালাল ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের। সমাজ, রাজনীতিতে তারা তাদের অবস্থান পোক্ত করে নেয়। এদের শক্তি সঞ্চয়ের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায় মধ্যযুগীয় মাদ্রাসা, ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রভৃতি।

বিএনপি বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে আওয়ামী লীগ এদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করে। আমরা এর সমালোচনা করেছিলাম। তখন আঃ লীগের নেতারা বলেছিলেন, এটি

রাজনৈতিক কৌশল। রাজাকারদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন কী ধরনের কৌশল তাঁরাই জানেন। সরকারে আসার পরও এই নমনীয়তা প্রদর্শন হ্রাস পায়নি।

গত এক বছর ধর্ম ব্যবসায়ীরা যখন নানা কর্মকাণ্ড শুরু করে তখনও আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি আইনী প্রক্রিয়ায় এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। কিছু করা হয়নি। কয়েকটি উদাহরণ দিই -

১. কয়েকদিন আগে ইসলামী ফাউন্ডেশন বিভিন্ন গ্রন্থাগারের জন্য কয়েক লাখ টাকার বই কিনেছে। এতে মুক্তিযুদ্ধের কোনো বই, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বই নেই। এ ব্যাপারে মহাপরিচালকও বিরত থেকেছেন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে, যদিও তাঁর নিয়োগ এই আমলে। আমাদের এ তথ্য ভুল হয়ে থাকলে ধর্ম সচিব তদন্ত করে দেখুন বিষয়টি সত্যি কিনা।

২. বায়তুল মোকাররম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আর কোনো খতিব এত বিতর্কিত হন নি রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় কারণে, যা হয়েছেন বর্তমান খতিব উবাইদুল হক। '৯৪ সালের ২৯ জুলাই ধর্ম ব্যবসায়ীদের এক সমাবেশে এই খতিব বলেছিলেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একদল লোক গাদ্দারি করে পাকিস্তান ভেঙ্গেছিল। এখন আবার গাদ্দারি শুরু করেছে।" এই রাষ্ট্রদ্রোহী উক্তির পর আমরা তাঁর অপসারণ দাবি করেছিলাম। এমনকী তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা জিল্লুর রহমান বলেছিলেন, "স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ৩০ লাখ শহীদের রক্তে সিক্ত আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু লোকের গাদ্দারি বলে যে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা হয়েছে তা শুধুমাত্র ধৃষ্টতা নয়, এটা আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতাকে সরাসরি অস্বীকার করারই নামান্তর এবং দেশদ্রোহীতার শামিল।" তারপর সেই বিরোধী দল সরকারে এসেছে। খতিব তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। কোনো ব্যবস্থাই নেয়া হয় নি তাঁর বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, জনাব রহমান তখন আরও বলেছিলেন, "একজন সরকারী কর্মচারী হয়েও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী প্রকাশ্য বিবৃতি দেয়ার পরও যদি তাঁর বিরুদ্ধে কোনোরূপ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া না হয় তাহলে দেশবাসী সঙ্গত কারণেই মনে করবে যে, এ সরকারই প্রত্যক্ষভাবে দেশদ্রোহীদের লালনপালন করছে।" এখন তিনি কী করবেন?

৩. চরমোনাইর পীর ঐ একই সভায় বলেছিলেন "যারা মৌলবাদী নয় তারা মুসলমানের জারজ সন্তান" (আজকের কাগজ ঃ ২০.৭)। শুধু তাই নয়, এরপর তিনিও তার সহযোগীরা বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বানাবার হুমকি দিয়েছেন, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মুরতাদ ঘোষণা করেছেন। সরকার বা আওয়ামী লীগ তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া দূরে থাক, কোনোরকম প্রতিবাদ জানায় নি। এ প্রশ্নও করা হয়নি-যে মুসলমান, দেশ সম্পর্কে এমন মন্তব্য করে সে আদৌ ধর্মপ্রাণ মুসলমান কিনা?

এভাবে এরা সংগঠিত হয়েছে। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিএনপি ও এদের মুখপত্র হিসাবে কাজ করছে আলবদরীয় পাকি হানাদার বাহিনী মনোভাবের পত্রিকা-দৈনিক ইনকিলাব।

এখানেই তারা থেমে থাকে নি। প্রশ্রয় পেয়ে তারপর তারা শিখা চিরন্তনকে নিভানোর জন্য হুমকি দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় অতিথি তুরস্ক ও ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের গাড়িতে ঢিল ছুড়েছে। ঘোষণা করেছে "আমরা হব তালেবান। বাংলা বানাবো আফগান।" হরতাল করেছে। কোনোভাবেই এদের প্রতিরোধ করা হয়নি। পাদুকা প্রদর্শনের পটভূমিকা এভাবেই তৈরি হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি চিরদিন ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেছেন। জানি না, সাধারণ মানুষ বা রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি বিচারক ছিলেন। কিন্তু তারপরও বঙ্গবন্ধু মুজিব ও জেনারেল জিয়াকে একই মানদণ্ডে বিচার করেছেন। রাষ্ট্রপতিকে অকারণে পাদুকা প্রদর্শন বিনা কারণে অবশ্যই গর্হিত কাজ। এখন তিনি বা সরকার বুঝতে পেরেছেন তাদের অপমান করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের বিশিষ্টজনদের যখন মুরতাদ ঘোষণা করা হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র আনয়নে যাঁদের অবদান কোন ক্ষেত্রেই কম নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসিত গালাগাল যখন করা হয় তখন সরকার একটু অপমানিত বোধ করলেন না? ধর্মমন্ত্রী তখন তো বলেননি, স্বাধীন দেশে বিনা কারণে কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করা অপরাধ- যারা করে তারাই মুরতাদ। আমাদের মূল বক্তব্য, তারা মানুষে মানুষে প্রার্থক্য করেছে যা বিচার, সমাজ, রাজনৈতিক কোন দিক থেকেই যুক্তিযুক্ত নয়।

এরপর তারা করেছে হরতাল। এ ব্যাপারে যথাযথ প্রতিরোধ করা হলে তা হতো না। আর হরতালও করতে পারাটাই হচ্ছে পাদুকা প্রদর্শনের তাৎক্ষণিক কারণ। তবে সাধারণ মানুষের কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আর যাই হোক ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান পণ্ড করতে পারে না। আর এটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য বিএনপি-জামায়াত এসব ধর্ম ব্যবসায়ীকে মদদ দিচ্ছে।

যখন তারা মাথা তুলছে তখন প্রতিরোধ করলে ধর্ম ব্যবসায়ীরা আজ এত সাহস পেত না। এর উদাহরণ সমন্বয় কমিটি, আঃ লীগ ও অন্যরা মাঠে নামামাত্র এরা পিঠটান দিয়েছে। শিখা চিরন্তন নিভানোর জন্য যে সাধের লং মার্চের ঘোষণা ধর্ম ব্যবসায়ীরা দিয়েছিলেন তাও বাতিল করা হয়েছে। যাক, পাদুকা প্রদর্শনকারীরা আমাদের মতো নিরীহদের খানিকটা উপকার করেছেন। রাষ্ট্রপতি ও সরকার বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের অপমান করা হয়েছে এবং এ সব নাশকতামূলক কাজ আর বরদাশত করা যায় না। কঠোর হতে হবে। আমরা ধরে নিচ্ছি খতিবকে অপসারণ করলে ধর্মব্যবসায়ীরা আবার মাঠে নামার চেষ্টা করবে। বিএনপি-জামায়াত এদের মদদ যোগাবে। এদের প্রতিরোধ করার জন্য যদি আমরা সবাই সতর্ক না হই তাহলে অবশ্যই তারা দেশে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করবে। আওয়ামী লীগ যদি মনে করে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে হবে-তাহলে জড়তা ভেঙ্গে রাস্তায় নামতে হবে। এখানে আর 'কৌশল' বলে এড়িয়ে যাবার সময় নেই; নাকি দেশে গৃহযুদ্ধ অবস্থা হলে তারা বুঝবেন যে সরকার ও সাধারণ মানুষ বিপন্ন।

২২.৭.১৯৯৭

ক্ষমতায় থাকলে শ্রদ্ধাঞ্জলি না থাকলে অগ্নিপূজা

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গত ২৬ মার্চ 'শিখা চিরন্তন' স্থাপিত হয়েছে। বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম জিয়া বলেছেন তা অগ্নিপূজার শামিল। চরমোনাইর পীর, মওলানা আজিজুল হক বা যারা পাকিস্তান ভাঙ্গাকে গাদ্দারি মনে করেন—এ রকম অনেকে মিটিং-মিছিল করে বলেছেন, শিখা চিরন্তন ইসলাম ধর্ম বিরোধী কাজ, শেরক্। জানি না ইসলামে কোথায় পীরবাদ আছে, জানি না ইসলামের কোথায় ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

শিখা চিরন্তন একটি প্রতীক। সেই প্রতীকটি হলো মুক্তিযুদ্ধের। মুক্তিযুদ্ধে অগণিত মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছেন, নিগৃহীত, ধর্ষিত হয়েছেন। তাদের দানে বাংলাদেশে আজ আমরা বসবাস করছি। সরকার চেয়েছেন তাদের স্মৃতি যেন অম্লান থাকে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যাতে অনির্বাণ থাকে, তাই শিখা চিরন্তন—একটি প্রতীক মাত্র।

গত কুড়ি বছর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগ সরকারে আসতে পারেনি। তাই শিখা চিরন্তন স্থাপন করা যায়নি। তবে আরো আগে বিভিন্ন সেনানিবাসে স্থাপিত হয়েছে শিখা অনির্বাণ। কারণ, ঐ একই। ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

এ দু'টি শিখার মধ্যে পার্থক্য কী? একটি সেনানিবাসে। অন্যটি, যেখানে স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বান জানানো হয়েছিল ও যেখানে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল সেখানে। একটি নামের শেষে অনির্বাণ, অন্যটির চিরন্তন, অর্থ প্রায় এক। বাংলাদেশের গ্যাসেই তা জ্বলছে, জ্বলবে। ভারত থেকে আমদানিকৃত গ্যাসে নয় এবং দু'টি শিখাই যারা স্থাপন করেছেন তারা হিন্দু নয়—মুসলমান এবং একজন তো কয়েকবার হজ করেছেন। তবুও বেগম জিয়া বলেছেন, শিখা চিরন্তন অগ্নিপূজা।

বিএনপি নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে দাবি করে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমানের অনেক ছবি পাওয়া যাবে যেখানে দেখা যাবে জেনারেল জিয়া 'স্মার্টলি' শিখা অনির্বাণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছেন।

তাহলে ধরে নিতে হবে বেগম জিয়ার ভাষায় যে জেনারেল জিয়া ছিলেন অগ্নিউপাসক? উল্লেখ্য, সামরিক শাসকরা ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করেছেন এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। সে জন্যই কি স্বাধীনতাবিরোধীরা সশস্ত্র কোনো সামরিক শাসককে অগ্নিউপাসক বলতে দ্বিধা করে? না হলে শেখ হাসিনা ধর্মবিরোধী কাজ করেন, শেরক্ করেন আর জেনারেলরা একই কাজ করলে তা শেরক্ বা ধর্মবিরোধী হয় না?

২১.১১.৯৪ সালে তোলা বেগম জিয়ার ছবিটি দেখুন। কী দেখছেন? শিখা অনির্বাণের সামনে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। সামরিকবাহিনী স্যালুট করছে। বেগম জিয়া এখন বলেছেন শিখা প্রতিষ্ঠা অগ্নিপূজা। তাহলে এই ছবির মানে কি এই যে, প্রধানমন্ত্রী হয়ে বা ক্ষমতায় নিজে থাকলে শিখার সামনে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি আর ক্ষমতায় না থাকলে অন্যরা একইভাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলে তা হয় অগ্নিপূজা?

২১.১১.৯৫ সালের আরেকটি ছবিও রয়েছে আমাদের সংগ্রহে। মুক্তিযুদ্ধের সময় শান্তি কমিটির সদস্য, বিএনপি আমলের স্পিকার ও প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস সুসজ্জিত হয়ে শিখা অনির্বাণে পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন। বেগম জিয়া বলেছেন, শিখা চিরন্তন অগ্নিপূজা। স্বাধীনতাবিরোধী বা বিএনপির প্রেসিডেন্ট পুষ্পমাল্য অর্পণ করলে হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি আর শেখ হাসিনা করলে হয় অগ্নিপূজা! যদিও গত ২৬ মার্চ দু'টি মুসলমান রাষ্ট্রের প্রধানও একই সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একই উদ্দেশে গিয়েছিলেন।

আমরা যা বুঝলাম তাহলো চরমোনাই থেকে জামাত বা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত করলে 'শিখা'-কে বলতে হবে অগ্নিপূজা, ক্ষমতায় না থাকলে বলতে হবে অগ্নিপূজা। সেনানিবাসে 'শিখা' থাকলে নিশ্চুপ থাকতে হয় অথবা দিতে হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এভাবে কতিপয় রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের রাজনীতিতে দিনকে রাত করছেন। তারপরও বলুন, এ রাজনীতিকে শ্রদ্ধা করতে হবে? তারপরও এ ধরনের রাজনীতিবিদদের শ্রদ্ধা করতে হবে? তবুও আমরা তাদের শ্রদ্ধা করতে চাই, চাই আমাদের চেয়ে সততার ভাগ যেন তাদের মধ্যে বেশি থাকে। বেয়াদবি নেবেন না, বা জানে মারার হুমকি যদি না দেন তাহলে অতি বিনীতভাবে বলব, আমরা সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, আপনারা তার যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠুন। রাজনীতি যেন নিছক ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার না হয়ে ওঠে।

৯.৪.১৯৯৭

খতিব সরকার বনাম বাংলাদেশ সরকার

বিষয়টি এখনো আলোচিত এবং আলোচিত হবে যতদিন এর একটা সুনিষ্পত্তি না হয়। কে রাজত্ব করবে বাংলাদেশে- খতিব সরকার না বাংলাদেশ সরকার? বিষয়টিকে এখন এভাবেও দেখা যেতে পারে। যে খতিব মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে প্রকাশ্যে বলেন, 'গাদ্দার'রা পাকিস্তান ভেঙ্গেছে, তারপরেও তিনি খতিব থেকে যান বায়তুল মোকাররমে বহাল তবিয়তে, খালেদা জিয়ার আমলে, শেখ হাসিনার আমলেও। তাঁর পক্ষে রাস্তা দাপিয়ে বেড়ান চরের পীর, ঐক্যজোটের অদ্ভূত উপাধিকারী ব্যক্তি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দাবিদার আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ করে না, সরকার নিশ্চুপ। এতদিন এই ছিল অবস্থা। আমরা গুটিকয় ব্যক্তি রাস্তায় হৈ চৈ করি। ক্ষমতাসীনরা (যখন যে থাকে) আমাদের করুণার দৃষ্টিতে দেখে। আজ এতদিন পর রাষ্ট্রপতি ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রীকে পাদুকা প্রদর্শনের পর সরকারি ও দলীয় নেতৃবৃন্দ বুঝলেন, তাদের অপমান করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ অনুধাবন করল, তাদের তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, লোকজন তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে।

এ কারণেই পাদুকা প্রদর্শনের পর আওয়ামী লীগ জনসভা করে। আব্দুর রাজ্জাক ঘোষণা করেন, "ওদের মুখোশ খুলে দিন। এই খতিব মুক্তযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।" (দৈঃ বাংলাবাজার, ২৩.৭)। আমরা এদের মুখোশ যথাসাধ্য উন্মোচন করেছি। আপনারা কী করেছেন? কী ব্যবস্থা নিবেন সেটা বলুন।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলছেন, "তারা 'নবীকে অপমান করেছে। বায়তুল মোকাররম আজ ইহুদীদের কবলে, মুক্ত করতে হবে।" (ঐ)। না এটি ভুল। মসজিদ ইহুদীদের কবলে নয়, পাকিস্তানপন্থী ধর্ম ব্যবসায়ীদের কবলে। তিনি আরও বলেছেন, "১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ওবাইদুল হকের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে এটা সবার জানা। আমরা মুক্তিযুদ্ধের সাথে ছিলাম। পাকিস্তানপন্থী হয়ে উনি মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে পারবেন না এটাইতো স্বাভাবিক।" (সংবাদ, ২৫,৭)। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এতকিছু জেনে এতদিন কেন নিশ্চুপ ছিলেন? আজই বা কেন উত্তেজিত?

ধর্ম ব্যবসায়ীদের এই দৌরাত্ম্য গত ৫./৬ বছর ধরে চলছে, এখন যা তুঙ্গে। বিএনপি এখন ধর্ম ব্যবসায়ীদের বি-টিম হিসাবে কাজ করছে। তাদের বর্তমান স্ট্র্যাটেজি যে কোনো মূল্যে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করা এবং ইসলামী ঐক্যাজোটের ভাষায় আওয়ামী লীগের 'তখত তাউস' গুড়িয়ে দেয়া। সরকারের কাছে প্রশ্ন কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, সাংবাদিক কাজী শাহেদ আহমদ বা অধ্যাপক আলী আসগরকে যখন 'মুরতাদ' ঘোষণা করা হয় তখন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী একটি বাক্যও কেন উচ্চারণ করলেন না? বা আওয়ামী লীগ? তাঁরাতো মন্ত্রীসভার সদস্য বা কোনো রাজনীতিবিদের চেয়ে কম

পরিচিত নন। শুধু তাই নয় এ সরকারকে ক্ষমতায় আনার জন্য বা স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এঁদের ভূমিকাতো কম নয়। এটি এক ধরনের ডবল ষ্ট্যান্ডার্ড। সরকার বলুক, আইনত কাউকে কি মুরতাদ ঘোষণা করা যায়? বা কারও 'কল্লার' জন্য এক লাখ টাকা পুরস্কার? যদি কেউ তা না পারে তাহলে আইনত তারা দণ্ডনীয় কিনা? এবং দণ্ডনীয় হলে সরকার এ পরিপ্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নিয়েছে? এক্ষেত্রে তাঁরা নিশ্চুপ কেন? এ কথা বললাম এ কারণে যে, অবসর গ্রহণের পর অনেকে মানবাধিকার ও বিচার বিষয়ে আমাদের হেদায়েত করেন।

পবিত্র কোরান শরীফে সুরা নিসায় বলা হয়েছে-"অবশ্য তোমরা কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের কাছে ও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে বিশ্বাস অর্জন করতে চায়। যখনই তাদের ফিৎনায় ফিরান হয় তখনই তারা উল্টিয়ে যায়। যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে চলে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না করে ও তাদের হাত না সামলায় তবে তাদের যেখানেই পাবে পাকড়াও করবে....আর আমি তোমাদের এইসব প্রতিরোধের স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছি।"

আমরা এ পবিত্র সুরায় সান্ত্বনা পাই। তবে, আওয়ামী লীগ এদের প্রতিরোধের জন্য জনসভা করে এবং নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানিয়ে বলেন, রাজাকারমুক্ত করার জন্য শুক্রবার বায়তুল মোকাররমে জুমা আদায় করতে হবে। এ আহ্বান অনেককে উদ্দীপ্ত করে, যদিও মসজিদে নামাজ পড়ে তা রাজাকারমুক্ত করা যায় না। রাজকারমুক্ত করতে হলে ইসলামী ফাউন্ডেশনের কর্তৃত্ব পাল্টাতে হবে। তবুও অনেকে গিয়েছিলেন, কিন্তু নেতারা কেউ যাননি। প্রায় প্রতিটি পত্রিকা এ খবর দিয়েছে। একমাত্র ফিৎনা সৃষ্টিকারী দৈনিক ইনকিলাব লিখেছে-"গতকাল (শুক্রবার) বায়তুল মোকাররম মসজিদে জাতীয় সংসদের ত্রিশজন সদস্য একত্রে জুমার নামাজ আদায় করেছেন। ইতিপূর্বে বায়তুল মোকাররম মসজিদে সরকারি দল ও বিরোধী দলের এত এমপিকে এক সাথে দেখা যায়নি। তবে এমপি তালিকায় সরকারি দলের প্রাধান্য ছিল। ....আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ নামাজে অংশ নেয়। এছাড়াও সিটি মেয়র মোহাম্মদ হানিফ জুমার নামাজে অংশ নেন।"

অন্যদিকে আজকের কাগজ খবর দিয়েছে, সংঘর্ষ হতে পারে এ আশঙ্কায় 'পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অঘোষিতভাবে নিষ্ক্রিয়' রাখা হয়। মেয়র হানিফ বলেন, "আমি বায়তুল মোকাররমে যাই নি।" তাহলে এখন বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজাটের মুখপত্র 'ইনকিলাব'কে কী অভিধায় ভূষিত করবেন? শোনা যায় এ পত্রিকায় এখনো সরকারী দলের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির কোম্পানির বিজ্ঞাপন নিয়মিত যায়।

এই হচ্ছে আমাদের সমাজের উচ্চবর্গের ডবল স্ট্যান্ডার্ড আর এ কারণেই ধর্ম ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রপতিকে পাদুকা প্রদর্শনের শক্তি পায়। তাছাড়া সংঘর্ষ এড়াবার কৌশল কি কাজে লেগেছে? যেসব আওয়ামী কর্মী সরল বিশ্বাসে নেতাদের ডাকে কর্মসূচি পালন করতে প্রহৃত হয়েছেন, নেতারা কি তাদের দায়দায়িত্ব নিয়েছেন? নেন নি। দুঃখটা এখানে। কর্মীদের তো ব্যবহার করতে করতে পাদুকা করে ফেলা হয়েছে।

ধর্মপ্রাণ বাঙালীর কাছে প্রশ্ন- ধর্ম অশান্তি সৃষ্টিতে অপব্যবহৃত হলে কি মানুষের শ্রদ্ধা

ভালবাসা বাড়বে? এবং একদল মানুষ ও তাদের নেতারা যদি নিয়ত তাই করে, সত্য বিকৃত করে, তাদের কি ধর্মাশ্রয়ী বলবেন? একটি উদাহরণ দেই। যেই খতিবকে অনেকে বড় করে দেখছেন সেই খতিব দৈনিক বাংলাবাজারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "১৯৮৪ সালে তিনি এই পদে যোগ দেন এবং সরকার তাঁকে নিয়োগ দেয়-এটি একটি অনারারি পদ। সরকারি নিয়মিত চাকুরের মতো নয়। সাধারণ চাকুরেদের সুযোগ এক্ষেত্রে নেই। অথচ পত্রপত্রিকায় তার উল্টোটা লেখা হয়েছে এবং ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলছেন খতিব "ফাউন্ডেশনের বেতনভূক্ত কর্মচারী।" ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর হাঙ্গামা সৃষ্টি সম্পর্কে 'ইনকিলাব' বাদে সব পত্রিকার ভার্সান এক যাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে হাঙ্গামার জন্য খতিব দায়ী। খতিব বলছেন, "এসব বিলকুল ঝুট।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-

"১৫ জুলাই রসূল (দঃ) ও পবিত্র কোরানের অবমাননার প্রতিবাদে হরতাল হয়েছিল। এই হরতাল নিয়ে আপনার মূল্যায়ন?"

জবাব ঃ "আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের দুশমনেরা কোনো ক্ষেত্রে ইসলামের অবমাননা করলে এর বিরুদ্ধে 'নারাজি' প্রকাশের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। 'নারাজি' প্রকাশের অন্যতম উপায় হল হরতাল। বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কারণে এই হরতাল করাটা আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি না।" যদি না-ই করেন তাহলে খতিব হিসাবে তিনি কেন হরতালের বিরুদ্ধে আহ্বান জানালেন না, যেখানে তিনি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে জনসভা করতে পারেন? মুক্তিযোদ্ধাদের 'গাদ্দার' বলতে পারেন? আপনারা যাঁরা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তাঁরাই বিচার করে বলুন এই জনাবকে কি আর খতিব পদে রাখা যায়- যার কথা আর কাজে বিরাট ফারাক? আর বায়তুল মোকাররম হওয়ার পর কোনো খতিব নিয়ে এত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি, যা এখন হচ্ছে। এর কারণইবা কী?

এই হরতাল সম্পর্কে ফজলুল বারী কায়রো থেকে জনকণ্ঠে লিখেছেন-"বিশ্ব ইসলামী সম্মেলনে আসা নেতৃবৃন্দ ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী প্রস্তুতির সময় বাংলাদেশে হরতাল হচ্ছে শুনে অবাক হলেন।" তাঁরা এখানকার ইসলামী নেতাদের জানেন না দেখে অবাক হয়েছেন। সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত যথার্থই লিখেছেন, "ধর্মকে এরা ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে আওয়ামী লীগকে বেকায়দায় ফেলার জন্য করেছে। পৃথিবীর অন্য কোনো মুসলিম দেশ মহানবী ও কোরান শরীফের অবমাননার জন্য হরতাল ডাকে নি।" বর্তমানে ধর্ম ব্যবসায়ীদের বি-টিম হিসাবে পরিচিত বিএনপি ঘোষণা করেছে-"সর্বস্তরে এই সরকারের নগ্ন দলীয়করণের অভ্যাস হিসাবে পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব দলীয় বক্তব্য প্রদান করে যে উস্কানিমূলক আচরণ করেছেন তাও নিন্দনীয়।" তাঁরা কি উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছেন? আর বর্তমান ধর্ম সচিবের চাকরিতো প্রায় চলে গিয়েছিল ১৯৭৩ /৭৪ সালে। বিএনপি ভুলে গেছে বর্তমান খতিবও তাঁদের বিপদে ফেলেছিলেন। ধর্ম ব্যবসায়ীদের পক্ষাবলম্বন কখনো কাউকে সুবিধা দিয়েছে বলে জানা যায়নি।

অবশ্য সুরা আনয়ামে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন "অবশ্য যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের জানিয়ে দেবেন।

বর্তমান ফিৎনায় এই সুরাই আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে। এ উদ্ধৃতি দিলাম এ কারণে যে, ইসলামী ঐক্যজোট ঘোষণা দিয়েছে-"আমাদের কথামতো রাষ্ট্র চলবে। কারণ, সংখ্যায় আমরা ১১ কোটি মুসলমান। ইসলামী ফাউন্ডেশনকে আওয়ামী ফাউন্ডেশন বানানোর চক্রান্ত প্রতিহত করা হবে।" (বাংলাবাজার পত্রিকা, ২৬.৭)।

ইতোমধ্যে তারা ২৩ আগস্ট আবার শিখা চিরন্তনের বিরুদ্ধে মহাসম্মেলন আহ্বান করেছে আর খতিব ঘোষণা করেছেন "কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আগামী ১৪ নভেম্বর মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে মহাসম্মেলন আহ্বান করা হবে।"

গত শুক্রবার ইসলামী ঐক্যজোটের সভায় জনাব মুহিউদ্দিন খান ঘোষণা করেছেন- "বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের মিম্বরে কে বসবেন-তা আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও দেবেন। এ মিম্বরে মাওলানা ওবাইদুল হকই বসবেন।" ভাষাটা দেখুন, যেন আল্লাহ-ই তাঁকে খবরটি দিয়েছেন। ওয়াসতাগফিরুল্লাহ!

সরকারকে পাদুকা প্রদর্শনের পর এ ধরনের হুমকি ধর্ম ব্যবসায়ীরা দিতে পেরেছে যেহেতু আওয়ামী লীগ কর্মসূচি দিয়ে নিষ্ক্রিয় থেকেছে এবং সরকারের ব্যবহারে সবসময় দোদুল্যমানতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং তারা সৃষ্টি করেছে সমান্তরাল সরকারের। যদি তা না-ই হয় তাহলে এতকিছুর পর খতিব বলছেন-"আমি জোর করে থাকতে চাই না। মসজিদের মুসল্লিরা চাইলে আমি অপসারণ মেনে নেব। কিন্তু আমার জবাবের পর যদি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অপসারণ চায় বা অপসারণ করে তাহলে ভেবে দেখতে হবে।" (জনকণ্ঠ, ২৮-৭)। অর্থাৎ সরকার কোনো পদক্ষেপ নিলে 'খতিব সরকার' ব্যবস্থা নেবে। নিজেকে কতটা শক্তিশালী মনে করলে এ ধরনের জবাব দেয়া যায়।

আমরা আগেও বলেছি, এখনো বলছি, বাংলাদেশে খতিব সরকার আমরা চাই না। খতিব সরকারকে আরও প্রশ্রয় দিলে সরকার নিজেদের বিপদ ডেকে আনবে। সরকার এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেবে তা স্পষ্টভাবে আমাদের বলে দেয়া উচিত। ধর্ম শুনলেই যদি সরকারের নীতিনির্ধারকরা মনে করেন, এদের প্রশ্রয় না দিলে রাজনৈতিক ক্ষতি হবে তাহলে বলব তাঁরা ভুল করবেন। বাংলাদেশে ফিৎনা সৃষ্টিকারীরা কখনো কল্কে পায় নি। সরকার কঠোর হলে তারা নিশ্চুপ থাকে। কারণ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তারা চলতে পারে না। ধর্ম ব্যবসায়ীদের কনসেশন দিয়ে কি ক্ষমতায় থাকা যাবে যদি আমরা আমজনতা সঙ্গে না থাকি? সম্প্রতি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির এক সভায় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এ পরিপ্রেক্ষিতেই বলেছেন, "বর্তমান সরকার যদি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকারীদের সমর্থনে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়, তাহলে তাদের সে কৌশল আমরা সমর্থন করব না।" আ. লীগ নেতা আব্দুল মান্নান বলেছেন, "সরকার যদি তার (খতিব) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে আওয়ামী লীগ কর্মসূচী গ্রহণ করবে।" (জনকণ্ঠ, ২৩-৭)। যদিও উক্তিটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য জানি না, তবুও এ পরিপ্রেক্ষিতে বলব, আপনারা নামুন, আমরা আছি। যেখানে ছিলাম সেখান থেকে নড়িনি, নড়বও না। কিন্তু আপনারাই শুধু আসা-যাওয়ার মধ্যে আছেন।

৩০.৭.১৯৯৭

জবাই কর জবাই কর

ছবিটি ছাপা হয়েছে দৈনিক আজকের কাগজে ২৬ জুলাই। আওয়ামী লীগ কর্মী নুরু মিয়ার ছবি। ক্যাপশনে লেখা-'ছড়িয়ে আছে চাপ চাপ রক্ত। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন তিনি। পাশে জায়নামাজ। গতকাল জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জুম্মার নামাজ পড়তে এসে এভাবেই মৌলবাদীদের হাতে নির্মমভাবে রক্তাক্ত হন রিকশা শ্রমিক লীগ নেতা নুরু মিয়া।' ছবিটি আমাকে সপ্তাহ দুতিনেক আগের একটি ঘটনা মনে করিয়ে দিল এবং কেন যেন মনে হল, ঘটনা দু'টির মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে।

তাহলে ফিরে যাই ১০ জুলাইর ঘটনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলোর মারামারি, কাটাকাটি, মিছিল, নতুন কিছু না এবং পরিস্থিতি এমন যে, এগুলো না থাকলেই মনে হবে ক্যাম্পাস এত অস্বাভাবিক রকম শান্ত কেন? কিন্তু ১০ জুলাই ক্যাম্পাসে যে মিছিলটি হয়েছিল তা ছিল অভিনব। কারণ, এর আগে কোনো একটি পত্রিকার পক্ষে মিছিল এবং এতবড় সংঘর্ষ হয় নি। অনেকদিন পর বিদেশ থেকে ফেরা আমার এক সহকর্মী পরদিন উত্তেজিত স্বরে আমাকে জানালেন, 'তারা শ্লোগান দিচ্ছিল জবাই কর জবাই কর। এটি কী ধরনের শ্লোগান!' রীতিমতো ভয়ার্ত তাঁর স্বর। কারণ, ক্যাম্পাসে 'তুলে নেব চামড়া' পর্যন্ত সহনীয় ছিল। কিন্তু জবাই কর!

মিছিলটি ছিল বাংলাদেশে ফিৎনা সৃষ্টিকারীদের মুখপত্র 'ইনকিলাব'-এর পক্ষে। এ মিছিলে যোগ দিয়েছিল ছাত্রদলের কর্মীরাও। তারা শ্লোগান দিচ্ছিল ইনকিলাব যারা বর্জন করতে বলেছেন তাদের বিরুদ্ধে। পরে সাধারণ ছাত্রদের ধাওয়া খেয়ে তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু মূল বিষয় হল 'জবাই কর'। ১৯৭১ সালে এই পত্রিকার একজন কর্ণধার ও তার সহযোগিরা বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের ঘর থেকে তুলে এনে জবেহ্ করেছিল। সেই জবেহ্‌র আনন্দ এখনো তাদের রক্তে খেলা করে। ড্রাকুলার মত রক্তই তাদের শরীরে শিহরণ জাগায়। কিন্তু অবাক হয়েছি ছাত্রদলের সমর্থন দেখে! বিএনপির তো একাত্তরে রক্তপাতের কোনো ঐতিহ্য নেই। ছাত্রদলের এক সময়ের উপদেষ্টা ড. মোশাররফ হোসেনতো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসে জোরেশোরে কাজ করেছিলেন। জবেহ তারাই করতে চায় যারা আধুনিক বিশ্বে স্থান করতে পারছে না, যেমন, আফগানিস্তানের তালেবান বা আলজেরিয়ার ধর্মপন্থীরা। আধুনিক যুবকরা বাংলাদেশে তাহলে কীভাবে সমর্থন করে ফিৎনা সৃষ্টিকারীদের!

যা হোক, এই জবাই কর শ্লোগান শুনে হঠাৎ মনে হয়েছিল, কোনো কিছুর কী প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে? নুরু মিয়ার রক্তাক্ত ছবি দেখে মনে হল-হ্যাঁ, কিছু একটার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

ওই ঘটনার পর দেখা গেল ধর্ম ব্যবসায়ীরা মাঠে নামছে ও তাদের কাজের পরিধি বিস্তৃত করছে। বিএনপি প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন যোগাচ্ছে। যে কারণে অনেকে মনে করেন, বিএনপি এখন ধর্ম ব্যবসায়ীদের বি-টিমে পরিণত হয়েছে। এদের বর্তমান স্ট্র্যাটেজি যে কেনোভাবে হোক ইস্যু সৃষ্টি করা, বিশৃঙ্খলা বাঁধানো যাতে অন্তিমে ইসলামী ঐক্যজোটের ভাষায়, আওয়ামী লীগের তখত তাউস গুড়িয়ে দেয়া যায়। এরপর তারা অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কবি শামসুর রাহমানের মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক কাজী শাহেদ আহমেদ ও আলী আসগর প্রমুখকে মুরতাদ ঘোষণা করে রাস্তা দাপিয়ে বেড়িয়েছে। অধ্যাপক আসগরের মাথার দাম এক লাখ টাকা ঘোষণা করেছে। যে ব্যক্তিটি এ ঘোষণা দিয়েছে পাকি বা সৌদি টাকা না পেলে তাকে বিক্রি করলেও এক লাখ টাকা পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

আমরা এদের দাপাদাপি দেখে আশ্চর্য হইনি। গত এক যুগ ধরেই তারা দাপাচ্ছে। এ দাপানির শুরু জেনারেল জিয়ার আমল থেকে, বিকাশ লাভ করে শিল্পী কামরুল হাসান কথিত 'বিশ্ব বেহায়া' জে. এরশাদের আমলে। বেগম জিয়া সস্নেহে শুধু প্রতিপালন নয়, এদের নিয়ে সরকারও গঠন করেন। আমরা আশ্চর্য হয়েছি, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে পরিচিত আওয়ামী লীগের নীরবতা দেখে। দেশে সরকার থাকলে কি যে কেউ যে কারো মাথার দাম ঘোষণা করতে পারে? দেশে একটি ধর্ম মন্ত্রণালয় আছে, যার কর্ণধার একজন প্রতিমন্ত্রী। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কি কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করা যায়? এসব প্রশ্ন কেউ করেনি, সবাই ছিল নিশ্চুপ। এ প্রশ্রয় পেয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীরা হরতাল আহ্বান করে ১৫ জুলাই।

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর প্রাক্কালে এ হরতাল আহ্বান ধর্মপ্রাণদের বিস্মিত করেছে। কায়রোয় ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষে আগত বিশ্ব ইসলামী নেতারা এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তারা যেটি অনুধাবন করেননি সেটি হচ্ছে এরা ধর্ম ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রাণ নয়। ধর্মকে ঢাল হিসেবে রেখে, এক ধরনের উদ্ভট ধর্মীয় পোশাক সৃষ্টি করে এরা নিরক্ষর অজ্ঞ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চায়। আসল লক্ষ্য রাষ্ট্রক্ষমতা। এ হরতালও সরকার বা সরকারি দল প্রতিরোধ করতে পারেনি। নির্বাচনের পূর্ব থেকে আমরা লক্ষ্য করছি, ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রশ্নে আওয়ামী লীগে এক ধরনের দোদুল্যমানতা বিদ্যমান। একদিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হিসেবে নিজেদের তুলে ধরা অন্যদিকে এ প্রশ্রয় কোনোভাবেই কাম্য নয়। কারণ, তা শুধু আওয়ামী কর্মী নয় সাধারণ সমর্থকদের বিভ্রান্ত করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখা গেছে, যারাই ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রশ্রয় দিয়েছে তাদেরই পতন ঘটেছে।

হরতালের পর ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী। সেখানে রাষ্ট্রপতি ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী, অন্যকথায় সরকারকে পাদুকা প্রদর্শন করে ইসলাম ধর্ম ব্যবসায়ীরা। পত্রপত্রিকায় অভিযোগ করা হয় যে, এর জন্যে বায়তুল মোকাররমের খতিব দায়ী। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী স্বয়ং তাঁকে অভিযুক্ত করেন। খতিব বলেছেন, তিনি এর জন্য দায়ী নন। কিন্তু এরশাদ কর্তৃক নিযুক্ত এই খতিবের পূর্ব ইতিহাস দেখুন। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলছেন, খতিব ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের

বিপক্ষে ছিলেন। হতে পারে, না হলে, তিনি মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে কেন মুক্তিযোদ্ধাদের গাদ্দার বলবেন? শুধু তাই নয়, কারণে অকারণে কাদিয়ানিদের নিয়েও বিভিন্ন অ-ইস্যু তুলে তিনি রাজনৈতিক সভায় বক্তব্য রেখেছেন। বর্তমান সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। সরকারকে তারা চড় মেরেছে।

এ ঘটনার পর আওয়ামী লীগের ইজ্জতে খানিকটা লেগেছে। জনসভা করে আওয়ামী লীগ নেতারা ঘোষণা করেন, শুক্রবার জুম্মার নামাজ বায়তুল মোকাররম মসজিদে পড়ে, মসজিদেক রাজাকারমুক্ত করা হবে। নামাজ পড়ে মসজিদ রাজাকার মুক্ত করা যায়? রাজাকার মুক্ত করতে হলে আগে ইসলামি ফাউন্ডেশনের কর্তৃত্ব বদল করতে হবে। আজকের কাগজ পড়েই জানা গেল, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জুম্মার দিন নিষ্ক্রিয় থাকে। এ নিষ্ক্রিয় থাকার কথা যারা জানতেন না তারাই মসজিদে গিয়ে খতিবপন্থী দলের হাতে মার খায়। নুরু মিয়া আওয়ামী লীগ কর্মী কি না তা কারো জানার কথা নয়। কিন্তু পরনে ছিল তার মুজিব কোট। সুতরাং মসজিদেই তাকে রক্ত দিতে হয়। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা কোনো মন্তব্য করেননি।

এটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, '৭১ সালের যুদ্ধাপরাধী জামাত, স্বাধীনতা পরবর্তী পাকি মনোভাবের দলসমূহ, যেমন -ইসলামী ঐক্যজোট, জাগপা প্রভৃতি এক হয়েছে এবং একেকটি ঘটনা সৃষ্টি করে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করছে। গুটিকয় বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সমন্বয় কমিটি ও ছোট ছোট কিছু দল ছাড়া কেউ তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। তাদের এই জোটে এখন বিএনপি যোগ দিয়েছে। মসজিদে নুরু মিয়ার রক্তাক্ত ছবি দেখে মনে হল, তারা জবেহ করার একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। এ কথা মনে করার কারণ, ওই দিন শুক্রবার জুম্মার নামাজে মুসল্লিদের নাজেহাল করার পর ইসলামী ঐক্যজোট ঘোষণা করেছে বায়তুল মোকাররম মসজিদের মিম্বরে 'মওলানা ওবায়দুল হকই বসবেন।' খতিব এখন একটি প্রতীক ধর্ম ব্যবসায়ীদের। এতকিছু করার পর তিনি থাকলে আমাদের মেনে নিতে হবে সরকার এঁদের মেনে নিয়েছে। এরপর তারা তাদের জবাই কর জবাই কর পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবে। সরকার হয়তো তাও মেনে নেবে, হয়তো এ কথা মনে রেখে যে আপস করলে হয়তো ক্ষমতায় থাকা যাবে। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা ভালো। পাকিস্তান সরকার সম্প্রতি মসজিদ থেকেও ধর্ম ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করতে দ্বিধা করছে না। কারণ, নেওয়াজ শরীফ বুঝতে পেরেছেন বিষধরদের প্রশ্রয় দিতে নেই।

আমরা আগেও বলেছি, এখনো বলছি, ধর্ম ব্যবসায়ীদের জন্যে বাংলাদেশ হয়নি। ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রশ্রয় দিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন করা যায় না। যদি কেউ তা বলে, তা হবে ভণ্ডামি। ধর্ম শুনলেই যদি সরকারের নীতি নির্ধারকরা মনে করেন, তাদের প্রশ্রয় না দিলে রাজনৈতিক ক্ষতি হবে, তাহলে তারা ভুল করবেন। বাংলাদেশে ফিৎনা সৃষ্টিকারীরা কখনো কল্কে পায় নি। সরকার কঠোর হলে তারা নিশ্চুপ থাকে। এর উদারহণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ধর্মব্যবসায়ীদের কনসেশন দিয়ে কি ক্ষমতায় থাকা যাবে যদি আমরা আমজনতা সঙ্গে না থাকি?

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, খতিব বলেছেন, 'আমি জোর করে থাকতে চাই না। মসজিদের মুসল্লিরা চাইলে আমি অপসারণ মেনে নেব। কিন্তু আমার জবাবের পর যদি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অপসারণ চায় বা অপসারণ করে তাহলে ভেবে দেখতে হবে।' (জনকণ্ঠ ২৮. ৭. ৯৭)। শুধু তাই নয়, কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে খতিব এক মহাসমাবেশ আহ্বান করেছেন। ইসলামী জোট শিখা চিরন্তনের বিরুদ্ধে ও সমাবেশ আহ্বান করেছে। সরাসরি তারা সবাই সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জে জিতলে শুরু হবে 'জবাই কর জবাই কর।'

কাদের জবাই কর- এ কথা নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অবশ্যই চাইব সরকার ধর্ম ব্যবসায়ীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে অপারগতা দেখালে আমাদের সামনে দু'টি বিকল্প থাকবে। তার একটি উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এক বক্তৃতায়- 'বর্তমান সরকার যদি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকারীদের সমর্থনে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়, তাহলে তাদের সে কৌশল আমরা সমর্থন করব না।' অর্থাৎ হয় আমরা নিষ্ক্রিয় থাকব, নয় যে যার নিজস্ব উপায়ে 'জবাই কর' থেকে বাঁচার চেষ্টা করব। আরেকটি উপায় আছে যা কোরআনে সুরা নিসায় উল্লেখ করা হয়েছে.'অবশ্য তোমরা কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের কাছে ও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে বিশ্বাস অর্জন করতে চায়। যখনই তাদের ফিৎনায় ফিরান হয় তখনই তারা উল্টিয়ে যায়। যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে বলে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না করেও তাদের হাত না সামলায়, তবে তাদের যেখানেই পাবে পাকড়াও করবে....আর আমি তোমাদের এইসব প্রতিরোধের সুষ্ঠু অনুমতি দিয়েছি।'

১৯৯৭

সাঈদী বচন ও এক বিধবার আর্তি

ইসলামী ছাত্রশিবির গত ৩ অক্টোবর পল্টন ময়দানে সীরাতুন্নবী (সঃ) মহফিলের আয়োজন করেছিল। এর আগে একবার তা বাতিল করা হয়েছিল। হয়তো উদ্যোক্তারা ভেবেছিল ঢাকা শহরের কেন্দ্রে, তাও আবার পল্টনে এ ধরনের মহফিল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারে। কারণ, সেখানে বক্তৃতা করবে জামাত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী।

উল্লেখ্য, নবপর্যায়ে আওয়ামী লীগের জনসভার পর এবার সাঈদীর জনসভা বা মাহফিল হল পল্টনে। আরো উল্লেখ্য, পল্টনের সভাটিতে আওয়ামী লীগের নেতারা অগ্নিঝরা কণ্ঠে ১৯৬৬, '৬৯, '৭১-এর কথা শুনিয়েছেন। এরপর হল সাঈদীর। ১৯৬৯-৭০ (সালটা ঠিক মনে নেই) এই পল্টনে আওয়ামী লীগের সভার পর জামাত, মুসলিম লীগ সভা করতে চেয়েছিল। পারে নি। অবশ্য, তখন কেউ ভাবে নি, ইত্তেফাকের পাশে শহীদ পরিবারের জমি কিনে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের ঘাতক বলে অভিযুক্ত ব্যক্তি পত্রিকা প্রকাশ করবে। সাঈদীর ঘটনাটাও সেরকম।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর নামের আগে সংবাদপত্রে 'মওলানা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কী কারণে? যারা শব্দটি ব্যবহার করেছেন সাঈদী কি তাদের ইমাম? 'মওলানার' অর্থ কী? যত্রতত্র অপাত্রে এ সম্মানিত শব্দটি ব্যবহার করা উচিত নয়। সাঈদী কোন্ বিদ্যায়তন থেকে সার্টিফিকেট পেয়েছেন যে, এ শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে তার নামের আগে?

সাঈদী যা বলেছেন তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। জামাত বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়-এ কথা আমরা বললে অনেকে এর বিরোধিতা করে বলতেন, কথাটি ঠিক নয়। সাঈদীর বক্তব্য প্রমাণ করেছে আমাদের বক্তব্যই ঠিক। তিনি তার মহফিলে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যয়, ২১ ফেব্রুয়ারি নাকচ করে দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন– "মুক্তিযুদ্ধের পক্ষবিপক্ষের কথা বলছে মুরতাদরা"। জামাত বা সাঈদীর মতো ব্যক্তি কেন এ কথা বলবে না? সরকারে যারা আছেন এবং আগে যারা ছিলেন, সবাই তাৎক্ষণিক কিছু লাভের আশায় জামাতের প্রতি নমিত আচরণ করেছেন। তাদের ধারণা, এটি রাজনৈতিক কৌশল। জামাতের ভোটের সংখ্যা কত? জামাতের জনপ্রিয়তা বা ভোটের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসের পিছনে রাজনৈতিক কৌশলের তেমন অবদান নেই, যেমনটি আছে নির্মূল কমিটি, জাহানারা ইমাম বা কিছু লেখক/সাংবাদিকের, যারা গত এক দশক ধরে এদের মুখোশ উন্মোচন করে বলছেন বা নতুন প্রজন্মের কাছে এদের কীর্তিকলাপ তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক দল এ সত্য স্বীকারে কুণ্ঠাবোধ করতে পারে কিন্তু তাই

সত্য। সুতরাং রাজনৈতিক প্রশ্রয়ের কারণে, আজ সাঈদী পল্টনের মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কটুক্তি করতে পারেন। খতিব মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের 'গাদ্দার' বলতে পারেন। এবং তার এ ধরনের বক্তব্য এখনো অব্যাহত। মিলাদুন্নবীর সভায় প্রেসিডেন্টকে ইসলামী ঐক্যজোটের কর্মীরা (অভিযোগ করা হয়েছে খতিবের প্ররোচনায়) জুতা ছুড়ে মারে। প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্য সভায় তারা 'কুলাঙ্গার' বলে, যা বিএনপিও বলেনি। উল্লেখ্য, মফস্বলে সাঈদী বা গোলাম আযম প্রায়ই মহফিল বা সভা করতে বাধাপ্রাপ্ত হন বা উল্লেখিত ঘটনাগুলি কম ঘটে। কিন্তু ঢাকায় হয়, যেখানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিস। এমনও হতে পারে এসব বিষয় বা বক্তব্যের প্রতি নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি একরকম, কর্মীদের অন্যরকম।

সাঈদী বলেছেন, "দেশে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে মূর্তি নির্মাণ বরদাশত করা হবে না। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরানের পাশাপাশি গীতা-বাইবেল পাঠ করা চলবে না। একদল মুরতাদ ও নাস্তিক টিভিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষের কথা বলে জাতিকে বিভক্ত করছে।"-না, এসব বক্তব্যে বিচলিত নই, এগুলি তাদের গৎবাধা বক্তব্য। আমরা বিচলিত তার অন্যান্য বক্তব্যে যা দেশের প্রগতিবাদ, মননশীলতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষকে নতুন করে ভাবাবে। সাঈদী আরো বলেছেন-

১. "গত বছরের ১২ জুন নির্বাচনের সময় অনেক মুক্তিযোদ্ধা আমার জন্য কাজ করেছে।" (জনকণ্ঠ ৪.১০.৯৭)

পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধারা বলুন এটি কি সত্য? মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান আহাদ চৌধুরী কী বলেন? যদি সত্যি হয় তাহলে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? আর যদি সত্য না হয় তাহলে তারা কী ভূমিকা নেবেন? না কি আ. লীগ এ সবে নীরবতা পালন করে দেখে তারাও নীরব থাকবেন? যদি অবিলম্বে এ বিষয়ে তারা কোনো বক্তব্য না দেন তাহলে ধরে নিতে হবে আমাদের শেষোক্ত উপসংহারই সঠিক।

২. নির্বাচনের সময় "এমনকি স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাও আমার মঞ্চে উঠেছেন।" (ঐ)

আ.লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে অবশ্যই এ বিষয়ে আমরা বিশদ জানতে চাই। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের দল হিসেবে আমরা অনেকে গত নির্বাচনে আ. লীগকে সমর্থন করেছি। যদি এ বিষয়ে তারা নিশ্চুপ থাকেন তাহলে বুঝতে হবে বিষয়টি সত্য এবং স্থানীয় আ. লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে তারা কোনো ব্যবস্থা নেননি। এবং তা যদি সত্য হয় তাহলে অবশ্যই এ ব্যর্থতা নিন্দনীয়।

৩. "সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের বাবার হত্যার সঙ্গেও নাকি আমি জড়িত।....
আর হুমায়ূন আহমেদ আমার সন্তানের বিয়েতে উপহার পাঠিয়েছেন। " [ঐ]

এটি পড়ার পর জনাব আহমেদকে টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছি, পাই নি। এম. আর. আখতার মুকুল কয়েকদিন আগে এই জনকণ্ঠেই জনাব আহমেদকে জাসাসের

প্রাক্তন সহ-সভাপতি হিসেবে কটাক্ষ করেছেন। আমি মনে করি এতে কটাক্ষের কিছু নেই। সবাইকে আ.লীগ সমর্থন করতে হবে এমন কোনো মানে নেই। কিন্তু তাই বলে জামাত? এবং সাঈদী? হুমায়ূন আহমেদ এ দেশের জনপ্রিয় লেখক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস লিখেছেন, চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, প্রকাশ্যে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বলেন, তিনি সাঈদীর সন্তানের বিয়েতে উপহার পাঠাবেন তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তিনি এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারেন-এ কথা ভেবেই বেদনা হয়। শুধু আমি নই, বাংলাদেশের অগণিত হুমায়ূনভক্ত একই প্রশ্ন করবেন 'একি সত্যি?' আমি মনে করি এটি সত্য নয় এবং তাই জনাব আহমেদকে অনুরোধ জানাব এর প্রতিবাদ করে আদালতে মামলা দায়ের করতে। যদি তিনি তা না করেন, তাহলে ধরে নিতে হবে সাঈদীর বক্তব্য সত্য। এবং তখন এই নন্দিত লেখক অবশ্যই নিন্দিত হবেন এবং অনেক ভক্ত-পাঠক হারাবেন, বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য।

৪. "ঘাদানিকের লোকেরা আমার এলাকায় গিয়ে বলেছে যে, আমি নাকি মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৩ জন হিন্দুকে হত্যা করেছি।.....আমি এত মানুষ মেরে থাকলে পিরোজপুর থানায় আমার নামে কোনো মামলা হল না কেন।" (ঐ)

মামলা কেন হয় নি? কারণ, এতদিন যেসব সরকার ছিল সেসব সরকার মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের প্রতি অসম্ভব মমতাবান ছিল। যে কারণে, ১৯৭৫ সালের বঙ্গবন্ধু ও চার নেতা হত্যা বা বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলা হয় নি এবং যে কারণে এখন হচ্ছে।

নির্মূল কমিটির একজন প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা শাহরিয়ার কবির গত বেশ কিছুদিন ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের ও শহীদ পরিবারের তথ্যচিত্র তুলছেন। এরকম একটি চিত্রের খানিকটা আমি দেখেছি। সেখানে এক প্রৌঢ় মহিলা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জানিয়েছেন- তার স্বামীকে হত্যা করেছেন সাঈদী এবং এতদিন বিচার চেয়েও বিচার পান নি। কারণ, সাঈদীর সঙ্গে এখন যোগাযোগ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের। সাঈদীর বক্তব্যেও তাই প্রমাণিত। তার সঙ্গে বিএনপি-জামাত তো বটেই, আ.লীগ, হুমায়ূন আহমেদের মতো সাহিত্যিকেরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ! তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের আর কী করার থাকতে পারে। এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে হত্যাকারী হিসেবে সাঈদীকে অভিযুক্তকারী সে মহিলার ক্রুদ্ধকণ্ঠ। এ ধরনের পরিস্থিতি দেখে সেই গ্রাম্য অজ্ঞ প্রৌঢ় মহিলা বলেছেন-"এ দেশে থাকতে ঘেন্না হয়, ঘেন্না হয়। কিন্তু উপায় নেই তাই থাকি।" আমরাও কি তাই বলব?

৬.১০.১৯৯৭

মিন্টো রোডে মহামিলন ঃ শেষ ভড়ংবাজিও শেষ

অবশেষে হল বহু প্রতীক্ষিত সেই মহামিলন। যেহেতু তা প্রতীক্ষিত সেহেতু মানুষ তাতে বিচলিত বা বিস্মিত হয় নি। কারণ, এটি ছিল স্বাভাবিক। বরং মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। রাজনীতিতে ভড়ংবাজির একটি পর্যায় শেষ হল। ২৯ নং মিন্টো রোডে কয়েকদিন আগে, বর্তমানে চরম ডানপন্থী কিছু দলের এবং বিএনপির নেতা বেগম খালেদা জিয়া ও জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযম মিলিত হলেন। মিলিত হয়েছিলেন তারা বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করার জন্য। এই মিলনের উষ্ণতা অনুভবের জন্য প্রচুর বিএনপি কর্মী অপেক্ষা করছিলেন মিন্টো রোডে। প্রতিমা বিসর্জনের পর খড়কুটো বেরিয়ে পড়ে, ফাউন্ডেশন ক্রীম উঠে গেলে ত্বকের রুক্ষতা ভেসে ওঠে, তেমনি এ মিলনের পর বিএনপির শেষ আব্রুটুকুও যে খসে গেল তা অবশ্য মিন্টো রোডে অপেক্ষমান বিএনপি কর্মীরা অনুধাবন করেনি; বেগম জিয়ার জন্য না হোক, গোলাম আযমের জন্য দিনটি ছিল বড়দিন, মনজিলে মকসুদে পৌঁছার দিন। গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। গোলাম আযম তখন পালিয়েছিলেন ভ্রাতৃপ্রতিম পাকিস্তান, সেখান থেকে সৌদি আরব। আজ তাকে পালিয়েই থাকতে হতো, জামায়াতের অস্তিত্বও থাকত না, যদি না লে. জে. জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করতেন। ক্ষমতায় এসে প্রথম তিনি জামায়াতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং গোলাম আযমকে দেশে ফেরার অনুমতি দেন। তার সময়ে আনোয়ার জাহিদ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী প্রমুখ স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থান হয়। জে. জিয়া জামায়াতকে সুযোগ দিয়েছিলেন সংগঠিত হওয়ার। তখনই জামায়াতের সঙ্গে সামরিক এস্টাবলিশমেন্টের যোগাযোগ হয়, যা ছিল পাকিস্তানপন্থী। লক্ষ্য করবেন, জামায়াত বিএনপির জন্ম থেকে তাকে সমর্থন করে আসছে। কারণ, বিএনপি ছিল সামরিক এস্টাবলিশমেন্টের খাঁটি প্রতিনিধি। বিএনপিও তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে কারণ, তাছাড়া তার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। জামায়াত সেই থেকে রাজনীতির মূল ধারায় আসতে চেয়েছে। এরশাদ আমলে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ যুগপৎ আন্দোলনের নামে জামায়াতকে রাজনীতিতে কল্কে পাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। তারা তখন জামায়াতকে এক ধরনের লেজিটিমেসি দিয়েছিল। বেগম জিয়ার আমলে এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে।

১. জামায়াতের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন। অর্থাৎ বিএনপি স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের সরাসরি রাজনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসতে চায়।

২. গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা এবং

৩. জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক দালাল বিরোধী আন্দোলন।

এ আন্দোলনে নতুন প্রজন্ম উজ্জীবিত হয় এবং এই আন্দোলনের সুফল লাভ করে আওয়ামী লীগ। ১৯৯৬ সালের নির্বাচন তার প্রমাণ। আওয়ামী লীগের একটি অংশ বোধহয় মনে করে, জামায়াতের প্রতি নমনীয়তা তাদের রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড দেবে। এ কারণে, খালেদা জিয়া বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতের প্রতি নমনীয়তা দেখিয়েছিল আওয়ামী লীগ। আমরা অনেকে বলেছিলাম, জামায়াতের প্রতি নমনীয়তা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আদর্শের বিরোধী এবং তা কখনো রাজনৈতিক সুফল আনবে না। বাঘ কি কখনো তৃণভোজী হয়? আমরা আসলে অনেক সময় একটি শব্দের কথা ভুলে যাই। তা হল-'পাকিস্তান'। 'পাকিস্তান' শব্দটি একটি মনোভঙ্গি। আমলাতন্ত্র বিশেষ করে যখন তা সামরিক আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় সিভিল সমাজ ও রাজনীতিবিদদের ওপর আধিপত্য বিস্তার চেষ্টা, অভ্যন্তরীণ লুটের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং নিছক ভারত বিরোধীতা। রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে এর অর্থ দাঁড়ায় সিভিল সমাজকে শৃঙ্খলিত করে সুবিধালাভের জন্য আমলাতন্ত্রের সঙ্গে আঁতাত, লুটের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও সরাসরি ভারত বিরোধিতা এবং ইসলাম বিপন্ন ও ভারত বিরোধিতাকে সমার্থক করে তোলা। এ কারণে আমরা দেখি অনেকে মুক্তিযুদ্ধ করেও এই মনোভঙ্গির বাইরে যেতে পারেন না। বাংলাদেশের বহু রাজনীতিবিদ এ মানোভঙ্গি থেকে মুক্তি পাননি যদিও তারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। জে. জিয়া, কর্ণেল অলি আহমদ প্রমুখ এর উদাহরণ।

বিএনপি এতদিন মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে এ মনোভঙ্গি আড়াল করার চেষ্টা করেছে কিন্তু এখন সে আব্রু খসে পড়েছে। এটি ছিল জনসমর্থন লাভে তার শেষ ভড়ংবাজি। এখন সে ভড়ং দেখাবারও আর উপায় নেই। রাজনীতির দিক থেকে গত সপ্তাহে বাংলাদেশে রাজনৈতিক মেরুকরণে সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে। এ সুস্পষ্ট মেরুকরণ হল- বাংলাদেশ ও পাকিস্তান (মনোভঙ্গি)। বেগম জিয়ার সঙ্গে মিলিত হবার পর গো.আযমের বক্তব্য শুনুন, তাহলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে-"দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা...অখণ্ডতা, আমি আবারও জোর দিয়ে বলছি অখণ্ডতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আমরা পেরেশানে আছি। এটা ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে আমাদের অখণ্ডতা থাকবে না।" জামায়াতের অখণ্ডতার অর্থ পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রে থাকা, যে কারণে ১৯৭১ সালে তারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল। শান্তি এলে দেশের অখণ্ডতা বিনষ্ট হয় এই প্রথম জানা গেল। আর এই অখণ্ডতা নিয়ে কে বেশি চিন্তিত? গোলাম আযম, আনোয়ার জাহিদ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীরা, যারা এখন বিএনপির নেতা এবং ১৯৭১ সালে যারা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। এ গ্রুপটি এখন বিএনপির সাহায্যে পাকিস্তান ফিরে চল'র যে আন্দোলন করছে সে ষড়যন্ত্র নিয়ে আমরাও খুব পেরেশানে আছি।

সুতরাং এখন যদি রাজপথে লড়াই হয় তাহলে তা হবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান- দু'মতাদর্শের। বিভিন্ন দলের ভগ্নাংশ, দুর্নীতপরায়ন গণধিকৃত নেতা, ইসলামী ঐক্যজোট

ও বিএনপি পাকিস্তান দলে, যার নেতা বেগম জিয়া। অন্যদিকে, বাকি সবাই। লড়াই হলে সেটিই হবে শেষ লড়াই। কারণ, বাংলাদেশে সব মতাদর্শ চলতে পারে কিন্তু পাকিস্তান মতাদর্শ নয়। টাইগার ও লায়ন মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে টাইসন, ইনকিলাব ও দিনকাল এর ভ্রান্ত প্রচার সৃষ্টি করেছে 'দিনকিলাব' প্রচার ব্যবস্থা যার অর্থ সঠিক নয় এমন তথ্য পরিবেশন করা যা যাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে। তেমনি বলা যেতে পারে বিএনপি জামায়াতের মিলন সৃষ্টি করেছে 'বাংলাদেশ জামায়াত পার্টি' (বিজেপি) বা 'বাংলাদেশ নাৎসী পার্টি' (বিএনপি)। কারণ জামাত ও নাৎসীদের মধ্যে এবং জামায়াত ও ভারতের বিজেপির মধ্যে পার্থক্য খুব কম।

মিন্টো রোডের মিলনে বেগম জিয়া বা বিএনপির কোনো জয় হয়নি। পত্রিকায় দেখেছি, গোলাম আযম মিন্টো রোডে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লে. জে. (অব) মীর শওকত বীরোত্তম পালিয়েছেন। এই পালানো বিএনপির পরাজয়ের প্রতীক হিসাবেও নেয়া যায়। জামায়াতের সঙ্গে যে যত দহরম মহরম করুক গোলাম আযমকে সবাই এড়িয়ে চলতে চেয়েছে। কারণ, বাংলাদেশে গণহত্যার, ধর্ষণ ও যুদ্ধাপরাধের প্রতীক তিনি এবং বিষয়টা আমাদের জন্য লজ্জার, কারণ তিনি বাঙালি। বেগম জিয়া প্রথম রাজনীতিবিদ যিনি তার সঙ্গে উষ্ণ বৈঠক করলেন। গোলাম আযমকে মিন্টো রোডে নিয়ে এলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের পরই ২৯ মিন্টো রোডের স্থান।

আমাদের মতো আমজনতার যে লাভটি হল, তা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিএনপির ভড়ংবাজিটা স্পষ্ট হল। এখন থেকে আমরা মনে করি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিএনপির কথা বলার কোনো অধিকার নেই। এবং এ অধিকার ফিরে পাওয়ার আশাও নেই। আমাদের রাজনীতিবিদরা স্বল্প মেয়াদ বা এক টার্মের রাজনীতি করেন। এ কারণে, বাংলাদেশের দু'টি প্রধান দল জামায়াতকে সহযোগিতা করেছিল। ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা বলেছিলেন, জামায়াত হচ্ছে ব্যবহারের জন্য। তা ঠিক। তবে, জামায়াতও তাদের ব্যবহার করে এতদূর এসেছে। ব্যবহার্য জিনিস দীর্ণ হলে ফেলে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে বিশেষত্ব হচ্ছে জামায়াতকে কেউ ফেলে দিতে পারেনি। বিএনপি জামায়াতের মিলন তার প্রমাণ।

বিএনপি এখন আর আগের বিএনপি রইল না। এ মতে চললে বিএনপির ভবিষ্যৎ কী তা অনুমান করা যায়। সেটি আমরা না বলে বিএনপির নেতা, বর্তমানে বিএনপির রাজনীতিতে ক্ষুব্ধ জনাব সাইফুর রহমানের ভাষায়ই বলি-

"আজ কিছু নতুন লোক দলে ঢুকে আমাদের হেয় করতে চাচ্ছেন। ওরা আজ দলকেই বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন।....আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, এসব লোকের কেউ কেউ এক সময় বিএনপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ভূমিকা রেখেছিলেন। " বিএনপির এমপি মেজর (অব) আখতারুজ্জামান বলেছেন- "ম্যাডাম, একটা গ্রুপ আপনাকে ডুবানোর জন্য দলের ভিতর তৎপর রয়েছে। ওদের সম্পর্কে সতর্ক না হলে দলের সর্বনাশ হয়ে যাবে।" (দৈনিক ইনকিলাব, ৩১-১০-৯৭।)

১০.১১.১৯৯৭

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে কি সম্পূর্ণ হবে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়?

২৭ বছর আগে ১৬ ডিসেম্বর আমরা সমস্ত শোক ভুলে রাস্তায় নেমে এসেছিলাম, মুখে হাসি নিয়ে স্বাধীনতা বরণ করতে। কারণ এ স্বাধীনতার জন্য কবি শামসুর রাহমানের ভাষায়-'সকিনা বিবির কপাল ভাংলো, সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর' আর 'ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।' তখনও দগদগ করে জ্বলছে বুক, রক্তক্ষরণ হচ্ছে অনবরত। কারও স্বামী বেয়নেট বিদ্ধ, সন্তান নিখোঁজ, বোন ধর্ষিত। প্রতিশোধে যে চোখ জ্বলে ওঠেনি, হাত নিশপিশ করেনি তা নয়। সেটিই স্বাভাবিক। তবে প্রায় ক্ষেত্রে সবাই সংযত করেছে নিজেকে। অনেক খুনীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল, মাত্র স্বাধীন হয়েছে দেশ। হবে, সবই হবে, ন্যায্য বিচার হবে। ১৯৭৩ সালে বিশাল এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলার মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্ন কি অপূর্ণ থাকবে? পৃথিবীতে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে স্বাধীনতাবিরোধী নামে একটি পক্ষ আছে। অনেক বিদেশী আমাকে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে স্বাধীনতাবিরোধী আবার থাকে কি করে? পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশে কেন এই শ্রেণীর উদ্ভব হলো? অনেকে বলবেন, বাঙালীরা ক্ষমাশীল, তাই এটি সম্ভব। আমি বলব, না, এটি বাঙালীর সুবিধাবাদ, নিষ্ঠুরতা।

আমার সামনে এখন গত কয়েক দিনের এবং ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকার ফাইল। সাম্প্রতিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় বিজয় দিবসকে বরণের সংবাদ। পুরনো পত্রিকাগুলোর পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, খুন হওয়া মানুষের নাম, ছবি। খুনীদের তালিকা, তাদের ধরিয়ে দেবার আহ্বান ছবিসহ। বিচারের দাবি আর বিচারের সরকারী প্রতিশ্রুতি। ১৯৭৩-৭৪ থেকে এসব খবর কমতে থাকে এবং এক সময় তা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে ২৫ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বরে। সুবিধাবাদটি কি? তা হলো ১৯৭১ -এর পর কিছু মুক্তিযোদ্ধা ও প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের সম্পদের বিনিময়ে বিচারের দাবি ত্যাগ। সুবিধাবাদ হলো ১৯৭৫ থেকে খুনীদের বিচারের সব পথ রুদ্ধ করে দেয়া। সমাজে, রাষ্ট্রে যুদ্ধাপরাধীদের প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মিত্রে পরিণত করা। নিষ্ঠুরতা হলো, স্বজনহারাদের কান্না দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। হয়ত এর কারণ এই যে, যারা ক্ষমতায় ছিল তাদের ৯০ ভাগের স্বামী মারা যায়নি, সন্তান হারায়নি, বোন ধর্ষিত হয়নি, স্ত্রী নিঃস্ব হয়নি। যার যায়নি সে বুঝবে কি করে হারানোর বেদনা! এই হচ্ছে বাংলাদেশ-আমাদের সোনার বাংলা।

বাংলাদেশ যে আজ অস্থিতিশীল তার প্রধান কারণ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়া। সমাজ, রাজনীতিকে এরা দ্বিখণ্ডিত করেছে। সমাজে, রাষ্ট্রে এ ধারণার সৃষ্টি করা

হয়েছে যে, খুন করলে কি হয়? কিছু না। লুট করলে কি হয়? কিছু না। ধর্ষণ করলে কি হয়? কিছু না। এসব বোধ পরতে পরতে মানুষের মনে জমা হয়, হিংস্রতা বাড়ে। তারপর কি হয়? তার প্রমাণ আজকের বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি থেকে কখনও বিরত থাকেনি। কখনও উচ্চগ্রামে, কখনও নিচুগ্রামে তা উচ্চারিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটি তা তীব্র করে তোলে। এখন তা আরও জোরদার। জোরদার আরও হবে এ কারণে যে, পৃথিবীর রাজনীতির অবস্থাটা বদলেছে। অপরাধ করে, লুট করে, ধর্ষণ করে কোথাও আশ্রয় নেয়া আজ অসম্ভব হয়ে উঠছে। চিলির পিনোশে এর উদাহরণ। সুহার্তোকেও দাঁড়াতে হবে কাঠগড়ায়। স্লাভ নেতাদের বিচার চলছে। বাংলাদেশে তা হলে যুদ্ধপরাধীদের বিচার হবে না কেন?

সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা সব সময় বলেছেন, সব রাজনৈতিক হত্যার, খুনের বিচার হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও দাবি করেছিলেন এক সময়। গণহত্যা কি রাজনৈতিক হত্যা নয়? বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পর এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। অনেকে বলছেন, শহীদ পরিবারের কেউ মামলা দায়ের করলে প্রচলিত আইনে বিচার হবে। আমরা বলি, তা হবে না। কেন হবে না তা বলছি।

১৯৭২ সালের একটি সংবাদে দেখি ডঃ আবুল কালাম আজাদকে হত্যার দায়ে দু'জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর এ মামলার কি হলো তা জানি না। ডাঃ আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী হিসাবে আলবদর আব্দুল মান্নানকে (বর্তমানে 'মাওলানা' হিসাবে পরিচিত ও 'ইনকিলাব' নামক মুক্তিযুদ্ধবিরোধী পাকিপন্থী পত্রিকার একজন মালিক) ধরা হয়েছিল। সেও ছাড়া পেয়ে যায়। শহীদুল্লাহ্ কায়সারের হত্যাকারী হিসাবে পরিচিত খালেক মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইবুনালের জজ সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। হাইকোর্ট সে রায় বাতিল করে। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর একটি আর্গুমেন্ট বিচার করুন এ প্রসঙ্গে - "Circumstances showing that about Khaleque was member of Jamat-e-Islami dominated the mind and judgement of the prosecution witnesses because impression was created that Jamat-e-Islami was against the movement of the liberation. Be that as it may this impression was responsible for influencing the inductive reasoning of the witness." তাছাড়া ধরে নেয়া যাক খালেক ধরে নিয়ে গেছে শহীদুল্লাহ কায়সারকে হত্যার জন্য, কিন্তু হত্যা করেছে তার প্রমাণ কি? এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী রায় দিলেন, "In the circumstances, therefore, the opinion is that doubt has crept into the prosecuition case and this doubt gives in favour of the accused and we accordingly give benefit of doubt..."

১৯৭১ সালে জামায়াত মানুষ খুন করেছে সেখানে কি ইমপ্রেশন হবে আওয়ামী লীগ খুন করেছে? তা হলে ন্যাচারাল জাস্টিস বলে কিছু থাকবে দেশে?

আমরা এগুলো মেনে নিয়েছি কারণ আমরা সেই আইনের ফ্রেমে বাস করি কিন্তু

সেই আইনের ব্যাখ্যাও কি বাস্তবতা বিবর্জিত হবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। বাংলাদেশে যত বিতর্কমূলক নির্বাচন হয়েছে তার প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি। বাংলাদেশে যতগুলো অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রায় প্রতিটির প্রধান ছিলেন একজন বিচারপতি। ১৯৭৮ সালে বিচারপতিরাই রায় দিয়েছিলেন সামরিক আইন বৈধ বা সভ্য দেশে জংলী আইন নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে পরিগণিত হয় এবং সরকারী সমস্ত কাজকর্ম ঐ ভাষায় সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া হয়। অধিকাংশ বিচারপতি সে আইন মেনেছেন কি?

তাই বলি, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য দায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রচলিত আইনে সম্ভব নয়। 'মাওলানা' মান্নান যদি বলে ডাঃ আলীম আত্মহত্যা করেছে, তখন কি হবে? বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রচলিত আইনে সম্ভব হয়েছে, কারণ হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে তা স্বীকার করেছিল। মান্নানরা কি তা করেছে? যদিও আমরা জানি সংবাদপত্রে তখন এ সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছাপা হয়েছে। এ ধরনের বিচারের জন্য সব সময় স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়। সংবিধানেও তার বিধান আছে। সুতরাং স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বাধা কি? এবং তাতে সরকারকেই বাদী হতে হবে। শহীদ পরিবারগুলো আজ নিঃস্ব। প্রচলিত আদালতে মামলা করলে তাদের মৃত্যু হবে কিন্তু আদালতের রায় শুনে যেতে পারবে না।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন সহজ, কারণ, বাংলাদেশের তিনটি দলই নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে দাবি করে। জেনারেল এরশাদকে তো এ কারণে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ 'রণবীর' উপাধিও দিয়েছিল। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদে যদি ঐকমত্য না হয় তাহলে আন্তরিকতা ও ভণ্ডামির সংজ্ঞা নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে।

আমরা মনে করি, বাংলাদেশের সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে হলে, মৌলবাদীদের অন্ধকার যুগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা প্রতিরোধ করতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে এবং আমরা আজ সেই ৩০ লাখ মানুষের পক্ষ থেকে বিচার চাইছি- যাঁরা তাঁদের বর্তমান বিসর্জন দিয়েছিলেন আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আজ সবাই বিজয় দিবসের উৎসবে মগ্ন। একবার কি ভেবেছেন, ত্রিশ লাখের স্বজনের কথা যারা কান্না চেপে দেখছে এ উৎসব। আপনার কি মনে হয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে সম্পূর্ণ হবে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়?

১৬.১২.১৯৯৮

ধর্মের রাজনীতি, রাজনীতির ধর্ম

নিজের পাতা ফাঁদে পা আটকে যাবে তা কখনো হয়ত ভাবেন নি অধ্যাপক ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। বেগম খালেদা জিয়ার একনিষ্ঠ ভক্ত জনাব ব. দ. চৌধুরী সংসদে বিরোধীদলের নেত্রীর ভূমিকা পালন করেন। বেগম জিয়া গণতন্ত্রের কথা বারবার বললেও সংসদে পারতপক্ষে আসেন না। কেন, তা নিজেই জানেন। সংসদে একটি ঐতিহ্য ছিল নিয়মকানুন মেনে যুক্তিযুক্ত বক্তব্য রাখা। এখন অবশ্য সে ঐতিহ্য শেষের পথে। বেগম জিয়া স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন সংসদে। ডা. চৌধুরী কয়েকদিন আগে, আবেগের তোড়ে ইসলাম বিষয়ক কিছু কথা বলে ফেলেছিলেন সংসদে। তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ সোরগোল তোলে। স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগ এ থেকে যতটা সম্ভব রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চেয়েছিল। সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের কাছে এর কোনোটিই রুচিকর ঠেকে নি এবং প্রশ্ন উঠেছে এবং আবারও উঠবে, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি আর কত হবে এবং রাজনীতির ধর্মই-বা কী হবে?

আগে বলা যেত, সাম্প্রদায়িক না হলে বিএনপি করা যায় না। এখন আওয়ামী লীগ গত ক'বছরে কিছু ইস্যুর মোকাবিলা করেছে যেভাবে এবং বর্তমান বিতর্কের প্রেক্ষিতে অনেকেই বলেছেন, আওয়ামী লীগেও বিএনপি ঢুকে পড়েছে। নিছক আওয়ামী লীগ বিরোধিতার কারণে বিএনপি গঠিত হয়েছে তা নয়। এর পিছনে একটি আদর্শ আছে। মুক্তিযুদ্ধ করলেও জেনারেল জিয়ার পরাণের গহীন গভীরে প্রোথিত ছিল কাকুল কালচার। যে-কারণে তিনি ধর্মব্যবসায়ীদের সহায়তা করেছেন, আলবদর/রাজাকারদের গদিতে বসিয়েছেন, জামায়াত, মুসলিম লীগকে অবাধে রাজনীতি করতে দিয়েছেন। ইসলামকে ঢাল হিসাবে সামনে রেখে অর্থ ও পেশীশক্তির সাহায্যে ক্ষমতা বিস্তৃত করেছেন। শুধু এই কারণেই আবার অনেকে আওয়ামী লীগ পক্ষের না-হলেও বিএনপি সমর্থন করতে পারেন না।

বিএনপি জামায়াত ও ঘাতকরা একত্রে মিলেমিশে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে, সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলবে এটাই স্বাভাবিক। অধ্যাপক বি. চৌধুরীর আগে যে-ইমেজ ছিল সজ্জন, ডাক্তার, অধ্যাপকের, এখন আর তা নেই বলাবাহুল্য। কারণ বিএনপি-দর্শন তিনি এখন আত্মস্থ করেছেন এবং খাস বিএনপির মানুষজন যে-ভাষা ব্যবহার করে গত তিন বছরে তাই তিনি করছেন। সবাই এখন কনভিন্সড্ যে, জনাব চৌধুরী একজন ভালো অভিনেতাও বটে। এই বিষবাষ্প তিনি এতদিন ঢেকে রাখতে পেরেছিলেন। এহেন ডাক্তার চৌধুরী সংসদে বলেছেন, 'আমাদের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.)। তিনি ছিলেন উম্মী। কিন্তু তাঁর জ্ঞান

ছিল অপরিসীম। সুতরাং এ ধরনের বক্তব্য ঠিক নয়।' অর্থাৎ বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে অল্পশিক্ষার অভিযোগ করা হয় তাতে কিছু আসে-যায় না। তিনি জ্ঞানী। ফলে এক্ষেত্রে চলে এসেছে মহানবীর (সা.) সঙ্গে তুলনা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া।

এতদিন বিএনপি জোট কারণে-অকারণে, আওয়ামী লীগ ও সমর্থক এবং প্রগতিশীলদের মধ্যে ইসলামী জোশ কম বলে প্রতিপন্ন করতে চাইত। এখন তারা এবং তাদের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত দৈনিক ইনকিলাব পড়েছে মুশকিলে। ফলে তারা এক নতুন ইস্যু তুলেছে পবিত্র কোরান শরিফ ডাস্টবিনে পাওয়া যাচ্ছে। এ সংবাদ 'ইনকিলাবে'ই ছাপা হয় শুধু। এটির উদ্দেশ্য তাদের নেতাকে আড়াল করে সরকারের বিরুদ্ধে ইসলাম বিপন্নের ধুয়া তোলা। সে-প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য। মহানবী (সা.) বা তাঁর সাক্ষাত শিষ্যদের সঙ্গে নিজ নেতাকে তুলনা করা ডা. চৌধুরীর পুরনো অভ্যাস। যেমন সংসদে তোফায়েল আহমদ বলেছেন, 'আওয়ামী লীগ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না।' তিনি বলেন, এই বদরুদ্দোজা চৌধুরী ১৯৮১ সালে জুন মাসে হজরত ওমরের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের তুলনা করে বলেছিলেন, জিয়া নিজেকে ওমরের মতো গড়ে তুলেছেন (জনকণ্ঠ ২-৭-৯৯)। জনাব আহমদেরও প্রথম বাক্যটি ঠিক নয় অন্তত বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে।

ডা. চৌধুরী কতটা সাম্প্রদায়িক তা বোঝা যায় এ প্রসঙ্গে সংসদে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে দেয়া তাঁর বক্তব্যে–'অজয় কর, বলরাম পোদ্দার বা অন্য কোনো তিলকধারীর কাছ থেকে ধর্ম শিক্ষা নিতে হবে না।' নেয়াটা জনাব চৌধুরীর প্রয়োজন কারণ তিনি ধর্মের রাজনীতি শিখেছেন, রাজনীতির ধর্ম শেখেন নি। ইসলাম কখনো সাম্প্রদায়িকতাকে অনুমোদন করে নি।

তাঁর এ বক্তব্যে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া হতেই পারে। তাঁর মাসুলও তাঁকে গুণতে হবে। আওয়ামী লীগ এ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাইবে তাও স্বাভাবিক। রাজনীতি এক অর্থে তাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা উচিত, কোথায় নামতে হবে সে-বোধও থাকা উচিত এবং সেটাই রাজনীতির ধর্ম। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী তা মানেন নি। তাঁদের আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মব্যবসায়ীদের খুব একটা তফাত ছিল না। এটি অনেককে ব্যথিত করেছে এবং এর প্রতিফলন ঘটছে পত্রপত্রিকায়। গত কয়েকদিন এ বিষয়টি নিয়ে প্রতিটি পত্রিকায় প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। আওয়ামী লীগের যারা সমর্থক ও শুভ কামনা করেন তাঁদের মনে দু'টো প্রশ্ন জেগেছে–

১. আওয়ামী লীগের আচরণ যদি বিএনপি-জামায়াতের মতো হয় তা হলে তিন দলের মধ্যে পার্থক্য টানা হবে কীভাবে? কোন ভিত্তিতে সমর্থন করা হবে আওয়ামী লীগকে।

২. ইসলামকে ব্যবহার করে যারা রাজনীতি করতে চাইছে তাদের আরো ইন্ধন ও প্রশ্রয় যে-যোগানো হবে, যা একসময় নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না এবং যা দেশ-জাতির জন্য হবে ক্ষতিকর।

এ পরিপ্রেক্ষিতে জনকণ্ঠ-এ পর্যবেক্ষক যথার্থই মন্তব্য করেছেন–'অধ্যাপক বি.

চৌধুরী পবিত্র ধর্ম ইসলাম এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর অবমাননা করেছেন, তিনি মুরতাদ, বিধর্মীদের এজেন্ট, তাঁকে প্রকাশ্য ক্ষমা চাইতে হবে;–এসব বক্তব্য ও দাবির মধ্যে ধর্মের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে উস্কানিমূলক ধর্মান্ধতাই এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহারের প্রবণতা স্পষ্টতই প্রতিভাত। আওয়ামী লীগ বরাবরই এ দেশে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করে আসছে। তারা নিজেরা এখনো সে-রকম দাবিই করতে পছন্দ করে। ফলে তাদের মুখে এ রকম সাম্প্রদায়িক ও উগ্রমৌলবাদী উচ্চারণ রীতিমতো উদ্বেগজনক। একান্ত মাঠকর্মী বা সংসদের পিছনের সারির সদস্যদের মুখে যদি এসব উচ্চারিত হতো, তাহলে হয়ত বিষয়টিকে অতটা সিরিয়াসলি না নিয়ে পারা যেত। কিন্তু বাঘা বাঘা নেতাসহ সামনের সারির শীর্ষ নেতারা যখন বলেন, তখন আতঙ্কিত হতে হয়। এমনিতেই দেশব্যাপী অব্যাহত নারী নির্যাতন, ফতোয়াবাজি, ঘাতক-দালালদের আস্ফালনে প্রগতিশীল জনগোষ্ঠী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে নিয়ে একধরনের আশাভঙ্গের বেদনায় আক্রান্ত। এর ওপর ধর্মান্ধতার এই পশ্চাৎগমন জাতির অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যকেই ঠেলে দেবে হুমকির মুখে।'

আনিসুল হক প্রথম আলোয় লিখেছেন–'অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে, বিএনপি হলো ফতোয়াবাজদের বড় পৃষ্ঠপোষক, আর আওয়ামী লীগ নিজেই হলো এখন ফতোয়াবাজ।'

আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ হতে লেগেছে মাত্র ছয় বছর। তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, '১৯৫৫-এর জুলাইতে গণপরিষদে যখন যাই আর আসি, তখনি বুঝতে পারলাম মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে সব ধরনের মানুষকে নিয়ে সংগঠন গড়তে হবে। আমাদের দুঃখ-দুর্দশার অনেক কারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ।' (আবু আল সাঈদ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস)। এ কারণেই আওয়ামী লীগ এগিয়ে গিয়েছিল এবং '৭২-এর সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে যোগ করতে পেরেছিল। ইসলাম, মুসলিম–এসব আবেগ নিয়ে যে খুব একটা এগোনো যাবে না এটা যদি বঙ্গবন্ধু ৪৫ বছর আগে বুঝে থাকেন তবে আজকে তাঁর দল সে-ভুল করবে কেন? ডা. চৌধুরীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত যদি তাঁর বক্তব্যের কঠোর নিন্দা করে, ধর্ম নিয়ে তাঁদের রাজনীতির বিষয়টি আরো উন্মোচিত করা হতো তা হলে আওয়ামী লীগ আরো উপকৃত হতো।

নির্বাচনের আগে থেকে আওয়ামী লীগের একাংশের এ ধারণা হয়েছে যে, মুসলমানত্ব যত প্রকাশ করা যাবে ভোটের বাক্স তত ভরে উঠবে। কিন্তু উঠেছে কি? কোনো ইস্যু না থাকলে এখানকার রাজনীতিবিদরা পাকিস্তান আমলের মতো ধর্ম নিয়ে মাতামাতি শুরু করেন। সম্প্রতি যেমন ইনকিলাবে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, ডাস্টবিনে পবিত্র কোরান শরিফ পাওয়া যাচ্ছে। পঞ্চাশ বছরে এ ধরনের ঘটনা ঘটল না, এখন ঘটবে কীভাবে? আর পবিত্র কোরান শরিফ পুড়িয়েছে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাঁর সহযোগীরা। সে-আলোকচিত্রও আছে। সুতরাং এ ধরনের সংবাদের মাজেজা বোঝা অসম্ভব নয়। এখন আওয়ামী লীগ কি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে? করলে কার বিরুদ্ধে করবে?

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি যে ক্ষতিকর আর কেউ না হোক হয়ত ডা. চৌধুরী অনুধাবন করছেন। এ ধরনের চেষ্টা যেই করুক তাকেই রোধ করা উচিত এবং আওয়ামী লীগেরই তাতে নেতৃত্ব দেয়া উচিত। এটিই তাদের ঐতিহ্য। আওয়ামী লীগের আওয়ামী মুসলিম লীগে ফিরে যাওয়া প্রগতির ইঙ্গিত বহন করে না। তাতে বড় ধরনের একটা সমর্থন আওয়ামী লীগ হারাবে। আর তা ছাড়া আগুন নিয়ে খেলতে গেলে আগুনের আঁচ গায়ে লাগবেই।

৭.৭.১৯৯৯

মানুষ যখন সংখ্যা তখন আপনি কি নিরাপদ?

মানুষকে যদি মানুষ হিসেবে আমরা বিবেচনা করি বা বিবেচনা করতাম, তাহলে সমাজের ইতিহাসে এ-রকম হতো না। আমরা তা করি নি দেখে সমাজের ইতিহাস অন্যরকম হয়েছে বা হতে যাচ্ছে। হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেকের একেকটা নাম আছে বটে, কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে মৃত্যুর পরপরই হয়ে যাই আমরা নিছক সংখ্যা। মৃত্যুর আগেও অবশ্য আমরা এ ধরনের সংখ্যা বিরাট মিছিলের অংশ, বিরাট জনসভার অংশ। কৌশলী রাজনীতিবিদদের দাবার ঘুঁটি। গত কয়েক মাসের ঘটনা তা প্রমাণ করে।

শুরুটা কোনখান থেকে করব? যশোরের ঘটনা নাকি আরো আগের ঘটনা দিয়ে? যেখান থেকে শুরু করি-না কেন ব্যাপারটা ঘুরেফিরে সেই একই দাঁড়াবে।

উদীচীর ঘটনা সকালে শোনার পর একজন আমাকে বললেন, যাক বেঁচে গেলেন। আপনারও তো যাওয়ার কথা ছিল। তিনি ভুল বলেছেন, আমি বা আমরা বেঁচে যাই নি। আমাদের মরণ শুরু হয়েছে মাত্র। অন্য দেশে মানসিকভাবে উজ্জীবিত থাকেন যাতে বাঁচতে পারেন দীর্ঘদিন। এ-দেশে আমরা মানসিকভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। অদ্ভুত গত বছর দু'য়েক ধরে আমি বা আমরা এও জানি যে মৃত্যু হয়ত স্বাভাবিক হবে না।

৭ মার্চ সন্ধ্যায়, ঢাকায় অনেককে দেখেছি বিবিসি শুনছেন যশোরের ঘটনা জানার জন্য। এর অর্থ সরকারি প্রচারে মানুষের আস্থা নেই। কারণ বেতারে সারাদিন এ-খবর প্রচার করা হয় নি। তবুও রাত আটটায় সবাই টিভি ছাড়ে, যদিও রাত আটটার টিভি সংবাদ শুরু হলে সবাই চ্যানেল বদল করে। প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সংবাদ শুনতে শুনতে সবাই যখন ক্লান্ত, তখন শেয়ার মার্কেটের খবরের আগে আগে জানানো হলো যশোরের ঘটনা। আগের ৭ মার্চ থেকে ১৯৯৯ সালের ৭ মার্চের ঘটনা ছিল বর্তমানের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সারাবিশ্বের প্রচারমাধ্যমে যে খবর সারাদিন প্রচার করেছে গুরুত্বের সঙ্গে সেখানে খোদ বাংলাদেশে এ-রকম! ঢাকায় মানুষকে আমি এত ক্ষুব্ধ হতে আর দেখি নি। তারা কী বলে সরকারকে গালিগালাজ করেছিল সেটিও আমি উল্লেখ করব না। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও করবে না। কারণ অতীত অভিজ্ঞতার মতো তারাও জেনেছে এখানে ব্যতিক্রম কিছু নেই। সেই রিপোর্টই করতে হবে যা সরকার পছন্দ করে। ৮টার সংবাদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিভি তার শেষ বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। সংসদে বাহরাইনের খলিফা মারা গেছেন তার জন্য শোকপ্রকাশ করা হয়। যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে নিহতদের জন্য নয়। কারণ এরা স্বল্পবিত্ত, গরিব; এরা মারা পড়লে রাজনীতিবিদের কিছু আসে যায় না। কারণ এরা তো সংখ্যামাত্র। মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন রাজনীতিবিদ হলে ঐদিন সংবাদে শুধু শোকপ্রকাশ নয়, নিন্দা করা হতো ঘটনার এবং অভাবিত ঘটনার জন্য জাতীয় শোকপ্রস্তাব করা হতো। আপনাদের মনে আছে কি না

জানি না, ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর বেগম জিয়া ক্ষমতায় এলে, সংসদের প্রথমদিন গণআন্দোলনের শহীদদের নামে প্রস্তাব করা হয় নি, কারণ তারা তো সংখ্যামাত্র।

অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলো 'দুঃখ' প্রকাশ করেছে। সবাই আশঙ্কা করছিল মান্নান ভূঁইয়া বা বেগম জিয়া বলবেন ঘটনাটি সাজানো, তাঁরা যে এটুকু বলে মৃতদের অপমান করেন নি তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। মান্নান ভূঁইয়া বলেছেন, আইনশৃঙ্খলার প্রতি সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। দৈনিক মুক্তকণ্ঠ বলেছে, পুলিশের চেন অব কমান্ড ভেঙে পড়ছে। এ বক্তব্যগুলোর সঙ্গে এখন অধিকাংশ মানুষই আর দ্বিমত পোষণ করবেন না। প্রধানমন্ত্রী কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কঠোর নির্দেশ যে পালিত হয় না মোটামুটি এটা সবার জানা। হলে, একই ধরনের ঘটনার এত পুনরাবৃত্তি হতো না। সমস্যা হচ্ছে ব্যর্থতার কথা অনায়াসে বলা যায়। কিন্তু কীভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করা যায় সে বিষয়ে বিরোধী দলও সংসদে আলোচনা করে না। আইনশৃংখলার অবনতি এখন একনম্বর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিএনপির কি ধারণা, তারা ক্ষমতায় গেলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে? অবশ্য অনেকে এখন বলছেন, কোনো প্রস্তাব এলেও কি সরকারি এমপিরা তাতে গা করবেন?

আজকাল হরতাল ডাকলেই সবাই জেনে যায় যে, সেদিন কেউ-না-কেউ নিহত হবে। হয় হরতাল প্রয়োগে, নয় রাজপথ দখলে। দৈনিক জনকণ্ঠ গত একসপ্তাহ ধরে হরতালে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের মর্মস্পর্শী বিবরণ ছেপেছে। যদি পড়ে থাকেন নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁরা কেউ রাজনীতিবিদ নন, ধনী বা স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত নন। হদ্দ গরিব। হরতাল শেষে আমরা জিজ্ঞাসা করি ক'জন মারা গেছে হরতালে? সংখ্যামাত্র, মানুষ এখন শুধু সংখ্যা।

গরিবরা সবসময়ই সংখ্যা হয়েছে এ দেশে, যদিও দেশটা গরিবদের। মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে এ ঘটনার আর পরিবর্তন হয় নি। এখন সংখ্যায় যোগ হতে যাচ্ছে নতুন একটি গ্রুপ– সংস্কৃতিকর্মী ও মডারেট রাজনীতিবিদ।

সংস্কৃতিসেবীরা (বৃহত্তর অর্থে) সবসময়ই স্ট্যাবলিশমেন্টের টার্গেট। স্ট্যাবলিশমেন্টের অনাচারের বিরুদ্ধে সবসময়ই তাঁরা মাথা তোলেন। রাজনীতিবিদরাও তাঁদের বিপক্ষে যদি না তাঁদের পক্ষে কথা বলা হয়। ধর্মান্ধ এবং ধর্ম ব্যবসায়ীরা সব সময় স্ট্যাবলিশমেন্টের পক্ষে (বা শক্তির) থাকে। এটা পুরোনো কথা তবুও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বলি– জেনারেল জিয়া এঁদের সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার ও সুযোগ দিয়েছিলেন তাঁর বিরোধীদের দমনের জন্য। জেনারেল এরশাদ তাঁদের সযত্নে পালন করেছেন বিরোধীদের নির্মূল করার জন্য। আওয়ামী লীগও তাঁদের প্রশ্রয় দিয়েছে এ ভুল ধারণায় যে তাদের ভোটব্যাংক বাড়বে। এ শক্তিকে প্রশ্রয় দিলে কী হয় এখন আরো স্পষ্ট হচ্ছে। গত দশ বছরে আমাদের লেখাগুলো উল্টেপাল্টে যদি কেউ দেখেন, তাহলে দেখবেন আমরা বারবার বলেছি এ প্রশ্রয় দিলে বিপদ ডেকে আনা হবে। এর বিপরীতে, রাজনীতিবিদরা কী বলেছেন আর কী করেছেন যদি মিলিয়ে দেখেন তাহলে ক্রুদ্ধ নয়, ব্যথিত হবেন। কারণ মানুষ হলে কথায় এবং কাজে এত ফারাক হবে কেন?

আমরা চিরকাল শুনে এসেছি মাওলানা তারাই যাদের দিল খাস, জবান মোলায়েম,

যারা অপরাধী নন, অপরাধের প্রতিবাদ করেন। ৮ মার্চ পল্টনে যাঁরা বক্তৃতা দিয়েছেন তাঁদের জবান শুনে আপনারাই বিচার করুন। ফজলুল হক আমেনী বলেছেন, 'এনজিওদের পৃষ্ঠপোষকতায় তরুণীরা আজ হ্যাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি গায়ে দিয়ে চলাফেরা করছে' (মানব জমিন)। আপনারা এমন কোনো এনজিওকর্মী দেখেছেন? যদি না-দেখে থাকেন তবে জনাব আমিনীকে কী বলবেন? 'মাওলানা আবু বকর কবি শামসুর রাহমানকে জাতীয় কুত্তা বলে অভিহিত করেন' (মানব জমিন)। এগুলো কি নেক জবান? এগুলো কি নাফরমানি উক্তি না? আল্লাহ কি এর বিচার করবেন না?

বিএনপি বা জাতীয় পার্টির কাছে মডারেট বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কেউ তেমন আশা করে নি, করেও না, তাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল আওয়ামী লীগকে ঘিরে। আওয়ামী লীগ নিজেই সে বিশ্বাস জাগিয়েছিল। এখন সবাই বলছেন, সরকার ক্রমাগত এদের তোয়াজ করার ফলে পরিস্থিতি আজ এ দাঁড়িয়েছে। তারা আরো বলেন কীভাবে সরকার এদের কাছে ভোটের আশা করে। যদি তারা তাই দিত তাহলে '৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট আরো ১০ শতাংশ বাড়ত। যশোরে যা হয়েছে তা'কি খুব অস্বাভাবিক নাকি কিছু ঘটনার ধারাবাহিক পরিণতি? '৯৭-এর শুরুতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতো জায়গায় প্রেসিডেন্টের দিকে জুতা ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। বিচার হয়েছে? ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, ফরিদপুর– কোথাও তালেবানপন্থিদের বিপরীতে অন্যরা সরকারের সমর্থন পায় নি।

সরকার যেন ফুটবল খেলার রেফারি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনায় সবাই উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিল, এসব ঘটনা বাড়বে এবং সত্যিই তাই হয়েছে। তারপর আক্রান্ত হয়েছেন শামসুর রাহমান, তারপর নিহত হলেন কাজী আরেফ, তারপর বরিশাল, ফরিদপুর এবং তারপর যশোর। সুতরাং ৮ মার্চ পল্টনে তালেবানপন্থিরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে 'ক্ষমতা দখল না করলে ইসলাম বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ছে। জিহাদী জজবা নিয়ে তালেবানী শাসন জারি না-হওয়া পর্যন্ত রাজপথ দখলে রাখার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, 'তালেবানদের সমর্থন না দিলে সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবে না' (জনকণ্ঠ ৯.৩.৯৯)।

পাঠক, যে ধারা দেখছি তাতে মনে হয় এখনো সবাই নিশ্চুপ থাকবে, বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দল এর নিন্দা করবে না। হাইকোর্ট তো অনেক বিষয়ে সুয়োমোটো করে, কিন্তু জাতীয় ব্যক্তিত্বদের অবমাননা এবং দেশদ্রোহী উক্তির বিরুদ্ধে নিশ্চয় সে-ধরনের কিছু হবে বলে মনে হয় না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশে আজ নিরস্ত্রদের পক্ষে কেউ নেই।

বিএনপি, জাতীয় পার্টি নিরস্ত্রদের পক্ষে থাকবে না তা জানা কথা, কারণ বেগম জিয়া ও জেনারেল এরশাদ সরকার উৎখাতের হুমকি অনেক আগেই দিয়েছেন। এ যে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ও নিরস্ত্রদের হত্যা করার ব্যাপারে কি এদের কারও দায় নেই? দৈনিক সংবাদ উল্লেখ করেছে–'প্রাথমিক তদন্তে তাদের ধারণা মৌলবাদী ধর্মান্ধ গোষ্ঠী এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থী সর্বহারা পার্টির সদস্যরাই এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। দেশের প্রধান একটি বিরোধীদলের যশোরের এক নেতা

বিস্ফোরণে ইন্ধন যুগিয়েছেন' (৯.৩.৯৯)। এ পরিপ্রেক্ষিতেই যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন তুলেছেন আবেদ খান–'তবে কি ধরে নেব অতঃপর বাংলায় একাত্তরের মৌলবাদী স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিই সদম্ভে বিরাজ করবে এবং এ দেশের নারীরা আফগানিস্তানের নারী হয়ে যাবে? এ দেশের মানুষেরা আফগানিস্তানের মানুষ হয়ে যাবে? আমাদের বিশ্বাস তো লুট হয়ে যাচ্ছে।'

সাধারণ নাগরিকরা আরো কঠোর ভাষায় কথা বলছেন যার খানিকটা প্রতিধ্বনিত হয়েছে আমান-উদ-দৌলার রিপোর্টে– 'আত্মবিমোহিত সরকারি দলের ক্ষমতার নানান খেলা, উদাসীনতার বিলাস... শুধু জনমানুষকেই প্রতারিত করছে না, নিজেদের জন্যও সমূহবিপদ ডেকে আনছে' (জনকণ্ঠ ৮.৩.৯৯)।

১৯৭০-৭১ সালেও অনেকটা এ-ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন নিরস্ত্রদের পক্ষে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। নিরস্ত্ররা জয়ী হয়েছিল। আজও অনেকটা সে-ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও বিপক্ষের শক্তিতে দেশ ভাগ হয়ে গেছে। শেষোক্ত শক্তি সশস্ত্র। যেমনটি লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক–'শত্রুরা আরও তীব্র ও মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে এমন আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে অচিরেই যা বিপর্যস্ত করে দেবে জনজীবন। আঘাত হানবে রাষ্ট্র ও জাতির ভিত্তিমূলে, লক্ষ্যস্থল হবেন দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা' (সংবাদ)। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চকে চ্যালেঞ্জ করেছে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ৭ মার্চ ১৯৯৯ সালে। ৬ বা ৮ মার্চ নয়। কিন্তু আজ সে-রকম কোনো নেতৃত্বের সম্ভাবনা চোখে পড়ছে না এবং সেই কথাই বলছেন আজ অনেকে আকারে-ইঙ্গিতে। ধরা যাক সাংস্কৃতিক জোটের কথা। সাংস্কৃতিক জোট সব-সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল এবং আছে। বর্তমানে সরকারকে ক্ষমতায় আনতে তারা যথেষ্ট সহায়তা করেছে। সেই জোটের নেতা আসাদুজ্জামান নূর পর্যন্ত বেদনার্ত কণ্ঠে বলতে বাধ্য হচ্ছেন–'বারবার আঘাত আসছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ওপর। কিন্তু সরকার তা প্রতিহত করছে কি?' (প্রথম আলো, ৮.৩.৯৯)। জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদার সাংস্কৃতিক কর্মীদের সেন্টিমেন্টই প্রতিধ্বনিত করে লিখেছেন ... 'আর ঘৃণা নয়, আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদে মিছিল বিবৃতি নয়, এবার সময় এসেছে প্রতিরোধের। এ প্রতিরোধ আসতে হবে সরকারের কাছে থেকে, সকল সামাজিক শক্তির কাছ থেকে। সরকার যদি ভেবে থাকে এ আক্রমণ কেবল সংস্কৃতিকর্মী বা সামাজিক শক্তির ওপর তবে তারা প্রচণ্ড ভুল করবে। এ আঘাতের শেষ লক্ষ্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার। আর কোনো আপোস নয়, এবার প্রয়োজন কঠোর হাতে স্বাধীনতাবিরোধী, ধর্ম ব্যবসায়ী, সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা। সরকার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়, তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি' (জনকণ্ঠ)। হ্যাঁ, অপেক্ষা করব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের উদ্দেশে বলতে চাই, আপনারা কি ভাবছেন আমরা সংখ্যা হলে আপনারা নিরাপদে থাকবেন? আপনাদের পরিবার ও সন্তানরাও নিরাপদে থাকবে? বাংলাদেশ হবে নিরাপত্তার অভয়াশ্রম? সে-কথা ভুলে যান। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের কাহিনীটি কি আপনাদের জানা নেই?

১০.৩.১৯৯৯

যা বলার ছিল বলেই যাব জল্লাদের চোখে চোখ রেখে

[এই নিবন্ধের সহ-লেখক আবেদ খান]

আমরা যখন এ লেখা লিখছি তখন বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে কবি শামসুর রাহমানের মুখ। আমরা খবর পেয়েছি একাত্তরের ডিসেম্বরের মতো একই উদ্দেশ্য নিয়ে আততায়ী গিয়েছিল কবিকে হত্যা করতে। আমরা তাঁর বাড়িতে গেছি ঘটনাটা জানতে। তাঁকে একথাও জানাতে যে, আমরা সবসময় ছিলাম এবং আছি তাঁর সঙ্গে।

শামসুর রাহমান বসে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটায়। খানিকটা হতচকিত কিন্তু অবিচলিত। কবি-পত্নীর হাতে ব্যান্ডেজ। তিনি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলছিলেন, 'চাইনিজ কুড়াল তো আগে দেখি নি এখন দেখা হয়ে গেল।' বাড়ির অন্যান্য সদস্যের চোখেমুখে ভীতির ছায়া। কোথাও শব্দ হলেই তাঁরা চমকে উঠছেন সেই একাত্তরের মতো।

আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রায়শঃই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। হুমকির পর হুমকি দিয়ে তাঁদেরকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে বারংবার। একাত্তরের পর একজন বুদ্ধিজীবীকে ঘরে ঢুকে হত্যা করার প্রচেষ্টা এই প্রথম। শুধু তাই নয়, আমরা জানতে পেরেছি ধৃত আততায়ীদের জবানি থেকেই যে, এই গ্রুপটির ওপর দায়িত্ব ছিল কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক কবির চৌধুরী, কবি তসলিমা নাসরীন এবং মওলানা আবদুল আউয়ালকে এই সপ্তাহের মধ্যে হত্যা করার। তাদের নীলনকশা হচ্ছে একাত্তরের ডিসেম্বরে যে-কাজ অসম্পূর্ণ ছিল এখন সেই কাজই সম্পূর্ণ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তারা এই সময়কে বেছে নিল এবং কেন তারা তাদের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিল এদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিত্বদের। তারা এই সময়কে বেছে নিয়েছে এই কারণে যে, তারা হিসেব করে দেখেছে যে এই সরকার দোদুল্যচিত্ততা এবং আত্মনিমগ্নতার কারণে নিজস্ব নৈতিক অবস্থানকেই শিথিল করে। ফলে তারা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তির মহড়া দিয়ে পরখ করেছে সরকারের প্রতিক্রিয়া এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছে যে, অভিভাবকহীন সাংস্কৃতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। আর তাদের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্যবস্তু এদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিত্বরা এই কারণে যে, এদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীরা অনেক বেশি সচেতন, প্রগতিবাদী, কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং মুক্তবুদ্ধির ধারক। তাঁরা যখন প্রতিবাদ করেন কোনো কিছুর তখন যুক্তির নিক্তিতে বিচার করেই করেন। এর ফলে এস্টাবলিশমেন্ট (সে যদি তাঁর পক্ষেরও হয়) নারাজ হয়। আবার একশ্রেণীর প্রগতিবাদীরাও অনেক সময় সন্দেহ পোষণ করেন এই ভেবে যে জনমতটা বুঝি আর তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং স্বাধীন চিন্তার পক্ষে সোচ্চার হতে

গিয়েই তাঁরা হয়ে যান নিঃসঙ্গ আর এই নিঃসঙ্গতাই অতিসহজে তাঁদের দুর্বৃত্তের শিকারে পরিণত করে। ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত গোটা সময়কে বিবেচনায় আনলে আমরা দেখব, এদেশের লেখক-শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মীরাই পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা কোনো রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা আদিষ্ট হয়ে নয়, নিজেদের বিবেক দ্বারা তাড়িত হয়ে। না, এখানে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে খাটো করছি না। লেখক-সাংস্কৃতিক কর্মীদের পুরো কাজটিই থাকে সৎ, গণমুখী, সৃজনশীল রাজনীতির পক্ষে। তাই অনেক সময় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মিলে যায় কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। কিন্তু কেউ তাঁদের হুকুম করতে পারে না এবং তারা তাদের হুকুম তামিল করতে কখনো বাধ্য থাকেন না। ঊনসত্তরে 'আসাদের শার্ট' লিখতে কি শামসুর রাহমানকে কেউ বলেছিলেন? একাত্তরের অবরুদ্ধ দেশে 'হে স্বাধীনতা' শামসুর রাহমানের মুক্ত কলমের ডগা থেকে উৎসারিত হয়ে আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে অনুরণন তুলেছিল, সে কি কারো নির্দেশে লেখা? স্বৈরাচারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মৌলবাদের বিরুদ্ধে নিঃশঙ্কচিত্তে উচ্চারিত 'অদ্ভুত উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' কি ফরমায়েশি কবিতা? কামরুল হাসানকে কি কেউ হুকুম দিয়েছিলেন একাত্তরের সেই দুর্দান্ত পোস্টারগুলো আঁকতে কিংবা মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' শিরোনামের কালজয়ী স্কেচটি সৃষ্টি করতে? মানবতার দুশমনরা এটা ভালো করেই জানে যে, জাতিকে নৈতিকভাবে নিঃস্ব করতে হলে বিবেকবান মানুষদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে, হত্যা করতে হবে বুদ্ধিজীবীদের। কারণ তাঁরা কাল অতিক্রম করে যান, অনেক রাজনীতিকের পক্ষে যেটা সম্ভব নয়।

পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশের দৃশ্যপট বদলে যায়। বাংলাদেশ আবার মিনি পাকিস্তানে রূপান্তরিত হয়। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি কীভাবে প্রতিটি রাজনৈতিক দল এস্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে কোনো-না-কোনো পর্যায়ে আঁতাত করেছে যার অশুভ ছায়া পড়েছে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে। আমরা দেখেছি কীভাবে আমাদের স্বাভাবিক চৈতন্য ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে, কীভাবে আমরা ধীরে ধীরে অন্ধকারের বিদর্ভ নগরীর মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, কীভাবে একটা লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন বিভ্রান্ত জাতিতে পরিণত করা হচ্ছে আমাদের। এদেশের বুদ্ধিজীবীরা, সাংস্কৃতিককর্মীরা, লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকরা কারও নির্দেশে নয়, বিবেকের তাড়নায় রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হলেও নৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয় নি। লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক তথা মুক্তচিন্তার মানুষরা এখনো অসহায়। পঁচাত্তরের বিরুদ্ধপক্ষ এখন সংঘবদ্ধ। কবি শামসুর রাহমানের ওপর আক্রমণ তারই অনিবার্য পরিণতি।

এমন একটা কিছু হতে পারে এ আশঙ্কা আমরা অনেক আগে থেকেই করছিলাম। আওয়ামী লীগ. বিএনপি. জাতীয় পার্টি, জামায়াত গত একদশক ধরে কোনো'-না-কোনো পর্যায়ে পরস্পরের সাথী হয়েছে অথবা পরস্পরের সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়া করেছে। আর এই বোঝাপড়া এবং সখ্যতাই ঘাতকদের স্পর্ধাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, ঝলকে উঠছে তাদের হাতের চাইনিজ কুড়াল, তাদের আগ্নেয়াস্ত্র এখন আবার তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠছে, এখন আবার তারা অন্বেষণ করছে নতুন নতুন বধ্যভূমির স্থান। আমরা বলি, এই সরকার

মুক্তিযুদ্ধের সরকার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণ ও সুসংবদ্ধ করার সরকার। তাহলে এই সরকার একাত্তরের ঘাতকদের ব্যাপারে এত নমিত কেন? কেন দ্বিধাগ্রস্ত মৌলবাদী ঘাতকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে যারা হিটলিস্ট তৈরি করছে গত কিছুদিন ধরে? সরকার কি তবে এ-সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবরই রাখে না? যাদের দায়িত্ব এই তথ্য সংগ্রহের কিংবা তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার তাঁরা কি পলাশীর আম্রকাননের লড়াইয়ে নিশ্চল দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে অবশেষে? কোনো কোনো মহল থেকে বলা হয়েছে, বুদ্ধিজীবীদের একটু সাবধানে চলাফেরা করতে। স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধারা চলাফেরা করবে শঙ্কিত পায়ে আর স্বাধীনতাবিরোধীরা চলবে নির্ভয়ে? এ দেশে কেন ঘাতকদের অভয়ারণ্য হবে এ প্রশ্ন কি তবে করা যায় না? সাবধানে চলা মানে কি সত্য-প্রকাশে কুণ্ঠিত হওয়া? এদেশের বুদ্ধিজীবীদের শুধু নয়, প্রতিটি শান্তিকামী মানুষের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সরকারের। ঘাতকদের হিটলিস্টে বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মীদের নাম রয়েছে বলে জানা গেছে। সেখানে রাজনীতিবিদদের নাম আছে কি না আমরা এখনো জানি না। এই হিটলিস্ট যারা প্রণয়ন করেছে তারা সম্ভবত এটা জানে যে, রাজনীতিকের লক্ষ্য ক্ষমতা এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তাঁরা যোগ-বিয়োগ করতে পারেন কিন্তু একজন সৎ, নিষ্ঠাবান বুদ্ধিজীবী স্পেডকে স্পেডই বলেন। একজন রাজনীতিকের কাছে ভোট অত্যন্ত মূল্যবান কিন্তু একজন সৎ বুদ্ধিজীবীর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান তাঁর বিবেক। এ জন্যই হিটলিস্টে সর্বাগ্রে তাঁদেরই নাম থাকে যাঁরা ন্যায়নীতি এবং সত্যের কথা বলেন।

আমাদের অনেকেই গত একদশকে আক্রান্ত হয়েছি, এখনো হচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও হব। স্বাধীন বাংলাদেশে এটাই আমাদের নিয়তি। শামসুর রাহমান, আপনাকে আরো বলতে পারি, আপনি যদি সেদিন নিহত হতেন তাহলে রাজনৈতিক দল বা এস্টাবলিশমেন্টের কিছু আসত-যেত না। শোকবার্তা, শোকসভা এবং নিন্দা জ্ঞাপনের পর আপনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেন বিস্মৃতির অন্তরালে যেমন করে 'সকল চিহ্ন পরম অচিনের মধ্যে যায় মিশে'। হত্যাকারী ধরা পড়তেও পারত, না-ও পারত। কিন্ত আপনি সবসময় থাকতেন কবিতায়, গ্রন্থে, সাধারণের হৃদয়ে এবং আমাদের চেতনার গ্রন্থিতে। ক্ষমতাসীনদের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা সম্প্রতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'আমরা কখনো আপনাদের সম্মান দিই নি, দিতেও পারব না। এটাই ঐতিহ্য। কিন্তু আপনারাও জানেন এবং আমরাও জানি সাধারণ মানুষ আপনাদের কী চোখে দেখেন। আপনারা আপনাদের কাজই করে যান এর বেশি আর কী বলতে পারি?'

তাই বলব কবি শামসুর রাহমান আপনি যা করছিলেন, আপনি তাই করুন। আমরা যা করছিলাম আমরা তাই করব। নিরস্ত্র থেকেও। আমাদের হাতে কলম আছে এবং বিবেক আমাদেরকে দংশন করলে আমরা রক্তাক্ত হই। আমরা জানি আমরা আক্রান্ত হব। হয়ত নিহতও হব। হয়ত আবার কোনো সূর্যোদয়ের ভোরে আবিষ্কৃত হবে আমাদের গলিত শবদেহ ভবিষ্যতের কোনো নির্জন বধ্যভূমিতে। কিন্তু তারপরেও আমরা সেই কথাই বলে যাব, যা আমরা বলতে চেয়েছি সবসময়। এই দেশকে আমরা সংস্কারমুক্ত উত্তর-প্রজন্মের বাসযোগ্য করে যেতে চাই।

২৪.১.১৯৯৯

যেভাবে এখন চলছে বাংলাদেশ

ডিবি অফিসের পানির ট্যাঙ্কে লাশ এল কীভাবে? এ নিয়ে সংবাদপত্রে নানারকম স্পেকুলেশন চলছে, আসলে যার অর্থ নেই। পুলিশ তদন্ত করছে, সবসময়ই করে। সরকার সমর্থক আমার এক সরকারি চাকুরে বন্ধু বললেন, পুলিশের তদন্তের ফলাফল কী হবে তা তিনি খানিকটা আঁচ করতে পেরেছেন। তার এক পুলিশ বন্ধু বলেছেন, একটি কাক লাশটি ঠোঁটে করে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ নিচে ডিবি অফিস চোখে পড়ায় সে ভয় পেয়ে যায়। লাশটি পড়ে যায় ঠোঁট থেকে। পড়বি তো পড় ডিবি অফিসের পানির ট্যাঙ্কে। পানির ট্যাঙ্কের মুখটি ছিল খোলা। এর ফলে পানিতে যে ভাইব্রেশন হয় তাতে ট্যাঙ্কের ঢাকনাটি মুখে এঁটে যায়।

আমি বললাম, এটা কীভাবে সম্ভব? সরকার সমর্থনে হলেও তো সবকিছুর একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা থাকে? সে বলল, এটা সরকার সমর্থন, না সমর্থনের সঙ্গে যুক্ত নয়, বাংলাদেশে সবকিছুর ব্যাখ্যা এখন এভাবেই তৈরি হয়, গ্রহণ করা না-করা যার যার ব্যাপার।

আমার মনের সব দ্বিধা দূর হয়ে গেল। আপনারাও মনের দ্বিধা ঝেড়ে ফেলুন। এ ব্যাখ্যা যদি পুলিশ দেয় আপনি কিছু করতে পারবেন? কাগজঅলা বা তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী হইচই করলে, তদন্তকারী অফিসারের বদল হবে হয়ত। পুলিশ জানে, কোনো কিছুর জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি বদলি। সুতরাং কিছুই আসে-যায় না। বেগম জিয়ার আমল থেকে এখন পর্যন্ত যত পুলিশি কাণ্ড হয়েছে তার কোনোটির সুষ্ঠু নিস্পত্তি হয়েছে? হবে না। কারণ সব সরকারই কখনো-না-কখনো পুলিশকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছে। আর পুলিশের একতা বিরোধীদল বা আমাদের মতো নয়। পুলিশ যে টাকা সংগ্রহ করে তা কি একজনের ভোগে যায়? যায় না। সবাই মিলেমিশে সব করে। সেই জন্যই তারা একতাবদ্ধ।

অনেকে বলেন, চারদিকে যে এত কাণ্ড হচ্ছে আর তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর কথা বলা উচিত, বিশেষ করে বিরোধীদলগুলোর। কারণ দেশে আছে একটি রাজনৈতিক সরকার। কিন্তু বিরোধীরাও তা বলতে পারবে না। কারণ তাদের বক্তব্যও হবে পুলিশের মতো। ফলে মানুষও তাদের এখন বিচার করে পুলিশের মতো; না-হলে ১৯৯৬ সাল থেকে বিএনপি সরকার উৎখাতের আন্দোলন করছে। সফল হচ্ছে না কেন? হয়ত হতো যদি বেগম জিয়া ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত যেমন নীরব ছিলেন তেমন নীরব থাকতেন। তিনি নীরব থাকছেন না। ফলে আমাদের কাছে তাঁর বক্তব্য দাঁড়াচ্ছে কাকের ঠোঁটে লাশ নিয়ে যাওয়ার মতো।

স্মরণ করুন শামসুর রাহমানকে হত্যা-চেষ্টার ঘটনা। বিএনপি থেকে বলা হলো এটি সাজানো ঘটনা। শামসুর রাহমানের মতামত যা-ই হোক, তিনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি ব্যক্তিত্ব। একজন বেগম জিয়া বা মান্নান ভূঁইয়া হতে যত সময় লাগে তার চেয়ে ঢের বেশি সময় ও মেধা লাগে একজন শামসুর রাহমান হতে। সুতরাং এ ধরনের বক্তব্য কোনো ভদ্রজনের কাছে রুচিসম্পন্ন মনে হতে পারে!

তারপর কুষ্টিয়ায় কাজী আরেফ এবং যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে নিহত হলেন দশ জনের মতো সাদামাটা নিরীহ মানুষ। বেগম জিয়া বললেন, 'যে জিনিস দিয়ে যশোরের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটানো হয়েছে তা বিরোধীদলের হাতে থাকার কথা নয়। শক্তিশালী গ্রেনেডের মাধ্যমে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে, যা কেবল সরকারের কাছেই থাকে। এ ঘটনায় জড়িত সরকারি দলের ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে সরকারকে স্বচ্ছতার জবাব দিতে হবে।' [জনকণ্ঠ ১২.৩.৯৯] এ বক্তব্যের অর্থ কী? সরকারি কোন ব্যক্তিরা দায়ী? এ ঘটনার কারণে হরকাতুল জেহাদের সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেগম জিয়া কি স্বীকার করে নিচ্ছেন হরকাতুল জেহাদ বিরোধী জোটে আছে? সবচেয়ে বড় কথা, দশ জন নিহত হলেন এতে তাঁর কিছুই এল-গেল না? যদি কোনো রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবি করে সে-দলের পক্ষ থেকে এ ধরনের বক্তব্য কি অভিপ্রেত?

১৯৯৫ সালে বেগম জিয়া বলেছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিশ্বাস করতে পারে একমাত্র পাগল বা শিশু এবং এ প্রত্যয় অসাংবিধানিক। সেই বেগম জিয়া এখন বলছেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয়, উপজেলা সিটি নির্বাচন হলে অংশ নেবে।' (ভোরের কাগজ, ২৬.৩.৯৯) মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

জামায়াতের আমীর গো. আযম বলেছেন, 'আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি ১৯৪৭-এ। আর ১৯৭১-এ পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছি।... তিনি বলেন, ১৯৭১-এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে বলা হলেও আসলে প্রকৃতভাবে স্বাধীনতা অর্জন করে নি।' (সংবাদ, ২৬.৩.৯৯) তিনি আরো বলেছেন, পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না।

জামায়াতের নেতা নিজামী বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য বিশেষ দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যায় অপবাদ দেয়া হচ্ছে।' এর কারণ, 'জামায়াত যেহেতু রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ফ্যাক্টর সেহেতু বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে জামায়াতের নেতৃবৃন্দের চরিত্র হননের চেষ্টা করা হচ্ছে।' (সংবাদ ১৫.১২.৯৮)।

গোলাম আযমদের পক্ষেই সম্ভব এ ধরনের অসম্ভব বক্তব্য দেয়া। পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না, ভারত না থাকলে পাকিস্তান হতো? প্রকৃত স্বাধীনতা কী? আলবদরকে আলবদর বলা কি অন্যায় অপবাদ দেয়া? চরিত্র হনন হলে তারা আদালতে যাচ্ছে না কেন? এ-ধরনের অনেক যুক্তি দেয়া যায় কিন্তু দেব না। মূল বক্তব্য হচ্ছে স্বাধীনতার তিন দশকের মাথায় কোনো দল এ-ধরনের বক্তব্য দিলে আমাদের কী করা উচিত? বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারের?

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের এক কর্মকর্তাকে বললাম, আপনারা প্রায়ই স্লোগান দেন– মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার। সেটার অর্থ কী? কোন দেশে সরকার বদল হলেই মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়ন শুরু হয়? যদি মুক্তিযোদ্ধাই হন (আমরা নই, কারণ, আমরা তালিকাভুক্ত নই) তা হলে স্বাধীনতাবিরোধীদের এ-ধরনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে একটি সমাবেশ না হোক মিছিলও তো করেন নি। পুলিশ যদি পুলিশের কাজ করত, রাজনৈতিক দল যদি মানুষের জন্য রাজনীতি করত আর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নিজেদের ও আমাদের উজ্জীবিত করতে পারত তাহলে কি আজ আমাদের এসব লিখতে হতো?

বিএনপির নেতা অধ্যাপক ব.দ. চৌধুরী বলেছেন. 'রাজাকারদের কেন ক্ষমা করা হলো দেশবাসী জানতে চায়।' [প্র. আলো. ১৫.১২.৯৮] অবশ্যই, ভ্যালিড কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, জনাব অধ্যাপক রাজাকারদের কেন সম্মান দিয়ে পুনর্বাসন শুধু নয়, মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল? এখনো যারা বলছে দেশ প্রকৃত স্বাধীন হয় নি তাদের সঙ্গে কেন জোট বাঁধতে হলো? এই নোংরা কাজগুলো কে শুরু করেছিল? জনাব চৌধুরীর ঈমান শক্ত হলে যদি কাগজের মারফত উত্তরগুলো জানান খুশি হব।

'মুরতাদ সৈয়দ হাসান ইমামকে ফাঁসি দিতে হবে। সেই বোমা হামলার ঘটনার নায়ক তালেবানদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে। তালেবান নেতা মদিনাকে মুক্তি দিতে হবে।' [ভোরের কাগজ, ২১/৩/৯৯] বলেছেন চরের পীর। শুধু হাসান ইমাম নয়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অনেককে এরকম গালিগালাজ ও হুমকি প্রদান করা নিত্যদিনের ঘটনা। শামসুর রাহমান ও অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে তো এই মাওলানারা পল্টন ময়দানে 'জাতীয় কুত্তা' বলেছে। আমাদের তো শক্তি নেই। ভেবেছিলাম বীরদের সংগঠন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল বা সরকার এর দাঁত-ভাঙা জবাব দেবে। কিন্তু বুঝি নি যে, তাদের দাঁত অলরেডি নড়বড়ে। শীর্ষস্থানীয় সরকারি এক নেতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বেগম জিয়া কিছু বললে তো পরদিন বিবৃতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আজ যদি আবদুস সামাদ আজাদ বা আমীর হোসেন আমুকে এ অভিধায় ভূষিত করা হতো তখন কী করতেন? এর জবাব পাওয়া যায় নি। তবে জবাব পাওয়া গেছে। পত্রিকায় দেখেছি, এসবের পরপরই মেয়রপ্রার্থী মোহাম্মদ হানিফ বলেছেন, নির্বাচিত হলে ঢাকাকে ইসলামি স্থাপত্যে সাজিয়ে দেয়া হবে। আরেক জায়গায় বলেছেন, বঙ্গবন্ধু পাক্কা মুসলমান ছিলেন। হায় বঙ্গবন্ধু, শেষে এঁদের কাছ থেকেও মুসলমানিত্বের সার্টিফিকেট নিতে হয়! আরেকজন শীর্ষস্থানীয় সরকারি নেতা বলেছেন, এ দেশে ইসলামী সেন্টিমেন্ট বেশি, বোঝেন তো? বুঝি। শুধু বুঝি না, তাহলে কেন মুসলমান বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান ভাঙতে চাইলেন? অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না যদি নির্বাচনের ঠিক আগে কেউ প্রস্তাব করে বসেন, আওয়ামী লীগের নাম আগের মতো আওয়ামী মুসলিম লীগ রাখা হোক। সরকারের ধারণা, এরা তো আছেই। বিরোধীদের পুরস্কৃত করো, প্রশ্রয় দাও। হায়, পুরনো সব শাসকই তো ভেবেছে। একটা প্রশ্ন, এত প্রশ্রয়-পুরস্কারের পরও আওয়ামী লীগের ভোট ৩৬ ভাগের জায়গায় ৪৬ ভাগ হয় না কেন? প্রশ্ন করতে পারি,

এ ধরনের স্বাধীনতাবিরোধী, ধর্ম ও সংস্কৃতিবিরোধী এবং দেশদ্রোহী বক্তব্য যারা করে তাদের প্রশ্রয় দেয়া অন্যায় কি না?

কিন্তু যেহেতু আমরা ভীতু তাই এ-ধরনের প্রশ্ন না করে বরং আল্লাহর এই কালামটি স্মরণ করি, আপনাদেরও করতে বলি–'যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদের কৃতকর্মের ফল এবং ওদের মধ্যে যে এ-ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।'

সকালে পত্রিকা খুললে, প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, ক'জন খুন হলো? বা ধর্ষিত বা লুট? জিজ্ঞেস করুন সরকারি দলের কাউকে। পেটেন্ট উত্তর হচ্ছে, যেমনটি বলা হচ্ছে তেমন সন্ত্রাস হচ্ছে না। একুশ বছরের জঞ্জাল সাফ করা যাচ্ছে না। বিএনপি'র যে-কাউকে জিজ্ঞেস করুন, পেটেন্ট উত্তর, দেশে যা হচ্ছে তা সরকারই করছে। কিন্তু পত্রিকা খুললেই কেন দেখতে পাই, ছাত্রদল বা ছাত্রলীগের কর্মীরা নিহত। পরস্পরের গুলিতে বা নিজেদের অন্তর্কলহে? এগুলো কি অতিরঞ্জন? শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও সবসময় বলছেন, সন্ত্রাস সহ্য করা হবে না। তাহলে কেন পত্রিকায় কোনো কোনো সরকারি নেতা বা এমপির জমি দখল, এলাকা দখল বা বোমা বানাবার খবর ছাপা হয়? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই। তা হলে এরা কারা বা কোন দলের? আমরা এসব বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। তাই প্রাক্তন আওয়ামী লীগ সাংসদ ও কলামিস্ট এ. বি. এম. মূসার ভাষা উদ্ধৃতি করছি– 'প্রথমে সন্ত্রাস যে হচ্ছে, সরকারকে তা স্বীকার করতে হবে। এ নিয়ে সাফাই গাওয়ার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করতে হবে। ব্যাধিই যদি অস্বীকার করি তাহলে চিকিৎসা হবে কী করে, চিকিৎসকের মত জানারই বা দরকার কী? দ্বিতীয়ত সন্ত্রাসী নিজ দলে আছে কি না তা জানতে হবে এবং থাকলে কোথায় আছে তাও স্বীকার করতে হবে। শুধু অন্যদিকে আঙুল দেখালে চলবে না। সরকার ও বিরোধীদলে সন্ত্রাসী আছে, তা তাদের উভয়কেই প্রকাশ্যে বলতে হবে। সরকার বলবে তাদের বেকায়দায় ফেলার জন্য শুধু অন্যরা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে, আর বিরোধীদল বলবে তাদের দলে সবাই ধোয়া তুলসি পাতা, শুধু হয়রানি করার জন্য দলীয় লোকজনকে ধরছে। তাহলে সন্ত্রাস নিয়ে উভয় পক্ষের কারো কিছু বলার অধিকার নেই কারণ কেউ কিছু করতে চান না তা বোঝা কঠিন নয়। এ-জন্য সন্ত্রাস নিয়ে তারা যা বলেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।

সন্ত্রাসের চেয়েও ভীতিকর অবস্থা হচ্ছে, 'সন্ত্রাসী কে তা সাধারণ মানুষও বলতে সাহস করেন না, জানলেও বলেন না, বললেও কেউ ভাসুরের নাম নেন না।' (জনকণ্ঠ) রাজনীতিবিদদের যেসব ভাষ্যের উল্লেখ করলাম তার সঙ্গে কি শুরুতে কাকের ঠোঁটে যে লাশ নিয়ে যাওয়ার কথা বললাম তার অমিল আছে? নেই এবং বাংলাদেশ এখন এভাবেই চলছে, কেউ কারো কাছে দায়বদ্ধ নয় এবং এখন রাজনীতির এই হচ্ছে স্বরূপ এবং এ-কারণে চারদিকে সৃষ্টি হচ্ছে নৈরাজ্যের। সাধারণ মানুষ কারো ওপর আস্থা রাখতে ভরসা

পাচ্ছে না। এর পরিণতিতে বিরোধীদলও গঠনমূলক কোনো আন্দোলন গড়তে পারছে না। সরকারি দলও মনে হচ্ছে অনেক কিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। এমনও বলা হচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্ষুদে আমলারাও সমান্তরাল একটি সরকারের সৃষ্টি করছে। এটি বাজারের কথা, আমরা তা কানে না-নিলেও এ কথা রটছে প্রবলভাবে এবং আমরা নিশ্চিত কোনো গোয়েন্দা সংস্থা প্রধানমন্ত্রীকে এ কথা জানাবে না। ১৯৭০ সালে কি গোয়েন্দা সংস্থারা সরকারকে জানায় নি, আওয়ামী লীগ মাত্র ৪০/৪৫ সিট পাবে? সেই গোয়েন্দা সংস্থার তো আর কাঠামোও বদলায় নি, দায়বদ্ধতাও সৃষ্টি করা হয় নি।

এ-ধরনের রাজনীতির অবসান না হলে তা রাজনৈতিক নেতাদের জন্য তো বটেই আমাদের জন্যও আত্মহননের শামিল হবে এবং দলমত নির্বিশেষে যদি আমরা এ-ধরনের রাজনীতি বা রীতির বিরুদ্ধে না বলি তাহলে হয়ত আমাদেরও একদিন প্রশ্ন করতে হবে আরো অনেকের মতো যে, বাংলাদেশ কি ক্রমেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে? নিশ্চয় আমরা তা বলতে চাই না।

১.৪.১৯৯৯

এখনো বলছি ভবিষ্যতেও বলব তুই রাজাকার!

'আরেকটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দু'টো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে, হাত-পা বাঁধা।...'

'আরেকটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটা অংশ কাটা।...., মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর।...'

'মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে, প্রতিটি জলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যে মৃত কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।'

এসব চিত্র চকিতে ভেসে উঠল সকালে এ খরবটা দেখে–'সরকার ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে গোলাম আযমের মামলা।' উপরে যে-প্রতিবেদনটির উল্লেখ করেছি তা লিখেছিলেন অধ্যাপিকা হামিদা রহমান, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ঢাকার রায়েরবাজার বধ্যভূমি দেখে এসে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী সময়ের পত্রিকা ওল্টালে এ-ধরনের প্রচুর বধ্যভূমির খবর জানা যাবে। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মূলত জড়িত ছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা, যাদের প্রধান অংশ ছিল জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা। এদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল রাজাকারবাহিনী, ডেথ স্কোয়াড নামে খ্যাত আলবদরবাহিনী ও আলশামসবাহিনী। আর আলবদরদের হাতে নিহত হয়েছিলেন এ দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা। বাংলাদেশ কি এসব ঘটনা মনে রাখে নি? দু'দিন আগে খবরের কাগজ দেখে সে-কথাও মনে হলো। গো. আযম গং গত ৯ মার্চ প্রথম সাবজজ আদালতে, আবেদ খান, সরকার, ইমপ্রেস ভিডিও এবং আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে ১৭ কোটি টাকার মানহানির মামলা করেছে। কারণ গত বছরের ৩১ মার্চ রাত সাড়ে ৯ টায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'ঘটনার আড়ালে' শীর্ষক বিষয়ভিত্তিক প্যাকেজ ধারাবাহিকে 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এই অনুষ্ঠানে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে জাতীয় গণতদন্ত কমিশন এ পর্যন্ত যে ১৭ ব্যক্তির অপরাধের তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছে তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। [প্রথম আলো ১.৫.৯৯] বাদীরা হলেন গো. আযম. নিজামী. সাঈদী, কাদের মোল্লাসহ ১০ জন। এরা প্রত্যেকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত আলবদর বা রাজাকার হিসেবে। আবেদ খান অনুষ্ঠানটি করেছিলেন মানুষের জন্য। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের কিছু মানুষ কীভাবে পশু হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে খুন করেছিল। তারা ছিল অমানুষ। এ

অমানুষদের মধ্যে অবশ্য শ্রেণীভেদ ছিল–রাজাকার, আলশামস, আলবদর। এদের মান বা মর্যাদা আছে এটা কারো মনে হয় নি। মনে হলে ইমপ্রেস বা আবেদ খান এ অনুষ্ঠান করতেন না। রাজাকারের আবার মান-মর্যাদা কী? সঙ্গত কারণেই গো. আযমরা এটা মানতে পারে নি। তারা মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি চায়। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। গো. আযমকে আদালত স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু মানুষ তো দিচ্ছে না। তারা রাজাকার, আলবদর বলেই যাচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার। মামলা জিতলেই কি মানুষ হওয়া যাবে? গো. আযমকে সবাই রাজাকারই বলবে। মতিউর রহমান নিজামীকে আলবদরই বলা হবে। আবদুর রহমান বিশ্বাস দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন সে-পরিচয় তো মুছতে পারেন নি, বরং প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর যেন সে-পরিচয় বড় হয়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে আজ ত্রিশ বছর পর এই রাজাকার-আলবদররা মামলা করল কেন? কী-ইবা তাদের যুক্তি? আরজিতে সম্মিলিতভাবে এই রাজাকার-আলবদররা বলেছে –'জামায়াতে ইসলামী আইনসিদ্ধ একটি রাজনৈতিক দল। জামায়াতে ইসলামী ১৯৭১ সালে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। সেটা ছিল তাদের রাজনৈতিক অবস্থান। কিন্তু কোনো আধাসামরিকবাহিনীর কার্যকলাপের সঙ্গে জামায়াত কোনোভাবে জড়িত ছিল না।' [জনকণ্ঠ]

১৯৭১ সালের পর জামায়াত ছিল বাংলাদেশে নিষিদ্ধ দল। কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল? কারণ তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করেছিল। জে. জিয়াউর রহমান বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখল করে, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের দিয়ে নিজের সমর্থনবৃদ্ধির জন্য সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। সামরিক আইন অবৈধ হলে সেই নিষেধাজ্ঞা ওঠানোও আইনসিদ্ধ নয়। সেটি মানলেও কথা থাকে। সংবিধানে মুক্তিযোদ্ধাদের দায়মুক্ত করা হয়েছে। রাজাকারদের নয়। সংবিধানে বলা হয়েছে–'এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে-কোনো অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোনো কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন...' সংবিধানে আছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শই মূলনীতি হবে। ঘোষিত মূলনীতি বদলালেও এ বাক্যটির বদল হয় নি। মুক্তিযুদ্ধের সেটি এখনো সেই হিসেবে বলবৎ।

জামায়াত জনমন থেকে রাজাকার শব্দটি মুছতে না-পারায় নতুন এক লাইন নিয়েছে। ১৯৭১ সালে রাজাকাররা অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। এটা রাজনীতি। আর এ কারণেই তো সে রাজাকার! হিটলার তো আর্য রক্ত বিশুদ্ধ করার স্ট্যান্ড নিয়েছিল, তা হলে তাকে মানবতার শত্রু বলা হয় কেন? পিনোশে বিরুদ্ধবাদীদের হত্যার রাজনৈতিক লাইন নিয়েছিল। আজ তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দাঁড়াতে হচ্ছে কেন? ১৯৭১ সালে

তারা পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল দেখেই তো বাংলাদেশে তখন দু'টি শব্দের উদ্ভব হয়েছিল –মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার।

জামায়াতে ইসলামী কোনো আধাসামরিকবাহিনীর কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল না? আলবদরবাহিনী কি ছিল? এ বাহিনীর প্রধান তো ছিল মতিউর রহমান নিজামী। খালেক মজুমদারকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুনের দায়ে। গোলাম আযম এত নিষ্পাপ হলে মুক্তিযুদ্ধের পর দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়েছিল কেন? জিয়াউর রহমানের প্রটেকশনে তার দেশে ফেরা। তারা যদি কোনোকিছুর সঙ্গে জড়িত না-ই থাকে তা হলে তাদের অনেক সহযোগী এখনো কেন বিদেশে?

আজ ৩০ বছর পর তারা সাহস পেয়েছে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে। বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের কারণেই তারা বাংলাদেশে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পেরেছে এবং সারাদেশের মুখে লাথি মেরেছে। কাজী শাহেদ আহমদের ভাষায় 'আসামি হলো মুক্তিযোদ্ধারা। আসামি হলো মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান আসামি মুক্তিযুদ্ধ।' তিনি আরো লিখেছেন যা আমরা সবাই জানি– 'যেদিন আওয়ামী লীগ এরশাদের পার্টি ও জামায়াতের সঙ্গে বসল এবং সেই ব্যর্থতা আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পরিণত হচ্ছে যখন খালেদা জিয়া সেই এরশাদের পাশে ও গো. আযমের পাশে বসতে যাচ্ছেন।' এবার বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও তার আদর্শের ওপর আঘাত হলো। বঙ্গবন্ধুর নামে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ফলক ..-বসিয়ে এ আদর্শগুলো প্রতিষ্ঠা করাই হতো বঙ্গবন্ধুর নাম প্রতিষ্ঠা করা।

জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এই দশ জন বাদীকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে বিচারের দাবি তোলে যা ব্যাপক আন্দোলনে রূপ নেয়। সে বিচারের দাবি থেকে আমরা সরে দাঁড়াই নি। আজ ৫০/৬০ বছর পরও নাজিদের বিচার হতে পারলে, দু'যুগ পর পিনোশোর বিচারপ্রক্রিয়া যদি শুরু হতে পারে তাহলে এদেরও হবে। কারণ একবার যে রাজাকার সে সবসময়ই রাজাকার।

রাজাকাররা মানহানির মামলা করেছে। করুক আরো করুক। চামচিকের চামড়া বদলে ফেললেও কি গন্ধ দূর হবে? মামলায় জিতলেও বলা হবে– 'তুই রাজাকার'। আমরা অনেকদিন ধরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করে আসছি। এটি ন্যায্য দাবি। কোনো রাজনৈতিক দল তা মানে নি। রাজনৈতিক দলের কর্মী থেকে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখনো যদি তারা রাজাকারদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, এত বড় অপমানের পরও, তাহলেও তাদের ভুলে যান আমরা আর কিছু না পারি রাস্তাঘাটে রাজাকারদের দেখলে তো বলতে পারব–'তুই রাজাকার'। এ ঘটনার পরও মুক্তিযুদ্ধের দল বলে পরিচিত দলের নেতাকর্মীরা যদি বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের জন্য না এগিয়ে আসে, ভয় পাবেন না। রাজাকারকে 'তুই রাজাকার' বলার অধিকার থেকে তারা আমাদের বিরত রাখতে পারবে না। 'মুক্তিযোদ্ধা সংসদ' বলে একটি সংসদ আছে। যারা স্লোগান দেয়– 'মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার'। সেই হাতিয়ার আর কখন

গর্জাবে জানি না। ঘাবড়াবেন না। আপনার ছেলেকে শেখান - গো. আযম, নিজামী এরা রাজাকার। এদের নাম উঠলেই যেন তারা বলে–ঐ রাজাকার। আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়িয়ে যাব তখন এদের বলব–'তুই রাজাকার।' আ. লীগ. জা. পার্টি ও বিএনপি যদি একত্রে মিলে গো. আযমকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টও করে আমরা বলব –'তুই রাজাকার।' নিজামী যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাও শুরু করে, আমরা বলতে থাকব–তুই রাজাকার, তুই আলবদর। কিছু রাজনৈতিক নেতাকর্মী বাদে সারা দেশ এদের বলে এসেছে তুই রাজাকার, এখনো বলছে তুই রাজাকার, ভবিষ্যতে বলবে 'তুই রাজাকার'।

৪.৫.১৯৯৯

এ কোন বিভ্রান্ত রাজনীতির বেড়াজাল?

সময়টা এখন অনেকের মতে, সঙ্কটময়। কেন সঙ্কটময় তার অনেক কারণ হয়ত আছে, থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্কটময় সময় কি আমরা আগে পেরোই নি? পেরিয়েছি, সঙ্কট অতিক্রম করতে পারার কারণ, লক্ষ্যে আমাদের ভুল ছিল না, বিভ্রান্ত আমরা হই নি কারণ, রাজনীতিবিদরা আমাদের বিভ্রান্ত করেননি। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭১ সালের কথা বলি। রাজনীতিবিদরা বললেন, দেশ স্বাধীন করতে হবে। সেটিই লক্ষ্য। আমরাও তাই মেনেছি এবং সফল হয়েছি, যদিও সে-রকম সঙ্কটময় সময় আর আমাদের সামনে আসে নি। সে-সঙ্কটেও মানুষ আশা হারায় নি। এখন সময় কতটা সঙ্কটময় জানি না, কিন্তু প্রায় সবার গলায়ই একটা হতাশার সুর। কারণ বোধহয়, সঙ্কট থেকেও আমাদের কাছে সময়টা বেশি বিভ্রান্তিকর। আর রাজনীতিবিদরা যেহেতু চালক, এ বিভ্রান্তির দায়ভাগও তাঁদের। অথচ আশ্চর্য, দায়বদ্ধ তাঁরা আমাদের থাকতে বলে নিজেদের ভাবেন তার ওপরে। বিভ্রান্তিটা এ-কারণেই বেশি। এর একটি উদাহরণ, গত সপ্তাহে ইনকিলাব-সংক্রান্ত ঘটনা।

গত ৬ মে সারাদিন আমি বেশ ক'টা ফোন পেয়েছি। এর মধ্যে বন্ধু আছেন কয়েকজন, বাকিরা তাঁদের পরিচয় জানান নি। সকালেই ফোন পেলাম এক বন্ধুর। রাজনীতি তিনি করেন না বটে, কিন্তু রাজনীতির খোঁজ-খবর রাখতে ভালোবাসেন। ফোন ধরতেই বললেন, ইনকিলাব পড়েছেন? বললাম, সাতসকালে ইনকিলাব পড়ে সারাটা দিন মাটি করব কেন? তিনি একটি প্রাণীর নাম করে বললেন, তাঁদের খোঁজ-খবর রাখার জন্য ইনকিলাবটি উল্টেপাল্টে দেখা দরকার। ঘটনাটি এরপর পুরো বর্ণনা করে তিনি বললেন, এরা তো সবাই আপনাদের পরিচিত, অনেকে হয়ত বন্ধুও। কিন্ত এখন কি আর এদের বিশ্বাস করতে পারবেন? কাদেরই-বা শ্রদ্ধা করবেন? অন্য যারা ফোন করছিলেন তাঁদের বক্তব্যও ছিল মোটামুটি একই রকম।

ঘটনাটি হলো এই যে, ৫ মে দৈনিক ইনকিলাব একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিল। বিষয় 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা সঙ্কট'। এতে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত সমর্থক কিন্তু আবার ইনকিলাব-পছন্দ কিছু মাইনর ও অচেনা ব্যক্তি ছিলেন। উল্লেখ করার মতো ছিলেন যুদ্ধাপরাধী ও ইনকিলাবপন্থি হিসেবে পরিচিত আনোয়ার জাহিদ, বারবার দলবদলকারী ও জেনারেল এরশাদের মায়ের মৃত্যুতে কান্নার রেকর্ডধারী হিসেবে খ্যাত কাজী জাফর (এরশাদ আমলে মন্ত্রী থাকাকালীন 'চিনি জাফর' হিসেবে বিখ্যাত), খালেদা-সৈনিক লে. জে. মাহবুবুর রহমান, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন ও কেন্দ্রীয় নেতা

হায়দার আকবর খান রনো এবং জাসদের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু। শেষ তিনটি নাম দেখেই অনেকে হতবাক এবং বন্ধুবান্ধব ও পাঠকদের ফোনের কারণও তা। আমি জানি শেষোক্ত তিনজন অতি ব্যস্ত মানুষ, আমার এই লেখা তাঁদের চোখে পড়বে না ! কিন্তু যদি পড়ে তাহলে হয়ত তাঁরা বুঝবেন সাধারণ মানুষ ঘটনাটি কিভাবে দেখছে। উদাহরণ হিসেবে ফোনে পাওয়া দু'টি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি।

১. ভাই, এ দেশে যে যত বামপন্থি সে তত সেনাপন্থি ও জামায়াতপন্থি অর্থাৎ, বামপন্থা নিয়ে যে বেশি কচলায় অন্তিমে দেখা যায় তার ঝোঁক সেনাবাহিনীর শাসন বা জামায়াত-বিএনপি জোটের দিকে।

২. পুরনো রাজাকার ভাত পায় না তায় আবার নতুন রাজাকার। আরো একটি মন্তব্য ছিল যা উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকছি। ইনকিলাবের ঘটনাটি রাজনীতি-সচেতন ও প্রগতিশীল মানুষদের হতবাক করেছে; কারণ শেষোক্ত তিন জন ঐ ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেন। এই ঘটনা বাংলাদেশের পুরনো রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। ইনকিলাবের যা উদ্দেশ্য ছিল তা সফল হয়েছে, নাককাটা গেছে শুধু ঐ তিন জনের। 'ইনকিলাব' কী তা পাঠকদের নিশ্চয় বলতে হবে না। বাংলাদেশে অপসাংবাদিকতা, আলবদরীয় আদর্শ, সাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধবিরোধিতা, ফ্যাসিবাদের প্রতীক। আমাদের এই 'থ্রি কমরেডস' আবার অসাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রবক্তা। তাঁরা যদি শুধু বিএনপি সমর্থক, এমনকি জাপা সমর্থকদের সঙ্গেও চা পান করতে করতে আলোচনা করতেন, তাহলে এত প্রতিক্রিয়া হতো না। কিন্তু ইনকিলাবীদের সঙ্গে?

ইনকিলাব কেন ঐ গোলটেবিল বৈঠকটি করেছিল? উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। এক, আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে ইনকিলাবীয় তত্ত্ব (অর্থাৎ পাকিস্তান তোষণ ও সমর্থন) প্রচার। দুই, ইনকিলাবের স্রষ্টা 'আলবদর' হিসেবে খ্যাত ও 'মওলানা' উপাধিধারী আবদুল মান্নান বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় জড়িয়ে পড়েছে এবং তাঁকে দেউলিয়া ঘোষণার জন্য মামলা শুরু হয়েছে। দেউলিয়া হয়ে গেলে, ইনকিলাব থাকবে না। 'মওলানা'র ক্ষমতার ভিত্তি বা এই রমরমা ভাব উবে যাবে। সুতরাং বিভিন্ন গ্রুপের রাজনীতিবিদদের নিয়ে বৈঠক, কাগজে তার প্রচার, যাতে সাধারণ মানুষ ও সরকার বুঝতে পারে তাঁর পক্ষেও রাজনীতিবিদ কম নেই। এ-ব্যাপারে যে তাঁরা কত আগ্রহী তার প্রমাণ পরের সপ্তাহেই ম্যাগাজিন আকারে এই বৈঠকের আলোচনা প্রকাশ–যার শিরোনাম–'বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রধান হুমকি ভারতের আধিপত্যবাদী লিপ্সা'। ইনকিলাবপন্থি রাজনীতিবিদরা কৌশলের সমর্থক হতে পারে, তাই বলে ঐ তিন জনও? ইনকিলাবী টেবিলে অন্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা ভারতবিরোধী মৃদু অথবা কট্টর পাকিস্তানপন্থি হিসেবে পরিচিত। এ দলের নতুন সদস্য লে. জে. মাহবুবুর সম্পর্কে স্পেসের অভাবে আজ আর কোনো মন্তব্য করলাম না। গোলটেবিল তিনি মেলা করেছেন, বুদ্ধিজীবীরা হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত বলে মন্তব্য করেছেন। পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'তথাকথিত শান্তিচুক্তি দ্বারা আমরা সেখানে চিরস্থায়ী অশান্তি প্রতিষ্ঠা

করলাম। যার জন্য হয়ত আমরা সে-অঞ্চলে এক-দশমাংশ ভূ-খণ্ড হাতছাড়া করলাম।' মনে আছে, শান্তিচুক্তির আগে আমরা বেশ ক'জন সরেজমিনে অবস্থা দেখার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম। সেনাধ্যক্ষ ছিলেন তখন লে. জে. রহমান। এক সৌজন্য সাক্ষাতকারে তিনি আমাদের বলেছিলেন, এ চুক্তি দেশের জন্য কতটা প্রয়োজন এবং এই চুক্তি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। হয়ত আজ তিনি তা স্বীকার করবেন না। তবু এতটুকু বলতে পারি, রিস্নার পাম্প ছাড়তে গিয়ে (পত্রিকায় প্রকাশিত) জনতার ধাওয়া খেয়ে যিনি পালান তাঁর আর যা-ই হোক দেশের নিরাপত্তা নিয়ে মন্তব্য করা মানায় না।

লে. জে. রহমান নতুন খালেদা-সৈনিক। অনেক জায়গায় জিহাদী জোশে তিনি এমন-সব মন্তব্য করছেন–যা তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কেই সন্দেহ জাগায়। তবে ধারণা করে নিতে পারি, আসন্ন নির্বাচনে নমিনেশন না-পেলে এ জিহাদী জোশ আর থাকবে না। 'থ্রি কমরেডসের' বিষয়ে প্রশ্ন দু'টি। এক, তাঁরা সেখানে কী বলেছেন, দুই, সেখানে তাঁরা কেন গেলেন? মূল প্রশ্ন অবশ্য দ্বিতীয়টি। তাঁর আগে দেখা যাক ইনকিলাবী বৈঠকে সিদ্ধান্তটি কী হয়েছিল–'জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ, চীন, বার্মা ও পাকিস্তানের মধ্যে চাই সামরিক সহযোগিতা।' পত্রিকার মতে, 'গোলটেবিলে বক্তারা একই কণ্ঠে (লক্ষ্য করুন একই কণ্ঠে) বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রধান হুমকি হচ্ছে ভারত,' সুতরাং, 'দেশের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ, বার্মা, চীন ও পাকিস্তানকে নিয়ে সামরিক সহযোগিতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।' ইনকিলাবের বিশেষ সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে–'সামগ্রিক অর্থেই দেশ আজ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই অবস্থাকে আরো সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে–দেশের ভিতরে ও বাইরের নানা প্রকার রাষ্ট্রঘাতী তৎপরতা। এই তৎপরতার উৎস ও কারণ অনুসন্ধান আজ যেমন জরুরি, তেমনি এ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে বের করাও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।' আলোচকরা ঘোষণা করেছেন, যা বড় বড় টাইপে ছাপা হয়েছে–'বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদই আমাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি।'

থ্রি কমরেডস কী বলেছেন সেখানে? সম্প্রতি 'সংবাদ'-এ মুনীরুজ্জামান কঠোর ভাষায় ইনু-মেননদের নিন্দা করে তাঁদের প্রায় 'নব্য রাজাকার' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। সে-কারণে, বিশেষ সংখ্যায় তাঁদের বক্তব্য ভালোভাবে পড়লাম। তাঁরা তিন জনই 'ইনকিলাব'-কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং সবচেয়ে কম সময় বক্তব্য রেখেছেন এ তিন জনই এবং অন্যান্য সভায় যা বলেন তাই তাঁরা বলেছেন। ইনকিলাবীদের মতো তাঁরা ভারতকে অযথা আক্রমণ করে বিষোদগার করেন নি। রনো বলেছেন, ভারত থেকে 'মনে হয় না সে-ধরনের কোনো আক্রমণ হবে।' ইনু সার্কের মধ্যে নিরাপত্তার কথা বলেছেন এবং তাঁর বক্তব্য বেশ সতেজ। মেনন বলেছেন, 'আমাদের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের কর্ণার স্টোন হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর ভাবনাগুলো।' শুধু দু'টি ক্ষেত্রে ইনকিলাবীদের সঙ্গে তাঁর মতের খানিকটা মিল দেখা গেছে। এক. পানি-চুক্তির ক্ষেত্রে। যেখানে তিনি বলছেন, '১৯৭৪ সালে যেখানে আমরা ৬৭% পানি

পেতাম, সেখানে উল্টা আমাদের কাছ থেকে ভারত নিয়ে যাচ্ছে।' পত্রপত্রিকার মতে, চুক্তি-অনুযায়ী আমরা পানি তো কম পাচ্ছিই না কখনো কখনো বেশি পাচ্ছি। দুই, পার্বত্য শান্তি-চুক্তি যেখানে তিনি বলছেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টিও একইভাবে খুব দুর্ভাগ্যজনকভাবে অমীমাংসিত রয়েছে। আমরা ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে অসমতায় আছি।' যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে বলব মনে পড়ে জনাব মেনন পানি-চুক্তি ও শান্তি-চুক্তিতে সন্তোষই প্রকাশ করেছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইনকিলাব যা বলছে তাঁর সঙ্গে তাঁদের বক্তব্যের তেমন কোনো সাযুজ্য নেই। আবার ইনকিলাব যা বলছে তার প্রতিবাদও তাঁরা করেন নি। এখানেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। আমাদের আলোচনা সভাগুলোতে তাঁরা যা বলেন সেগুলো কি তাঁদের মনের কথা নয়? পাকিস্তানপন্থি যে জোট সৃষ্টি করতে চাচ্ছে ইনকিলাব, তাতে কি তাঁদের সায় আছে? যদি সায় থেকে থাকে তবে কি এ কারণে যে, ইনকিলাব যাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলছে তাঁর মধ্যে চীন আছে? এটি কি নস্টালজিয়া? এ জায়গাটিতেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাই। থ্রি কমরেডসের মনোভাব এ রকম—আমরা সব পক্ষেই আছি। বাঙালি-বাংলাদেশী-ইনকিলাবী সবখানে।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্ন জাগে, যেটি মূল প্রশ্ন তাঁরা ইনকিলাবীদের সঙ্গে গেলেন কেন? কারণ, তাঁরা যা বলেছেন তা নতুন কিছু নয় এবং এর জন্য ইনকিলাবীদের সঙ্গে বসার প্রশ্ন আসে না। যেখানে দেশের সচেতন ও প্রগতিশীল মানুষমাত্রই ইনকিলাব ও ইনকিলাবপন্থিদের এড়িয়ে চলেন সেখানে তাঁরা কি অবোধ বালক যে, জানেন না পত্রিকাটি একজন যুদ্ধাপরাধীর? যদ্দুর মনে পড়ে, ইনু এবং মেনন নির্মূল কমিটির গণআদালতেও বক্তৃতা দিয়েছেন। তাহলে ধরে নিতে হয়, বাংলাদেশে তেলে-জলেও মিল খাবে। থ্রি কমরেডস কি জানেন না এ পত্রিকা ছিল একসময় জেনাবেল এরশাদ ও বিএনপি'র মুখপত্র। ইনু আবার জে. এরশাদের বিরুদ্ধে মামলাও করেছেন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য। তাঁরা কি জানেন না—পত্রিকাটি আদর্শগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ও ধর্ম ব্যবসার পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িক? অথচ তাঁরা কিন্তু অনবরত মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকভাবে কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁরা কি জানতেন না যারা ঐ বৈঠকে যোগ দিচ্ছে তাঁদের মধ্যে আছে যুদ্ধাপরাধী, স্বৈরাশাসকের প্রত্যক্ষ মদদদাতা, সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গ?

থ্রি কমরেডস অবশ্য বলতে পারেন যা অনেক নব্য রাজাকার বলেন যে ইনকিলাবে গিয়ে আমাদের কথা বলতে যাব না কেন? কিন্তু এগুলো হলো মতলববাজি মন্তব্য। ইউরোপে নব্য নাজিদের বৈঠকে কোনো গণতন্ত্রী যান না। এসব ভাওতাবাজি বক্তব্য মানুষ আর শুনতে চায় না। ঐ বৈঠকে তাই তাঁরা কী বলছেন তার চুলচেরা বিশ্লেষণ থেকেও যেটি জরুরি তা হলো, তাঁরা কেন গেলেন? একদিকে তাঁরা ঘাতক দালাল নির্মূল বা সমন্বয় কমিটির সভায় বসবেন, অন্যদিকে যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গেও চা খাবেন, আলোচনা করবেন তা কী করে হয়? মানুষের মাঝ থেকে কি বিশ্বাস বলে বিষয়টা উবে গেল? মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা এতদিন ধরে একটি উদ্যোগই সফল করতে চাচ্ছে—তা হলো

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী আদর্শকে মিলিয়ে ফেলা। এ তিন জন সেই উদ্দেশ্যকেই এগিয়ে নিলেন মাত্র।

আমরা শুধু বলতে চাই, থ্রি কমরেডস ইনকিলাবী বৈঠকে গিয়ে সঙ্কটাপন্ন বাম রাজনীতির ওপর আবারও আঘাত হানলেন। প্রগতিশীল আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি ছুরিকাঘাত করলেন। গত ১৩ মে ১১টি দল প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক বিকল্প শক্তি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। পল্টনে ১১ দলের জনসভায় রাশেদ খান মেনন বলেছেন, 'আজ দেশব্যাপী দুঃশাসন চলছে। অপরদিকে উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পাঁয়তারা শুরু করেছে। বিএনপি তাঁদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। এ অবস্থায় অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য ছাড়া দেশ ও জাতিকে রক্ষার উপায় নেই।' (সংবাদ ১৩.৫.৯৯)। অথচ এঁরা এদের সবার সঙ্গে বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক শক্তির পতাকাধারীদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে এসেছেন। ফলে এখন বিকল্প শক্তি নিয়ে প্রশ্ন জাগবে। বিকল্প ধারায় স্রষ্টাদের প্রথমেই এর মীমাংসা করা জরুরি।

আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা ভাবেন, তাঁরা যা-খুশি তা করতে পারেন এবং তা মেনে নিতে হবে। এটা সঠিক নয়। মনে হয়, এখন সময় এসেছে তাঁদের এ-ধরনের ইচ্ছার প্রতিরোধ করা ও সবার আগে তাঁদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা। এর অর্থ, বিভ্রান্ত করা ছেড়ে, রাজনীতির সুস্থ ধারায় ফিরতে হলে ইনকিলাবী বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য তাঁদের উচিত হবে বিষয়টি পরিষ্কার করা, প্রয়োজনে দুঃখ প্রকাশ করা।

সবশেষে বলি, পুরো ঘটনা থেকে এ কথাটিই প্রমাণ হলো যা অনেকেই আজকাল বলেন যে, এদেশে আর শ্রদ্ধা করার মতো কেউ থাকছে না, বিশ্বাস করার মতো কেউ নেই। এখন নিজেকে বিশ্বাস করতেও ভয় হচ্ছে।

১৭. ৫. ১৯৯৯

গো. আযমদের অর্জন এক খেলাতেই শেষ

মহানন্দার তীরে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক গরিব গ্রাম গোবরাতলা। গ্রামের ধূলিধূসর রাস্তা দিয়ে আম বাগানে যাওয়ার পথে চোখে পড়ে জীর্ণ এক দেয়াল, তাতে গোটা গোটা হরফে লেখা - '৭১-এ করেছি যুদ্ধ জয়, '৯৯ তে ক্রিকেট জয়–জয় বাংলা।'

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রিকেট জয় এখন পুরনো খবর। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মিছিলের ঢল নামবে তা ধারাভাষ্যকাররাও বলছিলেন। কিন্তু, তাই বলে গোবরাতলা গ্রামে এ শ্লোগান দেখব তা ভাবি নি। ঢাকা বা চট্টগ্রামের সঙ্গে গোবরাতলার মানসিক ও ভৌগোলিক দূরত্ব তো দুস্তর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মানসিক স্পিরিটটা এক। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা নেই। কয়েকদিন আগের ক্রিকেট জয় এ বিষয়টাই আবার প্রমাণ করল।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলায় বাংলাদেশ আগেও জিতেছে। কয়েক মাস আগে, সাফ ফুটবলে পাকিস্তানকে চার গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সেটি বড় খবর হয়ে ওঠে নি। অবশ্য এর কারণও আছে। তরুণরা ক্রিকেটে উৎসাহী। আর টিভি ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের কল্যাণে বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপমহাদেশে বিশেষ খবরে পরিণত হয়েছে। বিশ্বকাপে নিজ গ্রুপের খেলায় পাকিস্তান ছিল অপরাজেয়। ধরে নেয়া হচ্ছে পাকিস্তান হবে চ্যাম্পিয়ন। বাংলাদেশ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সেই বাংলাদেশ পাকিস্তানকে শোচনীয়ভাবে হারিয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই জয় পুরো জাতিকে কেন প্রায় উন্মাতাল করে তুলল বা কেন অন্যমাত্রা পেল? কেন গোবরাতলার মতো অজপাড়াগাঁয়ে শ্লোগান–১৯৭১-এর জয়ের মতো ১৯৯৯-এর জয়?

খেলার দিনটা পর্যালোচনা করা যাক। টিভিতে যেন দুর্দান্ত থ্রিলার চলছে। সবাই টিভির সামনে। উইকেট পড়ছে পাকিদের, তবুও জয় করে আমাদের ভয় যেন যায় না। শেষ উইকেট পড়ল আর বাংলাদেশ হয়ে উঠল মিছিলের দেশ। এ-সংক্রান্ত প্রচুর ঘটনা পাঠক নিশ্চয় ইতোমধ্যে জেনেছেন, তবুও দু' একটি বলি।

নোয়াখালীতে পাকিস্তানকে মৃদু সমর্থন করায় এক ব্যক্তিকে দিগম্বর করিয়ে দৌড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। ঢাকায় একজন জানালেন তাদের মেসের পাশে এক লোক, খেলার সময় বাংলাদেশের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য করেছিল। খেলাশেষে পাকিস্তানি হিসেবে তাকে নাজেহাল করা হয়। ঢাকায় টিএসসির সামনেও পাকি সমর্থকরা নাজেহাল হয়েছে। শ্লোগান উঠেছে হৈ হৈ রৈ রৈ রাজাকাররা গেল কই? হৈ হৈ রৈ রৈ গোলাম আযম গেল কই? জামায়াত কার্যালয়, নিজামী এবং গোলাম আযমের বাসায় পুলিশ প্রহরা দেয়া হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলো এ বিজয়ের আনন্দকে ১৯৭১-এর যুদ্ধজয়ের আনন্দের সঙ্গে

তুলনা করেছে। অবশ্য আইসিসি ট্রফি জয়ের পর এসব ঘটনা ঘটে নি, এ ধরনের স্লোগান দেয়া হয় নি। এবারের জয়ের বৈশিষ্ট্য এটিই যা নতুন মাত্রা দিয়েছে পুরো ঘটনায়।

স্কটল্যান্ডের সঙ্গেও বাংলাদেশ জিতেছে। এরকম হয় নি। এবার হয়েছে। অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তান খেলা যেমন অন্তিমে আর খেলা থাকে না, জাতিগত মান-সম্মানের প্রশ্ন হয়ে ওঠে তেমনি বাংলাদেশ-পাকিস্তানের খেলাও তাই হয়ে উঠছে, যুক্ত হয়ে পড়ছে ইতিহাস, না চাইলেও। খেলা একেবারে রাজনীতিমুক্ত, কে বলে? এবং কী সব ঘটনা এ মনোভঙ্গি তৈরি করে? দেখা যাক।

১৯৭১-এর আগে পাকিরা বাঙালিদের যথেষ্ট অপমান করেছে। এই খেলার আগেও পাকিরা বাঙালিদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে, ঢাকায় তো রীতিমতো অপমান করেছিল। গণহত্যার আগে পাকিস্তানের আশা ছিল ৭২ ঘণ্টার মধ্যে করজোড়ে মাপ চেয়ে বাঙালিরা ফিরে আসবে। আকরামরাও ঠিক করেছিল হয়ত ১০ ওভারে বাঙালিদের ৫০ রানে অলআউট করে ৫ ওভারে নিজেরা ৫১ করে খেলা শেষ করে দেবে। মুক্তিযুদ্ধ ৭২ ঘণ্টায় শেষ হয় নি। এ খেলা ১০ ওভারে শেষ হয় নি। পুরো ৫০ ওভার চলেছে। মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ্য ছিল এক, নেতা ছিল এক, ঐক্যবদ্ধ হয়ে মরিয়া হয়ে লড়াই করেছিল সবাই অপমানের প্রতিশোধ নিতে। খেলাতেও তাই হয়েছে। ১৯৭১-এর মতো পাকিরা আগে কখনো হাঁটু গেড়ে বসে নি। খেলার মাঠে পাকিস্তানি দলকে এর রকম সাজাও আর কেউ দেয় নি। নুতুন প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছে, তাদের কাছে তাই খেলার ঘটনাটা এরকমই মনে হয়েছে।

পরাজয়ের পর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রবল ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল শাসক ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। ক্রিকেট খেলায় পরাজয়ের পরও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে পাকিস্তানে। রেস্তরাঁয় কাপ-পিরিচ ভাঙা হয়েছে। বলা হচ্ছে ওয়াসিম আকরামরা পয়সা খেয়েছে। পাকিরা বলছে, খেলায় হারজিত আছে, তাই বলে বাঙালিদের কাছে হারতে হবে! ১৯৭১ সালেও তারা তাই বলেছিল। এখন আরো মুশকিল হচ্ছে, পাকিস্তান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হলেও বাঙালিরা বলতে পারবে, ওহ, তাতে কী হয়েছে তারা তো বাংলাদেশের কাছে হেরেছে। এ ভাবেই সামান্য ক্রিকেট খেলা হয়ে ওঠে দুই জাতির মান-সম্মানের লড়াই, যুক্ত হয়ে পড়ে ইতিহাস এবং ভবিষ্যতেও তা হবে।

এ খেলা আরো কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেছে–

১. পৃথিবীর সব দেশে বাঙালিমাত্রই বাংলাদেশের জয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছে। খবরে দেখেছি, বাংলদেশ-সীমান্তের ওপারেও রাত ১১ টায় পটকা ফুটেছে, মিছিল বেরিয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্রমেই পৃথিবীর সব দেশের সব বাঙালির কেন্দ্র হয়ে উঠছে। মানসিক জন্মভূমি হয়ে উঠছে। ফলে বাঙালি খেলোয়াড়, সংস্কৃতিসেবী, রাজনীতিবিদ এখন শুধু আর বাংলাদেশের নয়, বাঙালিরও প্রতিনিধিত্ব করবেন। বাঙালির দায়িত্ব বাড়ছে।

২. জয়ের পর রাজাকারবিরোধী শ্লোগান, পাকিস্তানের সমর্থক হলেই তাকে

রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত করে নাজেহাল করা–এসব কিছুর অর্থ মুক্তিযুদ্ধ এখনো আছে বাংলাদেশের কেন্দ্রে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি উপড়ে ফেলা যায় নি। পরাণের গহীনে তা আছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রাজনীতির ভণ্ডামি, রাজাকারদের কর্মকাণ্ড সব কিছুই ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে সাধারণের মনে। সে সমস্ত ক্ষোভ প্রকাশের উদাহরণই ঐ ঘটনাগুলো। এ জয় নিয়েও রাজনীতি করার নমুনা–অধ্যাপক ব. দ. চৌধুরী বলছেন 'দেশে আজ ক্রিকেটের যে-সাফল্য এসেছে এটা জিয়াউর রহমানেরই অবদান।' তাহলে বলতে হয়, ক্রিকেটে যে অসাধারণ দু'টি জয় তা শেখ হাসিনারই অবদান। এর অর্থ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক বিরাট শক্তি যা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এগিয়ে নিতে পারে। সঠিক নেতৃত্ব পেলেই হলো।

৩. গো. আযম মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা করেছে। মূল প্রতিপাদ্য মামলা দু'টির যে–তারা রাজাকার নয়। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা বানোয়াট। তারা শ'খানেক রিট করুক, মামলায়ও জিতুক তাতে মুক্তিযুদ্ধের কিছুই আসে যাবে না। তারা এখনো পরিচিত পাকিস্তানের প্রতীক হিসেবে খেলা শেষ হওয়ার পর যে-কারণে তাদের জন্য বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং বাংলাদেশের শত্রু হিসেবে বিশেষ সময়ে তাঁদের প্রটেকশনেই রাখতে হবে। তাঁদের একদশকের অর্জন এক খেলাতেই শেষ!

৪.৬. ১৯৯৯

বোমা থাকবে না তো কি মিষ্টির প্যাকেট থাকবে?

আহমদিয়াদের মসজিদে বোমা রাখা হয়েছে, আরো অনেক জায়গায় প্রাণঘাতী বোমার গুচ্ছ পাওয়া যাচ্ছে, দুর্গা পূজার প্রাক্কালে অনেক জায়গায় হামলা হচ্ছে, জনকণ্ঠে ট্যাংক বিধ্বংসী ল্যান্ড মাইন রাখা হয়েছে। ধর্ম ব্যবসায়ীরা অনেক জায়গায় এনজিওদের সমাবেশে বাধা দিচ্ছে, স্বঘোষিত এক নেতা বলেছেন, জয়বাংলা শুনলে তাঁর মনে হয় বাংলা যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উপরের শিরোনাম পড়ে আপনাদের মনে হতে পারে, দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি নিয়ে আমি হাল্কা রসিকতা করছি। না, আপনাদের মতো আমিও জানি, রসিকতার সময় এটা নয়। রাস্তাঘাটে আপনারা যা বলছেন সে-কথারই আমি প্রতিধ্বনি করছি, আপনাদের বিশাল ক্রোধ তুলে ধরার চেষ্টা করছি যার সম্পর্কে শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়াও হয়ত ওয়াকিবহাল নন। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি যে হঠাৎ হয়েছে তা নয়। এর ইন্ধন যোগানো হচ্ছে অনেকদিন ধরে যা পত্র-পত্রিকায় আপনারা দেখেছেন সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে। বিরোধীদলের এতে কর্ণপাত করার প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু সরকারও এতে কর্ণপাত করে নি। দু'পক্ষই ভেবেছে, ইন্ধনদাতাদের তোয়াজে দ্রবীভূত করা যাবে এবং তারা তাদের দরজায় মিষ্টির প্যাকেট অর্থাৎ ভোটের নজরানা পৌঁছে দেবে। তারা বিশ্বাস করেন, বাঘ ঘাস খায়। আমরা-যে বলি, বলে এসেছি, বাঘ রক্তপানে বিশ্বাসী তা তারা বিশ্বাস করেন নি, হয়ত করেন না। এখানেই বর্তমান বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের একাংশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

বোমাবাজি বা নিরীহ মানুষ হত্যা এদেশে নতুন নয়। পত্রপত্রিকা বা অনেক ভাষ্যকারের ভাষ্য পড়ে মনে হচ্ছে, আওয়ামী লীগ আমলেই বুঝি বোমা হামলাটা শুরু হলো। কিন্তু, ব্যাপারটা তা নয়। কেন বোমা পাওয়া যাচ্ছে বিশেষ করে এখন? বা কারা রাখছে? এসব উত্তরের জন্য খানিকটা পিছাতে হবে। স্থানাভাবের কারণে, আমি শুধু কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব।

না, আমি ১৯৭৫ থেকে শুরু করব না। ১৯৯০ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট বেঁধে সরকার গঠন করে। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে যে বিএনপি একটা ফলস ধারণা দেয় তখনই তা আবারও প্রমাণিত হয়েছিল। জাহানারা ইমাম ও ২৪ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা করতেও বিএনপি কসুর করে নি। বিএনপি'র এই পক্ষাবলম্বন জোর মদদ যোগায় যুদ্ধাপরাধী, ঘাতক, পাকি দালাল ও ধর্ম ব্যবসায়ীরা। সমাজ, রাজনীতিতে তারা তাদের অবস্থান পোক্ত করে নেয়। এদের শক্তি সঞ্চয়ের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায় মধ্যযুগের মাদ্রাসাসমূহ।

বিএনপি-বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে আওয়ামী লীগ এদের নমনীয়তা প্রদর্শন করে। আমরা এর সমালোচনা করেছিলাম। তখন লীগ-নেতারা বলেছিলেন, এটি রাজনৈতিক কৌশল। রাজাকারদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন কী ধরনের কৌশল তাঁরাই জানেন। সরকারে আসার পরও এই নমনীয়তা প্রদর্শনহ্রাস পায় নি। কারণ তাঁদের মনে হয়েছে, তারা তাঁদের দরজায় মিষ্টির প্যাকেট পৌঁছে দেবেন, বোমা নয়।

এ কারণেই দেখি, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বায়তুল মোকাররমের খতিব, মুক্তিযোদ্ধাদের 'গাদ্দার' ঘোষণা করেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনে রাষ্ট্রপতিকে পাদুকা ছুড়ে মারা হয়। মানিক মিয়া অ্যাভেনিউতে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়। বায়তুল মোকাররমে নামাজ পড়তে এসে খুন হন শ্রমিক লীগের নুরু মিয়া ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাতে, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি মওলানা আউয়ালকে কাদিয়ানী ঘোষণা করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তৃণমূল সমাবেশ হতে পারে না। নরসিংদীতে প্রবীণদের সমাবেশও। এ ধরনের অজস্র বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯৭ সালে তো ইসলামী ঐক্যজোট ঘোষণা দিয়েছে–"আমাদের কথামতো রাষ্ট্র চলবে। কারণ, সংখ্যায় আমরা ১১ কোটি মুসলমান।" সুরা আনায়ামে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন- "অবশ্য যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব তোমার নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের জানিয়ে দেবেন।" ধার্মিক হলে এ ঘোষণা বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু, চরের পীর, উদ্ভট উপাধিধারী ধর্মীয় নেতা, মানুষ হত্যায় বিশ্বাসী জামায়াত –এরা কি তা বিশ্বাস করে? করে না এবং তাই তারা ধর্ম ব্যবসায়ী, নয়ত বলা হতো তারা ধার্মিক।

১৯৭১ সালের পরাজয় পাকিস্তানিরা ভোলে নি। ওপরে যাদের কথা বললাম তারাও ভোলে নি। পাকিস্তানের আইএসআইও প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উন্মুখ। স্বভাবতই উল্লিখিতরা পাকিস্তানের নীতিতে বিশ্বাসী এবং আওয়ামী লীগকে উৎখাতে আশাবাদী। বেগম জিয়াও তাই চান। কারণ, বেগম জিয়া প্রথমে ভোটে কারচুপি এবং তারপর অহরহ সরকার উৎখাতের ঘোষণা দিয়েছেন এবং শান্তিচুক্তি আইএসআই বা ধর্ম ব্যবসায়ীরা চায় নি, বিএনপিও। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার হোক তারা চায় না, মদদও দিচ্ছে তাদের। বাংলাদেশ আদর্শ তাদের পছন্দ নয়। পাঞ্জাবিদের জুতার শুকতলা হওয়ার আনন্দই যেন আলাদা।

বাংলাদেশের প্রায় সব পত্রিকা এ ব্যাপারে সবসময় সোচ্চার। এর লেখকরাও বেগম জিয়ার পতনে জনমত সংগঠন করেছে। রাজাকার ও পাকিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছেন। জনকণ্ঠ সিরিজ আকারে এ দেশে অবৈধ অস্ত্র-আনা, তালেবান ও আইএসআইয়ের কর্মকাণ্ড ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচন করেছে। তাই জনকণ্ঠ বিএনপি মিছিল দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাতে বোমা রাখা হয়, এর লেখকদের প্রাণ সংহারের চেষ্টা চলে যার অন্যতম উদাহরণ শামসুর রাহমানকে হত্যার চেষ্টা।

সরকার দাবি করে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কিন্তু সরকার ও সরকারি দলের

অনেকের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এর মিল নেই। তবুও আমরা মনে করি, এখনো আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের। বিরোধীরা জানে, আওয়ামী লীগ যদি আরেকবার ক্ষমতায় আসে তাহলে তাদের অনেকের অস্তিত্ব থাকবে না। সুতরাং এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে জনমনে এ ধারণার সৃষ্টি করতে হবে যে, আওয়ামী লীগ দেশ শাসনে অযোগ্য। জনকণ্ঠ যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং প্রভাবশালী ও সোচ্চার কণ্ঠ সুতরাং একেও নিঃশেষ করতে হবে এবং এভাবে জনকণ্ঠের লেখক ও দেশের সাংবাদিকদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাঁরাও নিরাপদ নয়। তাঁদের হয় নিশ্চুপ থাকতে হবে নয় বোমাবাজদের সমর্থন করতে হবে। বিরোধীদের বিভিন্ন আন্দোলন হালে পানি না-পাওয়ায় এ আতঙ্ক বা অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা এবং এতে যে পাকি আইএসআইদের হাত স্পষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিয়া বা আহমদিয়াদের মসজিদে মুসল্লিদের হত্যা, সাংবাদিক হত্যা, বোমা মেরে স্থাপনা উড়িয়ে দেয়া–এগুলো পাকিস্তানি সংস্কৃতি।

মানুষ যে তা বোঝে না তা নয়। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিএনপি এবং ব্যবসায়ীদের দলগুলোর জোট সৃষ্টিতে। ফলে, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে কারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। বোমা রাখার জন্য যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, পত্রিকানুসারে সে বিএনপি'র কর্মী। উদীচী হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে, বিএনপি'র জেলা সহসভাপতিকে। অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজনীতি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একপক্ষে আইএসআই পরিচালিত একটি জোট, অন্যপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ, প্রগতিবাদী, লিবারেল ডেমোক্র্যাট, মধ্যপন্থিরা এবং তারা সমর্থন করে আওয়ামী লীগকে।

কিন্তু প্রশ্ন অন্যখানে। সরকার কেন এদের এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছে? ভোটের আশায়? তাদের কি ধারণা এদের তোয়াজ করলে তারা আওয়ামী লীগের ভোটের বাক্স ভরে দেবে বা আওয়ামী নেতাদের বাসায় বোমার বদলে মিষ্টির প্যাকেট পৌঁছে দেবে? ধর্ম ব্যবসায়ীদের বক্তব্য শুনে যদি সরকারের নীতিনির্ধারকরা মনে করেন, এদের প্রশ্রয় না-দিলে রাজনৈতিক ক্ষতি হবে তাহলে তারা ভুল করবেন এবং ভুল করেছেন। বাংলাদেশে ফিৎনা সৃষ্টিকারীরা কখনো কল্কে পায় নি। সরকার কঠোর হলে তারা নিশ্চুপ থাকে। এর অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ধর্ম ব্যবসায়ী বা ইন্ধন সৃষ্টিকারীদের কনসেশন দিয়ে কি ক্ষমতায় থাকা যাবে যদি আমরা আমজনতা তা সমর্থন না করি। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির এক সভায় জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, "বর্তমান সরকার যদি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকারীদের সমর্থনে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় তাহলে তাদের সে-কৌশল আমরা সমর্থন করব না।"

সবশেষে বলতে চাই, বিএনপি তালেবানপন্থি, আইএসআইপন্থিদের প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদেরও তাদের পক্ষভুক্ত করে তুলেছে। ফলে এসব হামলার দায়-দায়িত্ব তারা এড়াতে পারে না। তেমনি, সরকার যদি তালেবান ও আইএসআইপন্থি, চরের পীরদের প্রতি নমিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করত তাহলে আজ তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে এ ধরনের কার্যকলাপ করতে পারত না। আমরা সবসময় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে এ বক্তব্য পৌঁছে

দিয়েছি, বিরোধীদেরও বলেছি। কিন্তু থ্রিলারের ভাষায় তারা আমাদের 'এক্সপ্যানডেবল' ভেবেছেন এবং দু'পক্ষই ভেবেছেন তাদের মিষ্টির প্যাকেট গ্রহণে আমরা বাধার সৃষ্টি করছি। আমরা এক্সপ্যানডেবল হলে কি তারা থাকবেন? এটি যদি তাঁরা ভাবেন তাহলে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। তারাও এক্সপ্যানডেবল। তালেবান বা আইএসআই বা চরের পীর বা জামায়াত ক্ষমতা দখল করলে কি বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন? বা এরশাদ? শেখ হাসিনার তো প্রশ্নই আসে না।

আমরা সরকার ও বিরোধীদলের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যদি কেউ থাকে তাদের প্রতি দাবি জানাবো, দলমত নির্বিশেষে এদের প্রতিহত করুন, নির্মূল করুন। তারপরও যদি আত্মগর্বে তারা মত্ত থাকেন তাহলে আমরা শুধু পবিত্র কোরানের সূরা নিসা-ই পড়তে পারি যেখানে বলা হয়েছে-"অবশ্য তোমরা কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের কাছে ও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে বিশ্বাস অর্জন করতে চায়। যখনই তাদের ফিৎনায় ফিরানো হয় তখনই তারা উল্টিয়ে যায়। যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে চলে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না করে ও তাদের হাত না সামলায় তবে তাদের যেখানেই পাবে পাকড়াও করবে... আর আমি তোমাদের এইসব প্রতিরোধের স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছি।"

১৩.১০.১৯৯৯

বোমাবাজির গণতন্ত্র

রোজা শুরু হবার আর বেশিদিন বাকি নেই। সুতরাং সরকার পতনের লক্ষ্যে বিএনপিকে এন্তার হরতাল দিতে হবে। পরবর্তী হরতালগুলি দু'দিন থেকে বাড়িয়ে চার দিন এবং তারপর সাত দিন করলে কেমন হয়? গত তিন বছরে হরতাল তো কম হয় নি, কিন্তু বিএনপি নেতৃবৃন্দের খায়েশ তো পূরণ হচ্ছে না। সুতরাং, হরতালের মেয়াদ বাড়ানো হোক। শহরাঞ্চলের অর্থনীতি এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, বাকি বাংলাদেশে তেমন প্রতিক্রিয়া হবে না। শহরাঞ্চলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তারা যদি মনে করেন, এরপরও তারা জামাত ও বিএনপিকে সমর্থন করবেন তাতে কারো কিছু বলার নেই। আর যাদের মনে হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং এটা তারা মানতে রাজি নন তাহলে তারা বিএনপিকে সমর্থন করবেন না। গণতন্ত্রে জোরজবরদস্তি নেই।

এ দর্শন রাজনীতিবিদরা মানলে আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু, মানছেন কই! বিএনপির হরতালে আপত্তি নেই। এটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু বোমাবাজি করে যদি হরতাল পালনে বাধ্য করা হয় তাহলে বলতে হবে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালনে আগ্রহী নয়। এটি হবে বোমাবাজির গণতন্ত্র। আমরা পালন করব বাধ্যতামূলক হরতাল।

৭ ও ৮ নভেম্বরে কেন হরতাল ডাকা হলো? বেগম জিয়া বলেছেন, "৯৬-এর নির্বাচনে ভোট কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার আবার আঘাত হানতে থাকে জাতীয় ঐক্যের বীজমন্ত্র ও স্বাধীনতার রক্ষাকবজ ৭ নভেম্বরের ওপর।" ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে যদি কারচুপি হয় তাহলে নিজেকে লজ্জাহীনভাবে সংসদীয় নেত্রী কীভাবে বলেন বেগম জিয়া? তিনি এবং তাঁর দলের সাংসদরা কারচুপির নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে সংসদে বসলেন কীভাবে? সাংসদের সুযোগ-সুবিধা নিলেন কীভাবে? লাজলজ্জার ব্যাপারটা কি বাঙালি সংস্কৃতি থেকে একেবারে লোপ পেল? আওয়ামী লীগ যেখানে জিতেছে সেখানে কারচুপি হয়েছে, বিএনপি যেখানে জিতেছে সেখানে কারচুপি হয় নি–এ যদি হয় বক্তব্য তাহলে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, এসব বক্তব্যও একধরনের ভাওতাবাজি। সুবিধাবাদের রাজনীতিরও একটা সীমা থাকে। বিএনপি মনে হয় তাও অতিক্রম করছে। গত ৭ নভেম্বরের হরতালের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেগম জিয়া বলেছেন, "৭ নভেম্বর আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি তাৎপর্যময় দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্র রক্ষায় সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।" সরকার "এই মহান বিপ্লবের চেতনা ও তাৎপর্যকে ম্লান এবং ইতিহাস বিকৃত করে মহান এই দিবসের সকল

আনুষ্ঠানিকতা, এমনকি সাধারণ ছুটি বাতিল করে জনগণের মন থেকে এই দিবসকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করে।”

এই বিবৃতির কোনো অংশই সত্য নয়। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। অপরিকল্পিতও নয়। ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। ২২ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্টের মধ্যে গ্রেপ্তার হন আওয়ামী নেতৃবৃন্দ। জেনারেল জিয়া গ্রেপ্তার হন ২ নভেম্বর। ৩ নভেম্বর সংঘটিত হয় জেলহত্যা। জেনারেল জিয়াকে পদত্যাগ করানো হয়। খালেদ মোশারফের পদোন্নতি হয় এবং ১৫ আগস্ট খুনিরা দেশ ছেড়ে পালায়। উল্লেখ্য, জিয়া মুক্তি পেয়েই খালেদ মোশারফ যাতে হত না হন সে চেষ্টা করেন এবং জিয়া যাতে হত না হন খালেদও সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। অর্থাৎ ঐ ক'দিন ক্ষমতার লড়াই, আদর্শগত বিপ্লবী কোনো সংগ্রাম নয়। সব বিপ্লবের একটি পটভূমিকা থাকে। এ বিপ্লবের পটভূমিকা কী তা তো আগেই উল্লেখ করেছি। এ সঙ্গে জনগণের চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারটা কোথায়? বিপ্লব মানে বিদ্যমান ব্যবস্থা উৎখাত করা। সকল অর্থে দেখি ৭ নভেম্বর 'বিপ্লব' শুরু ১৫ আগস্ট থেকে। এ সময়টুকুতে উৎখাত করা হয়েছিল সিভিল কর্তৃত্ব, হত্যা করা হয়েছে জাতীয় নেতাদের, এক গ্রুপ সৈন্য ষড়যন্ত্র করেছে আরেক গ্রুপের বিরুদ্ধে। এসব টানাপোড়েনে জিতেছেন জেনারেল জিয়া এবং ক্ষমতা করায়ত্ত করেছেন। সুতরাং ৭ নভেম্বর 'বিপ্লব' নয়। পৃথিবীর কোথাও সিভিল কর্তৃত্বকে হটানোকে বিপ্লব বলে না, সেটাকে সামরিক অভ্যুত্থান বা ষড়যন্ত্র বলা হয়।

আর সংহতি? কাদের সঙ্গে? কার সঙ্গে কার সংহতি হয়েছে? রাজাকারদের সঙ্গে সামরিক শাসকদের সংহতি হয়েছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে নয়। সাধারণ মানুষ কখনোই সামরিক কর্তৃত্ব পছন্দ করে নি। সামরিক কর্তৃত্ব মানুষ পছন্দ করলে মানুষ সামরিক শাসন হটানোর জন্যে বারবার রাস্তায় নামত না। এখানেই বাঙালিদের সঙ্গে পাকিস্তানিদের তফাৎ। বেগম জিয়া বা জেনারেল এরশাদ তো বোঝেন না। তাই, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান মারা গেলে বেগম জিয়া শোকবাণী পাঠান আর জেনারেল এরশাদ সৌদি আরব গিয়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসকের সঙ্গে হাত মেলান। এখানে আরকটি বিষয় উল্লেখ্য, জেনারেল জিয়াও কিন্তু ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলীকে বিপ্লব বলতে দ্বিধা করেছেন। তাই ঐ দিবস উপলক্ষে প্রেরিত বাণীতে 'বিপ্লব' শব্দটিকে দুটি উর্ধ্বমুখী কমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন। সুতরাং, বলা যেতে পারে ৭ নভেম্বর পালন করার অর্থ হচ্ছে সিভিল সমাজকে খাটো করা। আমরা তা মানতে পারি না। আওয়ামী লীগের একটি ইতিবাচক কাজ হচ্ছে ৭ নভেম্বর সরকারি ছুটি বাতিল করা।

আর ৮ নভেম্বর হরতাল ঘোষণার কারণ হিসেবে বেগম জিয়া বলেছেন, এ হরতাল আহ্বান করা হয়েছে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন তফশীল ঘোষণার প্রতিবাদে। ইতোমধ্যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। মানুষজন বলছিলেন, তাহলে নিশ্চয় হরতাল প্রত্যাহার করা হবে। হয় নি। তার অর্থ দাঁড়ায়, বেগম জিয়ার জেদ-ই আসল, এর সঙ্গে গণতন্ত্র চর্চার কোনো সম্পর্ক নেই। এটিও বোমা মেরে মানুষকে ঘরে থাকতে বাধ্য করার মতো। তবে, এই গণতন্ত্র সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করেছেন এবিএম

মূসা। তিনি লিখেছেন–"ভোট দিতে চাই, এই দাবি করে আইয়ুব, জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার আমলে আন্দোলন, বিক্ষোভ করল জনগণ। কত নূর হোসেন, দেলওয়ার ও মিলন প্রাণ দিল শুধু "ভোট দিতে চাই, ভোট দিয়ে গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করতে চাই", এ কথাগুলি বলার জন্যে। এখন আমাদের বিরোধীদল বলছে, 'না, ভোট দিতে পারবে না, ভোট দেয়া যাবে না।"

সবশেষে বলতে পারি, সরকার যে বলছে বিএনপি ইস্যুবিহীন হরতাল করছে তা ঠিক নয়। উপরের আলোচনা থেকে ইস্যুটি পরিষ্কার। বিএনপি তাদের মতো গণতন্ত্র চায় সে গণতন্ত্রের আদল হবে পাকিস্তানি ছাঁচে। এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে যুক্তি অচল। যুক্তি ভিত্তি হলে এইসব কারণে হরতাল হতে পারে না। যুক্তি অচল দেখেই পেশীশক্তি দিয়ে মানুষকে দমিয়ে রাখতে হবে। পাকিস্তানের মতো মুখে সবসময় গণতন্ত্রের বুলি আওড়াতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে জামায়াত-বিএনপির গণতন্ত্র তাই আজ বোমাবাজির গণতন্ত্র।

৮.১১.১৯৯৯

কেমন লাগে ভাইসব, রক্তে ভেজা হাতে হাত মেলাতে?

চমক সংবাদে নয়, চমক ছিল ছবিতে? বিএনপি, জাপা, জামায়াত অনেকদিন ধরেই সরকারবিরোধী 'আন্দোলনের' কথা ভেবেছে, করছেও। সুতরাং তারা একত্রিত হয়ে একটি ঘোষণা দিয়েছে। সেটি এমন কোনো মহাবিষয় নয়। কিন্তু সেই ছবি? ১ ডিসেম্বর প্রায় সব দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিটি ছাপা হয়েছে। বেগম জিয়া হু, মু. এরশাদ ও গো. আযম হাসছেন। কোনো কোনো দৈনিকে উদ্ভট উপাধিধারী আরেকজনের ছবিও ছাপা হয়েছে। কখনো কখনো তিনি নিজের অনুসারীদের দল মনে করেন, কখনো ইসলামের রক্ষক মনে করেন। তবে তিনি এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নন যে আলোচিত হবেন। স্ট্যান্টম্যান হিসাবে মাঝে মাঝে খবরের বিষয় হতে পারেন হয়ত। তাঁকেও দেখা গেছে হাসতে।

চমৎকার একটি ছবি এসেছে একটি দৈনিকে। সুসজ্জিতা বেগম জিয়া, হু. মু. এরশাদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। বোঝা যায় মনের খুশি তিনি আর চেপে রাখতে পারছেন না। হু. মু. এরশাদ লাজুক মুখে তাকিয়ে, চোখ অর্ধনিমীলিত। যুগলের দিকে তাকিয়ে আবার হাসছেন গো. আযম। বেগম জিয়াকে এত সুন্দর হাসি দূরে থাকুক, গত চার বছরে কেউ হাসতে দেখেছেন কি না সন্দেহ। ৩০ নভেম্বর প্রকাশ্যে সবাইকে জানিয়ে তাঁরা হাতে হাত রেখেছেন। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের হাত রক্তে রঞ্জিত। জেনারেল এরশাদ নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে প্রায় দশ বছর শাসন করেছেন। এ সময় প্রচুর মানুষ নিহত হয়েছে, তাই তাকে বলা হয় স্বৈরাচারী তাঁর হাতও রক্তে রঞ্জিত। রক্তে ভেজা সব হাত একত্রিত হয়েছে। কী হতে পারে বলে মনে করেন ভাইসব? শুধু কি এঁদের হাত, রক্তে ভেজা? এঁরা কিভাবে পরস্পরকে মূল্যায়ন করেন তাও শুনুন।

মাত্র কিছুদিন আগে গো. আযম এক সমাবেশে বলেছিলেন–"বিএনপি সরকারের সময় সবচেয়ে বেশি ইসলামবিরোধী কাজ হয়েছে ... বিএনপি সরকার ভারতের সাথে সবচেয়ে বেশি মিত্রতা করেছে। ভারতের কাছে দেশ বিকিয়েছে তারা। ভোট বাগানোর জন্যে তারা আজ স্বাধীনতার রক্ষক সেজেছে।" [সংবাদ, ২৭-৪-৯৬]

এখন প্রশ্ন, ইসলামের যারা বিরোধী তাদের সঙ্গে জামায়াত হাত মেলায় কীভাবে? হিন্দুস্থানের কাছে যারা দেশ বিকিয়ে দেয় তাদের এত ভক্ত হলো কেন জামায়াতীরা? তিনি আরো বলেছিলেন, "দেশে ঘুষের রাজত্ব কায়েম হইয়াছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জুয়া চলিতেছে।" [ইত্তেফাক, ২৯-৫-৯৫] এবং "ভারতের তাঁবেদার পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় রাখা যায় না।" গোলাম আযম ১৯৯৭ সালে তাঁর প্রকাশিত একটি গ্রন্থে লিখেছেন–"যে দ্বীনকে কায়েমের জন্যে কাজ করে, সে ইসলামী কর্মী।"

এখন যাঁরা ঘুষ জুয়া চালু করেছিল ও হিন্দুস্থানের সঙ্গে মহব্বত করেছিল তাঁদের সঙ্গে তার হাত মেলানো কি দ্বীনের কাজ? আমরা অনেকবার বলেছি, জামায়াত ইসলাম ধর্মের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। এসব কি আবার প্রমাণ করে না এরা পাঁড় ভণ্ড? ইসলামী দলের পরিচয় দিয়ে যখন একটি দলের প্রধান এসব কাজ করেন তখন কি মনে হয় না এরা শুধু প্রতারকই নয়, ইসলামকেও ধ্বংসের কাজে লিপ্ত। এসব মোনাফেক থেকে সাচ্চা মুসলমান হয়ে বাঁচতে হলে এদের বিনাশ করাই শ্রেয়।

আলবদরদের প্রাক্তন প্রধান মতিউর রহমান নিজামীও ছিলেন বৈঠকে। এই যুদ্ধাপরাধী বলেছিলেন, "বিএনপি সরকার ও ছাত্রদল কসাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে" [মিল্লাত, ২৪-১২-৯৪] এবং "হত্যার রাজনীতির কারণেই বিএনপির ভরাডুবি ঘটবে" [সংগ্রাম ৭-৯-৯৫]। শুধু তাই নয়, "৫ বছরের দুঃশাসনে জনগণের মধ্যে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বিএনপি কোনো বিশ্বস্ত রাজনৈতিক শক্তি নয়।" [সংগ্রাম ২৪-৩-৯৬]

এরপরও কি অভিধানে "মিথ্যাবাদী" বা "সুবিধাবাদী" বা "নির্লজ্জ" শব্দটির মানে খুঁজতে হবে? এইসব যুদ্ধাপরাধীও গিয়েছিল বেগম জিয়া সকাশে। এদের নাম দিয়েছে সাধারণ মানুষ এককথায়– রাজাকার। তরুণ প্রজন্মের যারা বিএনপি সমর্থক তাদের জিজ্ঞেস করছি কেমন লাগছে রাজাকারদের সঙ্গী হতে? নিজেকে রাজাকার পরিচয় দিতে? বিএনপি তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের কেমন লাগছে খুনিদের সঙ্গে, যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে হাত মেলাতে, ভাইসব বলবেন কি?

কিছুদিন আগে হু. মু. এরশাদ বলেছিলেন, "স্বাধীনতার পর যতগুলো সরকার এসেছে তার মধ্যে বিএনপি সরকার ছিল সবচেয়ে বাজে সরকার। এই বিএনপি সরকার দেশকে ধ্বংস করেছে। বিচার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। ধ্বংস করেছে ছাত্রদের। ছাত্রদের হাতে অস্ত্রও তুলে দিয়েছে।" এবং বিএনপি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় "দেশের ১২ কোটি মানুষ রক্ষা পেয়েছে।" [ভোরের কাগজ ১০-১-৯৭] জাপার ভাইসবের কেমন লাগছে "সবচেয়ে বাজে" দলটির সঙ্গে হাত মেলাতে। এরশাদ তো এ সমাজে শুধু স্বৈরাচারী হিসেবেই নন, ভণ্ড হিসেবেও পরিচিত। এবারও তার প্রমাণ রাখলেন ৩০ তারিখের বৈঠকে। বেগম খা. জিয়া সম্পর্কে বললেন, "শি ইজ ভেরি গুড লেডি, ভেরি নাইস লেডি।" [ভো. কা. ১-১২-৯৯] এরশাদের ভাষায় যে খালেদা জিয়া তাকে "হত্যা করার চেষ্টা করেছিল" সে এত নাইস হলো কিভাবে?

জে. এরশাদ কয়েকদিন আগেও বলেছিলেন, বিএনপি সরকার "জালেম সরকার"। শুধু তাই নয়, "মরে গেলেও বিএনপিকে সমর্থন দেব না।" [ভো. কা. ১৯৯৭]। জেনারেল কি এখন বেঁচে আছেন না জীবন্মৃত? এবং বলেছিলেন, "দলকে শক্তিশালী করিয়া বিএনপির অত্যাচারের জবাব দিতে হইবে।" [ইত্তেফাক] জাপার ভাইসব, কী ভাবে জবাব দেবেন। বেগম জিয়ার চরণ বন্দনা করে। এরশাদ বলেছিল, "খালেদা জিয়ার আমলে সুষ্ঠু নির্বাচন হয় নাই।" [ইত্তেফাক, '৯৭] তাহলে বিএনপিকে নিয়ে ভবিষ্যতে নির্বাচন করলে যে তা সুষ্ঠু হবার কোনো কারণই তো দেখছি না।

এরশাদ বেগম জিয়া সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি "মৌলবাদী রাজাকারচক্রের সাথে হাত মিলিয়ে দেশ ধ্বংসের পাঁয়তারায় মেতে উঠেছেন।... এর পরিণাম কখনোই ভালো হবে না... যিনি নিজের জন্মদিন সর্ম্পকে মিথ্যাচার করে জনগণের সাথে প্রতারণা করতে পারেন তাঁর সম্পর্কে কিছু ভাবতেই আমার ঘৃণা হয়।" [জনকণ্ঠ, ৩০-৮-৯৭]

সেই ঘৃণা এখন রূপান্তরিত হয়েছে, 'নাইস'-এ। কবিরা বলেন, ঘৃণার অপর পিঠই ভালোবাসা। আর এরশাদ তো নিজেকে কবি ভাবেন। কিন্তু মুশকিল হলো, রাজাকারদের সঙ্গে তো এরশাদ হাত মেলালেন। রাজাকার আর স্বৈরাচার একীভূত হলো। এরশাদই বলেছিলেন, বিএনপিকে লক্ষ্য করে যে, "যারা হরতাল ডাকে তারা দেশের শত্রু"। এখন ৫ ও ৬ তারিখে তারা সবাই মিলে হরতাল ডেকেছেন। প্রতারণা কাকে বলে–এর নতুন কোনো সংজ্ঞা কি আর নিরূপণ সম্ভব?

যে বেগম জিয়া এরশাদের দিকে তাকিয়ে হৃদকম্পিত হাসি হাসছেন সেই বেগম জিয়া এই ব্যক্তিটিকে তার স্বামীর হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বলেছিলেন সে শুধু স্বৈরাচারী নয়, "অবৈধ ও ক্ষমতার জবরদখলকারী।" শুধু তাই নয়, এরশাদ "নিরস্ত্র জনগণের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে গণহত্যা ঘটিয়েছে" [সংবাদ, ১৯৮৮] প্রশ্ন হচ্ছে, সন্ত্রাসী বা স্বৈরাচারীর সঙ্গে কারা হাত মেলায়? সন্ত্রাসী ও স্বৈরাচাররাই তো। বেগম জিয়া আরো বলেছিলেন, এরশাদ বা জাতীয় পার্টিকে ক্ষমা করা যাবে না। কারণ "ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং গুণ্ডামি" করে তারা "দেশের মান-সম্মান ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে।" [সংবাদ, ৬-৩-৯৮] এবং মসজিদে দাঁড়াইয়া অসত্য কথা বলিয়াছেন।" এবং তাই বোধ হয় দৃপ্ত কণ্ঠে বেগম জিয়া ঘোষণা করেছিলেন, "এই সরকারের সাথে অতীতে যেমন আপোস হয় নি, ভবিষ্যতেও করব না।"

ভাইসব সত্যবাদী কাকে বলে? যাক সে-কথা, বিএনপি ভাইসব, কেমন লাগছে সেই এরশাদকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। কারণ, বিএনপির নেতৃবৃন্দের পক্ষে নজরুল ইসলাম খান এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছিলেন, "এরশাদকে মুক্তি দিতে হলে জেলে আটক সব চোর-ডাকাত, মাস্তানকে মুক্তি দিতে হইবে।" এবং বেগম জিয়া বলেছিলেন, "এরশাদ বেঈমান, নির্যাতনকারী ও অপরাধী।" [ইত্তেফাক, ১৯৯১] এবং "জেলখানাই এরশাদের উপযুক্ত স্থান।" কিন্তু এখন তো প্রমাণিত হলো বেগম জিয়ার পাশের স্থানটি তার জন্যে উপযুক্ত। পাশেই যখন স্থান তখন এই 'মাস্তান', এই 'বেঈমান', বা 'চোর'-কে আর খারাপ লাগার কথা নয়।

ওপরের কোনো মন্তব্যই আমার নয়। এসব হচ্ছে তিন নেতার পারস্পরিক মূল্যায়ন। এ থেকে কি বিষয়টা স্পষ্ট নয় যে–

১. এ ধরনের রাজনীতিবিদরা মুখে যা বলেন তা বিশ্বাস করেন না, তাঁরা প্রতারক।

২. তারা ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন কিন্তু বে-ইসলামি বা বে-দ্বীন আর মুক্তিযুদ্ধ ও রাজাকারের পার্থক্য বোঝেন না। সব একাকার করে ফেলেন। অর্থাৎ ভণ্ড মুক্তিযোদ্ধা। এঁরা ভণ্ড ইসলামি। রাজাকার তো বটেই। বিএনপির মেজর (অব.)

আখতারুজ্জামান নামে এক সংসদ সদস্য প্রায় সব বিষয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। তাঁর কোনো মন্তব্য তো দেখলাম না।

৩. উদ্ভট উপাধিধারী একজন ও গোলাম আযম এমনকি এরশাদও বলেছেন, নারী নেতৃত্ব তাঁরা মানেন না। কারণ তা নাজায়েজ। কিন্তু এখন জায়েজ হলো কীভাবে? 'নির্লজ্জ' শব্দটির উদাহরণের দরকার নেই। এঁদের নাম করলেই চলবে।

৪. এঁরা হাতে হাত মেলানোর পর এক বিএনপি নেতা বলেছেন, "সরকার হটানোর জন্যে আমরা অপছন্দের ব্যক্তির সাথেও হাত মিলিয়েছি।" এবং এক জাপা নেতা বলেছেন, "আমরা শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি।" [সংবাদ, ৩০-১১-৯৯] অর্থাৎ ব্যাপারটা কোনো আদর্শিক রাজনীতির জয়ের জন্যে নয়। নিছক ক্ষমতা দখল। অথচ গো. আযম তার গ্রন্থেই বলেছেন, নিছক ক্ষমতা দখল ইসলামের কাম্য নয়। অর্থাৎ এই চার জন যে বিশাল যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন তা ভাঁওতাবাজি। সুবিধাবাদীদের ক্ষমতা দখলের ম্যানিফেস্টো।

এরা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে কী বিপদ হতে পারে রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনু তাঁর উদাহরণ দিয়েছেন। এঁরা জিতলে হয়ত হু. মু. এরশাদ হবেন প্রেসিডেন্ট। তার মানে আবার হবে অবৈধ অর্থ ও নারী দখল আর বঙ্গভবন হবে ম্যাডাম টেন পার্সেন্টের কেন্দ্র। বেগম জিয়া হবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি রাজাকার ও স্বৈরাচারীদের একত্রিত করবেন এবং একুশ ও স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করবেন। গো. আযম হবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তখন হয়ত স্লোগান হবে–চলো চলো পাকিস্তান চলো। নিজামী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলে পুলিশবাহিনীর নাম হবে আলবদরবাহিনী। তাদের কাজ হবে জামায়াতে ইসলামবিরোধী সবাইকে কারণে-অকারণে জবেহ করা। আজিজুল হক শিক্ষামন্ত্রী হয়ে সব স্কুল মাদ্রাসায় রূপান্তর করবেন। সব মহিলা ঘরে আটক থাকবেন। ঠিক ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ। একদিকে ভালোই হয়েছে। এরা ভাবছে বিরাট কিছু করেছে। এ প্রসঙ্গে সেই রাজার কথা মনে পড়ল। রাজা মহার্ঘ এক পোশাক পরে বেরিয়েছেন অন্তত তার তাই মনে হয়েছে। সে-পোশাকে রাজাকে দেখার জন্যে প্রজারা লাইন করে দাঁড়িয়েছে। সবাই আহা উহু করছে। এক শিশু, যে ভণ্ডামি শেখে নি, তখন বলে ফেলল, রাজার নতুন পোশাক কই? রাজা তো ন্যাংটা। চার দলের বৈঠক তাদের মূল চরিত্র উন্মোচন করেছে।

এর বিপরীতে অন্য দলরা কী করবে সে-ভাবনা তাদের। আমরা শুধু বলব, যারা একবার রক্তে ভিজিয়েছে হাত তারা কখনো রক্তের স্বাদ ভোলে না। এইসব রক্তে ভেজা খুনি হাত সব একত্রিত হয়েছে। আমরা বা আপনারা কতটা নিরাপদ, ভেবে দেখবেন কি ভাইসব বা আপনাদের সন্তানরা?

৪.১২.১৯৯৯

রাজনীতিতে সংঘাত ও মেরুকরণের বছর

১৯৯৯ সাল ছিল রাজনৈতিক সংঘাত ও রাজনীতির মেরুকরণের বছর। গত বছরের মতো এ বছরও বিরোধীরা চেয়েছে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরই বিরোধী প্রধান দল বিএনপি ঘোষণা করেছিল, আওয়ামী সরকারকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হবে না। তারা তাদের কথা রেখেছে। সারাটা বছর তারা নানা ইস্যু তৈরি করেছে, লাগাতার হরতাল করেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সন্ত্রাসও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য দল যেমন জাতীয় পার্টি বা জামাতও বিএনপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এর মধ্যে চমক তেমন ছিল না। চমক ছিল শুধু কাদের সিদ্দিকীর নতুন দল গঠন এবং স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা। রাজনৈতিক কারণে জনজীবন, অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উপ-নির্বাচনগুলোতে বিরোধী দলসমূহ যোগ দেয়নি। হাঙ্গামা করেছে। সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তারা নির্বাচন প্রভাবিত করেছে। বিরোধী দলসমূহ পার্লামেন্টের অধিবেশনসমূহও বর্জন করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, রাজনীতি সম্পর্কে অনেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন যা একটি দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়। খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার মধ্যে তুলনা করা ঠিক না হলেও অনেকে বলছেন, যতদিন তারা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকবেন ততদিন বাংলাদেশে রাজনীতি সুস্থির হবে না। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে, রাজনীতির মেরুকরণ সম্পন্ন হয়েছে বছরের শেষে। বিষয়টি অপ্রত্যাশিত ছিল না কিন্তু নতুন চারদলীয় জোট যেমনভাবে একাত্মতা প্রকাশ করেছে এর আগে তেমনভাবে তারা তা করেনি। এর ফলে, স্বাধীনতার পক্ষের এবং বিপক্ষের শক্তি চিহ্নিত করার মধ্যে আর অস্পষ্টতা রইলো না। এটি ইতিবাচক দিক। কারণ, এর আগে বিএনপি বা জাতীয় পার্টি নিজেদেরও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে দাবি করতো। এখন তো তারা আর তা করে না। ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সমর্থক বললে তাকে ধরে নেওয়া হয় আওয়ামী লীগের সমর্থক, না হলে বিরোধী দলের মাঝখানের ধূসর রেখাটি ভারি অস্পষ্ট।

বিএনপি, জামাত বা জাতীয় পার্টি মিলে যে জোট করেছে তার চরিত্রটি সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এ ধারণা করা যেতে পারে- এ সব দলের নেতা-নেত্রীরা কি বলেছেন এবং কি বলছেন তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এ ধারণাটি স্পষ্ট না হলে সমাজে বিভ্রান্তি আরো বাড়বে যা দেশের জন্য ইতিবাচক নয়। কারণ, আগামী নির্বাচনে কে জিতবে তার ওপর অনেকটা নির্ভর করবে বাংলাদেশের পলিসি কি হবে। সে কারণে, বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আবার বলতে পারি ১৯৯৯ সাল বা বিগত শতকের শেষ বছরটি ছিল ধর্ম ও রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের প্রভাব বা ক্ষমতা সংহত করার বছর।

গত দুই যুগ ধরে ধর্ম ও রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রক্রিয়ায় পা রেখেছিল। অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে তারা এগিয়েছে এবং সমাজের এলিটবর্গের একটি বড় অংশকে তারা নিজেদের কব্জায় এনে ফেলতে পেরেছে। শহুরে এবং গ্রামীণ দু'শ্রেণীর এলিটই এর অন্তর্গত। ধর্মব্যবসায়ীদের মধ্যে আছে জামাত, বিভিন্ন পীরের ও স্বঘোষিত 'মাওলানা'দের ছোট ছাট দল। এদের সহায়তা করছে ধর্মান্ধ ও সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষজন। গ্রামের অশিক্ষিত চাষি থেকে শিক্ষিত প্রকৌশলীও এর অন্তর্গত। রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের যাত্রা শুরু জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা দখল থেকে। বিএনপি, জাপা ও আরো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দলগুলো হচ্ছে এই ক্যাটাগরির অন্তর্গত। এদের সহায়তা করেছে প্রধানত সামরিক বাহিনী ও আমলারা। এরা আবার ব্যাংক লুটের সুযোগ দিয়ে তৈরি করেছে ঋণখেলাপি ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ইত্যাদি। দু'টি ক্যাটাগরির একটু পার্থক্য আছে।

ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি করছে। রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার কথা বলে রাজনীতি করছে, তবে তাতেও ধর্মের মিশেল থাকছে দু'শ্রেণীরই লক্ষ্য ছিল এক- ক্ষমতা দখল। এদের ব্যবসায়ী নামে আখ্যা দেওয়ার কারণ তাদের মধ্যে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কোনো আদর্শ নেই। যা আছে তা হলো যে ভাবেই হোক ক্ষমতা দখল।

ডিসেম্বর, যেটিকে আমরা বিজয়ের মাস বলি, ১৯৯৯ সালে সেই বিজয়ের মাসকেই তারা বেছে নিয়েছে তাদের ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত পর্ব হিসেবে। কাগজে আপনারা প্রায়ই দেখেছেন বেগম জিয়া, গোলাম আযম ও এরশাদের ছবি। কোনো কোনো ছবিতে দেখা গেছে, লাজনম্র চোখ, নত মুখে স্মিতহাসি বেগম জিয়া, পাশে সাবেক জেনারেল এরশাদ, তার পাশে গম্ভীর মুখে রওশন এরশাদ। কোনোটিতে দেখা গেছে বেগম জিয়া ভারি সুন্দর হাসি হাসছেন গোলাম আযমের দিকে তাকিয়ে, অট্টহাসিতে ভেঙে পড়েছেন গোলাম আযম, অন্যপাশে এরশাদও হাসছেন। একটি ছবিতে দেখেছি বেগম জিয়া হাসি মুখে বসে, গোলাম আযম দাঁড়িয়ে, হাতটি বেগম জিয়ার চেয়ারের হাতলে, হাসছেন ড্রাকুলার হাসি। এ ছবিগুলোর কোনোটিই দেখে মনে হয়নি যে কৃত্রিম। খুবই আন্তরিক মনে হয়েছে তাদের। যে মেরুকরণ অনেক আগেই হওয়ার কথা ছিল সে মেরুকরণ সম্পন্ন হয়েছে চারদলীয় জোট বা ঘোটের মাধ্যমে। বিএনপি রাজনীতিতে এক চিমটে ধর্ম মিলিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। এখন তা পুরোপুরি ধর্ম ব্যবসায়ীদের দলেই পরিণত হচ্ছে। জামাতের নেতৃত্ব তারা মেনে নিয়েছে।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন কেন আমি তাদের ব্যবসায়ী বলে উল্লেখ করছি? এর কারণ হচ্ছে, কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত তারা পরস্পরের প্রতি তুমুল বিষোদগার করেছেন। এখন তারা পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরছেন কিভাবে? এর অর্থ হতে পারে, তারা যা

বলেন তা বিশ্বাস করেন না এবং যা বিশ্বাস করেন তা বলেন না। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিই-

১. 'প্রধানমন্ত্রীর [বেগম জিয়া] উক্তি বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপের শামিল' মওদুদ আহমদ, দৈনিক জনতা, ৬.৯.১৯৯৯।

২. 'নতুন আঙ্গিকে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।' মওদুদ আহমদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০.৯.৯১।

৩. 'বিএনপি সরকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও প্রশাসন দলীয়করণের সরকার।' মওদুদ আহমদ, ইনকিলাব, ৭.৮.১৯৯৩।

৪. 'দেশবাসী বেগম জিয়া ও তার সরকারের অত্যাচার নিপীড়ন কখনো ভুলবে না।' ঐ, ২২.৪. ১৯৯৬।

এই মওদুদ আহমদ আমাদের বিএনপির অত্যাচারের কথা ভুলতে মানা করে নিজে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন এবং তিনি এখন বিএনপির নেতা।

৫. 'জগন্নাথ হলে পুলিশী নির্যাতন (বেগম জিয়ার আমলে) পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' ওবায়দুর রহমান, বাংলার বাণী, ৭-২-১৯৯৬।

৬। 'বিএনপি সরকার তামাশার নির্বাচন করে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।' ঐ ১৯.২.১৯৯৬।

ওবায়দুর রহমান এখন শুধু বিএনপি নেতাই নন, সংসদ সদস্যও। অবশ্য এখন জেলে আছেন।

৭. 'বর্তমান সরকারের হাতে বাংলাদেশের সংবিধান, স্বাধীনতা, অর্থনীতি, দেশের সীমানা, জনগণের জীবন কিছুই নিরাপদ নয়।' আনোয়ার জাহিদ, দৈনিক সংগ্রাম, ২৮.৭.১৯৯৪।

আনোয়ার জাহিদ এখন বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতা, শোনা যায় বেগম জিয়ার খুবই ঘনিষ্ঠ। তিনি আরো বলেছিলেন-

৮. 'বাংলাদেশকে একটি সুন্দর দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার এখন একমাত্র পথ হচ্ছে বর্তমান বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা।' দৈনিক মিল্লাত, ৭.১১.১৯৯৪

৯. 'বেগম জিয়া এ দেশে মুসলমানশূন্য করার জন্য কাজ করছেন।' ঐ, ১৩.১০.৯৫।

১০. 'জাতি ও সরকারের মধ্যে বিশ্বাসের ভাঙন ধরিয়াছে।' সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ইত্তেফাক, ২.৪.৯৫।

১১. 'উন্নয়নের জোয়ারের নামে দুর্গতি ও স্বজনপ্রীতি চলিতেছে।' ঐ, ৫.৮.১৯৯৫।

সালাউদ্দিন কাদের শুধু চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধীই নয়, এখন বিএনপিরও নেতা। এখন প্রশ্ন, এসব 'রাজনৈতিক নেতা' দ্বারা বিএনপি গঠিত, তা হলে এদের এবং বিএনপি সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে কিনা?

রাজাকারদের দল জামাতে ইসলামীর আজীবন প্রধান গোলাম আযম বিএনপি শাসন সম্পর্কে বলেছিলেন-

১২. 'আইয়ামে জাহেলিয়াতে বর্বরতাকেও হার মানাইয়াছে।' ইত্তেফাক, ২২.৯.৯৩।

১৩. 'ভারতের তাঁবেদার পুতুল সরকারকে আর ক্ষমতায় রাখা যায় না।' সকালের খবর, ২৯.৯.৯৫।

১৪. 'সরকার দেশ হইতে ইসলাম নির্মূলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।' ২২.১২.৯৫, ইত্তেফাক।

১৫. 'এই সন্ত্রাসী স্বৈরাচারী ও ইসলামবিরোধী বিএনপি সরকারের পতন ঘটিয়ে এ দেশের গণতন্ত্রকে নিরাপদ করতে হবে।' বাংলার বাণী, ১০.২.৯৬।

কোনো ইসলামী চিন্তাবিদ, নেতা এ কথা বলার পর হাসিমুখে যদি বিএনপির সঙ্গে জোট বাধে তাহলে তাকে ভণ্ড, ধর্মব্যবসায়ী, মিথ্যুক বলা ছাড়া আর কি বলা যায়? যে দলের নেতা এমন সে দলের চরিত্র কেমন? এই জোটের আরেকজন নেতা হচ্ছেন শায়খুল হাদিস মওলানা আজিজুল হক। তিনি বলেছিলেন-

১৬. 'দেশের স্বাধীনতা এ সরকারের হাতে নিরাপদ নয়।' দৈনিক সংগ্রাম, ১৪.৯.৯৪।

১৭. 'সরকার বিসমিল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করছে।' মিল্লাত, ১.১০.৯৩।

বিএনপি তো সেই দলই আছে, নেতৃত্বও সেই রকম। তাহলে জনাব হক কেন এই জোটে যোগ দিলেন? তার মানে আগে যা বলেছিলেন তা ঈমান থেকে বলেননি। যিনি এ রকম কথা বলেন, আজ প্রশ্ন করা দরকার তিনি কোনো ইসলামী দলের নেতা হতে পারেন কিনা বা 'শায়খুল হাদিস' হতে পারেন কিনা। যারা ধর্ম জানেন তাদের কাছে প্রশ্ন, যিনি সত্য বলেন না তিনি তাঁদের ইমাম হতে পারেন কিনা?

জেনারেল এরশাদের নতুন পরিচয়ের দরকার নেই। তার নাম উঠলেই সবাই জেনারেলের বদলে স্বৈরাচার বলে। তার কথাবার্তার সঙ্গে যে সত্যের অনেক ফারাক এটি নতুন কোনো তথ্য নয়। কয়েকদিন আগে তিনি বলেছিলেন-

১৮. 'বিএনপি আমলে গোপনে দেশের স্বার্থবিরোধী উক্তি করা হয়েছে।' জনকণ্ঠ, ৭.২.৯৭।

১৯. 'বেগম জিয়া সম্পর্কে বলেছিলেন- 'নিজের জন্মদিন সম্পর্কে যে মিথ্যাচার করে, তার সম্পর্কে কিছু ভাবতেই আমার ঘৃণা হয়।' জনকণ্ঠ, ৩০.৮.৯৭।

সেই ঘৃণা ক্রমে কিভাবে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হলো তা হয় সাবেক জেনারেল এবং সাবেক জেনারেলের স্ত্রীই বলতে পারবেন।

বেগম জিয়া সাবেক জেনারেল এরশাদ সম্পর্কে বলেছিলেন 'এরশাদ রাজনীতিতে নেমে দেশকে আজ ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছেন এখন আবার ধর্ম এবং ইসলামের কথা বলে জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছেন।' ইনকিলাব, ২৫.৩.৮৮।

এরশাদের অপসারণের পর বলেছিলেন-

২০. 'একটি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে একজন চোর, বেঈমানকে ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে।' ঐ, ১৭.২.৯১। শুধু তাই নয়-

'এরশাদকে মুক্তি দিতে হইলে জেলে আটক সব চোর, ডাকাত, মাস্তানকে মুক্তি দিতে হইবে।' ইত্তেফাক, ৩.৯.৯৩।

তাহলে বেগম জিয়া, এরশাদ নিশ্চয় চোর মাস্তান নয়। চোর বা মাস্তান বা ইসলামবিদ্বেষী হলে আপনার পাশে বসে হাসিমুখে কিভাবে ইফতার করেন? তাহলে মিছামিছি একজন 'ভদ্রলোকে'র বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছিলেন? বেগম জিয়া বলেছিলেন, 'জেলখানাই এরশাদের উপযুক্ত স্থান।' এখন বুঝেছেন তা নয়। তার পাশের স্থানটিই এরশাদের জন্য উপযুক্ত।

যারা বিএনপি, জামাত বা জাতীয় পার্টি করেন তাদের কাছে প্রশ্ন—তারা কাদের নেতৃত্বে রাজনীতি করছেন? এ ধরনের নেতা-নেত্রীর অধীনে যদি কাজ করেন যারা একবর্ণ সত্য বলেন না, কথা ও কাজে কোনো মিল নেই- তাদের সম্পর্কে দেশবাসীর কেন, পরিবারের লোকজনেরই বা ধারণা কেমন? যদি ভালো হয় এবং তারা নির্বাচিত হয় তাহলে বলতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির চরিত্র বলে কিছু নেই।

ধর্মব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের জোট বাঁধার কারণটি আশা করি এখন স্পষ্ট। তারা কোনো আদর্শে বিশ্বাসী নয়, তাদের একমাত্র রাজনীতি যেকোনো প্রকারে ক্ষমতা দখল।

এদের বিপরীতে অবস্থান করছে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসেছে এবং মানুষ আশা করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা অর্পণ করেছিল। আওয়ামী লীগ কি সে আশা পুরণ করতে পেরেছে? শতাব্দীর শেষ দিনে মনে হচ্ছে, না পারেনি, সর্বাংশে পারেনি। নতুন শতাব্দীতেও কি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ চিন্তা-ভাবনা করেছেন দেশ সম্পর্কে? তার কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। কিন্তু, যদি বলি আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে সেটিও সত্য ভাষণ হবে না, বিএনপির ভাষণ হবে হয়তো।

আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে থাকে তখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে মানুষের একটা যোগাযোগ থাকে। এর আচরণও অনেক গণতান্ত্রিক হয়। আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় তখন সব বিরোধীরা এককাট্টা হয় এবং আওয়ামী লীগ তার মিত্রদের ত্যাগ করে। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগও হ্রাস পায়। রাস্তার মানুষ কী বলে তাও এই দলের নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছায় না। ক্ষমতাচ্যুত হলে তখন আবার আওয়ামী লীগ মিত্র খোঁজা শুরু করে। বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগ নেটওয়ার্কিং করতে পেরেছিল এবং আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে সহায়তা করেছিল বিভিন্ন পেশাজীবী গ্রুপ। ক্ষমতায় গিয়ে আওয়ামী লীগ সামরিক ও বেসামরিক আমলা ছাড়া এদের সবাইকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। আওয়ামী লীগ আমলে আমলারা আরো শক্তিশালী হয়েছে এবং এতই শক্তিশালী হয়েছে যে, পার্লামেন্টারি কমিটির সিদ্ধান্তও তারা মানে না। এ বছর, এ সংক্রান্ত অনেক রিপোর্ট পত্র-পত্রিকায় আছে যার একটি খতিয়ান নিলেই তা বোঝা যাবে। সংসদীয় সিদ্ধান্ত সমূহের কয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এ বছর? আমলাতন্ত্র সংস্কারের জন্য জনকমিশন যে কুড়িটি প্রস্তাব করেছিল তার কোনোটিই কার্যকর হয়নি। আওয়ামী লীগ প্রশাসন-ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি এবং এ কারণে তাদের নীতিও প্রায় ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়নি, সে নীতি যত জনকল্যাণমূলকই হোক না কেন এবং ক্ষমতায় গিয়ে আওয়ামী লীগ

নেতৃবৃন্দ এ কথাটাই মনে করেছেন, জনগণ নয়, আমলারাই ক্ষমতার উৎস। এর সর্বশেষ উদাহরণ, মোকাম্মেল হককে পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদায় বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্তি। বিনিয়োগ বোর্ডে এখন অচলাবস্থা বিরাজ করছে।

তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য উল্লেখ করার মতো। পানিচুক্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তি, দুস্থদের ভাতা প্রদান, আশ্রায়ণ প্রকল্প, স্থানীয় সরকারে মহিলাদের ক্ষমতায়ন- অনেক কিছুই উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজনৈতিক সংঘাতের ডামাডোলে এসব সাফল্য চাপা পড়ে আছে। এগুলো যে বিরাট সাফল্য তাও সাধারণ মানুষের কাছে আওয়ামী লীগ পৌছাতে পারেনি।

বর্তমানে ধর্মব্যবসায়ীদের উত্থানের পিছনে আওয়ামী লীগের নীতির অস্পষ্টতাও অনেকাংশে দায়ী। পার্লামেন্টারি রাজনীতির মূল হয়ে দাঁড়ায় পার্লামেন্টে সদস্য সংখ্যা। এ সংখ্যা বৃদ্ধিতে আওয়ামী লীগ বেশ ক'জন স্বাধীনতাবিরোধীকে নির্বাচনে নমিনেশন দিয়েছিল যা না দিলেও চলতো। সিভিল সমাজের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিষয়টি ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। জাতীয় পার্টি এবং জামাতের প্রতিও আওয়ামী লীগ যথেষ্ট নমনীয়তা প্রদর্শন করেছিল যার ফল শুভ হয়নি। এদের কার্যকলাপ আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ভাবে প্রতিহত করেনি। ফলে এরা দিন দিন সাহসী হয়ে উঠেছে এবং চরম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ পুরোনো মিত্রদের অবহেলা করেছে এবং এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল যা তার পুরোনো মিত্রদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের পার্থক্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

রাজনৈতিক এই সংঘাতে প্রধান সব কয়টি দলের সশস্ত্র ক্যাডাররা ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী বার বার ঘোষণা করেছেন, সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই। তা সত্ত্বেও পত্র-পত্রিকায় সব সময় বিভিন্ন দলের ক্যাডারদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের খবর ছাপা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হয় সশস্ত্র ক্যাডারদের ওপর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই অথবা তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্যাডারের পৃষ্ঠপোষক। এ পরিপ্রেক্ষিতে, সাম্প্রতিক দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। নগর ভবনে ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণ ও কাদের সিদ্দিকীর কনভেনশনে হামলা। এর কোনোটিই সরকারি দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেনি।

এরই মধ্যে সমঝোতার কথা যে উচ্চারিত হয়নি তা নয়। প্রধানমন্ত্রী বার বার আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি নেত্রীর সঙ্গে। বিএনপি নেত্রী বার বার তাতে শর্ত আরোপ করেছেন। সর্বশেষ ঘটনা হলো, প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন করেছিলেন তাকে আলোচনায় বসার জন্য। বিএনপি নেত্রী ফোনের সে আহ্বানে সাড়া দেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সমঝোতায় আর যে কেউ হোক, বিরোধীদলীয় নেত্রী বসতে রাজি নন।

খুব সম্ভব এ পরিপ্রেক্ষিতেই চারদলীয় জোট বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছে যাতে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শহরে জামাতে ইসলামী এবং সিলেটে চারদলীয় জোটের লাঠিয়ালরা সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য রাস্তায় নেমেছে। সিলেটে শা. বি.

হলের নামকরণের ঘটনা নিয়ে বিরোধিতার সঙ্গে শোনা গেছে আওয়ামী লীগের একাংশও জড়িত। প্রথম দিকে ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতি নমনীয়তা এর কারণ এবং এরা মনে করছে এখনই চূড়ান্ত লড়াইয়ের সময় এসে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে গোলাম আযম চারদলের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়েছে '৪৭-এর চেতনায় অর্থাৎ পাকিস্তানে ফিরে গেলে দেশে শান্তি ফিরে আসতে পারে। এ উক্তি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের জন্য অন্তিম চ্যালেঞ্জস্বরূপ এবং এ কারণেই বোধহয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দলগুলোও এক পক্ষ আসার চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের লাভের চেয়ে ক্ষতির কারণই বেশি হয়ে দাঁড়াবে।

নতুন শতাব্দীর প্রথম বছরে, এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে দেশে রাজনৈতিক শান্তির আশা কম। বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্র আরো সংঘাতময় এবং আরো রক্তাক্ত হয়ে উঠতে পারে। বিএনপি জামাতের সঙ্গে জোটবদ্ধ থাকলে, সমঝোতার আশা করা দুরূহ। শুধু তাই নয়, বিএনপি যদি আশা করে থাকে সংঘাতের মাধ্যমেই সরকার উৎখাত করতে হবে তাহলেও সমঝোতার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ওপরই একমাত্র শান্তির বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। না হলে, দেশের মানুষকে যেকোনো একটি পক্ষ বেছে নিতে হবে এবং তাদেরই বিচার করতে হবে কোন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীকে তারা বিশ্বাস করবেন। শুধু তাই নয়, তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা কি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চান, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চান, না তালেবানী বাংলাদেশ চান? তবে, এ কথা বলে রাখা ভালো, সংঘাতে লিপ্ত হয়ে বর্তমান সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব নয়। তাহলে অনেক আগেই বিএনপি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যেতো।

আমাদের ভয় অন্যখানে। সিভিল সমাজের প্রতিনিধি হচ্ছেন রাজনীতিবিদরা। নতুন শতাব্দীতে সারা বিশ্বে প্রধান-এজেন্ডা হয়ে দাঁড়াবে অর্থনৈতিক বিকাশ, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ। বর্তমান প্রজন্ম তাতেই আগ্রহী। কিন্তু, এই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক এজেন্ডা প্রাধান্য পাবে না এবং তা যদি না পায়, তাহলে ক্রমেই রাজনৈতিক নেতারা সমাজের ভার হয়ে উঠবেন, হয়ে উঠবে অপাঙক্তেয়। একই সঙ্গে দেশের অস্তিত্ব হয়ে উঠবে বিপন্ন। আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মনে রাখা উচিত, বাংলাদেশ হয়েছিল বলেই তারা একটি দেশের নেতা-নেত্রী হয়ে উঠেছেন, দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বাংলাদেশের অস্তিত্বই যদি সংকটময় হয়ে ওঠে তাহলে তাদের অবস্থা কী হবে?

৩১.১২.১৯৯৯

জাগো ওঠো দাঁড়াও বাংলাদেশ

শিরোনামটি একটি স্লোগান, ছাত্র ইউনিয়ন প্রদত্ত। একুশে মেলায় বিচারপতি হাবিবুর রহমানেরও এই নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এ মুহূর্তে এই শিরোনামটিই আমার কাছে যথার্থ মনে হয়েছে। আমরা যেহেতু ঋণখেলাপি জাতি, সে জন্যই ওপরের দেওয়া শিরোনামটি আত্মসাৎ করতে দ্বিধা বোধ করিনি।

সিলেটের শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গত কয়েকমাস কি ঘটেছে তা আমাদের অজানা নয়। যা ছিল নিছক রুটিন ব্যাপার তা নিয়ে দলীয় পর্যায়ে শুধু বিতর্ক নয় তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে। সরকার ও বিরোধী দলও নিজ নিজ স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এই 'কাণ্ডে' জড়িয়ে পড়েছে। ফলে এই 'মহাকাণ্ডে' বলি হয়েছে নিরীহ শিক্ষক ছাত্র এবং অভিভাবকরা। অবশ্য তাতে সরকার ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের তেমন কিছু আসে যায় না। তারা এক ধরনের ক্ষমতা ভোগ করেন মানুষকে ব্যবহার করে এবং চিরদিনই ক্ষমতাবান থেকে যান। একটি হিসাব নিয়ে দেখুন 'আন্দোলন'-এর কুশীলবদের ক'জনের সন্তান দেশে পড়াশোনা করেন বা আদৌ পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত কিনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের নামকরণের যারা বিরোধিতা করছেন তাদের উদ্দেশ্য বা আদর্শ স্পষ্ট হয়েছে। সমীকরণটি এরকম। যাদের নাম সিন্ডিকেট বাছাই করেছে হলের নামকরণের জন্য তারা অগ্রগণ্য বাঙালি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অবদান রেখেছেন, সমাজকে প্রগতির পথে নিয়ে গেছেন, বাঙালির সুনাম রক্ষা করেছেন। 'বাঙালি' শব্দটিতে নামকরণবিরোধীদের যথেষ্ট আপত্তি আছে। এবং যেহেতু বাঙালিত্বে আওয়ামী লীগ এখনো বিশ্বাসী সুতরাং নামকরণ একটি 'আওয়ামী কাণ্ড'। বিরোধিতা এ কারণে। শুধু তাই নয় সরকারবিরোধী আন্দোলনের জন্য 'ইস্যু' দরকার। অতএব একটি 'ইস্যু' সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আন্দোলনের পিছে তাই সাম্প্রদায়িকতা, বাঙালিত্বের বিরোধিতা করার বিষয়টি স্পষ্ট।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আঞ্চলিকতা। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়টি সিলেটে সুতরাং সিলেটে জন্মগ্রহণকারীদের এ বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সম্প্রতি বিএনপিতে যোগদানকারী আমলা ইনাম আহমদ চৌধুরী তার একটি লেখায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট করেছেন। ৫০ বছরের ইতিহাস টেনে দেখিয়েছেন কারা সিলেটে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এবং তাদের নামও কেন বাদ পড়লো? একটি হিসাব দিয়ে দেখিয়েছেন বর্তমানে শা. বি, তে সিলেটের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, 'সিলেটি' শিক্ষকের সংখ্যাও কম। তার মতে, "এসব সমস্যার বিচার-বিবেচনা এবং বিফল ও বিতর্কিত উপাচার্যের অপসারণ-এই দাবিগুলোর সঙ্গে মৌলবাদতো দূরের কথা, কোনো

ধর্মানুভূতিরই সম্পর্ক নেই।" এইসব ধোঁয়াটে বাতাবরণ সৃষ্টি করে কি আসল উদ্দেশ্য চাপা দেওয়া যায়?

তবুও এই সমস্যার সৃষ্টি হতো না যদি না আওয়ামী লীগের মধ্যে আঞ্চলিক কর্তৃত্ব নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকতো। একজনকে একটি সংস্থায় নির্বাচিত হতে হবে সে জন্য জামায়াতকে সমর্থন করতে হবে যাতে সৌদি আরব সন্তুষ্ট থাকে, এটি আর যাই হোক আদর্শের কোনো কথা নয়। আওয়ামী লীগের অনেক এমপি ভোটের কথা তুলেছেন। তাদের কথা শুনে মনে হয়, তারা আন্দোলনের বিরোধিতা না করলে জামায়াত ও বিএনপির ভোটগুলো তাদের বাক্সে পড়বে। এই হচ্ছে, আমাদের জনপ্রতিনিধিদের রাজনীতি সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা।

বিরোধীরা হজরত শাহজালালের শিষ্যদের নামে হলের নামকরণের দাবি তুলেছেন। সিলেটের কয়টি মসজিদ মাদ্রাসার নাম হজরতের শিষ্যদের নামে রাখা হয়েছে। হয়নি। হলে, তবুও দাবির যৌক্তিকতা থাকতো। ফজলুল কাদের চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উদ্যোক্তা। তাহলে কি তাঁর নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের নামকরণ করতে হবে? তাহলে বাংলাদেশের আর থাকে কি? সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়-এ সিলেটি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সংখ্যা বেশি হতে হবে এটি কোন ধরনের কু-যুক্তি। আমলা শাসন কি কারণে দেশের জন্য ক্ষতিকারক এ দৃষ্টিভঙ্গি তার উদাহরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ তাদের কাছে পরিষ্কার নয়, দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত থাকলেতো নয়-ই।

নামকরণবিরোধীরা আন্দোলন করে যেতে পারে, সে অধিকার তাদের আছে। কিন্তু ভায়োলেন্স করার অধিকার তাদের নেই। সরকার যদি তাদের দাবি মেনেও নেয় তাহলে আমরা চুপ করে থাকবো এটি ভাবারও কোনো কারণ নেই। আগামী নির্বাচনে যদি সিলেটের আওয়ামী এমপিদের বিএনপি-জামায়াতের ভোটের প্রয়োজন হয়, তাহলে জাতীয়ভাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের সমর্থনও লাগবে। আমাদের শক্তিকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। অস্ত্রশস্ত্র আমাদের না থাকতে পারে বটে কিন্তু আমরা সুবিধাবাদী রাজনীতি করিনি। হুমায়ূন আহমেদ নিশ্চয় পকেটে রিভলবার নিয়ে ঘুরে বেড়ান না। কিন্তু তাঁর একটি উদ্যোগও সমর্থিত হয়েছে। এ বিষয়টিও জামায়াত বিএনপির সমর্থকরা ভেবে দেখবেন।

এ দেশে জামায়াত যে কখনই ক্ষমতায় যেতে পারেনি, এমনকি ১৯৭১ সালেও, তাই প্রমাণ করে আমাদের জোরটা কোথায়? সিলেটের আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপিদের অনীহাও যে আমাদের উৎসাহ হ্রাস করতে পারেনি তাও প্রমাণ করে আমাদের জোরটা কোথায়। সক্রিয় রাজনীতি করেন ক'জন? সংখ্যাগরিষ্ঠ সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। তারা সবার বক্তব্যই পরীক্ষা করেন, আমাদেরটিও করছেন। সবচেয়ে বড় কথা আঞ্চলিকতা দিয়ে বেশিদূর এগোনো যায় না। সিলেটের মানুষজন কি বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বাস করেন না? সিলেট কি বাংলাদেশের বাইরে?

সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলে আন্দোলনকারীদের ক্ষতি নয়, সাধারণ

সিলেটবাসীরও ক্ষতি। ছাত্র অভিভাবকদের ক্ষতি। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শুধু ছাত্র-শিক্ষকরাই নয় অনেক মানুষও জড়িত, যার সঙ্গে যোগ আছে অর্থনীতির। এ বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্তরা বিবেচনা করে দেখবেন।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। যুগোস্লাভিয়ার একজন লেখক বিদেশে গিয়ে দেখেন কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না যদিও তিনি স্লাভদের গণহত্যার নীতির বিরোধী। তিনি হয়ে গেলেন দেশের বাইরে 'অস্পৃশ্য'। যারা কোনো 'পক্ষ' এ জড়িত নন তারাও বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

উপ¯রর শিরোনামটি উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এটি ব্যবহার করেছি আমরা যারা নামকরণের পক্ষে তাদের উদ্দেশ্যেই। বিরোধী দল কি করলো, সরকার কি করলো তা আমাদের বিবেচ্য হতে পারে না, আমাদের বিবেচ্য নামকরণ যুক্তিযুক্ত কিনা। বাংলাদেশ আদর্শের তা বিরোধী কিনা, যদি তা যুক্তিযুক্ত হয় এবং বাংলাদেশ আদর্শবিরোধী না হয় তাহলে আমাদের পিছু হটার উপায় নেই। আমাদের স্লোগান হবে জাগো ওঠো দাড়াও বাংলাদেশ।

১৬.০৩.২০০০

জেনারেল, আলবদর ও ধর্ম

পত্রিকায় উত্তেজক খবরের অভাবে বোধহয় প্রাক্তন জেনারেল ও স্বৈরশাসক হু. মু এরশাদের খবর গত দু'দিন ধরে পত্রিকায় আসছে। শুক্রবার জনকণ্ঠ-এ প্রাক্তন এই জেনারেল, প্রাক্তন আলবদর প্রধান নিজামী ও প্রাক্তন ভিসি এমাজউদ্দিনের রঙ্গিন ছবিসহ সংবাদ প্রকাশ করেছে। প্রাক্তন জেনারেল ফরমায়েছেন—"যদি দু'টি দল (অর্থাৎ বিএনপি ও জামায়াত) জাতীয় পার্টিকে টার্গেট না করে "ইসলামের শত্রু" আওয়ামী লীগকে টার্গেট করত তাহলে দেশের এ অবস্থা হতো না।"

তা দেশের অবস্থা কী ছিল এরশাদ আমলে? ১৯৯০ তাঁর স্বৈরশাসন উৎখাতের পর, তাঁর বর্তমান পরম মিত্র বেগম জিয়ার সরকার "এইচ. এ. এরশাদ সরকারের আমলে সংঘটিত আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম, দুর্নীতি, অপচয় ও ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কিত" ৫৩২ পৃষ্ঠার শ্বেতপত্র (তাও খসড়া) প্রকাশ করে। কেন করেছিল? "তাঁর শাসনামলে দেশে দুর্নীতি ও অরাজকতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। সাবেক রাষ্ট্রপতি, তাঁর স্ত্রী বেগম রওশন এরশাদ, তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদ সদস্যগণ থেকে আরম্ভ করে অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীও দুর্নীতি, অনিয়ম, অপচয় ও ক্ষমতার অপব্যবহারে জড়িয়ে পড়ে।"

এই ছিল সেই জেনারেলের আমল। এখন কি অবস্থা তার থেকে খারাপ? তাঁর আমলে দেশের অবস্থা যা হয়েছিল এর চেয়ে খারাপ আর দেশের অবস্থা কখনো হবে না। সুতরাং, এসব বিষয়ে এই বৃদ্ধ প্রাক্তন জেনারেল কোনো বক্তব্য দিলে ৫৩২ পৃষ্ঠার শ্বেতপত্রের কথা মনে রাখবেন এবং এও মনে রাখবেন, তিনি যদি আবারও কখনো ক্ষমতায় আসেন তাহলে দেড় হাজার পাতার শ্বেতপত্র হয়ত প্রকাশ করতে হতে পারে।

এরশাদ এখন আবারও ধর্ম নিয়ে কথা বলছেন। তিনি নারীদের যেভাবে ব্যবহার করেছেন ধর্মকেও সেভাবে ব্যবহার করেছেন। ঐ সময়ের বিভিন্ন দেশী বিদেশী পত্রপত্রিকার রিপোর্ট এর প্রমাণ। সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংযোজনের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, "এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার মধ্যে একটি দেয়াল তৈরির উদ্দেশে তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি আলাদা দেশ হিসেবে পরিচিত হয়। এছাড়া এ দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশ মুসলমান হওয়ার কারণেও তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেন।"

এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে দেয়াল তুলে তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে মিল ঘটাতে। এ কারণেই হয়ত পাকি সরকার তাঁকে 'নিশান ই হায়দার' উপাধি দিয়েছিল। জেনারেল তাঁর বক্তব্যের দ্বিতীয় বাক্যটির মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার

করেছেন। অথচ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করে রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র পাল্টানো হয়েছে যা দেশদ্রোহিতামূলক অপরাধ এবং যার বিচার এখনো হয়নি [হাইকোর্টে এ বিষয়ক মামলার নিষ্পত্তি হয়নি এখনও]। এরশাদ আটরশির পীরকে 'জাতীয় পীর' করে তুলেছিলেন এবং ঘন ঘন সেখানে যেতেন এ কথা প্রমাণের জন্য যে, তিনি ধর্মভীরু এক মুসলমান। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর সেখানে আর কখনো পা দেননি কেন? মানুষ ও ধর্মের প্রতি এই তাঁর বিশ্বাস? একটা সময় প্রায় তিনি স্বপ্ন দেখতেন বিভিন্ন মসজিদে নামাজ পড়ার এবং সেখানে হাজির হয়ে তা বলতেন। কোনো রাষ্ট্রপ্রধান হঠাৎ ইচ্ছা করলেই কি কোথাও যেতে পারেন? এক সপ্তাহ আগে থেকেই নিরাপত্তা জনিত ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তিনি আরো ধারণা দিয়েছিলেন, বড় পীরের মাজার জিয়ারত করে ফেরার পর তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেন। ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে জনকণ্ঠ এরশাদের 'দ্বিতীয় স্ত্রী' মেরির সাক্ষাতকারের একটি অনুবাদ প্রকাশ করে, সেখানে মেরি বলেছিলেন–"এরশাদের আপন ভাই আমাকে বলেছিল ময়মনসিংহের কোনো এক গ্রামের এক গরিব লোকের কাছ থেকে ৩ লাখ টাকার বিনিময়ে ঐ শিশুটিকে কেনা হয়েছিল।" এরশাদের প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান লিখেছিলেন, বেগম এরশাদকে তিনি কখনো অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দেখেননি।

বাংলাদেশে ধর্ম নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছেন ও ব্যবসা করেছেন এরশাদ তাঁদের অন্যতম। আলবদর নিজামী "ক্ষমতাসীন দলকে 'অপশক্তি' বলে অভিহিত করেন এবং অপশক্তির হাত থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানান।" ইসলামের নাম করে মানুষ হত্যায় বিশেষ করে মুসলমান হত্যায় বিশ্বাসী নিজামী ১৯৭১ সালে তৈরি করে আলবদর বাহিনী। বর্তমানে বিএনপি মিত্র নিজামী ১৯৯৪ ঘোষণা করেছিল–"বিএনপি সরকার ও ছাত্রদল কসাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে" (সংগ্রাম, ২৪.২.৯৪) এবং আরও দুই বছর পর ঘোষণা করে "৫ বছরের (বিএনপির) দুঃশাসনে জনগণের মধ্যে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বিএনপি কোনো বিশ্বস্ত রাজনৈতিক শক্তি নয়" [সংগ্রাম, ২০.৩.৯৬]। তাহলে জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে কোন ভিত্তিতে ঐক্য হচ্ছে? বিএনপির কর্মীদের জিজ্ঞাস্য, যারা লাথি দেয় তাদের পা ধরে রাখতে যদি ভালো লাগে তাহলে ছোট দল জামায়াতকে না ধরে বড় দল আওয়ামী লীগকে ধরলেই হয়। আফটার অল জেনারেল জিয়া তো বঙ্গবন্ধু সরকারের অধীনে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন। এই নিজামীদের বিরুদ্ধেই।

প্রাক্তন জেনারেল ও আলবদর প্রধান যে ইসলাম আনতে চাচ্ছেন সে ইসলাম এলে–দুর্নীতি হবে নীতি, নারী ও ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে এবং যারা এর বিরোধিতা কররে তাদের রগকাটা শুরু হবে। তাছাড়া এ দু'জনের যে উদ্ধৃতি দিলাম তারপরও কি অভিধানে 'মিথ্যাবাদী', 'ভণ্ড' 'মোনাফেক', 'নির্লজ্জ', 'সুবিধাবাদী' শব্দগুলোর অর্থ খোঁজার দরকার আছে? "ইসলামের শত্রু আওয়ামী লীগ?" মানুষজন বরং আওয়ামী লীগের অতি ধর্মপ্রীতিতে শঙ্কিত। আওয়ামী লীগ থেকে না দলটি আওয়ামী মুসলিম লীগে পরিণত হয়।

১.৭.২০০০

তারা সোচ্চার আমরা নিশ্চুপ

তারা এখন সোচ্চার। আমরা নিশ্চুপ। একটা সময় ছিল যখন আমরা ছিলাম সোচ্চার তারা নিশ্চুপ। আর তার ফলে বলি হচ্ছে মূল বিষয়। এটিই বোধহয় রাজনীতি, আর এক কারণেই বোধহয় : একটা সময় মানুষ রাজনীতিকে ঘৃণা করতে থাকে। অথচ রাজনীতি থেকে মুক্তি পাবারও উপায় নেই, তা আমাদের জড়িয়ে থাকে জীবনের সব পর্যায়ে।

বিষয়টি হচ্ছে, হামুদুর রহমান কমিশন। এ কমিশনে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী করা হয়েছে কিছু পাক সামরিক কর্তাকে। পাকিস্তানীরা এখন তাদের বিচার চাচ্ছে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য। আমরা আবার সেসব কর্মকর্তাকে দায়ি করছি যুদ্ধাপরাধী হিসাবে এবং তাদের বিচার চাইছি তিন দশক ধরে। সুতরাং এখন এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদের যে কোনো রকম বিচার হলে আমরা অন্তত সান্ত্বনা পাব। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আমাদের অনেকে, বিশেষ করে সরকার নিশ্চুপ।

১৯৭২ সালে হামুদুর রহমান কমিশন করেছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজের চামড়া বাঁচাতে। বছর দু'য়েক আগে, পাকিস্তান সফরের সময় অনেকে আমাকে বলেছিলেন যে, ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদারবাহিনীর আত্মসমর্পণের দৃশ্যটি পাকিস্তানী টেলিভিশনে একবার দেখানো হয়। এতে দর্শকরা যাতনায় উন্মদপ্রায় হয়ে ওঠে। তার পর থেকে এ পর্যন্ত নাকি টেলিভিশনে সে দৃশ্য আর কখনও দেখানো হয়নি। তখন এই রকম যখন সেন্টিমেন্ট তখন এ ধরনের কমিশন করা ভুট্টোর জন্য ছিল লাভজনক। কমিশন হলো, রিপোর্ট জমা দেয়া হলো, কিন্তু তা আর প্রকাশ করা হলো না। যদিও কমিশনের অনেক সিদ্ধান্ত মুখে মুখে ফিরছিল।

ভুট্টোর পক্ষে এ রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না, যদিও কমিশন ভুট্টো ও তাঁর পক্ষাবলম্বী সামরিক কর্মকর্তাদের ছাড় দিয়েছিল। কারণ পাকিস্তান চালায় আইএসআই। তারা নিজেদের স্বার্থেই রিপোর্ট প্রকাশিত হতে দিতে পারে না। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে পাকিস্তানীদের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে, এ রিপোর্ট প্রকাশ করার। ১৯৭১ সালের ঢাকার শেষ পাকিস্তানী কমিশনার আলমদার রাজাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন– "হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হলে অনেক কিছু জানা যেত। ঐ রিপোর্টে আবার এও বলা হয়েছিল, এর কিছু অংশ প্রকাশ করা যাবে না। এতই সংবেদনশীল ছিল তা।"

"শুনেছি রিপোর্টটি প্রকাশের জন্য হাইকোর্টে আপনি রিট করেছিলেন?"

"করেছিলাম, তবে শুধু রিপোর্ট প্রকাশের জন্যই নয়। আমি আরও দাবি জানিয়েছিলাম, যারা এসব অত্যাচার, ধর্ষণ, নারকীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তাদের

বিচার হতে হবে। বাংলাদেশের কাছে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী তাদের বিচার হতে হবে। বাংলাদেশের কাছেই এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী ২০০ লোকের তালিকা আছে। যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের যদি অপরাধের দায় থেকে মুক্তি দেয়া হয় তাহলে তাদেরও অপরাধী ঘোষণা করতে হবে।"

শোষকদের চাপে বিচারক এ রিট নিষ্পত্তি করতে পারেননি। একই প্রশ্ন করেছিলাম করাচীতে বেনজীর ভুট্টোকে। রিপোর্ট প্রকাশ না করার কারণ হিসাবে তিনি বললেন, 'কেউ তেমন দাবি জানায়নি।'

"হৈ চৈ হলে কি প্রকাশ করতেন?"

"ক্ষমতায় যাওয়ার পর কমিশনের রিপোর্টের কোনো কপি পাইনি। আমার বাবা রিপোর্টটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জেনারেলরা আপত্তি করেন।" তিনি আরও বলেছিলেন, "প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে জনগণের একটি বোঝাপড়া হওয়া দরকার। রিপোর্টটি প্রকাশ না করা ঐতিহাসিকদের জন্য এক ধরনের বিপর্যয়।"

এখন যে রিপোর্ট নিয়ে হৈ চৈ চলছে তা মূল রিপোর্ট নয়। সম্পূরক রিপোর্ট। পাকিস্তানে এই রিপোর্ট নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। বাংলাদেশের প্রতিটি পত্রিকা রিপোর্টের অনুবাদ ছাপছে। পাকিস্তানের এলিট মহলে যে বিষয়টি অজানা ছিল তা নয়, কিন্তু এখন দলিলাকারে তা প্রকাশিত হয়েছে। একজন পাকিস্তানী গবেষক আমাকে বলেছিলেন, "পাকিস্তানের লোকরা তখন বিবিসির খবর শুনলেও বলত যে মিথ্যা। পিপল হ্যাড টোটালি ক্লোজড মাইন্ড।" বাঙালি বিদ্বেষী, ভুট্টোর ঘনিষ্ঠজন রফি রাজা আমাকে বলেছিলেন ১৯৭১ সম্পর্কে– "উই ডিড নট ওয়ান্ট টু নো, অর উই ডু নট নো– যেভাবেই নিন। পিপলস পার্টির লোকরা ভেবেছিল, আর্মি এ্যাকশনের পর সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বেঙ্গলিজ কুড বি সর্টেড আউট। কিন্তু হয়নি এবং এ ঘটনায় নো বডি ইন দ্যা আর্মি রিগ্রেটেড। উই হ্যাড এ ভেরি ব্রুটালাইজড সোসাইটি আফটার দ্যাট।"

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি ১৯৭২ সাল থেকেই করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুয়ালালামপুরে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। হয়নি। কিন্তু কেন হয়নি তা কেউ ব্যাখ্যা করেননি। হয়ত বলার প্রয়োজন মনে করেনি কেউ। ক্ষমতায় থাকলে মানুষ তো আর মানুষ হিসাবে বিবেচ্য হয় না, বিবেচ্য হয় ভোটার হিসাবে।

নির্মূল কমিটির আন্দোলনের পর আবার জোরদার হয়ে উঠেছে যুদ্ধপরাধীদের বিচারের দাবি। এ দাবিতে এখন অধিকাংশ মানুষ সোচ্চার। তখন শেখ হাসিনাসহ অনেকেই বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর অনেকের মনে হয়েছে, কই এ রকম কথা বলেছিলাম নাকি! আবার যখনই গাড্ডায় পড়ে সরকার তখনই হঠাৎ জামায়াতবিরোধী হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশ ও চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ নেতারা খুন হওয়ার পর কয়েকদিন আগে আবার আওয়ামী লীগের সমস্ত অঙ্গ ও উপ-অঙ্গসংগঠন, নেতানেত্রীরা রাজপথ প্রকম্পিত করে তুললেন জামায়াতবিরোধী সমাবেশে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতেও সোচ্চার হয়ে উঠলেন। পাকিস্তানীরা ছিল

নিশ্চুপ। আজ পাকিস্তানে মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠছে তাহলে। হে ছাত্র, যুব, প্রৌঢ় লীগ নেতৃবৃন্দ– আপনারা কেন নিশ্চুপ? গাড্ডা কি পেরিয়ে গেছেন? আগামী এক বছর কি গাড্ডায় পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই?

মুক্তিযুদ্ধের পার্টি আওয়ামী লীগ এখন নিশ্চুপ। কারণ আছে বোধহয় একটি। পত্রিকায় দেখেছি, পররাষ্ট্র সচিব হন্তদন্ত হয়ে খালি পাকি সামরিক প্রশাসকের কাছে ছোটাছুটি করছেন দু'পক্ষের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য। হয়ত সরকার পাকি সামরিক সরকারকে দোস্ত করে এখানকার পাকি প্রেমিদের গাড্ডায় ফেলতে চায়। জানি না! যদি তাই হয়, তাহলে বলতে হবে, যেভাবে জীবন চালাতে চাই সেভাবে কি আর চলে? আজ ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে পাকিস্তানীদের সিভিল সমাজ যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠছে সেভাবে আমাদের সরকার না হোক, সরকারি দল তো সোচ্চার হয়ে উঠতে পারত। চারদলীয় জোট তো আর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাইবে না। দু'দেশে সিভিল সমাজ সোচ্চার হয়ে হয়তরা এক ধরনের বিচার হতো।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কোনো দেশের একার পক্ষে করা সম্ভব হবে না বিদ্যমান অবস্থায় এবং কোনো সরকার তাতে উৎসাহীও হবে না। কিন্তু একটি উপায় আছে, দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি দেশের সিভিল সমাজের সোচ্চার হয়ে ওঠা। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের এখানে যুদ্ধাপরাধীদের যে (শাহরিয়ার কবিরের গ্রন্থ, নির্মূল কমিটির রিপোর্ট ইত্যাদি) তালিকা, বিভিন্ন অপরাধ সম্পর্কে যে বিবরণ আছে তা পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের কাছে পাঠান। প্রবাসে যাঁরা আছেন তাঁরা আন্তর্জাতিক ফোরাম ও পাকিস্তানে মানবাধিকার কমিশনের কাছে তথ্য পাঠান, তথ্য বিনিময় করুন, বিচারের দাবি তুলুন। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশে যাঁরা যুদ্ধাপরাধের বিচার চান তাঁরা অভিন্ন একটি প্ল্যাটফরম গড়ে তুলুন। একমাত্র দক্ষিণ এশিয়ার সিভিল সমাজ চাইলে ও আন্তর্জাতিক ফোরামগুলো সরকারদ্বয়কে চাপ দিলে যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্ভব। সিয়াটলে কি শুধু তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে রাস্তায় লোক জড়ো করে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন বানচাল করে দেয়া হয়নি?

সব কথার শেষ কথা, হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে পাকিস্তানের মানুষ সোচ্চার হচ্ছে। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল, সে দলের সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চুপ, তা অতীব দুঃখজনক। এ নীরবতা আওয়ামী লীগ ভোট বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে না।

২৭.৮.২০০০

হামুদুর রহমান রিপোর্ট প্রকাশ– আমাদের কী?

হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের সম্পূরক অংশ প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের দেশে হৈ চৈ কম হচ্ছে না. পাকিস্তানে নাকি হচ্ছে। আমাদের দেশের এমন কোনো পত্রিকা নেই যারা এই রিপোর্ট ছাপেনি। হ্যাঁ, এতদিন এ রিপোর্টের কথা শুনেছি। প্রকাশিত হলো তার কিছু অংশ ত্রিশ বছর পর, কৌতূহল তো খানিকটা থাকবেই। পাকিস্তানিরা যদি সোচ্চার হয় এ রিপোর্ট পড়ে তবে আমাদের নীরব পত্রিকাগুলো যে কারণে সোচ্চার হচ্ছে বা বুদ্ধিজীবীরা, আমি তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে একমত নই।

বিভিন্ন পত্রিকা পড়ে মনে হয়েছে, আমরা এ রিপোর্ট প্রকাশে উল্লসিত। কারণ, এ রিপোর্টে কিছু পাকিস্তানি জেনারেলের কিছু অপকীর্তির, কিছু হত্যার, কিছু ধর্ষণের কথা আছে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়াতে আমাদের উল্লাসের কিছু নেই। এটি পাকিরা ছাড়া সারা বিশ্বের মানুষ জানে ১৯৭১ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্যতম গণহত্যা হয়েছিল বাংলাদেশে। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট একটি পক্ষপাতমূলক রিপোর্ট, যেখানে কিছু সত্য, কিছু অর্ধসত্য দিয়ে আসল ঘটনা আড়াল করা হয়েছে।

প্রথমেই দেখা যাক, কমিশনটি কেন হয়েছিল? পাকিস্তান কেন পরাজিত হয়েছিল তার কারণ নিরূপণের জন্য। পাকিরা কেন পরাজিত হয়েছিল তা আমাদের নতুন করে জানার কী আছে? আমরা জানি, পাকিস্তান কেন পরাজিত হয়েছিল। কমিশনটি কে করেছিলেন? প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো যিনি পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী কয়েকজনের একজন, অন্যতম একজন। কেন করেছিলেন, সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন। তিনি জানতেন সামরিক বাহিনী শক্তিশালী হলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হবেন। সুতরাং এটিই প্রমাণিত হোক যে, সামরিক বাহিনীই দায়ী পাকিস্তানের জন্য– এবং এর ফলে কিছু জেনারেলকে যদি বেকায়দায় ফেলা যায়, তাতেই তাঁর লাভ। কমিশন প্রধান করা হয়েছিল কাকে? হামুদুর রহমানকে– যিনি সব সরকারের ছিলেন বশংবদ এবং স্বাধীনচেতা হিসেবে যার কোনো খ্যাতি ছিল না। এসব কিছুর ফলাফল হচ্ছে হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট। ভুট্টো এটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। রিপোর্টের সিদ্ধান্ত ছিল, পাকিস্ত।নের পরাজয়ের জন্য পূর্বাঞ্চলের কমান্ড দায়ী। এ পরিপ্রেক্ষিতে সদর দফতরকেও খানিকটা দায়দায়িত্ব নিতে হবে। ফলে এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব কম।

রিপোর্টের গঠনটা কেমন? পাকিস্তানের পরাজয়ের কারণ কী? সেনাবাহিনীর অদক্ষতা। কারা দায়ী? কিছু জেনারেল যার মধ্যে প্রধান নিয়াজী। আর আছে উমর,

জামশেদ প্রমুখ, ইয়াহিয়া তো বটেই। কিন্তু ভুট্টো নয় কারণ সে ধোয়া তুলসীপাতা। জেনারেলদের কী হয়েছিল? নৈতিক স্খলন ঘটেছিল। যেমন নিয়াজী পান স্মাগল করেছিল, আরেকজন টাকা মেরেছিল। হত্যা? কেউ কেউ হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ এত হত্যা না হলে 'সাইলেন্ট মেজরিটি' পাকিদের পক্ষেই থাকত। এই হচ্ছে পাকিদের রিপোর্টের নির্যাস। কিন্তু, রিপোর্টের তো বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হবে। তাই কিছু কিছু হত্যা, ধর্ষণের সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং এখানেই সবচেয়ে বড় ভণ্ডামিটা করা হয়েছে। সত্য ঘটনাগুলো চাপা দেয়া হয়েছে। কয়েকটি উদারহণ দিই–

১. পঞ্চম অংশ। দ্বিতীয় অধ্যায়। কাউন্টার ইনসারজেন্সি দমনে পাকিস্তান বাহিনীর পদ্ধতি নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সে বিষয় আলোচনা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের শিরোনাম- "Alleged atrocities by the Pakistani Army." পাকিস্তান বাহিনীর বর্বরতা হচ্ছে 'তথাকথিত'। কাউন্টার ইনসারজেন্সি অর্থাৎ বিদ্রোহ দমনের সময়।

বিষয়টি কমিশনের মতে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার হওয়া উচিত। সঠিক পরিপ্রেক্ষিতটা কী?–

"Misdeeds of the Awami League Militants." অর্থাৎ আওয়ামী লীগাররা ২৬ মার্চের আগে অনেক অবাঙালিকে হত্যা করে ফলে সেনাবাহিনীতো একটু আবেগ প্রবণ হয়ে উঠতে পারে এবং সে কারণে দু'একটা খুনখারাবি হতে পারে। এটাকে বড় করে দেখতে নেই।

২. ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবীদের 'তথাকথিত হত্যা'। এটি হচ্ছে ২৪ নং পরিচ্ছেদের শিরোনাম। আবার লক্ষ্য করুন তথাকথিত শব্দটি। কমিশনের মতে, ব্যাপারটি সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। বাংলাদেশ যদি কিছু "Convincing evidence" দেখাতে পারে তবে ব্যাপারটার সুরাহা হতে পারে।

৩. ৩১ নং পরিচ্ছেদের নাম 'Magnitude of Atrocities.' 'স্পনসরড' মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের শান্তিপূর্ণ গ্রামগুলোতে হত্যা ও ধর্ষণে মেতে উঠেছিল ত্রাস সঞ্চারের জন্য যাতে সবাই তাদের পক্ষে থাকে।

বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের মতে, ত্রিশ লাখ মানুষ নিহত ও দুই লাখ মহিলা ধর্ষিত হয়েছিল। কমিশনের মতে, এটি অতিরঞ্জন। পাকিরা তো মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল। সুতরাং সদর দফতর যে হিসাব দিয়েছে তাই সত্য। সে সংখ্যাটি কী? মাত্র ২৬ হাজার। সেই বাংলা পুঁথির মতো–লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে কাতারে কাতার/ শুমার করিয়া দেখে মাত্র চল্লিশ হাজার।

পাকিস্তানের নীতি নির্ধারক, এলিটরা যা মনে করে ১৯৭১ সাল সম্পর্কে তাই প্রতিফলিত হয়েছে রিপোর্টে। সারা পাকিস্তান মনে করে, পাকিস্তানের পরাজয়ের জন্য দায়ী নিয়াজী। কিন্তু টিক্কা খান, ফরমান আলী কিছুই না। করাচীতে পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক এমভি নকভী আমাকে বলেছিলেন, টিক্কা যখন ঢাকা থেকে ফিরল তখন বিমানবন্দরে সাংবাদিকরা এই ধর্ষণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। টিক্কা বলেছিল, হ্যাঁ, হাজার

তিনেকের মতো ধর্ষিত হয়েছে। নকভী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, তিন হাজার মহিলা ধর্ষণও কোনো অপরাধ নয়। কমিশনের মতে, ফরমান কোনো কিছুর জন্যই দায়ী নয়। ফরমান এক সাক্ষাতকারে আমাকে বলেছিলেন, টিক্কার মতো ভালো জেনারেল হয় না। টিক্কা ও ফরমান দু'জনই ভুট্টোর মন্ত্রী হয়েছিলেন। শাহবাজ মাজারী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, ভুট্টো টিক্কাকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন বেলুচীদের ওপর ১৯৭১-এর পর। টিক্কা এমন বর্বর আচরণ করেছিল যে, তার নাম হয়ে গিয়েছিল বেলুচিস্তানের কসাই। ভুট্টো যাদের অপছন্দ করতেন, তাদেরকেই কমিশন অভিযুক্ত করেছিল। অন্যদের নয়।

রিপোর্টটি এখন প্রকাশিত হলো কেন? তাও আবার ভারতে। শোনা যায় মোস্তফা খা'র রিপোর্টটি 'ইন্ডিয়া টু-ডে'কে দিয়েছে। খা' পিপলস পার্টির এককালের বড় নেতা। পিপিপি এখন জেনারেলদের বেকায়দায় ফেলতে চাচ্ছে। মোশাররফও জেনারেলদের তাবে রাখতে চায়। ভাবটা, আর বাড়াবাড়ি করো না, মূল রিপোর্ট প্রকাশিত হলো বলে। কিন্তু তা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। গত ৫৩ বছরে পাকিস্তানে কয়েক শ' কমিশনের মাত্র একটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে–কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা সম্পর্কে। প্রকাশিত হবে কী ভাবে? কারণ, অধিকাংশ ঘটনার হোতা সামরিক বাহিনী, আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে 'আইএসআই'।

সুতরাং আমাদের উল্লাসের কিছু নেই। আমাদের যদি সোচ্চার হতে হয় তাহলে হতে হবে তিনটি ক্ষেত্রে–

১. এটি পক্ষপাতমূলক রিপোর্ট, যা সত্য আড়াল করেছে। আসল সত্য প্রকাশিত হওয়া উচিত ও পাকিদের তা জানা উচিত।

২. যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদেরতো বটেই যাদের অভিযুক্ত করা হয়নি তাদেরও আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী আদালতে বিচার হওয়া উচিত এবং এ সবের মূল হোতা 'আইএসআই' কে সন্ত্রাসী সংস্থা হিসেবে ঘোষণা করা হোক।

২. গণহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ে রিপোর্টের মিথ্যাচার প্রত্যাখ্যান এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশী যুদ্ধাপরাধীদের অবিলম্বে বিচার।

শেষোক্ত বিষয়টিতেই আমাদের বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ পাকিস্তানে এবং বিদেশে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন, বুঝলাম পাকি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া উচিত কিন্তু তোমাদের দেশী যুদ্ধাপরাধীদের তো তোমরা ছেড়ে দিয়েছ, এমনকি মন্ত্রী বানিয়েছ। সুতরাং আমাদেরগুলোর বিচার করলেই পাকি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে।

৮.৯.২০০০

মামলা হলে হাইকোর্ট ভবনে গিয়ে কোথাও লুকালেই হয়!

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর তফসির সংক্রান্ত মামলায় তার পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন টেবিল চাপড়ে বললেন, 'ডোন্ট টক রাবিশ'। পরিপ্রেক্ষিতটা ছিল '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ধর্মের নামে মানুষ হত্যার বিষয়। বিচারক বিব্রতবোধ করলেন। মামলা মুলতবি।

ইনকিলাব সম্পাদকের মামলায় শুনানির সময় "ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, এ মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ পর্যায়ে আদালত বলে, আবেদনকারী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো কিছুতে অপরাধ প্রমাণিত হলে এর মধ্যে রাজনীতি কোথায়? জবাবে মওদুদ আহমেদ টেবিলে করাঘাত করে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য এটা করা হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন আদালতের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এভাবে আদালতকে হুমকি দেয়া যায় না। তিনি আরও জানান, এ মামলার শুনানিতে তিনি বিব্রতবোধ করছেন।" (প্রথম আলো, ১৫.১১)। মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা শুনে নাকি গোলাম আযম একবার বলেছিলেন, ঐ কেচ্ছা রাখুন।

'৭১-এর গণহত্যার কথা উঠলে বা '৭১ যা মুক্তিযুদ্ধ বা যা স্বাধীনতা তার মর্মমূলে আঘাত করলে এবং আদালতে সে প্রসঙ্গ উঠলে কোনো কোনো আইনজীবী টেবিল চাপড়ে উচ্চঃস্বরে কথা বলেন। কারণ, তাঁদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি কেচ্ছার মতো বা রাবিশ এবং তাঁদের কাছে '৭১ রাজনীতি। কিন্তু, মুক্তিযুদ্ধ বা '৭১ অস্বীকার করা কি রাজনীতি নয়? আমি জানি না, বিব্রতবোধ না করে কোনো বিচারক বলতে পারেন কিনা এ পরিপেক্ষিতে যে, স্টপ ইট, গেট লস্ট।

লড়াইটা এখন দেশে চলছে আদর্শিক ভিত্তিতে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও বিপক্ষের। বিষয়টা আদালতে আজকাল চলে আসছে। আদালত এ বিষয়ে 'রুল' জারি করতে পারে, আদালত অবমাননার কথা বলতে পারে কিন্তু সারা দেশে তো এটি নিয়েই আলোচনা চলছে। এ আলোচনা তো রুল জারি করে থামানো যাবে না। কারণ, বিষয়গুলো আদালতেই ঘটছে।

১৪ আগস্ট পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন বা জাতীয় সঙ্গীতের প্যারোডির সঙ্গে বোমা মেরে প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টা এক ব্যাপার নয়। যদিও দু'টোকেই রাষ্ট্রদ্রোহিতা আখ্যা দেয়া হয়। প্রথমটি একেবারে স্বাধীনতা যুদ্ধকে অস্বীকার। আমরা চাই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থাকুক এ দেশে। রাষ্ট্রদ্রোহীরা চায় পাকিস্তানের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে। যারা বাংলাদেশে বিশ্বাস করে তারা সবাই প্রথমোক্তটিই চাইবে।

জাহাঙ্গীর মোঃ আদেলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলে তিনি হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে গিয়ে ঢুকলেন এবং জামিন পেলেন। বাহাউদ্দিনকে গ্রেফতারের কথা উঠলে তিনিও আদালত ভবনের একটি কক্ষে লুকোলেন। একটি পত্রিকায় দেখলাম, ঐ কক্ষটি বিএনপি নেতা জমিরউদ্দিন সরকারের। বাহাউদ্দিনকে গভীর রাতে আদালত জামিন দিল সরকার পক্ষের আইনজীবীর অনুপস্থিতিতে। দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত কেউ জামিন পেতে পারে কিনা সে প্রশ্ন করার আগে যে প্রশ্নটি অনেকে করছেন, তা হলো দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্তরা আদালতে গিয়ে লুকোচ্ছেন গ্রেফতার এড়াতে। এর অনেক রকম আইনগত ব্যাখ্যা দেয়া যাবে কিন্তু বিষয়টি তো সত্য। পাকিস্তানি মতাদর্শের বিপরীতে অভিযুক্ত কেউ কি আদালতে গিয়ে লুকিয়েছেন বা তাদের পক্ষের কোনো আইনীজীবী তাদের এমনভাবে আশ্রয় দিয়েছেন? বেগম জিয়ার আমলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল তারাও তো নির্দিষ্ট সময়ে আদালতে গিয়ে জামিন নিয়েছেন। এ প্রশ্নগুলো আজ কেন উঠছে? কেন অনেকের মনে এ জিজ্ঞাসা যে, তাহলে কি রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতে চলেছে?

অনেকে বলছেন, পাকিস্তানের পক্ষে টেবিল চাপড়ে কিছু বললেই দেখি পার পাওয়া যায়। আরো অনেক কিছু বলছেন। কিন্তু, আদালত অবমাননার ভয়ে আমরা সেগুলো উল্লেখ করলাম না। কারণ, কারো কোনো বক্তব্য সংবাদপত্র ছাপতে পারবে কিনা সেটিও প্রশ্নের সম্মুখীন। আমি শুধু শেষে একটি কথা বলেই শেষ করব। মধ্যরাতের জামিনের ঘটনাটি পত্রিকায় পড়ে অবসরপ্রাপ্ত এক সামরিক অফিসার ফোনে আবেগভরা কণ্ঠে বললেন আমাকে, দেশে থানা-পুলিশের কোনো দরকার আছে? মামলা হলেই হাইকোর্টের কোথাও গিয়ে লুকোবেন।

এসব প্রশ্ন একটি বিষয়কে জটিল করে তুলছে। যাদের ওপর সত্যিই অবিচার হয় তারও যদি একইভাবে আদালতের আশ্রয় চান এবং পান তা হলেও তা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

১৮.১১.২০০০

ইনকিলাবকে কেন সবাই প্রশ্রয় দিয়েছে, আশ্রয় দেয়?

খবরের কাগজ খুললেই এখন দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা চোখে পড়ে। আদালত ও দৈনিক ইনকিলাব। তবে, দুঃখের বিষয় দৈনিক ইনকিলাব যেদিন থেকে মাদ্রাসা শিক্ষকদের থেকে জোর করে চাঁদা তুলে বের করা হলো সেদিন থেকে বিতর্কিত হয়ে পড়ল। আদালত বা বিচারপতিরা বিতর্কিত ছিলেন না। এখন খবরের কাগজে দু'টি প্রসঙ্গই এক সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে, এটিই দুঃখের।

দৈনিক ইনকিলাবের কথা মনে হলে আমি কয়েক বছর আগের ঘটনাটি ভুলতে পারি না। বায়তুল মোকাররমের সামনের রাস্তায় ভর দুপুরে, খররোদ মাথায় নিয়ে রিক্সার দরদাম করছি। সঙ্গে '৭১-এর গেরিলা এক বন্ধু। এমন সময় চকচকে একটি গাড়ি এসে থামল সামনে। নামল একজন, পরনে সফেদ পাজামা-পাঞ্জাবি। মুখে কলপ মাখা ছোট করে ছাঁটা কালো দাড়ি। তাকে দেখে দৌড়ে এল কয়েকজন মুরগিঅলা। লোকটি জবেহ করে খাওয়ার জন্য হেলাভরে কয়েকটি মুরগি তুলে নিল।

চর্বিতে আসল চেহারা ঢাকা পড়ে গেলেও মনে হলো এ লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছি। মনে করতে পারছি না। বন্ধুর দিকে তাকাই। শীর্ণ চেহারা, জ্বলজ্বলে চোখে, হাত মুষ্টিবদ্ধ। দাঁতে দাঁত পেষার শব্দ।

ক্যারিকেচারটি কে? জিজ্ঞাসা করি আমি।

হ্যাঁ, তাই তো, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের দৈনিক বাংলায় এ লোকটির ছবি ছাপিয়ে শিরোনাম দিয়েছিল—'এই নরপিশাচকে ধরিয়ে দিন'। তখন লোকটির চেহারা এত তেলতেলে ছিল না। তবে, চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যটি বদলায়নি— এখন যেভাবে জবেহ করার জন্য হেলাভরে তুলে নেয় আধডজন মুরগি, কথিত আছে, ১৯৭১ সালে তেমনিভাবে হেলাভরে নিয়ে যেত বা তুলে নিতে সাহায্য করত বাঙালিকে জবেহ করার জন্য। শহীদ ড. আলীম চৌধুরী এর উদাহরণ। মুরগি বা মানুষে তার কাছে তেমন পার্থক্য নেই যদি তা সাহায্য করে নিজের মেদ বৃদ্ধিতে। মুক্তিযুদ্ধ আসলে বাংলাদেশকে কী দিয়েছে তাও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল একজনের মুরগি কেনা ও আরেকজনের খররোদে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যে।

আলবদর হিসেবে পরিচিত আব্দুল মান্নানকে আলবদর থেকে মানুষের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন আমাদের সেই বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়াউর রহমান। একই সঙ্গে দু'টি বিপরীতধর্মী কাজ করার যোগ্যতা তাঁর ছিল। সে যোগ্যতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছিলেন তাঁর শাসনামলে, যার মর্মান্তিক অভিঘাত আজ দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে।

আলবদরকে মানুষের মর্যাদা দেয়ার পর আব্দুল মান্নান আর ফিরে তাকায়নি। অর্থ সঞ্চয় করেছে [তার বিরুদ্ধে গম চুরির মামলার কোনো বিচার এখনো হয়নি। হয়ত আদালতে ঝুলে আছে।] টাকার তো আর কলঙ্ক নেই। জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর মান্নান এরশাদ বন্দনা শুরু করলেন। তার আর কী দোষ? সে তো সরকার সমর্থক সবসময়। সরকার বদলালে তার কী বলার আছে? আওয়ামী লীগের জনাকয়েক মন্ত্রী কি যান নি ইনকিলাব-এ? প্রখ্যাত লেখক, মুক্তিযুদ্ধের প্রবক্তা হুমায়ূন আহমদ কি লেখেননি ইনকিলাব গ্রুপের পত্রিকায়? নাকি সাক্ষাতকার দেননি। সুতরাং মান্নান যদি বলে, ভারি আমার মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিযুদ্ধ? ঢাকাইয়া ভাষায় হলে 'ভারি' শব্দটি ব্যবহার না করে অন্য শব্দ ব্যবহার করত। হয়ত মান্নান তাই করে।

আলবদর, পাকি পক্ষের শক্তি সংহত করার জন্য মান্নান প্রকাশ করে 'ইনকিলাব'। ব্রিটিশ আমলে এর একটা ভালো অর্থ ছিল বিপ্লব। ব্রিটিশবিরোধী শ্লোগান হলে বলা হতো, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইনকিলাব যে অর্থে 'ইনকিলাব' শব্দটি ব্যবহার করে তার অর্থ আলবদরীয় বিপ্লব। 'ইনকিলাব'কে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে এরশাদের সেনা সরকার। পত্রিকাটির পুঁজি নিয়ে শুরু থেকে নানা বিতর্কমূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু কোনো সরকার তার ব্যবস্থা নেয়নি। সেনাপতিরা সবসময় সাহায্য সহায়তা করেছে ইনকিলাবকে। কয়েকদিন আগে ছয় সাবেক ডিজিএফআই ও এনএসআই প্রধান 'ইনকিলাব'-এ দীর্ঘ সাক্ষাতকার দিয়ে পত্রিকাটির সঙ্গে একমত হয়েছেন যে বাংলাদেশে সিআইএ বা কেজিবি (এখন অন্য নাম) কোন ছার পাকি আইএসআইয়েরও কোনো এজেন্ট নেই। এজেন্ট আছে ভারতীয় 'র'-এর এবং সাংবাদিক (অবশ্যই ইনকিলাব-এর ছাড়া) শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে 'র'-এর এজেন্ট গিজগিজ করছে।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের দিন প্রাক্তন ছাত্রনেতা ইসমত কাদির গামার সঙ্গে মিছিলের পিছে হাঁটছিলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনারা এরশাদের বিরুদ্ধে এত আন্দোলন করলেন। মিছিল সমাবেশ করলেন কিন্তু এরশাদের মুখপত্র ইনকিলাবের ব্যাপারে নিশ্চুপ কেন?' তিনি বললেন, 'আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আর ইনকিলাব-এর চরিত্র উন্মোচিত হওয়ার পর সাংবাদিকরাও তো কখনও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি। আমরা তো কোন ছার!' আসলে আমরা ও সাংবাদিকরা তো অনেকের সম্পর্কে লিখি, বিবৃতি দিই, 'ইনকিলাব'-এর অপকর্মের বিরুদ্ধে তো কখনো কেউ বিবৃতি দেইনি। এটিও এক ধরনের ভণ্ডামি।

'ইনকিলাব' এভাবে সামরিকতন্ত্রে এবং গণতন্ত্রে বিকশিত হয়েছে। সব সরকারের আমলে এ পত্রিকা তুলনামূলকভাবে যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে অন্যকোনো পত্রিকা পায়নি। বর্তমান তথ্যপ্রতিমন্ত্রী শুধু প্রকাশ্যে পত্রিকাটির সমালোচনা করেছেন এবং বিজ্ঞাপনের নীতিমালা ঠিক করেছেন, যার ফলে 'ইনকিলাব' এ আমলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পত্রিকাগুলোর তুলনায় কম বিজ্ঞাপন পেয়েছে। কিন্তু পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

'ইনকিলাব' কী ছাপে? প্রতিদিন ভারত বিরোধী একটি সংবাদ/রচনা যাতে সাম্প্রদায়িকতা যুক্ত থাকে। মুক্তিযুদ্ধের পত্রিকা তাদের কাছে 'র'কণ্ঠ। আরেকটু 'ইসলামী লেবাস'ও থাকে। মাদ্রাসা শিক্ষক থেকে ধর্মভীরু মধ্যবিত্ত, ফন্দিবাজ ও পাকিপন্থীরা এই পত্রিকাটি কেনে। কিন্তু পত্রিকাটিতে অধিকাংশ সময় থাকে অতিরঞ্জন বা তথ্য বিভ্রাট ও চরিত্র হনন। এ থেকে শেখ হাসিনা বা ডা. বদরুদ্দোজা বা সাইফুর রহমান বা সাদেক হোসেন খোকা কেউ বাদ যান না। কিন্তু চরিত্র হনন করা হয় না খালেদা জিয়া, গোলাম আযম (এখন এরশাদও অন্তর্ভুক্ত), নিজামী, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বা আনোয়ার জাহিদদের। যে জন্য দেশদ্রোহিতার ঘটনার পর বেগম জিয়া পত্রিকাটির নিন্দা করতে নারাজ। কারণ, 'ইনকিলাব' এখন জাতীয় পার্টির নয়, বিএনপির মুখপত্র। তবে পুরো বিএনপির নয়, বিএনপির অধিক পাকিপন্থী বা যাদের গায়ে রাজাকার বা আলবদরের সিলছাপ্পড় আছে তাদের। অথচ দেখুন, পত্রিকাটি ছাপে নাকি ভারতীয় মেশিনে। পত্রিকার খবরে অনুমান করলাম, ভারতীয় তামিল নাগরিককে ভিসা প্রদান না করায় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেও পিছপা হয়নি এ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। অথচ আবার দেখুন, 'রাজনৈতিক রঙ্গালয়' শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে গোলাম আযমের মামলা চলাকালীন এ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যকে 'সংবেদনশীল' ও 'অত্যন্ত বিতর্কিত' বলে উল্লেখ করেছে এবং সরকারকেও কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে। এর অর্থ বাংলাদেশ যে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, আলবদর রাজাকাররা যে খুন-ধর্ষণ করেছে এসব তথ্য 'সংবেদনশীল' ও 'বিতর্কমূলক'। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় যারা বিশ্বাস করে না, একমাত্র তাদের পক্ষেই এসব কথা বলা সম্ভব। একি অদ্ভুত নয় যে, পাকি বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় পত্রিকায় কিন্তু ভারতীয় পণ্য বা ব্যক্তির প্রতি নমনীয়তা গোপনে!

দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যখন কয়েক বছর আগে 'ইনকিলাব'-এর বিরোধিতা করে বক্তব্য দিয়েছিলেন তখন আওয়ামী লীগের অনেক নেতা আমাদের বলেছিলেন, আমরা একটি পত্রিকার বিরুদ্ধে লিখে বাড়াবাড়ি করছি। আমরা বলেছিলাম ও লিখেছিলাম যে, ইনকিলাব কোনো পত্রিকা নয়। পত্রিকার এথিক্স না থাকলে কি পত্রিকা? ইনকিলাব স্বাধীনতাবিরোধীদের একটি প্ল্যাটফর্ম। আজ দেরিতে হলেও অনেক রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী সচেতন হয়েছেন এবং দেখছেন আরে কথাটা তো সত্যি! আসলে, গণতন্ত্রেরও একটি সীমা থাকে। গণতন্ত্র মানে এই নয় স্বাধীনতাবিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা জাতীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করা, সহ্য করা। ইনকিলাবে এর আগে অনেক প্রবন্ধে কি লেখা হয়নি, জাতীয় সঙ্গীত বদলানো হোক? আজ দেখলাম, কিছু সাংবাদিকও বলছেন, জাতীয় সঙ্গীত ধর্মগ্রন্থ নয় যে বদলানো যাবে না। একদম ঠিক। বাবা-মাও ধর্মগ্রন্থ নয় যে প্রয়োজনে তাদের বদলানো যাবে না। ইনকিলাব কি সব সময় লেখে না মোনায়েম খান শহীদ। এ ধরনের উদাহরণ কত দেব! এ পর্যন্ত মিথ্যা খবর ছাপিয়ে ইনকিলাব অসংখ্যবার ক্ষমা চেয়েছে। এই হাইকোর্টও তাকে সতর্ক করে দিয়েছে (যদি স্মৃতি প্রতারণা না করে থাকে)।

অন্য কোনো দেশ হলে এ পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখা সম্ভব হতো না। কিন্তু এ দেশে সম্ভব হয়েছে। কারণ, সেনাশাসনের দু'দশক ইনকিলাব জেনারেলদের সমর্থন পেয়েছে। কোনো জজ আজ পর্যন্ত পত্রিকাটিকে সুয়োমোটো করেছেন কিনা জানি না। দেশদ্রোহী বা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধবিরোধী কোনো সংবাদ/রচনার জন্য অন্য যাদের ক্ষেত্রে সুয়োমোটো করা হয়েছে তাদের অপরাধের মাত্রা কি ইনকিলাব সম্পাদক থেকে বেশি? এ প্রশ্নও আজ চলে আসছে। কোনো এ্যাটর্নি জেনারেলও এ পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেন নি। কোনো পত্রিকা সম্পাদকও মধ্যরাতে জামিন পাননি। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এবং জনাব খসরুর মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিচারকদের বিজ্ঞাপন এখনো ছাপা হয় ইনকিলাব-এ। সত্যি ঈর্ষাযোগ্য ভাগ্য!

'ইনকিলাব' কেন সবার আশ্রয় পায়? তার একটি কারণ, আমাদের মূল্যবোধ খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজে বা রাষ্ট্রের যে কেউ যে কোনো উপায়ে অর্থ ও পেশী শক্তি অর্জন করেছে, সমাজ রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগ তাকে আশ্রয় দিয়েছে। হ্যাঁ রাজনীতিবিদরাও। এখানে অন্য কোনো প্রশ্ন আসেনি, জনগণ খুব কম ক্ষেত্রেই সে রকম আশ্রয় পেয়েছে। মাঝরাতে জামিন দেয়াটা ব্যাপার নয়। বড় ব্যাপার হলো, একমাত্র ইনকিলাব যার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয়েছে তাকেই জামিন দেয়া হয়েছে। মাঝরাতে অন্য কাউকে জামিন দিলে হৈচৈ হয়ত হতো না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে রাষ্ট্রদ্রোহিতা কি প্রমাণিত হয়েছে যে উনি জামিন পাবেন না? এ কারণেই ইনকিলাব-এর সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো। প্রতিদিন যা দৃশ্যমান তা প্রমাণ করতে হবে কেন আমাদের? এতে কি আদালতের কোনো দায়িত্ব নেই? আর একটি বিষয় উল্লেখ্য আজকাল দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে কোনো আলোচনা হলেই সে সম্পর্কে আদালত প্রশ্ন রাখছে। আদালত অবশ্যই তা পারে। আদালত অবমাননার কথা আসছে। সংবিধানের কোথায় লেখা আছে একজন নাগরিক তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে না? অবস্থাটা এমন দাঁড়াচ্ছে যে, ভয়েই কিছু লেখার সাহস পাই না যদি আদালতে দাঁড়াতে হয়। কারণ, এ পর্যন্ত আদালত অবমাননার মামলায় কতবার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পত্রিকাকে দাঁড়াতে হয়েছে আর কতবার দাঁড়াতে হয়েছে স্বাধীনতাবিরোধী পত্রিকাকে। অবশ্য কোনো নাগরিক যদি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও বিপক্ষের লোক চিহ্নিত করতে না পারেন সে অন্য কথা। রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচারালয় বা ব্যবস্থা একটি। অন্য দু'টি কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করার অধিকার আমার থাকবে, অন্যটির থাকবে না, সংবিধানে এমন কোনো বাক্য নেই। অবশ্য আদালত যদি এখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার ব্যাখ্যা চান তবে নিরুত্তরই থাকব। ইনকিলাব যখন পাকিমনের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলছে তখন সমাজের অধিকাংশ আমরা তো নীরবই থেকেছি। কারণ, ভেবেছি সব শক্তিশালী কেন্দ্র যাকে আশ্রয় দেয় তার বিরুদ্ধে কলিমদ্দি ছলিমদ্দি কী করবে? তাছাড়া ঐ যে '৭১-এ যারা জবেহ করেছিল, তারা ও তাদের ভক্তরা যে শুধু সমাজ নয়, রাষ্ট্রের সব জায়গায়ই আছে এ কথা এখন অনেকেই বিশ্বাস করছে। '৭১-এর পরও তারা জবেহ করেছে এবং জবেহ করা পার্টিদের নিয়েই তো চারদল গঠিত হয়েছে।

শুধু তাই নয় মানুষ পাকিমনের ব্যক্তিরা দেখছে টেবিল চাপড়ালেই হয়। সবাই বিব্রত বা নিশ্চুপ হয়ে যায়। তবে সবশেষে বলব যে, সুস্থ রাজনীতিতে যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি সমর্থন বা নমনীয়তা যে অন্তিমে ফলদায়ক নয় তা আওয়ামী লীগ যেমন মনে হয় এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছে তেমনি বিএনপির সাদেক হোসেন খোকা ও তাঁর কর্মীরাও অনুধাবন করছেন। এঁরা সবাই যদি স্থির থাকেন তবে সমাজ রাষ্ট্রে অনেকটা স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। পৃথিবীর ইতিহাসে নেই যে অশুভ কখনো শুভ-এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তা' হলে তো সমাজ রাষ্ট্র থাকত না। আর সবসময় টেবিল চাপড়িয়ে পার পেলে মুক্তিযুদ্ধও হতো না এবং হ্যাঁ, তা না হলে আমরা অনেকে যেমন অধ্যাপক, পত্রিকা মালিক বা সম্পাদক হতাম না তেমনি অনেকে জজও হতেন না।

২০.১১.২০০০

বিজয়ের মাসে পাকি বাংলা সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ

শুরু হলো বিজয়ের মাস। বিজয়ের ত্রিশ বছর পুরো হতে চলল। মাসটি আনন্দের হলেও বারবার মনে পড়ে এ মাসে হত্যা করা হয়েছিল অগণিত বাঙালি পেশাজীবীকে, যাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশের অনেক বরেণ্য সন্তান। আমাদের অনেকের শিক্ষক।

১৯৭১ সালে বিজয়ের মাসের কিছুদিন আগে পাকিদের সহযোগী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামের সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গঠিত হয় আলবদর বাহিনী। উদ্দেশ্য, বাঙালি পেশাজীবীদের নিধন, যাতে নবীন রাষ্ট্র মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। আলবদর বাহিনী গঠিত হওয়ার পর তাদের কাজ শুরু করে এবং ডিসেম্বরে তাদের হত্যাযজ্ঞ তুঙ্গে ওঠে। এ মাসেই ঢাকার রায়ের বাজার, মিরপুরে শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের হত্যা করা হয়। এই বাহিনীর প্রধান ছিল তৎকালীন জামায়াতের তরুণ নেতা মতিউর রহমান নিজামী। সেই নিজামী আজ জামায়াতের নতুন আমির। সংবাদপত্রে দেখেছি, ৭ ডিসেম্বর নিজামী নতুন আমির হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বিজয়ের ত্রিশ বছর পর পাকিদের দোসর জামায়াত আবার বাঙালিদের মুখের ওপর ছুড়ে দিল নতুন চ্যালেঞ্জ–আলবদর নেতাকে প্রধান করা হয়েছে এই বিজয়ের মাসে এবং সে আমিরী গ্রহণও করবে এই মাসে। দেখি তোমাদের মুরোদ। কই? বিবৃতি পর্যন্ত। তাই বিজয়ের মাসেও নিতান্ত নিরানন্দ মন নিয়ে এই লেখা লিখছি। প্রতি ডিসেম্বর আমার শিক্ষকদের স্মরণে একটি লেখা লিখি। এঁদের খুন করেছিল নিজামীর নেতৃত্বে আলবদর বাহিনী। এই নিজামী আজ শুধু জামায়াতের আমীরই নয়, চারদলীয় জোটেরও একজন নেতা। এখন জোটে বস্তুত বেগম জিয়ার সেকেন্ড ইন কমান্ড। বেগম জিয়া আবার মুক্তিযুদ্ধের কথা বলেন। আমি বলব, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বস্তুত তামাশাই করছেন। নয়ত 'ইনকিলাব' সম্পর্কে বেগম জিয়া কীভাবে বলেন, "ইনকিলাবের বিরুদ্ধে আক্রমণ আমাদের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ।" [ইনকিলাব, ৫ জুন ১৯৯৭] পাকিপন্থীদের প্লাটফর্ম, দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত 'ইনকিলাব' হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষে! কয়েকদিন আগে পাকি ডেপুটি হাইকমিশনার যে বাঙালিদের গালিগালাজ করল তার বিরুদ্ধে সবাই প্রতিবাদ জানালেও বিএনপি-জামায়াত চুপ। সব পত্রিকা সোচ্চার হলেও 'ইনকিলাব' নিশ্চুপ। এ ধরনের ঘটনা বাংলাদেশেই সম্ভব এবং বাঙালিদের একাংশই এর জন্য দায়ী। বাঙালির বহু অর্জন এসব মানুষের জন্যই নিস্প্রভ হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। বাংলাদেশে যখন এভাবে পাকি বাঙালের সৃষ্টি হয় তখন দেশের নামকরণই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে।

১৯৭১-এর পর যাদের জন্ম তাদের বয়সও এখন ত্রিশের কোঠায়। একাত্তরের অনেক ঘটনা হয়ত তারা জানেন না বা আমল দিতে চান না। তাদের কাছে পাবনা

জেলার সাঁথিয়া থানার খন্দকার লুৎফর রহমানের পুত্র মতিউর রহমান নিজামী হয়ত নিছক একজন রাজনৈতিক নেতা, রাজনীতিবিদ। কিন্তু কেমন রাজনীতিবিদ? সে পরিচয়ও আমি তুলে ধরব। মতিউর রহমান নিজামী আপাদমস্তক পাকিস্তানি। ১৯৭১ সালে আলবদর প্রধান হওয়া শুধু এর প্রমাণ নয়। এখনো তিনি যা বলেন তাতেও পাকি পাকি ভাবটা চরম মাত্রায় থাকে। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে খুনীদের বাহিনী আলবদরের প্রধান নিজামী ঘোষণা করেছিলেন–"আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে, পাক বাহিনীর সহযোগিতায় এ দেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আলবদর বাহিনী গঠন করেছে। সেদিন আর খুব বেশি দূরে নয় যেদিন আলবদরের তরুণ যুবকরা আমাদের (অর্থাৎ পাকি) সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে (অর্থাৎ ভারতীয়) পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্তানের অস্তিত্বকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।" তা সারা বিশ্ব বাদ যাক, হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব দূরে থাকুক, পাকিস্তানের অস্তিত্বই শেষ হয়ে গেল। 'হিন্দু বাহিনী'র ডাণ্ডা খেয়ে নিজামীরা তখন বাপ বাপ বলে গর্তে লুকিয়েছিল এবং লুকোবার আগে পাকিদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র দিয়ে নিরীহ বাঙালিদের খুন করেছিল। এ জন্য আলবদর আর মানুষে পার্থক্য আছে। এই আলবদরদের গর্ত থেকে টেনে এনে নিজের দোস্ত বলে ঘোষণা করেছিল আজকের বিএনপির স্রষ্টা অব লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান। যে কারণে বিএনপি-জামায়াত আবার জোট বেঁধেছে। গণতদন্ত কমিশন, অনুসারে–"মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তার এলাকাবাসীও হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, নির্যাতন ইত্যাদি অভিযোগ এনেছেন।

পাবনা জেলার বেড়া থানার বৃশালিকা গ্রামের আমিনুল ইসলাম ডাবলু গণতদন্ত কমিশনকে জানিয়েছেন, তাঁর পিতা মোঃ সোহরাব আলীকে একাত্তরে নিজামীর নির্দেশেই হত্যা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, নিজামীর নির্দেশেই তাঁদের এলাকার প্রফুল্ল (পিতা ঃ নয়না প্রামাণিক), ভাদু (পিতা ঃ ক্ষিতীশ প্রামাণিক), মুন (পিতা ঃ ফেলু প্রামাণিক) এবং ষষ্ঠী প্রামাণিক (পিতা ঃ প্রফুল্ল প্রামাণিক) কে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার কয়েকজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীও রয়েছে বলে তিনি জানান।" এ রকম আরো অনেক বিবরণ আছে গণতদন্ত কমিশনে।

বিএনপি জোটের সেকেন্ড ইন কমান্ড একজন ঘাতক হতেই পারে, তাতে আমাদের বলার কিছু নেই। সাধারণের কাছে প্রশ্ন, একজন রাজনীতিবিদের কাছে আপনারা কী চান? নিশ্চয় আশা করেন, তিনি যা বলেন, তাই করেন, ওয়াদার বরখেলাপ করেন না। অর্থাৎ মোনাফেক নন। বিএনপি কর্মীরা না হয় একজন ঘাতককে মেনে নিল নেতা হিসেবে, কিন্তু তারা কী এমন একজনকে মানবে যে অহরহ বিএনপি'কে গালিগালাজ করে! আলবদর নিজামী যে ভাষায় বিএনপি'কে গালিগালাজ করেছে আর কেউ তা করেছে কিনা জানি না! আজ নিজামী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যে ভাষায় কথা বলছে কয়েক বছর আগেও ঠিক একই ভাষায় কথা বলেছে বিএনপির বিরুদ্ধে, যা হয়ত অনেকের জানা নেই। কয়েকটি উদাহরণ দেই–

১. "মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, এ সরকারকে অক্সিজেন দিয়ে আর কতদিন বাঁচানো যাবে? জাতি আজ চরম হতাশায় ভুগছে।" (দৈনিক জনতা ১৬-১১-৯১)।

২. "ক্ষমতায় গিয়ে বিএনপি দলীয় নেতাকর্মীদের আর্থিক সুবিধা দেয়ার জন্য দুর্নীতিকে দ্বিগুণ গতিতে চালিত করেছে।" (ভোরের কাগজ, ১১.৭.১৯৯৩)।

৩. "বর্তমান বিএনপি সরকার ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের তৎপরতা চালাচ্ছে।" (দৈনিক মিল্লাত, ২৫.৯.১৯৯৩)।

৪. "সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্রদল ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ"। (ঐ, ২৬.১০.১৯৯৩)।

৫. "বিএনপি সরকার ও ছাত্রদল কসাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।" (দৈনিক সংগ্রাম, ২৪.২.১৯৯৫)।

৬. "সন্ত্রাসীদেরকে যে আগুন জ্বালানোর সুযোগ দিয়েছেন সে আগুনেই তারা আপনাদের ও দেশবাসীকে জ্বালিয়ে মারবে।" (দৈনিক জনতা, ২৮.১১.৯৫)।

চারদলীয় জোটের সেকেন্ড ইন কমান্ড বলছে, কমান্ডার অর্থাৎ বেগম জিয়া ক্ষমতায় এলে–

১. ইসলামবিরোধী অনৈতিক কাজকর্ম শুরু হবে,

২. ছাত্রদল ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে,

৩. দেশ দুর্নীতিতে ছেয়ে যাবে,

৪. ছাত্রদল ও বিএনপি কসাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। নিজামীর এসব বিষয়ে ভালো জানার কথা। কারণ ১৯৭১ সালে জামায়াত ইসলামবিরোধী ও ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আলবদরদের ভূমিকা ছিল কসাইয়ের। না, এখানেই শেষ নয়, নিজামী আরো ঘোষণা করেছিল, "আমরা বর্তমান সন্ত্রাসী সরকারের জানাজা পড়তে চাই।" (দৈনিক বাংলার বাণী, ২৪.১০.৯৫) এবং "৫ বছরের দুঃশাসনে জনগণের মধ্যে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বিএনপি কোনো বিশ্বস্ত রাজনৈতিক শক্তি নয়।" (সংগ্রাম, ২৪.৩.৯৬)।

যে বিএনপির জানাজা পড়তে উদগ্রীব নিজামী, যে বিএনপি'কে নিজামী মনে করে বিশ্বস্ত নয়, সে বিএনপির সঙ্গে যাওয়া কেন? মোনাফেক শব্দটির অর্থ দেখার দরকার আছে? ত্রিশের কোঠার তরুণ-তরুণীদের জিজ্ঞাসা, এ ধরনের রাজনীতিবিদদেরই কি আপনারা ক্ষমতায় দেখতে চান? বা এদের নেতৃত্বে চলতে চান?

যদি চারদলীয় জোটকে আপনারা ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসান তা হলে জোটের সেকেন্ড ইন কমান্ড নিজামী হয়ত দায়িত্ব পাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। তার যে মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরলাম তাতে অনুমান করুন কী ঘটতে পারে এ দেশে। নতুন নামে আলবদর বাহিনী তৈরি হবে, ভিন্নমতাবলম্বী সবাইকে খুন করা হতে পারে। বিএনপির নেতাকর্মীদের জেলে যেতে হবে (দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত তার মন্তব্যসমূহ)। মুনীরুজ্জামান ঠিকই লিখেছেন, জামায়াতের আমীর যেই হোক, নীতিটা হবে গোলামের। অর্থাৎ প্রভু পাকিদের। কিছুদিন আগেও নিজামী পাকিপন্থী কাগজ ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

বলেছে, “যারা ’৪৭ পূর্ব সীমানায় ফিরে যেতে চায়, তারা ইনকিলাবের বিরোধিতা করে।” নিজামীরা চায় ’৪৭-এর পাকিস্তান। তারা যে নতুন পাকি-বাংলা জাতি সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে, ক্ষমতায় গেলে তা সফল করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

এ কারণে নিজামী আমীরত্ব গ্রহণ করবে ৭ ডিসেম্বর। এ কারণেই বিজয়ের মাসের শুরুতেই পাকি ডেপুটি পাকিদের কথা আবার বলেছে প্রকাশ্যে। এ কারণেই বিজয়ের মাসের আগেই ইনকিলাব বিকৃত প্যারোডি ছাপিয়েছে জাতীয় সঙ্গীতের। আর পাকিস্তান বলেছে পুরনো কথা ভুলে যেতে, যা সব সময় বলে বিএনপি এবং জামায়াত। আর এ কারণেই পাকি ডেপুটির আচরণের কোনো প্রতিবাদ করেনি চারদলীয় ঐক্যজোট। বিজয়ের মাসেই তারা পাকি-বাংলা আন্দোলনের শুরু করছে। বিজয়ের মাসে বাঙালিদেরই তাই নির্ধারণ করতে হবে তারা কী করবে।

১.১২.২০০০

কে কার ‘দালাল’ সেটি স্পষ্ট হলো!

পাকি কূটনীতিবিদের উদ্ধত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে বিএনপির সম্পাদক জনাব মান্নান ভূঁইয়া একটি বিবৃতি দিলেন। বেচারা জনাব ভূঁইয়া! ঘটনা ঘটার তিনদিন পর, কয়েক লাইনের এই বিবৃতি প্রদানের জন্য তাঁকে আবার বেগম সাহেবার অনুমতি নিতে হয়েছে। পাকি ডেপুটি হাই কমিশনার, ঢাকার সেমিনারে পাকি শাসকদের ১৯৭১ সালের মনোভাব তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাডেমীশিয়ানরাই প্রতিবাদ জানান। সেমিনারের সভাপতি অবশ্য নিশ্চুপ ছিলেন। অনেকে বলবেন কূটনৈতিক শিষ্টাচার। এ ক্ষেত্রে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের বিষয়টিও সে রকম। যাহোক, পরদিন এ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ জানায়, পাকিস্তানি পতাকা পোড়ায়। নিশ্চুপ ছিল বিএনপি ও তার নেতৃত্বাধীন বাকি তিন দল; যাকে বলা হয় চারদলীয় ঐক্যজোট। আর নিশ্চুপ ছিল ঐসব দলের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত ইনকিলাব, সংগ্রাম, দৈনিক জনতা ইত্যাদি।

গণ্ডারকে কাতুকুতু দিলে নাকি এক সপ্তাহ পর হাসে। কারণ, তার আচ্ছাদনটি অতীব পুরু। বিএনপিরও সেই অবস্থা। ঘটনা ঘটার তিনদিন পর ছোট একটি বিবৃতিটিও দেয়া হয় নি। পাকি ডেপুটি রাজাকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সংবাদ শুনে বিএনপি বিবৃতিটি প্রকাশ করে।

অথচ সবার আগে বিবৃতিটি বিএনপিরই দেয়ার কথা এবং সরকার কেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজাকে বহিষ্কার করছে না, সেই দাবি জানিয়ে রাস্তায় নামা উচিত ছিল। কারণ, বিএনপির মুখপাত্ররা বলেন, দলটি নাকি মুক্তিযোদ্ধার দল। তা এরা কেমন মুক্তিযোদ্ধা! বিএনপি যখন দাবি করল দলটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের তখন আমরা অনেকে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করায় অনেকে ক্ষুব্ধ হতেন। এখন তাঁরা কী বলবেন? এখন যদি বলা হয় উদ্ধত কূটনীতিবিদকে ফেরত নেয়ার পর বিবৃতি প্রদান একটি তামাশা বিশেষ, তা হলে উত্তর কী হবে? অন্যদিকে, শেখ হাসিনা কিছু বললে তড়পানি শুরু হয়ে যায়, শুরু হয় ভাংচুর, বক্তৃতা-বিবৃতির বন্যা। বিএনপি কি বলতে চায় পাকিস্তান থেকেও বাংলাদেশের বড় শত্রু শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ?

রাজার উক্তির পর যে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল নেমেছিল বা বিবৃতি দেয়া হয়েছিল তার মূল কারণ, বিষয়টি সবাই দেখেছিল মাতৃভূমির অপমান হিসেবে। তেমনি, যার মা বা বোন ইজ্জত হারিয়েছে সে বোঝে মা বা বোনের ইজ্জত কী বা সে বোঝে তার মনের সেই

বিশাল ক্রোধ! অন্যদের সে অনুভব সম্ভব নয়। স্পষ্টতই এই অনুভূতি বিএনপিতে দেখা যায় নি।

এ বিষয়ে জামায়াত কোনো বিবৃতি দিতে পারে না। কারণ, তারা নিজেদের এখনো মনে করে পাকি নাগরিক। রাজার কথাই তাদের কথা। জাতীয় পার্টির প্রধান কারাবন্দি লে. জে. হু. মু. এরশাদ তো পাকি উপাধি নিশান-ই-হায়দার পেয়ে গর্বিত। তাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আদেল তো পাকিস্তানি পতাকাই উড়িয়ে দিয়েছিলেন নিজের বাসায়। বিএনপির নেতাদের কয়েক লাইনের বিবৃতিটি দিতে প্রাণ ফাটা ফাটা হয়ে গেছে। বিবৃতিটি– " আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল একটি জাতীয় যুদ্ধ। দলমত নির্বিশেষে এ দেশের মানুষ সেদিন স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। একক কোনো রাজনৈতিক দলের অধীনে এ যুদ্ধ হয়নি। কাজেই সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে কটূক্তি মানে হচ্ছে সারা জাতির অনুভূতিকে আক্রমণ ও আহত করা। স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে ডেপুটি হাই কমিশনারের বক্তব্য কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত, অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। এ ধরনের বক্তব্য যেই দিয়ে থাকুক আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।" এখন এটি বিশ্লেষণ করা যাক–

১. একক কোনো রাজনৈতিক দলের অধীনে এ যুদ্ধ হয়নি। এ কথা বলার অর্থ কী এবং এ কথা অবান্তরভাবে এখানে আসছে কেন? বিএনপির হীনমন্যতায় ভোগার কী দরকার? তাদের স্রষ্টা জে. জিয়া কোন সরকারের অধীনে যুদ্ধ করেছিলেন এবং বীরউত্তম পেয়েছিলেন? সেক্টর কমান্ডার হয়েছিলেন?

২. 'কাজেই সে স্বাধীনতা যুদ্ধ'-এ ধরনের বাক্য ব্যবহারের অর্থ কী? মনে হয়, বিবৃতিটি না দিতে পারলেই ভালো হতো।

৩. বক্তব্যটি কি শুধু শিষ্টাচারবহির্ভূত ও দুঃখজনক? অপমানজনক নয়? উদ্ধত নয়?

৪. 'যেই দিয়ে থাকুক?'–মানে? তিনি জানেন না বিবৃতিটি কে দিয়েছে? এক নিম্নপদস্থ পাকি কর্মকর্তা দিয়েছে। তার নাম বলতেই ভয়। তো জেনারেল মোশাররফের নামই তো বিএনপির নেতাদের মুখে আসবে না।

এর চেয়ে বিএনপির সহসভাপতি শাহজাহান সিরাজের বক্তব্যটি বাঙালিদের মতো। তাঁর বোধহয় হঠাৎ মনে পড়ে গেছে পল্টনে ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরেছিলেন।

বিএনপি কথায় কথায় আওয়ামী লীগকে ভারতের দালাল বলে। মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকরা 'র'-এর এজেন্ট। এখন বুঝতে পারছি কেন এ কথা বলা হয়। আওয়ামী লীগকে ভারতের দালাল বলার একটি কারণ, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল এবং ভারত তাতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু, মান্নান ভূঁইয়ার বিবৃতি অনুসারে, আওয়ামী লীগের অধীনে যুদ্ধ হয়নি। তা হলে কি আওয়ামী লীগকে আর ভারতের দালাল বলা হবে?

আমরা জানতাম, ডিসেম্বর হলেই জামায়াতের নেতাদের মাথা গরম হয়ে যায়।

এখন দেখা যায় বিএনপিরও হয়। বিজয়ের মাস সহ্য করতে না পেরে বিএনপি অবশেষে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। এতদিন তাদের একটা বহুরূপী ভেক ছিল। পাকি ডেপুটির ঘটনাটি ছিল অম্ল পরীক্ষা। এতে দেখা গেল, চার দলের জোট আসলে পাকিপন্থীদের জোট। এদের কেউ কোনো বিবৃতি দেয়নি। বিএনপি দিয়েছে, সেটি কেমন তা তো উল্লেখ করেছি। এদের মুখপত্র বলে পরিচিত পত্রিকাগুলো এ সম্পর্কিত খবর ছাপেনি। মান্নান ভূঁইয়াকে ধন্যবাদ, বিএনপি সম্পর্কে অনেকের মোহমুক্ত করার জন্য, পাকিস্তানের পক্ষে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য। এর ফলে বিএনপি পাকিপন্থী দল হিসেবে আরো সংহতভাবে নিজেদের কর্মকাণ্ড চালাতে পারবে। বিএনপিতে মুক্তিযোদ্ধারাও আছে বলে যে অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন সেটিও আর থাকবে না।

২.১২.২০০০

তাহলে কি বাংলাদেশ হয় নি?

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, সাধারণত সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাদের সম্পর্কিত কোনো সংবাদ/রচনার প্রতিবাদ করে না। হয় তারা মনে করে, সংবাদপত্রের এসব বিষয় উপেক্ষা করা উচিত অথবা প্রকাশিত সংবাদ সত্য। তাই জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক যখন জামায়াতের একটি প্রতিবাদলিপি আমার হাতে তুলে দিলেন তখন বিস্মিত হলাম। জামায়াতের প্রচার সম্পাদক যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার প্রতিবাদ। জনকণ্ঠে ১ ডিসেম্বর প্রকাশিত আমার লেখা ভাষ্য 'পাকি-বাংলা সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ'-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদটি পাঠানো হয়েছে।

জামায়াত মনে করেছিল, গোলাম আযমের পরিপ্রেক্ষিতে নিজামীকে আমীর করলে হত্যাকারী বা ঘাতকদের দল হিসেবে জামায়াতের যে ইমেজ তার পরিবর্তন হবে। কিন্তু প্রতিবাদলিপিটি পড়ে মনে হলো, তারা এখন এ বিষয়ে শঙ্কিত। কারণ, বোঝা যাচ্ছে, নিজামীকে আমীর করেও জামায়াতের ইমেজের কোনো পরিবর্তন হবে না।

বৃহস্পতিবার গোলামের নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজামী জামায়াতের আমীরত্ব গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, সে সূত্রে চার দলে বেগম জিয়ার পর সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবেও তিনি অভিষিক্ত হলেন। কিন্তু নিজামী যে ঘাতক সে পরিচয় মোছা যাবে কী ভাবে? শুধু ঘাতক নয়, আলবদর। তার নতুন পরিচয় হবে জামায়াতের আমীর আলবদর নিজামী। কারণ, আলবদর আর মানুষের পার্থক্য আছে। মওলানা শব্দটি মানুষের নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

আমার লেখাটির দু'টি অংশ ছিল। একটিতে আলবদর নিজামীর ঘাতক জীবনের বর্ণনা। অন্যটি বিএনপি সম্পর্কে তার বিষোদগার। কাদের মোল্লা প্রথম অংশটিকে শুধু 'ভিত্তিহীন অসত্য, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, গণতদন্ত কমিশনে নিজামীর বিরুদ্ধে যে সব হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ তোলা হয়েছে সেগুলো হত্যা নয় এবং 'মুনতাসীর মামুনের শিক্ষকদের হত্যার' সঙ্গে নিজামীর কোনো সম্পর্ক নেই।

কাদের মোল্লা লিখছেন, "এ ব্যাপারে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো– ১৯৭১ সালে আলবদর বাহিনী গঠিত হয়েছিল তদানীন্তন পাকিস্তান সামরিক সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এখানে বেসামরিক কোনো ব্যক্তির কোনো ধরনের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। কাজেই মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর আলবদরপ্রধান হওয়ার ও তার নেতৃত্বে..." কোনো হত্যাকাণ্ডের প্রশ্ন আসে না।

আলবদর কী ছিল, আমাদের জেনারেশনের কারো অজানা নয়। নতুন প্রজন্মের জন্য শুধু উল্লেখ করছি আলবদররা ছিল ডেথ স্কোয়াড। রাজাকার বাহিনীর পর পরই এটি গঠিত হয়। তবে রাজাকার অধ্যাদেশের মতো কোনো আইনগত বিধান এর ভিত্তি নয়। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনীর প্রেরণায় এরা সংগঠিত হয় এবং হানাদার বাহিনীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল গভীর। বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনে যানবাহন যুগিয়েছে হানাদার বাহিনী। রাও ফরমান আলীর নোটে আলবদরদের উল্লেখ আছে এবং নিজামী ছিলেন সারা পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর প্রধান।

সুতরাং কাদের মোল্লারা তা অস্বীকার করছেন কী ভাবে? নিজামী ১৪ নভেম্বর ১৯৭১ সালে এ বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে পরিষ্কারভাবে এ-সবের উল্লেখ আছে। আমার ভাষ্যেও তার উল্লেখ আছে। কাদের মোল্লা কেন তা উল্লেখ করলেন না?

নিজামী যে নিষ্পাপ তার উদাহরণ দিয়ে কাদের মোল্লা বলেছেন– ১৯৮৬, '৯৬ সালে নিজামী সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু কেউ তার বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগ তোলেনি। '৮৬ সালে দেশের শাসক ছিলেন এরশাদ যিনি রাজাকারদের পক্ষের লোক। '৯১ সালে বিএনপি জিতেছে। নিজামীও জিতেছে। এরশাদ ও বিএনপির ভয়ে কেউ এসব অভিযোগ ওঠায়নি। কিন্তু বিএনপির পতনের পর এলাকার মানুষ আলবদরভীতি থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে নিজামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে প্রচারপত্র বিলি করে। নতুন প্রজন্মের ভোটাররাও তাতে প্রভাবিত হন। ফলে ১৯৯৬ সালে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ জয়লাভ করেন। সুতরাং কাদের মোল্লার অভিযোগ এক্ষেত্রে সত্যি নয়। রাজাকারদের সঙ্গে আলবদরদের খানিকটা তফাত ছিল। রাজাকাররা সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করেছে। সংঘর্ষ হলে খুন হয়েছে, লুটপাট ও ধর্ষণ করেছে। অনেকে যুদ্ধকালীন দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়েও রাজাকার হয়েছে। কিন্তু আলবদরদের লক্ষ্য ছিল স্থির। পাকিস্তান ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব তারা স্বীকার করে না। প্রকৃতিতে তারা ছিল অতীব হিংস্র ও নিষ্ঠুর। তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে। কারণ, তারা অনুমান করেছিল, যে শাসন তারা করতে চায়, বুদ্ধিজীবীরা হয়ে উঠবে তার প্রধান প্রতিবন্ধক। সামনের নির্বাচনে চার দল ক্ষমতায় এলে, নিজামীর নেতৃত্বে যে '৭১-এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? কারণ, '৭১-এর জামায়াতের অবদান হত্যা, ধর্ষণ ও লুট; '৭১-এর পর অবদান রাজনীতিতে রগ কাটার প্রচলন– যা এক ধরনের হত্যা। আমাদের আরো মনে রাখা দরকার '৭১ সালে আলবদর ছাত্ররাই তাদের শিক্ষকদের নিয়ে হত্যা করেছিল।

নিজামী যদি আলবদর এবং আলবদরপ্রধান হয়ে না থাকেন তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে বাংলাদেশ হয় নি। আর প্রমাণ? বাস্তবে যা ঘটেছে তার আবার কী প্রমাণ দিতে হবে? আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে যে বাংলাদেশ হয় নি? আমাদের ভাষ্য যদি মিথ্যা হয়, তাহলে নিজামী আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করুক।

এখানে আরো উল্লেখ্য, আমার ভাষ্যে উল্লেখ করেছিলাম, নিজামী বিএনপিকে

ইসলামবিরোধী, দুর্নীতিবাজ, ফ্যাসিবাদী দল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো ঘোষণা করেছিলেন, "বিএনপি সরকার ও ছাত্রদল কসাইয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।" কাদের মোল্লা এসবের কোনো প্রতিবাদ করেন নি। তাহলে এসব সত্যি? সুতরাং আমাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কসাই ও রগ কাটাদের দল? বাংলাদেশের ভবিষ্যত কী অনুধাবন করতে পারছেন, প্রিয় পাঠকবৃন্দ?

৮.১২.২০০০

গিকা চৌ এটা কী বললেন!

গিয়াস কামাল চৌধুরী অনেকদিন পর মুখ খুলছেন। অনেকের ধারণা, তিনি মুখ খুললেই একটা না একটা ঘটনা ঘটে যায়। অবশ্য কথাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তিনি মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ এ-কারণে যে, বিএনপি 'থিংক ট্যাঙ্ক' কী চিন্তাভাবনা করছে, গত শুক্রবার খেলাফত মজলিশের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তিনি তা প্রকাশ করেছেন। পরদিন শতনাগরিক কমিটির বুদ্ধিজীবীরাও প্রস্ফুটিতে হয়ে তাঁদের দলের চরিত্রটি স্পষ্ট করে তুলেছেন। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই।

গি. কা. চৌধুরী বলেছেন, "পৃথিবীর কোথাও মুসলমানদের পরাজয়ের চিহ্ন নেই। ছিল শুধু এই দেশে। সেই চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য রাষ্ট্রপতি জিয়া এখানে শিশু পার্ক তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন।" (যুগান্তর, ৯.১২)

এটি যে পিলে চমকানো কোনো তথ্য তা নয়। জিয়া যখন এখানে শিশু পার্ক করেন তখনই এই প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু সেনা সামন্ত নিয়ে তখন তিনি ক্ষমতায়, এসব প্রশ্ন ওঠানোর সাহস কারো হয়নি। আরেকটি বিষয়, সমাজের এটা বড় অংশ এ ধরনের ধারণায় বিশ্বাস করে নি। কারণ জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে একটি সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। তাঁরা কেউ তখন উল্লেখ করেন নি, শিশু পার্ক নির্মাণ এখানে জরুরি হয়ে পড়ল, বিজয়স্তম্ভ নয় কেন?

কয়েক বছর আগে শেখ হাসিনার উদ্যোগে যখন স্বাধীনতাস্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে, তখন এর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এক অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় এ প্রসঙ্গ উঠেছিল। শুধু তাই নয়, বিজয়স্তম্ভের পাশে এ ধরনের শিশু পার্ক হয় না। আর নিয়াজীর আত্মসমর্পণের জায়গাটি বোঝা যায় জোর করে পার্কের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যার দরকার ছিল না। এ কারণে প্রস্তাব করা হয়েছিল, আরো বড় জায়গায় আরো আধুনিক শিশু পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হোক। শেখ হাসিনা রাজি হন নি। যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, এক প্রেসিডেন্ট তা নির্মাণ করেছেন। সেটি থাকুক। বিসদৃশ শিশু পার্ক হয়ে গেল। আজ গি. কা. শিশু পার্কটির জন্মরহস্য উন্মোচন করলেন।

গি. কা. আরো বলেছেন, "জিয়াউর রহমান চান নি স্বাধীন বাংলাদেশে একজন মুসলমানের পরাজয়ের চিহ্ন থাকুক। সে জন্য পাকিস্তানী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়াজী যে স্থানে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন সেখানে শিশু পার্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, নিয়াজী একজন মুসলমান।"

আগে অনেকে বলেছেন। লিখে ইঙ্গিত করেছেন যে, বাধ্য হয়ে জিয়াউর রহমান

মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। ২৫ মার্চ রাতেও তো তিনি সোয়াত জাহাজের দিকে যাচ্ছিলেন অস্ত্র নামাতে। আর পাকিরা তাঁকে বিশ্বাস করত দেখেই তো সে দায়িত্ব দিয়েছিল। তাঁর ওপরঅলা বাঙালিদের তো আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জনতার বাঁধার সম্মুখীন হয়ে তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। এসব বিশ্বাস করি নি। কারণ ন'মাস তো তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই ছিলেন। কিন্তু গি. কা. চৌধুরীর কথা শুনে মনে হচ্ছে, সত্যিই তো পাকিদের আস্থাভাজন না হলে ঐ সময় কোনো বাঙালি অফিসারকে অস্ত্র খালাসের জন্য পাঠানো হতে পারে, বিশেষ করে যে অস্ত্র ব্যবহৃত হবে বাঙালি হত্যায়। বোঝা যাচ্ছে, বাধ্য হয়েই যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সাবেক কমান্ডারের অবমাননা তার ভালো লাগে নি। তাই সেই স্মৃতিচিহ্নটি মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। হায়, কতভাবেই না আমরা প্রতারিত হই। গি. কা. চৌ. এটাই বলতে চেয়েছেন জিয়াউর রহমান পাকিদের হয়ে কাজ করেছেন বা এজেন্ট হিসেবেই যুদ্ধে গিয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে, না হলে ক্ষমতায় গিয়েই কেন তিনি প্রথম জামায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা বাতিল করলেন, কেন আলবদর ও রাজাকারদের মন্ত্রী করলেন, আর কেনইবা সংবিধানের মূলনীতি পাল্টালেন?

গি. কা ঘোষণা করেছেন, "এটাই [অর্থাৎ পাকিস্তান তত্ত্ব] বিএনপির মূল অন্তর্নিহিত শক্তি। এ জন্যই বিএনপি তিনবার নির্বাচিত হতে পেরেছিল।" প্রথম বাক্যটির ব্যাপারে এখন আর আমরা দ্বিমত পোষণ করব না। দ্বিতীয় বাক্যটিতে একটু ঝামেলা আছে। প্রথমবার বন্দুকের জোরে ক্ষমতা করায়ত্ত করা হয়েছে, দ্বিতীয়বার ঐ বন্দুক পাশে রেখেই ক্ষমতা পাওয়া গেছে। তৃতীয়বার বিএনপি জিতেছে যদিও লাহোরের 'ফ্রাইডে টাইমস'-এর খালেদ আহমদ তাঁর পত্রিকায় লিখেছিলেন, নির্বাচনের ঠিক আগে নাকি সেনাপ্রধান ঢাকা আসেন এবং বিএনপি যাতে ক্ষমতায় যায় সে জন্য ১০ কোটি টাকা হস্তান্তর করেন সে সময়ের ক্ষমতাধর একজনের কাছে। খালেদ ব্যক্তিটির পদমর্যাদা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি তা থেকে বিরত থাকলাম এ কারণে নয় যে তিনি এখন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, খালেদ কোন প্রমাণের ভিত্তিতে (নিশ্চয় প্রমাণ ছাড়া এমন কথা লেখার সাহস হবে না, যে দেশের ওপরে আল্লাহ, নিচে মিলিটারি) তা লিখেছেন তা আমি জিজ্ঞাসা করি নি। সরকার ইচ্ছা করলে খোঁজখবর করতে পারেন।

গি. কা. চৌধুরী আরো লিখেছেন, "পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে।" এ বক্তব্য কিছু নয়। রাজাকারী চিন্তার ধারকদের এটাই থিম সং। তিনি আরো বলেছেন, "ভাষা আন্দোলনের প্রয়োজন হতো না। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বুঝিয়ে বললেই হতো।" মনে হচ্ছে, গি. কা. র তুলনায় জিন্নাহ নেহায়েত বালক ছিলেন। একুশে সম্পর্কে হীন উক্তি বা জিন্নাহ সম্পর্কে মন্তব্যে ভাববেন না যে, বছর কয়েক আগে মস্তিষ্কের প্রবল রক্তক্ষরণে যে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন তার রেশ রয়ে গেছে। না, তা নেই। একুশে পদকটি তিনি যত্ন করেই রেখেছেন, টাকাটিও। তা প্রত্যার্পণ করেন নি।

এতদিন জানতাম, ডিসেম্বর এলে জামায়াতীদের মনস্তাপ হয়, পাগল পাগল লাগে। কেন? তা বোঝা দুষ্কর নয়। গত ত্রিশ বছর চেষ্টাচরিত্র করেও বাংলাদেশকে পাকিস্তান

করা যাচ্ছে না। এটি কী কম দুঃখ? জামায়াতের সমান্তরালে বিএনপি ও জাপা এরশাদ পাকি চর্চা শুরু করেছিল। কিন্তু তবুও জামায়াত থেকে তাদের খানিকটা পার্থক্য করা হতো। কারণ দু'দলে এমন অনেকে ছিলেন এবং আছেন, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু গত দু'মাসে, বিশেষ করে ডিসেম্বরে এমন সব ঘটনা ঘটছে যাতে মনে হচ্ছে, এই তিনটি দলের আলাদা অস্তিত্বের কোনো দরকার নেই। দলপতিদের চেয়ে তাঁদের সমর্থক বুদ্ধিজীবীরাই তা বলছেন।

গি. কা. র উক্তি, আলবদর নিজামীর বিজয়ের মাসে আমীরত্ব গ্রহণ ছাড়া এ মাসে পাকি রাজা বাংলাদেশ সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি করার পর বিএনপি সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ও এসব দলের মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ নির্বাক ছিলেন। এখন বোঝা যাচ্ছে, পাকি সেনাপতির মৃত্যু হলে কেন বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়েও শোকবার্তা পাঠান, যা বিশ্বের আর কোনো সরকারপ্রধান পাঠান নি। কেন আলবদর প্রধান নিজামীকে সেকেন্ড ইন কমান্ড করেন এবং ব্যাক হিসাবে রাখেন দেশের দু'নম্বর জেলখাটা প্রেসিডেন্ট নিশান ই হায়দার এরশাদকে। যদিও এরশাদ বলেছিলেন, "খালেদা জিয়া আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল।" [ইত্তেফাক, ১৭.১.৯৭]

এখন আর এগুলোকে পাগলামি হিসেবে গ্রহণ করার সময় নেই। বিএনপির থিঙ্ক ট্যাঙ্কের একজন, ঢাবির একজন অধ্যাপক আফতাব আহমদ গত পরশু এক সভায় উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন, "জাতীয় সঙ্গীত কি ঐশীবাণী যে পাল্টানো যাবে না।" [জনকণ্ঠ ১০.১২] আমরা জানি, কোরান ছাড়া সবকিছুই পাল্টানো যায়, প্রয়োজনে পিতামাতাও। এটা যার যার অভিরুচি।

তিনি আরো বলেছেন, "হিন্দু রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত।" তিনি ঢাবির অধ্যাপক, কিছু বলতেও ভয় করে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই পদাধিকারবলে পণ্ডিত এবং বুদ্ধিজীবী। তা রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন না, ছিলেন ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মরা হিন্দু ধর্মকে অস্বীকার করে বেরিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা নিরাকার ঈশ্বর নিয়ে।

মানুষ চেয়েছিল, বাংলাদেশ হয়েছিল। আফতাবরা নয়, মানুষ চাইলে জাতীয় সঙ্গীত কেন দেশও বদলাবে। 'পাক সরজেমিন' এখনও পাকিদের জাতীয় সঙ্গীত। মাস কয়েক আগে তিনি লিখেছিলেন, '৪৭-এর স্পিরিটই ঠিক। 'পাক সরজেমিন শাদ বাদ'ও ঠিক। এটি হরদম তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে গাইতে পারেন। এতে যদি তার "অভিপ্রায়" "অনুভূতি" ও "আত্মমর্যাদা" প্রকাশ পায় মন্দ কী!

সেই সভায় বিএনপির চিন্তা কলসের আরেকজন অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ বলেছেন, "না হয় ধরে নিলাম, বেগম খালেদা জিয়া লেখাপড়া একটু কম জানেন। কিন্তু সেখানে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মতো ব্যক্তি আছেন, যিনি জীবনে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেননি। সাইফুর রহমানের মতো বিশ্বখ্যাত এ্যাকাউন্ট্যান্ট রয়েছেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ও খন্দাকর মাহবুবউদ্দিন আহমেদের মতো খ্যাতিমান আইনজীবীরা আছেন। এ রকম একটি টিম থাকতে ইরফান রাজার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে তিনদিন লেগে গেল! এটা বিস্ময়কর। বিএনপির জন্য প্রতিবাদ করা তো সহজ ছিল।" বেগম জিয়া পড়াশোনা কম

জানেন কী বেশি জানেন তা নিয়ে এ-ধরনের হীন প্রশ্ন করব না কারণ, বিদ্বান নই যে বিদ্যার বড়াই করব। তবে এটুক বলব, গত ১৫ বছর রাস্তায় রাস্তায় বেগম জিয়াকে মিছিল করতে দেখেছি [এরশাদের সময়], নির্যাতিত হতেও দেখেছি। তখন এসব শতনাগরিকের সদস্যকে দেখি নি। হতে পারে তা ভুল রাজনীতি, যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি। না হলে যে বেগম জিয়া বলেছিলেন, "প্রেসিডেন্ট এরশাদ মসজিদে দাঁড়াইয়া অসত্য কথা বলিয়াছেন।" (ইত্তেফাক, ৬.৩.৮৮) তাঁর মুক্তির জন্য এখন কেন ঝাপাইয়া পড়িতেছেন? আরামকেদারায় বসে যে অধ্যাপক ছবক দিচ্ছেন, তিনি কি কনফিউজড অধ্যাপক? তিনি জানেন না, বিএনপির পক্ষে পাকিদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া সম্ভব না। যাদের নাম তিনি বলেছেন তারা ব্রিলিয়ান্ট বা বিখ্যাত হলে কী হবে, বেগম জিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ আছে? সে মুরোদ কি ড. মাহবুরেরও আছে?

একই সভায় অধ্যাপক আফতাব আহমদও ছিলেন। অধ্যাপক আ. আ. চিৎকার করে বলেছেন, "পাড়ায় পাড়ায় মস্তানী করেছে বা দলীয় টিকিটে নির্বাচন করেছে এমন লোক কিভাবে বিচারপতি হয়! ইরফান যা করেছেন তা ভারতীয় পঞ্চম বাহিনীর হয়ে করেছেন... মুক্তিযুদ্ধের ৩০ বছর পর স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ বলে কিছু নেই।" [জনকণ্ঠ ১০.১২] হ্যাঁ, এ রকম লোককে বিচারপতি করা হয়েছিল এবং তাকে তার কর্মের ফলও ভোগ করতে হয়েছে। তুলনা নয়। কিন্তু বিএনপি আমলে এরকম একজনকে করা হয়েছিল এবং প্রায় একই রকমের কাণ্ড ঘটানোর পরও তার চাকরি যায় নি। মানুষ কতটা বিকারগ্রস্ত হলে বলতে পারে ইরফান ভারতীয়। আওয়ামী লীগের বললেও চলত। আর স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ কিছু নেই। এটা নতুন কোনো স্ট্যান্ড নয়। জামায়াত গত দু'দশক তা বলছে।

এ ডিসেম্বরে মনে হয় এধরনের আরো বক্তব্য আসবে বিভিন্ন দিক থেকে। পরিকল্পিত ছক কেটেই তা করা হচ্ছে। নিজামী গতকালও বলেছেন, আলবদরের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। নিজামী এ ধরনের প্রকাশ্য মিথ্যাচার করতে পারছেন এ কারণে যে, পাকিপন্থী আরো দু'টো দলও এখন তাঁর কব্জায়। ঢাকা আলবদর ইউনিটের প্রধানকে করা হয়েছে জামায়াতের মহাসচিব। এরা ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই নিজেদের উন্মোচন করেছে। ক্ষমতায় গেলে, বলার অপেক্ষা রাখে না ১৯৭১-এর সব অর্জন নস্যাৎ করে ১৯৪৭ ফিরিয়ে আনা হবে। এখন বিভিন্ন ব্যক্তি, গ্রুপ, দলকেই ঠিক করতে হবে এদের কি প্রতিরোধ করা হবে? না, ১৯৪৭-এর দিকে যাত্রা করতে হবে?

১১.১২.২০০০

আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঁচব তো?

পত্রিকায় মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) দেখলাম, জামায়াতের নেতা কাদের মোল্লা ইফতার পার্টিতে বেগম জিয়ার সঙ্গে রসিকতা করছেন। বেগম জিয়া, আপনার কি মনে পড়ে এই কাদের মোল্লা এক সময় বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গঙ্গার পানি, তিনবিঘা, তালপট্টি সমস্যার সমাধান না করে খালি হাতে ভারত থেকে ফিরে এলে বারো কোটি মানুষ এই সফরের খরচ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেবে? "এসব সমস্যার সমাধান না করলে এই সরকারকে ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হবে না।" (বাংলার বাণী ১৫.৫.৯২) বেগম জিয়া খালি হাতেই ফিরেছেন। কাদের মোল্লার রসিকতার সময় আপনাকে ঘিরে থাকা চারপাশের মোসাহেবদের কি মনে পড়েছিল, এই কাদের মোল্লা তারও চার বছর পর বলেছিল, "বিএনপি সরকার মিথ্যাবাদী, জনগণের সম্পদ হরণকারী, নির্লজ্জ সরকার।" (সংগ্রাম ২৬.২.৯৬) বিএনপি সরকারের "জন্মদাতা গোলাম আযম" (মিল্লাত ১৭.২.৯৩) এ কথা বলতেও তারা ভোলেনি।

আরো আছে লিখলাম না। মোসাহেবদের কোনো কথা মনে থাকে না। আপনি বিএনপি প্রধান না থাকলে, তখন যে থাকবে তারা তার মোসাহেবী করবে এবং বলবে, আরে বেগম জিয়া, তিনি তো লেখাপাড়া জানতেন না। যা এখনই অনেকে বলছে। বিএনপির চিন্তাকলসের লোকজনই বলছে। আমরা অনেকে আপনার সমালোচনা করি বটে, কিন্তু এ-ধরনের চরিত্রহননকারী কথা বলি না। কারণ, জননেতাকে জননেতা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। তাঁর পিএইডি আছে কি না সেটা বড় গুণ নয়। তিনি জনগণের জন্য কী করছেন সেটিই মুখ্য। পিএইচডি অনেক সময় শিং হয়ে যায়। যেমন ঢাবির অধ্যাপক– অধ্যাপক আ. আ. বা আফতাব আহমদ। শিং হয়ে গেলে সবাইকে গুঁতোতে চায়। সমস্যা হচ্ছে, যুদ্ধাপরাধী ও পাকিদের উচ্ছিষ্টভোগী মোল্লাদের আচরণ এ রকমই হবে। তারা আপনাকে 'মিথ্যাবাদী' বলে আপনার ইফতারী খেতেই যাবে। তাই বলে আপনারও? নাকি এটাই ঠিক যে জামায়াত যা বলেছে অর্থাৎ 'গোলাম আযম বিএনপির জন্মদাতা' তা-ই ঠিক। না হলে তাদের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করে ইফতার করতে তো রুচিতে বাধার কথা!

যুদ্ধাপরাধী মোল্লার কথা উঠলই যখন, তখন বলি, তাঁর আমীরের হয়ে কয়েকদিন আগে পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠিয়ে তিনি বলেছেন, নয়া আর্মির নিজামী আলবদর ছিলেন না। ধর্মের নামে রাজনীতি করলে কি অনবরত মিথ্যা বলতে হয়? ইসলাম আর মিথ্যা সংমিশ্রণ জামায়াতের পক্ষেই একমাত্র করা সম্ভব। নিজামী '৭১-এ আলবদর না থাকলে, বলতে হয় সে সময় জামায়াত বলে কোনো দল ছিল না। সুতরাং গোলাম আযম নামে

তার কোনো আমীরও ছিল না। নিজামীদের কসাইয়ের চকচকে ছুরিতে এই ডিসেম্বরে অগণিত বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছেন। ২৯ বছর আগে, এ দিনে নিজামীর নির্দেশে তার সাঙ্গপাঙ্গরা আমার শিক্ষকদের বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে নিয়েছিল। ছাত্র বলে তারা নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল। মিথ্যা বলা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জামায়াত কর্মীদের কি প্রথম গুণ হতে হবে মিথ্যাবাদিতা? দ্বিতীয় গুণ কি মোনাফেকী? কারণ, বিএনপিকে ইসলামবিরোধী ফতোয়া দিয়ে আজ মাহে রমজানের সময় তারা তাদের সঙ্গে না হলে ইফতার করে কীভাবে? যাক, নিজামীরা আমার শিক্ষক ও আরো অগণিত বুদ্ধিজীবীকে রায়েরবাজার আর মিরপুরে কুচি কুচি করে কেটেছে। নিজামী সেটি কীভাবে ভুলবেন? ভুলতে পারেন নি দেখেই সে সময়ে তাঁর ডান হাত আলী আহসান মুজাহিদকে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল করেছেন। কে এই মুজাহিদ? ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন নিজামীর ডান হাত। ঢাকার আলবদর প্রধান। লক্ষণীয়, পাকি গণহত্যার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তখন, তারাই এখন জামায়াতের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে। যুদ্ধাপরাধী কামরুজ্জামান, সাঈদী, কাদের মোল্লা প্রমুখ।

এই প্রজন্মের কাছে গো. আযম বা আলবদর নিজামী বা রাজাকার সাঈদীর মতো মুজাহিদ ততটা পরিচিত নন। কিন্তু ভুললে চলবে না, ঢাকা শহরে আলবদররা যত খুন করেছে তার সব দায়িত্ব ঢাকার আলবদরপ্রধান হিসেবে তাঁর ওপরই বর্তায়। এই মুজাহিদ ১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তানে দেশপ্রেমিক যুবকেরা ভারতীয় চরদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য সেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য হিসাবে জাতির সেবা করছে।" জাতির এই সেবা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষদের জবেহ করা। তরুণীদের ধর্ষণ করা। ঐ একই সময় মুজাহিদ (৭ নভেম্বর) বলেছিলেন, "এ দেশের তৌহিদবাদী মানুষ মানবতার দুশমন, শান্তির দুশমন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। দুনিয়ার মানচিত্র থেকে হিন্দুস্তানের অস্তিত্বকে মুছে না ফেলা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামের বিরাম নেই।" শুধু তাই নয়–

১. 'আগামীকাল থেকে কোনো লাইব্রেরি হিন্দুদের ও হিন্দুস্তানী দালালদের বইপুস্তক কেনাবেচা করতে পারবে না।'

২. 'ভারতীয় দালালদের মুখ আমরা চিনি। জনগণকে এদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে।'

৩. 'দিল্লীর বুকেই বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন করতে হবে।'

তারা হিন্দুস্তানকে নিশ্চিহ্ন করে দিক আমাদের কিছু আসে যায় না। আমরা আতঙ্কিত তাদের জোট বেঁধে পরিকল্পিতভাবে ছুরি হাতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। এ ডিসেম্বরের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং আগে এদের যেসব মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি তা দিয়ে তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন; তা হলে দেখবেন রাতে আর ঘুম আসবে না।

এখন আর আমাদের বলার কিছু নেই। বিএনপির চিন্তাবিদ সাংবাদিক গি. কা. চৌ. ঘোষণা করেছেন, জিয়াউর রহমান পাকিদের অনুগত ছিলেন। এতটাই অনুগত যে,

নিয়াজীর অপমান মুছে ফেলার জন্য শিশুপার্ক করেছিলেন। জনাব মান্নান ভূঁইয়া তাঁকে যাই বলুন না কেন, এই উক্তি আমাদের প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত করেছে। আজ অধ্যাপক আ. আ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত বদলানোর উপদেশ দেন। '৭১-এর এই সময় পাকিদের সহযোগী শিক্ষকরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-ধরনের আস্ফালন করেছে। শত রাজাকার কমিটি অনবরত রাজাকারী মতবাদ প্রচার করছে। পাকি কূটনীতিককে প্রত্যাহার করার পরও সে ঢাকায় রয়ে গেছে। পত্রিকায় পড়লাম, রাজাকারদের আওয়ামী লীগেও যোগ দেয়ানো হচ্ছে এবং এ সংবাদ বারংবার প্রচারিত হওয়ার পরও আওয়ামী নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ করেন নি। মনে হচ্ছে এ সরকার আস্ফালনকারী সরকার, কার্যকর নয়। অবস্থা অনেকটা ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের মতো। অবস্থা যেভাবে এগুচ্ছে তাতে বার বারই মনে হচ্ছে, আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঁচব তো! আজ বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবসে কেন যেন বার বার এ কথাই মনে হচ্ছে।

আমাদের শিক্ষকরা কেন শহীদ হয়েছিলেন? বা বুদ্ধিজীবীরা? বা অগণিত মানুষ? কারণ, তাঁরা কয়েকটি আদর্শের জন্য লড়েছিলেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কর্মক্ষেত্রে। সেগুলো হলো গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ন্যায়বিচার এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িকতা। অন্য কথায়, সিভিল সমাজ– যা ছিল সংবিধানের ভিত্তি। না, আমরা শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারি নি।

শহীদরা আমাদের ভবিষ্যত তৈরি করে দিয়েছিলেন। যে কারণে আমি আজ শিক্ষক আমরা শিক্ষকের জায়গায়, আমার বন্ধু ও অগ্রজেরা সচিব বা জেনারেল বা মন্ত্রী বা কোটিপতি। অন্যদিকে, আজ অধ্যাপক আ. আ. থেকে সাংবাদিক গি. কা. চৌধুরী, আলবদর নিজামী থেকে স্বৈরশাসক এরশাদ, এদের সব কর্মকাণ্ড বা দেশের অপমানকে মেনে নিয়েছি, নিচ্ছি। নিজেদের বর্তমান বিসর্জন দিতে রাজি না হওয়ায় আমরা মেনে নিয়েছি, সেসব অপমান, অংশগ্রহণ করেছি অপমানকারীদের কর্মকাণ্ডে। আমার শিক্ষকরা চর্চা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতির আর আমরা আপোসের আর ভয়ের। মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি ছিল বিজয়ীর। আর আমরা যা চর্চা করছি এখন তা পরাজিতের। আমরা নাকি করব বাংলাদেশ রাজাকারশূন্য? এই সংস্কৃতি দিয়ে? এখানেই আমার শহীদ শিক্ষকদের সঙ্গে আমার বা আমাদের অনেকে তফাৎ। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর সেই শহীদ শিক্ষক ও বন্ধুদের সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আমরা যারা সঙ্গী ছিলাম তাঁদের, তাঁরা সামান্য হয়ে পড়েছি, যতটা সামান্য ছিলাম তার চেয়েও বেশি।" এ কথা যে কত সত্য তা বুঝি যখন দেখি সামান্য রুটির টুকরোর জন্য পরিচিতদের হাহাকার। আওয়ামী লীগ এক সময় নমিত ভঙ্গি গ্রহণ করেছিল এই জামায়াতের প্রতি, আর জামায়াত তো বলে– বিএনপির জন্মদাতা তারাই। তা হলে এ দেশে খুনীরা আলবদররা কেন আস্ফালন করবে না? আজ ১৪ ডিসেম্বর মনে হলো, নিজ দেশেই আমরা উদ্বাস্তু, যারা এখনো মনে করি দেশে চর্চা হওয়া উচিত মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতির। তবে দেখা যাক তার আগে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি কি না আমি বা আমাদের অনেকে!

১৪.১২.২০০০

রাজাকে রাজার মতো ঢাকায় থাকতে দেয়া যায় না

পাকি ডেপুটি হাইকমিশনার এখনো অনুধাবন করতে পারে নি যে, ত্রিশ বছর আগে পাকিদের বিশেষ করে পাকি জেনারেলদের মুখে লাথি মেরে বাঙালিরা স্বাধীন হয়ে গেছে। অবশ্য, এই ডেপুটি ইরফান রাজার খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। সে দেখেছে, এ দেশে তো পাকি আবহ আছেই, তা'হলে পাকি জেনারেলরা ১৯৭১ সাল সম্পর্কে যা বলে তা বলতে দোষ কী? সে তো এক জেনারেলেরই প্রতিনিধিত্ব করছে। ইরফান কী দেখে? ইরফান দেখেছে, তাদের এক সময়ের জিগরী দোস্ত গোলাম আযম প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়িয়ে রাজনীতি করে, ১৯৭১-কে স্বীকারই করে না। আরেক দোস্ত, যে বাঙালিকে একমাত্র নিশান-ই হায়দার [নিশানই বরদার] দেয়া হয়েছিল সেই অব. জে. এরশাদও একই কাজ করে। এরা আবার রাজনৈতিক জোট বেঁধেছে আরেকজনের সঙ্গে যিনি পাকি সেনাপতি মারা যাবার পরই শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী অন্য দেশের সেনাপতির মৃত্যুতে শোকবার্তা পাঠান নি। পাঠনো যায় না। হ্যাঁ, সেনাপতিটি যদি আইজেনহাওয়ারের মতো কেউ হতেন তা হলেও মানা যেত। অবশ্য পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বন্ধু হলে অন্য কথা। বেগম জিয়া আবার যে পত্রিকাটিকে নিজের বলে মনে করেন সে পত্রিকার মালিক ছিল পাকিদের ভাড়াটে খুনী। ১৯৭১ সালে ভাড়াটে খুনীদের যে বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল তার প্রধান এখন আবার জামায়াত নামক রাজনৈতিক দলের আমীর। রাজা তো এগুলোই দেখেছে এবং আরো দেখেছে এদের জনসভায় বেশ লোক হয়। ইরফান রাজা আরো শুনেছে, পাকিদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা হলে, পাকি ভাবাপন্ন বাবা-মার কন্যারা গালে পাকি পতাকার ছবি এঁকে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে এসে উল্লম্ফন করে। তাই বোধ হয় 'বিজের' সেমিনারে সাহস করে সে কিছু বক্তব্য রেখেছে যা অধিকাংশ পাকিস্তানিই মনে করে। রাজা কী বলেছে–

১. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ হয়নি। হয়েছে ২৩ হাজার। হামুদুর রহমান কমিশনও তাই বলেছে।

২. গণহত্যার জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন হলে সে পাল্টা প্রশ্ন করেছে, "কিসের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে? ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের অর্ধাংশ হারানোর জন্য?"

৩. এই সমস্ত 'দুষ্কর্ম' শুরু করেছিল আওয়ামী লীগ। হামুদুর কমিশনের মতও তাই।

যদি এ দেশটিতে কিছু রাজনৈতিক দল ও পত্রিকা পাকি আবহ সৃষ্টি না করত তাহলে কি ইরফান রাজা প্রকাশ্যে এ রকম বিবৃতি দিতে সাহস করত? বা এ-ধরনের বিবৃতি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, কূটনৈতিক অব্যাহতি থাকলেও? এ মন্তব্য শুনে

আপনারা অনেকে ক্ষুণ্ন হতে পারেন। কিন্তু, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। তারপর আপনারাই বিচার করবেন, এ দেশে পাকি মনোভাবাপন্ন দল ও পত্রিকা আছে কিনা এবং কেন ইরফান রাজারা এ-ধরনের বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পায়।

১.ক. এ ঘটনার কথা শুনে দৈনিক যুগান্তর বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করেছে। অধিকাংশ রাজনীতিবিদ ক্রুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। হাসানুল হক ইনু রাজার "এ আচরণের জন্য পাকিস্তান নিঃশর্ত ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত দূতাবাসের সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে" বলেছেন। এমনকি জাপার ফিরোজ রশীদ পর্যন্ত রাজার বক্তব্যকে "অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক" বলেছেন। কিন্তু শুনুন, মহানগর বিএনপি সভাপতি সাদেক হোসেন খোকা বলেন, "আগে আমরা পাকিস্তানী কূটনীতিকের বক্তব্য বিস্তারিত জানি, তারপর নিশ্চয় আমাদের প্রতিক্রিয়া জানাব।"

খ. "জামায়াতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক কাদের মোল্লা বলেন, "ঢাকায় পাকিস্তানী কূটনীতিক কি বলেছেন, আগে তা জানি, তারপর মন্তব্য করব, এখন এর বেশি বলার নেই। (যুগান্তর, ২৮-১১)।

ঘটনাটি সবাইকে (সাংবাদিকরা) জানিয়ে মন্তব্য চাওয়া হয়েছে। শুধু দু'টি দলের রাজনীতিবিদের বক্তব্য ভিন্ন। পাকিদের ঔদ্ধত্য তারা দেখেও দেখেন না। কী বুঝলেন?

২. বাংলাদেশের সব পত্রিকা বিষয়টি প্রথম পাতার শিরোনাম করেছে, করারই কথা। কারণ, বাংলাদেশে বসে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনীতিবিদ বাঙালিদের চপেটাঘাত করে যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম। কিন্তু, সংবাদটি সেভাবে ছাপেনি, শুধু একটি পত্রিকা। অনেকেই পত্রিকাটিকে আইএসআইয়ের মুখপত্র বলে মনে করে এবং এ ঘটনাটি না ছাপাকে তার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরছে। আমরা বলি, এভাবে কোনো সংবাদপত্রকে কোনো গুপ্তচর সংস্থার কণ্ঠ বলা উচিত নয়। অনেকের পাকিস্তান প্রীতি থাকতে পারে, অনেকে পাকিদের বুট জুতা বুকে তুলে রেখে আনন্দ পেতে পারে, সেজন্য তাকে আইএসআই কণ্ঠ বলতে হবে? হ্যাঁ, সেই ইনকিলাবে অনেক খুঁজে পেতে খবরটি পাওয়া গেল। কিন্তু কী আছে তাতে? এ পত্রিকার খবরের ছোট শিরোনাম- "পাক হাইকমিশনারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব" কেন? তাদের সূত্র অনুসারে একটি "সেমিনারে একজন পাকিস্তানী কূটনীতিকের মন্তব্যের ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছে। সূত্র পাকিস্তানী কূটনীতিককে পররাষ্ট্র মন্ত্রণলয়ের তলব করাকে 'আশু ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া' বলে উল্লেখ করেছে।" পত্রিকাটি আরো লিখেছে, "তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নিহতদের সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যুদ্ধে মাত্র ২৬ হাজার বাংলাদেশী নিহত হয়েছিল।" খবর এখানেই শেষ। আইনত সব ঠিক আছে। কিন্তু খবরটি পড়ে ধারণা হবে, কী এক বক্তব্যের জন্য মন্ত্রণালয় এত কঠোর হয়েছে। ১৯৭১-এ তো ২৬ হাজারই মারা গেছে। দেশোদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত পত্রিকাটি এখনো এ রকম খবর প্রকাশ করছে এবং এখনো ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা না হয় মুক্তিযোদ্ধা নই কিন্তু দেশে তো শুনেছি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বলে একটি বিরাট সংগঠন আছে!

সুতরাং ইরফান রাজা কা কেয়া কসুর? বদরুদ্দীন উমর যথার্থই বলেছেন, “পাকিস্তানী কূটনীতিক এ-ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য রাখার সাহস কোথেকে পেলেন। এই যে এত বড় একটা অসত্য ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি করা হলো এ জন্য তো সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। প্রতিক্রিয়া হবে সরকার ও কিছু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে এবং ক'দিন বাদে সেটাও থাকবে না। সুতরাং, আজ পাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশনার যে একটা বলার সুযোগ পেলেন এ জন্য দায়ী কে? দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি প্রকৃত প্রতিরোধ থাকত তবে তিনি এমন কথা বলারই সাহস পেতেন না। তাই বলছি, আজ দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতি তাদেরকে এ-ধরনের বক্তব্য রাখতে উৎসাহিত করছে।” (যুগান্তর-২৮-১১)।

কারা এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে বা করছে তার উদাহরণ তো তুলে ধরেছি এবং বর্তমান শাসক দলও যে এদের এক সময় আস্কারা দেয়নি তা না উল্লেখ করলে সত্যের অপলাপ হবে।

ইরফান রাজা শুধু মিথ্যা বলে নি, ইতিহাসের সত্যকে চ্যালেঞ্জ করার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। শাসক আওয়ামী লীগকে ১৯৭১-এর জন্য দায়ী করেছে। ১৯৭১ সালের পরাজিত পাকি জেনারেলদের উত্তরাধিকার বহন করে ২০০০ সালে কোনো পাকি কূটনীতিবিদ ঢাকায় থাকতে পারে না। দেশে পাকি আবহ থাকতে পারে কিন্তু দেশে তো একটি সরকার আছে। এ সরকার যে দল গঠন করেছে সে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাদেরও অভিযুক্ত করার সাহস পাচ্ছে এই পাকি ডেপুটি। আমাদের মাঝে এখনো যদি স্বাধীনতার ইজ্জতবোধ খানিকটা অবশিষ্ট থাকে, এ সরকারের যদি মর্যাদাবোধের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে– তা হলে অবশ্য ইরফান রাজাকে আর রাজার মতো থাকতে দেয়া যায় না। দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাকে অবশ্যই বহিষ্কার করতে হবে। এতে চার দলের নেতৃবৃন্দ হয়ত দুঃখিত হবেন, ইনকিলাবের ‘পাঠক’রা হয়ত নিন্দা করবে, কিন্তু রাজামিয়াদের রাজত্ব যে নেই সেটা তো প্রমাণিত হবে।

২৯.১২.২০০০

রাষ্ট্র কি এক ব্যক্তির কাছে জিম্মি?

আমরা যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে। ফতোয়াবাজি সম্পর্কিত রায় প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লিখেছিলাম, এই রায়ে সাধারণ মানুষ খুশি হলেও খুশি হবে না বিভিন্ন চরের পীর ইনকিলাব ফ্রন্ট বা স্বঘোষিত কিছু 'ইসলামী বুদ্ধিজীবী'। গতকাল পত্রিকার সংবাদে জেনেছি, এই রায়কে সবাই যুগান্তকারী মনে করলেও মনে করে নি বিএনপির মুখপত্র হিসেবে পরিচিত, আলবদরের মালিকানায় পরিচালিত 'দৈনিক ইনকিলাব' ইসলামী ঐক্যজোটের দুই নেতা 'শায়খুল হাদিস' আজিজুল হক, 'মুফতি' ফজলুল হক আমিনী, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আলবদর প্রধান বর্তমান জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী ও কিছু 'ইসলামী চিন্তাবিদ'!

২ তারিখের সব পত্রিকা এই রায়ের বিষয়টিকে শিরোনাম করেছিল গুরুত্ব বিবেচনা করে। কিন্তু ইনকিলাবে অনেক কষ্টে খুঁজে-পেতে সংবাদটি বের করতে হয়েছে। কিন্তু গতকাল জনাব হক ও আমিনীর বক্তব্য 'ইনকিলাব' শিরোনাম হিসেবে এনেছে। এই উদাহরণটি দিলাম ইসলামের 'স্বঘোষিত' নিশান খবরদারদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাবার জন্য।

দৈনিক জনকণ্ঠ-এর সংবাদে জানা যায়, মুফতি আমিনী দুই বিচারপতিকে মুরতাদ ঘোষণা করেছেন। ফতোয়াবাজ এই 'মুফতি' এর আগে অনেককে মুরতাদ ঘোষণা করেছেন, প্রশিকার ড. কাজী ফারুককে হত্যার ফতোয়া দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, বিচারপতির রায়ের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের সবার আছে কিন্তু বিচারপতিকে মুরতাদ হিসেবে ফতোয়া দেয়ার অধিকার এই ব্যক্তিটির বা অন্য কারো আছে কি না? না থাকলে, আদালত অবমাননার দায়ে হাইকোর্ট তাঁকে সমন জারি করবে কি না? বা ৫০৮ ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে কি না? এটি দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আমরা দেখতে চাই, একটি ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রকে হুমকি দিয়ে জিম্মি রাখতে পারে কি না?

এ বিষয়ে আরো কিছু বলার আগে তাদের মুখোশটি উন্মোচন করা দরকার। এদের একজন 'শায়খুল হাদিস' আরেকজন 'মুফতি'। সমাজ তাঁদের কাছে ধর্ম বিষয়ক ব্যাখ্যার আশা করতে পারে বটে কিন্তু রাজনীতি! ধরে নিলাম, রাজনীতি তাঁরা করতে পারেন কিন্তু তাঁরা কোন ধরনের রাজনীতি করবেন? যেহেতু ইসলাম তাঁরা বিশ্বাস করেন সুতরাং তাঁদের কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে। তা হলে এবার দেখুন–

১৯৯৪ সালে 'শায়খুল হাদিস' বিএনপি'র বিরুদ্ধে বলেছিলেন "বিসমিল্লাহের নামে ক্ষমতায় এসে সরকার নাস্তিক মুরতাদদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে আর সন্ত্রাস দমন আইনে গ্রেফতার করছে ইসলামের পক্ষ শক্তিকে।" (দৈনিক সংগ্রাম, ১৩.৭.৯৪) তিনি আরো

বলেন, "মোনাফেক ধোকাবাজরা ক্ষমতা দখল করে বসে আছে।" (ভোরের কাগজ, ৬.৮.৯৪)।

আমিনী বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর "দেশে ইসলাম বিদ্বেষীরা যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।" [মিল্লাত, ৪,২,৯৩]।

তাঁর মতে "বিসমিল্লাহ বলে যে জাতি তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল আউয়ুবিল্লাহ বলে আবার তাদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত করবে।" [সংগ্রাম, ১০.৯.৯৫]। তিনি আরও বলেন, বিএনপি আমলে তাঁর মনে হয়েছে তারা 'ভারতের অঙ্গরাজ্যে বাস' করছেন। (সংগ্রাম, ১৭.৮.৯৪]।

ইনকিলাব লিখেছে, এঁরা হলেন ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ও মহাসচিব। এক সময় নারী নেতৃত্ব নাজায়েজ বলেও তাঁরা ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইসলামী ঐক্যজোট বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বে গঠিত জোটের অংশীদার। এখন প্রশ্ন, ইসলাম বিরোধী, মোনাফেক, ভারতের সেবাদাস হিসেবে যাঁদের তাঁরা ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আবার ঐক্য করেন কিভাবে? নারী নেতৃত্ব নাজায়েজ হলে বেগম জিয়ার সঙ্গে ইফতারিও বা সারেন কিভাবে? মোনাফেক তাহলে কে? আর ইসলামে মোনাফেকের স্থান কী? আসলে, ধর্মকে তারা ব্যবহার করেন রাজনীতির জন্য, স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যা এক ধরনের ব্যবসা।

এ দু'জন ও নিজামী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার ভাষা একই রকম। মনে হয় একই বক্তব্য কপি করে তারা দিয়েছেন। আমিনী বলছেন (বা অন্যরাও) "গ্রাম্য মাতব্বররা অসৎ উদ্দেশ্যে ভাড়াটে মুন্সীদের দিয়ে যেসব অনাচার করে তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।" (ইনকিলাব, ৩.১.২০০১) উত্তম। একথা গত এক দশক তাঁরা বলেন নি কেন যখন প্রায় ২৫০ নারীকে নিদারুণভাবে নির্যাতন করেছে ফতোয়াবাজরা। তাঁদের কি তখন মানবিক বিচার বুদ্ধি বলে কিছু ছিল না? তাঁরা বলেন নি কেন না, ঐসব গ্রাম্য মাতব্বর ও মুন্সীরা তাঁদের সহযোগী তাঁদের ক্ষমতার উৎস। তাদের ভোটে তাঁদের জীবন রাজনীতি সব নির্বাহ হয়। আমার–

৪.১.২০০১

নতুন ফতোয়া– বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ অবৈধ সন্তান!

রাজাকাররা আর কিছু বাকি রাখছে না। খুন জখম, লুট, ধর্ষণ, দেশদ্রোহিতা–অভিধানে এ রকম আর কোনো শব্দ নেই যা তারা করে নি। ইসলামের নামে রাজনীতিতো তাদের পেশাই। এখন, সবশেষে তারা আল্লাহকেও রাজনীতিতে টেনে এনেছে এবং এমন সব কথা বলে যে, ধর্মভীরু অনেক মুসলমান এসব কথা শুনলে কানে হাত দেবেন। আমার এ মন্তব্যের ভিত্তি দু'তিন দিন আগে রাজাকার ও ফতোয়াবাজ এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় খুন করার অভিযোগ রয়েছে যার বিরুদ্ধে, সেই দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর একটি বক্তৃতা। জামায়াতের প্রথম দু'জন আলবদর নেতার পর যার (সাঈদী) স্থান। রাজাকার সাঈদী সম্প্রতি পিরোজপুরে একটি বক্তৃতা দিয়েছে। এ বক্তৃতার সারমর্ম ছাপা হয়েছে শুধু একটি পত্রিকায় (দৈনিক সংবাদ ১৯.১.২০০১)। সে কারণে এখানে সংবাদাংশের প্রায় পুরোটাই বিবৃত করব।

১. সাঈদী বলেছে, "'৭৫ ও '৭১-এ পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলেছিলাম বলে ওরা আমাদের রাজাকার বলে। যারা আজ আমাদের রাজাকার বলে তারা পিতার অবৈধ সন্তান। বাংলাদেশের জনতার কাছে লৌহমানব আইয়ুব খানও হার মেনেছে। আর আওয়ামী লীগতো ছোট্ট এক মহিলার দল।"

আমরাও এতদিন বলে এসেছি জামায়াত পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলে। জামায়াতী নেতারা স্পষ্টভাবে তা কখনো স্বীকার করে নি। আজ রাজাকার সাঈদী স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে যে রাজাকারদের পার্টি জামায়াত পাকিদের পক্ষে। এখানে সাঈদী আরো স্পষ্টভাবে একটি কথা বলেছে, তা হলো ১৯৭৫ সালের ঘটনাও পাকিস্তানের পক্ষে ঘটানো হয়েছিল এবং '৭৫-এর পর সৃষ্ট বিএনপিও পাকিদের পাকজাত দল। সে কারণেই বেগম জিয়া তার একপাশে টেনে নিয়েছেন আলবদর প্রধান জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামীকে। রাজাকার সাঈদীর এই ভাষণের পর আরো পরিষ্কার হয়ে গেল বেগম জিয়া রাজাকার ও ফতোয়াবাজদের নিয়ে যে আঁতাত করেছেন তা মূলত পাকিদের পক্ষে এবং তাদের প্রধান কাজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিদের উৎখাত করা।

এখানেই যদি রাজাকার থামত তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু রাজাকার সাঈদী মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছে জারজ। ১৯৭১ সালে যারা পাকিদের পক্ষে ছিল তাদেরতো রাজাকারই বলে। এই শব্দ তাদেরই সৃষ্টি। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। ১৯৭১ সালে কিছু রাজাকার ছাড়া সবাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। তাহলে তারা সব অবৈধ বা জারজ সন্তান। তা জনাব আহাদ চৌধুরী কী বলেন? খালি একটা বিবৃতি দেবেন বোধ হয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের পক্ষ থেকে? জনাব মান্নান ভুঁইয়া ১৯৭১

সালে লড়াই করেছেন বাংলাদেশের পক্ষে, তিনিও অবৈধ সন্তান। ঠিক নাকি জনাব ভুঁইয়া? বেগম জিয়াতো নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মন্ত্রণালয় করবেন বলেছিলেন। প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। এখন দেখছি তিনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিলেন। যা হোক, চার দলের অন্যতম শরিক আজ স্পষ্ট বলে দিয়েছে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ জারজ।

বাংলাদেশের যে জনতার কাছে আইয়ুব খান হার মেনেছে সে জনতার নেতৃত্বে সাঈদীরা ছিল না। ছিলেন মওলানা ভাসানী আর আওয়ামী লীগ। ঐ সময়ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছিলেন একজন মহিলা। রাজাকার সাঈদী, শেখ হাসিনাতো 'ছোট্ট মহিলা', বেগম জিয়া কি খুব বড়? বাংলাদেশ নারাজ পার্টি বা বিএনপি কি বড় মহিলার দল? জামায়াত নারী নেতৃত্ব মানে না। তাহলে সাঈদী-নিজামীরা বেগম জিয়ার পাশ ছেড়ে নড়ে না কেন? তাদের কারণে তো ভণ্ডামী শব্দের অর্থ খোঁজার জন্য তার অভিধানও দেখতে হয় না।

২. সাঈদী বলেছে "আজ হাইকোর্টেও সরকারের পোষ্য দালালে ভরপুর। তা না হলে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়া হিল্লাকে এক শ্রেণীর বিচারক অবৈধ বলে রায় দিয়েছে। একজন বিচারক হিন্দুস্থানের দালাল ছাড়া আর কিছুই নয়।" হাইকোর্টের রায় মনমতো না হলে বিচারকরাও সরকারের দালাল। এর অর্থ সব রায় তাদের মনমতো হতে হবে। ফতোয়া ও হিল্লা বিয়ে সম্পর্কে সাঈদী যা বলেছে আলেমরা ইতোমধ্যে তার বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। এখন আশা করি সাঈদীর এই ফতোয়া সম্পর্কে তারাই মতামত দেবেন। হাইকোর্টের বিচারকরা এখন গালিগালাজকে কিছু মনে করেন না। খুব সহনীয় তাঁরা। আগে সাংবাদিক বা যাঁদের মামার জোর কম তাঁদের প্রতি স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালত অবমাননার সমন জারি করতেন। লেখক পেলে তো কথা নেই। কিন্তু ফতোয়াবাজরা তাঁদের মুরতাদ বললে, হত্যার হুমকি দিলে আদালত অবমাননা হয় না। বিএনপির ব্যারিস্টাররা প্রধান বিচারপতির দরজায় লাথি মারলে আদালত অবমাননা হয় না। সাঈদী তাঁদের হিন্দুস্তানের দালাল বললে মান যায় না, সব সহ্য করা যায়। কিন্তু শেখ হাসিনা আদালতের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বললে আদালত অবমাননা হয়। ধন্য বিচারকবৃন্দ। ধন্য আপনারা।

৩. সাঈদীর মতে, "ধর্ম নিরপেক্ষতা মতবাদ একটি কুফরী মতবাদ, এটি হারাম। কোনো মুসলমানের এ হারাম আইন মেনে নেয়া জায়েজ নয়।"

কোন্ ধর্মগ্রন্থে এ রকম বলা আছে? এটি আইন তাও বা রাজাকারকে কে বলল? ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা যুক্ত মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে। রাজাকারদের পক্ষে মানবতাবাদের সঙ্গে জড়িত কিছু মানা সম্ভব নয় সেটাই ১৯৭১ তো বটেই ১৯৭৫-এর পরও প্রমাণিত

৪. সাঈদী বলেছে, "হিন্দুস্তানের দালাল এ সরকার আল্লাহর পত্রিকা ইনকিলাব বন্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। অথচ ইসলাম বিরোধী কাফের লোকদের পত্রিকা 'সংবাদ' বন্ধ করে না–যে পত্রিকা সুযোগ পেলেই আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা শুরু করে।"

আল্লাহর পত্রিকা ইনকিলাব। নাউজুবিল্লাহ। আলেম সমাজ, আল্লাহ্ কবে পাকিদের মুখপত্র ইনকিলাবকে নিজের পত্রিকা হিসেবে ঘোষণা দিলেন? রাজাকাররা এখন আসমান জমিনের স্রষ্টাকেও নিজেদের হীন প্রয়াসে ব্যবহার করতে চায়। বিজ্ঞাপন হিসেবে?।

যাক জানা গেল, 'সংবাদ' যারা পড়ে তারা কাফের। সংবাদের পাঠকরাই আশা করি 'মুসলমান' সাঈদীর মোকাবিলা করবেন। আর সরকার অপপ্রয়াস দূরে থাকুক ইনকিলাবের বিরুদ্ধে কোনো প্রয়াসই নেয় নি। নিলে ইনকিলাব এখনো বের হয়? বরং সরকারের অনেকে ইনকিলাবের পক্ষে। ইনকিলাবের বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা তা পাঠকরাই নিয়েছে।

৫. "এ সরকার আমার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে, আমাকে সভা করতে দেয়া হয় না। আমার বিরুদ্ধে জেহাদ করা আর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে জেহাদ করা সমান কথা।"

এ সরকার আমার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলে তো খুশিই হতাম। আর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো সরকার জেহাদ ঘোষণা করবে কোন্ দুঃখে? রাজাকার সাঈদী কতবড় মিথ্যাবাদী তা বোঝা যায়, যখন সে বলে সে সভা করতে পারছে না। এ বক্তব্য সে তাহলে দিল কোথায়? তাকে অনেক জায়গায় সভাতে বাধা দিচ্ছে তারাতো সাধারণ মুসলমান, হিন্দু নয়। আবার আল্লাহর কথা নিয়ে এসেছে সাঈদী নোংরা রাজনীতি করার জন্য। নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে দাবি করছে যা কোনো মনুষ্য সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলাদেশের আলেম সমাজ কি মনে করেন কোনো বান্দা আল্লাহর সমকক্ষ? যদি তা না হয়, যে এই ঘোষণা দেয় তার কী হবে?

সাঈদী নিজেকে এখন আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজাকার বলে। সাঈদীর মতে, তারা জারজ সন্তান, অবৈধ। আমি ভীরু লোক, আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আপনারা যারা সাহসী ও ক্ষমতাবান তারা হয়ত এ বিষয়ে ভাববেন। আমি শুধু বলতে পারি, প্রাণীর ঔরসে প্রাণী জন্মে, মানুষের ঔরসে মানুষ আর পাকিদের ঔরসে রাজাকার।

২৩.১.২০০১

দেশটির সর্বনাশই তাদের কাম্য!

কমিউনিস্ট পার্টির জনসভায় বোমা বিস্ফোরণের খবর শুনলাম, বোমা বিস্ফোরণের পরদিন। তখন আমি বাংলাদেশের দক্ষিণপ্রান্তে ছোট এক দ্বীপে। আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপি নয়, জাপা-জামায়াত নয়, এমন কি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ফতোয়াবাজদের সভায়ও নয়, বোমা কি না বিস্ফোরিত হলো নিরীহ গোবেচারা কমিউনিস্টদের সভায়! কমিউনিস্টদের জনসভায় মানুষ আসে দূরদূরান্ত থেকে আদর্শের টানে। অধিকাংশই নিরীহ। কমিউনিস্ট নেতারাও পেশীবহুল নয়। সেই সভায়ই কি না হত হলেন চারজন!

আমার মনে পড়ল স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে শহীদ তাজুল ইসলামের কথা। তাজুল আমাদের সঙ্গে পড়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে, করত কমিউনিস্ট পার্টি। অর্থনীতিতে ডিগ্রী নিয়ে তাজুল গিয়েছিল আদমজীতে। আমাদের আদর্শিক ভিত্তি তেমন জোরালো ছিল না। আমরা ছড়িয়ে পড়েছিলাম নানা ধান্ধায়। তাজুলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আদমজী মিল এলাকায়। তাজুলের পরিবার হারিয়ে গেছে। তার হত্যার বিচার হয়নি। শোনা যায়, যারা তার হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল তারা প্রতিবার সরকার বদলের সময় সরকারি দলে যোগ দিয়ে নিজেদের বিত্তবৈভব বৃদ্ধি করেছে। রতন সেনের কথা মনে পড়ে? খুলনায় প্রকাশ্য রাজপথে যাকে হত্যা করা হয়? কমিউনিস্ট ছিলেন, সে হত্যারও বিচার হয়নি। যেমন হয়নি, উদীচীর সভায় বোমা বিস্ফোরণে নিহতদের। এমন কী প্রভাবশালী জাসদ নেতা কাজী আরেফের। যাদের মামার জোর নেই বা গরিবদের হত্যার বিচার কখনও হয় না বাংলাদেশে। কমিউনিস্টদের তো নয়ই। গরিবদের ব্যাপারে নানা কথা বলতে আগ্রহী রাজনীতিবিদরা, তাদের জনসভায় এনে হাততালির বন্দোবস্ত করতে আগ্রহী তারা। কিন্তু, তারা নিহত হলে কারও আর কিছু করার থাকে না। কমিউনিস্ট হলে তো অপাংক্তেয়।

পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে বামপন্থী বা কমিউনিস্টদের প্রতি সুপরিকল্পিতভাবে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে। কমিউনিজমকে ধর্মদ্রোহিতার সমার্থক ঘোষণা করা হয়েছে। বামপন্থীরা অন্যায়ভাবে সব আমলে নিপীড়িত হয়েছেন। অথচ এঁদের অধিকাংশ ছিলেন সৎ এবং নিঃস্বার্থ। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে আজকের যে প্রগতির ছাপ তার সিংহভাগ অবদান কমিউনিস্ট পার্টি বা বামপন্থার সমর্থকদের কারণে। কিন্তু তারা নিগৃহীত হলে, মারা গেলে, সরকার বা রাজনীতিবিদ বা সমাজের যেন কোনো দায় থাকে না তাদের প্রতি।

বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটার পর যা যা হয় পল্টনের ঘটনার পর ঠিক তাই

হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুনীদের মুখোশ উন্মোচিত করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আশাবাদী হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। আগেও অনেকবার তিনি একথা বলেছেন, কিছুই হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুনের আসামীকে আদালত পর্যন্ত নিয়ে গেলেও আদালত নানা অজুহাতে বিচার স্থগিত রেখেছে। আওয়ামী লীগ প্রথমদিকে মৌলবাদীদের দোষারোপ করেছে। আওয়ামী লীগের কোনো কোনো মন্ত্রী বিএনপিকে দোষারোপ করেছেন। বিএনপি সরকারকে দোষারোপ করেছে, বিএনপির কোনো কোনো সাবেক মন্ত্রী সরাসরি আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করেছেন। কমিউনিষ্ট পার্টিও মৌলবাদী ও চক্রান্তকারীদের দোষারোপ করেছে। 'মানবজমিন' ইঙ্গিত করেছে দলীয় অন্তর্কলহ এর জন্য দায়ী। পুলিশরা শুধু মৌলবাদী, অন্তর্কলহই নয় আইএসআইকে দোষী করেছে। বাদ আছে 'র' এবং সিআইএ। কোনো রকম শোক প্রকাশ বা নিন্দা করেনি রাজাকারদের দল জামায়াত ও ফন্দিবাজ ফতোয়াবাজরা। তবে সরকার একটি নয়, দু'টি তদন্ত কমিটি করেছে এবং নিশ্চিত থাকুন, এর কোনোটির রিপোর্ট প্রকাশিত হবে না। তবে দু'একজন পুলিশ কর্মকর্তা 'ক্লোজড' বা বদলি হবেন।

গত কয়েকদিনে যত বিবৃতি ছাপা হয়েছে তার কিছু কিছু বিশ্লেষণ করা যাক। বাংলাদেশের কোনো দলই কমিউনিস্ট বা মডারেট বামদের বিশ্বাস করে না। কমিউনিস্টদের কথা শুনলে এখনও অনেকের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়, কমিউনিজমের বিপর্যয়ের পরও। আওয়ামী লীগের সঙ্গে কমিউনিস্ট বা মডারেট বামদের এক ধরনের সমঝোতা সব সময় ছিল এবং হয়তো এখনও আছে। কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙ্গার পর অনেকে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। আ. লীগ সব সময় এদের সমর্থন চায় কিন্তু কখনও বিশ্বাস করে না। তারা আমলা, জেনারেল যারা সব সময় তাদের পিটিয়েছে বা তাদের বিরোধিতা করেছে তাদের বিশ্বাস করবে বা পদ ও পদক দেবে কিন্তু বামধারার কাউকে নয়। যেমন, কথায় কথায় মৌলবাদীদের বিপক্ষে তারা বলবে কিন্তু কখনও তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে না। এক ধরনের ভণ্ডামি সব সময় কাজ করে। হয়ত, নতুন জেনারেশন নেতৃত্বে এলে অবস্থার পরিবর্তন হবে। সুতরাং কমিউনিস্টদের জনসভায় বোমা রেখে আ. লীগের কোনো লাভ নেই। তাঁরা বামদের বিশ্বাস করতে না পারে কিন্তু বোমা রাখবে না।

বিএনপিতেও চরম বামরা আছেন। তবে, মডারেট বামদের সঙ্গে তাঁদের তফাত আছে। চরম বামরা রাজাকার ও সেনাবাহিনীর ভক্ত। এখন রাজাকারদেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রাক্তন বামপন্থী মান্নান ভূঁইয়া। কিন্তু, তারাও কমিউনিস্টদের মিত্র হিসাবে চায় নির্বাচনের জন্য। বাম দলের জোট অনেক সময় আ. লীগকে সমালোচনা করতে গিয়ে বিএনপির পক্ষ সমর্থন করে ফেলে। জেনারেল জিয়াকেও তারা সমর্থন করেছিল। ফলে বিএনপি তাদের একেবারে অপছন্দ করে তা নয়। কিন্তু বিএনপিতে এখন লাল্টু-পল্টুরা এসেছে। বিএনপির মিত্র ফতোয়াবাজ ও রাজাকাররা শক্তিশালী। তারা দেশে কিছু একটা করতে চায় যাতে সরকারের পতন ঘটে। আর ফতোয়াবাজ বা রাজাকাররা আওয়ামী লীগকে যতটা না ঘৃণা করে তার চেয়ে বেশি ঘৃণা করে কমিউনিস্ট পার্টিকে। সুতরাং বিএনপির

নেতৃত্বকে বোমা হামলার সঙ্গে জড়ানো যায় না। তবে সন্দেহ করা যায় বিএনপির যে অংশ এখনই অস্থিতিশীলতা ঘটাতে চায় ও উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী, যারা তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদেরও উপেক্ষা করা যায় না।

স্পেকুলেশন যথেষ্ট করা যায়, কিন্তু যতক্ষণ কারও বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দেয়া না হচ্ছে ততক্ষণ নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না। এমনও হতে পারে যে, কোনো বড় দলের কোনো স্প্লিন্টার গ্রুপেরও হাত থাকতে পারে তাৎক্ষণিক কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। অবশ্য তাতে দোষ পড়বে পুরো দলের ওপর। বেগম জিয়া এ হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে প্রথমদিন একটি যথার্থ উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আগে এ ধরনের যেসব হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার বিচার না হওয়ায় আজ এমনটি ঘটল। এ কথা আমরা সব সময় বলে আসছি। বেগম জিয়ার আমলেও এসব হত্যার বিচার হয়নি। হাসিনার আমলেও নয় এবং কোনো বড় দলের কেউ এ ধরনের ক্রিমিনাল কাজে জড়িত আছে বলে প্রমাণিত হলে দল তার পক্ষে এগিয়ে আসে। বিচার হয় না। আর গরিব বা কমিউনিস্টদের কিছু হলে কারও কিছু আসে যায় না। কিন্তু ফতোয়াবাজ বা রাজনীতির দুর্বৃত্তের কিছু হলে আজ রাষ্ট্রের আসে যায়। পল্টনে নিহতদের জন্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে শোকাভিভূত হতে পারি, দুঃখ প্রকাশ করতে পারি কিন্তু কিছু হবে না। কমিউনিস্ট পার্টি, ঋণখেলাপী কারও মতো হলেও সমাজ বা রাষ্ট্রের কিছু আসত যেত। আসলে ঐটাই মূল বিষয়। কোনো তদন্ত সমাপ্ত হয় না, কোনো অপরাধী ধরা পড়ে না, ধরা পড়লেও বিচার হয় না। সুতরাং এগুলো ঘটছে এবং নিশ্চিত হয়ে বলছি এর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়বে। এ মুহূর্তে একটি কথাই মনে হচ্ছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত, জাপা বা কারা এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত জানি না। কিন্তু আমাদের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার– যারা এসব করছে তারা দেশটিতে নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য শুধু যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে চায় তাই নয়, দেশটির মঙ্গল তাদের কাম্য নয়। চায় শুধু দেশটির সর্বনাশ হোক।

২৪.০১.২০০১

আমরা কি মসজিদে মুসলমান খুনের ইসলাম চাই?

'আমার স্বামীর হত্যাকারী মুসলমান নয়, পশু' বলেছেন, মসজিদে ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা খুন হওয়া কনস্টেবল বাদশা মিয়ার স্ত্রী। তিনি আরও বলেছেন, 'আমার স্বামী খুব ধার্মিক ও সৎ ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। চাকরি করে কিছুই করতে পারেননি।' এই ধরনের মুসলমানকে যখন মসজিদে খুন করা হয় তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে আমিনী বা আযীযুল হক গং কোন্ ধরনের ইসলাম প্রচার করতে চায়? বা ইসলামের নামে নতুন কোনো ধর্ম নিয়ে তারা মাঠে নামছে কিনা যার মূল কথা খুন-খারাবি। যে ইসলাম আমরা মানি অর্থাৎ শান্তি ও সহাবস্থানের ইসলাম তো তা নয়। পশুদের খাঁচায় রাখতে হয়, না হলে তারা তাণ্ডব সৃষ্টি করতে পারে। আমিনীরা বাইরে থাকলে বাংলাদেশের কোনো তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নিরাপদ নয়। কেন নয়, তা তাদের কথাবার্তাই প্রমাণ করবে।

তার আগে প্রথমে একটি নিবেদন। গত কয়েকদিন ধরে মুসলমান পরিচায়দানকারী কিছু লোক যা করেছে তা পত্রপত্রিকায় আমরা দেখেছি। সংবাদপত্রগুলো এদের নামের আগে মৌলানা, আলেম, মাশায়েখ প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করছে। এ ধরনের শব্দ ব্যবহার যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। একজন আলেম বা মাশায়েখ মসজিদে খুনের নেতৃত্ব দিতে পারে না। 'মুসল্লি' শব্দটিও অনেকে ব্যবহার করেন। বায়তুল মোকাররমে বোমা মারা বা ইট ছোড়া এবং তারপর প্রয়োজনে মসজিদে ঢুকে আত্মরক্ষা করা কি মুসল্লির পরিচয়? ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ, আপনারা কী গ্রামে কী শহরে এমন কাউকে আলেম বা মাশায়েখ বলেন বা সম্মান করেন যারা অনবরত অশ্লীল কথা বলে, কথায় কথায় মুসলমানদের কাফের বলে হত্যা করতে চায় এবং অহরহ সত্য নয় এমন কথা বলে? তা যদি না হয়, তা' হলে এসব শব্দ ব্যবহারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। 'শায়খুল হাদীস' বা 'আল্লামা' শব্দটি ব্যবহারও আপত্তিকর। যারা খুনে ইন্ধন যোগায় অনবরত যাকে তাকে মুরতাদ ঘোষণা করে, অনবরত রসিয়ে রসিয়ে অশ্লীল কথা বলে, ধর্মের নির্যাস বিনষ্ট করা উচিত নয় বলেই মনে করি। সবচেয়ে বড় কথা এরা অন্ধভক্তদের পয়সায় চলাফেরা করে, সম্পদশালীও হয়। তার ওপর রাজনীতি করে। কিন্তু, তারা কি রাষ্ট্রের প্রতি ছোট একটি কর্তব্য পালন করে? যেমন, তারা কি ইনকাম ট্যাক্স দেয়? এই তথ্যটি জানাতে কি রাজস্ব বিভাগ ভয় পাবে? এসব বিষয় এখন সর্বসাধারণের জানা জরুরি হয়ে পড়ছে। আর কেউ যদি আল্লাহর উপাসনা না করে আল্লাহ কি তাকে যত্রতত্র মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যা করতে বলেছেন। সূরা কাফেরুন-এ কী আল্লাহ বলেননি-"হে অবিশ্বাসীরা! আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী নও-যাঁর উপাসনা আমি করি।... তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার

ধর্ম আমার।" তারা কোরানের অর্থ বোঝে না বা বুঝেও অমান্য করতে চায়। তারা অশিক্ষিত ধর্মভীরু মানুষকে প্ররোচিত করে তাদের স্বার্থে, যাতে তারা সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে থাকতে পারে। তারা ধর্মব্যবসায়ী। ধর্মব্যবসায়ী না হলে তারা কিভাবে এসব কথাবার্তা বলে?

১৯ জানুয়ারি 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন'-এর এক সভায় তারা যা বলেছে তার কয়েকটি নমুনা–

১. চরমোনাইর 'পীরের' মতে, "ফতোয়া নিষিদ্ধ করে বিবাহ বন্ধনের এই শক্ত গাঁথুনি উঠিয়ে দিলে পরবর্তী সন্তানরা সব হারামজাদা হবে।" [প্র. কাগজ, ২০.১.]। ফতোয়ার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনের শক্ত গাঁথুনির সম্পর্ক কী? চরের এই পীর হিল্লার নামে কি ব্যভিচার সমর্থন করছে না?

২. গাজী আতাউর রহমান নামে একজন বলেছে, 'হাইকোর্টে, সুপ্রীমকোর্টে পার্লামেন্টে শয়তান ঢুকেছে।" [ঐ]

৩. অধ্যাপক নামধারী জনৈক মাহবুবুর রহমান বলেন, "পরবর্তী মুসলমানদের জারজ বানানোর জন্য ফতোয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।" [ঐ]

আমিনী সারাদেশে গত এক মাস অনবরত উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছে, যাতে দেশে একটি গৃহযুদ্ধ লেগে যায়। বিচারকদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে। এমনকি ২ ফেব্রুয়ারি পল্টনের সভায়ও চরের তথাকথিত পীর ফজলুল করিম ঘোষণা করেছে, "ফতোয়াবিরোধী রায় বাস্তবায়িত হইলে ইসলাম থাকিবে না। এনজিওরা সমাবেশ করিতে পারিবে না। যুদ্ধে মারা গেলে আমরা শহীদ হইয়া বেহেস্তে যাইব। আর তাহারা মারা গেলে যাইবে দোজখে।" [ইত্তেফাক ৩.২]

অর্থাৎ আল্লাহ নির্ধারণ করবেন না তার বান্দার ভাগ্য। কত বড় নাফরমানী কথা! এই চরের 'পীর' নির্ধারণ করছে বান্দার ভাগ্য। আল্লাহর কর্তৃত্ব যে অস্বীকার করে সে মুরতাদ হয় না, হয় এনজিওরা যারা গরিবদের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা চালাচ্ছে? আর ইসলাম এত ঠুনকো হলে ১৫০০ বছর টিকল কি ভাবে?

ধর্মব্যবসায়ীদের এই তাণ্ডব আজ হতো না বা তাদের আস্ফালন অনেক আগেই থেমে যেত, যদি আমরা ভণ্ডামি না করে নিজের নিজের দায়িত্বটুকু পালন করতাম। রাজনৈতিক নেতারা ভণ্ডামি করেছেন, আমরা পেশাজীবীরাও করেছি। যে আওয়ামী লীগ ধর্মীয় সহাবস্থান ও মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছে তারাও দোলাচলে ভুগেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিই।

আমিনীরা তাদের সমাবেশে "সরকারি অফিস-আদালতে 'শেখ মুজিবের' প্রতিকৃতি টানানোর আইনকে হারাম আখ্যায়িত করে এ আইন বাতিলের জন্যও দাবি জানান হয়।" [সংবাদ ৩.২]। এ সংক্রান্ত আইন পাস হওয়ার পর থেকেই তাদের তরফ থেকে এসব বলা হচ্ছে।

পত্রপত্রিকায় দেখেছি যুবলীগ নেতা কাজী ইকবাল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কিছু বললে জিহ্বা কেটে নেবেন বলেছেন। আওয়ামী লীগ নেতা জয়নাল হাজারী বা

লক্ষ্মীপুরের আবু তাহেরের নামে শুনেছি বাঘে-ছাগলে এক ঘাটে পানি খায়। আওয়ামী লীগকে ভালোবেসে তারা সাংবাদিকের হাত-পা ভেঙ্গে ফেলেন। তাদের বুলন্দ আওয়াজে এলাকাবাসী ঘর থেকে বেরুবার সাহস পায় না, এখন জাতির পিতার প্রতি তাদের ভালোবাসার কোনো নমুনা তো দেখা গেল না। আজ পর্যন্ত দেখেছেন এরা সমাজের সত্যিকার শত্রুদের কিছু বলেছে? সংসদে সাংসদরা 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির পিতা' ছাড়া কথা বলতে পারেন না। এঁদের শুনেছেন কখনও এদের বিরুদ্ধে সোচ্চারে কথা বলতে? রাস্তায় নামা তো দূরে থাক। মায়াহীন আওয়ামী লীগের প্রচুর নেতা-কর্মী ও ৪ তারিখ শান্তি মিছিল বের করেছেন? কিসের শান্তি মিছিল? কার সঙ্গে কার দ্বন্দ্ব তারা থামাতে চান? এঁদের দশভাগ গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামলে হরতাল হয়?

২ তারিখের ধর্মব্যবসায়ীদের সভায় সুলতান যউক নাদভী নামে একজন বলেছে, "আমি ফতোয়া দিতেছি দুই বিচারকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।" [ইত্তেফাক ৩.২]। হাইকোর্টে এখনও দেখছি একটি সত্য ঘটনা পত্রিকায় ছাপা হওয়াতে আদালত অবমাননা হলো কী না তার বিচার করছে। অথচ, ধর্মব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত বিচারকদের মুরতাদ ও ফাঁসির ঘোষণা দিচ্ছে। কিন্তু তাতে আদালত অবমাননা হয় না। রাষ্ট্রপ্রতি তো প্রায় রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করেন। এসব বিষয়ে কিছু বলেন না কেন? এ্যাটর্নি জেনারেল কেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এদের বিরুদ্ধে মামলা করেন না? সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তো করেন? এর কারণ কি এই যে সাংবাদিকরা হুমকি দেয় না বা অস্ত্র বহন করে না। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে বিচারকের দরজায় লাথি মেরে আদালতের সম্মান রক্ষা করেন, এখন আদালতের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব কার ওপর দিলেন? নাকি এরা বিএনপির মিত্র দেখে সম্মান রক্ষার দায়িত্বের কথা আসছে না? মনে হয় মঞ্চে একটি ফার্স বা প্রহসন অভিনীত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আব্দুল হক নামক একজন বক্তৃতায় বলেছে, "ইসলামের রায় অনুযায়ী রায় প্রদানকারী বিচারকদ্বয় জারজ সন্তান।" [ঐ]। সুয়োমোটো নামে একটি শব্দ গত দু'দশকে অনেক বিচারক উচ্চারণ করেছেন। সুয়োমোটের অর্থ বোধ হয় এখন বদলে গেছে। কী বলেন, মহামান্য বিচারকরা?

এখানে উল্লেখ্য যে, "মহাসমাবেশ চলার সময় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক টেলিফোনে সমবেত সকলের উদ্দেশে সালাম প্রেরণ করেন ও সমাবেশের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।" [ইনকিলাব ৩.২]।

বায়তুল মোকাররম ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন। এ ব্যক্তিটি অতীতে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেছে, ইসলাম রক্ষার নামে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়েছে এবং এখনও আমিনী গংয়ের হয়ে প্রকাশ্যে কাজ করছে। হক বলেছে, রাস্তায় নাকি মহিলাদের উলঙ্গ করে নাচানো হচ্ছে। [মানবজমিন ১৩.১]। অর্থাৎ, সরকারের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। এই মিথ্যাবাদীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, কে কোথায় রাস্তায় মহিলাদের উলঙ্গ করে নাচাচ্ছে? এর বিপরীতে নিম্নোক্ত রিপোর্টের ব্যাপারে তার বক্তব্য কী? যাঁরা বায়তুল মোকাররম যান তাঁরা দয়া করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন–

আযীযুল হকের মাদ্রাসায় 'অন্য জিনিসপত্রের সাথে পাওয়া গেছে কনডম ও অশ্লীল

কিছু চিঠিপত্র। এই মাদ্রাসায় শিশু ছাড়া কোনো মহিলা নেই। তার পরেও সেখানে কনডমের প্যাকেট ছিল। একইভাবে পাওয়া গেছে একটি অশ্লীল চিঠি।" [জনকণ্ঠ ৫.২]। এ চিঠিতে এক তালেবএলেম জানিয়েছে, সে তার স্ত্রীকে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে উপভোগ করবে। এই খতিব কিভাবে বায়তুল মোকাররমের খুতবায় বলে, "রায় প্রদানকারী দু'বিচারপতিকে তওবা করতে হবে।" তারপরও ব্যক্তিটি বহাল তবিয়তে খতিব পদে আসীন।

আশার কথা, বহুদিন পর বাধ্য হয়ে সরকার ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আমিনী ও আযীযুল হককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই আযীযুল হকের ক্যাডাররা "ধর ধর মুরতাদ ধর" বলে কনস্টেবল বাদশা মিয়াকে মসজিদের ভিতর নিয়ে যায়। "সেখানে তারা তাদের নেতা শায়খুল হাদীস আযীযুল হকের নির্দেশে বাদশা মিয়াকে রড, গজারী লাঠি ও জুতা রাখার কাঠের বাক্স দিয়ে বেদম প্রহার করে হত্যা করে।" [বাঙলাবাজার, ৫.২], উল্লেখ্য, বাদশা মিয়া এ মসজিদেই নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। বাকি আছে চরের পীর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম অবশেষে স্বীকার করেছেন, "অনেক ছাড় দিয়েছি আর নয়। এখন থেকে এক এক করে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।" আশা করি তিনি তাঁর কথা রাখবেন। মনে হয়, আওয়ামী লীগেও মেরুকরণ সম্পন্ন হচ্ছে। হয়ত তাঁদের অনেকে উপলব্ধি করছেন, যত ছাড়ই তাঁরা দিন না কেন আমিনীরা তাদের ভোট দেবে না। হয়ত এ কারণেই তাঁরা মনে করছেন, "ধর্মের নামে মানুষকে হত্যা, সর্বোচ্চ আদালত অবমাননা, দেশের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা কখনও জনগণ সমর্থন করবে না। যাঁরা এদের সমর্থন করবেন তাঁরাও গণবিচ্ছিন্ন হবেন।" [জনকণ্ঠ ৫.২]।

এ পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও মেরুকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিএনপি, জাপা আমিনীদের মুক্তি দাবি করেছে। অর্থাৎ, এরা মাদ্রাসাকে অস্ত্রের ঘাঁটি করতে, তরুণদের মুখে অশ্লীল কথা তুলে দিতে এবং মসজিদে মুসলমান খুনের পক্ষপাতী। এরা মানবতাবাদী ইসলামের বিপক্ষে। সরাসরি মিথ্যাচারই হবে তাদের ধর্ম, ইতোমধ্যে যার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বেগম জিয়া ঘোষণা করেছেন, "পুলিশ হত্যার জন্য আওয়ামী লীগ দায়ী। তারা দোষ অন্যের কাঁধে চাপাতে চায়।" [৫.২]। সমস্ত দেশের মানুষ টিভি দেখেছে, পত্রিকাও পড়েছে অনেকে। কেউ বলেনি আওয়ামী লীগ দায়ী। এ ধরনের নেতৃত্ব বাঙালিরা মানলে অচিরেই বিশ্বে মিথ্যাবাদী জাতি হিসাবে তারা পরিগণিত হবে।

যারা, বাংলাদেশে পাকিস্তান কায়েম করতে চায়, অধর্ম প্রচার করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে এখনই প্রতিরোধ না নিলে সবাইকেই পস্তাতে হবে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ হবে, মহিলাদের কাজ কর্ম পড়াশোনা শিকায় উঠবে। অস্ত্র হাতে আমিনী ও তার শিষ্যরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে এবং যাকে অপছন্দ তাকে হত্যা করতে হয়ত দ্বিধা করবে না। যেমন করেছে বাদশা মিয়াকে। যার যা অবস্থান সেখান থেকেও প্রতিরোধ চেষ্টা হবে প্রাথমিক পদক্ষেপ। ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন প্রমাণ করেছে তারা শক্তির আধার।

বাংলাদেশে এত বড় সুশৃঙ্খল সমাবেশ কখনও হয়নি। যারা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে চান না তাঁরা এই প্রচেষ্টায় অংশ নিতে পারেন।

আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে একটি আত্মসন্তুষ্টি লক্ষ্য করেছি। তারা নিশ্চিত পরবর্তী নির্বাচনে জিতবেন। তারা ভুলে যান '৯৬-এর নির্বাচনে যে ৩৬% ভোট তাঁরা পেয়েছেন, কমপক্ষে তার ১৫ ভাগ এসেছে বিভিন্ন গ্রুপের সমর্থন থেকে। সেসব গ্রুপকে আওয়ামী লীগ বাদ দিয়ে জিততে পারবে? এ পরিস্থিতিতে? কেউ যদি এটি বলে থাকেন তাহলে বলতে হবে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের পথ তিনি বা তাঁরা উন্মুক্ত করছেন। নির্বাচনে মায়ার খেলা কাজ নাও করতে পারে। জয়নাল হাজারী ভোট আনবে না, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার "হুজুর"ও নয়। ভোট আনবে পেশাদারী গ্রুপ বা ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন। এমনকি ১১ দলও। নিজেদের অস্তিত্ব শক্তিশালী করার জন্য এখন সরকারকে এদের সঙ্গে বসে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নিতে হবে। কারণ, আযীযুল হকরা শীঘ্রই আবার রাস্তায় নামার চেষ্টা করবে। সরকারের কি তখন কোনো সমর্থনও লাগবে না?

২০০১

সবাই মুরতাদ হলে ঈমানদার কে?

এক গৃহবধূ দৈনিক জনকণ্ঠ অফিসে ফোন করেছিলেন। "মসজিদে পুলিশ হত্যার জঘন্য ঘটনাটি সরকার ঘটিয়েছে–বিরোধী দলের নেত্রীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, তাহলে আমরা কার ওপর আস্থা রাখব? কাকে ভোট দেব? গৃহবধূ ভদ্রমহিলা বলেন, মনে করেছিলাম আওয়ামী লীগকে আগামীতে ভোট দেব না। কিন্তু বেগম জিয়ার এ-ধরনের দায়িত্বহীন বক্তব্য শোনার পর ভাবছি, কেন তাঁকে ভোট দেব যিনি এমন একটি জঘন্য ঘটনা সম্পর্কে এ-ধরনের উক্তি করতে পারেন।" (জনকণ্ঠ, ৬.২.০১)

গৃহবধূ কেন, আমাদের অনেককেই বেগম জিয়া বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছেন। বিরোধী নেত্রী হিসেবে বেগম জিয়ার অবস্থান শক্তিশালী হোক, সংসদে তিনি শেখ হাসিনার নীতিকে তুলোধুনো করুন, এটি অনেকেরই কাম্য। কিন্তু রাজাকার ও ধর্মব্যবসায়ীদের পক্ষে গত এক বছর ধরে অবস্থান নেয়ায় তাঁর প্রতি মানুষের আস্থা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। হতে পারতেন হিরো, হয়ে যাচ্ছেন জিরো। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে, আযীযুল হকের সামনে পিটিয়ে ফতোয়াবাজরা বাদশা মিয়াকে হত্যা করে। তিনি বলছেন, সরকার করেছে। ধরে নিলাম, এ ক্ষেত্রে তাঁকে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে হবে। তা হলে বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকার মতো বলতে পারতেন, পুরো ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত। তাহলে আসল ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হবে (একুশে টিভি)। সব বাদ দিই, বিএনপি আমলে পুলিশ প্রহৃত ও নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামী লীগ কী বলেছে, বিএনপি পুলিশ হত্যা করেছে। এটি সাধারণ সত্য ও কমন সেন্সের ব্যাপার যে, আমাদের মতো দেশে পুলিশ সরকারের ক্ষমতার উৎস। পুলিশ যাই করুক না কেন, সরকার পুলিশের পক্ষেই থাকে। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বরং রাজনীতির ধার না ধেরে অকপটে বলেছেন, "ক্ষমতায় গিয়ে কি পুলিশ হত্যা করা যায়?" (ভোরের কাগজ, ৬.২.২০০১)। বিরোধী দলের নেত্রী যখন সত্য নয় এমন কথা বলেন, তখন দায়টা দেশের ওপর বর্তায়। বহির্বিশ্বে ধারণা হতে পারে, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা সত্যবাদী নন। কিন্তু কী শুধু বেগম জিয়া? চার দলের নেতারা বোধ হয় এ-ধরনের বক্তবেই অভ্যস্ত। ভাবছেন আমি বাড়াবাড়ি করছি। আচ্ছা শুনুন তাহলে। ফতোয়াবাজ এবং পুলিশ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত গ্রেফতারকৃত ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আযীযুল হক কী বলেছেন। তাঁর মতে, "আমাদের মাসলা নারী নেতৃত্বের পুরোপুরি বিরুদ্ধে। যে দেশে নারী নেতৃত্ব থাকবে, সে দেশের উন্নতি হবে না। নারী নেতৃত্ব অবৈধ।" (বিচিত্রা, ১৯৯৭)। যিনি এমনটি বলেন, তিনি নারী নেতৃত্ব শুধু মেনে নেন নি,

তাঁর সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার উৎখাতের আন্দোলন করছেন। উদ্দেশ্য একটিই–ক্ষমতা লাভ। ইসলামের সেবা নয়। ঈমানদার হলে যে কথা বলেছেন তারপর 'বেগানা' মহিলার সঙ্গে এক মঞ্চে বক্তৃতা দেয়া দূরে থাকুক, পুলিশের ভয়ে তাঁর আঁচলের নিচে ঢুকে মঞ্চ ছেড়ে পালাতেন না। আমাদের উপলব্ধি করা উচিত কারা এসব বিশৃঙ্খলা, খুন করছে এবং কেন?

জামায়াতের আমীর সেক্রেটারি সব তো ১৯৭১ সালে ছিল খাঁটি আলবদর। আযীযুল হকরাও তাই। আযীযুল হক সরাসরি বলেছেন, "আমরা চাই নাই পাকিস্তান ভাইঙ্গা বাংলাদেশ স্বাধীন হোক। আমরা তখনো যা করেছি তা ঠিক-এখনো যা করছি ঠিক। জামাতীয়দের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই।" (ঐ)।

এরা যে দেশকে তালেবানদের দেশ করতে চায় সে ব্যাপারেও তাদের লুকোছাপা নেই। বরং সরকারই ছিল বধির। আযীযুল হক বলেছেন, "আফগান তালেবানদের সমর্থন করছি কারণ তারা ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করছে। এ জন্য আমাদের প্রস্তুতি আছে। ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে বিভিন্ন অঙ্গনে।" (ঐ) এখন তালেবানরাও কি চিজ একটু বলি। কয়েকদিন আগে তারা ঘোষণা করেছে, তাদের মদদদাতা পৃষ্ঠপোষক ওসামা বিন লাদেনকে তারা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেবে যদি যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অবরোধ তুলে নেয়। ইসলামী ঐক্যজোটও একদিন বিএনপিকে নাজেহাল করে ছাড়বে। কারণ, দেখা যাচ্ছে তালেবানদের কাছেও ইসলাম ব্যবহারের বস্তু। যেন ইলাসটিক। দরকারে লম্বা কর, নয়ত খাটো কর। ঈমানদার কখনো কথার বরখেলাপ করে না, যে তাকে সাহায্য করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

পুলিশ হত্যা করে তার যৌক্তিকতা প্রদানের জন্য চারদল হরতাল ডেকেছে। এ হরতাল, নিজেই বিচার করে দেখুন কার পক্ষে। ফতোয়াবাজদের পক্ষে, ধর্মব্যবসায়ীদের পক্ষে। রাজাকারদের পক্ষে। হরতাল হবে, তবে তা প্রতিবাদের হবে না। সেটি হবে ভয়ের কারণে। যারা মসজিদে মানুষ খুন করতে পারে তারা এমন কোনো কাজ নেই পৃথিবীতে যা করতে পারে না।

হরতাল ঘোষণার মতো মুরতাদ ঘোষণাও এখন প্রহসনের ব্যাপার হয়ে গেছে। ফতোয়াবাজরা স্বাধীনতার পক্ষের কবি-সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ, আইনজীবী অনেককে মুরতাদ ঘোষণা করেছে। আযিযুল হক খালেদা জিয়াকেও মুরতাদ ঘোষণা করেছিলেন। গত পরশু মতিঝিল, রমনা, মোহাম্মদপুর ও গুলিস্তান থানার ওসিকেও মুরতাদ ঘোষণা করেছে এরা (ইত্তেফাক, ৬.২.০১)। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে তারা ছাড়া সবাই মুরতাদ। তারাই একমাত্র ঈমানদার। হায় সাধারণ মানুষ তাদের কী চোখে দেখে যদি তা তারা জানতো! ৫ তারিখে শহীদ মিনারে ফতোয়াবাজবিরোধী সমাবেশে একজন একটি পোস্টার ধরে ছিলেন। তাতে লেখা ছিল– "ফতোয়াবাজরা নহে ঈমানদার/মসজিদে পুলিশ মারা যুদ্ধচোরা রাজাকার" (ঐ)। একজন সাংবাদিক আমাকে জানিয়েছেন, আমিনীকে যখন রমনা থানা থেকে পুলিশ ভ্যানে ওঠানো হয় তখন তিনি বলছিলেন, "নাসিম (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) তুমি আমাকে অপমান করলা। থানার ওসিও আমার সঙ্গে ঠাট্টা-

মশকরা করে।" আমিনী দেশের অধিকাংশ মানুষকে জারজ, মুরতাদ ছাড়া সম্বোধন করে নি। সে সব অপমান নয়! অপমান তার মতো লোককে গ্রেফতার করায়! আসলে মূল ব্যাপারটা হলো, ধর্ম ব্যবসা করে তারা প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। তাদের ধারণা তারা যা খুশি বলতে পারে, করতে পারে, কারণ মানুষ কিছু বলবে না; তারা ধর্মভীরু এবং এ সুযোগে তারা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাবে। এখন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধর্মের যে মায়া আবহ তারা তৈরি করেছে তা ভেঙ্গে পড়েছে। মানুষের এখন তাদের তেমন বিশ্বাস নাও করতে পারে। এটিই তার কাছে দুঃখজনক মনে হয়েছে। যেমন সামরিক আইন জারির প্রথমদিকে লোকে ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। এখন লোকের সে-ভয় নেই। এই ফতোয়াবাজরা কোন্ যুগে বাস করে? তাদের ধ্যানধারণা কি? আরেকটি উদাহরণ দিই। এই আযীযুল হক-ই বলেছেন, "মানুষের পক্ষে চাঁদে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্য কোনো দেশ থেকে ঘুরে এসে তারা দাবি করছে চাঁদে গেছি। আর মঙ্গলগ্রহে যাওয়া পিকনিকের মতো ব্যাপার। চেষ্টা করলে আমরাও যাইতে পারি। তা ছাড়া ঐ খানে গিয়া কি অইবো? শুধু শুধু টাকা পয়সা নষ্ট..." (মোহাম্মদ মোর্তজার গৃহীত সাক্ষাতকার, ১৯৯৭)। এঁদের গুরু ওসামা বিন লাদেন এসব শুনলে তাঁদের টাকা পয়সা দেয়া বন্ধ করে দেবেন। মৎস্য ভবনের পাশের পেট্রোল পাম্প, আজিমপুরে বিলাসবহুল অট্টালিকার মালিক, মধ্যপ্রাচ্যে আদম ব্যবসা করে প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক (ভোরের কাগজ-৬.২.০১) এই আযীযুল হক ঘোষণা করেছেন, "সব শিক্ষা বাতিল করে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটানো উচিত।" (ঐ)। এ ধরনের লোক যদি রাষ্ট্রে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে তা হলে আপনারা ভাবুন তা কি আওয়ামী আমল থেকে ভালো হবে? মাদ্রাসার অনেক ছাত্র যারা আযীযুল হকদের জন্য রাস্তায় নেমেছে তাদের অনুধাবন করতে বলি, আযীযুল হক বা আমিনী বা চরমোনাইর 'পীর' আপনাদের জন্য কী দান করেছে? আপনারা জেলে পচলে, পুলিশের হাতে প্রহৃত হলে কি তাদের সম্পদের ক্ষয় হবে? কিছুই হবে না।

ফতোয়াবাজরা কেন দেশে ধর্মান্ধতার প্রসার ঘটাতে চাচ্ছে। কারণ, ধর্মান্ধতার কাছে যুক্তি অচল। যখন সে একুশ শতকের সব সুবিধা গ্রহণ করে কিন্তু অন্যদের বলে, এগুলো ঠিক নয়। ধর্মকে ব্যবহার করে তারা সমাজে নিজেদের প্রভাব বলয় তৈরি করতে চায়। এনজিওরা তাদের টার্গেট। কারণ, তৃণমূল পর্যায়ে এনজিওরা নারীর ক্ষমতায়নের পথ উন্মুক্ত করছে। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়ছে। ফলে, রাজনীতিবিদ থেকে তারা বেশি ক্রুদ্ধ এনজিও, শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপর। তাদের ক্ষমতার ভিত নড়ে যাওয়ার আগে তারা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা খুঁজছে এবং বিএনপি তাদেরকে তা দিয়েছে। ফলে, বিএনপির অবস্থানও এখন ধর্মান্ধদের পক্ষে, সিভিল সমাজের সুস্থ চিন্তার বিপক্ষে, এনজিওদের বিরুদ্ধে।

এরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনারও বিরুদ্ধে। বিএনপির জোটে কে আছে? জে. এরশাদ। তিনি মিথ্যা নয় এমন কথা কখনো বলেছেন তা কেউ বিশ্বাস করে না। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল তাঁর অবস্থান। ভয় নেই। সামরিক আইনের কথা কেউ বললে বরং এখন তার প্রহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমিনীদের জেলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন ঢাকা

শহরে তারা নিশ্চুপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বা হাটহাজারীতে গণ্ডগোল হয়েছে। স্থানীয়ভাবে এ রকম ঘটনা ঘটবে। কিন্তু সরকার যদি শক্ত হাতে মোকাবিলা করে এবং সিভিল সমাজ যদি তাতে সমর্থন যোগায় তাহলে তারা হালে পানি পাবে না। অস্ত্রশস্ত্র তাদের আছে, কিছু লাশ তারা ফেলবেও, কিন্তু জনসমর্থন না থাকলে তারা কিছুই করতে পারবে না। আর বিএনপি যতই তাদের মদদ দেবে, ততই তারা ফতোয়াবাজ, রাজাকারের দল হিসেবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। রাজাকারবিরোধী যে মনোভাব দেশে সৃষ্টি হচ্ছে তা কি বিএনপির সুস্থ মানুষদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে?

আমাদের মধ্যে, রাজনৈতিক দলের মধ্যে, সমাজের সব স্তরেই দলাদলি-গ্রুপিং আছে। কিন্তু এখন আরেক ধরনের মেরুকরণ দরকার। সেটি হবে আমরা বর্বর যুগ, তালেবানদের শাসন, অশিক্ষিত মূর্খ, ফতোয়াবাজ-রাজাকার নেতৃত্বের পক্ষে না বিপক্ষে? অনেকে ভাবছেন, মাঝামাঝি থাকলে ফায়দা পাবেন। মোটেই না। আমাকে অনেকে বলছেন, বাড়াবাড়ি করছ, মারা পড়বে। আমি বলি, যদি না লিখি আর আমিনী, আযীযুল হক গং ক্ষমতায় এলে কি আমি বা আমরা বেঁচে থাকব? বিএনপির যেসব নেতানেত্রীর ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত, বাইরে পড়াশোনা করে, ব্যবসা করে, তারা নিরাপদে থাকবে? বলা হয়ে থাকে, প্রশিকা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনীতি করে। ব্রাকে তো এসব কিছুই করছে না, তাহলে তাদের অফিস আক্রান্ত হচ্ছে কেন? আওয়ামী লীগের অনেকে মনে করতে পারেন, এখন এসব করার কী দরকার, নির্বাচনটা যাক। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে নির্বাচনে জেতা যাবে এদের প্রতি নমনীয় হয়ে? তা'হলে তো সিভিল সমাজের একটা বড় অংশই আওয়ামী লীগের বিপক্ষে চলে যাবে।

মূল বিষয় হচ্ছে, ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মাঠে নেমেছে। তারা এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে, মসজিদেও মুসলমান হত্যা করছে। বিএনপি চাচ্ছে সরকারকে অস্থিতিশীল অবস্থায় ফেলে ফায়দা লুটতে। আমরা সবাই পরস্পরের প্রতি অভিযোগ ভুলে যদি এদের বিপক্ষে দলমত নির্বিশেষে মেরুকরণে সাহায্য না করি, তা হলে আমরা তো দূরের কথা বাংলাদেশ নামের অস্তিত্বও থাকবে কিনা সন্দেহ।

৮.২.২০০১

এবার কি হবে, ভাইজান?

গত পরশু ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইসলামী আইন বাস্তবায়ন পরিষদ এক সমাবেশ করে। খবরে প্রকাশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাধারণ মানুষ এই সমাবেশের কারণে আতঙ্কে ছিল। সমাবেশের আগে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে মাইকিং করা হয়। খবরে আরও জানা গেছে, আওয়ামী লীগের সচেতন কিছু কর্মী ও নেতা এর প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের অন্য অংশ, সংখ্যাগরিষ্ঠই হবে, এ ক্ষেত্রে 'চোরি চোরি চুপকে চুপকে' নীতি গ্রহণ করে। মূল কথা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একচ্ছত্র নেতা 'বড় হুজুর'। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এই সমাবেশ হচ্ছে। সুতরাং কিছু বলা যাবে না। নির্বাচন সামনে, সমাবেশ ভালো, খুব ভালো। এই সমাবেশে প্রায় পঞ্চাশজন ছোট বড় বক্তা বক্তৃতা করেন এবং সভাপতিত্বে করেন 'বড় হুজুর'-এর সাগরেদ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। সমাবেশে বক্তারা ফতোয়া দেন "আগামী নির্বাচনে ৬টি আসনের মধ্যে একটিতেও আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ভোট না দেয়ার এবং বলেন, ওটা হলে শহীদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করা হবে।" (জনকণ্ঠ, ২০.৩) ভাইজান এখন কী হবে?

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বড় হুজুরের একাধিপত্য। অনেক জায়গা ঘুরেছি বাংলাদেশের, কিন্তু গত এক দশকে পা দেইনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ভয়ে। আমরা নাদান জনতা, ভীতু, কিন্তু যারা রাজনীতি করেন তাঁরা তো ভীতু নন। এটাই জানতাম। বিগত গত কয়েক বছরে একটা সত্য জেনেছি। সারা দেশে আওয়ামী নেতৃত্ব, কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি এক রকম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঠিক বিপরীত। তাঁরা মানুষকে সাহস না দিয়ে বরং ভীতু হতে প্ররোচিত করেন এবং এর কারণ ---- কারণ, একটিই–ধর্ম।

দুঃখের বিষয়, আজ একুশ শতকে আমরা পঞ্চদশ শতকের মানুষের মতো আচরণ করছি। আমরা কেন, কমবেশি সারা বিশ্বের মানুষই তা করছে। ধর্ম রাজনীতিতে বড় হয়ে উঠছে। কমিউনিজম ঠেকাতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সব দেশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের অথবা স্বৈরশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। তালেবানদের কি মার্কিনীরা সহায়তা করেনি? এবং ভুল ক্রমে মৌলবাদ এখন সভ্যতা, ঐতিহ্যের বিনাশকারী শক্তি হয়ে উঠেছে। ভারতে তথাকথিত 'লুণ্ঠনকারী' হিসাবে পরিচিত সুলতান মাহমুদও যা করেননি, এখন তাই হচ্ছে। বিজেপির নেতৃত্বে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা হচ্ছে আর আফগানিস্তানে তালেবানরা বুদ্ধ মূর্তি ভাঙছে। তার সমর্থন করছে আবার বাংলাদেশের আযীযুল হকরা। ধর্মের নামে, ভোটের নামে এদের এমন প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে যে, এখন গল্পের সেই দত্যির মতো ঘাড় থেকে তাদের নামানো মুশকিল।

রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা তৈরি হয়েছে, আছে। বিশেষ করে গরিব দেশে যেখানে

অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত। যে কারণে বাংলাদেশে সত্যিকার ইসলামবিরোধী ইসলাম ধর্ম বিকশিত হয়েছে এইসব 'হুজুর'দের নেতৃত্বে। বিশেষ করে স্বাধীনতার পর। আবেগপ্রবণ না হয়ে একবার চিন্তা করে দেখুন তো পাকিস্তান আমলেও প্রতিটি পর্যায়ে ধর্ম নিয়ে এত বাড়াবাড়ি হয়েছিল কি-না।

ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান হয়েছিল, সত্য। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার প্রতিবাদ করেছে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা। যে কারণে সামরিক আইন জারি হয়েছে বটে কিন্তু ধর্মভিত্তিক কোনো দল সরকারে বসতে পারেনি। ধর্ম যে আমাদের রাজনীতিতে বড় ফ্যাক্টর ছিল না, তার বড় প্রমাণ মুক্তিযুদ্ধ। তা না হলে বাঙালি মুসলমান কেন পাকি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে।

আজ এটা প্রমাণিত যে, ১৯৭৫ সালের পর থেকে বিশেষ করে দুই জেনারেল, জিয়া ও এরশাদ আমলেই ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে আনা হয় এবং নির্লজ্জভাবে ধর্ম ব্যবসা শুরু হয়। যে এরশাদ মাসে একবার আটরশি না গেলে শান্তি পেতেন না সেই এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তো এক দিনও আটরশি গেলেন না। যিনি স্বপ্ন দেখে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তো তিনি আর মসজিদ নিয়ে স্বপ্ন দেখলেন না। তিনি রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করলেন, মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবী ছাড়া তো কেউ প্রতিবাদ করলেন না? ভাবলেন সবাই, ধর্ম নিয়ে কথা, কে কী বলে আবার! কিন্তু, এই সত্য কেউ বললেন না, ধর্ম নিয়েই যদি কথা হয় তা হলে মুক্তিযুদ্ধ হলো কীভাবে? ধর্মভিত্তিক দলগুলো যখন নিষিদ্ধ করা হলো ১৯৭২ সালে, কই তখন বাঙালি মুসলমান তো আপত্তি করেনি। বঙ্গবন্ধু মুসলমানত্ব বজায় রেখেও তো ধর্মকে টেনে আনেননি রাজনীতিতে, বরং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করা থেকে মানুষকে দূরে রেখেছেন। এখানেই তাঁর মহাপুরুষত্ব!

গত এক দশকে বামপন্থী দলগুলো ছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক দল ধর্মকে কমবেশি ব্যবহার করেছে রাজনীতিতে। যে আওয়ামী লীগ সেক্যুলারবাদীদের সমর্থন পায় সে আওয়ামী লীগই প্রকৃতঅর্থে ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি কখনও। না, ভুল বললাম, এ বছরই প্রথম শেখ হাসিনা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

এই প্রশ্রয়ের ফল যে কী হতে পারে তার উদাহরণ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আওয়ামী লীগ। প্রশিকার মহাসম্মেলন এই হুজুররা বানচাল করে দিল। অথচ প্রশিকা ধর্মবিরোধী কিছু করেনি এবং সেই মহাতাণ্ডবের সময় আওয়ামী লীগ প্রশিকার পক্ষে এগিয়ে আসেনি; বরং ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাজনীতির যারা কলকাঠি নাড়েন তাঁরা প্রশিকার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। এ কথা তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন যে, আওয়ামী লীগকে জিততে সাহায্য করেছিল এনজিওর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কর্মীরা। হুজুররা নন। এখন হুজুররা ঘোষণা করেছেন-"এত দিন শেখ হাসিনার ধোঁকায় পড়ে এনজিওবিরোধী আন্দোলন করেছি, এখন আন্দোলন হবে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে।" (ঐ) ভাইজানরা এখন কী বলবেন? কী করবেন? এবং এনজিওরা যদি আওয়ামী লীগ যেমন হুজুরদের পক্ষ নিয়েছিল ঠিক সেভাবে হুজুরদের পক্ষ নেয় বা চুপচাপ থাকে, তখন কী

হবে ভাইজান? আপনারা কি পাততাড়ি গুটিয়ে ঢাকা চলে আসবেন?

"সমাবেশের অন্যতম বক্তা মাওলানা ফুরকানউদ্দিন উর্দুতে তার জঙ্গী বক্তৃতায় বলেন, এবারের সংগ্রাম খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।" (সংবাদ ২০.৩) অন্যরা এ ধরনের বক্তব্য রাখলে তো আওয়ামী কর্মীদের রক্ত গরম হয়ে যায়। তা ব্রাহ্মণবাড়িয়া আওয়ামী লিডারদের রক্ত বরফের চেয়ে শীতল– ঠিক না ভাইজান? "হাফেজ্জী হুজুরের ছেলে শাহ আহম্মদউল্লাহ আশরাফ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাম শহীদবাড়িয়ায় রূপান্তর করে তা সর্বস্তরে ব্যবহার করার নির্দেশ দেন।" (ঐ) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হুজুর-নেতাদের নির্দেশে তাঁরা নিশ্চয় নাম বদল করে ফেলেছেন। নাকি ঢাকার লিডার হবু এমপি প্রার্থী যিনি পাঁচ কোটি টাকায় নির্বাচন হবে কিনা জানতে চেয়েছেন তার নির্দেশ পাননি। আমার মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে নাম বদল করে ফেলুন, হুজুররা আবার গোস্বা হলে যদি ভোট না পান!

এই ভোটের দোহাই দিয়ে এই অপশক্তিকে আজ দানবে পরিণত করেছেন একশ্রেণীর নেতাকর্মী। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তো আমরা আশা করি এ ধরনের অপপ্রচার করে যে জনমত সংগঠিত করা হয়, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জনমতকে নিজেদের মতে আনবেন। সৎ রাজনীতিবিদ তো গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসান না। এ প্রবণতা রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিরল হয়ে উঠছে।

অপশক্তিকে যখনই আমরা প্রতিরোধ করতে বলেছি, তখনই আওয়ামী লীগের একটি অংশে হৈ চৈ পড়ে গেছে। তাদের অনেকের ধারণা, ইনকিলাবীরা আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে। তাই যদি হতো তাহলে তো ইনকিলাব প্রকাশের দরকার পড়ত না। কিন্তু প্রতিরোধ যখন হয়েছে তখন স্বঘোষিত আল্লামা ও মুফতিরা গর্তে ঢুকে গেছে। ঢাকার রাজপথে তো আমিনী অনুসারীরা আর দাপাচ্ছে না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সমাবেশে তারা খিস্তিখেউর (হুজুররা যদি খিস্তিখেউর করে তাহলে তাদের মাদ্রাসার ছাত্ররা কী করবে অনুমেয়– এই নাকি ইসলামী শিক্ষা) করেছে বটে কিন্তু দাপাদাপি করেনি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আওয়ামী লীগাররা তো অনেক হুজুর হুজুর করেছিলেন। তা হুজুররা ভোট দিলে হারলেন কেন? এখন তো হুজুররা ফতোয়া জারি করেছেন। তাহলে কী হবে ভাইজান? নৌকা মার্কা নিয়ে লড়বেন নাকি অন্য কোনো মার্কা নেবেন? যদি হুজুরদের নিষেধাজ্ঞা, মানে ফতোয়া না মেনে দাঁড়ান তা হলে ধরতে হবে নিজেদের জোরে লড়াই করছেন। তাই যদি করতে পারেন তাহলে এত দিন হুজুর হুজুর করে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিদের অপদস্ত করলেন কেন? জবাব দেবেন ভাইজানরা? আপনাদের নেতারা যাই বলুন, আমরাও বলতে পারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই ঘটনায় স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে যারা অপদস্থ করেছিল তাদের ভোটদানে বিরত থাকুন। দেখুন তো হুজুরদের ভোটে জেতেন কিনা? আমাদের আপনারা ঢোল হিসাবে মনে করেন, তাই না ভাইজান? দেখুন তো এবার মনমতো বাজাতে পারেন কিনা?

২৩.৩.২০০১

বিকৃত পশুশক্তির প্রতি আমাদের ধিক্কার

বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যবাহী রমনা বটমূলের প্রভাতী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নারকীয় হামলা ও হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষ স্তম্ভিত। এই পাশব সন্ত্রাসের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। বাঙালির হাজার বছরের মানবিক সাধনার যে ধারা তার নামে আমরা ধর্মান্ধ বিকৃত পশুশক্তির প্রতি ধিক্কার জানাই। এই মানবতার অঙ্গীকার থেকে অমানবিক হীনতার বিরুদ্ধে সকল সচেতন নাগরিকের কাছে সমবেত সোচ্চার প্রতিবাদী জাগরণের আহ্বান জানাই।

বাংলা নববর্ষ আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। পহেলা বৈশাখ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির জাতীয় উৎসব। একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল জাতি গঠনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল যেমন বাংলাদেশ তেমনি এই উৎসব। এদিকে দেশের সব জেলা ও জনপদে অসংখ্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উদ্‌যোগে সারা দেশে সার্বজনীন উৎসবের আয়োজন হয়। এই জাতীয় উৎসবের ঐতিহ্যবাহী মূল কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে হামলা স্বভাবতই নববর্ষের সকল অনুষ্ঠানের ওপর হামলার শামিল।

কেন এই হামলা? কারা সম্ভাব্য হামলাকারী?

এই বোমা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যশোরে উদীচীর জাতীয় সম্মেলনে হামলা, পল্টনে সিপিবির সমাবেশে হামলা এবং ছায়ানটের নববর্ষের অনুষ্ঠানে হামলার মধ্যে যোগসূত্র থাকাই স্বাভাবিক। সাংবাদিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক কর্মীর ওপর হামলা ও তাদের হত্যার ও হুমকির ঘটনাগুলোও সম্ভবত বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চলেছিল তার বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীসহ গণবিরোধী সকল অপশক্তি নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। দেশ ও জাতি যখনই তার অভীষ্ট অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মানবিক সমাজ গঠনের বাতাবরণ তৈরিতে নিমগ্ন হয়, কিছুটা বা সফল হয় তখনই এই অপশক্তি মরিয়া হয়ে আঘাত হানতে থাকে। যত দুর্বল ও সীমিত হোক যখন পর পর দু'টি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার এক দশক পূর্তি হলো এবং আরও একটি নির্বাচন আসন্ন তখন সন্ত্রাসের মাধ্যমে এই গণতান্ত্রিক বিনির্মাণের প্রক্রিয়াই সবচেয়ে বেশি সঙ্কটাপন্ন হবে। অপশক্তির ছল ও চাতুরীর অভাব নেই। এ দেশের ধর্মপ্রাণ সরল মানুষকে তারা সবচেয়ে বেশি ধোঁকা দেয় ধর্মেরই নামে, ইসলামের নামে।

উদীচী, সিপিবি বা ছায়ানটের অনুষ্ঠানে বোমা হামলায় হতাহত হয়েছেন নিরপরাধ-নিরীহ সাধারণ মানুষ। এই হত্যাকাণ্ড কিভাবে ইসলামসম্মত হতে পারে? আদৌ কোনো ধার্মিকের পক্ষে কি এ কাজ সম্ভব? নিরীহ-নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করা কি

জেহাদ হতে পারে? এমনকি ভিন্নমতাবলম্বীকেও আঘাত করা ধর্মসম্মত নয়। এই গোপন প্রতিহিংসার রাজনীতি একমাত্র বিকারগ্রস্ত অধার্মিকেরই সাজে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এ দেশে সাধারণ দরিদ্র, শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের সারল্য ও অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মভীরুতাকে চাতুর্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা ও রাজনীতিক সমাজে বিভেদ, সংশয় ও হিংসার বীজ বপন করে চলেছে। তারা প্রকাশ্যে বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মনীষা এমনকি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় জীবনে পুরোধা ব্যক্তিত্ববৃন্দ, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে, ইতিহাসের নানা মীমাংসিত ইস্যু নিয়ে অযাচিতভাবে অহেতুক বারংবার প্রশ্ন তুলে চলেছে। এসব সম্পর্কে মানুষের মনে সংশয়ই নয়, অশ্রদ্ধা এবং বিতৃষ্ণা সৃষ্টিরও অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর সবই তারা করছে ইসলামের দোহাই দিয়ে। তবে তাদের উত্তরোত্তর হিংস্র ও মরিয়া আক্রমণ থেকে বোঝা যায় তাদের কোনো নীলনক্সা এ যাবত আশানুরূপ সাফল্য পায়নি। বাঙালি নানা দোলাচল, ব্যর্থতা, ভীরুতা ও প্রাপ্তির মধ্যেও তার হাজার বছরের মানবতার ঐতিহ্যকে ত্যাগ করেনি। তাতে বোধহয় অন্ধ পাশবশক্তির হিংস্র থাবা আরও প্রখর ও প্রকট হয়ে পড়ছে।

এইখানে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব, যে কোনো হত্যা ও অন্যায় যদি প্রতিকারহীন, বিচারবিহীনভাবে পার পেয়ে যেতে থাকে তাহলে শুভবুদ্ধির বিরুদ্ধে অশুভ শক্তি মদত পেয়ে যায়। উদীচী সিপিবি ট্র্যাজেডির বিচার কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। শামছুর রহমান, কাজী আরেফ, রতন সেন, কালিদাস বড়ালসহ অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের বিচারেও তেমন অগ্রগতি নেই। আরও অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের হতাশাজনক পরিণতি কেবল সমাজে ন্যায়- অন্যায়, শুভাশুভ সত্য-অসত্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিচ্ছে তা নয় অপরাধীকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ও শক্তিশালী করছে। সেই সুযোগে ধর্মান্ধ রাজনৈতিক বিপ্লবের ঘোরে আচ্ছন্ন অগণতান্ত্রিক গোষ্ঠী শক্তি সঞ্চয় করছে এবং সমাজের শুভ গণতান্ত্রিক ধারায় ওপর আঘাত হেনে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে সক্রিয় হয়ে উঠছে। আমাদের দ্বিধা ও শৈথিল্য, দুর্নীতি ও আপোস, ক্ষমতার লোভ ও ক্ষুদ্রস্বার্থের ভেদবুদ্ধি তাদের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও আসন্ন নির্বাচনকে তারা কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চায়।

আমরা ছায়ানট ট্র্যাজেডির হতাহত সকলের নিকটজনের কাছে সমবেদনা জানাই। সেই সাথে বলব, হতাশ হবার বা হাল ছেড়ে দেয়ার কোনো কারণ নেই, কোনো উপায়ও নেই। ত্রিশ লাখ শহীদের পবিত্র আত্মার অর্পিত দায়িত্ব আমরা ভুলতে পারি না; যে লক্ষ কোটি মানুষ বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে এই স্বাধীনতাকে স্বপ্ন থেকে বাস্তব করেছে স্বৈরাচারী বিকার তাড়িয়ে গণতন্ত্রের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তাদের ত্যাগকে অমর্যাদা করতে পারি না আমরা।

আমরা বুঝতে পারি সামনের দিন হয়ত আরও কঠিন হবে। হয়ত এই মরিয়া বন্য অশুভশক্তি আরও হিংস্রতা ও জিঘাংসা নিয়ে মানবতার চিরায়ত বাঙালি ধারার ওপর আঘাত হানার চেষ্টা করবে। আপোস বা পিছু হটার চেষ্টা করে এই শক্তিকে দমন করা

যাবে না। কারণ এ অন্ধ, তারও চেয়ে বড় কথা বিকারগ্রস্ত। পথ সামনেই, চলতে হবে সামনের দিকে। গণতন্ত্রের চলমান ধারাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অংশ করে তুলতে হবে, পরিণত করতে হবে ঐতিহ্যে, যেমনভাবে হয়েছে মানবতার ধারা।

আমরা পাকিস্তান আমলে আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর আঘাতকে যেভাবে প্রতিহত করেছি এবং সকল অপশক্তিকে একাত্তরে যেভাবে পরাভূত করেছি সেভাবেই আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে হবে।

১৬.৪.২০০১

সাকাচৌর কান্না, আমিনীর চিৎকার, অন্যদের মৃদু হাসি

কিছু কিছু কথা বার বার লিখতে হয়, মানুষকে পুরনো স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য, যাতে মানুষ ভবিষ্যতের সঙ্গে বুঝতে পারে। কোনো কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বার বার লিখতে হয়, লিখতে না চাইলেও, যাতে মানুষ ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ছবিটি। দুই পুলিশের ঘাড়ে ভর দিয়ে বিশালদেহী রাঙ্গুনিয়ার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ওরফে সাকা চৌধুরী বেরিয়ে আসছেন এবং তিনি কাঁদছেন। তাঁকে ধরে রাখা হবে না, সেটা সবাই জানত, কিন্তু তাঁর চোখে পানি, এটিই সবাইকে বিস্মিত করেছে। কারণ ১৯৭১ সালে সাকার চোখে পানি ছিল না। তরুণ সাকা এবং তার পিতা ফকা চৌধুরী চট্টগ্রামে কী করেছিলেন তা বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রপত্রিকায় আছে। মাহবুবউল আলম তাঁর 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন; ১৪ এপ্রিল, ১৯৭১ পিতা-পুত্র ও পাকিরা মিলে কুণ্ডেশ্বরীর অধ্যক্ষ নূতন চন্দ্র সিংহকে হত্যা করে। লেখকের বর্ণনায়, "তার জন্য কেঁদেছে হিন্দু, কেঁদেছে মুসলমান। মুসলমান যখন কেঁদেছে সালাউদ্দিন প্রবোধ দিয়েছে ঃ 'মালাউন' মলো, তোমরা শোক কচ্ছ কেন?" সুতরাং ২০০১ সালে সাকার চোখে পানি সেটি অত্যাশ্চর্য বটে। তবে, এই অশ্রু কাউকে বিচলিত করেনি। চাঁটগার মানুষদেরই দেখেছি নির্বিকার এবং বলছে, সাকার চোখে যখন পানি তখন সামনে খুন-খারাবি আছে। আসলে সাকার সঙ্গে অশ্লীল মন্তব্য খুন খারাবি শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে যায় আপনা-আপনি। প্রায় একই সঙ্গে আরেকটি সংবাদে দেখলাম, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা ফজলুল হক আমিনী জেল থেকে বেরিয়েছেন এবং বেরিয়েই চিৎকার– "আমি থাকব না চার জোটে।" আমজনতা এগুলো দেখে, পড়ে আর হাসে। তাদের কাছে এসব নতুন কিছু নয়। এগুলো ঘটবে তারা জানে, জানত। তারা এসব নাটকে অভ্যস্ত, কারও চোখে এখন জল, পরমুহূর্তে হাতে স্টেন। কারও গলা এখন চড়ে যায় পরমুহূর্তে পোষা জন্তুর মতো হাত থেকে খাবার খুঁটে যায়। অনেকে বলছেন, পত্রিকাগুলো কী কারণে সাকা বা আমিনীর মতো লোকদের নিয়ে এত নাচানাচি করে। এর উত্তর, পত্রিকা পণ্য, পত্রিকা বিক্রি হতে হবে। সেখানে উত্তেজক খবর থাকবেই, কারণ বাংলাদেশের মানুষ উত্তেজনায় অভ্যস্ত। তাছাড়া, আমাদের রাজনীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সাকা যুদ্ধাপরাধী হওয়া সত্ত্বেও এ দেশের সাংসদ, মন্ত্রী সব হয়েছেন। আমরা তা মেনেও নিয়েছি। যারা তাঁকে বানিয়েছে বা পরিণত করেছে আজকের সাকায়, তাদের আমরা ছি ছি না করে শুধু সাকাকে ছি ছি করলে হবে তা এক ধরনের আত্মপ্রতারণা। সাকা, আমিনী আমাদের দেশের রাজনীতি, একশ্রেণীর রাজনীতিবিদের

দৃষ্টিভঙ্গি, সাধারণ মানুষের চেতনার স্তরের প্রতিফলন। এটি অস্বীকারের কি কোনো উপায় আছে?

সাকা ১৯৭১ সালে কী করেছেন তা সংক্ষিপ্তাকারে গণতদন্ত কমিশন রিপোর্টে আছে। শুনেছি, আমার ভুল হতে পারে, স্বাধীনতার পর তিনি ও তাঁর পিতা দেড় মণ সোনাসহ ধরা পড়েন। সাকার পিতা জেলে মৃত্যুবরণ করেন। সাকা বিদেশ চলে যান। পিতৃদত্ত বিত্ত তাঁর ছিল কিন্তু গত তিন দশকে তা ফুলে ফেঁপে এত হয়েছে যে তিনি নিজেও তার হিসাব জানেন কিনা সন্দেহ। এই বিত্তই অস্ত্র কিনতে, মানুষ কিনতে, ভোট কিনতে সাহায্য করে এবং আমরা জানি, এই তিনটি বস্তুই বাংলাদেশে এখন সহজলভ্য ও সস্তা। সা. কা ফিরে রাজনীতি শুরু করেন। তাঁর যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে অনেকেই বিস্মৃত হলো। তাঁর ঘাঁটি রাঙ্গুনিয়া। সেখান থেকে তিনি কখনও পরাজিত হননি। কেন হননি তার অনেক কারণ আছে, কিন্তু তাঁর এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি তো তিনি!

আজ যাঁরা সাকার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন, ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁদের যদি বলি, সাকা তো আমাদেরই সৃষ্টি। তাহলে এর উত্তর কী হবে? সাকার উত্থান তো জিয়া ও এরশাদ আমলেই। কোনো রাজনৈতিক দল কি তাতে আপত্তি করেছে? রাজনৈতিক দল ও তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন, সাকা বা তাঁর মতো লোকদের বিরুদ্ধে আপনারা কী করেছেন? একটি হিসাব অনুযায়ী "খুন, অপহরণসহ বিভিন্ন গুরুতর অপরাধের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে গত ১০ বছরে দায়ের করা ৮টি ফৌজদারী মামলা এখন বিভিন্ন আদালতে চূড়ান্ত বিচারের পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া ১৯৭১ সালে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে রেকর্ডকৃত আরও ৬টি মামলা পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া চলছে।" (সংবাদ, ২.৬.২০০১)।

এরকম একজন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দলের নেতা ছিলেন, সর্বশেষ বিএনপির, তাহলে বুঝুন বিএনপির অবস্থান কোথায়! এই যে ১৪টি মামলা তার কোনোটিরও ৩০ বছরে সুরাহা হলো না, এমনকি আওয়ামী আমলেও! মোর্শেদ খান মিষ্টির দোকানের হামলায় জননিরাপত্তা আইনে খাবি খান আর সাকার দোরগড়ায় একজন নিহত হয় কিন্তু জননিরাপত্তা আইন সেখানে অচল। এর মাজমা কি মানুষ বোঝে না? সব মানুষ কি গরু?

সংবাদপত্রের মতে, "কি সরকারি দলে, কি বিরোধী দলে সাকার গোপন সম্পর্কের রয়েছে শক্ত ভিত্তি।" "(জনকণ্ঠ ২.৬.২০০১) সাকা এত অপছন্দীয় হলে নির্বাচিতই বা হন কিভাবে, রাজনৈতিক দলগুলোতেই বা এত পাত্তা পান কিভাবে? বিএনপি নেতা আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেছেন, "বর্তমান সরকারের কোনো না কোনো অংশের সাথে আঁতাত এবং অতীতেও বিএনপির কোনো কোনো নেতার সাথে সম্পর্ক রেখে তিনি ফায়দা লুটেছেন?" এ কথা তো আগে কখনও বলেননি আপনারা। কেন বলেননি বা আমরাও বলি না এ প্রশ্নগুলো নিজেকে করুন। সাকা বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন তাতে কী? তিনি নতুন দল করবেন অথবা আরেকটি দলে যোগ দেবেন। কেউ তাঁকে বাধা দেবে না। সা. কা. যখন গ্রেফতার হন আমি তখন চাঁটগায়। সাকার গ্রেফতারের খবর যেই শুনে, একটু বিস্ময় প্রকাশ করে, তারপর মৃদু হাসে। বলে, সাকা ছাড়া পেয়ে

যাবে। সাকা নিজেও বলেছেন, "পারলে গ্রেফতার করে নিয়ে যাক। এত ব্যস্ত হবার কী আছে?" [প্রথম আলো, ২.৬] কারণ, মানুষ জানে, আ. লীগ এখন সাকাকে ব্যবহার করবে বিএনপির বিরুদ্ধে বিএনপিকে পর্যুদস্ত করার জন্য। সব রাজনৈতিক দল-ই এটি করবে। আমাদের আপত্তি অন্যখানে। তা হলো, অস্ত্রের ব্যবহার। কেন জানি মনে হয়, চট্টগ্রামে অনেক লাশ পড়বে। একটি বিষয় উল্লেখ্য, যাঁরা সাকা বা তাঁর মতো যাঁদের ব্যবহার করেছেন বা করছেন তাঁরা কিন্তু কখনও ভাবেননি সাকাদের দ্বারা তাঁরাও ব্যবহৃত হয়েছেন। সাকারা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যাঁরা সাকাদের ব্যবহার করেছেন তাঁরা রাজনীতিতে একটি নতুন মডেল তৈরি করেছেন- তা হলো সাকা মডেল। হাসিনা বা খালেদা মডেল নয়। রাজনীতিতে সাকা হতে পারলে কেউ তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা যা খুশি করতে পারেন। একসময় তাঁরাও হারিয়ে যাবেন বা মাটিতে লুটিয়ে পড়বেন তা সত্য, কিন্তু যে ক'টা দিন থাকবেন সে ক'টা দিন তো দাপটে থাকবেন। যাঁরা সুস্থ রাজনীতির ধারক তাঁরা এদের সামনে টিকতে পারছেন না। কারণ কোনো দলেই গণতন্ত্র নেই। সব দল পরিচালিত হয় এক বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের দ্বারা। সেখানে শুধু থাকে ক্ষমতার প্রশ্ন অন্য কিছু নয়।

একই সঙ্গে আমিনী জেল থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে বলছেন, "৪ দলের জোটের সাথে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন করা যাবে কিনা পরে জানাব।" বলেছেন তিনি, "আমরা জেল খেটেছি, নির্বাচনে সম্মানজনক আসন দিতে হবে।" (সংবাদ ২.৬) এই আমিনী বিএনপি আমলে বিএনপিকে লক্ষ্য করে বলেছিল, "অযোগ্য সরকার।" শুধু তাই নয়, "আমরা ভারতের অঙ্গরাজ্যে বাস করছি।" (সংগ্রাম) "সরকার উৎখাত না করলে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা যাবে না।" সেই আমিনী যদি বিএনপির সঙ্গে জোট বাঁধে তা হলে বিএনপিও আমিনীর চরিত্র কি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা আমিনীর নিন্দা করি, কিন্তু যারা তাঁকে প্রশ্রয় দেয় তাদের সমর্থন করি, কিভাবে? বিএনপির একজন সমর্থক আমাকে বলেছিলেন, এইসব বর্জ্য পদার্থকে বাদ দিয়ে যদি বিএনপি নির্বাচনে লড়াই করতো তাহলে জিততো। বক্তিগতভাবে আমারও তাই মনে হয়। বিএনপি কী মনে করে, আমিনী বা জামায়াতের পিছে আছে লাখ লাখ ভোটার? বা সাকার? বরং এসব কারণে একথাটাই এখন রটছে, যে আওয়ামী লীগ জিতবে। ভোটের আগেই বিএনপি হেরে যাচ্ছে। বিএনপি কিছু বর্জ্য ত্যাগ করছে। বাকিগুলোকে করলে তার সিট হয়ত কিছু বাড়বে। আর আ. লীগ এসব বর্জ্য ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু জোট? যদিও সবাই বলেন, রাজনীতিতে শেষ কিছু নেই, তা সত্ত্বেও কট্টর এক আওয়ামী লীগার বলেছেন, এসব হলে দল ছেড়ে দেব। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যেই এ ধরনের একটি বড় অংশের সৃষ্টি হয়েছে যা রাজনীতিবিদরা হয়ত আঁচ করতে পারছেন না। রাজনীতিবিদরা ভাবছেন তাঁরা খুব রাজনীতি করছেন। এতে অনেকেই মৃদু হাসছেন। কারণ রাজনীতিবিদদের একাংশ জানেন না, তাঁদের অবস্থা 'রাজার নতুন পোশাক' গল্পের রাজার মতো। তাঁরা ভাবছেন, নতুন পোশাক পরে হাঁটছেন, আসলে তাঁদের পরনে

কিছুই নেই। আমরাও যদি সমাজে রাজনীতিতে সাকা বা আমিনী মডেলদের একঘরে করতে না পারি, বা যারা তাদের সমর্থন করে (তা সরকার বা বিরোধীদল যেই করে) তাদের বিরুদ্ধে অনবরত প্রতিবাদ না জানাই তা হলে বাংলাদেশে নিশ্চিন্তে পরিবার পরিজন নিয়ে আমাদের বসবাস করা সম্ভব হবে না। আমরা ভুলে যাই বর্জ্য জমতে জমতে বুড়িগঙ্গারও পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তা হলে, ঢাকা এক মহেঞ্জোদারোতে পরিণত হবে।

৪.৬.২০০১

বোমা মেরে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যায় না

বোমাবাজির ধর্ম ও ধর্মের মধ্যে মিল আছে শুধু 'ধর্ম' শব্দটির। বোমাবাজির সঙ্গে ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল সূত্রের কোনো মিল নেই বৈপরীত্য ছাড়া। বানিয়ারচরে গির্জায় বোমা মেরে মানুষ হত্যার খবরটি শুনে এ কথা মনে হলো।

কেউ বলেনি এ বোমা হামলা হয়েছে বিএনপির তরফ থেকে বা আওয়ামী লীগের তরফ থেকে। ১৯৯৯ সালের মার্চে যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠান থেকে ৩ জুন বানিয়ারচরে হামলা পর্যন্ত ৬টি বড় ধরনের বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে ৫২ জন, আহত তিন শতাধিক। পত্রিকার খবর অনুসারে "এ বোমা বিস্ফোরণের পিছনে বার বার মৌলবাদী চক্রকে দায়ী করা হলেও সুনির্দিষ্টভাবে পুলিশ এখনও তাদের চিহ্নিত করতে পারেনি। গ্রেফতার হয়নি হরকত নেতা মুফতি হান্নান।" [সংবাদ, ৪.৬.০১] এ-সব বোমা হামলায় মৌলবাদী চক্র ও তার সহযোগীদের হাত আছে বলে অনুমান করা হয় এবং এ-সব হামলার একটা প্যাটার্ন আছে। মন্দিরে হামলা হয়েছে, মসজিদে বোমা মারা হয়েছে, এবার হলো গীর্জায়। ১৯৭১ সালের একটি পোস্টারে লেখা ছিল– আমরা মুসলমান, আমরা হিন্দু, আমরা খ্রিস্টান, আমরা বাঙালি [ভাবার্থ]। সুতরাং ক্রমান্বয়ে তিন ধরনের ধর্মীয় উপাসনাগারে বোমা হামলার একটি প্যাটার্ন আছে, সেটি ১৯৭১ সালের মতো অর্থাৎ বাঙালির বিরুদ্ধে। উদীচী ও রমনার বটমূলের অনুষ্ঠান বাঙালি সংস্কৃতির প্রতীক। মৌলবাদীরা বাঙালি সংস্কৃতির বিপক্ষে। এ দেশের অধিকাংশ সংস্কৃতিকর্মী বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রপথিক। মৌলবাদীদের তা পছন্দ নয়। 'কমিউনিস্ট' শব্দটি এদের সহযোগীদের গাত্রদাহ ঘটায়। সে কারণে কমিউনিস্টদের সভায় বোমা হামলা হয়েছে। শেখ হাসিনা আবার অসাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক, সুতরাং তাঁকে বিনাশের জন্যও অহরহ বোমা পেতে রাখা হয়।

১৯৭৫ সালের পর থেকে এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার (যা মৌলবাদ নামে অভিহিত) বিরুদ্ধে পুনর্বার লড়াই শুরু হয়েছে। এর অর্থ, এ সময়েই আবার মধ্যযুগীয় এসব বিষয় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের আমলে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর উত্থান ও পুনর্বাসন হয়েছিল। এরশাদ সে ধারাকে পরিপুষ্ট করেছিলেন। নিজেদের দল ভারি করার জন্য তাঁরা এ-ধরনের প্রগতি বিরোধী ন্যক্কারজনক কাজ করেছিলেন। এ-সবের অর্থ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বাবরী মসজিদ যখন ভাঙলো তখন নরসীমা রাও ঘুমিয়ে না থাকলে তা ঘটতো না। এরশাদ আমলে দাঙ্গা না চাইলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হতো না। আওয়ামী লীগের একাংশ ভোটের আশায় প্রথম তিন বছর সরকারকে বাধ্য করেছে

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতি নমনীয় হতে। যদি তা না হতো, তাহলে হয়ত এ-ধরনের ঘটনা ঘটতো না। আরেকটি উদাহরণ দিই। সরকার ধর্মান্ধ এবং ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি ও ব্যবসা করে তাদের প্রতি খানিকটা কঠোর হওয়ার পর রাজপথে আর তাদের উল্লাস পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু সামরিক শাসকরা গত কুড়ি বছরে যা সর্বনাশ করার তা করে দিয়ে গেছেন। সম্প্রতি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন হয়ে গেল। লক্ষণীয় তার একদিন পর বানিয়ারচরে গির্জায় মানুষ হত্যা করা হলো। অর্থাৎ এরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চাচ্ছে এ বলে যে, তোমরা কিছুই করতে পারবে না। আমাদের পক্ষ অনেক শক্তিশালী। এ শক্তিশালীকরণটি হয় অনেকভাবে। যেমন দক্ষিণ এশীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্মেলন নিয়ে অনেক রটনা শুনেছি। এম আর আখতার মুকুল তো সম্মেলনের মুখ্য সমন্বয়কারী শাহরিয়ার কবিরকে প্রকারান্তরে আইএসআইয়ের এজেন্টই বানিয়ে ফেললেন। উদ্যোক্তাদের তার সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করলেন। তিনি অবশ্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, নির্বাচনের পর সম্মেলন করতে। ঐ সময় এটি করলে কি শাহরিয়ার এজেন্ট হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতেন? কারণ তিনি মনে করেছিলেন, এ সম্মেলন নিয়ে ঝামেলা হতে পারে, নির্বাচনে হয়ত প্রভাব পড়তে পারে। এ-ধরনের ধারণা আমাদের পক্ষে যায় না। প্রধানমন্ত্রী যে সম্মেলনের প্রতিনিধি ও সমন্বয়কারীদের চায়ের নিমন্ত্রণ জানালেন তাহলে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা কী দাঁড়াল? তিনিও কি এজেন্ট হয়ে গেলেন? জনাব মুকুলের লেখার প্রতিবাদ করতে অনেকে বলেছিলেন, নানাবিধ তথ্যও দিয়েছিলেন। আমরা কেউ তার প্রতিবাদ করি নি। কারণ তাহলে জনাব মুকুলের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়। জনাব মুকুল আমাদের অনেককে সন্দেহ করতে পারেন। কিন্তু আমরা তাকে মৌলবাদী বা ইনকিলাবী ভাবি না। 'জনকণ্ঠ' এ দেশে মৌলবাদের "আফগানিস্তানের তালেবানরা যেভাবে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন বৌদ্ধ মূর্তি ভেঙ্গেছে তা পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারে নি। তিনি খ্রিস্টান স্কুলে পড়ার সময়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত চার্চে যেতেন। এতে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি।" (জনকণ্ঠ ৫.৬.০২)।

এ কথা ভুল যে, বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তলোয়ারের জোরে, এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুফীদের কারণে, যারা সাম্য ও শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন যা ইসলামের মূল উপাদান। সুতরাং বোমা মেরে অন্য সব ধর্ম নাকচ করে, উদারমনা মানুষকে হত্যা করে যারা ভুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। বোমা মেরে শুধু মানুষ হত্যা করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক মনোভাব বিলোপ করা যায় না। আমাদের হতাশা এই যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল মনে করে মৌলবাদীদের প্রতি নমনীয় থাকলে ভোটের সুবিধা হয়। তা হলে প্রশ্ন চরের পীর, মুফতি নামধারী ব্যক্তি বা জামায়াতে ইসলাম কেন একচেটিয়া ভোট পায় না?

ধর্মান্ধতা, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা বা মৌলবাদ কোনো ধর্মেরই অংশ নয়। সব ধর্মই শান্তির পক্ষে। কোনো দল যদি মনে করে তাদের ছাড় দিলে সুবিধা হবে তাহলে তারা

ভুল করবে। ফলে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব ধর্মের ও দলের মানুষকেই এ অশান্তকামীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এক্ষেত্রে যারা এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। তাদেরই সমর্থন করতে হবে। কারণ 'মৌলবাদের অন্ধকার' দেশ গ্রাস করলে আপনার ও আপনার সন্তানের ভবিষ্যত বলে কিছু থাকবে না। আপনি, আপনারা কি তাই চান?

এ দেশে মৌলবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার পত্রিকা যা কখনো এ সব বিষয়ে নমনীয়তা দেখায় নি। সে পত্রিকায় এ-ধরনের বাক-বিতণ্ডা মানুষকে বিভ্রান্তই করবে। আমাদের লড়াই ইনকিলাব জাতীয় পত্রিকার বিরুদ্ধে। আমরা পরস্পরের প্রতি যদি সহনীয় না হয়ে যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করি, নিজের অতীত না দেখি তাহলে আমাদের পক্ষের মানুষকে আরো বিভ্রান্ত করা হবে। এ-ধরনের বেশকিছু ঘটনা এ সম্মেলনের সময় ঘটেছে যা অকারণে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আর বোমাবাজদের শক্তিশালী করে তোলে।

কোনো ধর্মেই বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা বিধান নেই। বাংলাদেশে এসব ঘটনা ঘটানোর পিছে আন্দাজ করা হচ্ছে তালেবানীদের ভূমিকাই মুখ্য। বর্তমান সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই এ সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য তাদের উৎপাত শুরু করেছে। এ নিয়ে জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা হয়েছে। সরকার তা উপেক্ষা করেছে। পাকিস্তানেও বিভিন্ন সরকার তাই করেছে। ফলে পরিস্থিতি এমন যে, এসব গ্রুপ একত্রিত হয়ে সামরিক সরকারকেও হটিয়ে দেয়ার মতো শক্তি অর্জন করেছে। এ কথা জানিয়েছেন পাকিস্তানে বসবাসরত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হামজা আলভী।

বাংলাদেশেও এমন হতে পারে। কারণ উদীচী থেকে বানিয়াচরের ঘটনায় কিছু গ্রেফতার ছাড়া আর কিছুই হয় নি। আইনগত বিষয় তেমন জানি না। কিন্তু এসব ঘটনার তদন্ত ও দ্রুত চার্জশীট দেয়ার জন্য কি বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া যেত না? এবং এসব ঘটনার দ্রুত বিচার নিষ্পন্ন করার জন্য কি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যেত না? এখন পর্যন্ত এ সব ঘটনায় কেউ শাস্তি না পাওয়ায় এসব ঘটছে ও ঘটবে।

তালেবানী, ইনকিলাবী বা এদের সহযোগীদের কাছে ধর্ম বড় বিষয় নয়। তাদের মূল বিষয় হচ্ছে ধর্মকে সামনে রেখে ক্ষমতা হস্তগত করা এবং সে ক্ষমতার অর্থ হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকী সবাইকে ক্রীতদাস করে রাখা। ধর্ম বা ধার্মিকতাই যদি মূল হয় তাহলে নিরস্ত্র মানুষকে কেন এভাবে হত্যা করা হবে। পাকিস্তানের বিশিষ্ট পণ্ডিত এএইচ দানী মৌলবাদ বিরোধী সম্মেলনে বলেছেন, "আফগানিস্তানে যা হয়েছে তা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের জন্য অশনি সঙ্কেত।

৯.৬.২০০১

আততায়ী দাঁড়িয়ে দুয়ারে

সে আছে হয়ত আমার পাশেই বন্ধু বা সুহৃদ সেজে বা আগন্তুক হিসাবেই। যেখানেই যাই, আমি বা আমরা, মনে হয়, সে তো দাঁড়িয়ে আশপাশেই, দুয়ারে। ১৯৭১-এর কথা মনে হয়। রাস্তায় বেরুলে জানতাম না ফিরতে পারব কিনা। কেউ জানত না মাঝরাতে কার ঘরের দরজার কড়া নড়ে উঠবে। বাংলাদেশে ওরা এখন পেরেছে সেই আতঙ্ক, সেই অবস্থা সৃষ্টি করতে। রাত এগারোটায় চাষাড়ার খবরটা শোনার পর থেকে এ পর্যন্ত যত জনের সঙ্গে কথা হয়েছে, সবার মনে উদ্বেগ, চেহারা ম্লান– বলছে সবাই দুয়ারে দাঁড়িয়ে এখন আততায়ী। মানুষের মনের আতঙ্ক, দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যাবে রাত বারোটা পর্যন্ত বেসরকারী টিভি চ্যানেল একুশে টিভিতে গুরুত্ব দিয়ে সর্বশেষ ঘটনা জানানোয় আর সরকার বা রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যাবে বিটিভি দেখলে। যেন, এটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, গুরুত্বহীন। সরকার প্রধান বা মন্ত্রীরা খুশি কি না সেটাই বিবেচ্য।

এরকম বোমা হামলা যে হবে, মানুষ মেরে ফেলা হবে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য, যাতে বোমাবাজদের উদ্দেশ্য সফল হয়– একথা কি আমরা নতুন বলেছি? আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন লেখা লিখে, সচেতন এ্যাক্টিভিস্টরা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এসব বলেছেন। এই জনকণ্ঠেই এ বিষয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। না, কেউ গা করেনি। সরকার ও সরকারি দলের একাংশ প্রতিনিয়ত বিষয়টিকে খাটো করে দেখাতে চেয়েছে, এমনকি সাম্প্রতিক মৌলবাদ বিরোধী দক্ষিণ এশীয় সম্মেলনের ব্যাপারেও। আমার মনে আছে, শামসুর রাহমান যখন আক্রান্ত হন তখন এ গ্রুপের একজন বলেছিলেন, কবি নিজেই কাজটি করেননি তো? যে বলছিল একথা তার মনে ছিল না তার জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই শামসুর রাহমান বিখ্যাত। এ ধরনের কথা বলে বিএনপি। বলে ইনকিলাবী গোষ্ঠী। শেখ হাসিনার ওপর যখন হামলা হয় [বোমা পেতে রাখ] তখনও এই ইঙ্গিত করা হয়েছিল এ বলে যে, এটি সরকারেরই কাজ। তা হলে, শামীম ওসমানকে হত্যা করতে গিয়ে একুশ জন হত্যাও কি আওয়ামী লীগ বা শামীম ওসমানের কাজ? আমাদের দেশের বুদ্ধিমান লোকরাও এ ধরনের এ্যাবসার্ড অর্থহীন কথা বলে নিজেদের স্মার্ট ও বুদ্ধিমান মনে করেন। কিন্তু কখনও অনুধাবন করেন না, তাঁদের কথার সঙ্গে ইনকিলাব বা বিএনপির মিল থাকবে কেন? সুতরাং, একজন আওয়ামী সমর্থক বুদ্ধিজীবী যখন কবীর চৌধুরীসহ অনেককে বলেন, আইএসআইয়ের এজেন্ট (এ জনকণ্ঠেই তা ছাপা হয়েছে) তখন ইনকিলাব বলে এরা র'য়ের এজেন্ট– আমাদের তখন আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকে।

চাষাড়ার বোমা হামলা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হবে। অনেকে বিএনপি, আওয়ামী

লীগের অর্ন্তদ্বন্দ্ব প্রভৃতিকেও কারণ হিসাবে দেখাতে 'চাইবে। কিন্তু, একটি বিষয় লক্ষণীয়, এ বোমা হামলাগুলোর একটি প্যাটার্ন আছে যা অস্বীকার করা মুশকিল। গত এক বছরে এসব বোমা হামলার লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগ, তার সমর্থক, উদার গণতান্ত্রিক, যারা বাঙালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসের ভিত্তির একটি উপাদান অসাম্প্রদায়িকতা। এই সংস্কৃতি দমন করতে চায় উগ্রপন্থী ইসলামীরা। তাদের বিশ্বাস বোমা মেরে, মানুষ মেরে সবাইকে নতজানু করতে হবে এবং সেটাই ক্ষমতা। তাদের সহযোগী বিরোধী দল। তাদের এ সমর্থনের ভিত্তি বিশ্বাস নয়, বরং ক্ষমতায় যাওয়ার কৌশল। উদীচী গণতন্ত্র ও সাম্যের গান গায়। যশোরে এদের অনুষ্ঠানেই হামলাটা হলো প্রথম। চট্টগ্রামে ও (বোমা ফাটেনি তাতে কী?) রমনার বর্ষবরণ বাঙালি সংস্কৃতির প্রতীক। সেখানেও মানুষ হত্যা করা হলো। বানিয়ার চরে খ্রীস্টানরা ইসলামে বিশ্বাসী নয়, অতএব চার্চ আক্রান্ত হলো। তাদের রাজনীতির সঙ্গে যারা জড়িত নয়, সুতরাং তারা যথেষ্ট মুসলমান নয়– এ ধারণায় মসজিদেও রক্তগঙ্গা বইল। শামীম ওসমান চাষাড়ায় ঢোকার মুখে সাইনবোর্ড লাগিয়েছেন, এখানে রাজাকারদের প্রবেশ নিষেধ। জাহানারা ইমামের নামে ছাত্রীবাস করেছেন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান করে। শেখ হাসিনা আ. লীগের মৌলবাদীদের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণকারী অংশের প্রভাব কাটিয়ে যখনই কঠোর হচ্ছেন তখনই তাঁর ওপর হামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। আর যারা গ্রেফতার হচ্ছে তারা সবাই উগ্রপন্থী ইসলামী দলের। আজ (১৭ জুন) পত্রিকায় দেখলাম, 'হিযবুল্লাহ বাহিনীর আঞ্চলিক প্রধানসহ ৫ মৌলবাদী গ্রেফতার। ডিসিদের উদ্দেশে লেখা জরুরি নির্দেশনামা উদ্ধার' এবং এ পর্যন্ত যেসব ব্যক্তিকে হামলাকারী হিসাবে ধরা হয়েছে তারা সবাই মাদ্রাসার সঙ্গে জড়িত। আমাদের নীতি নির্ধারকরা দেশ আধুনিক করার নির্দেশ দিবেন। নিজের সন্তানদের উঠতি বয়সে বিদেশ পাঠাবেন আর দেশে মাদ্রাসাব উন্নয়নে কত ব্যয় করেছেন তার উল্লেখ করবেন। ভণ্ডামির একটা সীমা থাকা উচিত! দেশ আধুনিক করতে চাইবেন অথচ মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন হবে না তা'হলে ফলটা এরকমই দাঁড়াবে।

একটি কথা বলা হয় বারবার, মুসলমানা সেন্টিমেন্ট। অর্থাৎ বেশিরভাগ ভোটার মুসলমান, সুতরাং মাদ্রাসা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলা যাবে না। এ সেন্টিমেন্ট কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু, রাজনীতিবিদদের ধারণা, রাজাকারদের প্রশ্রয় দিলে মাদ্রাসা শিক্ষা বৃদ্ধি করলে, চরের পীরদের তোয়াজ করলে, ইসলামী সেন্টিমেন্ট রক্ষা হবে, ভোটের বাক্স ভরে উঠবে। আওয়ামী লীগকে সবসময় হিন্দুর দল বলা হয়, সুতরাং আ. লীগ '৯৬ সালে জিতল কি ভাবে? কেন জামায়াত, চরের পীররা ভোটে জেতে না। এর উত্তর কিন্তু কোনো রাজনীতিবিদ দেন না।

এই প্যাটার্ন ধরলে বলা যায়, উগ্রপন্থী ইসলামের নাম ধরে ইসলাম বিনাশকারীরা বিরোধী দল বা আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, বিএনপি যার নেতৃত্ব দিচ্ছে। ফৌজীরা এ ধারা পুষ্ট করছে। বলবর্ধক যুগিয়েছে আওয়ামী লীগ বিরোধীরা। এতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আওয়ামী বিরোধীদের এলিট শ্রেণীর কাছে প্রশ্ন, আপনারা যদি ক্ষমতায় আসেনও এ শক্তি আপনাদের ছেড়ে দেবে? বেগম জিয়ার নেতৃত্ব

থাকবে? এ শক্তিকে আবার মাঝে মাঝে সালসা যুগিয়েছে সরকারের তোষণ নীতি, অনেক ক্ষেত্রে অবিশষ্যকারিতা। তা' না হলে রাজনীতিতে এত জঞ্জাল জমা হতো না।

গণতন্ত্রে সবারই মতামত দেয়ার অধিকার আছে এবং সে কথা শুনে উত্তর দেয়ার অধিকারও সবার আছে। এসব মতামত প্রকাশিত হবে সংসদ, বক্তৃতা বা পত্রপত্রিকার লেখালেখিতে। বোমাবাজিতে নয়। যারা বোমাবাজি করছে তাদের ধারণা হতে পারে মানুষ আতঙ্কিত এবং তারা যা বলবে তাই শুনবে। এ পরিস্থিতিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে সব দলের সশস্ত্র ক্যাডাররা। তবে, সঙ্গে সঙ্গে বলে রাখা ভালো, মানব সভ্যতায় ভয় দেখিয়ে কোনো মত চাপিয়ে দেয়া যায়নি এবং সভ্যতা এগিয়ে নিয়েছে সশস্ত্ররা নয়, নিরস্ত্ররা। বাংলাদেশে এ অবস্থা চললে, দু'দিন পর বোমাবাজ সন্দেহে অনেকে আবার শিকার হবেন বোমা হামলার। দেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, নির্বাচন হবে না। দু'টি বড় দল যদি আন্তরিকভাবে নির্বাচন চায় তা'হলে সব সমস্যা বাদ দিয়ে এদের রোখার ব্যাপারে একমত হতে হবে। যদিও ধারণাটা হয়ত ইউটোপীয়। নির্বাচন বানচাল হলে কি হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আর বলতে চাই না।

এসব বোমা হামলা রোখার দায়দায়িত্ব সরকার একেবারে এড়াতে পারে না, রাজনীতিবিদরাও। পুলিশকে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ নিতে দেয়া হয় না। রাজনৈতিক ক্যাডার/সন্ত্রাসীদের ধরতে গেলে রাজনীতিবিদরা হস্তক্ষেপ করেছেন। এখন পর্যন্ত কোনো বোমা হামলার সুরাহা হয়নি। কেউ সাজাও পায়নি। এগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য বিশেষ পুলিশ গ্রুপ বা ট্রাইব্যুনালেরও বন্দোবস্ত হয়নি। সুতরাং বোমাবাজরা সাহসী হবে না কেন?

শামীম ওসমান হাসপাতালে একটি প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন, শেখ হাসিনাকে রক্ষা করুন। সবাই একত্রিত হোন। আওয়ামী লীগ যা বলে, তা যদি বিশ্বাস করে, তাহলে এ মুহূর্তে অন্তর্দ্বন্দ্ব দূরে রেখে, আত্মগরিমা ত্যাগ করে সবাইকে বলতে হবে, যারা বাঙালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী তারা একত্রিত হোন এবং এ আহ্বান শেখ হাসিনাকেই দিতে হবে। আদর্শ রক্ষার বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। না হলে, শেখ হাসিনাও রক্ষা পাবেন কি না সন্দেহ। অন্য অনেককেও একই ভাগ্য বরণ করতে হবে। নিজেরা না বাঁচলে, সমর্থকদের বাঁচাতে না পারলে, দেশ, রাজনীতি, নির্বাচন অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ বৃহত্তর ঐক্য, মঞ্চ গড়তে রাজি, রাজনৈতিক নেতারা? যদি তা' না হয়, ধরে রাখুন এবং এ কথা সবার উদ্দেশে– আততায়ী কিন্তু দাঁড়িয়ে দুয়ারে।

১৮.৬.২০০১

রাজাকার নিয়ে কীভাবে অন্ধকার থেকে আলোয় নেবেন?

কথাটা সুন্দর, ভারি সুন্দর। আগে এ কথা বলতেন দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিক্ষকরা। এখন বলেন, রাজনীতিবিদরা। অন্ধকার থেকে আলোয় নেয়া। আমাদের রাজনীতিবিদরা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিতে চান। গত তিন দশক ধরেই চাচ্ছেন, তাতে কতটা আলোকিত হয়েছি সে আপনারাই বিবেচনা করবেন।

এ কথা আবার মনে পড়ল পত্রিকার শিরোনাম দেখে "বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারঃ জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার অঙ্গীকার।" (যুগান্তর, ৮.৯) বত্রিশ দফা প্রতিশ্রুতি দিয়ে খালেদা জিয়া জানাচ্ছেন যে জাতিকে তিনি আলোকিত করবেন। এর অর্থ জাতি গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আওয়ামী লীগের সময় ছিল তমসাচ্ছন্ন। অথচ বিএনপি ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে শাসন করেছে এক দশক। এর মধ্যে তাঁর পাঁচ বছরও অন্তর্গত। অর্থাৎ শুধু আওয়ামী লীগ নয়, তাদের শাসনামলও ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এখানে একটু দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলি। অন্ধকার থেকে আলোয় নিতে গেলে একক নেতৃত্বে দৃঢ় পদক্ষেপে আলোকিত করার কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে হলে বেগম জিয়া যে বলেছেন, তিনি আলোকিত করবেন; তাঁর হাতে সেই মশাল দূরে থাকুক, হারিকেনও তো দেখি না। বেগম জিয়াকে দেখুন, সুন্দর ছিমছাম, কনফিডেন্ট। তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেনঃ বিএনপির আরো অনেক মহিলাও আছেন। কিন্তু মইত্যা রাজাকার নামে খ্যাত মতিউর রহমান নিজামীর স্ত্রীকে কখনো দেখেছেন বা আমিনীর? তাঁদের ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বের হলেও তাদের বাধ্যতামূলকভাবে সৌদি বোরকা পরতে হয়। সাইফুর রহমানকে দেখেছি সব সময় সাফারি স্যুটে এবং যতটা সম্ভব ভদ্র ভাষায় কথা বলতে। আমিনী পানের পিক ফেলতে ফেলতে অশালীন ভাষায় কথা বলেন। এরা সবাই মুসলমান। এর অর্থ, সব মুসলমান এক নয়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্ন। শিফন ও বোরকার অনেক তফাত, অর্থাৎ একটি নব্য ধনবানের যিনি আলোকিত হতে চাচ্ছেন। আরেকটি চূড়ান্ত রক্ষণশীলতার। এ অমিলের মিল হলে না হয় একক নেতৃত্ব বা দৃঢ়ভাবে চলা সম্ভব। কিন্তু তেল জলে কি মেলা সম্ভব? বিএনপির ৩২ দফা প্রতিশ্রুতিতে কী আছে আলোকিত করার? যেমন, বলা হয়েছে সংসদের আসন হবে ৫০০। হতে পারে কিন্তু ৩০০-এর সংসদেই বিএনপি চার বছর এল না। ৫০০ দিয়ে কী করব? আরো ব্যয়, অপচয়, হানাহানি। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিকীকরণ। এই তোয়াজে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা এক নম্বর। চামচারা নেতানেত্রীকে তৈলাক্ত করে ফেলেন আর সেই তেলের সঙ্গে নিজেরটুকু যোগ করে নেতারা সেনাদের সিক্ত করেন। সেনাবাহিনীর ডাণ্ডার

ভয় সবার জব্বর। এমনকি প্রবল প্রতাপান্বিত আমলা-উপদেষ্টারাও সে ভয়ে জর্জরিত। বেচারা শাহ্ ফরিদ, তাঁর ভাই নির্বাচন করছেন, তিনি হারালেন তাঁর পদ। শুনেছি, অনেক সেনাকর্মকর্তার ভাই-বেরাদর নির্বাচন করছেন, তাঁদের কিন্তু বদলি হয়নি। যা হোক, সেনাবাহিনী আধুনিকীকরণ বর্তমান বিশ্বে প্রধান অগ্রাধিকার নয়। সেটি জাতীয় অপচয়ের খাত বৃদ্ধি করে। এর পর আছে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের সম্পদের হিসেব। ন্যায়পাল নিয়োগ। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ। ত্রিশ বছর শুনেছি এসব কথা। আর কত শুনব? বেগম জিয়া আরো বলেছেন বেতার টিভির স্বায়ত্তশাসন দেবেন। এ মিথ্যাচারের দরকার ছিল না। এর আগে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি রাখেননি। আওয়ামী লীগও প্রায় একই রকম করেছিল। আসলে তথ্য মন্ত্রণালয় লুপ্ত হওয়া উচিত। এটি একটি নুইসেন্স, অপচয়মূলক খাত। আরো কিছু আছে যা হয়ত আরো কিছু পলিটিক্যাল পার্টির ফরমানে পাওয়া যাবে। তা হলো স্থায়ী বেতন ও মজুরি কমিশন গঠন, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, গঙ্গার পানি চুক্তির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সংবিধানিক সমাধান, গ্রাম সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ইন্টারনেট পল্লী প্রতিষ্ঠা, সব বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল সরকারিকরণ। এর মধ্যে দু'একটি ছাড়া কিছুই করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে অনায়াসে নিশ্চিত হতে পারেন।

বিএনপি ঘোষণা করেছে, সংসদে তারা মহিলাদের আসন বৃদ্ধি করবে। আপনাদের কি মনে আছে মহিলা আসন সংরক্ষণের জন্য তখন বিএনপির প্রতি কত আবেদন জানানো হয়েছিল। তাঁদের জন্য শেষ সংসদের শেষ দিনও অপেক্ষা করা হয়েছিল। তাঁরা আসেন নি। এখন বলছেন, মহিলাদের আসন সংরক্ষণ করবেন মহিলারা তা বিশ্বাস করেন? না মনে করেন এ গরু মেরে জুতা দান!

স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করবে কি বিএনপি? যার নেতাদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের এখনো সুরাহা হয়নি। ধরা যাক, তারা সরকার গঠন করল। নেতারা এ-ধরনের কমিশন গঠন করতে দেবেন?

বিএনপি ইশতেহারে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ১ হাজার কোটি টাকার আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। (ভোরের কাগজ ৯.৮) ইশতেহারে ব্যক্তিগত আক্রমণ এই প্রথম। মনে হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশনের ঘোষণা আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে দুর্নীতি হয়নি এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া ১৯ জনের নাম ধরে ইশতেহারে বক্তব্য রাখা আর যাই হোক, আলোকিত মনের পরিচয় নয়। নির্বাচন বিধির ১৭ ধারায় বলা হয়েছে "কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দল কিংবা প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোনো ধরনের তিক্ত, উস্কানিমূলক এবং ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না।" এর আগেও বেগম জিয়া বলেছেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মিলিটারি ও ধর্ম থাকবে না, যা মারাত্মক অভিযোগ। তবে আপনারা নিশ্চিত থাকুন জনাব সাঈদ বিএনপির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবেন না। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম সাংবিধানিক সমস্যার বেগম জিয়া কী সমাধান করবেন? শান্তিচুক্তির পর যিনি বলেন, ফেনী পর্যন্ত ভারতের

অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তাঁর মুখে আর যাই হোক এটা মানায় না। শান্তিচুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে কি বড় রকমের কোনো অশান্তি হয়েছে?

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মন্ত্রণালয় গঠন করবে। যারা আলবদরপ্রধান নিজামী বা মইত্যা রাজাকার নামে যিনি খ্যাত ও যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে ঐক্য করে, তারা এ কথা বললে কী বলবেন? স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ না হলে এ-ধরনের অঙ্গীকার সম্ভব? যুদ্ধাপরাধী সা. কা. চৌধুরীর দুর্দান্ত সব গালি হজম করে যিনি সাকাকে ধানের শীষ প্রতীক উপহার দেন তিনি এ কথা বললে বলতে হয়, সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে। তবে বলে রাখি, বাংলাদেশে কিন্তু এটাও সম্ভব।

মন্ত্রণালয় দূরে থাকুক, নিজামী-আমিনীদের নিয়ে ক্ষমতায় এলে দেশে বোরকার যুগ প্রবর্তনে বাধ্য হবে বিএনপি। গার্মেন্টসে কর্মরত মহিলাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ হবে। পাঠ্যপুস্তকের বদল হবে। বিএনপি সমর্থক তরুণদের বলি, তাদের আর আধুনিক তারুণ্যের স্বপ্ন দেখতে হবে না। লক্ষণীয় যে, বিএনপির বিরুদ্ধে জামায়াতের বিদ্রোহী প্রার্থীদের তিরস্কার বা বহিষ্কার কোনোটাই করা হয়নি। কারণ, বিএনপি প্রার্থী হারা জেতাতে জামায়াতের কিছু আসে যায় না, তাদের জিততে হবে। ধর্ম মানুষকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে না, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদও নয়। এ সব বিবেচনা করে বলা যেতে পারে, ঐক্যজোট জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নয়, আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাবে, ইশতেহারে যাই লেখা থাকুক না কেন।

১০.৯.২০০১

স্থায়ী বিএনপি-তালেবান সরকার গঠনে অস্থায়ী বিএনপি-তত্ত্বাবধায়কের চেষ্টা!

প্রথমে মনে হয়েছিল ব্যাপারটা বেশ রোমান্টিক; অন্ধকার রাত, গ্রামের পথ, চারদিকে গাছগাছালি; হাতে সন্ধ্যা প্রদীপ নিয়ে বধূটি দাঁড়িয়ে। কিন্তু না, ব্যাপারটি ভারি নিষ্ঠুর। হাতে কুপি নিয়ে, কেউ কেউ হারিকেন হাতে সন্ত্রস্তভাবে খুঁজছে, স্বামী বা পুত্রকে। কারণ, তারা লুকিয়ে আছে হামলার ভয়ে। এসব মানুষকে আমরা বলি সংখ্যালঘু। এ থানার নাম কচুয়া (চাঁদপুর জেলা)। এর কিছু গ্রাম হিন্দু অধ্যুষিত। আমরা খবর পেয়েছি, বেগম জিয়া এই থানায় তিনটি জনসভা করে যাওয়ার পর শুরু হয়েছে তাণ্ডব। অবশ্য এর আগে থেকে শুরু হয়েছে নতুন কৌশল, সিলেকটেড ভায়োলেন্স। বিএনপি সমর্থকরা আক্রমণ করছে হিন্দুপাড়া বা মহিলাদের দেখাচ্ছে ভয়। একা কোনো আওয়ামী সমর্থক পেলে তাকে পেটানো হচ্ছে এবং এসব কাণ্ড চলছে নির্ভয়ে। কারণ, থানা তাতে সহায়তা করবে, করছেও; যা আমার কথা নয়। পত্রিকার ভাষায়, "কচুয়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরুদ্ধে চরম পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। জানা যায়, তিনি সারাসরি বিএনপির পক্ষে কাজ করছেন।" (সংবাদ, ১৬.৯)। পত্রিকাটি আরো লিখেছে, "হিন্দু সম্প্রদায়ের মহিলারা মাথায় সিঁদুর মুছে, শাঁখা খুলে ঘর থেকে বের হচ্ছে। পুলিশ সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৩ জনকে হরতাল চলাকালে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতদের ১ জন বিএনপির ও ১২ জন আওয়ামী লীগ কর্মী।" (সূত্র ঃ ঐ)। মোয়াজ্জেমের কিছু হয়েছে? হয় নি। কারণ, মোয়াজ্জেমরা জানে মুয়ীদ চৌধুরীরা তাদের নিয়োগ করেছে এ কাজটি করার জন্য যাতে বর্তমানে অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক-বিএনপি সরকারের বদলে স্থায়ী বিএনপি-তালেবান সরকার আনা যায়। বিষয়টি নিশ্চিত না হলে প্রায় কনস্টেবল পর্যায়ের কেউ এ-ধরনের কাজ করতে পারে না।

১৯৯৬ সালেও এমনটি ঘটেছিল। এই একই এলাকায়, জানিয়েছেন অনেক পুলিশ কর্মকর্তা যে, চাঁদপুরের তৎকালীন এক পুলিশ কর্মকর্তা অর্থের বিনিময়ে হিন্দু সম্প্রদায়কে ভোট দিতে দেয় নি। না, এখন এ-ধরনের ঘটনা যে শুধু কচুয়াতেই ঘটছে তা নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই ঘটছে। আমাদের বন্ধুরা বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এসে জানিয়েছেন, প্রায় সব অঞ্চলেই এমনটি ঘটছে কারণ, তারা জানে কেন্দ্রে এখন বিএনপি মানে বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সুতরাং, ভয়ের কিছু নেই। নির্বাচনী ফল বিএনপি-তালেবানদের পক্ষে নিতে হবে, আওয়ামী লীগের পক্ষে জনসমর্থন থাকলেও। মুয়ীদ চৌধুরীদের কাছে এভাবে অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগ হেরে যাচ্ছে। তবে, তাঁরা সান্ত্বনা পেতে পারেন এ ভেবে যে, দশ দিন পর চৌধুরীদের যেসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরি

করতে যাবেন সেগুলো বিএনপি-তালেবান-জামায়াত সমর্থক প্রতিষ্ঠানে চিহ্নিত হবে। সুতরাং, এভাবে চিহ্নিত হতে না চাইলে ঐ সব প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের সরিয়ে দিতে হবে।

নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার পর এখন তালেবান প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে। আমেরিকা ও ইউরোপ এখন তালেবানদের বিরুদ্ধে। এখানে বিএনপি-জামায়াত-তালেবান একজোট। এ ক্ষেত্রে তাদের নীতি কী হবে? গণতন্ত্রের নামে তালেবানদের সমর্থন এবং আফগানিস্তান সৃষ্টি? নাকি ধর্মনিরপেক্ষ লিবারেল রাষ্ট্রের সৃষ্টি? তালেবানদের এক সময় আমেরিকা সমর্থন দিয়ে এখন আঙুল চুষছে। এটা খুব অদ্ভুত যে বিএনপি বলছে, 'তালেবানদের সঙ্গে বিএনপির কোনো সম্পর্ক নেই। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বে পরিচিত করতে চায়।' (জনকণ্ঠ ১৮.৯)। মিথ্যা বলারও একটা সীমা থাকা চাই। সাত তালেবান কি আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচন করছে? তালেবান দর্শনের প্রবক্তা কি চার জোটের ফজলুল হক আমিনী নয়, যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নির্বাচন করছে? এ রকম আরও আছে। আওয়ামী লীগ সব সময় বলেছে যে, তারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। মৌলবাদী রাষ্ট্রে বিশ্বাস করলে তো আওয়ামী লীগই চার দলীয় ঐক্যজোট করত। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে বেগম জিয়া বলেছিলেন, হিন্দুদের তিনি রক্ষা করবেন। তারা যেন তাকে ভোট দেয়। তা হলে, তাঁর কর্মীরা কেন হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করছে? তাদের ভয়ে কেন হিন্দু মহিলারা পরিচয় আত্মগোপন করতে চাইছে? একই মিথ্যা বার বার বললে সত্য হয় না। বিএনপি-তালেবানরা ক্ষমতায় এলে নিশ্চিত থাকুন বাংলাদেশ আফগানিস্তান হবে। এ স্লোগান তারা প্রকাশ্যেই দিয়েছে। তালেবানরা ইসলামের আদর্শ মানলে কট্টর ইসলামী রাষ্ট্র ইরান, সৌদি আরব কেন আজ তালেবানদের সমর্থন করছে না। এমনকি তাদের দোস্ত পাকিস্তানও? বাংলাদেশ আফগানিস্তান হলে সব মহিলাকে ঘরে থাকতে হবে। সমস্ত গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। বিএনপি নেতাদের কিছু হবে না। তাদের পুত্র-কন্যারা বাংলাদেশে থাকে না।

এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপির অনুকূলে নির্বাচনী ফল আনার জন্য যা যা দরকার তা করবে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ এ মোহ যাদের আছে তারা তা ত্যাগ করুন। যদি তাই হতো, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সাঈদীর মিথ্যা ও অশ্লীল ক্যাসেট তারা বাজেয়াফত করত। এমনকি বেগম জিয়াও এখন বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাথে আমাদের মিল রয়েছে। মিল থাকার কারণ হচ্ছে আমরা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই বলে।" (জনকণ্ঠ ১৬.৯)। তাদের সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে বিএনপিকে জিততে হবে। না হলে বিএনপি যখন যা বলছে তত্ত্বাবধায়করা তা মেনে নিচ্ছেন কেন? একটা উদাহরণ দিতে পারবেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপির দাবি মানেনি। বিএনপি বলছিল ফলাফল শুধু বিটিভিতে প্রচার করতে হবে। সিইসি প্রথমে তাতে রাজি হননি। এখন রাজি হয়েছেন। অধুনা বিতর্কিত ও বিখ্যাত মুয়ীদ চৌধুরী বলেছেন, 'ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হলে ভালো হয়।' (সূত্র ঃ ঐ)। দু'দিনের যোগী ভাতকে বলে অন্ন! বেগম জিয়া ও লতিফুর রহমান একই সুরে বলেছেন,

'যুদ্ধাপরাধী, আলবদর, রাজাকারদের তালিকা নেই, চিনব কীভাবে? জনাব রহমান ১৯৭২ সালে কী ভাবে রাজাকারদের চিনেছিলেন?

জনাব লতিফুর রহমান এখন বলছেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো বোমাবাজি করে বা লাশ ফেলে দেয়, তবে এর দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না, পুরো দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে?' (ভোরের কাগজ, ১৭.৯)। এখন এ কথা বলছেন কেন? ক্ষমতা গ্রহণের পর তো অ্যায়সা করেঙ্গা ত্যায়সা করেঙ্গা বলেছিলেন। দায়িত্ব না নিলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দরকার কী? এ বলে কি দায় দায়িত্ব এড়ান যাবে?

প্রথম দিন থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিণত হয়েছিল বিএনপি সরকারে। এখন তাদের দায়িত্ব হয়ে পড়েছে বিএনপিকে জিতিয়ে দেয়ার। সারা দেশে মুয়ীদ চৌধুরীরা যে প্রশাসনিক অরাজকতা সৃষ্টি করেছে তার ফলে কেউ আর কথা শুনছে না। লতিফুর রহমান বলেছেন, সংখ্যালঘু ও মহিলাদের ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি সহ্য করা হবে না। তা হলে, দেশজুড়ে যে সংখ্যালঘুদের ওপর বিএনপি ও থানার দারোগার সন্ত্রাস চলছে তা বন্ধ হচ্ছে না কেন? তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত পাঁচ বছরের সরকার প্রধানের জন্য তিন মাসের ও অনির্বাচিত তিন মাসের সরকার প্রধানের জন্য এক বছরের এসএসএফ দেয়ার আইন করেছে। আরো ভালো হতো, উপদেষ্টাদের জন্যও নিরাপত্তা ব্যবস্থা এক বছরের করা। তাঁরা ভাবছেন, তিন মাস এসে বিএনপি-তালেবান সরকার গঠন করিয়ে তারা আরামে থাকবেন! একবছর পর? একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত, শেখ হাসিনা এসে '৭৫-এর খুনী চক্রের স্বার্থে আঘাত হেনেছিলেন দেখে তাঁকে বার বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। সে জন্য বাধ্য হয়ে আইন করে তাঁকে এসএসএফের নিরাপত্তা নিতে হয়েছে। সে চক্রকে পুনর্বাসিত করার দায়িত্ব নিয়েছে বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এ অনুভব থেকেই তারা আগাম নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করছেন। কারণ, তাঁরা জানেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তা মানবে না। কারণ, এভাবে পক্ষপাতমূলক নির্বাচন হবে আর সবাই বহাল তবিয়তে থাকবেন তা বোধ হয় হবে না। আমাদের উচিত হবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষপাত ও বিএনপি এবং প্রশাসনের সন্ত্রাস সত্ত্বেও নির্বাচনী প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ন রাখা, মানুষকে নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে উদ্বুদ্ধ করা। তা না হলে, বাংলাদেশে তালেবানী শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পথ সুগম হবে। কর্নেল অলি আহমদ বা আকবর হোসেন বা মীর শওকত আলীরা কিন্তু সেই তালেবানী ছোবল থেকে বাঁচবেন না। বিএনপি করলেও।

২০.৯.২০০১

খালেদা জিয়ার পাকা ধান কেটে নিচ্ছে নিজামী–সুবাহান!

গত এক দশকে এত উত্তেজিত হননি ১৯৭১ সালে সারা পাকিস্তান আলবদর বাহিনীর প্রধান মতিউর রহমান নিজামী। তিনি পাবনা-১ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, "ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি চারদলীয় জোটের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাইয়া চরিত্র হনন করিয়া জনগণের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করিতেছে" [ইত্তেফাক, ১২.৯]। তা ছাড়া যুদ্ধাপরাধী সাঈদী, সুবাহান, ইউসুফ প্রমুখও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও এডাব-প্রশিকার তৎপর নিন্দা জানিয়েছেন।

নিজামীকে সবাই ঠাণ্ডা মাথার লোক হিসেবে জানেন। ঠাণ্ডা মাথা না হলে ১৯৭১ সালে তিনি আলবদর বহিনীর প্রধান হতে পারতেন না। ১৯৭১ সালে সারা দেশে যে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে আলবদররা, তার জন্য ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনা দরকার। আলবদররা তা করতে পেরেছিল। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যে গত এক দশক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে নিজামী তার বিপক্ষে তেমন কিছু বলেন নি। এখন তিনি ক্ষেপলেন কেন? এই সংগঠনটিকে 'সন্ত্রাসী' বললেন কেন?

নিজামী পাবনা-১ থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আছেন আবু সাইয়িদ। নিজামী ছিলেন '৭১-এর পাকিদের দোসর। আবু সাইয়িদ মুক্তিযোদ্ধা। গতবার জিতেছেন আবু সাইয়িদ। এবার জিততে চান নিজামী। তাঁর ধারণা চারদলীয় জোটের ঐক্য মানে সব ভোট পাওয়া যাবে। তাত্ত্বিক দিক থেকে সব ঠিক ছিল, কিন্তু বাস্তবে একটু ঝামেলা হচ্ছে।

সেই এলাকায় প্রশ্ন উঠেছে, নিজামীকে কেন মইত্যা রাজাকার বলা হয়? তার মানে, ১৯৭১-এ সে রাজাকার ছিল। না, রাজাকার নয়, আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিল। ১৯৭১-এ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা শুধু নয়, নিজ এলাকায় নিজামীর নেতৃত্বে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। বিশ্বাস না হলে বেড়া থানার বৃশলিকা গ্রামের আমিনুল ইসলাম ডাবলু, শোলবাড়িয়ার মাধবপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কুদ্দুস, সাথিয়া থানার মিয়াপুর গ্রামের মোঃ শাহজাহান আলীকে জিজ্ঞাসা করুন। শাহজাহান আলী বেঁচে যান। তাঁর গলায় এখনো নিজামীদের ছুরির দাগ আছে। ঢাকা শহীদ মিনারে গত বছর ৭ ডিসেম্বর বেড়া থানার বৃশলিকা গ্রামের আব্দুল লতিফ বলেছিলেন, "একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনায় যিনি 'মইত্যা' রাজাকার হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনিই জামায়াতে ইসলামীর নতুন আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। একাত্তরে নিজামীর আরেকটা পরিচয় ছিল। পাবনা-বেড়া-সাঁথিয়ার মানুষ তাঁকে মইত্যা রাজাকার হিসাবে চিনতেন। তাঁর

মতো খুনী আজও টিকে আছে, যা দুঃখজনক।"

এসব খবর নতুন প্রজন্ম জানার পর তারা বলছে, খুনীকে ভোট দেব কিভাবে? অবস্থা নিজামীর এতই প্রতিকূলে যাচ্ছে যে, তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, "ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় থেকে জামায়াতের প্রতিটি আসনে জামায়াতকে ভোট না দেয়ার জন্য চিৎকার করে বেড়াচ্ছে" [জনকণ্ঠ, ২০.৯]।

নিজামী আরেকটা মিথ্যা বললেন। রাষ্ট্র এখন, তিনি ভালো করে জানেন, বিএনপি তালেবানদের তত্ত্বাবধায়কদের অধীনে। সুতরাং তারা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিকে পছন্দ করবে কেন? স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রাম শ্যাম যদু মধু সবাইকে সাক্ষাতকার দিলেও নির্মূল কমিটি তাঁর সাক্ষাতকার পায়নি। নিজামী যতটা সন্ত্রাসের সঙ্গে পরিচিত আর কেউ ততটা নয়। কোরান হাতে নিয়ে বলেন তো তিনি ১৯৭১-এ কী করেছেন? নিজামীর হাতে রক্তের দাগ আছে। নির্মূল কমিটির হাতে নেই, অস্ত্র ব্যবহারও তারা জানে না।

ইসলামের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা তো সত্য কথা বলেন। শান্তির বাণী যাঁরা প্রচার করেন তাঁদের সঙ্গেই তাঁরা থাকেন। নিজামী ১৯৯৫ সালের ১৩ আগস্ট বিএনপি সম্পর্কে বলেছিলেন—"বর্তমান সরকারের আমলে গত আড়াই বছরে ৫ হাজার ২৯৩ জন খুন হয়েছে। দেশ আজ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের নিকট জিম্মি" [ইত্তেফাক]। সেই সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে তিনি জোট বাঁধেন কিভাবে নিজে সন্ত্রাসী না হলে? তিনি আরো বলেছেন, 'ইসলামী জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না।' 'এ সরকারের অধীনে ইসলাম রক্ষা করতে হলে নিজামীর ভাষায় ধানের শীষে ভোট দেয়া সম্ভব নয়। এখন নিজামী বলুন ঐ সব কথা মিথ্যা! এটি অস্বীকার করলে তিনি মোনাফেকীর দায়ে পড়বেন। কারণ, এগুলো পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তাঁরই পত্রিকায়। সুতরাং, জামায়াতের আমিরকে কি বলবেন?

নিজামীরা মওদুদী মতবাদের অনুসারী। মওদুদী বলেছেন, 'নির্বাচনী প্রচারণা শিকারি কুকুরদের দৌড়।' শুধু তাই নয়, 'গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট বা সংসদের সদস্যপদ গ্রহণ করাও হারাম, প্রার্থীদের পক্ষে ভোট প্রদানও হারাম।' নিজামী তাহলে তাঁদের গুরুকে সম্পূর্ণভাবে অমান্য করছেন। জামায়াতের এই আমির বলুন প্রকাশ্যে যে মওদুদীকে তাঁরা ঘৃণা করেন।

পাবনা-৫ আসনে দাঁড়িয়েছে জামায়াতের যুদ্ধাপরাধী আবদুস সুবাহান, এই লোকটি '৭১-এ গণহত্যার সঙ্গে জড়িত। পাবনার কালাচাঁদপাড়ার অধ্যক্ষ গণি জানিয়েছেন, 'মে মাসে পাবনার ফরিদপুর থানার ডেমরাতে মাওলানা আব্দুস সুবাহান, মাওলানা ইসহাক, টেগার ও আরো কয়েকজন দালালের একটি শক্তিশালী দল পাকিস্তানী আর্মি নিয়ে ব্যাপক গণহত্যা করে। সেখানে ঐ দিন আনুমানিক ১০০০ মানুষ হত্যাসহ ঘরবাড়ি পোড়ানো, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন ইত্যাদি করা হয়।'

বিএনপি জোট এই সব হত্যাকারীকে বিভিন্ন জায়গায় নমিনেশন দিয়েছে। যেমন '৭১-পূর্ব তাবিজ বিক্রেতা দিইল্যা রাজাকার ওরফে দোলোয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে জামায়াত নেতা ওরফে যুদ্ধাপরাধীকে পিরোজপুরে নমিনেশন দিয়েছে। শেখ হাসিনার

নামে সে অশ্লীল ক্যাসেট প্রকাশ করেছে যা নির্বাচনবিধি ভঙ্গ। কিন্তু নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ আনা সত্ত্বেও তা বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয় নি। কেন দেয়া হয় নি এটি সবাই জানে। পিরোজপুরবাসী জেনে রাখুন, সাঈদী বিদেশে যেখানে গেছে বাঙালিরা সেখানেই তাকে প্রতিরোধ করেছে। তালেবান ৭ জনকেও নমিনেশন দিয়েছে ঐক্যজোট। জোটের লক্ষ্য, বিভিন্ন জায়গায় এদের জিতিয়ে ছোট ছোট পাকি উপনিবেশ সৃষ্টি এবং অন্তিমে পুরা বাংলাদেশকে পাকিস্তানে পরিণত করা। আপনারা কি পাকিস্তান বাংলাদেশে থাকতে চান, না বাংলাদেশে থাকতে চান? আপনাদের স্ত্রী-কন্যা, পরিবার-পরিজনের ইজ্জত অক্ষুণ্ন রাখতে চান, নাকি ১৯৭১-এর অবস্থায় পড়তে চান?

পাবনা ও অন্যান্য জেলার ভোটারদের বলি, বিশেষ করে বিএনপির নতুন প্রজন্মকে। ধরা যাক আওয়ামী লীগের আবু সাইয়িদ খারাপ, নিজামী কি তাঁর চেয়ে ভালো? আপনি কি চান আপনার এলাকা পাকি এলাকা হিসেবে পরিচিত হোক? যদি না চান তাহলে বিবেচনা করুন ১ অক্টোবর কী করবেন। খবর পাওয়া গেছে ঐ সব এলাকায় নতুন প্রজন্মের বিএনপিরা বলছে দরকার হলে তারা ভোটকেন্দ্রে যাবে না। তারা ছড়া বেঁধেছে-

খালেদা জিয়ার পাকা ধান
কেটে নিচ্ছে নিজামী-সুবাহান।

২২.৯.২০০১

আদালতের কাঠগড়ায় শৃঙ্খলিত মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতা

আসামী পক্ষের আইনজীবীরা বললেন, তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ। সরকার পক্ষের পুলিশ ইন্সপেক্টরও বললেন, তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্পদ শাহরিয়ার কবিরের হাতে তখন হাতকড়া, পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশেই ঘটনাটি ঘটেছে গত পরশু। এতে বোঝা যায়, বাংলাদেশের শাসকরা রাষ্ট্রীয় সম্পদকে কিভাবে দেখেন।

শাহরিয়ার কবির দীর্ঘ ত্রিশ বছর সংগ্রাম করে আসছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে। তাঁর সাংবাদিকতা, লেখালেখি, ডকুমেন্টারি, সাংগঠনিক কাজকর্ম–সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুই ছিল : এ দু'টি বিষয়। রাজনীতিকরা তাঁকে পছন্দ করতেন না কিন্তু ব্যবহার করতে চাইতেন এবং যেহেতু তিনি আবেগী, ব্যবহৃতও হয়েছেন। ভদ্র সাংস্কৃতিক কর্মীরাও তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। কারণ তাঁর কর্মে কোনো আপোস ছিল না।

বিএনপি ১৯৯১ সালে তাঁকে চাকরিচ্যুত করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করায় আজ এক দশকেও তিনি আর কোথাও চাকরি পাননি। কারণ পত্রিকা মালিকরাও তাঁর সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। বেকার জীবন চলেছে, চিত্রকলা সংগ্রহ বিক্রি করে, লেখালেখির টাকায়। কিন্তু কাঁধ থেকে নামাতে পারেননি মুক্তিযুদ্ধ এবং অসাম্প্রদায়িকতা। দেশের রাজাকার বা যুদ্ধাপরাধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক তিনি। মানবতাবাদ বিরোধীর বিপক্ষে আপোসহীন যোদ্ধা। তিনি শাসক, ভীরু মধ্যবিত্তের পছন্দের নয়। কিন্তু বাংলাদেশে তিনিই এক ধরনের প্রতীক হয়ে উঠছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ও অসাম্প্রদায়িকতার। বিশেষ করে বর্তমান নির্বাচনের পর সেই শাহরিয়ার কবিরকে হাতকড়া পরা অবস্থায় কাঠগড়ায় থাকার অর্থ মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতাকে হাতকড়া পরিয়ে আদালতে হাজির করা। এ দৃশ্য দেখে আদালত কক্ষে অনেকের চোখ ভরে উঠেছিল পানিতে, 'শেম শেম' ধ্বনি উঠেছিল আদালত কক্ষেই। এমনকি সারা আদালতে পুলিশদেরও দেখেছিলাম ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে, যে পুলিশকে মানুষ এখন সবচেয়ে অপছন্দ করে।

বিএনপির একটি অবসেশন হলো রাষ্ট্রদ্রোহী খোঁজা। এর কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ বিএনপির স্রষ্টা ক্ষমতায় এসেছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে, যা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। বিএনপির নেতৃত্বের একটি বড় অংশ ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। সমাজে নিজেদের চেহারা ঢাকতে তাদের সব সময় দরকার হয়ে পড়ে রাষ্ট্রদ্রোহী খোঁজা। ১৯৯২ সালে বিএনপি ২৪ জন শিল্পী-সাহিত্যিককে আদালতে দাঁড় করায় রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায়।

এবারও ক্ষমতায় গিয়ে তারা খুঁজে পেয়েছে একজন রাষ্ট্রদ্রোহীকে। উল্লেখ্য, তারা কোনো ঋণখেলাপী মস্তান, রাজনীতিবিদদের মাঝে রাষ্ট্রদ্রোহী খুঁজে পায়নি, খুঁজে পেয়েছে শুধু লেখক শিল্পীদের মাঝে। আগেও এবং এখনও।

শাহরিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৫৪ ধারায়। এ ধারায় সাধারণত সন্দেহজনক গতিবিধির মানুষজনকে ধরা হয়। পুলিশ সাধারণ পতিতা, দালাল ভবঘুরে এ ধারায় ধরে। যেমন সীমা চৌধুরীকে ধরা হয়েছিল এবং পরে চট্টগ্রাম জেলে যাকে মেরে ফেলা হয়। শাহরিয়ারকেও অনেকের ধারণা গুম করে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কিন্তু তরুণ সাংবাদিকরা তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। থানার অভিযোগে বলা হয়েছে, শাহরিয়ার "বাহিরে অবস্থান করিয়া বাংলাদেশে নির্বাচনোত্তর কিছু সহিংস-ঘটনার স্থিরচিত্র কতিপয় সংখ্যালঘু লোককে প্ররোচিত করিয়া কথিত সহিংস ঘটনার ব্যাখ্যা তৈরি পূর্বক জনগণের বিভ্রান্তি ক্ষোভ সৃষ্টি করার লক্ষ্যেও" কিছু ভিডিও চিত্রধারণ করে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন যা "বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টসহ আইনশৃঙ্খলার পরিপন্থী ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর এবং তিনি এই ক্ষতিকর" কাজে লিপ্ত রহিয়াছেন। তাহার এই বিভ্রান্তিকর ধারণকৃত ছবি ও বক্তব্য প্রচারিত হইলে সমাজে মারাত্মক আইনশৃঙ্খলা অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।" তাঁকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ আইনে আটকেরও আবেদন জানানো হয়েছে। এই তৃতীয় শ্রেণীর বাংলায় লেখা আবেদনের মূল বিষয় হলো– শাহরিয়ার কলকাতায় গেছেন। বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত নির্যাতিত হিন্দু চলে গেছে সেখানে তাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন এবং তা নিয়ে এসেছেন। এতে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে পারে। জনগণের মাঝে ক্ষোভ ও বিভ্রান্ত সৃষ্টি হতে পারে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে, রাষ্ট্রের পক্ষে তিনি ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহী। এখানে লক্ষণীয়, এর কোনো কিছুই প্রদর্শিত হয়নি এবং একজন সাংবাদিকের মৌলিক অধিকার হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ।

প্রথম কথা লতিফ-মুয়িদের আমল থেকে হিন্দু ও আওয়ামী নির্যাতন শুরু হয়েছিল কিনা? তাদের সেই প্রকল্প বিএনপি-জামায়াত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর করেছে। লতিফুর এখন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় যমুনার আর মুয়িদ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ব্র্যাকের প্রধান নির্বাহী। এখন প্রশ্ন নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াতরা হিন্দু শূন্য ও আওয়ামী শূন্য কারার জন্য আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ গ্রহণ করেছিল কিনা? এ সরকার যদি বলে তা করেনি, তাহলে বাংলাদেশের সমস্ত খবরের কাগজ (ইনকিলাব ও দিনকাল বাদে) মিথ্যা সংবাদ প্রচার করছে। হাসিনাকণ্ঠ বলে পরিচিত কাগজগুলোর কথা বাদ দিলাম কিন্তু মাহফুজ আনাম, মতিউর রহমান ও গোলাম সারোয়ার সম্পাদিত কাগজেও তো ছিটোফোঁটা এসব খবর এসেছে। তাহলে তারা কি সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছেন। বিবিসি নিত্য এ সংবাদ প্রচার করছে। শেখ হাসিনা চিৎকার করে বলছেন। বীর আলতাফ চৌধুরী তাদের গ্রেফতার করছেন না কেন? কারণ এদের পিছনে আছে রাজনৈতিক শক্তি, সামরিক-বেসামরিক আমলা, বড় কোম্পানি, ঋণখেলাপী। শাহরিয়ারের পিছে তেমন কোনো শক্তি নেই।

সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে বা ছড়াচ্ছে কে? আলতাফ চৌধুরী প্রথম থেকে হিন্দু নির্যাতন, আওয়ামী নির্যাতনকে উপেক্ষা করে প্রকৃত অবস্থা খাটো করে দেখিয়েছেন ও দেশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। পূর্ণিমার কাহিনী যদি বানোয়াট হয় যা বলেছেন এতদিন বিএনপি নেতৃবৃন্দ তাহলে আজ কেন পূর্ণিমা ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে? মান্নান ভূঁইয়া ৯টি ঘটনার ২টি স্বীকার করে কেন সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন? দেখা যায়, নির্বাচনোত্তর কালে সমাজে আলতাফ চৌধুরী, মান্নান ভূঁইয়া, বিএনপি নেতৃত্বরা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। তাঁরা রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়েন না, পড়ে শাহরিয়ার। আজ (২৬ নভেম্বর) 'প্রথম আলো'য় ছাপা হয়েছে বাংলাদেশে নির্যাতিত হিন্দু পরিবারের কলকাতায় আশ্রয়ের কাহিনী। এই কাহিনীটি শাহরিয়ার হয়ত ভিডিও বন্দি করেছেন। তো আলতাফ চৌধুরী বা গোয়েন্দা সংস্থার কোমরে জোর আছে মতিউর রহমানকে হাতকড়া বেঁধে আদালতে হাজির করার?

সমাজে সহিংস আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছে এবং ঘটাচ্ছে কারা। সহিংসার মাস্টার প্ল্যান শুরু হয়েছে লতিফুর-মুয়িদের আমল থেকে। তাদের কাঠগড়ায় আনা হবে না কেন? প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরী অশালীন ভাষায় সাবাস বাংলাদেশ প্রচার করে সমাজে সহিংসতার বীজ কী ছড়াননি যাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিএনপি ক্যাডাররা বাংলাদেশে ত্রাসের রাজত্ব ঘটিয়েছে। জামায়াত ক্যাডাররা অধ্যক্ষ মুহুরীকে হত্যা করে। আড়াইহাজারে পুলিশ ডাকাতি করে। মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী তালামিস্ত্রী ও পুলিশ নিয়ে সংসদ দখল করে। বেগম জিয়া ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে শৌচাগার থেকে সংসদ ভবনের কক্ষ সব দখল হয়ে যায়, চাঁদাবাজিতে অনেকে গৃহহারা, নির্যাতনের কাতর- এগুলো কি অপরাধের কোটায় পড়ে না। শাহরিয়ার কোনো কিছু দখল করেননি, স্মাগলিংয়ে যুক্ত নন– তিনি সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছেন আর অন্যরা ভালোবাসা বিলাচ্ছে? কই গোয়েন্দা সংস্থা বা আলতাফ চৌধুরীর তো সাহস হয় না তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার। প্রতিদিন ইনকিলাবের মিথ্যা, হ্যাঁ, মিথ্যা প্রচার করে মুসলমানদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ সৃষ্টি করছে। আলবদর পরিচালিত এই পত্রিকাটি তো মঈন খান বন্ধ করেন না। পুরো দেশটাকে হাওয়া ভবন যদি ভাবেন আর ভাবেন সব মানুষ হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে তাহলে তো মুশকিল।

আসলে মূল বিষয় অন্য। পত্রিকায় দেখেছি, অনেকে অনুমান করছেন কারও চাপে পড়ে কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠান। ভারত এখন বাংলাদেশের হিন্দুদের হরিজন মনে করে। এতদিনে ভারত পেয়েছে একটি সরকারকে যে তার হুকুমে চলবে এবং চিরশত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবে। সে জন্য গ্যাস বিক্রির অছিলায় দেশ বিক্রি তো আছেই, হুকুমও তামিল করতে হয়। এ রকম চললে উপমহাদেশে বিএনপি-জামায়াত বাংলাদেশকে ভারতের সেবাদাসীতে পরিণত করবে সন্দেহ নেই। শাহরিয়ার সেখানে হিন্দু নির্যাতনের কথা বলবেন এটি এখন আর ভারতীয়দের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। এখানে মানবিকতার প্রশ্ন গৌণ। অন্য বিষয়গুলো আদালতেই তুলে ধরেছে শাহরিয়ারের আইনজীবীরা।

১. "রাজাকার আলবদররা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছে বলেই মুক্তিযোদ্ধাদের অপমানিত করা হচ্ছে।"

২. "একাত্তরের ১৪ ডিসেম্বর দেশকে ধ্বংস করার জন্য রাজাকার আলবদররা যেভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল সেই নীলনক্সায় আবারও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।"

৩. শাহরিয়ার মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাই "রাজাকার আলবদররা তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে শাহরিয়ারকে আটক" করেছে।

৪. আদালতে জাতীয় জীবনে লাথির ভূমিকা তুলে ধরা হয়। বলা হয়, এই এজলাসেই লাথি মেরে দরজা প্রায় ভেঙ্গে ঢোকা হয়েছিল যাতে আসামীদের জামিন দেয়া হয় এবং দেয়া হয়েছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও লাথির ভূমিকা আমাদের অজানা নয়। লতিফুরের দরজায় বিএনপি অ্যাকটিভিস্টরা লাথি মেরেছিল, প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনকে অপমান করেছিল, জুতা ছুড়েছিল, এমএ সাঈদকেও পদাঘাত করা হয়েছিল। যার ফলে তারা সবাই জামায়াত-বিএনপির পক্ষে কাজ করছেন বলে রটনা রয়েছে।

৫. আদালতে এও বলা হয়, ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় জামিন হয়েছে। হাইকোর্ট হিন্দুদের নির্যাতনের প্রশ্নে রুলনিশি জারি করেছে। সুতরাং হিন্দু নির্যাতন হয়েছে তা বাস্তব ও সত্য ঘটনা। সেটি যদি কেউ তুলে ধরে [যা ব্যাপকভাবে তুলে ধরছে পত্র-পত্রিকায়] তাহলে তা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে কেন?

আদালতে গতকাল বিচারের সময়ই আইনজীবীরা ও সাধারণ দর্শকরা বলছিলেন, শাহরিয়ারকে জামিন দেয়া হবে না। মামলার কোনো বিষয়বস্তু নেই প্রতীয়মান হওয়ার পরও জামিন হয়নি। তার মানে সবার কাছে সরকারের ইচ্ছা স্পষ্ট যে সরকার প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক। এক তরুণ আমাকে বলছিলেন, স্যার মন খারাপ নাকি আপনাদের? রাজাকারদের দেশে তো এ রকম হবেই। না, আমার মন খারাপও না, দেশটাকে পুরোপুরি রাজাকারের দেশও আমি ভাবি না। একজন আইনজীবী বলছিলেন, "১৯৯৭ সালে জানুয়ারি মাসে এই আদালতে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের হাজির করা হয়েছিল। তখনও তাদের হাতকড়া পরানো ছিল না। আজ দেশের বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরকে আদালতে হাতকড়া পরিয়ে হাজির করা হয়েছে। এ লজ্জা গোটা জাতির।" হায়, ইতিহাস পড়লে তিনি জানতেন, এ জাতির চোখের চামড়া নেই। থাকলে এ জাতির সরকার পরিণত হতো না ধর্ষণকারী ও মানবতাবিরোধী সরকার হিসাবে যে কারণে এদের পরম মিত্র বুশ প্রশাসন ও বাজপেয়ীও এখন কুণ্ঠিত। যেখানে নিজেদের কেউ ধর্ষিত না হলে মন্ত্রীরা বোঝেন না ধর্ষণ কি, সন্ত্রাস কি, যেখানে সরকারি দলের রাজনৈতিক এজেন্ডা জাতি শুদ্ধি ও রাজনৈতিক শুদ্ধি, সে জাতির আবার লজ্জা কি।

২৭.১১.২০০১

রাজাকারের সার্টিফিকেটে দেশপ্রেমিক?

স্পেনের জাতীয় খেলা হচ্ছে ষাঁড়ের লড়াই। ষাঁড়ের সঙ্গে যিনি লড়াই করেন তাঁকে বলা হয় ম্যাটাডর। তিনি একটি লাল কাপড় ধরেন ষাঁড়ের সামনে। লাল কাপড় দেখলেই ষাঁড়ের মাথা খারাপ হয়ে যায়। পাগলের মতো তেড়ে যায় ম্যাটাডরের দিকে। বাংলাদেশেও এখন অনেকের অবস্থা হয়েছে এ রকম। মুক্তিযুদ্ধ যাঁরা করেছিলেন, আওয়ামী লীগ যাঁরা করেন বা সমর্থক, কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী, সৎ, বামপন্থী, যাঁরা সেক্যুলার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, সৎ বা আদর্শবাদী এবং হিন্দু– এরা সবাই এখন লাল কাপড়ের মতো। এদের দেখলেই মাথা খারাপ হয়ে যায় চারজোটের। এদের সামগ্রিক নাম দেয়া হয়েছে এখন দেশদ্রোহী।

সারা দেশে জামায়াত-বিএনপি সরকার এখন দেশদ্রোহী খুঁজে বেড়াচ্ছে। এদের অনেকের কাছে এটি আবার বিনোদনের বিষয়ও হয়ে উঠেছে। এভাবে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের পর আর কখনো দেশদ্রোহী খোঁজা হয়নি। দেশদ্রোহীর সাধারণ অর্থ দেশের শত্রু। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের সমষ্টিগত নাম ছিল রাজাকার। দেশদ্রোহী ও রাজাকার এখন এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সাধারণ মানুষও সে অর্থেই বিষয়টি বোঝে। এখন চারদলীয় জোট সরকার দেশদ্রোহীর নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে। সে সংজ্ঞা অনুসারে যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিল, মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেছিল, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী-সমর্থক, বামপন্থী, সেক্যুলার গণতন্ত্রের বিশ্বাসী এবং হিন্দু– এরা হচ্ছে দেশদ্রোহী। এদের ইসলাম ধর্ম অনুসারে এসব দেশদ্রোহী ইহুদীদের সমতুল্য। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীরা এদের সম্মিলিতভাবে বলত– কাফের। মতাদর্শ অবস্থানে দু'পক্ষে কাছাকাছি।

১৯৭১ সালে যদি দেশদ্রোহীদের এখনকার মতো খোঁজা হতো তাহলে সারা পাকিস্তান আলবদরপ্রধান নিজামী এখন বাংলাদেশের পতাকা গাড়িতে উড়িয়ে ঘুরে বেড়াত না। শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর স্বামী ডা. আলীম চৌধুরীকে হত্যার দায়ে যাকে চিহ্নিতকরে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল সেই কথিত মওলানা আব্দুল মান্নান যাকে জেনারেল এরশাদ আদর করে বলতেন 'দাড়িঅলা খচ্চর'– এখন আর দৈনিক কুৎসা কাগজ ইনকিলাব প্রকাশের সাহস পেত না। তা ১৯৭২ সালে যাঁরা ভুল করেছিলেন তাঁদের ভুলের খেসারত তো দিতেই হবে। তাই এখন দিচ্ছে মানুষজন।

দেশদ্রোহী খোঁজার মূল উদ্দেশ্য একটিই। ১৯৭১ সালে যে সংগঠনটি দেশদ্রোহিতার সঙ্গে যুক্ত ছিল সেই জামায়াতে ইসলামের আদর্শের আধিপত্যের বিস্তার। অন্যদিকে ১৯৭৫ সালের পর গড়ে ওঠা সংগঠন বিএনপির উদ্দেশ্য, বিএনপি যারা সমর্থন করে না

তাদের নিশ্চিহ্ন করা। অর্থাৎ দু'টি দলের অভিন্ন উদ্দেশ্য নিশ্চিহ্নকরণ। হয়ত বিএনপি অচিরেই পরিচিত হয়ে উঠতে পারে বাংলাদেশ নাজি পার্টি হিসেবে। অথবা জামায়াতের মতাদর্শও গ্রহণ করতে পারে। দেশদ্রোহী খোঁজার অন্য অর্থ হচ্ছে শুদ্ধিকরণ।

বিএনপি এ শুদ্ধিকরণ প্রথমে নিজ দলেই করেছে। ১৯৭১ সালে বিএনপির যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের দেয়া হয়েছে প্রভাবহীন মন্ত্রণালয়। বিএনপির জন্য সাদেক হোসেন খোকা (ঢাকায়) বা আব্দুল্লাহ আল নোমান (চট্টগ্রাম)-এর মন্ত্রণালয় দেখুন। মান্নান ভূঁইয়া সাধারণ সম্পাদক হওয়ার কারণে বেঁচে গেছেন।

অন্য দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দু'ভাবে আক্রমণটি পরিচালিত হচ্ছে। একটি হচ্ছে জেলজুলুম হুলিয়া, অনটি হচ্ছে পত্রপত্রিকায় চরিত্র হনন বা বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও এর চর্চাকারীদের বিরুদ্ধে বলা বা প্রচার। দ্বিতীয় নিকেশ করে ফেলা, আহত করা, ধর্ষণ করে বা ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করে মানসিক মনোবল ভেঙ্গে দেয়া। হিন্দু, আওয়ামী কর্মী, নেতা ও সমর্থকদের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে দ্বিতীয় পন্থা। আর প্রধানত সংস্কৃতিসেবী বা বুদ্ধিজীবীদের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে প্রথম পন্থা।

লুৎফুন্নাহার লতা (এরা গত তিনচার বছর ধরে প্রবাসী), আবেদ খান, রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ, আলী যাকের, মুনতাসীর মামুন, অজয় রায়, শ্যামলী নাসরীন চৌধুরীসহ অনেকেই।

বাংলাদেশের সবাই জানেন বাংলাদেশ সৃষ্টি ও গড়ায় [একমাত্র আমি ছাড়া] এঁদের অবদান কত অপরিসীম এবং এঁরা সবাই বাংলাদেশের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ডিজিএফআইয়ের প্রাক্তন মহাপরিচালকরাও এই পত্রিকায় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে এ-ধরনের বক্তব্য দিয়েছিলেন।

এ বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয়েছে সংসদে। জামায়াতের এক সদস্য সংসদে বলেছেন, "দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী মূল্যবিরোধী ষড়যন্ত্রের অজানা তথ্য উদ্ধার সংক্রান্ত" জনগুরুত্বসম্পন্ন বাতিল নোটিসের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের কয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তাদের গ্রেফতার দাবি করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হচ্ছেন সৈয়দ হাসান ইমাম, লায়লা হাসান, মুনতাসীর মামুন, তাজুল ইসলাম, আবেদ খান, কবীর চৌধুরী এবং রামেন্দু মজুমদার।" (সংবাদ, ২৯-১২) লক্ষ্য করুন তাজুল ইসলাম নামটি। এ নামটি অপরিচিত। এ ভদ্রলোক ইনকিলাবের বিরুদ্ধে কয়েকটি লেখা লিখেছিলেন তাই তার নাম যুক্ত হয়েছে। এবং আরো দেখুন, ইনকিলাবে প্রকাশিত নাম, চারদলীয় জোট গ্রেফতারকৃত শাহরিয়ার কবির এবং সংসদে প্রদত্ত নামগুলোর মধ্যে অদ্ভুত মিল।

এই সূত্র ধরেই ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা বললেন, "শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা হতে পারেন কিনা তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। তবে শহীদ জিয়াউর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষক এ বিষয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই।" [ভোরের কাগজ, ২৯-১১]।

দেশদ্রোহী হিসেবে প্রথমেই গ্রেফতার করা হয়েছে শাহরিয়ার কবিরকে। তাঁকে গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে চারদলীয় জোটের জামায়াত ধারার সমর্থক ইনকিলাব তাঁকে 'র'-

এর সেরা এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করে প্রায় প্রতিদিন গীবত গেয়ে চলছে। তাদের মতে, "এদিকে শাহরিয়ার কবির গ্রেফতার হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করা কিছু চিহ্নিত এজেন্ট ইতোমধ্যেই গা-ঢাকা দিয়েছে। এসব এজেন্টের মধ্যে আছেন পলাতক হাসান ইমামের স্ত্রী লায়লা হাসান, আ'লীগের একজন সংসদ সদস্য যিনি একজন পরিচিত অভিনেতাও (অর্থাৎ আসাদুজ্জামান নূর), কলামিস্ট নামধারী তাজুল ইসলাম, নাসিরউদ্দিন। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা আবার বক্তব্য দিতে শুরু করেছেন। এতে কলাম লেখকরা খুশি কারণ ব্যারিস্টার না. হুদা বেহুদা কথাবার্তা এত বলেন যে, লেখকদের আর বিষয় খুঁজতে হয় না। পিতা নিয়ে মানে জাতির পিতা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনেকেরই থাকতে পারে। কিন্তু কিছুতেই ২৯ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা সৃষ্টিকরা যাবে না। কারণ সংবিধানটি বলে দিচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছিল ২৬ মার্চ। জেনারেল শওকত এখনো বেঁচে আছেন। তাঁর কী মনে আছে এরশাদ আমলে তিনি লন্ডনে থেকে যাওয়ার চিন্তা করছিলেন এবং ব্রিটিশ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, জিয়া বা তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ না দিলে সৈন্যরাই তাদের হত্যা করত। জেনারেল শওকত এখন এই মন্তব্য অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু সেই ব্রিটিশমন্ত্রী ও তাঁর সমব্যথী যাঁরা ছিলেন সেখানে তাঁরা এখনো বেঁচে আছেন। তবে, আমি মনে করি না, এ মন্তব্য করে তিনি খাটো হয়ে গেছেন। তাঁর ও জেনারেল জিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অবদান স্বীকৃত এবং এ কারণেই দু'জন বীরউত্তম উপাধি পেয়েছেন।

আমেরিকায় এক সময় শুদ্ধিকরণ শুরু হয়েছিল কমিউনিস্ট খোঁজার মাধ্যমে। একে বলা হয় ম্যাকার্থীবাদ। সুহার্তোও এমনটি করেছিলেন ইন্দোনেশিয়ায়। মিলোশেভিচ যুগোশ্লাভিয়ায়। এ শুদ্ধিকরণ অভিযান তুঙ্গে উঠলে সবাই ভীত থাকে। সাহসী সংবাদপত্র ছাড়া যেমন অন্য কোনো সংবাদপত্রে এখন আর হিন্দু নিধন, সন্ত্রাস সম্পর্কে খবর কম থাকে। টিভি চ্যানেলগুলো এসব বিষয় এড়িয়ে যায়। সেন্সর আরোপিত হয়। যেমন, গত সংখ্যা এশিয়া উইক বাজারে ছাড়া হয়নি। কারণ সেখানে একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, হিন্দু বিতাড়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে তালেবানীকরণ শুরু হয়েছে। হতে পারে এবং এটি সমর্থন করছে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত। কে না জানে, লাদেন আমেরিকারই সৃষ্টি এবং লাদেনকে ধ্বংস করছে তারাই। এক সাংবাদিক আমাকে বললেন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় বামপন্থী সাংবাদিক এনায়েতউল্লাহ খান আওয়ামী আমলকে মাঝে মাঝে বলতেন ইল্লিবারেল ডেমোক্র্যাসি। এখন যা হচ্ছে অর্থাৎ কাগজ ব্যান্ড করা থেকে হিন্দু ও আওয়ামী নিধন ও ধর্ষণ– এ আমলকে কি তিনি বলবেন ইল্লিগ্যাল ডেমোক্র্যাসি? এর উত্তর আমার জানা নেই। আর ১৯৪৭ থেকে এখন পর্যন্ত এ দেশে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাদের সব সময় ভারতীয় এজেন্ট বলা হয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় এজেন্ট তারাই যারা ভারতে গ্যাস বিক্রি করতে সবচেয়ে উৎসাহী। ইনকিলাব তো ছাপা হয় ভারতীয় মেশিনে।

এ শুদ্ধিকরণ অভিযান এখন শুধু সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সরকারি

কর্মচারীদের বিশেষ করে '৭৩-এর ব্যাচে শুরু হয়েছে দেশদ্রোহী খোঁজা। এক কথায় মিউনিসিপ্যালিটির সুইপার বাদে সমাজের সবাস্তরেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেশদ্রোহী খোঁজা হচ্ছে। যেমন সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানে তালেবানরা করেছিল। এ-ধরনের শুদ্ধি অভিযানের ফলাফল কী হয়েছে সমসাময়িক ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়।

সবশেষে বলব, যাঁদের বিরুদ্ধে শুদ্ধিকরণ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে বা হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দেশদ্রোহী খোঁজার অজুহাতে, তাঁরা মনে করেন, রাজাকারদের সার্টিফিকেট নিয়ে দেশপ্রেমিক হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও তাই মনে করেন। অবশ্য অনেকের মনে হতে পারে ক্ষণিকের সুবিধা আদায়ের জন্য যে, রাজাকারদের সার্টিফিকেট নিয়ে দেশপ্রেমিক সাজার প্রয়োজন আছে।

১.১২.২০০১

বাংলাদেশে কি তৈরি হচ্ছে গৃহযুদ্ধের পটভূমি?

'মানুষ তা-ই পায় যা সে করে।' না, এ মন্তব্য আমার নয়। পবিত্র কোরানের আয়াত, সুরার নাম নজম্। এ কথা মনে হলো গত ৫০ দিনের পত্রপত্রিকা পড়ে। গতকাল পূর্ণ হয়েছে বিএনপি-জামায়াতের সরকার গঠনের ৫০ দিন। সরকার সংহতকরণের জন্য এই ৫০ দিন যথেষ্ট। কিন্তু কি দেখেছি গত ৫০ দিন পত্রপত্রিকায়? একদিকে আছে জোট সরকারের অতিদক্ষভাবে দখল সংস্কৃতি প্রচলন; অন্যদিকে দেশদ্রোহী খোঁজা, যার অন্য নাম শুদ্ধিকরণ অভিযান। বিএনপির চিন্তাটাঙ্কির একজন বলেছেন, 'নতুন সরকারের কাজে উন্নয়ন ভাবনার চেয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ছাপই বেশি।' (জনকণ্ঠ, ১.১২.২০০১) এ প্রতিহিংসা যারা পরিচালনা করছে, কর্মফল কি তাদের তা-ই হবে?

'মোটর গ্যারেজে হামলাকালে যুবদল নেতা   খালেদা জিয়া আমার নেত্রী, আমি সবকিছু দখল করে নেবো।' (সংবাদ, ২২.১১.২০০১) না, এ ধরনের শিরোনামের সংবাদ আজকাল তিন চারটি পত্রিকা ছাড়া অন্য পত্রিকা করে না। কারণ সৎ সাংবাদিকতার বিষয়টি আপেক্ষিক। যে মালিক বা সম্পাদক যা সৎ মনে করেন, তা-ই সৎ সাংবাদিকতা। এক সময় যেসব কাগজের সম্পাদকরা চোখ খুললেই আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস এবং বিএনপি-জামায়াতের শান্তি দেখতেন, তাদের কাছে এখন দু'মাসের পুরনো আফগান সঙ্কট প্রধান বিষয়। তাদের কাছে হিন্দু ও রাজনৈতিক কর্মী নির্যাতন অতিরঞ্জন। শাহরিয়ার কবির ঠিক ঠিকই র-এর এজেন্ট, দেশে এখন গিজগিজ করছে দেশদ্রোহী। আর সন্ত্রাস, ধর্ষণ তো এক-আধটু থাকবেই। নিউইয়র্কে নেই?

যাক, যা বলছিলাম। এই যুবদল নেতা রাজনীতি বোঝে না। তাহলে সে বেগম জিয়ার নাম ধরে একথা বলতো না। বরং বলতো, শেখ হাসিনা আমার নেত্রী। সে জানে, তার নেত্রী ক্ষমতায় এসেছে এবং ক্ষমতায় যাওয়া মানেই দখল, লুট-প্রয়োজনে খুন। সে আরো দেখছে, শৌচাগার থেকে এমপি হোস্টেল সব দখল হয়ে যাচ্ছে। তার কী হবে? দখলের তো কিছু থাকছে না। সবাই দখলের জিনিস খুঁজছে। নেতাকর্মীরা সকাল হলেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছেন। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথচ সংসদে কোরাম হয় না। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়ে গেছে। হয়তো অচিরেই এরা তাদের নেতা-নেত্রীদের সম্পদের দিকে হাত বাড়াবে। এ কারণেই কি পবিত্র কোরানে আছে–'মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।' (সুরা শুরা)

বিএনপি-জামায়াতের বিজয়কে অনেকে বিচার করেছেন আওয়ামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

জনগণের 'রায়' হিসেবে। মেনে নিলাম সে কথা। কিন্তু পত্রিকাগুলো তাহলে এখনো কেন লিখছে :

১. 'বিপজ্জনক হয়ে উঠছে রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। নবেম্বর মাসে রাজধানীতে ৪৯ খুন। ৩শ' ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় দেড় কোটি টাকার মালামাল লুট।' (আজকের কাগজ, ১.১২.২০০১)

২. 'জোট সরকারের ক্যাডারদের চাঁদাবাজি সন্ত্রাসের কাছে দুই সহস্রাধিক গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান জিম্মি।' (জনকণ্ঠ, ১.১২.২০০১)।

৩. 'চট্টগ্রামের কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা জামিন পেয়ে যাচ্ছে। এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে খুন, সন্ত্রাস, ডাকাতি, ছিনতাই, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা থাকলেও তারা আইনের ফাঁকফোকর গলে দিব্যি জেলখানা থেকে জামিনে বের হয়ে আসছে।' (ভোরের কাগজ, ২৮.১১.২০০১) সে জন্যই কি প্রতিদিন পত্রপত্রিকায় দেখি খুন আর ধর্ষণের কাহিনী? সমাজে বিএনপি-জামায়াত আমলে এই যে ফিৎনা বা চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে তার কী হবে? আল্লাহ ফরমায়েছেন, 'ফিৎনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক।' (সুরা বাকারা) তাদের ভাষায়, মানুষের ম্যান্ডেট কি ছিল এই ফিৎনা সৃষ্টির জন্য?

জামায়াত-বিএনপি ক্ষমতায়। সুতরাং বাংলাদেশে আর কোনো মতাদর্শ থাকতে পারে না। এ আদর্শ সামনে রেখে শুরু হয়েছে শুদ্ধিকরণ, বিশেষ করে প্রশাসনে। সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে :

১. 'পুলিশের ৩১ জন ওএসডি।' (ভোরের কাগজ, ২৯.১১.২০০১)

২. 'ওরা সংখ্যালঘু ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, তাই বাতিল করা হচ্ছে এনএসআইয়ের ৬৫ উপ-সহকারী পরিচালকের নিয়োগ।' (জনকণ্ঠ, ২৭.১১.২০০১)

৩. 'বিদেশে উচ্চশিক্ষারত ৬৯ জনকে পাঠানো হয়েছিল পরিকল্পনা প্রণয়নের সামর্থ্য বৃদ্ধি প্রকল্পের অধীনে।' এখন তাদের ফেরত আনা হচ্ছে উচ্চশিক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে।' (ঐ)।

৪. 'দেড় মাসে ৭ শতাধিক বদলি।' (ভোরের কাগজ, ২৫.১১.২০০১)

৫. '৭৩ ব্যাচের সকল মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাকে বিদায় দেয়া হবে।' (সংবাদ, ২২.১১.২০০১)

এবং পরশু ১৯ জনকে বিদায় দেয়া হয়েছে।

এছাড়া ডিসির মতো সব ভিসি বদল করা হয়েছে। এমনকি পিতা আওয়ামী লীগের হওয়ার কারণে ক্রিকেট দলের ম্যানেজারও বাদ পড়েছেন। গত পাঁচ বছরে স্থাপিত ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধেও পরোক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বাকি আছে ফকির-ফাকরারা।

প্রথম ব্যাচের (৭৩) সিভিল সার্ভিসে যোগ দেয়া কি অপরাধ ছিল? এখন দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা চাওয়াটাই ছিল মুখ্য অপরাধ। মধ্যযুগের পাকিস্তান ছিল ঢের ভালো।

আওয়ামী লীগের আমলে যাদের চাকরি হয়েছে, সবাই আওয়ামী লীগার? বিএনপি আমলের কর্মকর্তারা বিএনপির? এ তো উন্মাদের মতো আচরণ। এ যুক্তি অনুসারে কেবিনেট সচিব আকবর আলী খান থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগ আমলে যারা সচিব হয়েছিলেন, তারা আওয়ামী লীগার। বিএনপি আমলেও তারা আছেন। এর অর্থ কি বিএনপির সঙ্গে তাদের কোনো লেনদেন হয়েছিল? এ রকম যুক্তি তৈরি হলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বলে কিছু থাকবে না। সব চাকরিই চুক্তিভিত্তিক হতে হবে। যাদের আজ বিভিন্ন জায়গায় বসানো হচ্ছে, তারা চিহ্নিত হচ্ছেন হাওয়া ভবনের খাস লোক হিসেবে। এভাবে তাদের ক্যারিয়ার বিনষ্ট হয়ে যাবে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধ্বংস করে দিচ্ছে উচ্চপদস্থ কয়েকজন সচিব। এরা কয়েকদিন পর চলে যাবেন। যারা থাকবেন তারা পড়বেন প্রতিহিংসার কবলে। আমি মনে করি না সিভিল সার্ভিসে যারা যোগ দিয়েছেন তাদের সবার রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে বা সবাই চাকরিতে থেকে রাজনীতি করেন। যারা আজ উল্লসিত সাড়ে সাতশ' ওএসডি বা চাকরিচ্যুত হওয়াতে, তাদের অনুরোধ জানাবো কোরানের এই আয়াতটি স্মরণ করতে– 'পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস ও সকল পবিত্র জিনিসের জন্য এমন বিনিময়। সুতরাং যে তোমাদের আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।' (সুরা বাকারা) অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এখন দেশদ্রোহী খোঁজা হচ্ছে। পত্রিকার ভাষায়– 'এবারের টার্গেট মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। তালিকাভুক্তদের হত্যা, গুম থেকে শুরু করে মিথ্যা মামলায় জড়ানোসহ বিভিন্নভাবে হয়রানি করার জন্য নীলনকশা তৈরি করা হয়েছে।' (জনকণ্ঠ, ১.১২.২০০১) এই নীলনকশার প্রথম শিকার শাহরিয়ার কবির। দেশদ্রোহী হিসেবে দ্বিতীয়বার যার বিরুদ্ধে মামলা করা হলো, তাঁর সম্পর্কে এক চিঠি লিখেছে নেদারল্যান্ডসের রয়াল একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল হিস্ট্রি। বেগম জিয়াকে পাঠানো চিঠিতে তারা উল্লেখ করেছে–'মি. কবির ডিজার্ভস হিজ কান্ট্রিস রেসপেক্ট রাদার দ্যান সেনশিউর ফর হিজ অ্যাক্টিভিটিজ ইন সাপোর্ট অব জাস্টিস, ফ্রিডম অব স্পিচ অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস...' আর এদেশের কুৎসা রটনাকারী, জেনারেল এরশাদের সেই 'দাড়িঅলা খচ্চর'র পত্রিকা ইনকিলাবে প্রতিদিন গীবত গাওয়া হচ্ছে শাহরিয়ারের এবং অন্যান্যের। এসব সংস্কৃতিসেবী নাকি সব ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা থেকে মাসোহারা পায়। এ চরিত্র হননের বিরুদ্ধে কোনো বিচার নেই। সাংবাদিকরাও কখনো এ-ধরনের সংবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি। আমরা অসহায় এ কারণে যে, আমাদের পিছনে রাজনীতিবিদ, ভণ্ড মওলানা, ঋণখেলাপি শিল্পপতি, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র নেই। অবশ্য আল্লাহ ঘোষণা করেছেন– 'মোনাফেকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করবো, এরপর এ শহরে তারা তোমার প্রতিবেশীরূপে কমই থাকতে পারবে। তারা হবে অভিশপ্ত, ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে ও নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।' (সুরা আহসাব) আল্লাহ

মেহেরবান। আমরা তার দিকে তাকিয়ে আছি যাতে ইবলিশের হাত থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেন।

লতিফুর-মুয়ীদ গং হিন্দু ও আওয়ামী লীগ সমর্থক নিশ্চিহ্নকরণে যে প্রোগ্রাম শুরু করেছিল, তা পরিপূর্ণতা পেয়েছে চার জোটের আমলে। বিচারপতি হিসেবে পরিচিত লতিফুর রহমানের সময় নির্বাচনের একটি ঘটনা ছেপেছে ইন্ডিয়া টুডে। দিনাজপুর-২ নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী সতীশচন্দ্র রায়, যিনি এর আগে চারবার জিতেছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির জেনারেল মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সেনাপতি। নির্বাচনের দিন জেনারেল তার সমর্থকদের নিয়ে রাজবংশীদের গ্রাম ঘিরে ফেলেন এবং ঘোষণা করেন, পুলিয়ারা (হিন্দু রাজবংশীদের এ নামে ডাকা হয়) ভোট দিতে গেলে কল্লা ফেলে দেয়া হবে। পুলিয়ারা এ কথা শুনে পগার পার। বিএনপির মাহবুবুর রহমান জয়ী। অবশ্য আমাদের জেনারেলরা সব সময় নিরস্ত্রদের ওপর স্টিমরোলার চালিয়েই জিতেছে। নির্বাচনে এম. এ. সাঈদের দুষ্টু ছেলেরা তো ছিলই আর ছিল আর্মিরা। মাহবুবুর রহমান এ কাজ করতে পারেন ভাবতে পারি না। তার উচিত এ খবরের প্রতিবাদ করা এবং ইন্ডিয়া টুডের সম্পাদককে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তারের আদেশ দেয়া। বাংলাদেশে ও ভারতে তো এখন খুব একটা তফাত নেই। ভারত এ অনুরোধ রাখবে।

তা লতিফুর-মুয়ীদ-সাঈদের পর এসেছেন তেনারা এবং গ্রামবাংলা আজ ১৯৭১। আগে ছিল খানসেনারা ও রাজাকাররা। এখন বিএনপি ও রাজাকাররা। ইয়াহিয়া খান বলেছিল, কতল কর হিন্দু আর আওয়ামী লীগকে। বিএনপিও বলছে, কতল কর হিন্দু আওয়ামী লীগারদের। পার্থক্য মাত্র ৩০ বছরের। চারদিকে এখন ধর্ষিত রমণীর আর্তনাদ, ঘরছাড়া গৃহস্থের হাহাকার, আহত-নিহত পরিবার-পরিজনের আহাজারি। জানি না আল্লাহর আরশে তাদের কান্না পৌঁছয় কি-না। আল্লাহ বলেছেন, 'আর তাদের জন্য তার মধ্যে (তওরাত) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত আর জখমের সমান জখম।' (সুরা মায়িদা) তবে আমরা বলবো, আল্লাহর কথা মনে রেখে ধৈর্য ধরুন যিনি বলেছেন, 'অবশ্যই অত্যাচারীদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।' (সুরা আল-ই-ইমরান) আল্লাহ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না।' (ঐ) যেসব ঘটনার উল্লেখ করলাম, এগুলো সবই উদাহরণ প্রতিহিংসার। 'ধীরে ধীরে এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকার ১০০ দিনের ঘোষিত কর্মসূচির পরিবর্তে প্রতিশোধস্পৃহায় অঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে ঝড়ো গতিতে।' (জনকণ্ঠ, ১.১২.২০০১) প্রতিহিংসা প্রতিহিংসাই ডেকে আনে। যারা অত্যাচারিত হচ্ছে, একসময় তাদের মধ্যে প্রতিহিংসা জেগে উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে স্বৈরাচারী এরশাদ আমলের কথা মনে পড়ছে। একজন রাজনীতিবিদ বলেছিলেন, সেনাবাহিনী দিয়ে আমাদের দমন করা হচ্ছে, তারা সংখ্যায় কয়জন? তাদের পরিবারের সবাই কি আর্মি? মানুষ ক্ষিপ্ত হলে তাদের ওপর হামলা হবে না কে বললো? তো মানুষ তো মানুষ।

প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠলে কী হবে? এ-ধরনের হামলা প্রতিহামলা শুরু হলে তা গড়াবে গৃহযুদ্ধে। এই ফিৎনার জন্য কে দায়ী হবে? চারদলীয় জোটের পর যারা ক্ষমতায় আসবে, তারা কি পারবে, তাদের অনুসারীদের দমাতে? চেষ্টা করলেও পারবে কি-না সন্দেহ। আমাদের অনেকেও হয়তো বলি হবো সেই গৃহযুদ্ধে। ওই পরিস্থিতিতে আমরা শুধু বলবো স্মরণ করুন আল্লাহকে যিনি বলেছেন–'আর যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, মন্দের প্রতিফল মন্দ আর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোস নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। ... কেউ ধৈর্য ধারণ করলে আর ক্ষমা করলে তা হবে স্থৈর্যের কাজ।' (সূরা শুরা)

২.১০.২০০১

ইতিহাস নিয়ে মারামারি– ধান্দাবাজদের আবির্ভাব!

গত ত্রিশ বছর ধরে ইতিহাস নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মারামারি চলছে। রাজনীতির কারণে ও স্বার্থে মারামারিটা এমন পর্যায়ে এসেছে যে, কয়েকটি প্রজন্ম এতে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে দেশে তাঁদের স্থান হবে না। সে কারণে যাঁরা বলেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, তাঁরা ভুল বলেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই দেশটি স্থাপিত। অনেকে বলেন, আওয়ামী লীগ বা আমাদের অনেকে কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ টেনে আনি, বাড়াবাড়ি করে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করি। তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে বেগম জিয়ার কী দরকার ছিল ত্রিশ বছর পর মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় গঠন করার?

দেশের তিনটি দলই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাতে বাধ্য এবং এ প্রক্রিয়ায় ইতিহাসে চলছে সংযোজন, বিয়োজন এবং উধাওকরণ। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দু'টি দলই কমবেশি যুক্ত সংযোজন ও বিয়োজনের সঙ্গে। জামায়াত যুক্ত উধাওকরণের সঙ্গে। যেমন, জামায়াত বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে যুক্ত নয়। বা গণহত্যা কী?

জাতীয় ইতিহাসের কয়েকটি বিষয় থাকে, যা নিয়ে পৃথিবীর কোথাও বিতর্ক হয় না। হতভাগ্য এ দেশে হয় এবং তা যতটা না ইতিহাস তার চেয়ে বেশি নিছক রাজনীতির স্বার্থে। ইতিহাস প্রসঙ্গে নানাজনের নানা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে। তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু ঘটনার সৃষ্টি বা ঘটে যাওয়া ঘটনার বিকৃতায়ান সুস্থ চিন্তার পরিচায়ক নয়। অধিকাংশ লোকের ধারণা, রাজনৈতিক নেতাদের একটা বড় অংশ ধান্দাবাজ, তাই যে কোনো বিষয়ে তাঁরা মনগড়া কথা বলতে পারেন; কিন্তু যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা যখন মুক্তিযুদ্ধের কিছু সত্য অস্বীকার করেন তখন দুঃখ হয়, কারণ, তাঁদেরও এখন অনেকে ধান্দাবাজ মনে করেন। ১৯৭১ সালের সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব) মীর শওকত আলী বলেছিলেন, 'জিন্নাহ পাকিস্তান সৃষ্টি না করলে আজ বাংলাদেশ হতো না।' (সংবাদ, ৮.১২.৯৬)। এই জেনারেল বিএনপির কেষ্টবিষ্টু হলেও কেউ তাঁকে সিরিয়াস রাজনীতিবিদ হিসাবে মনে করেন না। সীমিত ধারণার মানুষ হিসাবেই মনে করেন। কিন্তু যখন সাদেক হোসেন খোকা বলেন, "মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের কোনো অবদান নেই"- তখন অবাক হতে হয়। খোকা ৩০ বছর আগের কথা চিন্তা করে একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, কার ডাকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, কোন্ সরকারের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিলেন? এ প্রশ্ন অন্য কাউকে করতাম না কিন্তু তাঁকে করছি এ কারণে, বিএনপির ১০/১৫ জন নেতার মধ্যে তাঁকেই বিবেচক হিসাবে আমরা মনে করি যাঁর পক্ষে কখনও কখনও সম্ভব হয় দলীয় সঙ্কীর্ণতার ওপরে ওঠা। তাঁর মধ্যে

হীনম্মন্যতা আশা করা যায় না। তিনি যে কোনো দল করতে পারেন কিন্তু সত্য অস্বীকার করা সৎ রাজনীতিবিদের কাজ নয়। তা হলে ধান্দাবাজদের সঙ্গে আর তাঁর পার্থক্য থাকে না।

এসব বিতর্কের মাঝে পদ ক্ষমতা অর্থের লোভে কিছু লোক ছুটে যায় ইতিহাস নির্মাণে, ধান্দাবাজ হিসাবে তাঁদের আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে খ্যাত-অখ্যাত দু'ধরনের লোকই থাকতে পারেন। একটি উদাহরণ দিই। বদরুদ্দীন উমরের সঙ্গে আপনি অনেক বিষয়ে একমত হতে না পারেন, কিন্তু কোনো কিছুর লোভে তিনি কোনো কিছু লিখেছেন তা বলতে পারবেন না। কারণ, তিনি ধান্দাবাজ নন, অন্যদিকে তাঁর চেয়ে বয়সী আলী আহসানের কথা ভাবুন। আশি বছরের এই সাহিত্যিক সুন্দর কিছু কবিতা লিখেছেন কিন্তু নিজেকে এমন পর্যায়ে নিতে পারলেন না, যেখানে কেউ তাঁকে ধান্দাবাজ বলবে না। ওবাইদ জায়গীরদার নামে এক লোক আবার ১৬ ডিসেম্বর অস্বীকার করে ইনকিলাবী ইতিহাস নির্মাণ করতে চাইছেন। নিশ্চিত থাকুন, এবার বইমেলায় জেনারেল জিয়ার ওপর গোটা পঞ্চাশেক বই বেরুবে। এটাই হচ্ছে ধান্দাবাজি।

আজকে এ লেখার প্রয়োজন ছিল না যদি না তথ্য মন্ত্রণালয় প্রযোজিত ১৬ ডিসেম্বরে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রোড়পত্র দেখতাম। সেখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণীর সঙ্গে প্রধান যে রচনাটি স্থান পেয়েছে তা সেই বর্ষীয়ান সৈয়দ আলী আহসানের। নাম 'ষোলই ডিসেম্বর ঃ আমাদের চিত্তশুদ্ধি ও স্বাধীনতার বিকাশ।' এতদিন তিনি নিশ্চুপ ছিলেন, ভাবতাম উৎপাত থেকে বেঁচেছি, এখন দেখছি, না আবার তিনি মাঠে নামছেন। এঁদের থেকে সতর্ক থাকার জন্যই এ রচনা, কেননা বুদ্ধিজীবী হওয়ার জোরে এঁরা এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। আমরা মনে করি, বা তিনি তো একজন বর্ষীয়ান বুদ্ধিজীবী, মিথ্যা বলবেন কেন? তখন ভুলে যাই, প্রকৃত সৎ বুদ্ধিজীবী ও ধান্দাবাজ বুদ্ধিজীবীর মধ্যে পার্থক্য না টানলে জাতীয় রাজনীতিতে আরও উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। বোধশক্তি হবে আলতাফ চৌধুরীর মতো, যিনি টোকাই ও এমপির পার্থক্য বোঝেন না [তিনি পত্রিকার এ খবর অস্বীকার করেছেন] বোঝেন না কেন শাহরিয়ার কবির তাঁর মতো বায়ু সেনা থেকে বিখ্যাত ও সম্মানিত।

উল্লিখিত ক্রোড়পত্রে সৈ. আ. আহসান স্বাধীনতা কী, এর ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে জাতিকে একটা ছবক দিয়েছেন। এমনকি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দলীয় প্রধান হয়ে বেগম জিয়া যে বিকৃতি ঘটাননি তা ঘটিয়েছেন সৈয়দ আলী। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী অবশ্য রাজনৈতিক হীনম্মন্যতার কারণে, মুক্তিযুদ্ধের নায়ক বা বীর যেমন বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন বা ওসমানীর কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। সৈয়দ আলীর সংক্ষিপ্ত স্বাধীনতার ইতিহাসটির অনেক কিছুই চ্যালেঞ্জ করা যায়, কিন্তু আমরা তা করব না বরং মিথ্যাচারগুলো তুলে ধরব-

১. "এই মুক্তিযুদ্ধ কোনো একটি রাজনৈতিক দল পরিচালনা করেনি।" এটি সর্বৈব মিথ্যা। এটি ইতিহাসের ঘটনা যে, আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে যুদ্ধ হয়েছে। তিনি কীভাবে সর্ব ঘটনা গাপ করে দেন তাঁর একটি উদাহরণ দিয়েছেন অধ্যাপক অনুপম

সেন। এ আর মল্লিক, সৈয়দ আলী, অনুপম সেন, আনিসুজ্জামান, আবু জাফর- এঁরা অনেকেই এক সঙ্গে দেশ ছেড়েছিলেন। আলী আহসান তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ওপারে পৌঁছানোর পর ভারতীয়রা অনুপম সেনের খোঁজ করতে লাগল [অর্থাৎ তিনি হিন্দু, ভারতীয়রাও হিন্দু]। অধ্যাপক সেন জানাচ্ছেন, আসলে ভারতীয়রা মল্লিক সাহেব আর সৈ. আ. আহসানকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে রেখেছিল, বাকিরা যে যার মতো জায়গা করে নিয়েছিলেন। অধ্যাপক সেনের মতে, ইনি এ রকম সত্য না বলায় অভ্যস্ত।

২. "মূলতঃ এই যুদ্ধে প্রেরণা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শহীদ জিয়াউর রহমানের ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখের ঘোষণায় সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে সূচনা হয়।" জেনারেল জিয়া কখনও এ ধরনের মিথ্যার বেসাতি করেননি, যা করছে তাঁর অনুচর ও কিছু ধান্দাবাজ- এ সত্যটি বর্তমান প্রজন্মের জানা উচিত। যুদ্ধে তাঁর স্থান কি ছিল তা তিনি জানতেন আওয়ামী লীগ সরকারই তাঁকে মেজর পদ থেকে কর্নেল পদে উন্নীত করে, যেমন করে কর্নেল ওসমানীকে জেনারেল পদে। সৈয়দ আলীর কথা স্বীকার করার অর্থ, বাংলাদেশ গঠনে ফজলুল হক, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী এবং প্রধান নায়ক বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পূর্ণ অস্বীকার করা, যা একমাত্র উন্মাদ বা মূর্খের পক্ষে সম্ভব।

৩. "এ কথাও বলা হয় যে, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক নন এবং জিয়াউর রহমানের জায়গায় কয়েকটি অপরিচিত নাম একটি দলের পক্ষ থেকে দেয়া হয়।" সৈয়দ আলী স্পষ্ট করে বলুন কোন্ সে দল- এবং নামগুলো কী?

৪. "এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জিয়াউর রহমান না থাকলে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ বিশৃঙ্খলায় পরিণত হতো।" বলে কী লোকটা! মুক্তিযুদ্ধ একটা কাঠামোর মধ্যে হয়েছে। এ কাঠামোয় জেনারেল ওসমানীর পরিচালনায় যুদ্ধ করেছেন সেক্টর কমান্ডাররা, জেনারেল জিয়া ছিলেন যার একজন। উপযুক্ত উক্তির অর্থ জেনারেল ওসমানীকে হেয় করা। জেনারেল ওসমানীর ওপরে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ আর তাঁর ওপর ছিলেন যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। একেই বলে ইতিহাস উধাও করে দেয়া।

৫. "এটা সত্য এবং সর্বজনবিদিত যে, একটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা যখন দেশ থেকে পলায়ন করছিলেন অথবা পাকিস্তানের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিলেন তখন একমাত্র জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার স্পৃহাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং দেশকে ক্রমশ স্বাধীনতার সংগ্রামে টেনে এনেছিলেন।"

বোঝা যাচ্ছে, তিনি আওয়ামী লীগের কথা বলছেন। তাঁরা ছাড়া আর কেউ দেশ ছেড়ে যাননি? তিনি নিজে পালাননি? জিয়াউর রহমান বা অন্য সেক্টর কমান্ডাররা ভারত যাননি? আবার দেশে ছয় কোটি মানুষ থেকে লড়াই বাঁচিয়ে রাখেনি? স্বাধীনতার স্পৃহাকে প্রজ্বলিত রাখেনি? এই প্রজ্বলনের কাজ করতে গিয়ে ত্রিশ লাখ শহীদ হয়নি? যারা দলের নির্জলা দালালি করে তারা এসব বলতে পারে। জানি না আশি বছরেও মানুষের আর কী শখ আহলাদ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে?

৬. "বহু পূর্বে এক সময় আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলাম।" কবে, কখন?

সৈয়দ আলী আহসানদের প্রধান কাজ বন্দনা করা এবং তার বিনিময়ে দু'টুকরো রুটি জোটে, কি-না তার হাপিত্যেশ করা। এ প্রসঙ্গে দৈনিক 'আজকের কাগজ'-এর মালিক সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমদ, "জিয়াউর রহমানের নিন্দায় বন্দনায় সৈয়দ 'আলু' আহসান" শীর্ষক নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'আলু সবখানেই ফিট করে', কাজী সাহেব বেপরোয়া মানুষ, অনেক কিছু তিনি বলতে লিখতে পারেন যা আমরা দুর্বলচিত্তরা পারি না। তাই তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি- "বাংলাদেশের এক জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। আলুর মতোই সব জায়গাতে ফিট। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে ছিলেন। তাই তিনি নিজেকে 'মুক্তিযোদ্ধা' পরিচয় দিয়ে অতীতে ফায়দা লুটেছেন। এখন আরও লুটতে চান। ... সৈয়দ আলু আহসান বঙ্গবন্ধুর আমলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। জিয়াউর রহমানের আমলে পদোন্নতি পেয়ে উপদেষ্টা মানে মন্ত্রী। হযরত আলহাজ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে জাতীয় অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সংস্কৃতি কমিশনের চেয়ারম্যান। এরশাদের 'রাজকবি' হিসাবে এই 'আলু' আহসান দেশের একশ্রেণীর কবিদের সংগঠিত করেন এবং নিয়মিত এরশাদের রাজসভায় বাংলা কবিতা কাওয়ালির মতো গেয়েছেন। মানে নিয়মিত এরশাদ বন্দনা করেছেন।" (আজকের কাগজ ১৬.৬.৯৭)। এরশাদ পতনের পর তাঁর বাড়ি আক্রান্ত হয়। এরপর তাঁর আশ্রয় ছিল দৈনিক সংগ্রাম ও ইনকিলাব। বেগম জিয়া ক্ষমতায় আসার পর শুরু হয় জিয়া বন্দনা। কিন্তু সে আমলে তিনি আর কিছু পাননি।

কাজী শাহেদ ১৯৭০-এর আগের কথা বলেননি। আইয়ুব আমলেও শোনা যায় তিনি জড়িত ছিলেন আইয়ুবের আত্মজীবনীর বাংলা অনুবাদ প্রকাশে। তাঁর আগে ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে বাংলা ভাষা প্রচলনের বিরোধিতা করেন। কবি জসীমউদ্দীন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- আলী আহসান বাংলার পরিবর্তে উর্দু বর্ণমালা প্রবর্তনের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন মন্ত্রীর ডাকা এক বৈঠকে। একপর্যায়ে আলী আহসানকে ধমক দিয়ে জসীমউদ্দীন বলেন- "আমি কথা বলতে আসিয়াছি আমার বন্ধু ফজলুর রহমানের সঙ্গে, তোমাদের সঙ্গে না। শুনিয়া আলী আহসান চুপ করিয়া গেল।" (ভাষা আন্দোলনের দলিল)।

৮ জুন (১৯৯৭) তারিখের ইনকিলাবে আলী আহসান লেখেন, "শহীদ জিয়াউর রহমান আমাদের জাতীয় জীবনের এক অসাধারণ সত্তা, বিস্ময়কর প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বাদ দিলে আমাদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হবে।"

অথচ এর দেড় বছর আগে নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক ঠিকানার সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন–

প্রঃ মানুষ হিসাবে জিয়া কেমন ছিলেন?

উঃ আমরা শেখ মুজিবের মধ্যে যে মানবিক গুণাবলী দেখেছি তা জিয়ার মধ্যে একেবারেই ছিল না (হঠাৎ রাগত, স্বরে স্বগতোক্তি করলেন, বেয়াদব)।

প্রঃ বেয়াদব?

উঃ একদিন রাতে ঘুমিয়ে পড়েছি, কুমিল্লা থেকে তাঁর টেলিফোন এল, রাত তখন দেড়টা। রিসিভারটা তুললেই শোনা গেল জেনারেল জিয়ার কণ্ঠস্বর, ঘুমোচ্ছেন নাকি! ঘুম বাদ দিয়ে দেশের কথা চিন্তা করেন, দেশের জন্য কাজ করেন। কুমিল্লায় মেয়েদের কলেজকে সরকারি করছেন না কেন? আমি উত্তর দিলাম, সে ক্ষমতা তো আপনার। 'কাল থেকে এই কলেজটিকে সরকারি করবেন' বলে ঠাস করে ফোন রেখে দিলেন। রাত দুপুরে এটা ছিল ফাজলামি।

আর একদিনের কথা। একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সই করাতে নিয়ে গিয়েছিলাম বঙ্গভবনে তাঁর কক্ষে। দস্তখত শেষ করে কালো চশমার ফাঁকে আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কাউকে স্যার বলেন না নাকি?

জবাবে বলেছিলাম, আমার শিক্ষককে বলি, বয়োজ্যেষ্ঠদের বলি। শুনে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'হুঁ'।" [ঠিকানা ঃ ১৯.১.৯৬]

এর পর তিনি যখন মধ্যপ্রাচ্যে গেছেন সরকারি কাজে তখন জেনারেল জিয়া তাঁকে বরখাস্ত করেন। তাঁর ভাষায়, সেই 'বেয়াদব' ফাজিল জিয়া এখন আবার তাঁর ভাষাতেই প্রায় প্রেরিত পুরুষ।

সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, ১৯৭৫ সালে তাঁর শ্যালক তাঁকে বলেছিলেন, "আপনাকে নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে আপনি তাল মিলিয়ে চলতে জানেন না।" (বাংলাদেশ ঃ ১৯৭৫)। এই মন্তব্য সম্পূর্ণ ভুল অথবা এটি স্বরচিত। তিনি সব সময়ই তাল মিলিয়ে চলেছেন, এখনও চলতে চান জিয়ার সেই লাথি খেয়েও। এ ধরনের মানুষের এটিই বৈশিষ্ট্য এবং বিএনপি এদেরই পছন্দ করে।

২৩.১২.২০০১

এই জাতির বোধ

বিজয় দিবস গেল, ঈদও শেষ হলো, বিজয়ের মাসও শেষ হতে চলল। এবার ছিল বিজয়ের ত্রিশ বছর। এ উপলক্ষে অনেকে আশা করেছিলেন যে, খুব ধুমধাম করে তা পালিত হবে। হয়নি এবং সেটাই স্বাভাবিক। স্মৃতিসৌধেও মানুষজন তেমন যায়নি। অনেকের মনে হয়েছে, জামায়াত যখন ক্ষমতায় তখন বিজয় দিবসের আর গুরুত্ব থাকে না। কারণ জাতি এখন এক হিসেবে বিজিত। অনেকে ভয়ে যায়নি, কারণ তাদের মনে হয়েছে, এতে সরকারের রোষানলে পড়ার সম্ভাবনা আছে। ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর অনেক বুদ্ধিজীবী বাসায়ও থাকেননি। কারণ ১৯৭১ সালে জামায়াতের কর্মীদের দ্বারা গঠিত আলবদররা হত্যা করেছিল বুদ্ধিজীবীদের। আর ঈদ! নির্বাচনে পর পলিটিক্যাল ক্লিনসিংয়ের কারণে অনেক মানুষ গ্রামে ফিরতে পারেনি। একুশ শতকের প্রথম বছরের বিজয় দিবস ও ঈদ এভাবেই পালিত হলো।

১৯৭০-৭১ সালে যদি ফিরে যাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলিতে। মনে হয়, হ্যাঁ, আমরা তো স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। পুরো জাতি তো তখন বার বার গর্জে উঠেছিল 'জয় বাংলা' বলে। যারা চায়নি, তারাও তো ভেসে গিয়েছিল সেই গর্জনের সামনে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, মুক্তির সংগ্রাম, তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতা তো মুক্তিযুদ্ধ। কারণ, হয়ত অনেকের মনে হয়েছিল, স্বাধীনতা তো পাবই, কিন্তু স্বাধীনতা পেলেই কি মুক্তি পাব? মুক্তি শব্দটির অর্থ তো ব্যাপক। পাকিস্তানের কলোনিতে আমরা যারা বসবাস করেছি, তাদের মনে হয়েছিল, শুধু ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নয়, সার্বিক অর্থেই আমরা মুক্তি চাই–স্বৈরাচার থেকে, সাম্প্রদায়িকতা থেকে, কলোনির অর্থনীতি থেকে। নতুন ভূখণ্ডে আমরা নতুনভাবে সব শুরু করব। তাই মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল আমাদের কাছে এবং স্বাধীনতার পর যে সংবিধানটি গ্রহণ করা হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল এই বোধ।

বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লবও হয়। নতুন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল এক ধরনের বিপ্লবও বটে। বিপ্লবের সময় অন্তর্দ্বন্দ্বও থাকে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল ১৯৭১ সালে বিজয়ের পরও। এটি যতটা না ছিল আদর্শিক তার চেয়েও বেশি ব্যক্তিগত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও তা মেটাতে পারেননি বরং অনেকটা জড়িয়ে পড়েছিলেন সেই দ্বন্দ্বে। বাংলাদেশের প্রথম সরকারের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট ছিল না। যে কারণে তাজউদ্দিন আহমদ অপসারিত হলেন আর ষড়যন্ত্রকারী খোন্দকার মুশতাক রয়ে গেলেন। পরবর্তী ইতিহাস আমাদের জানা। বাকশাল গঠন তাঁর হত্যার মূল কারণ, এটি মেনে নেয়া কঠিন। কারণ শিল্পী-

সাহিত্যিক থেকে শুরু করে জেনারেল– সবাই বাকশাল গঠন শুধু সমর্থন করেননি, অন্তর্ভুক্তও হতে চেয়েছিলেন। বরং বিষয়টা এভাবে দেখা যেতে পারে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিসমূহের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অভ্যন্তরের পরাজিত শক্তির অনেকের তা পছন্দ ছিল না। তাই তাঁকে হত্যা ও সমাজে ভীতি সঞ্চার করা ছিল জরুরি এবং পরবর্তী শাসকরা সৃষ্ট সেই ভীতিকে ভিত্তি করেই নিজেদের শাসনের সূত্রপাত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যু ছিল সেই সব আদর্শের বিলুপ্তি। পরিবর্তে নতুন আদর্শসমূহের ভিত্তি প্রদান। এটা খুবই আশ্চর্যের যে, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সে আদর্শ এত অল্প সময়ে নির্দ্বিধায়, সমাজের একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছিল। সে কারণেই প্রশ্ন জাগে, আমরা যে মুক্তি চেয়েছিলাম তা কি সত্যিই চেয়েছিলাম?

বাংলাদেশ গঠনের মূল ভিত্তির বিপরীতে জেনারেল জিয়া ও পরবর্তীকালে জেনারেল এরশাদের অবস্থান তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে মুক্তিযুদ্ধ ছিল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে। সুতরাং, যিনি সামরিক শাসক ও সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের পুনরুজ্জীবন ও পরিবর্ধনে আগ্রহী এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পরিপোষক তিনি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক হন কিভাবে? বরং মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্টি করল সমস্যার। রাষ্ট্রের শিশু অবস্থায় জেনারেল জিয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল মুক্তিযুদ্ধের ও তার ইতিহাসের অন্তর্গত হওয়া। জেনারেল জিয়া মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন বটে কিন্তু তার আদর্শসমূহ তিনি ধারণ করেননি। ফলে প্রশ্ন ওঠে, তিনি কি বাধ্য হয়েছিলেন যুদ্ধে অংশ নিতে? তাঁর মৃত্যুর পর বিএনপির প্রয়োজন হলো জেনারেল জিয়াকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করার। তাই সৃষ্টি হলো স্বাধীনতার ঘোষক শব্দটি, যা তিনি জীবদ্দশায় কখনো উচ্চারণ করেননি।

প্রশ্নটা হয়ে গেল তখন ইতিহাসের। আদর্শিক দ্বন্দ্ব তো ছিলই, যা প্রতিফলিত হয়েছে বর্তমানে হিন্দু খেদাও ও মুক্তিযুদ্ধের দুই আলবদরকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়ায়। অবশ্য, এটি নতুন কিছু নয়। জেনারেল জিয়া এই প্র্যাকটিস শুরু করেন, যা চালু রেখেছিলেন জেনারেল এরশাদ। ইতিহাসের বিষয়টি এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব অনেকটা ঢেকে দিয়েছে। তারপর থেকে শুরু হয়েছে ইতিহাসে সংযোজন, বিয়োজন ও উধাওকরণ। পাঠ্যবই নিয়ন্ত্রণ মুখ্য হয়ে উঠল এবং এখনো তা মুখ্য হয়ে উঠেছে। আর কোথাও এমনটি ঘটেনি। ভারতে, অনেকে গান্ধী বা নেহরুকে পছন্দ করতেন না, জিন্নাহকে পাকিস্তানেও। কিন্তু, ইতিহাসে তাঁদের নির্দিষ্ট স্থান নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে উঠেছে এবং এই প্রশ্ন তুলেছেন যাঁরা অনেকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বিএনপির মুক্তিযোদ্ধারাও যখন বলেন, মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের অবদান নেই তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, জাতি হিসেবেও কি আমরা ভণ্ড এবং হীনম্মন্যতায় ভুগি? ব্রিটিশরা আমাদের সম্পর্কে এ-ধরনের কথাই বলে গেছে। এটি কি ঐতিহাসিক সত্য? এভাবেই সামরিক নায়করা পরাজিত শক্তিকে নিয়ে জাতিকে বিভক্ত করে ফেলেছে। এটা সম্ভব হয়েছে অস্ত্রের জোরে দু'দশক তাদের ক্ষমতায় থাকার ফলে। এ দু'দশকে ঋণখেলাপী, লুট, দুর্নীতির ফলে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে [ব্যবসায়ী ও সব রকমের

আমরা যার মধ্যে প্রধান] তাদের ও তাদের সন্তানদের পক্ষে সম্ভব নয় বিএনপি বা জাতীয় পার্টির বিরোধীতা করা।

এর সুযোগ দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ। তারাও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিয়োজনে সমর্থন করেছে। বিএনপি সংযোজন। জামায়াত উধাওকরণে। এ কারণে স্বাধীনতাবিরোধীদের পক্ষে সুবিধা হয়েছে পরিসরটি ব্যবহার করার। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের ছাড়াও অনেকের মনে বীতশ্রদ্ধ মনোভাব ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে শক্তিশালী হয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অংশ। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ পরিণত হয়েছিল এবং হয়েছে সরকারের তল্পীবাহক হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডের জোরালো ও সক্রিয় প্রতিবাদ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কখনো করেনি। করেনি প্রায় সব বীরোত্তম, বীরবিক্রম বা বীরপ্রতীক। করেছে শিল্পী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীরা, যারা কোনো আনুকূল্য পায়নি কোনো সরকারের কাছে।

আমাদের এক মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু বলেছিলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস আটকে আছে ২৬ মার্চ ও ২৭ মার্চ-এই তারিখের মধ্যে। একমাত্র সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ ছাড়া এমনটি আর কোথাও ঘটেনি। ইতিহাসের মূল বিষয়ে ঐকমত্য না হলে জাতি গঠন ও রাষ্ট্রের গঠন নিয়ে অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হয় এবং আমরা তার মাসুল দিচ্ছি। আর এই দ্বন্দ্ব নিরসন না হলে সমাজে অস্থিরতা কমার কোনো সুযোগ নেই।

অনেকে বলেন, আজ ত্রিশ বছর পর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মাতামাতি কেন? এবং আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশি করে। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংযোগ না রাখলে ইতিহাসে তারা থাকে না। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের নিয়ে সরকার গঠন করলেও চোখে ধুলো দেয়ার জন্য সৃষ্টি করতে হয় মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়। এটি যে কত বড় ইয়ার্কি সে বিষয়ে কিন্তু কেউ, এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলও প্রশ্ন করেনি। সুতরাং যারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ এখন অপ্রাসঙ্গিক তাঁরা ভুল বলেন। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকার করলে কয়েকটি জেনারেশনের আর অস্তিত্ব থাকে না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এবং বিএনপি জেনারেল জিয়াকে নিয়ে যতটা মাতামাতি করেছে মুক্তিযুদ্ধকে চেতনায় জাগরূক রাখার জন্য গঠনমূলক তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। হ্যাঁ, বিভিন্ন সময় দুই দলই মুক্তিযুদ্ধের কিছু প্রতীক প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু, এ প্রশ্ন আমরা কখনো করিনি কেন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ চর্চার বিষয়টি ভেস্তে যায়? আওয়ামী লীগ আমলে, মুক্তিযুদ্ধ চর্চার একটি মাত্র অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য তাঁর সময়কালে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো কাজ করতে দেননি এবং এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারক ও শিক্ষামন্ত্রী নীরবে প্রশ্রয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের অনেকে মনে করেন শিল্পী সাহিত্যিকদের মুক্তিযুদ্ধ চর্চাও তাদের পতনের জন্য দায়ী। অথচ এর পেছনে যে মানুষের খানিকটা প্রত্যাখ্যান আছে তা স্বীকার করতে এখনো তারা অরাজি।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে কিন্তু ত্রিশ বছরে কোনো সরকারই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপন করেনি। কিন্তু, সরকারি উদ্যোগে সামরিক জাদুঘর বা জিয়া জাদুঘর (বঙ্গবন্ধু জাদুঘর নয়) বা ওসমানী জাদুঘর স্থাপিত হলে আমাদের কারো আপত্তি থাকে না। বা আওয়ামী লীগের যারা সমর্থক ও নেতা তাঁরাও নিশ্চুপ থাকেন। এসব প্রশ্নের উত্তর যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু, বিষয়গুলো আমরা এড়িয়ে যেতে চাই। এ ধরনের চালাকি বা ভণ্ডামি কাজ করে আমাদের মধ্যে। এসব বিবেচনায় বলা যেতে পারে ভণ্ডামিও এই জাতির এক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজয় দিবসের মাসে এ কথাগুলো আরো বেশি মনে পড়ল। কারণ এখন সরকার শুধু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অন্তর্গতই নয় তা নিয়ন্ত্রণও করতে চাচ্ছে। এর প্রথম উদাহরণ, স্বাধীনতার ঘোষণা আর ২৭ মার্চ নয় ২৬ মার্চ বলে বলা হচ্ছে। বিজয় দিবসের ক্রোড়পত্রে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারি বিজ্ঞাপনে ও সমর্থনে পুষ্ট ইনকিলাব ঘোষণা করছে ১৪ আগস্টই হওয়া উচিত জাতীয় দিবস। বিটিভি বিজয় দিবসের নাটকে জানিয়েছে, “জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নিকট নিজেই আত্মসমর্পণ পূর্বক ধরা দিয়েছিলেন।” বলা হয়েছে, তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে এক প্রকার বাধ্য হয়ে জনতার চাপে পড়ে কোনো রকমে, “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম বলেছিলেন।” (জনকণ্ঠ, ২০.১২.২০০১)।

দৈনিক জনকণ্ঠ প্রশ্ন তুলেছে, ‘আর একটু আশকারা পেলে ১৬, ২১ ও ২৬কেও ওরা বাদ দিতে বলবে।’ (২১.১২) বায়তুল মোকাররমের খতিব পহেলা বৈশাখের উৎসবকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। “পয়লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর দেশব্যাপী নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর যে নির্বিচার নির্যাতন পরিচালিত হয়, সে সবও যে এই হায়েনাদেরই নীলনক্সার কারণে সম্ভব হয়েছিল সেটাও ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে।” (ঐ) জাতীয়তাবাদী সালদা [সাহাবুদ্দীন, লতিফুর, সাঈদ] এতে প্রণোদনা যুগিয়েছিল।

আলবদর প্রধান নিজামীকে দেশপ্রেমিক পুলিশ ইত্যাদি বাহিনী বিজয় দিবসে সালাম দিয়েছে। আর মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবির- যে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ– সে দেশদ্রোহী অপরাধে কারাগারে। যে আদালত পাকিস্তানি পতাকা ওড়ানোর সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে জাহাঙ্গীর মোঃ আদেলকে জামিন দেয় সে আদালতে শাহরিয়ারের জামিনের আবেদন নাকচ হয়। শুধু তাই নয়, হাইকোর্টের নির্দেশের পরও শাহরিয়ারের কৌসুলিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। পরে ডিমান্ড অব জাস্টিস প্রেরণ করে দেখা করতে হয়। হাইকোর্টের আদেশ উপেক্ষিত হয়– যদিও হাইকোর্ট অনেকক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিত হয়ে রুলনিশি জারি করে। অনেকে প্রশ্ন করেন, আদালতে কি আজ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ জিতেছে? কোনো মুক্তিযোদ্ধার দল, সংসদ, বীরোত্তম বা বীরবিক্রমরা এসব প্রশ্ন করেন না।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই এ জাতির বোধ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং এ কারণেই মনে হয় আমরা

কতটা মুক্তিযুদ্ধ চেয়েছিলাম? মনে হয় ঐতিহাসিকরা যে বলেন, এ জাতি ভালোবাসে দাস হয়ে থাকতে– তাই কি সত্য? মনে হতে পারে, অনিচ্ছুক এক জাতিকে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে টেনে নিয়েছিলেন। সে জন্যই কি অন্যান্য রাজনীতিবিদ থেকে আলাদা এবং নিজের স্থান করে নিয়েছেন ইতিহাসে যেখানে কারো পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি নেই, একদিকে ভালো হয়েছে। না হলে, তাঁকে ব্যথিত হতে হতো ত্রিশ লক্ষের আত্মাহুতির জন্য। আমার ব্যক্তিগত মত, যে বিষয়ে অনেকে একমত হবেন না, তা হলো, এই জাতির একটা বড় অংশ বোধহীন এবং যে জাতির একটা বড় অংশ বোধহীন সে জাতিকে নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে প্রগতির লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। সব অর্থে; মুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়।

৩১.১২.২০০১

রাজনীতিক হলেই কি অসত্য বলতে হবে?

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারফ হোসেন শাহজাহানের সঙ্গে এক-আধটু পরিচয় আছে। সজ্জন, অমায়িক, লেখালেখির সঙ্গেও যুক্ত। কিন্তু তিনি যে আবার 'র' ও 'সিআইএ'র সঙ্গেও, কি বলে যেন, এই প্রভাবান্বিত তা জানা ছিল না। এই তথ্যটুকু পাওয়া গেছে সরকারের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত একটি পত্রিকায়। না, সরাসরি তারা কিছু বলেনি, এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তা বলা সম্ভবও নয় বর্তমান নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে; তবে, আকার-ইঙ্গিতটা আছে। সরকারের খতিব উবাইদুল হক ঈদের জামাতে তালেবানদের পক্ষ নিয়ে বলেছিলেন। সারা দেশ জুড়ে তখন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া হয়। যারাই পাকিপন্থী এই খতিবের সমালোচনা করে দৈনিক ইনকিলাব তাদের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিরুদ্ধবাদীরা পরিণত হতে থাকে বিভিন্ন সংস্থার এজেন্টে। একের পর এক বিবৃতি ছাপা হতে থাকে। ২৬ 'বিশিষ্ট আলেম' বিবৃতি দেন– "জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব শ্রদ্ধেয় আলেম হযরত মাওলানা উবাইদুল হক গত ঈদ-উল-ফিতরের জামাতে জাতীয় ঈদগাহে যে সময়োপযোগী বক্তব্য প্রদান করেছেন তা নিয়ে সিআইএ ও 'র'-এর এজেন্টদের অহেতুক নর্তন-কুর্দন এবং বিতর্ক সৃষ্টির অপচেষ্টার আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সে দিন মাওলানা উবাইদুল হক যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা এক শ' ভাগ ইসলামী শরিয়তসম্মত এবং সময়োপযোগী। এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কোনো অবকাশ নেই। যারা এ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে তারা সিআইএ ও 'র' এজেন্ট।" (ইনকিলাব, ২৬.১২.২০০১)।

এই ২৬ জনের মধ্যে স্বঘোষিত আল্লামা ও মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ও আবদুল সুবাহানও আছেন। এঁরা সরকারের শরিক জামায়াতের দুই এমপি এবং '৭১-এ গণহত্যার জন্য দায়ী যুদ্ধাপরাধী।

জনাব শাহজাহানের প্রসঙ্গ এখানে আসে কীভাবে? সরকার নিযুক্ত খতিব, অনেকের ধারণা সরকারেরই বক্তব্য তুলে ধরেছেন। না হলে, স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও নীতিনির্ধারকদের সামনে তিনি এ বক্তৃতা দেন কীভাবে? এ ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হতো যদি সরকার খতিবের বক্তৃতার পরই তাঁকে অব্যাহতি দিত। এমনকি বেগম জিয়াও এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট কিছু বলেননি, শুধু মন্তব্য করেছেন বিনীতভাবে, 'উনি জ্ঞানী লোক, আমি আর কি বলব!' এগুলো পরের কথা, কিন্তু যখন বিতর্ক শুরু হলো তখন ধর্মমন্ত্রী ব্যাপারটা বোঝেননি। কাগজে দেখলাম, খতিবের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে এবং খতিব যে ঠিক বলেননি আকার-ইঙ্গিতেও তা বলেছেন। তখন লিখেছিলাম, তিনি শুধু শুধু নিজেকে এ ঝামেলায় জড়াচ্ছেন। কারণ, নীতি নির্ধারকরা তাঁকে পছন্দ করেন এবং হয়ত, তালেবান ও পাকি

জঙ্গীদের সঙ্গে তিনিই যোগসূত্র। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, এই ব্যক্তি মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে ঘোষণা করেছিলেন, যারা পাকিস্তান ভেঙ্গেছিল তারা গাদ্দার। আওয়ামী লীগ তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছিল। বিএনপি-জামায়াত তাঁকে পুনর্বহাল করেছে। এর মাজেজা কী?

একইদিনে পাকিপন্থী পত্রিকা বলে পরিচিত 'ইনকিলাব' আরো কিছু বিবৃতি ছেপেছে। বিবৃতির ধরনগুলো একই রকম, ভাষাও। এতে অনুমান করা যায়, এগুলোর উৎস একটিই। ৫১ জন আলেম ঘোষণা করেছেন, "শাহরিয়ার কবিরের দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাঁর শাস্তির দাবিতে যখন দেশপ্রিয় জনগণ সোচ্চার তখন তা ঢাকতে রাশেদ খান মেনন গং খতিব ইস্যু দাঁড় করিয়েছে।" তাঁরা আরো বলেন, "মার্কিন দূতাবাস এ বিষয়ে যা মন্তব্য করেছে তা তাদের এখতিয়ার বহির্ভূত এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ।" এর বিবৃতিগুলো অন্য কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি এবং আরো উল্লেখ্য, গণআদালতের উদ্যোক্তা হিসেবে ১৯৯২ সালেই শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়েছিল এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রা থেকে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়, উবাইদুল হক আবারও বলেছেন, "দু'টি উৎসব ছাড়া মুসলমানদের অন্য কোনো উৎসব থাকতে পারে না। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ছিল জালেমদের সরকার। তারা মানুষে-মানুষে, মুসলমানে মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে ব্যস্ত ছিল।" (প্র. আলো, ৩০.১২) এবং তিনি পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য দোয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বংস কামনা করেন। এমন কি আতাউস সামাদ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে লিখছেন, 'খতিব সাহেবের পিছনে দাঁড়াতে চাই না ... আমাদের ভদ্রতা, নম্রতা ও নামাজের পবিত্রতার প্রতি যে শ্রদ্ধা রয়েছে তার সুযোগ নিয়ে আমাদেরকে এক ধরনের জিম্মি করে তাঁর কথা শোনান ও তাঁর প্রতি সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেন।' (প্রথম আলো, ৫.১.০২)। সরকারি কর্মচারি হয়েও তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন। সরকার এ বিষয়ে স্পর্শকাতর হলেও খতিবকে স্পর্শ করেনি। কারণটা অনুমেয়।

অন্যদিকে জামায়াতে রোকনদের সম্মেলনে, "নাম প্রকাশ না করার শর্তে শিবিরের এক সাবেক সভাপতি বলেন, সরকারে যোগ দেয়ার কারণেই আমরা আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার ইস্যুতে জোরালো কোনো আন্দোলন বা কর্মসূচি দিতে পারিনি।" (আজকের কাগজ, ২৬.১২)। নির্বাচনের আগে, জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট ও তথাকথিত আলেমরা লাদেনের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং এই বক্তব্য দেয়ারই চেষ্টা করেছেন যে, লাদেন ইসলামের পক্ষে, তারাও ইসলামের পক্ষে, আওয়ামী লীগ বিপক্ষে; সুতরাং তাদের ভোট দেয়া উচিত। উদাহরণ হিসেবে তারা লাদেনপন্থী বলে পরিচিত আমিনী ও আজিজুল হকের গ্রেফতারের কথা বলেছেন। তালেবানদের মেরে চুরচুর করে দেয়া হলো, লাদেন নিখোঁজ; কিন্তু লাদেনের এই সমর্থকরা একদিনও লাদেনের জন্য মাঠে নামেনি। ইসলাম কীভাবে বিক্রি হয় ভণ্ডদের হাতে এটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখন শোনা যাচ্ছে, সরকার আফগানিস্তানে সৈন্যও পাঠাবে।

এসব বিষয় থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার। খতিব লাদেনপন্থী, জামায়াত লাদেনপন্থী। এমন কি পত্রিকাটিও এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নাখোশ, যেহেতু তারা লাদেনদের নিকেশ করেছে। এরা পাকিপন্থীও। মুসলমানদের একাংশের এ ধর্ম ব্যবসার কারণে, পৃথিবীতে মুসলমানরা যত মুসলমান মেরেছে, খ্রীস্টানরাও তা মারেনি। ১৯৭১ সালে পাকি মুসলমানরা, জামায়াতের মুসলমানরা মিলে ত্রিশ লাখ মুসলমান হত্যা করেছিল। সুতরাং, সরকার গঠিত লাদেনপন্থীদের দ্বারা এবং লাদেনপন্থীদের তারা প্রশ্রয়ও দিচ্ছে। খতিব যার উদাহরণ।

জোট সরকারের আরেক অংশীদার আমিনী যে তালেবানপন্থী তা কখনো তিনি আড়াল করেননি। হাতের কাছে সমস্ত পত্রপত্রিকা না থাকায় এ বিষয়ে তাঁর উদ্ধৃতি ও রেফারেন্সসমূহ দিতে পারলাম না। কিন্তু অন্তত একটি উদাহরণ দিতে পারব যাতে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে তিনি তালেবানদের একজন প্রবক্তা। গত ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক জনসভায় বলেছিলেন, "কোটালীপাড়ার বোমা ঘটনার কয়েকদিন আগে ইসলামী ঐক্যজোট নেতা ফজলুল হক আমিনী ঐ এলাকার এক জনসভায় দেশে 'তালেবান বিপ্লবের' কথা ঘোষণা করেছিলেন।" এ খবর দিয়েছিল ইনকিলাব ১০.২.২০০১ তারিখে।

এত বড় পটভূমিকা করতে হলো একটি কারণে। কয়েকদিন আগে এ নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিবিসিকে শেখ হাসিনা বলেছেন, "তালেবানের প্রকাশ্য সমর্থকরা দেশের মন্ত্রিসভায় রয়েছেন। এমনকি আমি যে নড়াইল-২ আসনে নির্বাচন করি, আমার বিরুদ্ধে তারা যাকে [জোট] মনোনয়ন দেয় এবং এখনো উপ-নির্বাচনের জন্য জোট যে মনোনয়ন দিয়েছে, সে নিজেও দাবি করে যে, সে লাদেনের খুব ঘনিষ্ঠ এবং সেখান থেকে সে ট্রেনিংপ্রাপ্ত। যেহেতু তারা সরকারে আছে এবং বর্তমানে যে জোট সরকার, এই সরকারে তো দু'জন মন্ত্রীও আছে। কাজেই এই জোট সরকারের কাছে যেহেতু তারা মদদ পাচ্ছে, হয়ত সামনে তারা এ ব্যাপারে সাংগঠনিক শক্তিও অর্জন করবে।" (ইত্তেফাক, ১.১.০২)। এ আশঙ্কা সত্যি হলে বাংলাদেশ আফগানিস্তান হতে বাধ্য। অবশ্য, মানুষ যদি তাই চায় বা সে জন্যই যদি ম্যান্ডেট দিয়ে থাকে তা'হলে আমাদের বলার কিছু নেই।

সরকারের দুই নম্বর ব্যক্তি সাইফুর রহমান, যিনি আজকাল অনবরত সব বিষয়ে কথা বলেন, বলেছেন– "চারদলীয় জোটে তালেবান সমর্থক নেই। এর মধ্যে কোনো সত্য নেই। ... বিদেশে নিজের দেশ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের কুৎসা রটাচ্ছেন এবং দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন।" (ঐ)।

একেই বোধহয় চোখ থাকিতে অন্ধ। আমি যে তথ্যগুলো তুলে ধরলাম সেগুলো কি মিথ্যা? রাজনীতিবিদ হলেই কি সত্য নয় এমন কথা বলতে হবে? এমনকি সাইফুর রহমানকেও, যিনি আজকাল মনে হয় অন্য কাউকে নিজের যোগ্য মনে করেন না। দেশটা কি সত্যিই নষ্ট হয়ে গেল?

৬.১.২০০২

তালেবান কি হাওয়া হয়ে গেল?

জাতির উদ্দেশে ভাষণে বেগম জিয়া তাঁর বিখ্যাত ১০০ দিনের কর্মসূচির সাফল্য- ব্যর্থতা আলোচনা করেছেন। ১০০ দিনের কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি তার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। ১০০ দিনের কর্মসূচি সফল হলে নিশ্চয় পূর্ব ঘোষিত আরও ১০০ দিনের কর্মসূচি গ্রহণের কথা তিনি ঘোষণা করতেন। তা কিন্তু তিনি করেননি এবং কেন তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এলেন তার ব্যাখ্যাও দেননি।

ভাষণে যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো– 'দেশের বিরুদ্ধে বিরোধীদলীয় নেত্রীর প্রচারণা প্রসঙ্গে বলেছেন, বাংলাদেশকে বিপদে ফেলার কিংবা বন্ধুহীন করার এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন এবং বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল বন্ধুদের প্রতি আহ্বান- এই অসত্য প্রচারণাকে খণ্ডন করুন। মনে রাখবেন, মাতৃভূমির প্রতি আপনাদের সকলের দায়িত্ব আছে। আমরা বারবার বলে আসছি এবং সারা দুনিয়া জানে বাংলাদেশ কোনো উগ্র মৌলবাদী দেশ নয়।

ডান কিংবা বামপন্থী নয় বর্তমান সরকার। আমরা মধ্যপন্থী, আমরা শান্তিপন্থী, আমরা প্রগতিপন্থী। ... এদেশের মানুষকে তালিবান, সন্ত্রাসী, উগ্র মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত করে ভিত্তিহীন প্রচারণা চালাচ্ছেন।' (ইত্তেফাক ৫.২.২০০১)।

অবশ্যই কেউ যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা করে আমরা তার প্রতিবাদ করব। কিন্তু বিরোধী দল থেকে যা বলা হচ্ছে তা কি অসত্য? এ সমস্ত তো পত্র পত্রিকায়ই প্রকাশিত হচ্ছে। তা হলে, বলতে হবে বাংলাদেশের পত্র পত্রিকাগুলো কুৎসা ছড়াচ্ছে। সরকার প্রগতিপন্থী, তা হলে সরকারি দলের সাঈদী কী ভাবে দেশের সমস্ত ভাস্কর্য ভেঙ্গে ফেলার হুকুম দেন বা বিমানবন্দর লাউঞ্জে বলেন খালি পিটিভি চলবে। দেশের সাম্প্রদায়িক লোকজন নেই? আমরা শান্তিপন্থী? তাহলে গত তিন মাসে হিন্দুরা কি জোটপন্থীদের দ্বারা নিপীড়িত হয়নি? বিবিসির সংবাদ কি মিথ্যা? মিথ্যা হলে বিবিসির সংবাদদাতা এখানে কাজ করেন কিভাবে? যেদিন বেগম জিয়া ভাষণ দিচ্ছেন সেদিনই তো সিরাজদিখানে মন্দির ভাঙ্গা হয়েছে এবং হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে। এ সংবাদ তাঁর ভাষণের সঙ্গেই পত্রিকায় বেরিয়েছে (জনকণ্ঠ ৫.২.২০০১)। সন্ত্রাসী নয় জোট সরকারের সমর্থকরা? তাহলে বিরোধী দলের অনেক সদস্য কেন গৃহচ্যুত, গ্রামচ্যুত, দেশচ্যুত? বেগম জিয়া এসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন কিনা জানি না। তবে, তাঁর মূল বক্তৃতার সঙ্গে যে এসব মন্তব্য সঙ্গতিহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিশ্চয় বাংলাদেশের সরকারের স্বরূপ নিয়ে দেশে-বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে তাই তাঁকে এসব কথা বলতে হয়েছে। নিজের

সরকারকে ডিফেন্ড করতে হয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক।

বেগম জিয়া বলেছেন, তাঁর সরকারে তালেবান নেই, সাম্প্রদায়িক লোকজন নেই। তিনি কেন, তাঁর মন্ত্রীরাও অনবরত তা বলছেন। আমরা অনেকে বলছি, না, কথাটা ঠিক নয়, তিনি ইসলাম ধর্মকে ভোটে ব্যবহারের জন্য মুসলমান সেন্টিমেন্ট যারা ভুল প্রচার করে উস্কে দিয়েছিল তাদের সঙ্গে শুধু আঁতাত নয় সরকারেও নিয়েছেন এবং তারা যে তালেবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল এ কথাও মিথ্যা নয়।

নির্বাচনের ক'বছর আগের কথা চিন্তা করুন, হরকাতুল মুজাহিদ ইত্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত নামের কিছু সংস্থা গড়ে উঠল বাংলাদেশে। তাদের লক্ষ্য তালেবান শাসন প্রচলন, যা তারা ইসলামী শাসনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছিল। শায়খুল হাদিস উপাধি ব্যবহারকারী জনাব আজিজুল হক বা মুফতী উপাধি ব্যবহারকারী আমিনী ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ফ্রন্টের নামে এ আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। সে সময়ই তাঁরা উদ্ভাবন করেন বিখ্যাত সেই স্লোগানের 'আমরা হব তালেবান বাংলা হবে আফগান'। ইনকিলাব নামে মিথ্যা সংবাদ প্রদানকারী সংবাদপত্রটি এর এক ধরনের গার্জেন বা মুখপত্র হয়ে ওঠে। আমিনীদের সঙ্গে নিজামীদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও নির্বাচনের আগে তাঁরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে এ কথা বলা শুরু করেন, আওয়ামী লীগ, বামপন্থীরা ইসলামের পক্ষের শক্তি নয়। তালেবান হওয়া ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বিষয়টি এমন পর্যায়ে যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ঢাকায় এসে সাভার স্মৃতিসৌধে যেতে অস্বীকার করেন অনিরাপদ বোধ করে। মার্কিনীদের এই ধারণা হয়েছিল তালেবানদের সঙ্গী-সাথীরা ক্লিনটনকে হত্যা করতে পারে। এখন এ কথা অস্বীকার করার অর্থ নির্জলা মিথ্যা বলা।

তালেবানদের সমর্থক পাকিস্তান যখন আমেরিকার সঙ্গে মিলে তালেবানদের মার দিতে শুরু করে তখন আমিনী-জামায়াতের ইসলামবোধ উড়ে যায়। পাকিস্তানী মুসলমানরা চীন-আমেরিকার সমর্থনে যে বাংলাদেশের মুসলমানদের হত্যা করেছিল ১৯৭১ সালে তেমনি ২০০১-২ সালে আবারও সেই পাকিরা আমেরিকানদের সঙ্গে মিলে আফগান মুসলমানদের হত্যা করে। তখনই এই সাঈদী, নিজামী, আমিনী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা একটি কথাও বলেনি। তাদের অনুসারীরাও এমন ভণ্ড যে, একথা তারা জিজ্ঞাসা করেনি যে, যখন তালেবানরা মার খাচ্ছে তোমরা তখন সুখে মুরগি চিবিয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছ কী ভাবে? আগে কেন বলেছিলে তালেবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল? এই যে মুসলমান ভান করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এ সম্পর্কে আল্লাহ্ জানিয়েছে– 'তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে বড়ই অপ্রীতিকর।' (সুরা-সাফ্ফ)। আসলে ভণ্ড বা রাজাকাররা আমাদের মতো নিরস্ত্র মানুষ পেলে লাঠি ঘোরাতে পারে, কিন্তু অন্যরা ডাণ্ডা নিয়ে নামলে বাপ-মায়ের নাম ভুলে যায়।

যে দু'জন মার্কিন কংগ্রেস সদস্য সম্প্রতি বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন তাঁরা বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদীদের শক্তি বৃদ্ধিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। জোসেফ ক্রলির মুখপাত্র বলেছেন, 'বাংলাদেশ সরকারের যেসব কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে তাঁরা এ বিষয়ে

জানেন।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'বিএনপি বা প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি এভাবে দেখেন- নিম্নবর্গের অনেকে মৌলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যাদের মাদ্রাসা ও 'টেররিস্ট নেটওয়ার্কে' মাধ্যমে রিক্রুট করা হয় (ওয়াশিংটন টাইমস, ৩.১.২০০২)।

একই পত্রিকায় বলা হয়, ভারতীয়রা বলছে আইএসআই ও চরমপন্থীরা সীমান্ত এলাকায় তাদের তৎপরতা চালাচ্ছে। অনেকের অনুমান, তা ভুলও হতে পারে যে, জোট সরকারের ওপর আইএসআইয়ের প্রচণ্ড প্রভাব আছে, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মোঃ সেলিম বলেছেন, বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় মৌলবাদীদের প্রশিক্ষণ চলছে বা ঘাঁটি আছে।

এগুলো গেল বিদেশী খবর। সেপ্টেম্বর একুশে টিভিতে কি লাদেনের পক্ষে বিরাট মিছিল দেখায়নি? ঐ একই সময় বিবিসিতে কি দেখানো হয়নি লাদেনের পক্ষে কিভাবে বুশের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হচ্ছে? এগুলোর সঙ্গে কি আমিনী-জামায়াতরা জড়িত ছিল না? তারা না থাকলে কি বিএনপি ছিল? বিএনপি বা আমিনীরা না থাকলে আমাদের বিশ্বাস করতে হয় আফগানিস্তান থেকে আল কায়েদার লোকজন এসে ঐ মিছিল করিয়েছিল। নির্বাচনের আগে এটি প্রচার করার উদ্দেশ্য ছিল যে, আওয়ামী বা বামপন্থীরা মুসলমান নয়, আর মুসলমান না হলে কাউকে ভোট দেয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বেগম জিয়া কি ভুলে গেছেন, চট্টগ্রামে ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা মুফতি ইজহারুল ইসলাম পরিচালিত লালখান বাজারের পাহাড় শীর্ষে অবস্থিত মাদ্রাসাটিতে আফগান স্টাইলে বাংলাদেশে তালেবানী বিপ্লব করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ ছাড়া যেদিন আমেরিকাতে হামলা হয় সেদিন রাতেই ঐ মাদ্রাসা থেকে একটি জঙ্গী মিছিল বের হয় এই হামলার সমর্থনে উল্লাস প্রকাশ করে। ইতোপূর্বে চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে একটি মাদ্রাসার ছাত্ররা এবং ইসলামী ঐক্যজোট চট্টগ্রামের বিভিন্ন মিছিল থেকে স্লোগান দিয়েছে 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান।' (ভোরের কাগজ ১৯.৯.২০০১)। একই সময় "চট্টগ্রামে আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ থেকে জাগ্রত জনতার ব্যানারে জামায়াতে ইসলামী-তালেবান সমর্থকরা এ বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলে 'ওসামা আমাদের হিরো' আমেরিকা তুমি খুনী প্রভৃতি লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করা হয়।" আসলে, টুইন টাওয়ারের ঘটনায় সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ প্রথম নিন্দা জানালে জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট বা তালেবান চক্রের 'টার্গেট' হয়ে পড়ে আওয়ামী লীগ। ২৩ অক্টোবর, ২০০১ সংবাদে একটি ছবি ছাপা হয়েছে সেখানে দেখবেন একদল তরুণ লাদেনের ঢংয়ে পোশাক পরে ডামি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে স্লোগান দিচ্ছে, 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান।' এখন বিএনপি, বেগম জিয়া বা জোট সরকার যদি এটি অস্বীকার করে তবে বলতে হবে, তারা মিথ্যা বলছে, হ্যাঁ মিথ্যা বলছে এবং জামায়াতই সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে। কোরানে বলা হয়েছে 'তোমরা মিথ্যা বলা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে' (সুরা-হজ্জ)। আর জামায়াত বলে 'প্রয়োজনে মিথ্যা বলা কেবল জায়েজ নয় বরং ওয়াজেব বা আবশ্যক।' (তরজুমানুল কুরআন, মে ১৯৫৮ ঃ তফহিমুল কোরআন, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০)।

আমেরিকার ডাণ্ডাবাজির পর আফগান তালেবান উবে গেছে। আমিনী গং এ বিষয়ে মিউমিউ করছে। তালেবানদের 'স্রষ্টা' জে. মোশাররফ নিজের দেশে তালেবানদের খালি

ধরেছেন না মাদ্রাসাগুলোকে সংস্কার করছেন। একই কাজ করছেন মাহাথির মালয়েশিয়ায়। বেগম জিয়া এ কাজ না করলে তাঁকেও উৎখাত করতে পারে তালেবান সমর্থকরা।

এর প্রমাণ জোট সরকারের অন্যতম অংশীদার জামায়াতে ইসলামী তালেবানদের কখনও নিন্দা করেনি এবং সব সময় সন্ত্রাসীদের ওপর আমেরিকানদের আক্রমণের নিন্দা করেছে। সাঈদী প্রকাশ্যে বলেছেন, নিযামী বলেছেন, চারজোটের রূপকার, জামায়াতের আসল নীতিনির্ধারক গোলাম আযম কয়েক দিন আগে 'ইউরো-বাংলা'র সঙ্গে সাক্ষাতকারে আকারে ইঙ্গিতে তালেবানদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন, (১৪-১-২০০২)। তিনি বলেছেন- 'দেশের ৯৫ ভাগ তালেবানের নিয়ন্ত্রণে আসার পরও গণধিক্কৃত রাব্বানী-দোস্তাম জোট ইসলামের চরম দুশমনদের পুতুল হিসাবে টিকে থাকে। আফগানিস্তানের উত্তরে পাশাপাশি সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান ভাষা ও গোত্রীয় সম্পর্কের কারণে রাব্বানী-দোস্তাম জোটকে সাহায্য করতে থাকে। রাশিয়া ও ভারতের এত সহযোগিতা সত্ত্বেও এ জোট যা 'নর্দার্ন এ্যালায়েন্স' নামে এখন পরিচিত- তালেবান সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে কোনো এলাকাই তাদের দখলে নিতে সক্ষম হননি, এখন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর চাপিয়ে দেয়া চরম অন্যায় যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আমেরিকার পুতুল সরকার কাবুলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।' তিনি আফসোস করে বলেছেন- 'তালেবান সরকার একঘরে হয়ে আন্তর্জাতিক মহাসন্ত্রাসের শিকারে পরিণত হলো, আর ওআইসিসহ সকল মুসলিম দেশ নীরবে তামাশা দেখল। অবশ্য মুসলিম জনতা সকল গণতান্ত্রিক দেশে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।' (ঐ)। জনাব আযম সত্যিই বলেছেন, তারা তো এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং করছেনও।

বেগম জিয়া তালেবানদের সঙ্গে রেখেছেন। রাখুন, তাতে কারও কোনো আপত্তি জানাবার কথা নয়। কিন্তু তিনি কেন গোলাম আযমের মতো কথা বলছেন তা বোধগম্য নয়। সারা দেশ জানে, তালেবানপন্থীরা ছিল এবং এখনও আছে ঘাপটি মেরে। কারণ, মার্কিন ডাণ্ডার ভয়। ডাণ্ডা থাকবে না তখন আবার স্লোগান হবে, 'আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগান।'

গোলাম আযমের মতো কথা বলে নিজেকে কলঙ্কিত করার দরকার কি? মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যান্টনমেন্টে তিনিও নিপীড়িত দিন যাপন করেছেন। অথচ তাঁর জোটের রূপকার গোলাম আযম এখনও বলেন- '৭১ সালে ভূমিকাকে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা বলে অপবাদ দেন, তারা ধর্মনিরপেক্ষ, বামপন্থী ও ভারতপন্থী। জনগণ আমাদের তা মনে করে না।' জামায়াত গণহত্যার সহযোগী এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান– 'এটা অপবাদ। এর চেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদ আর কিছু হতে পারে না। ওসব করলে এদেশে রাজনীতি করতে পারতাম না। এদেশে আমিও থাকতে পারতাম না।' (মানবজমিন ২৭.১.২০০১)।

আসলে তারা তো আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিলেন জেনারেল জিয়ার কারণে। সুতরাং বর্তমান সরকারের জামায়াত তথা তালেবানপ্রীতি থাকতেই পারে।

৩০ বছরের অর্জন কি পাকিস্তানবাদ?

স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর ২৬ মার্চ যেভাবে উদযাপিত হলো তা দেখে শুধু একটি কথাই মনে হলো, ৩০ বছরে আমাদের অর্জন– হুকুমের স্বাধীনতা? ৩১তম স্বাধীনতা দিবসে কোথাও স্বাধীনতার নায়কদের ছবি, বাণী, কণ্ঠস্বর কিছুই চোখে পড়েনি, শুনিনি। সরকারি ক্রোড়পত্রে জিয়াউর রহমানের শুধু একটি ছবি। সেনা প্যারেডেও শুধু জিয়াউর রহমান, টেলিভিশনেও তাই। যাঁরা বাংলাদেশের ইতিহাস জানেন না, ২৬ মার্চ তাঁরা যদি কেউ এ দেশে থেকে থাকেন তাহলে তাঁদের মনে হবে, একমাত্র জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছেন। বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় আসার পর থেকে স্বাধীনতা নামক বিষয়টি নিয়ে যা করতে চেয়েছিল, মনে হতে পারে তা সফল হয়েছে। হ্যাঁ, যাঁরা বিএনপি-জামায়াতের সমর্থক, তাঁদের মনে হতে পারে তাঁরা জয়ী হয়েছেন। গত ছয় মাস বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে অত্যাচার চালানো হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে তাঁরা হুকুমের চাকর বানাতে পেরেছেন। এমনকি স্বাধীনতার বিষয়টিও তাঁরা পরিবর্তন করে তা মানতে সবাইকে বাধ্য করতে পেরেছেন।

ইতিহাসে কখনো কখনো এমনটি ঘটে। যেমন, ত্রিশ-চল্লিশ দশকে জার্মানি বা ইতালিতে হিটলার বা মুসোলিনি ছাড়া কারো ইতিহাস ছিল না। অন্য কারো কথা উচ্চারিত হলে তার খোঁজ পাওয়া যেত না। তাঁরা তাঁদের মতো ইতিহাস নির্মাণ করে নিয়েছিলেন। আর তা পাহারা দেবার জন্য ছিল গেস্টাপো, ব্রাউন শার্ট, ব্ল্যাক শার্ট প্রভৃতি। এখনও কিন্তু তাই হয়েছে। নতুন ইতিহাস জোট সরকার নির্মাণ করেছে বটে, কিন্তু তা পাহারা দেয়ার জন্য আছে বিএনপি-জামায়াত কর্মীরা অনেকটা ব্ল্যাক শার্টের মতো, আছে পুলিশ-সেনাবাহিনী। কিন্তু, এতসবের মাঝেও, হঠাৎ হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো সত্য বেরিয়ে আসছে। হুকুম হয়েছে, ভালো থাকার; কিন্তু, তার মাঝেও জানা যাচ্ছে, ভালো থাকার উপায় নেই।

এ প্রসঙ্গে বিএনপির জনক, অধুনা বাংলাদেশের জনক হিসেবে পরিচিত জেনারেল জিয়ার ১৯৭২ সালের লেখাটি 'জনকণ্ঠ' পুনর্মুদ্রণ করে অনেককেই বিপাকে ফেলে দিয়েছে। ১৯৭২ সালে এই লেখাটি আমরা পড়িনি তা নয়, পড়েছি, কিন্তু গুরুত্ববহ মনে হয়নি। কারণ, কিছু সাধারণ সত্যই তাতে প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে তিনটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছিল– যা আজকের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক। সেগুলো হলো–

১. "পাকিস্তানি তরুণ সমাজকেই শেখানো হতো বাঙালিদের ঘৃণা করতে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেয়া হতো স্কুল ছাত্রদের শিশুমনেই। শিক্ষা দেয়া হতো তাদের– বাঙালিকে নিকৃষ্টতম মানবজাতি রূপে বিবেচনা করতে। ...

সেই স্কুল জীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাঙ্ক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানব।"

এখন ঠিক তাই হয়েছে। বাংলাদেশের মূল সত্তা বাঙালিবাদের বিরুদ্ধে নির্মম নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। পাঠ্যবইয়ে মিথ্যাচার করা হয়েছে। এই শিক্ষাই দেয়া হচ্ছে যারা বাঙালিত্বের কথা বলে তারা নিকৃষ্ট জীব এবং এটা নিশ্চিত যে বাংলাদেশের হাজার হাজার কিশোর-তরুণের এখন তাই মনে হচ্ছে, যা এক সময় জিয়াউর রহমানের মনে হয়েছিল। শুনেছি, চট্টগ্রামের একটি এলাকায় শিক্ষক বই দেখে বলেছিলেন, স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছে ২৬ মার্চ, জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে। ছাত্ররা চেঁচিয়ে বলল, স্যার, কথাটা ঠিক না, জিয়া ২৭ মার্চ ঘোষণা দিয়েছেন।

২. জিয়াউর রহমান উল্লেখ করেছেন, যারাই বাঙালি ও বাংলাদেশের কথা ভাবত বা বলত আখ্যায়িত করত আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। একাডেমীর ক্লাসগুলোতেও সব সময় বোঝানো হতো, আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। এমনকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো আমাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ওদের রাষ্ট্রের সব চেয়ে বড় শত্রু।

এখনো ঠিক একই অবস্থা, যারা বিএনপি-জামায়াতের সমর্থক নয় তারা সবাই ভারতের দালাল, দেশদ্রোহী তো বটেই। জাতির পিতা কায়েদে আযম বললে তাও এই সরকার মানতে রাজি, কিন্তু জাতির পিতা শেখ মুজিব সেটি বলা মানে ভারতের দালালি করা। এ কথা প্রমাণের জন্য বঙ্গবন্ধুর ছবি নামিয়ে নেয়ার হুকুম করা হয়েছে। আজকের জোট প্রজন্মের কাছে আশ্চর্য মনে হতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি যে, জিয়াউর রহমানকেও আখ্যায়িত করা হয়েছে আওয়ামী লীগের দালাল বলে, যেহেতু তিনি বাংলাদেশের কথা ভাবতেন।

৩. "৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে।..."

২৬ মার্চ তিনি যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন তার কোনো উল্লেখ নেই। যা করেননি তা উল্লেখ করবেন কীভাবে? তা ছাড়া, সেক্টর কমান্ডারও তো তিনি পুরো সময়টা জুড়েও ছিলেন না। ইতিহাসে এ-ধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটেছে, যিনি একটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করেছিলেন সেই দলের অনুসারীরা তাঁকে মিথ্যাবাদী হিসেবে সমাজে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা! আমাদের জানা আছে, অনেকে আওয়ামী লীগকে পছন্দ করেন না, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভক্ত। অনেকে বিএনপি পছন্দ করেন না, কিন্তু জিয়াউর রহমানের ভক্ত। তাঁদের উদ্দেশে বলব, আপনাদের জীবদ্দশাতেই দেখুন, জিয়াউর রহমানকে কীভাবে মিথ্যা নায়ক বানিয়ে তাঁর অপমান করা হচ্ছে।

জামায়াত-বিএনপি এ কাজটি করছে একটি কারণেই যে, তারা এখন পাকিস্তানবাদ মেনে নিতে ইচ্ছুক। পাকিস্তানবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাই করতে হবে, যা পাকিস্তান করেছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে, যার কথা জিয়াউর রহমান আগে লিখেছেন। কিন্তু যাঁরা দল করেন না বা যাঁদের আওয়ামী সমর্থক বলেও খ্যাতি নেই তাঁরাও এখন অখুশি বোধ করছেন। আপনাদের হয়তো অনেকের জানা নেই, প্রাক্তন দুই প্রধান বিচারপতি ও একজন প্রথিতযশা আইনজীবী নতুন এই পাকিস্তান তত্ত্ব মানতে চাননি।

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান ও প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান, মনে করা হয়ে থাকে যিনি প্রবল আনুকূল্য প্রদর্শন করেছিলেন জোটকে, তিনি– "প্রতিকৃতি ভাংচুরের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলেন। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবেই উল্লেখ করেন।" (বাংলাবাজার পত্রিকা, ২৫.৩.২০০২)।

ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষণাকারী হিসাবে অস্বীকার করা সংবিধান লঙ্ঘন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশের মূল ভিত্তি। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সুস্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক। এই ঘোষণা অস্বীকার করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে অবমাননার শামিল। এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে শুধু সংবিধানের অংশ বললে খাটো করে দেখা হবে। মূলত এই ঘোষণাপত্রটিকে অস্বীকার করা স্বাধীন বাংলাদেশকে অস্বীকার করার শামিল।" (ঐ) তাহলে, বিজ্ঞ সংবিধানবিশারদ ও আইনবিদের মতে, বর্তমান সরকার একটি দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে।

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেনও একই বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, "জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন রহিতকরণ বিল সংসদে পাস হলেও সাংবিধানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা বহাল রাখতে চাইলে সরকার বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। বরং বাধা দিলে সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের বিরুদ্ধে যে কোনো নাগরিক আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। সংবিধানের সাথে যতকাল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ শব্দ যুক্ত থাকবে ততকাল জাতির পিতা ও বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান সুনিশ্চিত থাকবে। এটা যাঁরা মানছেন না বা মানবেন না প্রকারান্তরে তাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই স্বীকার করেন কী করে?" (ঐ)

না, বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন এখানেই থেমে থাকেননি, তিনি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কঠোর সমালোচনা করেছেন, কেননা তিনি জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি যা করেছেন তা 'বেদনাদায়ক ও অকল্যাণকর', তিনি সংবিধানও লঙ্ঘন করেছেন।

পরিস্থিতিটা এখন এ রকম– জোট– জেনারেল জিয়াকে যা বানাতে চাচ্ছে তার কোনো সাংবিধানিক বা আইনগত ভিত্তি নেই। আর মানুষের সমর্থন? যদি থাকতই,

তাহলে হুকুম করে ৩১তম স্বাধীনতা দিবস শুধু জিয়াকে নিয়ে পালন করানো সম্ভব হতো না। কঠোর নিপীড়ন চালিয়ে মানতে বাধ্য করা হচ্ছে এমন সব বিষয় যার আইনগত বা সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। জিয়াউর রহমানের যাও খানিকটা জাতীয় ইমেজ তৈরি হয়েছিল, জোট সরকার এখন তা ভূলুণ্ঠিত করে তাঁকে একটি রাজনৈতিক দলের নিছক প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করেছে। বঙ্গবন্ধু, জাতীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়া স্বাধীনতার কথা বলা একটি দলীয় বিষয়, দলীয়ভাবে, স্বাধীনতা উদযাপন; এটি একটি দলীয় 'স্বাধীনতা'। হুকুমের স্বাধীনতা, দলীয় স্বাধীনতা উঠে যায় যখন অন্য কোনো দল ক্ষমতায় আসে। জাতীয় বিষয় জাতীয়ই থাকে, আইনগত ও সাংবিধানিকভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে। এ ধরনের হুকুমের স্বাধীনতা ও তার নায়করা এক সময় ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়- যেমন হয়েছেন হিটলার বা মুসোলিনি। পাকিস্তানবাদের বিরুদ্ধে এক সময় শুধু 'জয়বাংলা' রণধ্বনি দিয়ে বাংলাদেশবাদ জয়লাভ করেছিল। এমন দিন খুব দূরে নয়- যখন এই নব্য পাকিস্তানবাদের বিরুদ্ধে পথে দাঁড়াবে সাধারণ মানুষরা, এমনকি হয়তো আসল জিয়াপ্রেমিকরাও।

২৮.৩.২০০২

একজন যুদ্ধাপরাধীর মৃত্যু

বাংলাদেশে গণহত্যার প্রধান নায়ক, যুদ্ধাপরাধী জেনারেল টিক্কা খানের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য তিনি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। অথচ আশ্চর্য সরকারি কোনো নথিপত্রে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে টিক্কা খানের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে টিক্কা খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও 'খ' অঞ্চলের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাধারণ সেপাই হিসেবে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ পদে আরোহণ করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় রান অব কচ বা কচ্ছের যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে পাকিস্তানি সেনাবহিনীর এলিটদের চোখে পড়েন এবং তার পর ধীরে ধীরে সেনা এস্টাবলিশমেন্টে স্থান করে নেন। তাঁর হিংস্রতা লক্ষ্য করে জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠান। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। তার পর দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল নিয়াজী। অবশ্য জেনারেল নিয়াজীকে প্রথম থেকে পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়েছিল। টিক্কা খান চলে গেলে গভর্নর হন আবদুল মালেক।

টিক্কা খান চলে এলে গভর্নর হিসেবে তাঁর শপথগ্রহণ করাতে অস্বীকার করেন প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী। টিক্কা খান প্রথম থেকেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। ২৫ মার্চের আগে তিনি ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে পরিস্থিতি জানতে চান। তৎকালীন পুলিশ কর্মকর্তা এএম মেছবাহউদ্দিন তাঁকে সামগ্রিক পরিস্থিতি ব্রিফ করে জানান, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছাড়া সঙ্কট উত্তরণ করা যাবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করাই বিধেয়। টিক্কা খান ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, 'ইউ আর আস্কিং ফর দি মুন।' এ উক্তি থেকেই বোঝা যায়, ক্ষমতা হস্তান্তর না করার সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়েছিল।

২৫ মার্চ, গণহত্যা শুরুর দায়িত্ব তাঁর ওপরই বর্তায়। কারণ তিনি গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন। ২৫ মার্চ গণহত্যার পর ২৬ মার্চ রাতে বঙ্গভবনে সেনা অফিসারদের নিয়ে তিনি এক নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। ২৬ মার্চের কথা মনে হলে এই ছবিটির কথা মনে হয়। হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা করে রক্তরঞ্জিত হাত নিয়ে খুশিমনে সেনা অফিসারদের নিয়ে নৈশভোজ সারছেন জেনারেল টিক্কা।

গণহত্যা শুরু হওয়ার পর ৯ এপ্রিল বিচারপতি সিদ্দিকীর কাছে তিনি শপথ নেন। এবার আর বিচারপতি সিদ্দিকী শপথ পড়াতে অস্বীকার করেননি। আসলে রাস্তার ব্যাপারটিও বিচারপতিদের অনেকাংশে প্রভাবিত করে। এর পর থেকে বাংলাদেশে যা

ঘটেছে তার জন্য টিক্কা খান অবশ্যই দায়ী। পাকিস্তানে গিয়ে জেনারেল টিক্কা খানের সাক্ষাৎকার নেয়ার চেষ্টা করেছি কয়েকবার (১৯৯৮)। তাঁর পরিবার থেকে জানানো হয়েছে, তিনি সাক্ষাৎকার দেয়ার পর্যায়ে নেই। স্মৃতিভ্রম ঘটেছে।

১৯৭১ সালের ঘটনা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলাপ করেছি। কিন্তু আশ্চর্য, টিক্কা খান সম্পর্কে তেমন কোনো মন্তব্য কেউই করেননি। সবাই ক্ষিপ্ত জেনারেল নিয়াজীর ওপর। বরং অনেকে টিক্কা খানকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। টিক্কা খান সম্পর্কে জেনারেল নিয়াজীই কিছু মন্তব্য করেছেন। হামুদুর রহমান কমিশনও টিক্কা খান ও ফরমান আলীকে কোনো কিছুর জন্য দায়ী করেনি। এর একটি কারণ, টিক্কা ঢাকা ছেড়ে আগেই চলে গিয়েছিলেন। টিক্কা খান পরে যোগ দিয়েছিলেন ভুট্টোর সঙ্গে। ভুট্টোর নির্দেশে তিনি বেলুচিস্তানে কম্বিং অপারেশন করেন অনেকটা ঢাকা স্টাইলেই এবং 'বেলুচিস্তানের কসাই' উপাধি লাভ করেন। পাকিস্তানের সম্মানিত রাজনীতিবিদ শেরবাদ খান মাজারির আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। উল্লেখ্য, ভুট্টো টিক্কাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান করেছিলেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী বলেছেন, 'টিক্কা খান ভেবেছিলেন ২৫ মার্চের অ্যাকশন ১০ এপ্রিলের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তারা মানুষের ক্রোধের গভীরতা বোঝেনি।'

জেনারেল নিয়াজী সাক্ষাৎকারে আমাদের জানিয়েছিলেন, 'টিক্কা খান বলেছিলেন, বাগদাদে চেঙ্গিস খান বা হালাকু খান যে রকম নির্মমতা দেখিয়েছিলেন তা দেখাতে হবে। তিনি বলেছিলেন, তিনি মাটি চান, মানুষ নয়। ইয়াহিয়া এসব দেখেশুনে ভড়কে টিক্কা খানকে দশ দিনের মধ্যে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখানে বলা দরকার, কোনো জেনারেলকে যদি অপারেশনের মধ্যে সরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তা তাঁর জন্য মৃত্যু পরোয়ানার মতো।'

জেনারেল রাও ফরমান আলী এর উত্তরে আমাদের জানান, "আমি দুঃখিত, কিন্তু আমাকে বলতে হচ্ছে, জেনারেল নিয়াজী একজন মিথ্যাবাদী। টিক্কা খান কখনও ঐ ধরনের উক্তি করেননি। গভর্নর হিসেবে তিনি ছিলেন চমৎকার, অথচ দুর্ভাগ্য যে, বেলুচিস্তানে ও পূর্ব পাকিস্তানে তার একই দুর্নাম রটেছে।"

হ্যাঁ, চমৎকারভাবে তিনি গণহত্যা চালাতে পারতেন। যদি বলা হয় টিক্কা খান কিছুই করেননি, তাহলে বলতে হবে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কোনো গণহত্যা ঘটেনি। অবশ্য অধিকাংশ পাকিই তা মনে করে।

টিক্কা খান কতটা বোধহীন ও নির্মম ছিলেন তার একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি। পাকিস্তানের সাংবাদিক এমভি নকভী এক সাক্ষাৎকারে আমাদের বলেছিলেন, "পাকিস্তানি বাহিনী ছিল বিশৃঙ্খল লুটেরা বাহিনী, এরা লুট করেছে, ধর্ষণ থেকে শুরু করে সব রকমের অপরাধ করেছে। এ সেনাবাহিনী কত বোধহীন ছিল তার প্রমাণ জেনারেল টিক্কা খানের মন্তব্য। ঢাকা থেকে ফেরার পর সাংবাদিকরা যখন লুট, ধর্ষণ, হত্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, "ধর্ষণের সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত। মাত্র

তিন হাজার, মাত্র তিন হাজার মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে।" ক্রোধে নকভীর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তানীরা ৮৭ বছরের টিক্কা খানকে সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করেছে। সেটিই স্বাভাবিক। কিন্তু টিক্কা খান বাঙালি ও বিশ্ববাসীর কাছে 'বাংলার কসাই' হিসেবেই পরিচিত থাকবেন। আমাদের দুঃখ, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আমরা তাঁর বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছি।

ওদের বিরুদ্ধে মামলা হবে?

টিক্কা খানের মৃত্যুর সংবাদ বাসস পরিবেশন করেছে রয়টারের বরাত দিয়ে। খবরে বলা হয়েছে, "১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে টিক্কা খান সামরিক ক্র্যাকডাউনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি হিসাবে আবির্ভূত হন।" জোট সরকার যে ইতিহাস এখন শেখাচ্ছে এই বক্তব্য তার সম্পূর্ণ বিরোধী। জেনারেল জিয়ার নাম তারা কোথাও উল্লেখ করেনি। অথচ একজন মেজর হিসেবে কিছুদিন একটি সেক্টরের অধিনায়কত্ব করে তিনি বাঙালিকে স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরী এখনো বাসসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেননি। রয়টারের বিরুদ্ধে মামলা করার মুরোদ না থাকলে (রয়টারের প্রধানের সঙ্গে আলতাফ চৌ সাক্ষাৎ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ) অন্তত তার খবর পরিবেশন বন্ধ করুন। এভাবে এরা জোট সরকারের ইতিহাসের বিরোধিতা করবে আর আপনারা তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করবেন না তা কি করে হয়?

৩১.৩.২০০২

রিভিউ এভাবে বাংলাদেশকে চিত্রিত করছে কেন?

পাশ্চাত্য বাংলাদেশকে উপাধি দিয়েছে, 'মডারেট মুসলিম স্টেট' আর এতেই খুশিতে আমরা বাকবাকুম করছি। সরকার ও সরকারি দলদ্বয় খুশি, প্রচার মাধ্যমও এ বিশেষণটি বিশেষভাবে ব্যবহার করছে। কিন্তু কেউ ভেবে দেখেনি এর ফলে আমরা পৃথিবীর চোখে কতটা পিছিয়ে গেছি। ধর্মভিত্তিক দেশ হিসেবে পরিচিত হওয়া দোষের নয়; কিন্তু আধুনিকতা নয়। ১৯৭২ সালে আমরা পরিচিত ছিলাম 'সেক্যুলার স্টেট' হিসেবে যা আধুনিক প্রত্যয়। বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের নাগরিকদের কিভাবে দেখা হয় সেসব দেশে যেসব দেশে পালাবার জন্য আমরা অস্থির। সম্প্রতি জনকণ্ঠের একটি প্রতিবেদনে জানা গেল, লন্ডনের মতো মাল্টি কালচারাল সংস্কৃতিতেও বাংলাদেশের পরিচয় 'তালেবান' হিসেবে। এ দেশের নাগরিকদের দেখা হয় সন্দিগ্ধ চোখে। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে পাঠানো চিঠিপত্র, পত্রিকায় প্রকাশিত নানা খবরাখবরে একই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অনেকে বলতে পারেন, ১১ সেপ্টেম্বরের পর সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মুসলমানদের এভাবেই দেখছে। এ যুক্তি অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এ কথাও সত্যি, মুসলমানদের প্রতি এ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছে গত দু'যুগ ধরে বিভিন্ন উগ্রপন্থার কারণে এবং তা বৃদ্ধি পায় তালেবানি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর। কিন্তু, বাংলাদেশকে এখন 'তালেবানি সংস্কৃতি'র পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, যা আগে করা হতো না।

বাংলাদেশে তালেবান অনুসারীরা আছে– এ কথা সরকার ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবে না। তালেবান অনুসারীরা অনেকদিন ধরেই এ দেশে পরিপুষ্ট হচ্ছে। তাদের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে, পত্রপত্রিকায় সেসব ছাপা হয়েছে এবং বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দু'দলই তাদের বিভিন্ন সময় প্রশ্রয় দিয়েছে। আমরা যারা এর বিরোধিতা করেছি, দু'দলের নেতৃবৃন্দই তাদের বিদ্রুপ করেছে ও বিরূপ চোখে দেখেছে। বিএনপি তালেবান সমর্থক জামায়াতে ইসলামী ও তালেবান বলে এ সময় পরিচয় দিয়ে তৃপ্তি পেতেন সেই [illegible] ও তার দলকে নিয়ে সরকার গঠনের পর বাংলাদেশের পরিচয় বিদেশে বদলে গেছে। এখানে সরকারের কেউ হয়তো তথাকথিত 'দেশদ্রোহিতায়' 'বিদেশে ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী' হিসেবে আমাদের অনেককে নাজেহাল করতে পারেন; কিন্তু বিদেশীদের তো বৃদ্ধাঙ্গুলটিও ছুঁতে পারবেন না। এর প্রমাণ ৪ এপ্রিল প্রকাশিতব্য 'ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিয়্যু'। ৪ এপ্রিলের প্রচ্ছদে আছে বাংলাদেশ। প্রচ্ছদ কাহিনীটি বার্টিল লিন্টনারের লেখা। শিরোনাম 'বিওয়্যার অব বাংলাদেশ' বা 'বাংলাদেশ থেকে সাবধান'।

বার্টিল যে নতুন কিছু লিখেছেন তা নয়। আমরা যা বলেছি তার থেকে বেশি কিছু তিনি বলতে পারেননি। এর চেয়ে ঢের বেশি তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ভোরের কাগজে ৯ মার্চ, ২০০২ সালে, 'ছাত্রশিবির, হরকাতুল জেহাদ ও ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী সংগঠন নামে'। বার্টিলের কাহিনীর গুরুত্ব এই যে, বিদেশীরা আমাদের কী চোখে দেখে তার উদাহরণ এতে পাওয়া যাবে এবং পত্রিকাটি বহুল প্রচারিত।

বার্টিল শুরু করেছেন খুব নাটকীয়ভাবে 'এ রিভ্যুলেশন ইজ টেকিং প্লেস ইন বাংলাদেশ' অর্থাৎ বাংলাদেশে একটি বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে যা এই অঞ্চলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। তিনি জানাচ্ছেন, 'ইসলামী মৌলবাদ, উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শক্তিশালী বাহিনী, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা মাদ্রাসা যা সৃষ্টি করছে চরমপন্থী সব ছাত্র, মধ্যশ্রেণীর উদাসীনতা, দারিদ্র্য এবং সন্ত্রাস এ সব কিছুই দেশটিকে বদলে দেবে।'

বার্টিল বলছেন, দৃশ্যটা অনেকটা পাকিস্তানের মতো এবং বাংলাদেশ মধ্যপন্থী ইসলামী দেশ আর থাকছে না। সরকার এই স্রোতধারার সামনে শক্তিহীন অথবা ইচ্ছাহীন, যার প্রমাণ মধ্যপন্থী মুসলমানদের ওপর আক্রমণ ও ক্ষীণ হতে থাকা হিন্দু জনসংখ্যা। এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠনের ফলে এবং পশ্চিমা কূটনীতিকরা তাঁকে জানিয়েছেন, জামায়াতের দুইজনকে প্রভাবশালী দুই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। ক্ষমতায় গিয়ে তারা নিজেদের সুর একটু নমনীয় করেছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারা তার বিরোধী এবং "ইনোসেন্ট ভিকটিমস অব আমেরিকাস ওয়ার"– এ নামে একটি তহবিল সংগ্রহের অভিযান শুরু করেছে।

বার্টিল যা বলছেন তা নতুন কিছু নয়। জামায়াতের প্রধান, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম প্রকাশ্যে তালেবানদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছেন (দেখুন, জনকণ্ঠ) এবং জামায়াত তার তালেবানপ্রীতি কখনো লুকানোর চেষ্টা করেনি। এখন আমেরিকার মারের ভয়ে এবং তাদের পিতৃভূমি পাকিস্তানের করুণদশার কারণে খানিকটা নমনীয় ভাব দেখাচ্ছে।

বার্টিল এ প্রসঙ্গে বায়তুল মোকাররমের খতিব উবায়দুল হকের কথা উল্লেখ করেছেন। হরকত-উল-জেহাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তানের মতো মাদ্রাসাও কিভাবে বাংলাদেশকে শেষ করে দেবে তার বিবরণও দিয়েছেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিভিন্ন রিপোর্টেও তা বলা হয়েছে।

ভোরের কাগজ 'ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিকট ম্যানেজমেন্ট' এর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসবাদের ওপর গবেষণা করে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ), হরকত-উল-জেহাদ এবং ছাত্রশিবির। রিপোর্টে "ঐ ৩টি রাজনৈতিক সংগঠনকে পুরোপুরি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং তা রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে উল্লেখ করা হয়।" (ঐ)

রোহিঙ্গাদের কথাও উল্লেখ করেছেন বার্টিল। তিনি জানাচ্ছেন, কক্সবাজারে স্থানীয়

'মুসলিম গ্রুপ'দের সঙ্গে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার চরমপন্থীদের যোগাযোগ হয়েছে। তাঁর মতে, 'এর ফলে বাংলাদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উগ্রপন্থীদেরও স্বর্গ হয়ে উঠবে' তাঁর মতে, সরকার এর বিরুদ্ধে কিছুই করছে না।

ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশী কূটনীতিকরা কিছু আঁচ করছেন; কিন্তু তাঁরা ব্যাপারটা কত গভীর তা অনুধাবন করছেন না। বিদেশী কূটনীতিকরা, বার্টিল জানেন না, সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছে এই জোটকে। বিষয়টি অনেকের কাছে আশ্চর্য মনে হতে পারে। এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল ভারত। কারণ, তাদের কাছে তেল-গ্যাসের বিষয়টি ছিল প্রধান। তাদের হয়তো ধারণা, বাংলাদেশে যদি কখনো এ রকমটি ঘটে, তাহলে আফগানিস্তানের মতো একে গুঁড়িয়ে দেয়া যাবে। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের ভালোবাসা আছে– এ ধারণা করা মূর্খতার শামিল। বার্টিল বলছেন, এবার যে প্যারিসে দাতারা বিমুখ ছিলেন, এর একটি কারণ হলো এই। তা ছাড়া, পশ্চিমা দূতাবাসসমূহের গোয়েন্দা চ্যানেল দুর্বল, তাদের মূল কাজ সহায়তানির্ভর। ভোরের কাগজের সেই রিপোর্ট অনুযায়ী হরকত এখানে তালেবানি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। "চট্টগ্রাম ও জেলার বিভিন্ন উপজেলার মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইসলাম ধর্মকে রক্ষা ও জেহাদের' নামে যুবকদের রিক্রুট করে সামরিক ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে, পার্বত্যাঞ্চলের রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, বান্দরবানের নাইখ্যংছড়ি এবং কক্সবাজারের উখিয়া ও মহেশখালীতে। সামরিক বেসামরিক ট্রেনিং ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের হেডকোয়ার্টার হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে উত্তর চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া, রাউজান ও হাটহাজারীতে।"

বার্টিলের দীর্ঘ প্রবন্ধ অনুসারে বাংলাদেশের সামরিক শাসকরা প্রথম এ-ধরনের উগ্রবাদীদের প্রশ্রয় দেয়। পরবর্তী শাসকরাও একই ফর্মুলা গ্রহণ করে। বর্তমানে তালেবান সমর্থকরা ক্ষমতায়। সরকার তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। ফলে প্রতিবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হবে এ অঞ্চলে। সুতরাং, পাশ্চাত্যকে পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখতে হবে এবং তাদের সাবধান হতে হবে বাংলাদেশ সম্পর্কে।

এমনিতেই বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় আসার পর এমন অবাধ লুটপাট, সন্ত্রাস, ধর্ষণ শুরু হয়েছে যে বলার নয়। পুলিশ এখন দলের অঙ্গসংগঠন। আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। আদালতের আদেশ পর্যন্ত পুলিশ উপেক্ষা করছে। বিএনপি-জামায়াত বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এমনভাবে বিনষ্ট করছে যা আমাদের জন্য আশঙ্কাজনক; যে কারণে দাতারাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বিদেশীদের কাছে বাংলাদেশকে আরেক পাকিস্তান হিসেবে দেখতে বার্টিলের এই প্রবন্ধ ইন্ধনে ঘৃতাহুতি দেবে। বাংলাদেশের যারা বিদেশ যেতে চান এবং বিদেশে আছেন, তাদের জন্য পাশ্চাত্যের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। অনেককে ফিরেও আসতে হতে পারে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তরাও ভেবে দেখতে পারেন এ শাসন চললে তাদের জন্য সুদিন না দুর্দিন কী অপেক্ষা করছে।

আমরা বারবার লিখেছি, বাংলাদেশের এ-ধরনের ভাবমূর্তি আমাদের জন্য ক্ষতিকর। সরকারকে অনুরোধ করছি, তারা এমন কিছু করুন যাতে এ ভাবমূর্তির বিপরীত ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশটার কথা ভাবুন।

নীতিনির্ধারকদের এটি মনে রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। না হলে, আমাদের সমূহ বিপদ। পাকিস্তানের মতো অচ্ছুৎ রাষ্ট্রে আমরা পরিণত হতে চাই না, যা করার চেষ্টা করছে অনেকে। এদের প্রতিহত করুন।

ফারইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ যে এই প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশ করল, এ কারণে কি বাংলাদেশ সরকার বার্টিল লিন্টনারও রিভিউর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা আনবে? না আনলে বাংলাদেশের যাদের বিরুদ্ধে এ মামলা করা হয়েছে বা হবে তা বিবেচিত হবে প্রতিশোধমূলক জিঘাংসা হিসেবে।

১.৪.২০০২

তালেবানী রাষ্ট্র ও মহিলা প্রধানমন্ত্রী সমাচার

নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটি যৌক্তিক প্রশ্ন রেখেছেন। স্বাভাবিকভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে প্রশ্ন রেখেছেন "বাংলাদেশ নাকি মৌলবাদী তালেবান রাষ্ট্র হয়ে গেছে। যদি তাই হয়, তবে আমার মতো মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলো কিভাবে?" (জনকণ্ঠ, ১৩-৫)। অর্থাৎ তালেবান শাসনে মহিলাদের কোনো স্থান নেই। সুতরাং, কোনো রাষ্ট্র তালেবানি রাষ্ট্র হলে সেখানে কোনো মহিলা প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না। সংবাদপত্রের বিভিন্ন খবর বোধহয় তিনি পড়ার সুযোগ পাননি। সেগুলো পড়লে তিনি দেখতেন, বাংলাদেশকে কখনো তালেবান রাষ্ট্র বলা হয়নি। বলা হয়েছে এখানে তালেবান সমর্থক আছে, তাদের সংখ্যা বাড়ছে এবং তারা সরকারকে সমর্থন করছে এবং ভবিষ্যতের জন্য তা শুভ নয়।

তবে, বাংলাদেশ যেহেতু সব সম্ভবের দেশ, সেহেতু বলা যেতে পারে, রাষ্ট্রটি তালেবান হলেও বেগম জিয়ার প্রধানমন্ত্রী হতে কোনো বাধা থাকবে না। এ সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছতে চাই কিছু তথ্য ও যুক্তি দিয়ে।

মওদুদ আহমদ এখন সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী। মিষ্টভাষী। মিষ্ট মিষ্ট কথা বলে তিনি যেসব আইন তৈরি করছেন সেগুলো বোতল থেরাপীর পথ উন্মুক্ত করছে। ১৯৯১ সালে বেগম জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি এরশাদের ডানহাত। ১৯৯১-৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি প্রচুর বক্তৃতা দিয়েছেন। অবশ্যই বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু আশ্চর্য তখন তিনি বিএনপির চরিত্র যা নির্ধারণ করেছিলেন দেখা যাচ্ছে এখন তা হুবহু বর্তমান। তবে, মওদুদ আর সেগুলো বলেন না। যেমন–

১. "বর্তমানে দেশের অবস্থা দেখলে মনে হয় দেশে কোনো সরকার নেই। বিএনপি সরকার গত ৫ মাসে সন্ত্রাস ছাড়া কিছুই উপহার দিতে পারেনি।" (বাংলার বাণী, ২৬.৮.৯১)-এর চেয়ে-বড় সত্য আর কিছু নেই।

২. "সন্ত্রাসের মাধ্যমে যাহারা ক্ষমতায় আসিয়াছে, সেই সন্ত্রাসের শিকার, হইয়াই তাহাদেরকে ক্ষমতা হইতে বিদায় লইতে হইবে।" (ইত্তেফাক, ১.৯.৯১)। বর্তমানে সিভিল সমাজের ধারণাও তাই।

৩. "এ সরকার একটি মামলাবাজ সরকার।" (সংবাদ, ১৩.২.৯২)-এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।

৪. এবং "আইনের শাসনের প্রতি এত অবজ্ঞা ও অবহেলা পূর্বেকার কোনো সরকারের সময় দেখি নাই।" (ঐ ১৭.১.৯২)। মওদুদকে এ কথা বলার জন্য কেউ মিথ্যাবাদী বলবে না।

৫. "১৯৭২ সালের সরকারের আমল থেকে কোনো সরকারকে বিরোধী দলের সভা সমাবেশ ভাঙতে দেখিনি।" (বাংলার বাণী, ১৯.২.৯২)। মানুষ স্বচক্ষেই তা দেখছে।

৬. "প্রতিটি ক্ষেত্রেই দলীয়করণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও সন্ত্রাস বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।" (ভোরের কাগজ, ৬.৮.৯২)। আমরাও তাই মনে করি।

৭. "বিএনপি সরকার জাতিকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি উপহার দিয়েছে।" (জনকণ্ঠ ২৩.১.৯৪)। এ কথা এখন আর কেউ অস্বীকার করবে না।

৮. "এর আগে কখনো বিচারকদের এ রকম চাপের সম্মুখীন হতে হয়নি।" (আজকের কাগজ, ১৭.৪.৯৪)। আদালতের অবস্থা দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।

৯. "বিগত কোনো সরকারের আমলে এত সন্ত্রাস হয়নি।" (জনকণ্ঠ, ২৯.১২.৯৩)। সত্যিই এ রেকর্ড আর কেউ ভাঙতে পারবে না।

তাঁর ডেমোক্র্যাসি এ্যান্ড চ্যালেঞ্জ অব ডেভেলপমেন্ট বইতে যা বলেছিলেন গবেষকরা সে প্রসঙ্গে একমত– "জিয়া ১৯৭৫ হতে ১৯৮১ এবং এরশাদ ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সালের শেষ পর্যন্ত দেশ শাসন করেছেন। দু'জনেই বেআইনী ও অনৈতিকভাবে সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন।" আরও লিখেছিলেন জিয়া দুর্নীতিমুক্ত নন। এ রকম একজন ব্যক্তির হাতে বাংলাদেশের আইন মন্ত্রণালয়ের ভার ন্যস্ত। কে এম ওবায়দুর রহমান জেলহত্যার আসামী, তবে বর্তমান সরকারের আমলে জামিন পেয়েছেন। বেগম জিয়ার সরকার সম্পর্কে ঐ সময়ে তাঁর মূল্যায়ন আর এখন জনগণের মূল্যায়ন একই রকম। তিনি বলেছিলেন–

১. "দেশ আজ সন্ত্রাসবাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে।" (ইত্তেফাক, ১৪.১২.৯১)। প্রতিদিন সংবাদপত্রগুলোতে সেসব রিপোর্টই ছাপা হচ্ছে।

২. "সরকারের ভ্রান্তনীতি ও'ব্যর্থতার ফলে দেশের সাইফুর রহমান ছাড়া সবাই হাড়ে হাড়ে তা বুঝতে পারছেন।

৩. "রাষ্ট্র পরিচালনায় বিএনপি সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।" (বাংলার বাণী, ১.৯.৯২)। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪. "বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত এ দেশে সুস্থ ও স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হতে পারে না।" (বাংলার বাণী, ১১.১১.৯৩)। আমরাও একমত। তবে খুব সম্ভব সরকার একমত নন।

৫. "হানাদার বাহিনীর দোসররাই আজ রাষ্ট্রীয় শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত।" (বাংলার বাণী, ১২.১২.৯৩)। পৃথিবীর সব সুস্থ মানুষই তাতে একমত।

৬. "পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে আর বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে, তাই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোনো স্থান নেই।" ইতিহাস তাই বলে। জোট সরকার তা মনে করে না। ওবায়দুর রহমান এখন সেই সাম্প্রদায়িক দলের এমপি এবং শোনা যাচ্ছে তিনি মন্ত্রী হবেন।

সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী সে সময় যেসব প্রশ্ন করেছিলেন, সাধারণ মানুষও এখন সেসব প্রশ্ন করছে–

১. "দেশে কোনো সরকার আছে কিনা জাতি আজ জানতে চায়।" (সংগ্রাম, ১২.৪.৯২)।

২. "বেগম জিয়ার আমলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শেষ হয়ে গেছে।" (খবর, ২৪.৬.৯৩)। সালাহউদ্দিনের চেয়ে এ কথা বেশি ভালো আর কে জানে!

৩. "জাতি ও সরকারের মধ্যে বিশ্বাসের ভাঙ্গন ধরিয়াছে। এহেন পরিস্থিতির জন্য রাজনীতিকদের কথা ও কাজের মধ্যে মিলের অভাবই দায়ী।" (ইত্তেফাক, ২.৪.৯৫)। সারা দেশের মানুষ আজ তা হাড়ে হাড়ে বুঝছে।

সালাহউদ্দিন কাদের এখন জোট সরকারের এমপি ও প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা।

'৭১-এর ঘাতক স্কোয়াড, আলবদরের প্রধান ও বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামীও প্রায় প্রতিদিন বিএনপির চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন সে সময়। তিনি ঘোষণা করেছিলেন–

১. "দেশের সন্ত্রাস বিস্তারে বিএনপি চ্যাম্পিয়ন।" (বাংলার, বাণী, ২৭.১০.৯৩)। এ বিষয়ে এখন কেউ আর দ্বিমত পোষণ করে না।

২. "ইসলামী জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না।" (ইত্তেফাক, ২৪.১.৯৪)। অর্থাৎ জামায়াত, ইসলামী ফ্রন্ট এখন আর ইসলামী দল নয় কি।

৩. "বর্তমান ক্ষমতাসীনদের অধীনে কেয়ামত পর্যন্ত নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না।" (জনকণ্ঠ, ২৯.১.৯৪)-এর আলামত গত অক্টোবর থেকেই দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে পৌর নির্বাচনের পর সাধারণের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে।

৪. "সন্ত্রাসীদেরকে যে আগুন জ্বালানোর সুযোগ দিয়েছেন সে আগুনেই তারা আপনাদের ও দেশবাসীকে জ্বালিয়ে মারবে।" (দৈ. জনতা, ২৮.৩.৯২)। এ ব্যাপারে এক ধরনের ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে সাধারণের মাঝে।

৫. "আমরা বর্তমান সন্ত্রাসী সরকারের জানাজা পড়তে চাই" (বাংলার বাণী, ২৪.১০.৯৫) ও "বিএনপির জন্য অপমানজনক পতন অপেক্ষা করছে।" (সংগ্রাম, ২৫.২.৯৬)।

নিজামী ও তাঁর দল ইসলামের প্রচারক। ইসলামে যারা কথার বরখেলাপ করে তাদের সাদা বাংলায় মোনাফেক বলা হয়। এরা সব সময় ঘোষণা দিয়েছেন নারী নেতৃত্ব স্বীকার করে না। এখন তারা অন্য কথা বলে। এরা তালেবানের প্রকাশ্য সমর্থক ও নিজামী এখন জোট সরকারের মন্ত্রী।

জামায়াত নেতা আলী আহসান মুজাহিদ ও দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মাত্র দু'টি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করছি–

১. "খুনী আসামীদের জেল থেকে মুক্তি দিয়ে ভোটকেন্দ্র দখল করে ব্যালট ডাকাতি করা হয়েছে।" (মুজাহিদ ঃ জনকণ্ঠ, ২২.৩.৯৪)। এর প্রমাণ সাম্প্রতিক পৌর নির্বাচনসমূহ।

২. "বিএনপির ষড়যন্ত্রকারীরাই সরকার ও দেশকে ধ্বংস করিবে। (সাঈদী ঃ

ইত্তেফাক, ৯.১০.৯৩)। শুভবুদ্ধির মানুষজন এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে। মুজাহিদ এখন জোট সরকারের মন্ত্রী ও সাঈদী জোটের এমপি ও নীতিনির্ধারক।

তালেবান সমর্থক, ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট নেতা ফজলুল হক আমিনী বলেছিলেন–

১. "আমরা ভারতের অঙ্গরাজ্যে বাস করছি।" (সংগ্রাম ১৭.৯.৯৪)।

২. "সরকার উৎখাত ছাড়া স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা যাবে না।" (মিল্লাত, ২৮.১০.৯৫)। আমিনী ইসলামের প্রচণ্ড প্রচারক। বর্তমানে এমপি হিসেবে গাড়ি আমদানিতে জালিয়াতের আশ্রয় নিয়েছেন।

এ রকম অজস্র উদাহরণ দেয়া যায়। স্পেসের অভাবে দেয়া গেল না। এইসব লোক অতীতে বিএনপির বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছে নিয়ত। ইসলামের কথা বলে লোককে বিভ্রান্ত করেছে। এরাই এখন বিএনপি ও সরকারের নীতি নির্ধারক। তো বোঝেন সরকার বা রাষ্ট্রের অবস্থা কী!

এ পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরটা দেয়া যায়– এইসব লোক এতকিছুর পরও যদি বিএনপির সঙ্গে সরকারে থাকতে পারে, তা হলে বাংলাদেশ তালেবান রাষ্ট্র হলে, মহিলাও প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন।

১৬.৫.০২

ভাবমূর্তি বিনষ্টের আর বাকি কী?

ক্ষমতা পাওয়ার পরদিন থেকে সরকারি স্লোগান হলো– বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে। এই বিনষ্ট করার ভার কে গ্রহণ করেছে? কে আবার, আওয়ামী লীগ ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংগঠন। ভাবমূর্তি বিনষ্টকরণ বিষয়টি এখন আবার গুরুত্ব পাচ্ছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক কিছু সংস্থা বাংলাদেশে সংঘটিত কিছু কর্মকাণ্ডের বিষয় তুলে ধরেছে। সরকারের প্রভু যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল কিছু প্রশ্ন করেছেন সেবক মোর্শেদ খানকে। এসব সমালোচনার মুখে সরকার যেসব উত্তর দিচ্ছে, সেগুলো পরিস্থিতি আরো হাস্যকর করে তুলেছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খানের সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলের এক বৈঠক হয় সম্প্রতি ওয়াশিংটনে। সেখানে 'মৌলবাদের উত্থান'-এর অভিযোগ উঠলে মোর্শেদ খান বলেন, 'বাংলাদেশ উদার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। তালেবান এবং ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদা ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু।' (জনকণ্ঠ, ২২.৫)। তিনি মন্তব্য করেন, 'দেশে গণতন্ত্রের যে চর্চা হচ্ছে তা অন্য অনেকের জন্য উদাহরণ হতে পারে।' (ঐ)

প্রথমোক্ত বক্তব্যের জন্য খান সাহেবকে অভিনন্দন। লক্ষ করুন, 'মডারেট মুসলিম' থেকে আমরা এখন 'লিবারেল মুসলিম'-এ উত্তীর্ণ হয়েছি। বাংলাদেশের জ্ঞানপাপীরা বুঝেও বুঝবে না যে, আধুনিক প্রত্যয় হচ্ছে 'সেক্যুলারিজম'। তবে সরকারিভাবে আল কায়েদাকে শত্রু ঘোষণা করা সাহসের কাজ বটে। এ বক্তব্য মুখ ফসকে বেরিয়েছে, না হাইকমান্ড অর্থাৎ নিজামীর নির্দেশে তা অবশ্য জানা যায়নি।

এ ঘোষণার রেশ মিলাতে না মিলাতে পরদিন বিবিসির সংবাদে জানা গেল, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পছন্দসই (পছন্দসই না হলে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কেন) সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদ'কে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং জানিয়েছে, বাংলাদেশে এদের 'অন্তত কয়েক হাজার সদস্য রয়েছে এবং বিভিন্ন শিবিরে এরা তাদের তৎপরতা চালায় ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে ইসলামী শাসন কায়েম করা। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০০ সালের জুলাইয়ে তারা হাসিনাকে এবং ২০০০ সালের নভেম্বরে এক সাংবাদিককে হত্যার চেষ্টা চালায়।' পররাষ্ট্র সচিবকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, মার্কিন সরকার তাদের কোনো তথ্য দেয়নি। অর্থাৎ তারা জানে না। যেন অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে। বোঝা যাচ্ছে, খান সাহেবের কথা আদৌ বিশ্বাস করেনি প্রভু। বিশ্বাস করলে এবং আশ্বস্ত হলে প্রভু পাওয়েলের দপ্তর থেকে এরকম প্রতিবেদন প্রকাশিত হতো না। পররাষ্ট্র সচিব কী বাংলাদেশের বা বাংলাদেশে থাকেন?

এ প্রশ্ন করতে হলো এ কারণে যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বা সাংবাদিক বা কবি শামসুর রাহমানকে হত্যার প্রচেষ্টা তিনি জানেন কি না। হরকাতুলের যে বেশ কিছু সদস্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাও কি তিনি ভুলে গেছেন? স্ট্রেঞ্জ! মিথ্যাচার অবশ্য বাংলাদেশে মানায়, কারণ এখানে কমবেশি সবাই মিথ্যাচারী। কিন্তু বিদেশে কি তাতে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে, নাকি পরিচিত হয় মিথ্যাবাদীদের দেশ বলে?

আরেকটা বিষয় পরিষ্কার হলো, যুক্তরাষ্ট্র (বা অন্য কোনো দেশ) বাংলাদেশের সচিব বা মন্ত্রী থেকে নিজেদের লোকের কথা বিশ্বাস করে বেশি। মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগ বিশ্বাস করেছে তাদের দুই রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্যের কথা। তারা এক চিঠিতে বেগম জিয়াকে জানিয়েছেন, 'বিবিসির রিপোর্ট থেকে দেখা গেছে, তালেবান নেতা মোল্লা ওমর এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনের সমর্থনে গত কয়েক মাসে ঢাকায় অসংখ্য মিছিল হয়েছে। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের ইমাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশকে শত্রু হিসেবে উল্লেখ করে বিশ্বের সকল মুসলমানকে আমেরিকান স্বার্থে আঘাত হানার আহ্বান জানান। মুসলিম মৌলবাদীদের এই কার্যকলাপে খুবই উদ্বেগের বিষয়।' (জনকণ্ঠ, ২৬.৫)।

প্রধানমন্ত্রী এ চিঠির উত্তর দিয়েছেন কিনা জানি না। কেউ চিঠি লিখলে উত্তর দিতে হয়, সে সংস্কৃতি আমাদের দেশে অনুপস্থিত। উত্তর দিয়ে থাকলে কি চিঠিতে উদ্ধৃত বিবিসির খবর তিনি অস্বীকার করেছেন? করে থাকলে কিসের ভিত্তিতে?

২৪ মে দৈনিক জনকণ্ঠ হরকতের কার্যকলাপ সম্পর্কে এক বিস্তারিত রিপোর্ট ছেপেছে, যা সরকার অস্বীকার করেনি। কীভাবে করবে? এই হরকতের ভয়ে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাননি। সেই খবরে আরো জানানো হয়েছে 'সর্বশেষ রাজশাহীতে আল হিকমা, পার্বতীপুরে জামাআতুল মুজাহিদীন নামের যে দু'টি গোপন জঙ্গি সংগঠনের আস্তানা শনাক্ত হয়েছে, গোপনে গ্রেপ্তার হয়েছে কয়েক ক্যাডার, তারাও ভিন্ন নামে হরকতওয়ালা সংশ্লিষ্ট বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, রাজশাহীতে গ্রেপ্তারকৃত ক্যাডাররা বিএনপি জোট সরকারের বিশেষ এক ধনাঢ্য এমপি, মুসলিম লীগের একাংশের বিশেষ এক নেতার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।'

জামাআতুল মুজাহিদীনের গ্রেপ্তারকৃত ৮ জন সম্পর্কে নতুন খবর দিয়েছে ২৬ মের ভোরের কাগজ। পত্রিকাটি জানাচ্ছে, 'গ্রেপ্তারকালে জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত ওসামা বিন লাদেনের জিহাদের ডাক শীর্ষক লিফলেট পার্বতীপুর, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, সৈয়দপুরসহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি উপজেলার জামাআতুল মুজাহিদীনের শাখা কমিটি গঠনের নথিপত্র, জঙ্গি চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের ভাষণ ও গজলের ক্যাসেট, বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার ও পরে সাংবাদিক ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতিতে গ্রেপ্তারকৃত ৮ সশস্ত্র জঙ্গি নিজেদের লাদেনের অনুসারী বলে ঘোষণা করে।' সরকার এখন নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে এই তদন্ত বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে বলে পত্রিকা জানিয়েছে। তদন্ত বন্ধ হতে পারে, কিন্তু খবরের কাগজের সাক্ষ্য রয়ে গেছে। এদের কাছ থেকে প্রাপ্ত

আলামত নষ্ট করলে সংশিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের পরে নিশ্চয়ই জবাবদিহি করতে হবে। ইতোমধ্যে রুম বল্ডউইন নামে এক মার্কিন সাংবাদিক 'দি নেশন' পত্রিকায় আরো বিস্তারিত এক নিবন্ধ ছেপেছেন 'দি তালেবানাইজেশন অফ বাংলাদেশ'।

এসব তর্ক-বিতর্কের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তার প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট স্থান পেয়েছে, যেখানে অক্টোবর নির্বাচনের পরবর্তী ঘটনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে হিন্দুদের ওপর কী নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এই রিপোর্ট পক্ষপাতমূলক বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। ৩ মে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা শুনে মন্তব্য করেন, 'আমরা খুবই বিরক্ত।' (ভোরের কাগজ, ৩১.৫.০২)।

তালেবান সমর্থকদের বিষয়টি সরকার অস্বীকার করছে অথচ দেশি-বিদেশি পত্রিকায় নিয়মিত এদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। তালেবান সমর্থকদের অপরাধের বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে অর্থাৎ প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং দেশে প্রকাশিত খবরাখবর অস্বীকার করছেন না। অস্বীকার করবে কীভাবে? সব খবর তো সত্য। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, সরকার তা অস্বীকার করে কীভাবে? এই অত্যাচারের কারণেই তো বিরোধীদল সংসদে যেতে পারছে না।

৩১ মে বেগম জিয়া আবার আহ্বান জানিয়েছেন দেশের ভাবমূর্তি যাতে ক্ষুণ্ন না করা হয়। এর সোজা উত্তর হলো– সরকার মিথ্যাচার না করলে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে না। সরকার যদি তালেবানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতো ও বিরোধীদের ওপর জঘন্য অত্যাচার না করতো, তা হলে তো এসব খবর প্রকাশ করতে হতো না। বা তালেবান সমর্থকরা যদি সরকারের অংশ না হতো এবং সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি গ্রহণ না করতো, তাহলে তো এসব বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের অবকাশ ছিল না। এর অন্য অর্থ হচ্ছে, ভাবমূর্তি রক্ষা করতে হলে সরকার থেকে তালেবান সমর্থকদের বাদ দিতে হবে এবং অবিলম্বে সব রকমের রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। সেটি কি বেগম জিয়ার পক্ষে সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তাহলে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন থাকবে। না হলে সরকার এক মিথ্যাচার থেকে আরেক মিথ্যাচারের আশ্রয় নেবে এবং দেশের ভাবমূর্তি বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

সবশেষে, প্রথমে উল্লিখিত মোর্শেদ খানের দ্বিতীয় বক্তব্যের ব্যাপারে একটি কথা না বললেই নয়। তিনি বলছেন, বাংলাদেশে যে গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে, তা অন্য দেশের উদাহরণ হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বাংলাদেশের বর্তমান স্টাইলের গণতন্ত্র যে দেশ চর্চা করবে সে দেশের গণতন্ত্র বলে কিছু থাকবে না বরং গৃহযুদ্ধের সূচনা হবে, দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে, বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে দেশ নিঃস্ব হয়ে যাবে। কারণ খান সাহেবদের গণতন্ত্র হচ্ছে সবার কণ্ঠ নীরব করে নিজের কণ্ঠ সরব করা।

৩.৬.০২

আবারো লিন্টনার এবং আবারো ভাবমূর্তির সমস্যা

বার্টিল লিন্টনার মনে হয় বাংলাদেশের ওপর বেশ ক্ষুব্ধ। লিন্টনারকে মনে নেই আপনাদের? লিন্টনার হলেন তিনি যিনি ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউতে 'বিওয়ার অব বাংলাদেশে' নামে একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন লিখেছিলেন। প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ হইচই পড়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার তো এত ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে, এক বিলিয়ন ডলারের মামলা করার কথা ঘোষণা করেছিল। আমরাও আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম যে, একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। কে সত্য বলছে তার প্রমাণ হয়ে যাক। কিন্তু, কেন জানি বাংলাদেশ সরকার চুপসে গেল। হয়তো এ কারণেই টাইম পত্রিকা সাহস পেয়েছে আরেকটি বিশাল প্রতিবেদন লেখার। সরকার এবার মামলার কথা ঘোষণা না করে পত্রিকাটি শুধু আসতে দেয়নি। যা হোক, লিন্টনারের বিরুদ্ধে তখন মামলা করলে তিনি আর ঝামেলা করার সাহস করতেন না। কিন্তু, তার বিরুদ্ধে হম্বিতম্বি করায় মনে হলো তিনি বেজায় চটেছেন। নতুন আরেকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন খুব সম্ভব এ পরিপ্রেক্ষিতেই।

আগস্ট মাসের ১৯-২২ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইতে, এশিয়া প্যাসিফিক সেন্টার ফর সিকিউরিটি স্টাডিজে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল 'রিলিজিয়ন অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন সাউথ এশিয়া'। সেখানে লিন্টনার একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। নাম 'রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম অ্যান্ড ন্যাশনালিজম ইন বাংলাদেশ।' অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে প্রবন্ধটি ইন্টারনেটে প্রচার করা হয়। প্রবন্ধটি খুব বড় নয়। লিন্টনারের আগের প্রতিবেদন ও টাইমের প্রতিবেদনে যা উল্লিখিত হয়েছিল তার সারাংশ আছে এ প্রবন্ধে। নতুন কিছু তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

লিন্টনার প্রবন্ধের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখ করে লিখেছেন, স্বাধীনতার পর ইসলাম গুরুত্ব পেতে থাকে কেননা দেশের ক্ষমতাধর সামরিক বাহিনী অপছন্দ করতে থাকে আওয়ামী লীগকে। শাসনতন্ত্রের আদর্শ, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি ছিল চক্ষুশূল এবং এর বিরুদ্ধে ধর্মকে টেনে আনা হয়। লিন্টনার গোলাম কবিরের বই থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, ১৯৭৫-এ জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে 'সাফল্যের সঙ্গে বাংলাদেশ যে উদার ইসলামি দেশের ইমেজ ছিল তা ইসলামি দেশে রূপান্তরিত করেন' এবং পরে শাসনতন্ত্র থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' নীতিটি ছেঁটে ফেলেন। আওয়ামী লীগ বিরোধী সবচেয়ে বড় দলটি অর্থাৎ বিএনপি সে কারণেই গড়ে ওঠে। কারণ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আঁতাত। লিন্টনারের ভাষায় 'The marriage of convenience

between the military—which needed popular appeal and an ideological platform to justify its opposition to the Awami League and the country's Islamic forces survived Zia's assasination in 1981.'

এ বিষয়গুলো, লিন্টনার লিখেছেন, এরশাদের সময় প্রবল হয়ে ওঠে। পরে সেই জেনারেল এরশাদ, যিনি রাষ্ট্রপতি থাকার সময় প্রতি বৃহস্পতিবার স্বপ্ন দেখতেন কোন্ মসজিদে নামাজ পড়তে হবে, স্বপ্নাদিষ্ট সন্তানের জনক হয়েছিলেন, যিনি কয়েকদিন আগে বুদ্ধিজীবীদের বলেছিলেন সেনাবাহিনীর সমালোচনা না করতে, অথচ জানা গেল নিহত কালা ফারুকের 'বাবা' ছিলেন সেই লোক বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। লিন্টনার এখানে একটি ভুল তথ্য দিয়েছেন। লিখেছেন, বিরোধী সেক্যুলারদের দমনে তিনি জামায়াতে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। আসলে জামায়াতকে বৈধ এবং পাকিস্তানিদের সঙ্গে মিল-মহব্বতের জন্য সমন্বয়ের রাজনীতি শুরু করেছিলেন জিয়াউর রহমান। অবশ্য লিন্টনার পরে উল্লেখ করেছেন, জিয়ার আমলে জামায়াতি নেতারা পাকিস্তান থেকে ফিরে আসে নতুন মৌলবাদী ধারণা নিয়ে। এরশাদ আমলে রাজনীতিতে ইসলাম একটি ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। বেগম জিয়া ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় আসেন এবং ওই সময় মৌলবাদীরা বাংলাদেশে তাদের ক্ষমতা সংহত করে। কিন্তু ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে এই প্রভাব বা ক্ষমতা সংহতকরণ থমকে যায়। এরপর মৌলবাদীদের সঙ্গে আঁতাত করে বেগম জিয়া কীভাবে ক্ষমতায় এসেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন তিনি। নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু ও বিরোধীদের ওপর কী অত্যাচার হয়েছে, তার বর্ণনাও আছে।

তবে লিন্টনারের মূল বিষয় হচ্ছে, জামায়াতের প্রত্যাবর্তন এবং প্রবন্ধের মূল অংশের উপশিরোনাম 'দি রিটার্ন অফ দি জামায়াত-ই-ইসলামি'। তিনি উল্লেখ করেছেন, জিয়া ও এরশাদের সময় বা সামরিক বাহিনীর প্রশ্রয়ে জামায়াত বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং জাঁকিয়ে বসেছে। কওমি মাদ্রাসার ছত্রছায়ায় তাদের প্রভাব বিকশিত করছে এবং এরা আধুনিক মুসলমান তৈরি না করে 'ফ্যানাটিক' তৈরি করছে। গত ৩০ বছরে এই প্রথম যুদ্ধাপরাধী বলে পরিচিত দু'জনকে মন্ত্রী করা হয়েছে। ফলে জামায়াতের ক্ষমতা বাড়ছে।

জামায়াতের সঙ্গে বিশ্ব সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর সম্পর্ক কী? লিন্টনার এর বেশকিছু উদাহরণ দিয়েছেন। একটি হলো, ইসলামী ছাত্রশিবির। এ সংগঠনটি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অফ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ও ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি অফ মুসলিম ইয়ুথ-এর সদস্য। পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার র‍্যাডিকাল গ্রুপগুলোর সঙ্গে শিবিরের যোগাযোগ আছে। এরপর লিন্টনার নিজামী ও মুজাহিদের যুদ্ধাপরাধের বর্ণনা, গত কয়েক বছরে তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিবরণ দিয়েছেন। লিন্টনার বলছেন, ১১ সেপ্টেম্বরের পর যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ দূতাবাস বলছে, ওই ঘটনা 'an affront to Islam... an attack on humanity'. অন্যদিকে সরকারি ভিকটিমদের

জন্য চাঁদা তুলছে। মার্চ ২০০২ পর্যন্ত তারা ২ লাখ ১০ হাজার ডলারের ফান্ড গঠন করেছে। দল জামায়াত আফগানিস্তানে তালেবান দমনের পরিপেক্ষিতে 'মার্কিন যুদ্ধে নিরাপরাধ বাদে যা টাকা, সেগুলো পাকিস্তানের আফগান রিফিউজি ক্যাম্পে পাঠানো হবে।

এরশাদের আমলে জামায়াতের উত্থান পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে আরো র‍্যাডিকাল গ্রুপ গঠনে, যেগুলো বিকশিত হয়েছে ১৯৯১ সালে বেগম জিয়া ক্ষমতায় আসার পর। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের বরাত দিয়ে তিনি লিখেছেন, সে সময় সউদি আরবে বাংলাদেশী কূটনীতিকরা এসব র‍্যাডিকাল গ্রুপের সদস্যদের পাসপোর্ট দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে। পাকিস্তান থেকেও (হয়তো আফগানিস্তান থেকেও) একই প্রক্রিয়ায় উগ্রপন্থীরা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং এরাই হরকত-উল-জিহাদ আল ইসলামি গঠন করেছে। এদের সঙ্গে আল কায়েদার যোগ আছে। এর নেতা চট্টগ্রামের শওকত ওসমান ওরফে শেখ ফরিদ এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মতে, হরকতের কমপক্ষে ছয়টি ক্যাম্প আছে বাংলাদেশে। হরকতের প্রভাব বেশি কক্সবাজারে, বার্মা সীমান্তে। বিএনপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর কথা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। সবশেষে তিনি উল্লেখ করেছেন গত ১০-১১ মে হরকতসহ নয়টি ইসলামি গ্রুপ উখিয়ায় একত্র হয়ে বাংলাদেশ ইসলামিক মঞ্চ গঠন করেছে। রোহিঙ্গা এবং আসামের মুসলিম লিবারেশন টাইগার্সের প্রতিনিধিও সেখানে আছে। ১৯৮০-এর দিকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আফগানদের হয়ে যেসব বাংলাদেশী যুদ্ধ করেছিল, তারা নাকি দক্ষিণ বাংলাদেশের কোথাও মঞ্চের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

এই হচ্ছে লিন্টনারের প্রতিপাদ্য। গবেষণামূলক তেমন কিছু নেই এবং বাংলাদেশের যারা এ বিবরণ পড়বেন, তারা হতাশই হবেন। কারণ গত এক দশক ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এসব লেখা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ ধরনের বক্তব্য প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে, বালির ঘটনার পর দক্ষিণ এশিয়ায় মৌলবাদীদের নিয়ে সবাই শংকিত। টাইম পত্রিকায় বাংলাদেশের উগ্রবাদীদের উত্থান নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। হয়তো আরো ছাপাবে। ফলে বিদেশে বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীদের যে সমূহ বিপদে পড়তে হবে বা বিড়ম্বনার শিকার হতে হবে, তা বলাই বাহুল্য।

সরকার ওদিক বিবেচনা করেই এসবের প্রতিবাদ করছে। জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি এ্যান পিটার্সকে বঙ্গেশ্বরী খেতাব দিয়েছেন, তিনিও সরকারের পক্ষে এগিয়ে এসেছেন। অবশ্য নির্বাচনের আগে থেকেই তিনি ধর্মীয় উগ্রবাদীদের পক্ষে ছিলেন। অনেক পত্রিকা এ পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে যে, তিনি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সংকটাপন্ন করেছেন। বিএনপিও একই কথা বলছে। শ্রদ্ধেয় গাফ্ফার চৌধুরী সম্প্রতি এ পরিপ্রেক্ষিতে জনকণ্ঠ, ডেইলি স্টার ও প্রথম আলোর তুমুল সমালোচনা করেছেন। আমরা এসব বিতর্কে যাবো না।

শক্তিশালীরাই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সমালোচনা করতে পারে। আমাদের মতো হরিদাস পালরা নয়।

একটি কথা শুধু উল্লেখ করবো। টাইম বা ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ কি বানোয়াট তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তাদের প্রতিবেদন লিখেছে? এটি কি বিশ্বাসযোগ্য? আচ্ছা, যেহেতু আমি বাংলাদেশের নাগরিক সে জন্য আমি বিশ্বাস করলাম এসবই বানোয়াট। কারণ সরকারও তা-ই বলছে। তাহলে কেন সরকার এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না বা আদালতে মানহানির মামলা করছে না?

জোটের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অনেক পত্রিকা লিখেছে, শেখ হাসিনা (বা অন্য কেউও হতে পারে) বিদেশে এসব বলে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন। এখানে দু'টি প্রশ্ন করতে হয়। এক. বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় এসব খবর ছাপা হয়েছে কি-না? হয়েছে। এসব পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ হচ্ছে। দেশে-বিদেশে লোকে তা পড়ছে। আজও ডেইলি স্টার বা জনকণ্ঠে লেখা হয়েছে সেনা হেফাজতে মানুষ মারা যাচ্ছে।

গড়ে প্রতিদিন একজন। ২২ দিনে ২২ জন। বিদেশে কাস্টডিতে হত্যা জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। যে জামায়াতে ইসলাম নিয়ে এত কথা, সেই জামায়াতে ইসলামীর তেমন কেউ ধরা পড়ছে না–এসব কথা পত্রিকায়ই লেখা হয়েছে। লিন্টনার যেসব ইঙ্গিত করেছেন, তার সঙ্গে বর্তমান ঘটনা মিলিয়ে কেউ যদি কোনো উপসংহারে পৌঁছে, তখন কী করা। দ্বিতীয়ত, আমাদের অনেকে এবং রাজনীতিবিদরা বিদেশে যান। ধরা যাক, জনাব মাহফুজ আনাম বা আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো বিবিসি থেকে, দু'জন যুদ্ধাপরাধী কি বর্তমান সরকারের মন্ত্রী? আমরা কি না বলবো? যদি প্রশ্ন করা হয়, তালেবান সমর্থক ঐক্যজোট সরকারের পার্টনার? কী বলবো–না? জামায়াতিরা কি তালেবানদের সমর্থন করে? কি উত্তর হবে–না? ২২ দিনে সেনা হেফাজতে ২২ জন নিহত? উত্তর হবে– না? যদি আমরা সবকিছুর উত্তর না বলি, তাহলে আমাদের ভাবমূর্তি থাকে? আর যদি হ্যাঁ বলি, তাহলে কি বলবেন দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে? এসব বলা কি এক ধরনের ভণ্ডামি না। ব্যাপারটা যেন এরকম, আমার বউ আমি পেটাবো, তুমি বলার কে? কিন্তু, আজ বিশ্বায়নের যুগে কোনো দেশের ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। হলে, আমেরিকা-চীনের মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠতো না। ধরা যাক, হাসিনা যদি প্রশ্নের উত্তরে বলতেন, এগুলো দেশে ঘটছে না তাহলে কি ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতো। আমাদের পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের/মালিকদের কপটতার একটা সীমা থাকা উচিত। এগুলো যদি সত্য না হয় তাহলে সরকার বঙ্গেশ্বরীকে অনুরোধ জানাতে পারেন যে, বাংলাদেশে মুখে বিবৃতি না দিয়ে, টাইম যে মিথ্যা বলেছে তা টাইমকেই জানানো হোক। তিনি কেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানালেন, সেনা হেফাজতে লোক নিহত হচ্ছে? এটা কি আমাদের মিলিটারিদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করছে না? আমাদের 'সার্বভৌমত্বের প্রতীক' মিলিটারিকে যদি এ কারণে জাতিসংঘে না নেয়া হয় তাহলে কি হবে? এতে কি দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে না? আশা করি এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় মতিউর রহমান ও মাহফুজ

আনাম কিছু লিখবেন। যদি না লেখেন তাহলে বুঝতে হবে ভাবমূর্তি ব্যাপারটা গোলমেলে। মনে হয় এ কারণেই সম্প্রতি ভারতীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী আদভানি বলেছেন বাংলাদেশে আইএসআইর ক্যাম্প আছে ও উগ্রবাদীদের সরকার মদদ দিচ্ছে। বাংলাদেশ তার প্রতিবাদ করেছে। ভারত ৯১ জন উগ্রবাদীর তালিকা দিয়েছে বাংলাদেশকে। তাদের ধারণা, এরা বাংলাদেশে লুকিয়ে আছে।

আসলে যে কথাটি আগেই বলেছিলাম, এগুলো না ঘটলে, সত্য না হলে বাংলাদেশের খবরের কাগজ তা লেখে কেন, বিদেশেও বা লেখালেখি হয় কেন? সরকার এসব ঘটনার প্রতিবাদ করছে, তা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না কেন? এসব প্রশ্নের দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। যদি আমরা বাইরের বিশ্বকে বোঝাতে না পারি যে এসব ঘটনা মিথ্যা, তাহলে আমাদের পরিস্থিতি করুণ হয়ে উঠবে? ভারত বা নেপাল যাওয়ার ভিসাও পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ।

৯.১১.০২

আওয়ামী লীগারদের তাহলে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হোক

বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তীব্র ভাষায় আওয়ামী লীগের সমালোচনা করেন এবং নানা বিষয়ে আওয়ামী লীগকে অভিযুক্ত করেন। পত্রপত্রিকা থেকে জানতে পেরেছি, বাজেট আলোচনায় সরকারি সাংসদরা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিষোদগারে বেশির ভাগ সময় কাটান, বাকিটা সংসদনেত্রীর স্তুতিতে। বেগম জিয়া সেদিন বলেছেন–'প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগই আল-কায়েদা, তালেবান। তারা ছাড়া দেশে আর কোনো তালেবান কিংবা আল-কায়েদা নেই। তিনি গত শুক্রবার বগুড়ার গ্রামে আটক করা আগ্নেয়াস্ত্রের বিপুল পরিমাণ গুলি ও বিস্ফোরক আনার জন্য আওয়ামী লীগকেই দায়ী করেন।' (প্র. আলো, ১.৮.২০০২)।

একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী সংসদে অসত্য বলতে পারেন না। যেকোনো বিষয়ে দেখেশুনে, তথ্য প্রমাণ হাতে রেখেই তিনি কথা বলেন। সুতরাং ধরে নিতে পারি, আওয়ামী লীগই যেন আল-কায়েদা সে বিষয়ে তার কাছে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আছে।

সমস্যা হচ্ছে, পত্রপত্রিকাগুলো বলছে অন্য কথা। অস্ত্রের চালান ধরা পড়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগকেই দায়ী করেছেন। তারা এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, নাশকতামূলক কাজকর্ম চালানোর জন্যই আওয়ামী লীগ এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমদানি করেছিল। অস্ত্রের আমদানিকারক হিসেবে আওয়ামী কৃষক লীগের এক কৃষক সদস্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠের খবর অনুযায়ী, 'এসব অস্ত্র আনার পিছনে ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী সংগঠন এটিটিএফের হাত রয়েছে। এদের সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে। হবিগঞ্জের কতিপয় বিএনপি নেতারও। গোয়েন্দা সূত্র ধারণা করছে, নওগাঁ এলাকার কোনো একটি চরমপন্থী দলের কাছে বিক্রির জন্য এই চালানটি আনা হয়েছিল।' (জনকণ্ঠ, ৩০.৭.২০০৩) জনকণ্ঠে বিস্তারিত বিপোর্টে জানানো হয় কিভাবে, কারা কোন রুটে এই চালানটি এনেছিল।

দৈনিক সংবাদ একই তারিখে জানায়, পুলিশ এ ঘটনায় একজন জামাত, শিবির ও জাতীয় পার্টির কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এ সংবাদে জোট সরকারের মাথায় বাজ পড়ে। ইতিমধ্যে এটিএন ও চ্যানেল আইয়ে সংবাদটি প্রচারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জিডি করা হয় জামাত ও পুলিশের পক্ষ থেকে! যুদ্ধাপরাধী জামাতিরা তাদের 'ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছে–এ অভিযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠান দু'টির

ওপর। তারা দু'দিন ধরে প্রকাশ্যে এ সংবাদ দেওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তারপরও পুলিশ তাদের দপ্তরে হানা দিয়েছে। অনেকে বলছেন, যেহেতু ফালুর টিভি উন্মোচিত হচ্ছে সে কারণে চ্যানেল আই ও এটিএনকে চাপে রাখা হচ্ছে, যদিও সরকার সমর্থক বলে তাদের সুখ্যাতি আছে। এতে আরেকটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে, সরকার সমর্থক হলেও লাভ নেই, সরকারের নীতিনির্ধারকদের আত্মীয়স্বজন বা ঘনিষ্ঠ হতে হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ-এর বগুড়ার রিপোর্টার জানান, 'আটক দেলোয়ার হোসেনের সঙ্গে কথা বললে তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, তিনি জামাতকর্মী এবং ২ বার রোকনের পরীক্ষা দিয়েছেন। এ ছাড়া আটক শামীম গত রোববার সাংবাদিক ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের কাছে নিজেকে শিবিরের সমর্থক পরিচয় দিলেও পরে অস্বীকার করেন। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, রোববার রাতে জামাতের জেলা আমীর অধ্যাপক শাহাবুদ্দীন ও স্থানীয় নেতারা গভীর রাত পর্যন্ত ওই দু'জনকে ছাড়াতে থানায় তদবির করেন এবং ঐ দু'জনকে দলীয় পরিচয় দিতে নিষেধ করেন।' (সংবাদ, ১-৭-২০০৩) এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, জামাতিরা সত্য কম বলে, তাদের পূর্ব ইতিহাস খুনের ইতিহাস। তাদের ধারণা বার বার কোনো বিষয় অস্বীকার করলেই বোধ হয় ইতিহাসে তা স্বীকৃত হয়ে যায়। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী 'বিস্ফোরক ৪৮ কেজি উদ্ধারস্থল বিএনপি কর্মীর পায়খানা ও চাতাল।' (ভোরের কাগজ, ২-৭-২০০৩)।

এ বিবরণ পড়ে অনেকে বলবেন, তা হলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে–আমি বলি কি আর আমার সারেঙ্গী বলে কি? বেগম জিয়া সংসদে কি বলেন আর সারা দেশের সংবাদপত্রসমূহ কি বলে! আমরা কি তা হলে বলবো, দেশের প্রধানমন্ত্রী সত্য বলছেন না? আমি অন্তত এটা বলবো না, কারণ তা হলে নিজামীর নির্দেশে সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিএনপির ক্যাডার পুলিশ কর্মকর্তারা আমাকে আবার রিমান্ডে নিয়ে যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলছেন, আওয়ামী লীগ আল-কায়েদা। এর অর্থ দেশের অর্ধেক মানুষ আল-কায়েদার সমর্থক। এর অর্থ যে দেশের তিনি প্রধানমন্ত্রী সে দেশ স্বাধীন করার নেতৃত্ব দিয়েছিল তালেবানরা। তার স্বামী আল-কায়েদার কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি কেন, অলি আহমদ থেকে শুরু করে সব কমান্ডারই ছিলেন আল-কায়েদার গ্রুপ কমান্ডার। এরা কি তা হলে এখন বিএনপি সরকারের 'স্লিপার' হিসেবে কাজ করছেন? এ প্রশ্ন অবধারিতভাবে এসে যায় এবং আমরা জানি এ দেশে শাসকরা কখনো প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যস্ত নয়।

মাত্র এক সপ্তাহ আগে প্রথম আলো শিরোনাম করেছে 'আল-কায়েদার সহযোগী বাংলাদেশে কাজ করছে।' (২৩.৬.২০০৩) না, তারা শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের নেতাদের নাম উল্লেখ করেনি। এর আগের সপ্তাহে টাইম পত্রিকায় অ্যালেক্স পেরি রিপোর্ট করেছেন বাংলাদেশে আল-কায়েদা সম্পর্কে এবং সেখানেও আওয়ামী লীগারদের কথা নেই এবং গত দু'বছর ধরে দেশে-বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে এ বিষয়টিই বার বার বলা হচ্ছে–বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ঘাঁটি আছে। কয়েকদিন আগেও কলিন

পাওয়েলের সফরের সময় পুলিশ ঢাকার মালিবাগ থেকে আন্তর্জাতিক মৌলবাদী সংগঠন হিযবুত তাহরিয়াতের ২ সদস্য আটক করে। (সংবাদ, ২০.৬.২০০৩) এর একটি প্রধান কারণ সরকার যারা গঠন করেছে তাদেরই কেউ কেউ স্লোগান দিয়েছিল–'আমরা হবো তালেবান।' এ সরকারের অংশীদার যুদ্ধাপরাধীরা। এ সরকার যাকে ওআইসিতে মনোনয়ন দিয়েছে সেই সাকাচৌ সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেছেন, তার বাবা ছিলেন পাকিদের সমর্থক, তিনিও। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ অর্থাৎ দেশের অর্ধেক মানুষ তালেবান। একটি দেশের অর্ধেক মানুষ তালেবান। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী কখনো সংসদে অসত্য বলতে পারেন না। বললে, সে দেশের ভাবমূর্তি বলে কিছু থাকে না এবং এখন তা আছে কিনা তা আবিষ্কারের বিষয়। আমরাও এ কথা বলতে পারবো না। বললেও তা যদি সংবাদপত্র ছাপে তবে তার সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

আওয়ামী লীগ যে তালেবান এ ব্যাপারে 'আল্লাহর মাল' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোনো দ্বিধা নেই। শেখ হাসিনার সময় কোটালীপাড়ায় যে মুফতি হান্নানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বোমা রাখার দায়ে ঐ ব্যক্তিও যে আওয়ামী লীগ সমর্থক এটি প্রমাণের উদ্দেশ্যে, (অর্থাৎ আওয়ামী লীগই সব বোমাবাজির জন্য দায়ী) সংসদে তিনি বলেন, 'মুফতি হান্নানের নিজের ওজন হতে পারে বড়জোর ৪৫ কেজি, সে কিনা ওই বোমাটি সবার চোখের আড়ালে পকেটে করে হেলিপ্যাডে নিয়ে গিয়েছিল?' (প্র. আলো, ৩১.৬.২০০৩)। আলতাফ চৌ বিমান বাহিনীতে ছিলেন। দৈর্ঘ্য বড়জোর সাড়ে ৫ ফুট, ওজন না হয় ৮০ কেজি। তিনি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ও ওজনে তার থেকে ১০০ গুণ বড় বিমান চালাতেন কিভাবে? না, কখনো বিমান চালাননি?

এতদিন পাকি যুদ্ধাপরাধী সমর্থক জামাতি ও জামাতসমর্থক বিএনপি বলে এসেছে বাংলাদেশে তালেবান নেই। এখন তাদের দলীয় প্রধান ও দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন দেশে তালেবান আছে। তা হলে, এতদিন কি এরা মিথ্যা বলছিলেন? আমরা তা লিখতে পারবো না বা লিখলেও কোনো সংবাদপত্র ছাপলে তার মালিককে হাজতে যেতে হবে।

আজ পৃথিবীর প্রভু বা 'ফাদারগড' বুশ যেখানে আল-কায়েদা পাচ্ছেন সেখানে হামলা চালাচ্ছেন। সে দেশের লোকদের নাজেহাল করছেন। তাই আমরা দাবি জানাবো প্রধানমন্ত্রী যেন যথাশিগগির আল-কায়েদা তথা তালেবান তথা আওয়ামী লীগ তথা সাড়ে ৭ কোটি লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন জরুরি ভিত্তিতে। অথবা বহু দল বদলকারী মওদুদকে হুকুম দেন এমন একটি আইন করার যার বদৌলতে আওয়ামী লীগ তথা সাড়ে ৭ কোটিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। যদি এদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদের সেনাবাহিনী ও ক্যাডার পুলিশ বাহিনী পর্যাপ্ত না হয় তা হলে প্রভু বুশকে অনুরোধ করা হোক মেরিন পাঠাতে। চাকরদের অনুরোধ মনিবরাও কখনো কখনো রাখে। যাই হোক, আমরা চাই না আল-কায়েদা, তালেবানরা বাংলাদেশে বহাল তবিয়তে বসবাস করুক।

এর কিছুই যদি তিনি না করেন তা হলে বুঝতে হবে কোথাও কোনো ঘাপলা আছে।

অনেকে এ সন্দেহও করতে পারেন যে, প্রধানমন্ত্রী সংসদে যা বলেছেন তার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী এমন আচরণ করবেন যদিও সাক্ষ্য-প্রমাণ তাই বলে। এটা কি ছেলে খেলার দেশ হয়ে গেল? আমরা অবশ্য এ কথা বলতে পারবো না তা'হলে হয়তো আমাদের নিখোঁজ হয়ে যেতে হতে পারে। এ ধরনের কথা বাংলাদেশে বলার একমাত্র সাহস রাখেন সাকা চৌধুরী যিনি তার প্রধানকে 'কুকুর' ও 'তালাকপ্রাপ্ত বিবি' হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন এবং এরপর সস্নেহে তাকে প্রধানমন্ত্রী ওআইসির মহাসচিব হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন।

৩.১.২০০৩

নিজামীর পলায়ন ॥ দিগন্তে সামান্য আশার আলো

খবরটি হয়ত অনেকে পড়েছেন। অনেকের হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে। জোট সরকারের বা জামাত-বিএনপি'র পত্রিকার জোর বেশি, তারা খবরটি ছোট করে ছেপেছে। অন্যদের কাগজের জোর কম স্বাভাবিকভাবেই; কিন্তু খবরটা তারা বড় করে ছেপেছে, দৈনিক সংবাদ তো একেবারে প্রথম পাতায়। খবরটা সবাইকে ছাপতে হয়েছে এত ডামাডোলের ভেতরও। কারণ জামাতি-বিএনপি শাসনে এ ধরনের ঘটনা ঘটা অভাবনীয়। ঘটনাটি কী?

মুক্তিযুদ্ধের সময় মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন আলবদর বাহিনীর প্রধান। এ বাহিনীর কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা। নিজামীর নেতৃত্বে এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল। নিজামী একজন যুদ্ধাপরাধী। তাকে বা তার দলকে রাজনীতির সুযোগ দিয়েছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান, যাকে অকারণে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজামী ও তার দল জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। একথা আমাদের জেনারেশনের অজানা নয়; কিন্তু এখন অনেকে তা বিস্মৃত বা স্মৃতিভ্রষ্টের ভান করেন। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের পক্ষে ধারণা পাওয়া মুশকিল যে, সফেদ শ্মশ্রু সম্বলিত মোলায়েম চেহারার মন্ত্রী নিজামীর হাত রক্তরঞ্জিত, খুনি বা মস্তান বাহিনীর সে ছিল প্রধান। এ কারণেই এই ভূমিকা দিতে হলো। বেগম খালেদা জিয়া তার স্বামীর আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করেছেন আলবদর বাহিনীর সাবেক প্রধান, এ দেশের প্রধান মৌলবাদী দলের আমির নিজামীকে কৃষিমন্ত্রী করে। এটি এক ধরনের প্রতিশোধ বাংলাদেশের জন্মের বিরুদ্ধে। পাকি-রা এ প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, পারেনি; কিন্তু বাঙালি পেরেছে নিজের পিঠে ছুরি মারতে। অবশ্য এ কাজে বাঙালি সবসময় পটু। নিজামীকে কৃষিমন্ত্রী করার আরেকটি কারণ আছে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কৃষকের ভূমিকা ছিল প্রধান। তাই তাদের বা তাদের পূর্বপুরুষের 'পাপের' প্রায়শ্চিত্ত যাতে হয় সে জন্যই নিজামীকে করা হয়েছে কৃষিমন্ত্রী।

নিজামী এখন নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে আমাদের খরচে, বাংলাদেশের পতাকা লাগিয়ে ফুর্তিতে ঘুরে বেড়ায়। সার্টিফিকেটধারী মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং ১৯৭২ থেকে প্রতিটি সরকার বাংলাদেশের মানুষকে অপমান করেছে, এভাবে যে, প্রায় ৬ কোটি ৪৯ লাখ মানুষ তখন দেশে ছিল তারা অমুক্তিযোদ্ধা কাপুরুষ। যে ১ কোটি পলায়ন করেছিল তারা রিফিউজি। আর যে ১ লাখ পালিয়েছিল বা দেশ ত্যাগ করেছিল বা যুদ্ধ করেছিল তারা শুধু মুক্তিযোদ্ধা, সাহসী সন্তান। নিজামীরা পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর এই সাহসী সন্তানরা এখন কী করে? একথা বললাম এ কারণে যে, আমরা তো ১৯৭১ সালে কাপুরুষ ছিলাম, এখনও তাই।

তা এই নিজামী ৪ঠা মে সাভারে আম্রকানন ও ধান্যক্ষেত্র পরিদর্শন করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ (হয়ত মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল) করার মানসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন। ঢোকার পরপরই বাঁধার সম্মুখীন হন। সবশেষে সাবেক আলবদর প্রধান 'ডেইরি গেট' দিয়ে প্রবেশ করেন। এ সময় প্রগতিশীল ছাত্রজোটের প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্রছাত্রী মন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ের যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে কবীর সরণির রাস্তায় শুয়ে পড়ে এবং মন্ত্রীকে ক্যাম্পাস ছাড়তে বলে। এ সময় মন্ত্রীর গাড়ি বহর বেশকিছু সময় আটকে থাকে। মন্ত্রীর সঙ্গে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তারা ছাত্রছাত্রীদের রাস্তা থেকে সরে যেতে বললেও তারা তাদের অবস্থানে অনড় থাকে। পরে মন্ত্রীর গাড়িবহর রাস্তা পরিবর্তন করে দ্রুত ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। এ সময় প্রগতিশীল ছাত্রজোট কর্মীরা মন্ত্রীর গাড়িবহরকে ধাওয়া করে এবং নিজামীকে লক্ষ্য করে 'ধর রাজাকার' শ্লোগান দিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল করে।' (সংবাদ ৫.৫.২০০৩)।

ঘটনাটি অভাবনীয় এ কারণে যে, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পর থেকে জামাত-বিএনপি'র যে তাণ্ডব শুরু হয়েছিল এখনও তা চলছে। এস্টাবলিশমেন্ট ও ইয়ার লতিফের ম্যান্ডেট পাওয়ার পর জামাত-বিএনপি ঝাঁপিয়ে পড়ে আওয়ামী লীগ ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর। এ অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বাংলাদেশকে মানবাধিকার লঙ্ঘনে প্রথম সারির মধ্যে ফেলা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধী ও মৌলবাদীদের নিয়ে সরকার গঠনের পর দেশটি মৌলবাদী দেশ হিসেবে বিদেশে পরিচিতি পেয়েছে, যে কারণে প্রবাসী বাঙালিরা এখন বিপদের সম্মুখীন। সেই জোটে সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীকে ধাওয়া করল কিছু সাহসী যার ফলে সাবেক আলবদর নেতাকে পালাতে হলো! এটি গত দু'বছরে সবচেয়ে অভাবনীয় ঘটনা। প্রগতিশীল ছাত্রজোট সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। এই জোট যে ক্ষুদ্র তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাদের সাহস আকাশ প্রমাণ। উল্লেখ্য, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের দু'টি ছাত্র সংগঠন আছে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ। ছাত্রদল এখন শিবিরের সঙ্গে মিশে গেছে; ফলে তারা নিজামীকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে এটিই ছিল বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা তা করেনি। এ বিষয়টি লক্ষণীয়। আওয়ামী নেত্রী স্বয়ং এখন যুদ্ধাপরাধী ও জামাতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু যুদ্ধাপরাধীকে বাধা দেয়ার জন্য ছাত্রলীগের কেউ সেখানে ছিল পত্রিকার খবরে তা পাওয়া যায়নি। এ বিষয়টিও লক্ষণীয়।

এখানে একটি প্রশ্ন তোলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। ইরাক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সরকার এ দেশে পরিচিত হয়ে উঠেছে মানবতা লংঘনকারী ও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে। এ কারণে, বাংলাদেশের মানুষ বুশ ও তার সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। বেলজিয়ামে সে সরকারের কিছু কর্তাব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের জন্য মামলা করা হচ্ছে। গত এক মাস এ কারণে মানুষের পদভারে দেশের রাজপথগুলো ছিল কম্পিত। কিন্তু এ দেশের মানুষ নিজের দেশের যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে রাজপথে মিছিল করা দূরে থাকুক কোনো বক্তব্যও প্রদান করেননি। সুতরাং এ প্রতিবাদ

কতটা যৌক্তিক? বিষয়টা কেমন দেখুন। এ দেশে সরকার গঠিত যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার লংঘনকারীদের দ্বারা। আর এ দেশের যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশে সব সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতিকর্মীরা। গত দু'বছরও সংস্কৃতিকর্মীরা এসব অনাচারের বিরুদ্ধে কম-বেশি প্রতিবাদ করেছে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল প্রায় নীরব। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে মধ্য, মৃদুবাম ও বামদের একটা প্রভাব ছিল। কিন্তু গত দু'বছরে তা অন্তর্নিহিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন দক্ষিণ ও চরম দক্ষিণপন্থীদের প্রবল প্রতাপ। এ পরিপ্রেক্ষিতেও জাহাঙ্গীরনগরের ঘটনাটি অভাবনীয়।

এ ঘটনার পরদিন সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা মৌন মিছিল ও সমাবেশ করেছে। শুধু তাই নয়, বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও বাম ধারার ১০২ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'জামায়াতে ইসলামীর কোনো নেতা ইতোপূর্বে ক্যাম্পাসে ঢোকার দুঃসাহস দেখায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন মৌলবাদী মনোভাবের কারণে এবার এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটল। বিবৃতিতে মতিউর রহমান নিজামীকে কুখ্যাত খুনি আলবদর বাহিনীর প্রধান বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।' (প্র. আলো. ৬.৫)।

বর্তমানের চরম দক্ষিণপন্থী আবহে জাহাঙ্গীরনগরের যারা প্রাক্তন আলবদর নেতাকে প্রতিরোধ করেছেন তাদের অভিনন্দন। সেখানে আমরা যুদ্ধাপরাধী ও মানবাধিকার লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দূরে থাকুক কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেলেছি সেখানে এ প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ আমাদের সামান্য হলেও সাহস যোগাবে, আশার আলো দেখাবে, প্রগতির পথ উন্মুক্ত করবে। হতাশাবাদীদের মনে এ আশাও জাগাবে, তা হলে দেশে সবকিছু একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।

আশা করি এর ইতিবাচক প্রভাব শুধু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, দেশেও পড়বে। কারণ, পরের দিন, এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটেছে, 'বরিশালের গৌরনদী ও মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় সোমবার ইসলামি জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তওহিদের প্রচারপত্র বিতরণের সময় গোলযোগকালে সংগঠনের সদস্যদের হাতুড়ির আঘাতে ২০ জন আহত হয়। পরে বিক্ষুব্ধ জনতার পিটুনিতে সংগঠনের একজন নিহত ও কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়।' (ঐ)

নিজেদের আত্মসম্মান ও অন্য দেশের যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে ও মানবাধিকার লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর বা গৌরনদীর মতো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আশা করি আমরা বিষয়টি অনুধাবন করব এবং যে আশার আলো মাত্র প্রস্ফুটিত হচ্ছে তা সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত করার জন্য একত্রিত হব।

৭.৫.২০০৩

কার সরকার?

গত ২১ মে তারেক রহমান সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। দেশের মানুষ এবং বিএনপির কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে বুঝে গেছেন যে, তাকে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি বিএনপি কর্মকর্তা, মন্ত্রীরা তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে যান। তার সঙ্গে জিয়ার কবরে ফুল দিতে যাওয়ার সময় বয়োবৃদ্ধ সাইফুর রহমান ও মান্নান ভূঁইয়ারা ঠেলাঠেলি করতে গিয়ে পেরেশান হয়ে যান।

তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে আমাদের অসুবিধা কী? কিছুই না। হলে বরং বলা হতে পারে অনভিজ্ঞ তরুণ নেতৃত্ব দেশ চালাবে। এখনো অবস্থা তা-ই। সুতরাং দেশের অবস্থার হেরফের খুব একটা হবে না। সেটি ভালো কী খারাপ–সময় বিচার করবে। তবে তারেক রহমানের একটি বিষয় ভালো লেগেছে, স্পষ্টভাবে তিনি কথা বলেন এবং অনেক সময় সত্য বলেন।

সেদিনের মতবিনিময় অনুষ্ঠান ক্যাবল টিভিতে দেখানো হয়েছে। যতটা না বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে, তার চাইতে বেশি বেগম জিয়ার পুত্র ও ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হিসেবে তার ওপর স্পটলাইটটি বেশি। বিএনপির আরো যুগ্ম মহাসচিব আছেন, তারা কি সংবাদ হন বা টিভির স্পটলাইট পান? পান না।

মতবিনিময় সভায় টিভিতে দেখেছি, জামায়াত-বিএনপি বা জোট সরকারকে অন্তত দু'বার তিনি 'আমার সরকার' বলেছেন। এটিই হচ্ছে তার সত্য ভাষণ। রাজনীতিবিদরা কথা বলার সময় যেরকম বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছড়ান এবং যা করবেন না তা বলেন, তরুণ তারেক রহমান সে রকম না করে স্পস্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সরকারটি তার। তিনিই নিয়ন্ত্রক। এজন্য তাকে অভিনন্দন। বরং বলবো, পত্রপত্রিকার খবরে বিভ্রান্তি আছে। তারা 'আমার' বদলে কোনো কোনো জায়গায় 'আমাদের' ব্যবহার করেছে।

আসলে হাওয়া ভবন বা তারেক রহমানের ডিকটাট অনুযায়ী যখন সব চলে, তখন বাড়তি প্রশ্নে না গেলেই চলে। সাংবাদিকরা তা দেখে-শুনেও হাওয়া ভবনের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তারেক রহমান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা নাকচ করে বলে দিয়েছেন হাওয়া ভবনের কারো বিষয়ে অভিযোগ থাকলে ফ্যাক্স করে জানাতে। একথা তিনি অবশ্য আগেও বলেছেন। কিন্তু তিনি কি জানেন না, বাংলাদেশে এ ধরনের বুকের পাটা কারো নেই। যেখানে বাস্তবতা হলো, কোনো কিছু না করলেও কোহিনূর মিয়াদের রিমান্ডে যেতে হয়, সেখানে অভিযোগ করে পৈতৃক প্রাণ হারাবার ঝুঁকি নেবে কে? না, সে ঝুঁকি কেউ নেবেন না। তারেক রহমান সোজাসুজি যেভাবে বলেন, সেরকম সরল

মন নিয়ে যদি অভিযোগগুলোর তদন্ত করেন, তাহলে হয়তো ব্যাপারটার সুরাহা হতেও পারে। তিনি হয়তো এ গল্পটি জানেন, তবু বলছি।

নিকিতা ক্রুশ্চেভের সময় সোভিয়েত রাশিয়ায় যখন খানিকটা খোলা হাওয়া বইছে, তখন পার্লামেন্টের এক অধিবেশনে নিকিতা খুব গালমন্দ করছিলেন স্ট্যালিনকে। তখন সদস্যদের একজনের মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়, 'আপনি তখন এ কথাগুলো বলেননি কেন?' নিকিতা থেমে গেলেন। চারদিকে পিনপতন নিস্তব্ধতা। নিকিতা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই প্রশ্ন করলেন?' সব আগের মতোই নিশ্চুপ। তখন নিকিতা বললেন, 'এ কারণেই আমি তখন সমালোচনা করিনি।'

এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তারেক রহমান বলেন, 'কোনো মন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম মনিটর করা হাওয়া ভবনের কাজ নয়। তবে মন্ত্রী-উপমন্ত্রীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় সাংগঠনিক কাজ কী করছেন, তা হাওয়া ভবনের পক্ষ থেকে নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে' (ইনকিলাব, ২২.৫.২০০৩)। এর অর্থ কী? কেউ যদি প্রশ্ন করে, এ কাজ মনিটর করার জন্যও বা হাওয়া ভবন কেন? মান্নান ভূঁইয়া, স্থায়ী কমিটি সব কি হাওয়া হয়ে গেল?

তিনি বলেছেন, 'হাওয়া ভবনের ক্ষমতা থাকলে অনেক কাজ ভালো হতো' (সংবাদ, ২২.৩.২০০৩)। আর কত ক্ষমতা লাগবে? ক্ষমতা আছে দেখেই না তারেক রহমান বলতে পারেন–'আমার সরকার'।

যদি তারেক রহমান সরকার না চালায়, তাহলে, সরকার নিশ্চয়ই বেগম জিয়ার? কী কাজ করছে বেগম জিয়ার সরকার?

বিচার বিভাগ বাস্তবায়নের দাবি ধরা যাক। আদালতের নির্দেশের পরও সরকার তা বাস্তবায়ন করছে না। বরং বাস্তবায়ন করার জন্য কয়েকবার সময় নিয়ে ১৯ মাস পার করে দিলো। প্রতিবার সময় নেয়ার অর্থ রায় বাস্তবায়নে এতটুকু সময় দরকার। কিন্তু রায় যে বাস্তবায়ন করা হবে না, সে বিষয়ে মওদুদ আহমদ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন এমন ব্যক্তি, যিনি বাংলাদেশের সব দল করেছেন, সব দলে উচ্চপদে থেকেছেন। তিনি অভিজ্ঞ দেখে বোধহয় অপরিহার্য। কয়েকদিন আগে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, বিচার বিভাগ পৃথক করতে ৬ থেকে ৭ বছর লাগবে। এর পরও বেগম জিয়া বলেছেন, সরকার রায় বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এখানে স্বাভাবিকভাবে দু'টি প্রশ্ন জাগে। মওদুদ আহমদের মন্তব্যে কি ধরে নেয়া যায়, সরকার জানে রায় বাস্তবায়নের ৬/৭ বছর লাগবে। কিন্তু প্রতিবার আদালত থেকে কয়েক মাস করে সময় নেয়া হচ্ছে। ভাবটা এমন, এসব হয়ে গেল বলে। এটি কি এক ধরনের প্রতারণা বা আদালতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন নয়? সংবাদপত্রে দেখেছি, বিচারকরা ঔপন্যাসিকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার সুয়োমোটো অভিযোগ আনেন, সাংবাদিক/সম্পাদকদের অভিযোগের নামে অপমান করা হয়। কিন্তু এখন আদালত কেন নিশ্চুপ? আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে আমাদের ধারণা কম। তাই প্রশ্ন জাগে, মওদুদ আহমদ যা বলেছেন তা কোন্ পর্যায়ে পড়ে? বা মন্ত্রী হলে সব ধরনের মন্তব্যই করা যায় এবং সেটি উপেক্ষা করা ভালো?

অন্য প্রশ্নটি হলো, প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রী যখন বলেন বিচার বিভাগ পৃথক করতে ৬-৭ বছর লাগবে, তখন তিনি কীভাবে বলেন প্রক্রিয়া চলছে। এই চলমান প্রক্রিয়ার যদি শেষ না হয়, তাহলে আদালত থেকে প্রতিবার সময় নেয়ার প্রহসন কেন?

জামায়াত-বিএনপি এবার ক্ষমতায় আসার পর সবাই জেনে গেছে দেশটিকে পাকিস্তানিকরণের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ ওআইসি মহাসচিব পদে সা. কা. চৌধুরীকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো। প্রথম আলো জানিয়েছে, 'প্রার্থী সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী সরাসরি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারী নতুন চন্দ্র সিংহ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।'

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে জেনেশুনেই এই প্রার্থী বাংলাদেশ দিয়েছে এবং সা. কা. চৌ. হয়তো জিতবেনও। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় এই তথাকথিত ইসলামি রাষ্ট্রগুলো মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। সা. কা. মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এবং পাকিস্তানি মহব্বতে পাগল। পাকিস্তান জানে সা. কা. নিজেদের লোক। হয়তো পাকিস্তানের নির্দেশেই তাকে প্রার্থী করা হয়েছে। তাছাড়া পাকিস্তান যুদ্ধাপরাধীদের আশ্রয়ও দেয়। সুতরাং একজন যুদ্ধাপরাধী নির্বাচিত হবে। জামায়াত মনে-প্রাণে চাইবে সা. কা. নির্বাচিত হোক, তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে সে যুদ্ধাপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্যে যেসব বাঙালি বাস করেন, তাদের কী হবে। যুদ্ধাপরাধী যখন ওআইসির মহাসচিব হবেন, তখন সভ্য সমাজে মাথা উঁচু করে তারা হাঁটতে পারবেন? কারণ সবাই বলবেন, যে দেশে যুদ্ধাপরাধীকে আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রার্থী করে, সে দেশের সবাই যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে কি সা. কা. গৃহীত হবে? কুর্ট ওয়াইল্ডহাইম অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়েও রেহাই পাননি। এটি কয়েক বছর আগের ঘটনামাত্র। নিজের দেশের প্রতি যদি কারো বিন্দুমাত্র ভালোবাসা থাকে তাহলে বলবো, বিভিন্ন সংস্থায় প্রথম আলোর রিপোর্টটি প্রেরণ করুন।

'পররাষ্ট্র সচিব নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সা. কা. চৌধুরীকে বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে দেয়াটাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তিনি বাংলাদেশের প্রার্থী এবং সম্ভাবনা ভালো। তাকে মনোনয়ন দেয়াটাকেও তিনি ভালো বলে মন্তব্য করেন' (প্রথম আলো, ২৩.৫.২০০৩)।

সাংবাদিকরা কেন যে এসব লোককে এসব প্রশ্ন করেন। তারা কি জানেন না, আত্মরক্ষার্থে অনেককে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল, সে কারণে তারা 'মুক্তিযোদ্ধা'। অনেকে দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধে গিয়েছিল, তারাও মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু পার্থক্যটা তো অনুমেয়। ভুলে গেলে চলবে না, বর্তমান পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে গভীর সখ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর খুনিদের। লিবিয়ায় সশরীরে গিয়ে খুনিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। পুরনো ফাইল ঘেঁটে দেখুন।

অন্যদিকে দেশ বিক্রির কাজ মোটামুটি ফাইনাল করে দিয়ে এসে সাইফুর রহমান বলছেন, আলোচনা সফল হয়েছে। 'সাইফুর রহমান বলেন, ভারতের সঙ্গে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে অবাধ বাণিজ্য চালুর প্রস্তাব

দিয়েছেন।' অন্যদিকে পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন, 'ভারত এ প্রস্তাব দিয়েছিল' (ভোরের কাগজ, ২৩.৫.২০০৩)। এটা সেই তারেক রহমান ও বেগম জিয়ার সরকারের পার্থক্যের মতো। কার সরকার বোঝার উপায় নেই। মন্ত্রী যা বলেন, সচিব তার উল্টো বলেন।

দেশের অর্থনীতি বিনাশকারী মন্ত্রী যে ভারতীয় লবির লোক, তা আরো স্পষ্ট হয়েছে। ইতোমধ্যে রাস্তাঘাট থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত ভারতীয় বণিকরা পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশ সীমান্ত অবধিও পৌঁছতে পারেনি। এখন অবাধ [বাণিজ্য] বা কাপড়-চোপড় সব খুলে দিলে কী অবস্থা হবে? ভারত-বাংলাদেশের অর্থনীতি এক অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতিই থাকবে। বাংলাদেশের কোনো সহায়-সম্পদ-বাণিজ্য কিছুই থাকবে না। এ সরকারের মনোভাবটি হচ্ছে এরকম–ভারত তুমি আমাদের দেহ নাও। আর পাকি, পাকিদের তো দিলই দিয়ে দেয়া হয়েছে। দেশ প্রদেশ হোক, কিন্তু নিজামী-খালেদা যেন ক্ষমতায় থাকতে পারেন। বিএনপির মন্ত্রীরা যেন মন্ত্রী থাকেন। বিএনপির ক্যাডাররা যেন ভারত-পাকিদের হয়ে বাঙালিদের সব লুটে নিতে পারে।

গত এক সপ্তাহের মাত্র কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম। তাতে দেখুন সরকারের কী অবস্থা। বেগম জিয়া বলেন তার সরকার। আমজনতা বলে হাওয়া ভবন/তারেক রহমান সরকার। তারেক রহমান বলেন, আমার সরকার। আদালত বিশ্বাস করে, সরকার যে সময় নিচ্ছে সে সময়ের মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথক হবে। আইনমন্ত্রী বলেন, ৬/৭ বছর লাগবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন কাজ হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী যা বলেন, পররাষ্ট্র সচিব তার উল্টো বলেন এবং পৃথিবীতে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যে স্বীকৃত একজন যুদ্ধাপরাধীকে আন্তর্জাতিক সংস্থার সর্বোচ্চ পদে মনোনয়ন দেয়। আশা করি বেগম জিয়া, সাবেক আলবদর প্রধান নিজামী, তারেক রহমান, অর্থনীতি বিনাশকারী সাইফুর রহমান ও খুনিদের সমর্থনকারী সচিব–নিজেরা আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করুন সরকারটা কার?

২৬.৫.২০০৩

বাঙালি ও বাংলাদেশ নিয়ে ইয়ার্কি বন্ধ করুন

'শুককুইজ্যা কডে'? (শুককুর কোথায়?) আজকের অতি বিখ্যাত, অতি ক্ষমতাবান, বিশেষ কিছু ভবন ও বিএনপি-জামায়াতের নীল নয়ন 'যুবক' সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বা সংক্ষেপে সাকাচৌ-র পিতা ফজলুল কাদের চৌধুরী বা ফকা চৌধুরীর রাজনীতির মূলমন্ত্র ছিল এ ধরনের হুঙ্কার। অর্থাৎ পেশী, অর্থাৎ মস্তান। পিতার যোগ্য সন্তান সাকাচৌ। পিতার পথ ধরে ১৯৭১ সালে পাকিদের অনুসরণ করেছিলেন এবং সে পথ থেকে বিচ্যুত হননি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে তার সখ্য ছিল এবং আছে যে কারণে বাংলাদেশের কোনো আইন তার ক্ষেত্রে তাকে লুফে নেয়। যখন তখন যা খুশি তা নির্বিবাদে বলতে পারেন।

অন্যরা যে যা বলুক আমি সাকাচৌ-এর সাহসের প্রশংসা করি। তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান বেগম খালেদা জিয়াকে পথের ধুলোর মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলেন এবং বেগম জিয়া প্রায় নতজানু হয়ে তাকে শুধু দলে ফিরিয়ে আনেননি, মন্ত্রীর মর্যাদায় সংসদের উপদেষ্টা করেছেন এবং নির্দেশ মতো সাকাচৌ সংসদকে অকার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান দু'জন, যাদের নামে পুরো বাংলাদেশ ভয়ে কম্পমান সেই তারেক রহমান (বা জিয়া) ও বেগম জিয়াকেও তিনি কখনো বন্দনা করেননি। অথচ বিএনপির ওজনদার মন্ত্রী ব্য. না. হুদা তো তারেক বন্দনায় আবেগে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন এবং তারপরও বেগম জিয়া সাকাচৌকে ওআইসির মহাসচিব পদে মনোনয়ন দিয়েছেন। মনে হয়, সাকাচৌ এমন কিছু জানেন যেটি প্রকাশ পেলে বর্তমান সরকার বিপর্যস্ত হতে পারে।

সাকাচৌ বাংলাদেশের মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। প্রায় শয়নরত অবস্থায় চোখ বুজে তিনি টিভিতে সাক্ষাৎকার (পরামর্শ) দেন। বাংলাদেশ নিয়ে তার ইয়ার্কির শেষ নেই। এবং এটি স্বাভাবিক। তিনি বা তাঁর পরিবার কখনো বাংলাদেশ চাননি। যুদ্ধাপরাধী তিনি তারপরও এ দেশে থাকছেন যেহেতু আর কোথাও এতো ইয়ার্কি চালে থাকলে এতো ক্ষমতা নিয়ে থাকতে পারবেন না।

সাকাচৌ সম্প্রতি সেই ইয়ার্কির ভঙ্গিতেই বলেছেন, 'অবিবাহিত নারী, হলুদ শাড়ি পরে রাতের আঁধারে রাজপথে হাঁটা, খালিপায়ে একুশে রাতে শহীদ মিনারে গিয়ে আমরি বাংলাভাষায় গান গাওয়া নাকি আমাদের সংস্কৃতি। মহিলারা নাভির নিচে শাড়ি না পরলে সংস্কৃতি বের হয় না। শাড়ি-ব্লাউজ কম না পরলে সংস্কৃতি বের হয় না। সংস্কৃতির মালিকানা কুক্ষিগত করে রেখেছে মুনতাসীর মামুন, কবীর চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির,

শামসুর রাহমান, আসাদুজ্জামান নূর, আলী যাকেরেরা সংস্কৃতির সোল এজেন্ট।' (জনকণ্ঠ, ১.৬.)।

এ রকম বক্তব্য তিনি হরহামেশা দেন আর এখনতো পাক-সৌদি-বাং-স্পন্সরশিপে তিনি ওআইসির প্রার্থী। কিন্তু সামান্য একটি লাইন যে বিভিন্ন মহলে এতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা হয়তো সাকাচৌ ভাবেননি। তিনি বোধহয় আরো অবাক হয়েছেন আওয়ামী লীগের এতো তীব্র প্রতিক্রিয়ায় কারণ, গত আমলে তাকে গ্রেপ্তার করে কী কারণে জানি না ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১১ দলও প্রতিবাদ জানিয়েছে। কাগজে লেখালেখি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা প্রতিবাদ জানানো শুরু করেছে। সাকাচৌ ভেবেছিলেন এবং পাকি-সৌদি ও বাংলাদেশের বাঙালি পাকিদের পরিকল্পনা ছিল, সাকাচৌ নির্বাচিত হলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীরা স্বীকৃতি পেয়ে যেতো। আর আমেরিকাতো যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে। আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিজেকে শক্তিশালী করে সাকাচৌ এক সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতেন। যেমন জাতিসংঘের মহসচিব যুদ্ধাপরাধী কূট ওয়াইল্ডহাইম অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আর যাই হোক বেগম জিয়া আর তার পুত্রতো যুদ্ধাপরাধী নন। সুতরাং সরে তাদের যেতেই হতো। বাংলাদেশ তখন সম্পূর্ণভাবে 'শুককুইজ্যা' ও তাদের লিডারদের চারণভূমিতে পরিণত হতো।

সাকাচৌ যে উক্তি করেছেন তা বিএনপির নারী সমর্থক ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও গেছে। পর্ণো দেখতে দেখতে মনটাও অনেকের পর্ণোগ্রাফিক হয়ে যায়। না হলে এই উক্তি এবং তাও মিথ্যা বলা যেতো না। বাঙালি মেয়েরা নাভির নিচে শাড়ি পরে? হলুদ শাড়ি পরে কেউ শহীদ মিনার যায়? হলুদ তো বসন্তের প্রতীক। বিএনপির নারী সমর্থকরাও তাহলে সাকাচৌ বর্ণিত সেইসব রমণী? এখন আরেকটি প্রশ্ন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ও তার পরিবারের মেয়েরাও তো শাড়ি পরেন, শহীদ মিনার বা জিয়ার কবরে যান তাদের নিয়েও ইয়ার্কি করার ক্ষমতা তাহলে রাখেন সাকাচৌ? আচ্ছা, সাকাচৌ পরিবারের মেয়েরা কি বোরখা পরে চলাফেরা করে? আর ছেলেদের মুখ কি শ্মশ্রু শোভিত ও মস্তক টুপিতে আচ্ছাদিত? সাকাচৌকেতো কখনও তথাকথিত ইসলামি পোশাক পরতে দেখিনি। সাকাচৌর কথায় জামাতিরা উল্লাস প্রকাশ করেছে কারণ তারা অশ্লীল পর্ণোগ্রাফিক কথা পছন্দ করে। সাঈদীর ওয়াজে কি তারা দলে দলে যোগ দেয় না?

বাংলাদেশে বিএনপি-জামাত জাতীয়তাবাদের চরম বিকাশ ঘটেছে এখন যার উদাহরণ যুদ্ধপরাধী সাকাচৌর মনোনয়ন। গত কয়েকদিন বিভিন্ন দল/সংস্থার প্রতিবাদ দেখে মনে হচ্ছে তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখনো এমন অনেক মানুষ আছে যারা বিএনপি-জামাত জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয় এবং তারা প্রতিবাদের সাহস রাখেন। তাদের কাছে আবেদন সাকাচৌ কী তা আবার বিস্মৃতপরায়ণ প্রবীণ ও নবপ্রজন্মের বাঙালিদের কাছে তুলে ধরুন। এটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য। ইতিমধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি তথ্য তুলে ধরছি।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারির দৈনিক বাংলা খুলে দেখা যাক। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের ২০ দিন পর। তখনো বিএনপি হয়নি যেহেতু, সেহেতু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মিথ্যার বেসাতি শুরু হয়নি। সে সময়কার দৈনিক বাংলার খবর :

"সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও তার পিতা ফজলুল কাদের চৌধুরী 'গুড সাহেবের হিলস্থ' বাসায় মরহুম ড. সানাউল্লার এক ছেলেসহ চাটগাঁ-এর কয়েকশ' ছেলেকে ধরে এনে নির্মম অত্যাচার করতেন। ১৭ জুলাই ১৯৭১-এ ছাত্র নেতা ফারুককে ধরে এনে পাকবাহিনীর সহায়তায় সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী হত্যা করেন। ২৬ মার্চ থেকে আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীদের বাসায় পাকবাহিনীর এক প্লাটুন সৈন্য মোতায়েন থাকতো। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ফজলুল কাদের চৌধুরীসহ তাদের পরিবার প্রায় দেড় মণ সোনাসহ পালানোর সময় মুক্তিবাহিনীর কাছে গত ১৮ ডিসেম্বর '৭১ ধরা পড়েন।" জিয়াউর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় মুক্তিযুদ্ধের যে দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও সত্য তথ্য হিসেবে এই সংবাদটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আমাদের সম্পর্কে বিএনপি-জামাতি জাতীয়তাবাদীদের ঘোরতর আপত্তি থাকতে পারে; কিন্তু মাহবুব-উল-আলম সম্পর্কে তো নেই। ১৯৭২ সালে বয়োবৃদ্ধ মাহবুব-উল-আলম সাহিত্য বাদ দিয়ে বিভিন্ন তথ্য ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত রচনা করেন এবং স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যে তা প্রকাশিত হয়। মানুষের মনে তখনো মুক্তিযুদ্ধের, স্মৃতি টাটকা। ১৮ নভেম্বর (১৯৭১) জেল থেকে মুক্তি পাওয়া নিজামুদ্দিন নামে এক মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব-উল-আলমকে বলেন, '৫ জুলাই তিনি ধরা পড়েন এবং ফকা চৌধুরীর কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফজলুল কাদেরের পুত্র সালাউদ্দিন, অনুচর খোকা, খলিল ও ইউসুফ বড় লাঠি, বেত প্রভৃতি হাতে আমাকে পিটাতে থাকে। ৫ ঘণ্টা মারের চোটে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। এ অত্যাচারের বিবরণ জানতে হলে বইটি পড়ুন। সেখানে সাকোচৌ সম্পর্কে আরেকটি সত্য ঘটনার উল্লেখ আছে।

চট্টগ্রামের কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের মালিক ছিলেন অধ্যক্ষ নূতন চন্দ্র সিংহ। ১৩ এপ্রিল ১৯৭১ সালে পাকি হানাদাররা তাদের পোষ্য রাজাকারদের নিয়ে তার বাসায় যায়। নূতন চন্দ্র সিংহ তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করেন। তারপর মাহবুব-উল-আলমের ভাষায়: 'কিন্তু সালাউদ্দিন তাদের ফিরিয়ে আনলেন। তার বাবা বলে দিয়েছেন, এই মালাউনকে আস্ত রাখলে চলবে না। সেদিন বীরত্ব ছিল যাদের হাতে অস্ত্র ছিল তাদের নয়, বীরত্ব ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এই সত্তর বর্ষীয় বৃদ্ধের। তিনি মন্দিরের সম্মুখে বিগ্রহের দৃষ্টির সামনে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হয়ে দাঁড়ালেন। তারা তাকে তিনটি গুলি করে। একটি গুলি একটি চোখের নিচে বিদ্ধ হয়, একটি তার হাতে লাগে আর তৃতীয় গুলিটি তার বক্ষ ভেদ করে যায়, তিনি মায়ের নাম করে মাটিতে পড়ে যান। তার জন্য কেঁদেছে হিন্দু, কেঁদেছে মুসলমান। মুসলমান যখন কেঁদেছে, সালাউদ্দিন প্রবোধ দিয়েছে : মালাউন মলো, তোমরা শোক কচ্ছ কেন? ১৩ এপ্রিল ১৯৭১ শুধু কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ নূতন চন্দ্র সিংহের

হত্যার জন্য স্মরণীয় নয়, অন্য দু'টি হত্যার জন্যও স্মরণীয়। ফজলুল কাদের চৌধুরীর পুত্র সালাউদ্দিনের পরিচালনায় গুণ্ডা বাহিনী সকাল সাড়ে ১০ টায় গহীরার বনেদী বিশ্বাস পরিবারে ঢুকে চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের পুত্র কলেজ ছাত্র ও ছাত্রকর্মী দয়াল হরি বিশ্বাসকে ধরে ফেলে এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।' (বিস্তারিত বিবরণের জন্য মাহবুব-উল-আলমের বইয়ের, পৃ. ২৫৪-৫৫ দেখুন)।

১৯৭২ সালে নূতন চন্দ্রের পুত্র সত্যরঞ্জন সিংহ হত্যামামলা করেছিলেন। মামলার এফআইআর নং ইউ/এস/৩০২/১২০(১৩)/২৯৮ বিপিসি। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি মামলা শুরু হয়। মামলার ১০ জন আসামির মধ্যে ফকাচৌসহ পাঁচ জন ছিল জেলে। সাকাচৌ পাঁচজনসহ পালিয়ে গিয়েছিলেন। চার্জশিটে বলা হয়েছিল, অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

গণতদন্ত কমিশন যখন কাজ করছিল, তখন চাটগাঁর শহীদ সন্তান শেখ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর জানিয়েছিলেন, তার পিতা ও ভাইকে সাকাচৌ ও তার বাহিনী হাটহাজারী ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তিনিও মামলা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে।

চাটগাঁর জাতীয় পার্টির এক সময়ের নেতা হারুন-আর-রশীদও কমিশনকে জানিয়েছিলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, তার পিতা ফজলুল কাদের চৌধুরী ও তার সহযোগীরা চট্টগ্রামে তাদের গুডস হিলস্থ বাসভবনে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষকে ধরে এনে নির্যাতন ও হত্যা করেছে। এমনকি মেয়েদেরও তারা এনে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের মনোতুষ্টির জন্য। তিনি বলেন, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী স্বাধীনতার ঠিক আগে দেশ থেকে পালিয়ে যান। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে মারার জন্য উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল। তবে সালাউদ্দিন চৌধুরীর পায়ে গুলি লেগেছিল।

সাকাচৌ এরপর দেশে ফিরে রাজনৈতিক দল করেছেন। সব রাজনৈতিক দল, সেটি ডান-বাম যা-ই হোক না কেন, তার বন্ধু আছে, শত্রু নেই। এ সম্পর্কিত খবরাখবরও পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সাকা তারপর আরেক স্বৈরাচারী এরশাদের দলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হন। এখন আছেন বেগম জিয়ার দলে।

সাকাচৌর চরিত্র ও কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাবে চাটগাঁর রাজনীতিবিদ আবদুল্লাহ আল-হারুনের করা এক মামলায়। তিনি বিএনপি মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমানের বড় ভাই। নির্বাচন কমিশনে ২৫ এপ্রিল ১৯৯১ সালে এক নির্বাচনী মামলায় তিনি জানান : '১ নং বিবাদী (সাকাচৌ) শক্তি প্রয়োগ, হিংস্রতা ও সন্ত্রাসে বিশ্বাসী। তিনি আইন-কানুনের ধার ধারেন না। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ন্যক্কারজনক নারকীয় ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তিনি বহু হত্যাযজ্ঞে ও লুটতরাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। ... তাহার বিরুদ্ধে ১৯৭২ ইংরেজি সনে দালালি আইনে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানায় ১৩/৪/৭২ইং তারিখে ১৭ নং মামলা দায়ের করা হয়। দানবীর নূতন চন্দ্র সিংহের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের জন্য ১নং বিবাদীর বিরুদ্ধে রাউজান থানায় ৪১(১)৭২ নং এবং ৪৩(১)৭২ নং মামলা দায়ের করা হয়।'

গণতন্ত্র কমিশন ও অন্যান্য দলিলপত্রে এসব বিষয়ে বিস্তর লেখা হয়েছে। নির্বাচনের আগে, খবরের কাগজ অনুসারে সাকাচৌর ক্যাডাররা নোমানের ক্যাডারকে হত্যা করে। তাকে এ কারণে প্রথমবার গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর সাকা মুক্তি পান কিভাবে ঠিক জানি না।

এ ধরনের এক ব্যক্তিকে বেগম জিয়া মনোনীত করেছেন ওআইসি মহাসচিব পদে বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে। জেনারেল জিয়া রাজাকার আলবদর পুনর্বাসনের প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। বেগম জিয়া এবার তাতে পরিপূর্ণতা আনলেন। সে সময়ও জিয়ার প্রকল্পে সহায়তা ছিল পাকি ও সৌদিদের, এখনো তা-ই আছে। পররাষ্ট্র সচিবও তা-ই জানাচ্ছেন। মনে রাখা দরকার, ১৯৭১ সালের হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল পাকিরা সাকাদের সাহায্যে এবং সৌদি সমর্থনে। সুতরাং এ ধরনের একজনকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে তারা চাপ দেবে তা স্বাভাবিক।

আমাদের প্রশ্ন অন্যখানে। আন্তর্জাতিক সংস্থায় কি জেনেশুনে এ ধরনের একজনকে মনোনয়ন দিতে হবে? আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বা মানবাধিকার কর্মীরা কি এ বিষয়ে খোঁজ নেবে না? প্রচার চালাবে না? তাহলে সেই ইমেজই তো শক্তিশালী হবে যে বাংলাদেশ একটি মৌলবাদী দেশ, না হলে ১৯৭১-এ যার প্রধান কাজ ছিল হিন্দু হত্যা করা ও অসংখ্য অপকর্মে যে জড়িত, তাকে মনোনয়ন দেবে কেন? বিদেশে বাঙালিদের কি অবস্থা, তা তো এখন সবার জানা। এ অবস্থার আরো অবনতি হবে। বিএনপিতে কি এখন আর যোগ্য কোনো লোক নেই। অবস্থা কি এতোই খারাপ? নাকি ণ ও দেশের মানুষকে নিয়ে বিএনপি-জামাত ইয়ার্কি করছে? সময় আছে এসব ইয়ার্কি থামান। আমরা মনে করি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের নাগরিক কর্তব্য এ ধরনের ইয়ার্কি রুখে দাঁড়ানো! অনেকে হয়তো ভাবছেন, একজন যুদ্ধাপরাধী ওআইসিতে গেলে আমাদের কি! এর ফলে এটাই প্রমাণ হবে জামাত-বিএনপি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পক্ষে সবাই (যেমন, জার্মানিতে হয়েছিল হিটলারের সময়)। এর পরিণতি কি জানেন, শুধু ব্যবসায়ী পেশাজীবী নয়-যাদের একটি বাড়ি আছে, ছোট একটি ব্যবসা আছে বা মন্ত্রী–সবাইকে, তাদের পরিবারকে কাফফারা দিতে হবে এবং তখন কেউ সহানুভূতি জানাবে না। কারণ যে জাতি যুদ্ধাপরাধীকে সমর্থন করে, সে জাতি যুদ্ধপরাধী জাতি হিসেবে পরিণত হয়। তাকে সহানুভূতি জানানোর কোনো কারণ নেই। কালা ফারুক বা ওই ধরনের কেউ নিহত হলে কি আপনি শোকাহত হন?

৪.৬.২০০৩

আবারো সাকাচৌ

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অর্থ অনেকে অনেক রকম করতে পারেন; কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে এর সঙ্গে বাংলাদেশের সব মানুষ, সংস্কৃতির সম্পর্ক খুব কম। বরং এর নামকরণ করা হয় যদি জামায়াত-বিএনপি জাতীয়তাবাদ, তাহলে এবং ভালো হয়। যদি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হতো বাংলাদেশ, একেবারে খাঁটি বাংলাদেশ, তাহলে আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণা পাকিস্তান। না হলে জামায়াতকে কেন প্রায় একীভূত করা হবে বিএনপির সঙ্গে? জামায়াতিরা ১৯৭১ সাল অস্বীকার করে এবং ১৯৭১ সালে পাকিদের হয়ে যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তার জন্যও তারা অনুতপ্ত নয়। জেনারেল জিয়া এদের সঙ্গেই গাঁটছাড়া বেঁধেছিলেন, বেগম জিয়া সেটিকে শক্তিশালী করেছেন। এ জাতীয়তাবাদে সব মুসলমানের স্থান নেই, যারা বাঙালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী তাদের তো নয়ই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জামায়াতি নেতারা প্রায়ই বলেন, ১৯৪৭-এর চেতনায় ফিরে যেতে হবে। পাকিস্তানি আদর্শে যারা বিশ্বাসী ছিল এবং এখনো আছে, তারা কিন্তু সব বিএনপি-জামায়াতে, ১১ দল বা আওয়ামী লীগে নয়।

জোট সরকার দেশের সব মানুষকে বিএনপি-জামায়াত জাতীয়তাবাদের অধীনে আনতে চায়। গত দু'বছরের ঘটনাবলী তার প্রমাণ। আওয়ামী লীগ করে এমনসব মুসলমান, হিন্দুদের হত্যা, নির্যাতন, ভিটা থেকে বিতাড়ন, জিজিয়া বা চাঁদা আদায় এর উদাহরণ। এই জাতীয়তাবাদের চরিত্র এবার আরো উন্মোচিত হলো সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে ওআইসির সেক্রেটারি জেনারেল পদে মনোনয়ন দানে।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছি। সেই লেখার পর সাকাচৌকে কেন্দ্র করে বেশকিছু ঘটনা ঘটে গেছে। ওআইসির মনোনয়ন পেয়ে সাকাচৌ এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা আমার উপযুক্ত বক্তব্য সমর্থন করে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজনীতির ধারাটাকেও খানিকটা স্পষ্ট করে।

আমাদের সিভিল সমাজ, রাজনীতিবিদদের নিয়ে পূর্বে হতাশা প্রকাশ করেছিলাম। কারণ সাকাচৌকে মনোনয়ন দেয়ার পরও কোথাও কোনো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি। মৃদুভাষণের লেখা ও নির্মূল কমিটির প্রতিবাদ ছাড়া সব ছিল নিশ্চুপ। নির্মূল কমিটির প্রতিবাদটিও জনকণ্ঠ ছাড়া আর কেউ গুরুত্ব দিয়ে ছাপেনি। তারপর প্রকাশিত হলো জনকণ্ঠেই সাকাচৌর উপযুক্ত বক্তব্য। এবার যেন সবাই নড়েচড়ে বসলেন।

এরকম বক্তব্য তিনি হরহামেশা দেন আর এখন তো পাক-সউদি-বাং স্পন্সরশিপে

তিনি ওআইসির প্রার্থী। কিন্তু সামান্য একটি লাইন যে বিভিন্ন মহলে এত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, তা হয়েতো সাকাচৌ ভাবেননি। তিনি বোধহয় আরো অবাক হয়েছেন আওয়ামী লীগের এত তীব্র প্রতিক্রিয়ায়। কারণ গত আমলে তাকে একটি খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে কী কারণে জানি ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। ১১ দলও প্রতিবাদ জানিয়েছে। কাগজে লেখালেখি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা প্রতিবাদ জানানো শুরু করেছে। সাকাচৌ ভেবেছিলেন এবং পাকিদের পরিকল্পনা ছিল, সাকাচৌ নির্বাচিত হলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীরা স্বীকৃতি পেয়ে যেত। একসময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতেন। যেমন জাতিসংঘের মহাসচিব যুদ্ধাপরাধী কুর্ট ওয়াইল্ডহাইম অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আর যা-ই হোক বেগম জিয়া আর তার পুত্র তো যুদ্ধাপরাধী নন। সুতরাং সরে যেতেই হতো।

সাকাচৌকে তার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন করার সাহস আমাদের হবে না। তবে সাংবাদিকরা তো হরহামেশা তার সাক্ষাৎকার নেন। আমাদের হয়ে কি তাকে জিজ্ঞেস করবেন তার এই উক্তি কি প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির মহিলা সমর্থকদের পক্ষে প্রয়োজ্য নয়? বাঙালি মেয়েরা কি নাভির নিচে শাড়ি পরে? হলুদ শাড়ি পরে কেউ শহীদ মিনারে যায়? হলুদ তো বসন্তের প্রতীক। বিএনপির নারী সমর্থকরাও তাহলে সাকাচৌ বর্ণিত সেইসব রমণী? এখন আরেকটি প্রশ্ন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের মেয়েরাও তো শাড়ি পরেন, শহীদ মিনার বা জিয়ার কবরে যান, তাদের নিয়েও ইয়ার্কি করার ক্ষমতা তাহলে রাখেন সাকাচৌ। আচ্ছা, সাকাচৌ, পরিবারের মেয়েরা কি বোরখা পরে চলাফেরা করেন? আর ছেলেদের মুখ কি শ্মশ্রু শোভিত ও মস্তক টুপিতে আচ্ছাদিত? সাকাচৌকে তো কখনো তথাকথিত ইসলামি পোশাক পরতে দেখিনি। সাকাচৌর কথায় জামায়াতিরা উল্লাস প্রকাশ করেছে, কারণ তারা অশ্লীল পর্ণোগ্রাফিক কথা পছন্দ করে। সাঈদীর ওয়াজে কি তারা দলে দলে যোগ দেয় না?

দৈনিক ভোরের কাগজ এ পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন রাজনীতিবিদকে প্রশ্ন করেছিল। কারণ এটা জানা যে, প্রত্যেক দলের কিছু রাজনীতিবিদের সঙ্গে সাকাচৌর গভীর সখ্য বিদ্যমান। এ কারণে কোনো দল বা নামী রাজনীতিবিদরা তার বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। ভোরের কাগজের প্রতিবেদনে এর কিছু ইঙ্গিত পাবেন।

জাতীয় পার্টি (ম) প্রধান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এ পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, 'সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ব্যাপারে আওয়ামী লীগ যে অবস্থান নিয়েছে তা অস্বাভাবিক নয়। তাদের যুক্তি দুর্বল তাও আমি বলবো না। তবে এ ব্যাপারে যেহেতু বিএনপি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে, এখন এ নিয়ে দেশের স্বার্থটাই বিবেচনায় রাখা উচিত। কারণ এবার এ পদটি পাওয়ার ব্যাপারে সত্যি সত্যিই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।' অর্থাৎ প্রকারান্তরে তিনি সাকাচৌকে সমর্থনই করেছেন। যুদ্ধাপরাধী হলেও তাকে মনোনয়ন দিতে হবে–এ যুক্তিটি সাকাচৌর কথাবার্তার মতোই উদ্ভট।

জাসদ (ইনু)-এর সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন, 'ওআইসির মতো আন্তর্জাতিক

সংগঠনের জন্য প্রার্থী দিতে হলে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলেই দেয়া উচিত। কারণ তাকে নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমাদের দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' লক্ষণীয়, তিনি সাকাচৌর বিপক্ষে কিছু বলেননি। তার এই উক্তি বাঁ ঘেষা দলগুলোর প্রতি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো, যদি না সিপিবির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান জোরালোভাবে এর বিপক্ষে বলতেন। তিনি বলেছেন, 'সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী একজন যুদ্ধাপরাধী, খুনি ও সন্ত্রাসীদের গডফাদার। তার মতো ব্যক্তি যদি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, তা হবে জাতির জন্য অপমানজনক। ওআইসির মহাসচিব পদ নয়, বিভিন্ন অপরাধের জন্য তার বিচার হওয়া উচিত।'

তার এই বক্তব্য আওয়ামী লীগের বক্তব্যের মতোই। অন্তত একটি বিষয়ে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন, যা উৎসাহব্যঞ্জক।

অতীতে সাকাচৌ আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ সম্পর্কে নানা কটূক্তি করেছেন। এমনকি সংসদেও। তা সত্ত্বেও বাজারে গুজব ছিল এবং সংবাদপত্রের বিভিন্ন খবরে তার সঙ্গে সাকাচৌর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে ইঙ্গিত করা হতো। কিন্তু এবার তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, 'সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী একজন চিহ্নিত খুনি ও সন্ত্রাসী। তাকে ওআইসির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মহাসচিব করা হবে জাতির জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। বিএনপি তাদের দলের লোক মনোনয়ন দিক, উই ডোন্ট মাইন্ড। কিন্তু বিএনপিতে কি আর কোনো লোক নেই?'

আশা করি, এরপর এ সম্পর্কিত সব ধরনের জল্পনা-কল্পনার অবসান হবে।

তোফায়েল আহমেদ আওয়ামী লীগের বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত করেছেন। কোনো যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে আওয়ামী লীগ এই প্রথম কঠোর অবস্থান নিয়েছে। আওয়ামী লীগের অনেকেই মনে করেন : জামায়াত, যুদ্ধাপরাধী বা ইনকিলাবিদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়া উচিত নয়। ভোটের রাজনীতির কারণে এদের অতি নমনীয় হওয়া উচিত। এ ধরনের ধারণা যে ভুল ও বিভ্রান্তিকর, তা অনেক আওয়ামী লীগারকে বোঝানো যায়নি। তারা অনুধাবন করেন না যে, জামায়াতি বা ইনকিলাবিরা ভুলেও কখনো নৌকার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। কারণ আওয়ামী লীগ তাদের দিল-পসন্দ পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিল। এটি তাদের চোখে বিশাল অপরাধ।

সাকাচৌর ব্যাপারে আওয়ামী লীগের কঠোর অবস্থান এ ধারণার সৃষ্টি করছে যে, জামায়াত বা যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে বর্তমান আওয়ামী লীগ নমনীয় মনোভাব নেবে না বা প্রগতিশীল শিবিরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদারনীতির সমর্থকরা এ কারণে আওয়ামী লীগের প্রতি নমনীয় হবেন। সিভিল সমাজের বিভিন্ন সংগঠনও এখন সাকাচৌর বিরুদ্ধে নেমেছেন। সাকাচৌ হয়তো এ কারণেই প্রতিবাদলিপি পাঠিয়ে জানিয়েছেন, তিনি এ ধরনের উক্তি করেননি। অবশ্য কেউই তা বিশ্বাস করছে না। উল্লেখ্য, সাকাচৌ আজ পর্যন্ত তার কোনো বক্তব্যের (প্রকাশিত) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাননি। এতে বোঝা যায়, এখন তিনি খানিকটা চিন্তিত। কারণ তার ধারণা ছিল, সারা

জীবন বাঙালি-বাংলাদেশে নিয়ে তিনি ইয়ার্কি করে যেতে পারবেন, যা গত তিন দশক ধরে তিনি করছেন।

সাকাচৌকে মনোনয়ন দিয়ে বেগম জিয়া ও নিজামী বাঙালি, বাংলাদেশকে অপমান করেছেন, যে অধিকার তাদের কেউ দেয়নি। অনেক রাজনীতিবিদ ও সিভিল সমাজের বিভিন্ন গ্রুপ এখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রশ্ন তুলবেন, দেশেই যার গ্রহণযোগ্যতা নেই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি কীভাবে গ্রহণযোগ্য হবেন। যিনি নিজের দেশ, দেশের মহিলা, দেশের ঐতিহ্য নিয়ে ব্যঙ্গ করেন–তিনি যে ইসলামি অন্য দেশগুলো সম্পর্কে ধরনের মন্তব্য করবেন না, তার গ্যারান্টি কী? এবং সে ধরনের বক্তব্য যে বাংলাদেশকে একটি ব্রাত্য দেশে পরিণত করবে না, তার নিশ্চয়তা কী?'

৯.৬.২০০৩

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার আরেকটি প্রচেষ্টা?

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টের আরেকটা প্রচেষ্টা কি গ্রহণ করেছে সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকা? কারণ ১৬ জুন সংখ্যায় তারা আলেক্স পেরির একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ছেপেছে বাংলাদেশকে নিয়ে। সেই আলেক্স পেরি যিনি কিছুদিন আগে বিরাট একটি রিপোর্ট করেছিলেন বাংলাদেশের ইসলামি জঙ্গিদের নিয়ে! বাংলাদেশ সরকার তখন ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিল, পেরি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করছেন। ইসলামি জঙ্গিটঙ্গি বাংলাদেশে নেই।

আলেক্স পেরির বর্তমান রিপোর্টের শিরোনাম–'এ ভেরি ডার্টি প্লট'। বাংলাদেশে ইউরেনিয়াম প্রাপ্তি নিয়ে রিপোর্টটি লেখা হয়েছে। বাংলাদেশের কোনো পত্রিকায় পেরির রিপোর্টটি আসেনি। অনেক সংবাদিককে জিজ্ঞাসা করলাম, তারাও জানালেন, রিপোর্টটি তাদের চোখে পড়েনি। তবে আমার যদ্দুর মনে পড়ে, বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এ ধরনের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে জানানো হয়েছিল, কয়েক ব্যক্তির কাছে নিষিদ্ধ ইউরেনিয়াম জাতীয় পদার্থ পাওয়া গেছে। আরো মনে পড়ে, এর একটি ফলোআপ রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে জানানো হয়েছিল, এগুলো তেজস্ক্রিয় কোনো পদার্থ নয়, নিছক পাউডার মাত্র। তবে মনে হয়, এ দু'টি রিপোর্ট অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে।

পেরির রিপোর্টটি এর বিপরীত। তিনি জানাচ্ছেন, বাংলাদেশের জঙ্গিরা হয়তো একটি তেজস্ক্রিয় নোংরা ('ডার্টি') বোমা বানানোর চেষ্টা করছে। পুইয়ার এক গ্রামে মে মাসের ৩০ তারিখ বাংলাদেশের পুলিশ জঙ্গি ইসলামি গ্রুপ 'জামা আ'তুল মুজাহিদীন'-এর চারজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাদের কাছ থেকে ফুটবলের আকারের একটি প্যাকেট উদ্ধার করে, যাতে কাজাখস্তানে তৈরি ইউরেনিয়াম ছিল। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনে ২২৫ গ্রামের প্যাকেটটি পরীক্ষা করে জানানো হয়, তা হলো ইউরেনিয়াম অক্সাইড। প্রচলিত বোমায় তা যুক্ত করা যায়, এবং বোমাটি বিস্ফোরিত হলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটতে পারে।

কমিশনের একজন বিজ্ঞানী 'টাইম'কে জানিয়েছেন, ঐ প্যাকেটের সঙ্গে ২৩ পাতার একটি ম্যানুয়েলও জব্দ করা হয়েছে, যাতে বোমা তৈরির প্রণালী উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত জানা যায়নি, এরা কি বোমা তৈরির জন্য না ব্যবসা করার জন্য ইউরেনিয়াম এনেছিল! কালোবাজারে এর মূল্য ১ লাখ ৭০ হাজার ডলার। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে জানানো হয়েছে, কারা কেন ইউরেনিয়াম স্মাগল করেছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

পেরির মন্তব্য, পুইয়া গ্রামটি পরিচিত আল-কায়েদার সমব্যথীদের জন্য। পুলিশ সম্প্রতি সেখান থেকে ১৭ জন সন্দেহভাজন জঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে, যারা ওসামা বিন লাদেনের পোস্টার বিলি করছিল। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সূত্র মন্তব্য করেছে, 'দ্যাট ব্রিংগস ইন দ্য গ্লোবাল টেরর অ্যাঙ্গেল, অ্যান্ড উই আর টু ক্লোজ টু অল দিজ ফল কমফোর্ট।' পেরির মন্তব্য, 'হি মে অ্যাজ ওয়েল বি স্পিকিং ফর দ্য ওয়ার্ল্ড।'

পেরির রিপোর্টটি সত্য না হলে সরকার নিশ্চয় এর প্রতিবাদ করবে। আর যদি সত্য হয় তা হলে জিজ্ঞাস্য, যে চারজনের কাছে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? তারা এখন কোথায়? কারণ ঘটনাটি সত্য হলে আমাদের জন্য স্বস্তিদায়ক নয়। না কি ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেছে?

২২.৬.২০০৩

ভিক্ষুকের আবার মান-অভিমান!

বাংলাদেশের রাজনীতি এখন ভিক্ষুক এবং দুর্বৃত্তদের দখলে। দুর্বৃত্তদের দখল কথাটা পরিচিত, কিন্তু ভিক্ষুকরাও যে রাজনীতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে এটি বোধহয় অনেকে ভাবেননি। এদেশে হাজারখানেক না হলেও শ'খানেক দল আছে যাদের নেতা ও কর্মী একজনই। গোটা পঞ্চাশেক দল আছে যেখানে এ সংখ্যা বোধহয় খানিকটা বেশি। তারা বিভিন্ন সময় জোট গঠন করে বিরাট বিরাট বিবৃতি দিয়ে নিজেদের 'শক্তি' প্রদর্শন করে। ভোটারদের মধ্যে এক ধরনের ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করে যে, জোটে ভোটার গিজ গিজ করছে। বড় দলগুলোও এ ধরনের ফাঁকি দেওয়ার জন্য জোট সৃষ্টি করে।

যেমন চারদলীয় জোট। আসলে এখানে দল দু'টি–বিএনপি এবং জামাত। বাকি দু'টি নামকাওয়াস্তে। যে কারণে এদের সরকারে কোনো পদ নেই। এর মধ্যে আবার ইসলামী ঐক্যজোট একটি আছে। সেটি আবার চারটি দলের সমন্বয়ে গঠিত। এর নেতা দু'জন, শায়খুল হাদিস ও ফজলুল হক আমিনী। শেষোক্ত জন ধানের শীষ নিয়ে এমপি হয়েছেন।

আপনারা আমার সঙ্গে একমত হন বা না হন, একটি কথা বলতে চাই, 'এদেশে সত্যিকারের ইসলামি আদর্শের কোনো দল নেই। ইসলামের মূল নীতি মানলে রাজনৈতিক দল লাগে না। কিন্তু যখন কেউ বলে সে ইসলামি আদর্শে রাষ্ট্র গঠন করতে চায় তখনই সন্দেহ জাগে। তখন ধরে নিতে হবে যে, সে ইসলাম নিয়ে ব্যবসা করতে চায়। ইসলামের নামে সে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতা দখল করে ফায়দা লুটতে চায়। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক দলগুলো ইসলামের ঠিকাদারি ব্যবসা করতে চায় এবং এটি যেকোনো দেশে যেকোনো ধর্মভিত্তিক দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি–

জামাতের এক সময়ের প্রধান গোলাম আযম বিএনপি শাসনামলকে বলেছিলেন, 'আইয়ামে জাহেলিয়াতের বর্বরতাকেও হার মানাইয়াছে' (ইত্তেফাক, ২২.৯.০৩)। আর জামাতের বর্তমান আমির মতিউর রহমান নিজামী বলেছিলেন, 'ইসলামী জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না', (ইত্তেফাক, ২৪.১.৯৪)। জামাত এবং বিএনপির অধীনে শুধু সরকার গঠন নয় নিজামী মন্ত্রীও হয়েছে। কোনো ইমানদার মুসলমান বা ইসলাম আদর্শে বিশ্বাসী লোক এ কাজ করতে পারে না। ভুললে চলবে না ১৯৭১ সালে ইসলামের নামে তারা খুন ও ধর্ষণ করেছে।

সরকারের আরেক পার্টনার আমিনী। তার বিখ্যাত স্লোগান-'আমরা হবো তালেবান বাংলা হবে আফগান।' বেগম জিয়ার সরকার যে বিদেশে তালেবান সমর্থক হিসেবে

পরিচিত তার কারণ এই। গত নির্বাচনের সময় আমিনীর 'নেতৃত্বাধীন' চারটি দল, নাজিউরের ভগ্নাংশ দল এতিমের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিএনপি-জামাতও এদের ছাড়া কোনো মিত্র পাচ্ছিল না। ফলে এদের সবার মধ্যে মিলন ঘটে। বেগম জিয়া দেখলেন, তিনি সাত দলের জোট গঠন করেছেন (ইসলামী ঐক্যজোট চারটি দল নিয়ে গঠিত, আমি নিশ্চিত এই চারটি দলের নাম কেউ বলতে পারবে না)। আর এসব দল নানা অপকর্ম করে বেড়ায় (অবশ্য সব দলই তা করে) তাদেরও সরকারের প্রটেকশন ও প্যাট্রোনাইজেশন (পি-২) দরকার। ভিক্ষুকের মতো এরা। ভিক্ষুকদেরও পি-২ দরকার। তাছাড়া ভিক্ষুকের চাল তার আবার কাড়া আকাড়া!

আমিনীর মূল ব্যবসাও ইসলামের ঠিকাদারি। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী স্থানীয় সাংসদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বড়কাটরা মাদ্রাসা দখল করে প্রিন্সিপাল বনে গেছেন। ইসলামের এই ঠিকাদার তথা ক্ষমতার ভিক্ষুক বেগম জিয়ার সরকার সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বিসমিল্লাহ বলে যে জাতি তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল আউযুবিল্লাহ বলে আবার তাদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত করবে, (দৈনিক সংগ্রাম, ১০.৯.৯৪)। তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমরা ভারতের অঙ্গরাজ্যে বাস করছি' (ঐ, ১৭.৯.৯৪)। শুধু তাই নয় আমিনী আরো বলেছিল, 'ইসলামবিরোধী এই সরকার পতনে বছরে চার মাস লাগাতার হরতাল করতে হবে। সরকারের রক্তে ইসলামবিরোধী ক্যান্সার বাসা বেঁধেছে। সরকারের আর কোনো সংশোধনের পথ খোলা না থাকায় সরকারকে সমূলে উৎখাত করা ছাড়া ইসলাম ও এদেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা যাবে না।' (দৈনিক মিল্লাত, ৮.১০.৯৫)।

সুতরাং এটা পরিষ্কার এরা ঈমানদার নয়, মুসলমান হতে পারে। ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে চারটি দলই ক্ষমতায় এসেছে এবং এখনো বলছে তারা ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগকে তারা ইসলামবিরোধী দল বলে প্রচার করছে। টুপিপরা, দাড়ি রাখা ও কপালে কালো দাগ যদি মানুষ মনে করে মুসলমানের ট্রেডমার্ক, তাহলে তার সংখ্যা বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে বেশি। দুই নেত্রীর লেবাস, চলন দেখুন। এখানে আরো উল্লেখ্য, নিজামী-আমিনীরা বলেছিল তারা নারী নেতৃত্বে বিশ্বাস করে না, সেটা নাজায়েজ। তাহলে ইসলামের নামে মানুষ তাদের ভোট দিয়েছে কেন? এর সোজা উত্তর ভণ্ডরাই ভণ্ডদের নেতা মানে, বিশ্বাস করে। বেগম জিয়াকে অভিনন্দন জানাই এ কারণে যে, এত বড় দুই ইসলামের ঠিকাদারকে পায়ের নিচে রেখে দিয়েছেন। টু-শব্দটিও কেউ করছে না। যে পুরুষ নিজের থুথু নিজেই চেটে খায় তাকে আর কী বলা!

এসব ঠিকাদারের একজন আমিনী কয়েকদিন আগে মহাহুলস্থুল বাধিয়ে দিলেন। শোনা গেল আমিনী পদত্যাগ করেছেন। আমিনীর ভাষায়, ম্যাডাম বলেছেন-তাই পদত্যাগ করেছি। বলাবলি শুরু হলো চার দল ভাঙছে। বিরোধী দলের অনেকের মধ্যে উল্লাসের সৃষ্টি হলো-চার দল ভাঙছে!

বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তখনই বলছিলেন, এগুলো সাজানো নাটক। এদের কারো মুরোদ নেই জোট থেকে চলে যাওয়ার। বিএনপি এদের পিষে ফেলবে। তাছাড়া এরা নানা

অপকর্মে লিপ্ত। বাসার চাকর-বুয়ারাও তো মান-অভিমান করে। মাঝে মাঝে কড়া কথা বলে। তারপর বেগম সাহেব দু'টি মিষ্টি কথা বলে দু'টি টাকা ধরিয়ে দিলে সব শেষ। আজকাল ভিক্ষুককেও আটআনা এমনকি এক টাকা দিলেও রাগ করে। ভিক্ষার অঙ্ক মনমতো হলে ৫ মিনিট তার মক্কেলের জন্য সে আল্লাহর কাছে দোয়া করে।

পরের দিন দেখা গেল বিচক্ষণ ব্যক্তিদের কথাই ঠিক। আমিনীর অভিযোগ ছিল, তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়। পাত্তা দেওয়া হয় না। সেটা স্বাভাবিক। আমিনীর জোর কতটুকু? জামাতি মন্ত্রী করা হয়েছে, তাদের করা হয়নি। কেন হবে, বিএনপির একটি বড় অংশ জামাতের আদর্শে বিশ্বাসী। তাই জামাতকে তারা মন্ত্রিত্ব দিয়েছে। তবে আমিনীর অভিমানের কারণে চারদল গঠন প্রক্রিয়া, লেনদেন সম্পর্কে একটি সুষ্ঠ ধারণা পাওয়া গেছে।

২ জুলাই চারদলের সভায়, আমিনী তার অভিযোগ পেশ করলে এক পর্যায়ে বেগম জিয়া ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন, 'নির্বাচনের আগেই আপনাকে বলেছিলাম, মন্ত্রী হবেন না আপনার আসনে বিএনপির একজন ত্যাগী নেতা উকিল আবদুস সাত্তারকে চারদলের স্বার্থে আমরা মনোনয়ন না দিয়ে আপনাকেই দিয়েছি। ওই সময় সাত্তার সাহেবকে বলেছিলাম এমপি না করলেও তাকে ক্ষমতায় গেলে মন্ত্রী করবো। তাকে মন্ত্রী করাও হয়েছে। তাই এ নিয়ে তো আপনার কোনো ক্ষোভ থাকার কথা নয়।'

কিন্তু আমিনী প্রধানমন্ত্রীর কথার জবাবে বলেন, 'আমি মন্ত্রিত্ব চাই না। আপনি বললে এমপিশিপও ছেড়ে দেবো। দু'বছর হয়ে গেছে। জামাতে ইসলামীর দু'জনকে মন্ত্রী করেছেন ম্যাডাম। অথচ আমার দল থেকে কাউকে এখনো মন্ত্রী করা হয়নি। একসঙ্গে চারদল আন্দোলন করেছে, এখন সরকার গঠন করে কেবল জামাত সুবিধা নেবে, এটা হয় না। দলের কর্মীদের কাছে আমি কিছু বলতে পারি না।'

এ সময় প্রধানমন্ত্রী রাগান্বিত সুরে বলেন, 'এমপি থাকতে ভালো না লাগলে আপনি পদত্যাগ করুন।'

আমিনীও বলেন, 'ম্যাডাম, আপনি বললে আমি পদত্যাগপত্র আজই পাঠিয়ে দেবো। মন্ত্রী হবো না। তবে আমি চারদলে আছি, কাজ করে যাবো।' (প্র. আলো. ৩.৭.২০০৩)।

আমিনীর বক্তব্যে আরেকটি বিষয় ফাঁস হয়ে গেছে। তার ভাষায়, 'বিএনপি মনে করছে আমরা তাদের দয়ায় রাজনীতি করছি। এমন ভাবনার পরিণাম ভালো হবে না। আমরা যদি শেষ পর্যন্ত বিএনপি-জামাতের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম না হতাম, তাহলে আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায় ঘণ্টা বাজতো না। দেশের মানুষ বিএনপি ও জামাতকে বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে জামাত তো একটি গাদ্দার রাজনৈতিক দল। যদিও আমরা তাদের সঙ্গে জোট করেছি। তবে সেটা আদর্শিক কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণে (ভোরের কাগজ, ৩.৭.২০০৩)। শুধু তাই নয়, চারদল কোনো আদর্শিক জোট নয় এটি করা হয়েছিল আওয়ামী লীগকে পরাজিত করার জন্য।

এটা নিশ্চিত, আমিনী মন্ত্রীত্ব চায়। যদিও আজ, ৫ জুলাইও তিনি ঘোষণা করেছেন,

মন্ত্রীত্ব চান না। তবে তার মজলিসে সূরা অনুরোধ জানাবে আমিনীকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণে এবং আমিনী তা গ্রহণ করবেন। অবশ্য, সব নির্ভর করবে ম্যাডাম যদি তাকে কোনো মন্ত্রীত্ব দেন। দিতেও পারেন নুইসেন্স ভ্যালুর জন্য।

আমাদের বক্তব্য, আমিনীরা এসব নাটক করবেই। এতে বিরোধী দলের উৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ অন্তিমে ইসলামের ঠিকাদাররা বিএনপিকেই ভোট দেবে, আওয়ামী লীগকে নয়। যে কারণে বেগম জিয়া ও তার প্রথম সরকারকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করেও তারা বিএনপির সঙ্গেই জোট গঠন করেছে। আলাদা কোনো জোট করেনি ইসলামি হুকুমত কায়েমের জন্য। এমনকি মন্ত্রীত্ব না দিলেও আমিনীরা জোটে থাকবে। ভিক্ষুকের আবার মান-অপমান! চাকরের আবার মান-অভিমান!

সবশেষে বলবো, শহরের ভদ্রলোকদের উদ্দেশে বিশেষ করে, আমিনী-নিজামীরা দেশ-সমাজ-অর্থনীতির শত্রু। দেশে তারা আধিপত্য বিস্তার করলে আপনারা-আমরা কেউ ই থাকবো না। এমনকি 'নিরপেক্ষ'রাও। মান-ইজ্জত, জান শুধু নয় সহায় সম্পত্তিও যাবে। এর একটা উদাহরণ, এত মান-অভিমান করে পরদিন সব ভুলে আমিনী মস্তান নিয়ে বড় কাটরার মূল্যবান জমিসহ মাদ্রাসা দখল করে নেয়। সরকার নাকি দখলদার হটাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু আমিনীর দখল নিয়ে এখনো সরকারের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

৬.৭.২০০৩

আমিনী-নিজামীদের ইসলাম ও আমাদের ইসলাম

এই যে আমরা এত লেখালেখি করি, পাঠকরা কি তা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন? সরকারি নেতা ও কর্মকর্তারা যে এগুলো ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না, তা তো বলাই বাহুল্য। কয়েকজন লিখিয়ে এ ধরনের আলোচনা করছিলেন এক আড্ডায়। একজন তো হতাশ হয়েই বললেন, পাঠকদের কোনো সাড়া পাই না, তাই লেখালেখি বন্ধ করে দেবো ভাবছি।

লিখিয়েরা যা আলোচনা করছিলেন, আসলে বোধহয় তা ঠিক নয়। পাঠকরা যদি এসব লেখা না-ই পড়বেন, তাহলে পত্রিকাগুলো প্রতিদিন এত রাশিরাশি লেখা ছাপতো না। হ্যাঁ, কারো লেখা হয়তো পাঠকরা গোগ্রাসে লুফে নেন, যেমন জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর, কারো লেখা পড়ে দর্শন চিন্তা জাগে বা ক্রোধের সঞ্চার হয়, যেমন জনাব ওয়াহিদুল হকের। এসব লেখার ওপর ভিত্তি করে একজন পাঠক নিজের মতামত গড়ে তোলেন। পাঠকরা প্রতিক্রিয়া জানান না এ কারণে যে, লেখার অভ্যাস অধিকাংশের নেই বা হয়তো লিখবো লিখবো করে লেখা হয় না বা লেখা পাঠালেও অনেক সময় সম্পাদক তা ছাপেন না। কিন্তু অনেকে লেখেন এবং অনেক পাঠকের লেখা স্বয়ং লেখককেও ভাবায়।

এ ধরনের এক পাঠকের প্রতিক্রিয়া আমার নজরে পড়েছে ১০ জুলাইর দৈনিক ভোরের কাগজে। পরিবাগ থেকে জনাব আবদুস সালাম ভোরের কাগজে আমার একটি লেখার ওপর তার দীর্ঘ অভিমত জানিয়েছেন। আমার লেখাটি ৬ তারিখের ভোরের কাগজে ছাপা হয়েছিল– 'ভিক্ষুকের আবার মান-অভিমান' শিরোনামে।

অনেকে বলতে পারেন, আমার এ লেখা ভোরের কাগজে দেয়া-ই উচিত; কিন্তু আমার মনে হয়েছে, যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন জনাব সালাম তার গুরুত্ব আছে বর্তমান সময়ে। সুতরাং তা যে কোনো কাগজেই আলোচনা করা যেতে পারে।

আমার পূর্বতন লেখার বিষয় ছিল জনাব ফজলুল হক আমিনী। তার অনুগামীরা তাকে মুফতি নামে সম্বোধন করেন। নেতাকে কর্মীরা যে কোনো উপাধিতেই সম্বোধন করতে পারেন; কিন্তু সাংবাদিকরা কেন করেন জানি না। কারণ পত্রিকায়ই দেখেছি, বেগম জিয়াকে শর্ত দেয়ার পর বড় কাটরার মাদ্রাসাটি স্থানীয় সংসদ সদস্যের সাহায্যে তিনি দখল করে নিয়ে নিজেই প্রিন্সিপাল বনে গেছেন। কোনো মুফতি কখনো এ ধরনের কাজ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

আমি ওই লেখায় আমিনী, নিজামীদের পূর্বেকার অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করেছিলাম,

যেখানে তারা পূর্ববর্তী বিএনপি শাসনকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তারা নারী নেতৃত্বকেও নাজায়েজ বলেছিলেন। অথচ ওরা এখন নারী প্রধানমন্ত্রীর আঁচলের নিচে তো আছেনই এবং তিনি যে হুকুম দিচ্ছেন, তা-ই তামিল করছেন। যেমন, আমিনী সংসদ সদস্যপদে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে বলেছিলেন, ম্যাডাম বলেছেন তা-ই তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। জোটের চারটি দলই নিজেদের সবসময় বড় মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। অন্য কথায় ধর্মব্যবসা করে। তাই মন্তব্য করেছিলাম– এটা পরিষ্কার যে এরা ঈমানদার নয়, মুসলমান হতে পারে। ইসলামের নাম ভাঙিয়ে চারটি দলই ক্ষমতায় এসেছে এবং এখনো-বিরোধী দল বলে প্রচার করছে। টুপি পরা, দাড়ি রাখা ও কপালে কালো দাগকে যদি মানুষ মনে করে মুসলমানদের ট্রেডমার্ক, তাহলে তার সংখ্যা বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে বেশি। দু'নেত্রীর বা দু'দলের নেতাদের লেবাস, চলন দেখুন।

ইসলাম বলে ঈমানদার কথা দিলে কথা রাখে, বরখেলাপ করে না। কিন্তু এরা বারবার কথা বরখেলাপ করে। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, ইসলামের নাম বলে তারা যখন ভোট চায়, তখন মানুষ তাদের ভোট দেয় কেন? মানুষের মন জটিল, তা বিশ্লেষণের ক্ষমতা আমার নেই। সোজা একটা উত্তর দিতে পারি যা মূর্খের বচন বলে মনে হতে পারে, তাহলো– ভণ্ডরাই ভণ্ডদের নেতা মানে, বিশ্বাস করে। বেগম জিয়াকে আমরা প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাতে পারি এ কারণে যে, জোটের দুই 'ইসলামি দলে'র 'দুই ঠিকাদার'কে পায়ের নিচে রেখে দিয়েছেন। টুঁ' শব্দটিও কেউ করছে না।

এ প্রসঙ্গে জোটের আরেক অংশীদার (ঐক্যজোট দু'ভাবে বিভক্ত) 'শায়খুল হাদিস' (কেন এই উপাধি তা আমার জানা নেই) মহিলা ট্রাফিক পুলিশ নামানো হয়েছে দেখে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন তাদের প্রত্যাহার করতে। কারণ এরা 'বেপর্দা' আওরত। বেপর্দা আওরতের সামনে মোমিন মুসলমান তো যান না। কিন্তু কয়েকদিন আগেই দেখলাম মখমলের আলখাল্লা পরে শায়খুল হাদিস প্রধানমন্ত্রী সন্দর্শনে গেছেন এবং আলখাল্লা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও নিজের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করেননি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে জনাব সালাম সরল ভাষায় যে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন, তা আমাদের অনেকেই পারতাম না। তিনি লিখেছেন 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। গণতান্ত্রিক চেতনায় মতপার্থক্য বা মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক এবং এজন্য একে গণতন্ত্র বলা হয়। কিন্তু ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা তা ধর্মীয় গ্রন্থের অনুশাসনে আবদ্ধ। এখানে কি ভিন্নমত থাকার সুযোগ আছে? ইসলামের অনুসারী সব রাজনৈতিক দল কোরআন ও সুন্না অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলছেন। তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনে বা সংগ্রামে একাধিক দল বা একাধিক মতের কথা বলা হয় কেন? তাহলে কি পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার একাধিক ধারার কথা উল্লেখ করা আছে? বিষয়টি অবশ্যই ইসলামি চিন্তাবিদদের বিশ্লেষণের দাবি রাখে।'

সত্যিই তো, এ সোজা কথাটা আমরা হাজার হাজার জ্ঞানী-গুণী লোক মনে রাখি না কেন?

জনাব আমিনী কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছেন, 'দেশের মানুষ বিএনপি ও জামায়াতকে বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে, জামায়াত তো একটি গাদ্দার রাজনৈতিক দল, যদিও আমরা তাদের সঙ্গে জোট করেছি। তবে সেটা আদর্শিক কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণে' (ভোরের কাগজ, ৩.৭.০৩)। অর্থাৎ একটি ইসলামি দল আরেকটি ইসলামি দলকে 'গাদ্দার' বলছে এবং আদর্শ তাদের কাছে প্রাথমিক কোনো বিষয় না। আদর্শ ছাড়া ইসলাম থাকে কী করে?

সেজন্য আপনারা আমার সঙ্গে একমত হন বা না হন, একটি কথা বলতে চাই, এদেশে সত্যিকারের ইসলামি আদর্শের কোনো দল নেই। যারা ইসলামি দল করেন, তারা ইসলামের মূল নীতি মেনে চললে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন পড়ে না। তাই যখন কেউ বলেন যে, ইসলামি আদর্শে রাষ্ট্র গঠন করতে চান, তখনই সন্দেহ জাগে এবং তখন ধরে নিতে হবে যে, তিনি ইসলাম নিয়ে ব্যবসা করতে চান। ইসলামের নাম ভাঙিয়ে, অন্ধ-অশিক্ষিত জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতা দখল করে নিজের স্বার্থ হাসিল করতে চান। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক দলগুলো ইসলামের ঠিকাদারি ব্যবসা করতে চান। এটি যে কোনো দেশে যে কোনো ধর্মভিত্তিক দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

গত দু'দশকে তথাকথিত ইসলামি দলগুলোর নেতারা যা বলেছেন, তার যদি সংকলন করা যায় তাহলে দেখা যাবে, তাদের কোনো কথার সঙ্গে কোনো কথার মিল নেই এবং যা বলেছেন তার উল্টোটা করেছেন। একটি উদাহরণ দিই। জামায়াতের বর্তমান আমির নিজামী বলেছিলেন 'ইসলামি জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না' (ইত্তেফাক, ২৪.১.১৯৯৪)। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, নিজামীরা তো এখন শুধু বিএনপিকে সমর্থন-ই নয়, তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকারও গঠন করেছে। জনাব সালাম প্রশ্ন রেখেছেন এ পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে– 'ইসলাম ধর্মে মিথ্যা কথা বলা জায়েজ কি-না?'

ইসলাম কেন, কোনো ধর্মেই মিথ্যা বলা জায়েজ নয়। আমি ধর্মতত্ত্ববিদ নই যে, এর ওপর ওয়াজ করতে পারবো। কিন্তু আগ্রহী পাঠক বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের কোরান-সূত্র গ্রন্থটিতে 'মিথ্যাবাদী ও সীমা লঙ্ঘনকারী'দের বিষয়ে আল্লাহ্ কী ফরমিয়েছেন তা দেখতে পারেন। আমি সেখান থেকে দু-একটি উদাহরণ দিতে পারি :

১. সূরা শোয়ারাতে আছে– 'তোমাকে কি জানাবো কার কাছে শয়তান অবতীর্ণ হয়? ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর কাছে। ওরা কান পেতে থাকে, আর অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।'

২. সূরা মুলক– 'এদের আগে যারা এসেছিল, তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাই ওদের ওপর আমার শাস্তি কী কঠিন হয়েছিল!'

৩. সূরা আল-ই-ইমরান– 'তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তারপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন; আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টকর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী।'

জনাব সালাম আরো লিখেছেন 'ইসলাম ধর্মের কোথায় এই ম্যাডামের শাসন

ব্যবস্থার উল্লেখ আছে', তা বিস্তারিত জানাতে। না, এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। নারী-পুরুষকে আমরা অনেকেই সমানভাবে বিচার করি। কিন্তু আমিনী-নিজামীরা সবসময় নারী নেতৃত্ব নাজায়েজ বলে ঘোষণা করেছেন।

জনাব সালাম পরিশেষে বলেছেন : 'ইসলাম ধর্মে যদি মিথ্যা কথা বলা হারাম হয়ে থাকে এবং ধর্মীয় ভাষায় মিথ্যাবাদীকে যদি মোনাফেক বলা হয়, তাহলে বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলোর ঠিকাদারি নেতাদের বাস্তব অবস্থান কোথায়?'

আসলে এ বিষয়ে ভালো লিখতে পারবেন জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, যিনি এক সময় মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু যার মনে ধর্ম নিয়ে ছটাকমাত্র সংস্কার নেই। আর পারবেন মওলানা আবদুল আউয়াল, যিনি জামায়াতের আসল চেহারা নামে চমৎকার একটি বই লিখেছেন।

কোরআনে আল্লাহপাক মোনাফেকদের সম্পর্কে এত বলেছেন যে, নতুন কিছু বলার নেই। আমি শুধু সূরা নিসা থেকে একটি লাইন তুলে দেবো : 'মোনাফেকদের শুভ সংবাদ দাও যে তাদের জন্য রয়েছে নিদারুণ শাস্তি।'

এ প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদের সাম্প্রতিক এক বক্তৃতার কথা উল্লেখ করতে হয়, বাংলাদেশের মুসলমানরা নিশ্চয়ই মানবেন যে, মালয়েশিয়ায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বাঙালিরা তাদের থেকে বড় মুসলমান নয়। কিন্তু সে দেশটি কোথায় আর আমরা কোথায়। এর কারণ সেখানকার নেতারা ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেননি। কেউ দিলেও মানুষ মেনে নেয়নি এবং মনে রাখা উচিত, মালয়েশিয়ায় মুসলমান ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাস করেন। তিনি বলেছেন, 'মুসলমানদের সহজেই নির্যাতন ও যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ ভ্রান্ত ধর্মীয় শিক্ষা, যা তাদের পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। সারা বিশ্বে মুসলমানরা আল্লাহর কাছে ইরাকি মুসলমান এবং তাদের রক্ষা করতে মোনাজাত করে কিন্তু তাদের প্রার্থনার জবাব আসেনি। এর কারণ এই নয়– আল্লাহ মুসলমানদের পরিত্যাগ করেছেন; বরং এর কারণ তারা তাদের প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র, সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত বাহিনী তৈরিতে জ্ঞান এবং যোগ্যতায় উন্নত বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারেনি।' মাহাথির বলেছেন, 'ফিলিস্তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা শহীদ হিসেবে বহু মুসলমানের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু যারা বিজ্ঞান, গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় অধ্যয়ন করেন, তাদের কাছে তাদের কোনো মূল্য নেই।' তিনি আরো বলেছেন, 'মুসলমানরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা অনুসরণ না করে বর্তমানে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মুসলমানদের দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করেছে' (ভোরের কাগজ, ১০.৭.০৩)।

সাধারণ মুসলমান ইসলামের সরল জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী, যা কল্যাণকর। ভ্রান্তি সৃষ্টি করে আমিনীরা। যিনি ইসলামের মূলনীতি জানেন, তার জন্য নিজামী-আমিনীদের দরকার হয় না। আল্লাহ-রসূলই যথেষ্ট। ইসলাম মানে বুঝি মাদ্রাসা আর মসজিদ সৃষ্টি। আসলে আমাদের মনে যথেষ্ট গণ্ডগোল আছে, জেনেটিক গোলমাল আছে; না হলে

নিজামী-আমিনীদের নেতৃত্ব কেন একশ্রেণীর মানুষ মেনে নেয় বা তারা বহাল তবিয়তে রাজনীতি করতে পারেন? এদেশে এখন জন্মানো এত অগৌরবের, এত লজ্জার হতো না– যদি না আমরা এবং নিজামী-আমিনীরা আল্লাহর সেই বাণীটি মনে রাখতাম 'আর তোমাদের এই যে জাতি এ তো একই জাতি। তাই তোমরা আমাকে ভয় কর। কিন্তু (তারা) নিজেদের কাজকর্মে বহুদলে বিভক্ত। প্রত্যেক দল নিজেকে নিয়েই খুশি। তাই ওদের কিছুকালের জন্য বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও' (সূরা মুমিনূন)।

১৪.৭.২০০৩

পাকিরা পাকি-ই, বাংলাদেশের পাকিরাও তা-ই

অন্য কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা দেখাটা বেশ একটু বিপজ্জনক। শরীর এবং মনের ওপর চাপ পড়ে। কিন্তু দলটি বাংলাদেশের এবং বাঙালি হিসেবে বাংলাদেশের জয় দেখতে চাই, তাই মাঝে মাঝে টিভি খুলে বসি এবং রক্তচাপ না থাকলেও মনে হয় রক্তচাপের সৃষ্টি হচ্ছে। জানি, বাংলাদেশের জিতবে না তবু শেষ মুহূর্তেও বাংলাদেশের জয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ অবশ্য সেই প্রার্থনা কবুল করেন না।

অনেক সময় এ বিষয়ে ভাবলে অন্য একটি কথা মনে হয়, তাহলো- এদেশের প্রায় অর্ধেক লোকই তো প্রকারান্তরে পাকিভক্ত। তাদের প্রার্থনা কি বাংলাদেশের পক্ষে থাকে? আল্লাহ তাহলে করবেন কী? জানি, বিষয়টি বিতর্কের কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে আমার মন্তব্যটি উড়িয়ে দেয়াও যাবে না। জামায়াত-বিএনপিদের কি পাকিদের জন্য মনের গহীন গভীরে খানিকটা ভালোবাসা নেই? গত ২৫ বছর তাদের সমস্ত কার্যকলাপ কি বাংলাদেশের বিপক্ষে নয়? বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়া কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীদের স্বাধীনতার ৫ বছরের মধ্যে পুনর্বাসন থেকে সাকাচৌকে ইসলামি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন বাংলাদেশের কোন্ আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতের বিরুদ্ধে এ দু'টি দল যে পরিমাণ বিষোদগার করেছে, গণহত্যাকারী পাকিদের বিরুদ্ধে কি কখনো নিন্দামূলক কোনো মন্তব্য এ দু'দলের কোনো নেতার মুখে শুনেছেন? সবচেয়ে বড় কথা, এরা ইতিহাস তো স্মরণ করতে চান-ই না বরং বিকৃত করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বদলে মেজর জিয়া হয়ে যান স্বাধীনতার ঘোষক, যা চরম আওয়ামী-বিদ্বেষী বদরুদ্দীন উমর পর্যন্ত ইতিহাসের সত্যের খাতিরে মানতে রাজি নন। তা দেশের অর্ধেক লোক যদি জোটের আদর্শ সমর্থন করে, তাহলে তাদের কী বলবো? শুধু তা-ই নয়, পাকিদের আদর্শের ধারক হোক, হতেই পারে; কিন্তু তাই বলে পাকিদের অপমানও মেনে নেয় নির্দ্বিধায় চাকর-বাকরের মতো। এটি তো আরো জঘন্য।

বাংলাদেশ-পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে সে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হলো। আমাদের দেশে আমরা এত বড় মুসলমান যে, শুক্রবার খোলা থাকলে মুসলমানত্ব নষ্ট হয়ে যায়। বাঙালি-পাকিদের আদর্শ পাকিস্তানে শুক্রবার খোলা ও নাছারাদের বন্ধের দিন রোববার বন্ধ। শুক্রবার ও জুমার কারণে খেলার জন্য স্পেশাল কোনো বিরতি নেই। প্রথম দু'টি খেলায় দেখা গেল স্টেডিয়াম ফাঁকা। আমাদের এখানে পাকিস্তানের বেলা হলে স্টেডিয়ামে জায়গা পাওয়া যায় না। করাচি, পেশোয়ার মুলতানে দেখা গেল সব দর্শক পাকিস্তানের সমর্থক। কারো হাতে বাংলাদেশের কোনো পতাকা

নেই। আমাদের এখানে শ'খানেক পাকিস্তানি পতাকা দেখা যাবে। তরুণ-তরুণীরা গালে পাকিস্তানি পতাকা এঁকে নেয়। সেখানকার হোটেলে কেউ বাঙালি খেলোয়াড়দের দর্শনের জন্য ভিড় করেছে বলে কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এখানে শেরাটনে প্রৌঢ় মাতা ও তরুণী কন্যাদের ভিড় করার সংবাদ খবরের কাগজেই দেখেছি। বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যানের চমৎকার ব্যাটিং, ফিল্ডিং কখনোই করতালিতে প্রশংসিত হয়নি। পাকিস্তানের প্রতিটি চারের মার-ই দর্শকদের উল্লসিত করেছে। পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা ভ্রমণ করে আরামদায়ক শ্রেণীতে, বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের সে আসন দিতে তারা ভুলে যায়। এর কারণ, বাংলাদেশ বা বাঙালিদের তারা দেশ বা মানুষ মনে করে না এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে অভ্যস্ত। বিশেষ করে, ১৯৭১ সালে পরাজয়ের কথা তারা ভোলে না। তাই ভোরের কাগজের খবর অনুযায়ী, পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছুক সাংবাদিক ও খেলোয়াড়দের ভিসা ফরমে যাদের জন্ম ১৯৭১-এর আগে তাদের 'পাকিস্তানি বাই বার্থ' লিখতে বাধ্য করা হয়েছে।

আমরা ১৯৭১-এর বিজয়ের কথা মনে রাখি না। ভাবি প্রাক-'৭১-এর চাকর-বাকরের মতোই আছি। আমাদের দলের পক্ষ থেকে বিমান ভ্রমণে পক্ষপাতিত্বের জন্য প্রতিবাদ করা হয় না। দলের ম্যানেজার উর্দুতে সাক্ষাৎকার দেন নস্টালজিক হয়ে। আচরণটা করি সবসময় পরাজিতদের মতো। ফলে খেলোয়াড়রা শুরুতেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়।

পাকিরা বিবেকের মুখোশ পরে প্রতারণা করে। রশীদ লতিফ তার প্রমাণ। সত্য তারা কখনো স্বীকার করে না, তাদের কর্মকাণ্ডের জন্যও কখনো তারা অনুতপ্ত নয়। মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী ঘটনাবলী এর প্রমাণ। ১৯৭১-এর গণহত্যার জন্য কখনো তারা অনুতাপ দেখায়নি। অনেকে বলবেন, তাহলে মুলতান বা ফয়সালাবাদে এত দর্শক এল কেন? না, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা দেখতে আসেনি। রশীদ লতিফ সাসপেন্ড হওয়ার জন্য তারা ক্ষুব্ধ, পাকিস্তান যেন বাংলাদেশকে দলিত-মথিত করে, তার প্রার্থনা নিয়েই তারা স্টেডিয়ামে এসেছিল। যে কারণে ইনজামাম বলেছেন, পাঁচটি ওয়ানডের জয়ই রশীদ লতিফকে উৎসর্গ করবে।

তবে একথাও সত্য যে, এর বাইরেও মানুষ আছে। ১৯৭১-এ গণহত্যার বিরোধিতা করার জন্য পাকিস্তানে অনেকে নির্যাতিত হয়েছেন। বাংলাদেশের পরাজয়ে বাংলাদেশের পাকিরা মনে মনে খুশি হলেও অনেক বাঙালি তাতে খুশি হয়নি। টেস্ট ম্যাচে দেখা গেছে, আম্পায়ার থেকে দর্শক সব বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যে জিরো বা বাঙালিদের যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে সবাই পছন্দ করে, তার প্রমাণ দক্ষিণ আফ্রিকার আম্পায়ারের খালেদ মাসুদকে অশালীনভাবে ডেকে পাঠানো, আপিল করলে হুমকি দেয়া ইত্যাদি। এতসব সত্ত্বেও বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা বাঙালির মতোই খেলেছে, '৭১-এর বিজয়ীর মতো মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে। হয়তো প্রতারণা না করলে, আম্পায়াররা জোট না বাঁধলে একটি টেস্টে তারা জিততো। অভিনন্দন বেশি প্রাপ্য আতাহার আলী খানের। সুদর্শন এই সাবেক খেলোয়াড়, বাংলায় অভ্যস্ত নন; কিন্তু

বাঘের মতো পাকি কমেনট্রেটরদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। প্রকাশ্যে। এ ধরনের মানুষকে দলের ম্যানেজার করলে বিদেশে হয়তো নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখা যেতে পারে। বাংলাদেশের পাকিরা এখানকার ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ করলেও খেলোয়াড় ও কমেনট্রেটর যে বাঙালিদের জন্য লড়েছেন প্রধান প্রবণতার বাইরে, এটুকুই বাঙালিদের আশা।

ক্রিকেট খেলার এই পর্যবেক্ষণ হয়তো যথেষ্ট জোরালো মনে হবে না। তাহলে গত কয়েকদিনের দু-একটি ঘটনার উদাহরণ দিই।

ডেইলি স্টারের (৮.৯.০৩) একটি খবরে বলা হয়েছে : ১৯৭১-এর আলবদর-প্রধান বর্তমানে জোটের প্রভাবশালী মন্ত্রী 'নিজামী কৃষিমন্ত্রী থাকাকালে গত মে মাসে শেরপুর জেলার নকলায় প্রতিষ্ঠিত জয় বাংলা কৃষি মার্কেটে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে মার্কেটের নাম বদলের নির্দেশ দেন। পরে আগস্ট মাসে জয় বাংলা বাজারের নাম বদলে ধোনাকোলা করা হয়।'

বিডিআরের একজন মুক্তিযোদ্ধা বীর উত্তম মরহুম সালাহ উদ্দিন আহমদের পরিবারকে বিডিআর কর্তৃপক্ষ 'যে কোনো কায়দায় বাস্তুচ্যুত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাসার দখল কেড়ে নেবার জন্য এর মধ্যে দু'দিন এমন ব্যবহার করা হয়েছে, ভীতসন্ত্রস্ত পরিবারটি বাসা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে এক রকম আত্মগোপন করে আছে' জানিয়েছে জনকণ্ঠ (১২.৯.০৩)। বিডিআরের পরিচালককে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, 'তারা আইন দেখেন, আর কিছু নয়। মুক্তিযোদ্ধা বা মানবিক কোনো বিবেচনা আইনের আওতায় পড়ে না।' সালাহ উদ্দিন আহমদের স্ত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিডিআর পরিবারটিকে থাকার জন্য ছোট একটি বাসা দিয়েছিল। সালাহ উদ্দিন আহমদ বীর উত্তমরা না থাকলে যে এখন কেউ আর বিডিআরের মহাপরিচালক বা পরিচালক হতে পারতেন না, তা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

এসব ঘটনা আর পর্যবেক্ষণের উপসংহার একটিই– একবার যে রাজাকার সে যেমন সবসময় রাজাকার, তেমনি পাকিরা পাকি-ই আর বাংলাদেশের পাকিরাও তা-ই। ভূখণ্ডটি স্বাধীন হয়েছে বটে, এখন তো আর তাকে পরাধীন করা যায় না; তাই বাংলাদেশ নামটি রয়ে গেছে। হয়তো থেকে যাবে। কিন্তু মানুষের প্রধান প্রবণতা পাকিদের দিকেই, যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জোরজবরদস্তি ইতিহাস থেকে বাদ দেয়া হয়, তার নামাংকিত প্রতিষ্ঠানের নাম বদল করে দেয়া হয় এবং আমরা নিশ্চুপ থাকি অর্থাৎ সমর্থন করি। এ কারণেই ১২ তারিখে টিভিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে কমিটেড পার্টনার।

১৫.৯.২০০৩

স্বদেশে গোলাম আযমদের প্রত্যাবর্তন

জামাতের অবসরপ্রাপ্ত কিন্তু কার্যত বড় আমির গোলাম আযমের মুখ ফসকে বহুদিন পর একটি সত্য কথা বেরিয়ে গেছে। দিলপছন্দ দেশ পাকিস্তানে গেছেন কয়েকদিন আগে। করাচিতে নেমে তিনি বলেছেন তার মনে হয়েছে 'যেন নিজ দেশেই আছেন।' ৩১ বছর পর সফর করলেন তিনি করাচি। শুধু তাই নয়, তার খায়েশ বাংলাদেশ-পাকিস্তানের ব্যবসা-বাণিজ্য চরম পর্যায়ে উন্নীত হোক [জনকণ্ঠ, ২২-১২]। প্রবাসীরা প্রবাসে যত সুখ-আহ্লাদেই থাকুক, নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি তাদের মনটা পড়ে থাকে নিজের দেশের দিকে যা সে ছেড়ে এসেছে সজ্ঞানে, স্বইচ্ছায় 'উন্নত' জীবনযাপনের জন্য। বিশেষ করে শেষ বয়সে অনেকের আকুতিই হয় এরকম যে, তাকে যেন কবর দেওয়া হয় নিজ দেশে। সুতরাং শেষ বয়সে, ৩১ বছর পর করাচি ফিরে গোলাম আযমের অনুভূতি সে রকমটি হওয়াই স্বাভাবিক। থাকেন তিনি বাংলাদেশে, সেটি তার কাছে প্রবাস, যেখানে থাকেন বাধ্য হয়ে, রাজনীতির কারণে, উন্নত জীবনের জন্য তো বটেই। এ কারণেই বলা হয় যার যেথা ঘর। পাকিরা গোলাম আযমকে নিজের লোক, দেশের লোক জেনে খাতির যত্ন ভালো করবে স্বাভাবিক। তবে, এ দেশে, কয়েকমাস কলেজে শিক্ষকতার কারণে নামের আগে অধ্যাপক লাগানো, ভাষা সৈনিকের জিকির তুলুন, সফেদ শশ্রু নিয়ে সুফী ভাব করে থাকুন, কিছুতেই কিছু হবে না। আমাদের কাছে তিনি রাজাকার-আলবদর বা এক কথায় যুদ্ধাপরাধী এবং পাকিতন্ত্রের প্রতীক। উল্লেখ্য তার দল এখন বিএনপির সহযোগী হয়ে ক্ষমতায়।

ইসলামী ঐক্যজোটের ভগ্নাংশের প্রধান ফজলুল হক আমিনীও এখন পাকিস্তানে। সেখানে তাকে রাষ্ট্রীয় প্রোটোকল দেওয়া হচ্ছে যা অন্য কোনোখানে দূরে থাকুক বাংলাদেশেও দেওয়া হয় না। তিনিও টেলিফোনে তার এক সুহৃদকে জানিয়েছেন, 'এখানে খুব আরামে-আদরে আছি। সর্বক্ষণ সামনে পিছনে থাকে আর্মির সারি।' (ঐ) আমিনীর ভগ্নাংশ দল চারদলীয় জোটের শরিক বটে তবে বিএনপির জামাতের নেতাকর্মী দূরে থাকুক, সামান্য কর্মীও তাকে পাত্তা দেয় না। সরকারের একটি পদও তাকে দেওয়া হয়নি। তাহলে পাকিস্তান তাকে এত আদর-যত্ন করে কেন?

এই উদ্ধৃতিগুলো তুলে ধরলাম এ কারণে যে, আমরা যখন এদের পাকিদের প্রতীক, মৌলবাদের, অন্যকথায় ধর্ম ব্যবসার প্রতীক বলেছি তখন অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আমিনীর বিষয় জানি না। কিন্তু গোলাম আযম '৭১ সালে কী করেছেন আমাদের জেনারেশন তা দেখেছে। এখন অবশ্য জামাতিরা সেটা স্বীকার করে না। আমাদের জেনারেশনের যারা বিএনপিতে আছে তারাও এ কথা স্বীকারে দ্বিধান্বিত। এ কথা মনে

রাখা জরুরি, বিএনপি-জামাতের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের একটি নীতি-অনবরত অসত্য বলা। সুতরাং যে উদ্ধৃতিগুলো দিলাম, সেগুলো দেখেও তারা বলবে এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

আমার সঙ্গে অনেকে একমত হবেন না, তবুও নির্দ্বিধায় বলতে চাই, ২০০০ সালের নির্বাচনের পর কাগজে-কলমে বা ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশ থাকলেও তাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশের খুব বেশি কিছু একটা নেই। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যে আদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই করে জন্মেছিল সে আদর্শেই ফিরে এসেছে। যুদ্ধাপরাধীরাই এখন ক্ষমতায়। যারা তাদের ক্ষমতায় এনেছে স্বাভাবিকভাবেই তারা বাংলাদেশ দর্শনে বিশ্বাসী নয়। ফলে তাদের মূল নীতিই হবে, শারীরিকভাবে (অর্থাৎ ভৌগোলিকভাবে-পাকিদের সঙ্গে মিলিত হতে না পারলেও (পারলে তারা নিজেদের সম্মানিত ভাবত) মানসিকভাবে যেন পারে। তাদের মূল উদ্দেশ্য, দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিদের সহযোগী রাষ্ট্র হিসেবে বা তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসেবে থাকা 'হিন্দু ভারত' 'হিন্দু নেপাল বা 'বৌদ্ধ শ্রীলঙ্কা'র বিরুদ্ধে মুসলমানত্ব প্রকাশ করা। পত্রপত্রিকা অনুসারে, জামাত ও তার গুণমুগ্ধ বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর আইএসআইদের গুরুত্ব বেড়েছে। যেটা আওয়ামী আমলে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল এবং দেশে ও আশপাশের দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। পাকিস্তান যেন সাম্প্রদায়িক নীতিগ্রহণ করে দেশটিকে হিন্দু শূন্য করেছে ও এখন খ্রিস্টান শূন্য করতে চাচ্ছে, জামাত ও তার সহযোগী বিএনপি ও ইসলামী ঐক্য বাংলাদেশে একই নীতি গ্রহণ করেছে। পাকিস্তান যেমন সামরিক যাঁতায় নিষ্পেষিত এরাও সামরিক বাহিনীর পরোক্ষ ফ্রন্ট এবং গণতন্ত্র বস্তুটি এখানে প্রায় নির্মূল করা হয়েছে। পাকিস্তানের মতোই সন্ত্রাস-দুর্নীতি এখন সরকারের প্রধান নীতি। যারা বাংলাদেশ ভালোবাসেন বাংলাদেশের অর্থে, পাকি অর্থে নয়, তাদের তাই আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম বাংলাদেশের পাকিকরণ না চাইলে জামাত-বিএনপি রোধ করতে হবে। হয়তো অনেকে তা চাননি বা চান না বা বাংলাদেশে এখন পাকিরাই হয়তো জিতেছে, তাদের অনুসারীরাই হয়তো বেশি। পাকিভক্তির একটা উদাহরণ দিই। এই পাকিভক্তদের অন্যতম যুদ্ধাপরাধী হিসেবে পরিচিত সাকাচৌ বেগম জিয়াকে এক সময় কুৎসিত সব ভাষায় গালাগালি করেছিলেন যা বাংলাদেশে কেউ করেনি। বেগম জিয়া কিন্তু তাকেই ওআইসির মহাসচিব পদে মনোনয়ন দিয়েছেন। কারণ, জামাত তাকে চায়, সে কারণে ওআইসির ও জামাতের পৃষ্ঠপোষক সৌদি আরব তাকে সমর্থন জানাবে। এর ফলে বাংলাদেশে অবস্থা কী হবে তা বাঙালিরা পরে টের পাবেন। অপরদিকে আরেক যুদ্ধাপরাধী মন্ত্রী মোজাহিদ মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, 'বাংলাদেশ এখন মৌলবাদীদের শক্ত ঘাঁটি।' (জনকণ্ঠ ২১.১২.০৩) পরে অবশ্য তা অস্বীকার করা হয়েছে।

কয়লা ধুলেই কি ময়লা যায়? কয়লার রং কি সাদা হয়ে যায়। যায় না। জামাত নেতারা সব সময় এগুলো বলে আসছে এবং তাদের সহযোগী বিএনপিও এ বিষয়ে একমত। এ জন্য তারা দেশ হিন্দু-খ্রিস্টান শূন্য করতে চায়। (সাম্প্রদায়িকতা), মৌলবাদ বা ওহাবিবাদ প্রচার করতে চায় (কাদিয়ানীদের অমুসলমান করা, মসজিদের নামে জমি

দখল করা ইত্যাদি)। ওহাবীরা কেন সৌদি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল এর বিশদ বিবরণ জানতে চাইলে তারিক আলীর ক্লাশ অফ ফান্ডামেন্টালিজম' গ্রন্থটি পড়ার অনুরোধ জানাবো। এ থেকে বেগম জিয়াকে নিয়ে তাদের এগোনোর কৌশলটাও পরিষ্কার হবে। যে কারণে নারী নেতৃত্ব হারাম ঘোষণার পর জামাত নেতারা বেগম জিয়ার পদচুম্বনে আগ্রহী। গোলাম আযম একদিকে নীতিবান। তিনি যা মনে করেন তা বলেন। তিনি দু'যুগ আগে ১৯৭১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, 'রিপ্যান্ট করার কোনো কাজতো আমি করিনি। রিপ্যাণ্ট করবো কেন?' (আখতার হোসেন, জননেতা গোলাম আযম, পৃ-৪৭)। তারই সুর ধরে এখন বলছেন, নিজ দেশে ফিরে এসেছি। আত্মজীবনীতে গোলাম আযম লিখেছেন 'স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েমের সংগ্রামকালে মুসলিম জাতীয়তাবোধ ম্লান হয়ে গেল এবং বাঙালি জাতীয়তার চেতনা প্রবল হয়ে দেখা দিলো। ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে পার্থক্য, তা একশ্রেণীর লোক ভুলেই গেল।' (পৃ. ২৫১) বিএনপিও তাই মনে করে। বিএনপি মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছেন 'ইনকিলাব', 'সংগ্রাম' ও 'দিনকাল' তাদের পত্রিকা। এগুলোর চরিত্র কী তা কারো অজানা নয়।

গণঅসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠলে গণঅভ্যুত্থান হয়। জামাত জানে তারা ক্ষমতায় এলে যা করবে তাতে গণঅসন্তোষ তীব্র হয়ে উঠতে পারে। সে জন্য গোলাম আযম তার 'স্টাডি সার্কেল' গ্রন্থে লিখেছেন- 'বাংলাদেশে নির্বাচনই নিরাপদ মাধ্যম। গণঅভ্যুত্থান এ দেশের জন্য মারাত্মক– এতে প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী শক্তি সুযোগ পেয়ে যাবে। (পৃ. ১৬৭) কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার এও বলেছেন- 'নির্বাচন ছাড়া জিহাদের মাধ্যমেও তা হতে পারে- যেমন আফগানিস্তানে হয়েছে।' (পৃ. ১৬৮) কী বুঝলেন? সারা দেশে অসংখ্য মৌলবাদী গোষ্ঠীর অস্ত্রশস্ত্রসহ ধরা পড়া ও না পড়ার মধ্যে কী প্রমাণিত হয়? আর না হলে পাকি পদ্ধতি তো আছেই। তার মতে-'সশস্ত্র বাহিনীর অফিসাররা জিহাদি জজবায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং জওয়ানদেরকে শাহাদাতের প্রেরণা দেবে।' (পৃ. ১৬৫) এ সবেরই ফয়সালা করতে সব পাকি ও তালিবান পন্থীরা পাকিস্তানে কিনা কে জানে। এবং তারপর খবর পাওয়া গেল তালেবান বিরোধী পাকি প্রেসিডেন্টকে হত্যার জন্য দু'বার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

বাংলাদেশের পাকিকরণ বা ইজ্জতহরণ সম্পর্কে আমরা জামাত-বিএনপি ঐক্যজোট সম্পর্কে যত সাক্ষ্যপ্রমাণই তুলে ধরি না কেন বিএনপি-জামাত অনুসারী ও তাদের গুণমুগ্ধ ভোটাররা বলবে প্রোপাগাণ্ডা। কিন্তু এখন আমাদের সুস্পষ্টভাবে বলার সময় এসেছে জোট বাংলাদেশপন্থী নয় পাকিপন্থী। গত ৩ বছরে তাদের কোনো ব্যবস্থা বাংলদেশ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন, আমরা জানি কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। সাদা হয় না। বিএনপি-জামাত বলবে এটি ঠিক নয়। যেমন আলতাফ চৌধুরী বলেছেন, 'দেশে খুন বেড়েছে, অপরাধ বাড়েনি। জামাত-বিএনপির অনুসারীদের বলি, সেমতো কয়লা বারবার ধুতে থাকুন, দেখুন ময়লা যায় কিনা বা সাদা হয় কিনা।

৩০.১২.২০০৩

বিচারকরা কি শুনেছেন আমিনীর হুংকার?

আদালত অবমাননার বিষয়টি এখনও আমাদের অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। অতীতে দেখা গেছে, কোনো উপন্যাসের দু'একটি লাইনও বিচারকদের ক্ষুব্ধ করেছে। লেখককে ডেকে আনা হয়েছে আদালতে। আবার অনেক সময় দেখা গেছে উর্দিপরা মানুষজনের ক্ষমতা দখলকে আদালত অনুমোদন করছে। পাকিস্তানে কয়েকদিন আগে, এক রাজনীতিবিদ পাকিস্তানি বিচারকদের উদ্দেশে বলেছেন, এরা সবসময় উর্দি-অলাদের আইন অনুমোদন করে পাকিস্তানের নষ্ট করে দিয়েছে। এদের বিচার হওয়া উচিত। পাকি প্রসঙ্গ তুলতে চাইনি। কিন্তু এখন চারিদিকে যেমন পাকি পাকি গন্ধ তাই না বলে পারলাম না। আমাদের এখানে আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, পেশীবহুল রাজনীতিবিদ বা অন্যকেউ এমন সব মন্তব্য করছে যা আমাদের কাছে মনে হয়েছে আদালত অবমাননা। ভেবেছি, এবার আদালত আর ছাড়বে না। কিন্তু না, কোনো সাড়াশব্দ নেই। আবার একসময় পত্রিকায় পড়েছিলাম, বাংলাদেশের দুই সুখ্যাত পত্রিকা সম্পাদককে আদালতে ডেকে এমনভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল যে, মানুষজন ভড়কে গিয়েছিল। যেন, তারা বাড়ির ভৃত্য আর কি! যাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছিল তারাও অনেক গুণীব্যক্তি এবং তাদের পরিচিতিও বেশি। যদিও আমরা পড়েছিলাম মানীর মান মানীই রাখে, কিন্তু আদালত বলে কথা!

যাক, এসব কথা মনে পড়লো পত্রিকার একটি সংবাদ পড়ে। সম্প্রতি পাকিস্তান ফেরত, 'আমরা হবো তালেবান' খ্যাত ফজলুল হক আমিনী এক হুংকার দিয়েছেন বিচারকদের উদ্দেশ করে। লাল লাল ছোপ পড়া দাঁতের (তিনি পান চিবুতে বোধ হয় খুব ভালোবাসেন) আমিনী বলেছেন, 'দেশের সুপ্রিম কোর্টও যদি কাদিয়ানিদের পক্ষ নেয় তাহলে তাও মেনে নেওয়া হবে না। তাতে দেশে এমন আগুন জ্বলবে তা নেভানোর সাধ্য কারও থাকবে না।' ইসলামী ঐক্যজোটের ভগ্নাংশের প্রধান ফ. হ. আমিনী আরো বলেছেন, 'কাদিয়ানিদের ব্যাপারে সরকারি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা চালালে দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। সংবিধান রক্ষার নামে কাদিয়ানিদের পক্ষ নেওয়ার সুযোগ নেই।' (জনকণ্ঠ)

আমিনীর বক্তব্যে দু'টি দিক আছে– আদালতের রায় যদি কাদিয়ানিদের পক্ষে যায় তাহলে আগুন জ্বালানো হবে এবং সংবিধান অনুসারে যদি বিচার করা হয় এবং সে রায় যদি কাদিয়ানিদের পক্ষে যায়, তাহলেও দেশে আগুন জ্বলবে। অন্যদিকটি হলো, কাদিয়ানিদের পক্ষে কিছু বললে তাদেরও দেখে নেওয়া হবে। অর্থাৎ গণতন্ত্র, সংবিধান, আইন-আদালত বড় কথা নয়, বড় হচ্ছে, অর্থ, অস্ত্র, অর্থাৎ ক্ষমতা।

এসব ভাষায় কথা বলা হয় সাধারণত যেখানে শিক্ষা-সংস্কৃতির মান নিচু। কারণ, ঐ ধরনের সমাজে যারা ক্ষমতার অধীশ্বর হন তাদের অবস্থাও এর থেকে ভালো হওয়ার কথা নয়। আমিনী শাসক জোটের অংশীদার খুব অনেকের মতে, ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চার মতো। তারা, জোটের অংশীদার বটে, তবে কেউ তাদের খুব একটা পাত্তাটাত্তা দেয় না। মাঝে মাঝে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করলে প্রধানমন্ত্রী একটু মৃদু হেসে চা-নাশতা খাইয়ে দেন, তাতেই তাঁরা খুশি। আমিনীর বক্তব্য ঐ স্তরের হলেও এর মধ্যে অনেকগুলো বিষয় জড়িত।

সরকার বলছে, বাংলাদেশ মডারেট মুসলিম দেশ। কিন্তু জামাত-আমিনীরা সরকারের থাকলে যে তা মডারেট থাকে না তা বিএনপির বীর পুরুষরা না বুঝলেও যাদের বোঝার তারা বুঝে নেয়। আমিনীদের এ ধরনের হুংকার বাংলাদেশকে উগ্র জঙ্গিবাদীর ইমেজে তুলে ধরে। আসলে ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছে প্রধানমন্ত্রীর এইসব সাঙ্গপাঙ্গরা।

বিচারের আগেই রায় নিয়ে কথা বলছে এবং বিচারকদের হুমকিও দেয়া হয়েছে। এই হুমকি ন্যায়বিচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে কিনা? যদি, রায় বিপক্ষে যায় তাহলে বলা হবে, বিচারকরা ভয় পেয়েছেন। সেটি কাম্য কিনা বা তাদের চরিত্রের ওপর আঘাত কিনা? তবে আমি এটা বিশ্বাস করি যে, আমিনী আগুন জ্বালাতে পারেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিনি এমনটি করেছিলেন। এর আগেও আদালতকে তিনি হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু কোনো সমন পাননি। এ কারণেই লোকজন নানা কথা বলে।

আমরা কয়েকদিন আগে এই ভোরের কাগজেই লিখেছি, বর্তমানে কাদিয়ানি ইস্যু, সৃষ্টি করা হচ্ছে কয়েকটি কারণে। জামাত, বিএনপি ও ঐক্যজোট মিলে দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করেছে। তারা ভেবেছিল (যেটা জামাতের স্ট্র্যাটেজি), ছুরি বুকে ধরে রাখলে মানুষ চুপ থাকবে, যেমনটি ছিল ১৯৭১ সালে। এখনও তাই করছে। কারণ, পরাজিতদের আর কি অস্ত্র থাকতে পারে? মানুষ ছুরির নিচে আছে বটে কিন্তু খুবই ক্ষুব্ধ। এই ব্যর্থতা ঢাকার জন্য ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, এই উত্তেজনার আগুনে তারা হাত সেঁকবে এবং তাদের কর্তৃত্ব বহাল রাখবে। সঙ্গে সঙ্গে, বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিরকার ওপর ওহাবিবাদীদের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে। জামাত এর প্রধান প্রবক্তা। কারণ, সৌদিরা জামাতের পৃষ্ঠপোষক। জামাতের অনেকেও হয়ত সুন্নী। কিন্তু মালকড়ি যা পাওয়া যায় বা যাবে তাতে এ ধরনের কাজ করা এমন কোনো ব্যাপার না, অন্তত জামাতিদের কাছে আমিনীরা হলো এর সেকেন্ড ফ্রন্ট। এরা জামাতিদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে কথা বলে বটে কিন্তু সেটা লোকদেখানো। না হলে জামাত, আমিনী ও চরের পীরদের এজেন্ডা এক হয় কী করে?

আমরা সেই সময়ই বলেছিলাম, এইতো সবে শুরু। 'ম্যান্ডেট' কাকে বলে এরপর দেখবেন। ঘটনাগুলোর ক্রম দেখেন- জামাতের আসল আমীর গোলাম আযম ও আমিনী প্রায় একই সঙ্গে পাকিস্তান গেলেন। পাকিরা তাদের মহাখাতির-যত্ন করেছে। আমিনী নিজেই তা বলেছেন। তারা ফেরার পর আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে হট্টগোল শুরু করলেন।

সরকার ত্বরিত আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে বন্দোবস্ত নিল। এরপর আমিনীদের হুংকার। তার রেশ না মিলাতেই হজরত শাহজালালের ওরসে বোমা হামলা। নিহত ৩. আহত ৫০। গত ৭০০ বছরে এরকম ঘটনা ঘটেনি। অধিকাংশ পত্রিকা লিখেছেন, এটি জামাতের নির্দেশে হয়েছে। তারপর দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির ছাত্রদলকে এমন পিটিয়েছে যে তারা তাদের নতুন লিডার তারেক জিয়ার নামও ভুলে গেছে। তাদের বিগ লিডার ব্য. না. হুদা আগে বলেছিলেন, তারেক জিয়াই একমাত্র সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। ছাত্রদল জানিনা বুঝবে কিনা যে, মার খায় তারা আর জামাতের সঙ্গে দোস্তি করে তাদের লিডাররা।

সে জন্য অনেকে বলাবলি করছিলেন, বিচারকরা কি শুনেছেন আমিনীর হুংকার? এখন তারা কি করবেন? হয়ত বিব্রত হবেন। যদি কাদিয়ানিরা আদালতে যায় তাদের প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে এবং তখন যদি বিচারকরা সংবিধান মতে চলেন তাহলে আমিনী তাদের দেখে নেবেন। যদি বিপক্ষে যায়, তাহলে অধিকাংশ মানুষ বলবে, আমিনীর হুংকার রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। আমি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বরং জনাব ফ. হ. আমিনীকে একটি প্রশ্ন করি। আদালত সংক্রান্ত নয়। কাদিয়ানিদের পক্ষে সরকারের মন্ত্রী নাজমুল হুদার স্ত্রী. মানবাধিকার সংগঠনের নেতা সিগমা হুদা একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আগুন জ্বালাবার কাজটা সেখান থেকেই শুরু করেন না কেন?

১৫.০১.২০০৪

বিএনপি কীভাবে জামাতের বি টিমে পরিণত হলো

জামাত-বিএনপি যখন একজোট হয়ে রাজনীতি শুরু করে তখন আমাদের কি যেন বলে, সুশীল সমাজের সুশীল মার্কা অনেকে বলেছিলেন, গণতন্ত্রে এমনটি হতেই পারে। তারা তখন দিব্যি ভুলে গিয়েছিলেন, ইউরোপে আমাদের থেকে উন্নতমানের গণতন্ত্র চর্চা হয় এবং সেখানে নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। এই একই কারণে, ১৯৭২ সালের সংবিধানে জামাত বা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কারণ, জামাত ও ধর্মব্যবসায়ীরা ১৯৭১ সালে গণহত্যা গণধর্ষণ ও গণলুটের সঙ্গে ছিল জড়িত। সেই 'সুশীল ভদ্রলোক'রা তখন বলতেন, লিখতেন যে, জামাত এমন কোনো শক্তি নয়, ৭% ভাগ ভোট আছে মাত্র। আমরা বলেছিলাম, এটা ভুল। কয়লা ধুলে ময়লা যায় না। জামাতের পূর্ব ইতিহাস জিঘাংসা ও হিংস্রতার ইতিহাস। তারা সব সময় কয়েক ভাগ ভোট নিয়ে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতায় বড় হয়েছে। তাদের গুরু মওদুদী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকদের সমর্থন করেছিলেন। ভারত থেকে বিতাড়িত হলে তিনি পাকিস্তানে আশ্রয় নেন এবং মানুষ হত্যার জন্য দাঙ্গার সৃষ্টি করেন। যে কারণে, পাঞ্জাবীদের মতো ধর্মব্যবসায়ীরাও তার ফাঁসির আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছিল। মওদুদীর হয়ে বাংলাদেশে ভার নিয়েছিলেন গোলাম আযম, যার শিষ্য নিজামী ছিলেন আলবদর প্রধান। জিয়াউর রহমানের মহব্বতের কারণে এবং তারপর আরেক ধর্মব্যবসায়ী এরশাদের কারণে আজ ওদের রবরবা। গত কুড়ি বছরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে জামাত। যাক, আমরা তখন বলেছিলাম, এইবার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বারোটা বাজল বলে। যেসব বিখ্যাত সাংবাদিক 'গণতান্ত্রিকভাবে' জামাতকে ক্ষমতায় আনতে সাহায্য করেছেন, তাদের পত্র-পত্রিকায় জামাত সম্পর্কে এখন মিনিমাম খবর পাবেন। এতে কী প্রমাণিত হয়? নিজেরাই বুঝে নিন।

বিএনপির প্রচুর অন্ধ, অজ্ঞ সমর্থক মনে করেছিল বিএনপি বোধ হয় এবার তাদের এজেন্ডা কার্যকর করার ব্যাপারে শক্তিশালী হবে। একদিক থেকে বলতে গেলে, বিএনপির প্রধান দু'টি এজেন্ডা পূর্ণ হয়েছে। প্রথমটি হলো লুট, হত্যা, ধর্ষণ। অনেকের ধারণা, আওয়ামী লীগের প্রধান শত্রু বিএনপি, মোটেই না। বিএনপি মোটামুটি সুবিধাবাদী কিছু লুটেরার দল, আদর্শবিহীন। গত দু'বছরে সংবাদপত্রের বিভিন্ন খবরই এর প্রমাণ। আদর্শগত দিকে থেকে আওয়ামী লীগের প্রধান শত্রু জামাত। গত তিন বছরে জামাতও বিএনপি হত্যা, লুট, ধর্ষণে সহায়তা করেছে তবে সহযোগী হিসেবে। বিএনপির দ্বিতীয় এজেন্ডা, জিঘাংসা বা হীনম্মন্যতা কার্যকর করা। অর্থাৎ যেখানে যেখানে বঙ্গবন্ধু বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম আছে তা মুছে ফেলা এবং নৌকা প্রতীক ধ্বংস

করা। লক্ষ্য করবেন, সর্বোচ্চ আদালতের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িপাল্লা কিন্তু ঠিকই আছে। এবং আরো ভেবে দেখুন, স্বাধীনতা যুদ্ধের, প্রধান-বিরোধী ছিল জামাত, বিএনপির তখন সৃষ্টি হয়নি। জামাতের পক্ষে স্বাধীনতার প্রতীকসমূহ সহ্য করা মুশকিল।

এ ছাড়া কার্যত সর্বক্ষেত্রে জামাতের এজেন্ডা কার্যকর হয়েছে। কত উদাহরণ দেবো? এর সংখ্যা এতো বেশি যে কয়েক পৃষ্ঠা লাগবে। সামান্য ক'টিই যথেষ্ট। যুদ্ধাপরাধী জামাতিদের ক্ষমতা দখল ও যুদ্ধাপরাধীকে ইসলামী সংস্থায় মনোনয়ন, মওদুদীর উগ্রপন্থা কার্যকরভাবে গ্রহণ যার ফলে বাংলাদেশ এখন ইসলামী জঙ্গিবাদী দেশ হিসেবে পরিণত। এর প্রমাণ, অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রচুর জঙ্গিবাদী গ্রেপ্তার এবং বিচার না হওয়া। এতে বোঝা যায় ঐ সব গ্রেপ্তার ছিল লোকদেখানো। যার সর্বশেষ উদাহরণ, হজরত শাহ জালালের (রহঃ) মাজারে বোমা নিক্ষেপ, বিশেষ বিশেষ জায়গায় জামাতের ছাত্র ক্যাডার নিয়োগ, অন্যান্য জায়গায় বিএনপির সদস্য ক্যাডার নিয়োগ যাতে তারা জামাতের ওপর নির্ভরশীল থাকে। শোনা যাচ্ছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরেজিতে কথা বলা তাকে অপসারণ করে জামাত ক্যাডারের একজনকে নিয়োগ করা হবে। এই ক্যাডার কয়েকদিন আগেও ছিল সচিব যার ভয়ে মন্ত্রীরা পর্যন্ত ছিল নিশ্চুপ। এখন দেশের নাম বদলের বাকি মাত্র। এটি হলে কয়েক দশক আগে ক্ষমতা দখলকারীর পরিবারদের সবাইকে দেশ ত্যাগ করতে হবে। শেখ হাসিনাকেও। অথবা তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ধর্মযুদ্ধের মতো যুদ্ধ করে শহীদ হতে হবে। এ কারণেই কয়েকদিন আগে, জামাতের ছুপা রুস্তম, ব্যা. না. হুদা ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৭১ সালে জামাত কোনো অপরাধ করেনি যা ১৯৭১ সালেই জামাতের নেতারা বলেছিল।

আমি এ বিষয়ের সর্বশেষ তিনটি উদাহরণ দেবো–

১. সপ্তাহখানেক আগে, জামাতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির বা বাচ্চা জামাতিরা বিএনপির ছাত্র সংগঠন বা খালেদা জিয়ার সোনার ছেলেদের এমন পিটিয়েছে যে অনেকে পিতৃ পরিচয়ও ভুলে গেছে। ছাত্রদল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, শোনা গেছে রাজশাহী ত্যাগ করেছে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী, ছাত্রদলের পৃষ্ঠপোষক শিক্ষকদেরও এমন ধাওয়া করেছে বাচ্চা জামাতিরা যে, তাদের অনেকে এখন ঢাকায়। ছাত্রদলের বিরুদ্ধে বেশ ক'টি মামলাও করেছে শিবির। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ বা তরুণ তুর্কী, ক্যারিশমেটিক লিডার হিসেবে পরিচিত তারেক রহমান এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। মন্ত্রীরা নিশ্চুপ। ঢাকা থেকে কোনো লিডার রাজশাহী যাওয়া দূরে থাকুক, খানিকটা সমবেদনাও জানায়নি। ছাত্রদলের সাধারণ কর্মীরা, যারা লুটের ভাগ পায় না কিন্তু ছাগলের তিননম্বর বাচ্চার মতো লাফায়, এখন বোধহয় তাদের সময় এসেছে বিষয়টি অনুধাবন করার।

২. পত্রিকার খবর অনুযায়ী এবার হজের সরকারি প্রতিনিধিদলে বিএনপির ধর্মমন্ত্রী নেতৃত্বে থাকছেন না। জামাতিরা শুধু 'মন্ত্রীর নামই নয়, একই সঙ্গে প্রতি দল থেকে বাদ দেওয়া হয় মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত সিংহভাগ লোকেরও নাম। আর এদের পরিবর্তে ঢোকানো হয় জামাত পছন্দ 'খ্যাতিমান' সব লোক। এদের মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজাকার হিসেবে কাজ করেছে এবং ধর্ষণের অভিযোগ আছে এমন কুখ্যাত

লোকও হয়েছে।' (জনকণ্ঠ ২০.০১.০৪)। একদিকে ঠিকই আছে। সৌদিরা রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের পছন্দ করে যারা রাজতন্ত্রের সমর্থক।

৩. জামাতের পাকিকরণ এজেন্ডাও যে সমাপ্তির পথে তার প্রমাণ পাকিস্তানের সিনেটে মুত্তাহিদা মজলিস-ই-আমলের সংসদীয় নেতা মওলানা গুল নসিব খান বলেছেন, তাঁরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন এবং বাংলাদেশের সংসদে তাদের তিনজন এমপি আছে। এরা হলেন– ওয়াক্কাস, আমিনী ও শহিদুল। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতি অবস্থান খুবই সুদৃঢ় এবং সে দেশের প্রতিটি শহরে দলটির সংগঠন রয়েছে।' এরা সব জামাতের উগ্রবাদের সমর্থক জোটের অধস্তন সহযোগী।

৪. বেগম জিয়া বলেছেন, তার পক্ষে আহমদিয়াদের এখন অমুসলিম ঘোষণা করা সম্ভব নয়। হলে হয়তো করতেন। অন্যদিকে সরকারের আরেক প্রধান নিজামী ফতোয়া দিয়েছেন, আহমদিয়ারা অমুসলিম এবং তাদের যারা সমর্থন করে তারাও অমুসলিম। আপনি রাগ করে হয়ত বলতে পারেন, ইসলাম তার পিতার সম্পত্তি নাকি যে সে নির্ধারণ করবে কে মুসলমান, কে নয়? কিন্তু বলা পর্যন্তই। ১৯৭১ সাল থেকে দিব্যি খেয়েদেয়ে তারা পুরুষ্ট হযেছে। কী করতে পেরেছেন? এমন কি 'বীর' খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারাও?

৫. রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান থেকে জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা বাদ। সিপিএ সম্মেলনের কথা স্মরণ করুন। কয়েকদিন আগে এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী উদ্বোধনেও জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়নি। এবং বিএনপির লিডার মান্নান ভুঁইয়া ক'দিন আগে বলেছেন পুরনো কথা বা অতীত ভুলে যেতে।

সুতরাং, এখন জামাতের বি টিম হিসেবে বিএনপিকে ডাকতে পারেন। সেটি ভালো না লাগলে, আপাতত জুনিয়র জামাতি বলতে পারেন। তবে, বেশিদিন এ অবস্থা থাকবে না। এখন বিএনপি-জামাত একই দলের এপিঠ-ওপিঠ। ভবিষ্যতে দল একটিই হয়ে যাবে।

২৩.১.০৪

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও রাজনীতি

দেখতে দেখতে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির এক যুগ পূর্ণ হলো। আমরা যারা এটি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তাদের তখনো তরুণ বলে চালিয়ে দেয়া যেতো। আমাদের বড়দের প্রবীণ। এখন আমাদের আর তরুণ বলার উপায় নেই। বড়রাও সে অর্থে সচল নন। কিন্তু যে কারণে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে কারণটির অবসান এখনো হয়নি। অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। সেজন্য যারা জড়িত ছিলেন, তারা এখনো দমেননি।

নির্মূল কমিটি এক যুগ উপলক্ষে গণআদালতের বিচারক অভিযোগকারীদের বিশেষভাবে সংবর্ধনা দেয়। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এখন আশি পেরিয়েছেন, কলিম শরাফী, গাজিউল হক আশির দিকে ছুটছেন, সৈয়দ শামসুল হক আর বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সত্তরে পা দেবেন। কিন্তু সেদিনের সভায় এরা সবাই ছিলেন সোচ্চার। এবং এ কথাটাই তারা বারবার বলছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই।

নির্মূল কমিটির আগে ছিল মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র। একদিন কার বাসায় যেন সমমনা কয়েকজন বসে আলাপ হচ্ছিল। এরশাদ আমল তখন। জামায়াত, বিএনপি, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আন্দোলন করলেও আমরা শঙ্কিত হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, এই আন্দোলন আন্দোলন খেলার মাধ্যমে তারা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে চাচ্ছে। সামরিক শাসকদের সঙ্গে তাদের সবসময় যোগাযোগ থাকে। তখনো ছিল নিশ্চয়ই। কারণ স্টাবলিশমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া জামায়াত কখনো বেড়ে উঠতে পারে না। শক্তি সঞ্চয়ের পর পুরনো পৃষ্টপোষকদের ছুরি মেরে সে স্থান দখল করে। এইটা তাদের রণকৌশল। আমাদের সঙ্গে সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন কয়েকজন। জামায়াত তথা ঘাতক তথা যুদ্ধাপরাধীদের উত্থানে ছিলেন তারা শঙ্কিত। ক্ষুব্ধও। সে কারণে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র গঠন করা হলো। কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হলো একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়? একুশে বইমেলায় ডানা প্রকাশনীর দোকানে বইটি বিক্রির বন্দোবস্ত করা হয়। পুরো মেলাজুড়ে সৃষ্টি হয় আলোড়ন। পুরানো ইতিহাস, যা সামরিক কর্তৃপক্ষ ও জামায়াতের মিলিত চেষ্টায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল, তা আবার জ্বলজ্বল করে ওঠে। এ বইটি বিবেকবান মানুষকে আঘাত করেছিল, সমাজে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তার ফলেই চিন্তা করা হচ্ছিল, শুধু গবেষণা নয়– মাঠপর্যায়েও কিছু কাজ করা যায় কি-না। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় নির্মূল কমিটি।

প্রধানত শাহরিয়ার কবিরের উদ্যোগে গঠিত হয় নির্মূল কমিটি। এই প্রথম বাংলাদেশে ডানপন্থী চিন্তা-ভাবনার লোক ছাড়া সব ধরনের বুদ্ধিজীবীদের একই প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল, যা কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে এর আগে

সম্ভব হয়নি। শুধু তা-ই নয়, নির্মূল কমিটির সব ধরনের কর্মকাণ্ডে ছিলেন তারা সক্রিয়। এর অন্য একটি দিক আছে। বাংলাদেশের প্রায় সব লেখক-শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী তথা বুদ্ধিজীবীর প্রাণের দাবি ছিল যুদ্ধাপরাধী শনাক্ত ও তাদের বিচার করা। কিন্তু নির্মূল কমিটির একার পক্ষে দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটি। রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৭০টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় জাতীয় সমন্বয় কমিটি। আহ্বায়ক হলেন জাহানারা ইমাম।

একাত্তরের দিনগুলি লেখার সময়ই বোধহয় ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার কথা তার মনের অবচেতনে ঘুরতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের পর ঘাতক-দালালদের উত্থান তাকে অসম্ভব পীড়া দিতো। কারণ তিনি ছিলেন শহীদ জননী। পুত্রহারা যারা হননি, তাদের পক্ষে সেই শোকের মাত্রা অনুভব করা সম্ভব নয়। সে কারণে যখন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং পরে সমন্বয় কমিটি হলো, তখন তার 'মুক্তিযোদ্ধা ছেলে'রা আহ্বান জানিয়েছিল এর ভার নেয়ার জন্য এবং তিনিও সায় দিয়েছিলেন, যদিও আক্রান্ত তিনি তখন ক্যান্সারে।

নির্মূল কমিটির প্রধান দাবি ছিল এবং এখনো আছে, তাহলো– যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। কারণ একটি সভ্য সমাজ গড়ে তুলতে এর বিকল্প নেই। অতীতে যাদের হত্যা করা হয়েছে বা লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তাদের হত্যাকারী বা লাঞ্ছনাকারীদের বিচার যদি না হয়, তাহলে মানুষ বর্তমানের মুখোমুখি হবে কীভাবে? কারণ হত্যাকারীরা সমাজে ঘুরে বেড়াবে বীরদর্পে এবং এতে প্রতীয়মান হবে, খুন করলেই যে বিচার হবে– এমন কোনো কথা নেই। এবং বাংলাদেশে ঠিক তা-ই হয়েছে। বাংলাদেশ যে সন্ত্রাসের কারণে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, তার মূল কারণ সেখানেই নিহিত। ইউরোপেও এক সময় গণহত্যা চালানো হয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ সভ্যতার সেই সূত্রটি মেনে নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় সমাজের অগ্রগতির এটিও একটি কারণ। সমাজে স্থিরতা ফিরে এসেছিল এবং আগের অভিজ্ঞতা মনে রেখে, ইউরোপে আর কখনো নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদকে উৎসাহ দেয়া হয়নি। দমন করা হয়েছে, কারণ তা গণতান্ত্রিক আদর্শের বিপরীত।

আহমদ জিয়াউদ্দিনের এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, হিটলারের নরমেধযজ্ঞের পর অধিকৃত রাষ্ট্রগুলোর স্লোগান ছিল, যারা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের কোনো স্থান হবে না দেশে। পাশ্চাত্যের সবক'টি অধিকৃত রাষ্ট্রে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটিই ছিল সরকারি নীতি। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, দালালির কারণে বেলজিয়ামে ১ লাখ, নেদারল্যান্ডে ১ লাখ ১০ হাজার এবং ফ্রান্সে ১ লাখ ৩০ হাজার লোককে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ১৯৪৫ সালে বেলজিয়ামের জনসংখ্যা ছিল ৮৩ লাখ আর নেদারল্যান্ডে ৮৮ লাখ। ফ্রান্সে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল ৬ হাজার ৭৬৩ জনকে, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডে ২ হাজার ৮৪০ ও ১৫২ জনকে। বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডে ও ফ্রান্সে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল যথাক্রমে ৫৩ হাজার, ৪৯ হাজার এবং ৪০ হাজার মানুষকে।

এখানেই শেষ নয়। কারাদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল জরিমানা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, জেল মেয়াদ শেষে পুলিশ মনিটরিং এবং বসবাসের জন্য বিশেষ এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া। বেলজিয়ামে তো রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়েছিল। এবং সে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে (প্রয়োজনে)।

সে তুলনায় আমাদের দেশের খুনি, যুদ্ধাপরাধীরা স্বর্গে বসবাস করছে। খুনের বিচার থাক তারা আজ মন্ত্রী, আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিয়োগ পাচ্ছে। দেশের লোকের এতে সায় আছে– বিদেশে যদি কেউ তা বলে, তখন আমাদের উত্তর কী হবে? দেশের লোকের যদি সায় না থাকে, তাহলে এতদিন বহাল তবিয়াতে বসবাস করে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে কীভাবে।

এর অন্য দিকটি হলো, নির্মূল কমিটিই শুধু গণহত্যা বা যুদ্ধাপরাধের বিচার দাবি করেছে তা নয়। এ দাবি ১৯৭২ সাল থেকে করা হয়েছে। এবং তৎকালীন সরকারও এ বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছিল। আন্তর্জাতিকভাবেও দাবি উঠেছিল গণহত্যা বিচারের। কয়েকদিন আগে ১৯৭২-৭৫ সালের পত্রিকা উল্টাতে গিয়ে সে ঘটনাগুলোই মনে হলো। আমি নিশ্চিত, আজ অনেকে সেসব ভুলে গেছেন। তাই বারবার এ কথাগুলো বলা উচিত। কয়েকটি উদাহরণ দিই :

১. ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক জুরি সম্মেলন রায় দিয়েছিল, বাংলাদেশের গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি হওয়া উচিত। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৭.৯.১৯৭২)।

২. ইসলামি দেশগুলোর প্রতি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছিলেন 'ইসলামের নামে গণহত্যা দেখিয়া যান'। (ঐ, ২৬.২.৭২)।

৩. সরকার গঠন করে গণহত্যা তদন্ত কমিশন। ৫.৪.৭২

৪. ড. কামাল হোসেন ঘোষণা করেছিলেন, গণহত্যার বিচার বাংলাদেশেই হবে।

১৯৭২ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত দালাল, আলবদর, যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচার সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলো বর্তমান প্রজন্মের অনেককে আগ্রহান্বিত ও বিস্মিত করতে পারে। গত দু'দশকে এক ধরনের প্রচারণা চালানো হয়েছে, যার মূল কথা হলো– দালাল, আলবদরদের গ্রেপ্তারে তৎকালীন সরকার শৈথিল্য প্রকাশ করেছে, তারা দণ্ডিত হয়নি এবং তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে যেহেতু এখন এক ধরনের রাজনীতি চলছে এবং এখনো আলোচিত, তাই সে সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করবো, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রসঙ্গটি।

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালেই বুদ্ধিজীবী হত্যার দাবি করা হয়েছে। উল্লিখিত পত্রিকাগুলোর পাতা উল্টালেই এ বক্তব্যের সত্যতা মিলবে। শুধু তা-ই নয়, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল 'চারুকলা ও সাহিত্য সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করা হবে।' তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, হত্যার বিচার হবে। বঙ্গবন্ধুও তো স্বপ্ন দেখেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কিছুই হয়নি।

বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জোরালো হয়ে উঠলে ২৫ ডিসেম্বর (১৯৭১) দৈনিক বাংলা লিখেছিল।

'আলবদর বাহিনীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিকে সরকারের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তাদের তদন্তের ভিত্তিতেই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পশুদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেনেভা কনভেনশনের অছিলায় যাতে তারা নিষ্কৃতি না পায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যদি সব দুর্বৃত্ত রেহাই পেয়ে যায়, তবে এদেশের নিহত নিরপরাধীদের আত্মা কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না।' অবশেষে বুদ্ধিজীবীরা নিজেই তদন্ত কমিশন গঠন করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির আশ্বাসে কাজ শুরু করেন। কমিটির আহ্বায়ক জহির রায়হান নিজেই এরপর নিখোঁজ হয়ে যান।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবি করে '৭২ সালের ১৭ মার্চ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ শহীদ মিনারে গণজমায়েত করেন। এরপর মিছিল করে বঙ্গভবনে যান। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন। পরে মিছিলকারীরা বঙ্গভবনের ফটকে অবরোধ করে বসে পড়লে অনেকক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিছিলকারীদের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। পরে তিনি জানান, তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে। ইতোপূর্বে ৮ ফেব্রুয়ারি জহির রায়হানের অর্ন্তধানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিন সপ্তাহের ভেতর তাকে রিপোর্ট করা হবে। সেই তদন্তের ফলাফল দেশবাসী কখনো জানতে পারেননি।

সংবাদ থেকে জানতে পারি, ১৯৭২ সালে ড. আজাদকে হত্যার দায়ে দু'জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর এ মামলার কী হলো, তা জানি না। ড. আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী হিসেবে আলবদর আবদুল মান্নানকে (বর্তমানে 'মওলানা' ও ইনকিলাবের মালিক) ধরা হয়েছিল। সেও ছাড়া পেয়ে যায়। শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত খালেক মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইবুনাল জজ ৭ বছরের কারাদণ্ড দেন। হাইকোর্ট সে রায় বাতিল করেন।

মনে হয় বিচারকরা সব স্বর্গে ছিলেন। যেখানে জামায়াতে ইসলামী চোখের সামনে এত বড় হত্যাকাণ্ড ঘটালো, সেখানে কি ইমপ্রেশন হবে আওয়ামী লীগ দায়ী ছিল? বিচারকরা অবসর নেয়ার পর আজকাল অনেক উপদেশ দেন। বদরুল হায়দারও দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, এই বিচারক প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের কাছে দোয়া মাগুতে গিয়েছিলেন। একই ধরনের আর্গুমেন্টে গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। এতে যে ন্যাচারাল জাস্টিস লঙ্ঘিত হয়েছে তা কারো মনে হয়নি। আমরা এগুলো মেনে নিয়েছি, কারণ আমরা সেই আইনের ফ্রেমে বাস করি। কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় শুধু আমরা উল্লেখ করতে চাই– বাংলাদেশে যত বিতর্কমূলক নির্বাচন হয়েছে, তার প্রতিটির প্রধান (নির্বাচন কমিশন) ছিলেন একজন বিচারপতি। বাংলাদেশে যতগুলো অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রতিটির প্রধান ছিলেন একজন বিচারপতি। ১৯৭৮ সালের এক রায়ে বিচারপতিরা রায় দিয়েছিলেন সামরিক আইন সংবিধানের ওপর। অথচ পৃথিবীতে

সামরিক আইন জঙ্গি আইন হিসেবে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলাভাষা রাষ্ট্রে ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সব কাজ কর্ম ওই ভাষায় সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া হয়। অধিকাংশ বিচারপতি সেই আইন না মেনে ইরেজিতে রায় লিখেছেন।

১৯৭৫ এর পর থেকে বুদ্ধিজীবী হত্যা তথা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়ে যায়। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটি তারপর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের দাবি তোলে এবং সে দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। তখন শেখ হাসিনাও এ দাবি সমর্থন করেন। সে দাবি থেকে আমরা এখনো সরিনি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পর আবার এ দাবি জোরদার হয়ে উঠছে। অনেকে শহীদ পরিবারের সদস্যদের বলছেন মামলা দায়ের করতে। আমরা এর বিরোধী। কারণ বিষয় দু'টি আলাদা।

বুদ্ধিজীবীদের যারা হত্যা করেছে, তারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। বর্তমান বিশ্বে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কোনো দেশের মধ্যে সীমিত রাখা যাচ্ছে না। চিলির একনায়ক পিনোশের ঘটনা এর উদাহরণ। প্রচলিত আইনে এই বিচার সম্ভব নয়। কারণ 'মওলানা' আবদুল মান্নান যদি বলেন, ডা. আবদুল আলীমকে তিনি হত্যা করেননি, তখন আর এর প্রমাণ কী হবে? বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে হত্যার কথা স্বীকার করেছিল। মান্নানরা তো তা করেননি। বিচারক বলতে পারেন, সংগৃহীত প্রমাণ যথেষ্ট নয়। যদিও আমরা জানি, তৎকালীন কাগজপত্রে তা উল্লিখিত হয়েছে। এ ধরনের বিচারের জন্য সবসময় স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করা হয়। তাই সরকারকে এটা করতে হবে এবং সরকারকে বাদী হতে হবে। শহীদ পরিবারগুলো আজ নিঃস্ব। জীবন ধারণই তাদের জন্য কষ্টকর। বছরের পর বছর তারা মামলা লড়বেন কীভাবে? সংবিধানে কিন্তু স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠনের ব্যবস্থা আছে।

বিএনপি বলে, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দল। এরশাদ বলেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধা। আওয়ামী লীগ বলে, তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল। সুতরাং তিন পক্ষই তো সংসদে বিষয়টি তুলে স্পেশাল ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করলে তো এমনটিই হওয়া উচিত। আর খুনের মামলা বা খুনের বিষয় কখনো তামাদি হয় না। সব রাজনৈতিক খুনের বিচার সব দল দাবি করছে। বাংলাদেশের উজ্জ্বল সন্তানদের ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা কি রাজনৈতিক হত্যা নয়?

মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং অন্যান্য স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠন যে শুধু পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তা-ই নয়,তারা গণহত্যা, ধর্ষণ, লুট এবং অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সফল যুদ্ধ শেষে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল, যুদ্ধ শেষে অনেকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেকের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ এনেছে; অনেকে শাস্তির ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এসব অভিঘাত সৃষ্টি করলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর। সরকার অবশ্য চেয়েছে পাকিস্তানি দালালাদের বিরুদ্ধে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি সরকার ঘোষণা করে 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ, ১৯৭২। এ

আইনে শাস্তির মেয়াদ ছিল দু'বছর থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। এ ধরনের আইনের যে প্রয়োজন ছিল শুধু তা-ই নয়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্যও প্রয়োজন ছিল এর যথাযথ প্রয়োগ। ২৮ মার্চ সারা দেশে দালাল বিচারের জন্য গঠন করা হলো ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল। কিন্তু এ আইনে একটি ফাঁক ছিল। সপ্তম ধারায় বলা হয়েছিল 'থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি যদি কোনো অপরাধকে অপরাধ না বলেন, তবে অন্য কারো কথা বিশ্বাস করা হবে না। অন্য কারো অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার হবে না ট্রাইব্যুনালে। অন্য কোনো আদালতে মামলা দায়ের করা হবে না।'

১৯৭৩ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এই অধ্যাদেশ বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ৩৭ হাজার ৪৭১ জনকে। মামলা নিষ্পত্তি হয়েছিল ২ হাজার ৮৪৮ জনের। দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল মাত্র ৭৫২ জন। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

এই সাধারণ ক্ষমা সমাজে এমন অভিঘাত হানবে, যা বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দেবে, তা যদি ওই সময় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতেন, তাহলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার আগে তাদের চিন্তা করতে হতো। এখনো বাঙালি জাতিকে এই সাধারণ ক্ষমা নিয়ে তর্ক করতে হচ্ছে। শেখ মুজিব ও তার সরকার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তিনি বা তারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি এবং মানুষকে কী যাতনার মধ্যে থাকতে হয়েছে, তাও তারা অনুধাবন করেননি। করলে তাদের পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব হতো না। যেমনটি বলেছেন শহীদ সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার : 'আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোনো নেতা যুদ্ধে আপনজন হারাননি। ফলে স্বজন হারানোর ব্যথা তাদের জানা ছিল না। ঘাতকদের তারা সহজেই ক্ষমা করে দিতে পেরেছিলেন।' অন্যদিকে এ পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের বক্তব্য, যা শেখ হাসিনা বলেছিলেন জাতীয় সংসদে। 'সেই সময় প্রায় ৪ লাখ বাঙালি পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় ছিল। তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্য রাস্তায় নেমেছিল, বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল। আমাদের কাছে এসেও তাদের আত্মীয়স্বজন অনেকে কান্নাকাটি করেছেন। এরকম একটা অবস্থায় সেইসব বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্যই এই Clcmency (ক্ষমা) দেয়া হয়েছিল। (মুক্তিযুদ্ধে) অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাড়ির একজনকে কোনো একটা পদে রেখে সেই বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এ ধরনের যেসব কেস ছিল, যারা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেই বঙ্গবন্ধু সাধারণ 'ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধাপরাধী, বিশেষ করে যারা গণহত্যা চালিয়েছে, যারা লুটতরাজ করেছে, যারা নারী ধর্ষণ করেছে, যারা অগ্নিসংযোগ করেছে, তাদেরকে কিন্তু ক্ষমা করা হয়নি।'

এ বিষয়গুলোই বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকা উল্টালে প্রায় প্রতিদিন চোখে পড়বে দালাল-আলবদরদের গ্রেপ্তারের এবং তাদের বিচারের খবর। দেখা যাবে বিচারে অনেক কারাদণ্ড, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হচ্ছে।

২৬.১.০৪

আক্রান্ত হুমায়ুন আজাদ : বিপন্ন মুক্তচিন্তা

গত এক সপ্তাহের দেশের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার হয়ে উঠবে মানুষ হিসেবে আমরা কীরকম? গত ছয়-সাতশ' বছরের ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছি, আমাদের সম্পর্কে, বিশেষ করে এ ভূখণ্ডের মানুষ সম্পর্কে কোথাও কোনো ভালো মন্তব্য নেই। যেসব বিবরণ আছে, তাতে সবখানে বাঙালি সম্পর্কে নিন্দাসূচক মন্তব্যই করা হয়েছে। বাঙালি কলহপ্রিয়, অমানবিক, কৃতঘ্ন, বোধহীন, সংকীর্ণমনা, কপমণ্ডূক। একমাত্র ব্যতিক্রম ১৯৭১। এ সময়ের বিবরণেই আমরা শুধু পাই এসব বিশেষণ অতিক্রম করার কথা। শুধু এটুকুই আশার আলো, ওই সময়টুকুই। তারপরই আমরা আবার পুরনো চরিত্রে ফিরে গেছি। সাম্প্রতিক ইতিহাস তার প্রমাণ। পৃথিবীর কোনো দেশ থেকে কি এ নজির দেখাতে পারবেন যে, যার নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাকেই ইতিহাস থেকে খারিজ করার অপচেষ্টা হয়েছে এবং হচ্ছে? এবং এদেশের এক-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ যে প্রচেস্টার সঙ্গে জড়িত।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন্ মানুষের কথা বলছি? প্রায় সব পর্যায়ের সব ধরনের মানুষ। দারিদ্র্যপীড়িত অধিকাংশ মানুষের কথা বাদ দিই। এদের ওপরে যারা আছেন, ছোটখাটো ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ পেশার মানুষজন, তাদের বোধবুদ্ধির ওপরও আস্থা রাখা দায়। কাগজে-কলমে অনেকে শিক্ষিত, কিন্তু মানসিক দিক থেকে অশিক্ষিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, যাদের অনেককে আমরা আধুনিক মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করি, খোঁচা দিলে দেখবেন, গলগল করে পুঁজের মতো বেরুচ্ছে যুক্তিহীনতা, ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা, অমানবিকতা, কৃতঘ্নতা।

পত্রপত্রিকায়, রাজনীতিতে আমরা যাদের গণ্য করি, তারা এলিট সমাজের। এরা বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ করে। আগেও করতো। তবে আগে এ সমাজে কিছু মানবিক উপাদান খুঁজে পাওয়া যেতো, এখন তা অনুপস্থিত। মোটা দাগে যদি ভাগ করি তাহলে বলতে হবে, এলিট সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ডানপন্থার প্রভাবে আচ্ছন্ন, যার মূল উপাদান, স্বার্থ বা সুবিধাবাদ। এজন্য যুক্তিহীনতা গ্রহণ করতে, মিথ্যা বলতে, কৃতঘ্ন হতে, অমানবিকতা প্রদর্শন করতে, ভণ্ডামি করতে তাদের আপত্তি নেই। বর্তমান বাংলাদেশ তার প্রমাণ। পৃথিবীর সব দেশেই রক্ষণশীল, ডানপন্থার মানুষ আছেন। তবে যে উপাদানগুলোর কথা উল্লেখ করলাম, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সেখানে অনুপস্থিত। এবং এ কারণেই অনেক আগেই কবিকে লিখতে হয়েছিল, বাঙালি করেছো মানুষ করোনি।

এলিট সমাজের একটি অংশ মধ্যপন্থী, লিবারেল, যুক্তিবাদী। এ মধ্যপন্থার মধ্যেও মৃদু ডানপন্থার ঝোঁক লক্ষণীয়। অনেক লিবারেলকে দেখবেন, সারাজীবন সেক্যুলার

পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে তরক্কি করেছেন, পুত্রকন্যাদের অবস্থান বিদেশে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে তিনি গ্রামে একটি মাদ্রাসা বা মসজিদ করছেন। যে মক্তবে তিনি নিজে পড়েননি, পুত্র-কন্যাদের পড়াননি, মসজিদেও গেছেন কি-না সন্দেহ। ক'জন বাঙালি ধনাঢ্যকে দেখেছেন জনকল্যাণ বা শিক্ষামূলক ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশন গঠন করতে? প্রান্তিকে অবস্থান বাম বা মৃদু বাম।

রাজনৈতিক দলগুলো এসব মানুষকেই প্রতিনিধিত্ব করে। রাজনৈতিকভাবে ডান-এর প্রতিনিধিত্ব করছে বিএনপি-জামায়াত-জাতীয় পার্টি প্রভৃতি। এর সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দল। মধ্যপন্থাকে প্রতিনিধিত্ব করছে আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী পার্টি, গণফোরাম প্রভৃতি। কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ প্রভৃতি প্রতিনিধিত্ব করছে মৃদু বাম বা বাম ধারাকে। আমার এ বিশ্লেষণের সঙ্গে অনেকে একমত হবেন না, বরং ক্রুদ্ধও হতে পারেন যদি আমি বলি, অন্তিমে কখনো না কখনো এদের মধ্যেও দেখা যায় ডানের প্রতি ঝোঁক। আওয়ামী লীগ কখনো কখনো ইসলামের ঝাণ্ডাবাহক হয়ে ওঠে, কমিউনিস্ট পার্টি জেনারেল জিয়াকে সমর্থন করে, জাসদ বিভিন্ন সময়ে জেনারেলদের সঙ্গে থেকেছে বা নমনীয় হয়েছে, ওয়ার্কার্স পার্টি আবদুর রহমান বিশ্বাসকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সমর্থন করেছে। সম্পূর্ণ বাঙালি চরিত্র রাজনৈতিক দলগুলোতে এভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে।

গত এক সপ্তাহের ঘটনা কী? অধ্যাপক-লেখক হুমায়ুন আজাদের মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি। ২৮ ফেব্রুয়ারি ছিল হরতাল। যারা এ হত্যা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল, তারা এটি ২৫ বা ২৬ তারিখেও করতে পারতো। কিন্তু করেনি, ঘটনা ঘটিয়েছে ঠিক আওয়ামী লীগ আহূত হরতালের আগের দিন। যেভাবে হত্যার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, তা একটি বিশেষ দলের ট্রেডমার্ক। জামায়াত/শিবির মানুষ হত্যার সময় চাপাতি ব্যবহার করে। এর সঙ্গে তারা জবেহ-এর একটা সাদৃশ্য খোঁজে। তারা মনে করে, ধর্মের নামে 'মুরতাদ' বা 'কাফের' হত্যা করছে। সুতরাং বেহেশতে তার জন্য অপেক্ষা করছে অসংখ্য হুরী। জামায়াতিরা যত খুন করেছে, সবখানেই এ ট্রেডমার্ক লক্ষণীয়। জখম যখন করে, তখন তারা রগ কর্তন করে।

২৭ তারিখের কথা বলছিলাম। ২৮ তারিখ ছিল হরতাল। বেগম জিয়া ২৮ তারিখে মৃদু হেসে বললেন, হরতালের সাফল্যের জন্য আওয়ামী লীগ এ কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। এ ঘোষণার পর পুলিশ গ্রেপ্তার করে ছাত্রলীগের এক কর্মীকে। আলতাফ চৌধুরীর খাসবরদাররা তাকে রিমান্ডে পাঠিয়েছে। উল্লেখ্য, ড. আজাদ ও শেখ হাসিনা দু'জনেই বাংলার ছাত্র। কখনো কখনো শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ অধ্যাপক আজাদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু এ মেলায় সেই ড. আজাদই শেখ হাসিনার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছেন, কোনো মন্ত্রী বা অন্য কোনো রাজনীতিবিদের নয়। প্রবল যুক্তিবাদী ও উন্নাসিক ড. আজাদ তাহলে শেখ হাসিনার মধ্যে ইতিবাচক কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন।

এর পরের ঘটনা আরো নাটকীয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানে কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদার শেখ হাসিনা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে অধ্যাপক আজাদকে দেখতে রওনা হয়েছিলেন। তার গাড়ি আটকে দেয়া হয় ক্যান্টনমেন্টের ফটকে। তিনি হেঁটে রওনা হন।

পথিমধ্যে এবং হাসপাতালের ফটকে তাকে যতটা সম্ভব অপমান করে সিপাহী সান্ত্রীরা। সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সর্বাধিনায়ককেও তারা আটকে দেয়। আরো অনেক সাবেক মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদেরও। আলতাফ হোসেন চৌধুরী নামে একজন লোক আছেন সরকারে, যাকে সংসদে তার দলের সংসদ সদস্যই আখ্যা দেন 'স্টুপিড' হিসেবে, তিনি তারস্বরে সংসদে ও সংসদের বাইরে বলতে থাকেন, হরতালকারী বা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তার নির্দেশে পুলিশ যে স্যাডিস্ট আচরণ করছে, তাতে সেই বাক্যটিরই পুনরাবৃত্তি করতে হয়-পুলিশ ও মানুষে পার্থক্য আছে।

বস্তুত এলিট সমাজ ও সাধারণ মানুষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একভাগে মধ্যপন্থা, লিবারেল, মৃদু বামের সমর্থকরা; অন্যদিকে আন্দোলনবিনাশী, ধর্মব্যবসায়ী ও স্বৈরাচারের সমর্থকরা। অধ্যাপক আজাদের বিষয়টি এমন হতে পারতো যে, তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ, তাকে বিনাশের চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং আসুন, সবাই মিলে হত্যাকারীকে ধরার চেষ্টা করি ও কঠোর শাস্তি দিই। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ কি তা-ই বলে? বলে না, কেন বলে না,তার কারণ আগেই উল্লেখ করেছি।

মিডিয়ার ভূমিকা পর্যালোচনা করা যাক। সংবাদপত্রের অধিকাংশ মালিক বিএনপি বা ডানপন্থী। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে এরা। গত তিন বছরে তারা কি জোট সরকারের কর্মকাণ্ডগুলো ছাপেনি? ছেপেছে, কিন্তু কাগজগুলো পাশাপাশি রাখলে দেখবেন কে কীরকম ট্রিটমেন্ট দিয়েছে। হুমায়ুন আজাদের ক্ষেত্রে ২৮ তারিখ সবগুলো কাগজ একরকম ট্রিটমেন্ট দিতে বাধ্য হয়েছে। তারপর যখন তাকে হত্যার প্রচেষ্টা চলমান আন্দোলনে নতুন মাত্রা প্রদান করলো, তখন কিন্তু অনেক কাগজের ধরন বদলে গেল। একটি উদাহরণ দিই। সিভিল সমাজের ৭১ জন হুমায়ুন আজাদকে হত্যার প্রচেষ্টার প্রতিবাদে ৬ তারিখের হরতাল সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। সে বিবৃতিটি ছেপেছে মাত্র জনকণ্ঠ ও ভোরের কাগজ। আর কেউ নয়। কারণ জামায়াত-বিএনপি এখন হরতালের বিরুদ্ধে। অনেক কাগজে কলামিস্টরা লিখছেন, এ হত্যা প্রচেস্টার জন্য মৌলবাদীদের প্রমাণ ছাড়া অভিযুক্ত করা ঠিক নয়। বা আওয়ামী লীগ আমলে উদীচীর সভায় বোমা বিস্ফোরণের জন্য তরিকুল ইসলামকে জড়ানো হয়েছিল, যা ঠিক ছিল না। বিভিন্ন প্রাইভেট চ্যানেলে আন্দোলন বিষয়ে সংবাদগুলো যাচ্ছে বটে, কিন্তু অনেকে আক্রমণকারী ছাত্রদলের নাম বলতে ভুলে যায়, তাদের অ্যাকশনের ছবি তুলতে পারে না, আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ চলে যায় খেলার খবরের আগে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ আমলে তো তারা এ ধরনের ভুল করতো না বা শেখ হাসিনার খবরও তেমন গুরুত্ব দেয়নি। যেমনটি দিচ্ছে এখন খালেদা জিয়াকে। যে ইটিভির কথা শুনলে অনেক উদারপন্থীর চোখ সজল হয়ে ওঠে, সেই ইটিভিও কি গুরুত্ব দিয়েছিল মধ্যপন্থার রাজনীতিকে? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তারা কাকে গুরুত্ব দিয়েছিল? তাদের প্রফেশনাল এক্সেলেন্সের কারণে তা ধরা ছিল অসম্ভব। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে বলতে হয়, আওয়ামী লীগ আমলে গণতন্ত্র ছিল, এ আমলে নেই। না হলে, তারা আমাদের পর্যবেক্ষণের নির্ভুলতার প্রমাণ। আমরা ভুলে যাই, মধ্যপন্থার

অনেক সমর্থকও, এসব মাধ্যমের মালিক কারা, কাদের লেখা তারা গুরুত্ব দিয়ে ছাপে, কাকে তারা গুরুত্ব দেয়। এভাবে ডান মানসিকতার প্রভাব ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

একটা কথা সবাই বলে থাকেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রাজনৈতিক নির্দেশনায় চলে। এর খানিকটা সত্য, খানকটা মিথ্যা। মুক্তিযুদ্ধের পর মনে করা হয়েছিল সেনা ও পুলিশদের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন হবে। এখন দেখা যাচ্ছে, তারা পাকিদের থেকেও পাকি। রণহুঙ্কার জয় বাংলার বদলে প্রথমেই তারা বেছে নেয় পাকিদের আল্লাহু আকবর। যেন মুক্তিযুদ্ধের সময় আল্লাহ আমাদের ত্যাগ করেছিলেন। যাক, যা বলছিলাম। সেনাদের কথা ধরা যাক। যে দু'জন প্রেসিডেন্টকে তারা হত্যা করেছিল, তার পেছনে কি কোনো রাজনৈতিক নির্দেশ ছিল? বা দু'জন জেনারেলকে তারা দীর্ঘদিন যে ক্ষমতায় বসিয়ে রেখেছিল, তা কোনো রাজনৈতিক নির্দেশে? গত ২০ বছরে অজস্র ক্যু, প্রচুর সহযোগী হত্যার পেছনে কোনো বৈধ আইনগত রাজনৈতিক নির্দেশ ছিল? তারা তাদের সুবিধা অনুযায়ী রাজনৈতিক নির্দেশ মানে, মানে না। এদের আচরণ সবসময় উদ্ধত। আর ক্যান্টনমেন্ট শহরের মধ্যে হওয়ায় কারণ-অকারণে সেনাদের সঙ্গে মানুষের বিরোধ বাড়ছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে এটিকে শহরের বাইরে সরিয়ে নেয়া আবশ্যক। শেখ হাসিনাকে শুধু ক্যান্টনমেন্টে অপমান করা হয়নি, তার বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়েছে। তাকে অপমান মানে সিভিল সমাজকে অপমান। যদি সেনারা সিভিল সমাজের সঙ্গে বিরোধে-সংঘর্ষে যেতে চায়, আপত্তি নেই। গুলি, হত্যা এগুলো তাদের ট্রেডমার্ক বটে, তবে আমরা জানতে চাই প্রতিটি সেনার মা-বাবা, ভাইবোন, ছেলেমেয়েরাও সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে কি-না, না, তারা গ্রাম-গঞ্জে, শহরে-নগরে থাকে?

বিভিন্ন আমলে এমনকি আওয়ামী লীগ আমলেও রাজনৈতিক নেতাদের ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে যেতে বাধা দেয়া হয়েছে [বহু বেহায়া সিভিলিয়ান সেনাকুঞ্জে অনুষ্ঠান করতে গর্ববোধ করেন]। আমরা এর প্রতিবাদ তখনো করেছি। রাজনৈতিক নির্দেশে যদি তা করা হয়ে থাকে, তবে রাজনীতিবিদরা নিজেদের খুব ছোট করেছেন। কিন্তু মানুষের কাছে প্রতিভাত হয় যে, এ কাজটি সেনাবাহিনী আক্রোশবশত করেছে, ফলে সিভিল সমাজে তারা পরিচিত হয়ে উঠেছে অস্ত্রধারী, জোর-জবরদস্তকারী হিসেবে। এ বিষয়টি এখন আরো গুরুত্ব পাচ্ছে এ কারণে যে, বেগম জিয়ার পরিবার সেখানে থেকে দু'দশক ধরে নির্বিবাদে রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন কারো মনে এ প্রশ্ন ওঠে না। অন্যদের বেলায় প্রশ্ন ওঠে যে, এই বিষয়টির সঙ্গে নৈতিকতার প্রশ্নও জড়িত। সাবেক সচিব বোরহানউদ্দিন আহমদ তার গ্রন্থে লিখেছেন, 'জেনারেল জিয়াউর রহমান নিহত হলে তার স্ত্রী খালেদা জিয়াকেও অনুরূপভাবে গুলশানের এক পরিত্যক্ত বাড়ি হস্তান্তর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী সংসদে এক বিবৃতিতে বলেন যে, ওই বাড়ি তাকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তিনি স্বেচ্ছায় ক্যানটনমেন্টে ডেপুটি সেনাপ্রধানের সরকারি বাসস্থান, যেটা জেনারেল জিয়াউর রহমান শেষ অবধি ব্যবহার করেছিলেন, ফেরত প্রদান করেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানের হত্যার পর ওই সরকারি ভবনের মালিকানা নিষ্ঠুর আঘাতপ্রাপ্ত খালেদা জিয়ার অনুকূলে তড়িঘড়ি করে বরাদ্দ করা হয় তাকে প্রশমিত

করার জন্য। অনুরূপভাবে তার দুই ছেলের শিক্ষার জন্য ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত সরকারি খরচে স্বদেশ এবং বিদেশে অর্থের সংস্থান করা হয়। খালেদা জিয়া বর্তমানে সেই বাড়িটিতেই বসবাস করেন।' তাদের শিক্ষা কী হয়েছে জানি না, তবে শুনতে পাই কোটি কোটি টাকা হয়েছে।

পুলিশ সব আমলে 'উচ্চ মহলের নির্দেশে' মানুষ পিটিয়েছে। আর আমরা সবসময় এর প্রতিবাদ করেছি এবং করতে করতে ক্লান্ত। রাজনীতিবিদরা কখনো এ বিষয়টি আমলে আনেননি। মতিয়া চৌধুরী তো জানেন পুলিশ কী, অন্যরা না জানলেও। সরকারের প্রভাবশালী নীতিনির্ধারক থাকার সময় কি এদের মনুষ্য পর্যায়ভুক্ত করার জন্য কোনো প্রস্তাব রেখেছিলেন? তবে গত তিন বছরে উচ্চ মহলের নির্দেশের সঙ্গে আদর্শগত উপাদান যুক্ত হয়েছে। সাবেক মন্ত্রী-রাজনীতিবিদদের পেটানোর সময় 'শালাদের পেটা' বা সেদিন কার্জন হলে ছাত্রছাত্রীদের ওপর 'শুয়ারের বাচ্চাদের পেটা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়া-একটি বিশেষ আদর্শের কথাই বলে। আমার এক ছাত্র সেদিন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল: 'স্যার, আমি সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চাই, যেদিন এদের ছেলেমেয়েদেরও এভাবে পেটানো হবে।' মনে রাখতে হবে, পুলিশের দুই শীর্ষ কর্মকর্তা ১৯৭১ সালে পাকিদের সহযোগী ছিলেন সেনা হিসেবে। অবসর থেকে টেনে তাদের উচ্চপদে বসানো হয়েছে। টিআইবি বলেছে, ৯৮ ভাগ লোক পুলিশের ওপর অসন্তুষ্ট। কারণ তাদের জোর-জবরদস্তি করে ঘুষ নেয়া, সোজা ভাষায় যাকে বলে চুরি। এখন এসব ঘুষখোর জুলুমবাজ অশিক্ষিত 'লোক'দের হাতে প্রহৃত হচ্ছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, এলিট-নন এলিট সব এবং কাজটি হচ্ছে জামায়াত-বিএনপির নির্দেশে।

একটি কথা এখন চালু হয়ে গেছে যা শুভ নয়, তাহলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্ক না রাখা শ্রেয়। এক সহকর্মী আমায় সেদিন বলেছিলেন, আমার কোনো ছেলে মেয়ে যদি এদের পরিবারে বিয়ে করতে চায় তবে আমি তাদের ত্যাগ করবো।

জামায়াত মনে করেছিল, হুমায়ুন আজাদকে হত্যা করতে পারলে বুদ্ধিজীবী সমাজকে শিক্ষা দেয়া যাবে। বিএনপি ভেবেছিল, হত্যাকারীদের রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব। কারণ জামায়াত বিএনপিরই অঙ্গসংগঠন বা পরস্পরের। তাছাড়া সিভিল সমাজ এতে এতো ভীত হবে যে, জামায়াত-বিএনপির বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটি করবে না। কিন্তু হুমায়ুন আজাদকে কেন্দ্র করে যে সিভিল সমাজে মেরুকরণ ও র‍্যাডিক্যালাইজেশন হবে, তা তারা হিসাবের মধ্যে আনেনি। বহুদিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা গেল তরুণরা সমবেত হচ্ছে প্রতিবাদ জানানোর জন্য। শিক্ষকরাও নেমেছেন। ৬ তারিখে হরতালকে সমর্থন করেছে আরো কিছু দল। ছাত্রদল ও পুলিশরা ছাত্রছাত্রীদের ওপর জুলুম করলেও তারা রাস্তা ছাড়ছে না। বহুদিন পর সাংস্কৃতিক জোটের নেতাদের এখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছে। এর একটি কারণ, আওয়ামী লীগ ভয়ের বেড়া ভেঙে এখন রাস্তায়। এতে জোট খানিকটা হতচকিত হয়ে গেলেও তারাও তাদের অভিভাবক/শিক্ষকও তাতে সুর মেলাচ্ছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ৪০/৪৫ দিন, জামায়াত-বিএনপিপন্থী উপাচার্য আনোয়ার

উল্লাহ চৌধুরীর অপসারণের জন্যও ৪০/৪৫ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। তখন কেউ এ প্রশ্ন ওঠায়নি। ড. আজাদকে হত্যার প্ররোচনাকারী হিসেবে পরিচিত যুদ্ধাপরাধী সাঈদী বলছে, যারা তাকে অভিযুক্ত করছে তারা জ্ঞানপাপী। খয়রাতি সাহায্যে জীবনযাপনকারী চরের পীর বলেছে, হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে সেক্যুলাররা ইসলামি রাষ্ট্র ধ্বংস করে বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য করতে চায়। হুমায়ুন আজাদের হত্যা চেষ্টার পর চাপাতি উদ্ধার করে ছাত্ররা। তারপরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিহত এক পাতি জামায়াতি নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। থানার ওসিকে ক্লোজ করা হয়। সুতরাং কী হচ্ছে দেশে, তা আঙুল দিয়ে বোঝানোর দরকার হয় না।

এখন অনেকে ধুয়া তুলছেন, হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। ঘটনা অন্যখাতে প্রবাহিত হচ্ছে। ছাত্রদের এক বক্তৃতায়ও শুনলাম বলা হচ্ছে, এ মঞ্চে রাজনীতি আনবেন না। হুমায়ুন আজাদকে হত্যার প্রচেষ্টা কি পারিবারিক বিরোধ না রাজনীতি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও এ ধরনের বিবৃতি দিচ্ছেন। স্টাবলিশমেন্টের কাগজ হিসেবে পরিচিত নয় এমন কাগজেও 'নিরপেক্ষ' বুদ্ধিজীবীদের 'নিরপেক্ষ' লেখা ছাপা হচ্ছে। এরা জামায়াত-বিএনপির দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করছে বলে জানবেন। একজন হুমায়ূন আহমেদ বা একজন এমাজউদ্দিন আহমদের মধ্যে কী পার্থক্য করবেন, যেখানে দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত-বিএনপি দলের পত্তন, সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে পেছনে ঠেলে দিয়েছেন? বা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বা মনিরুজ্জামান মিয়ার মধ্যে পার্থক্য কী, যখন তারা দু'জনেই ওই একই কাজ করেছেন? হুমায়ুন আজাদের হত্যার চেষ্টার দায়-দায়িত্ব পরোক্ষভাবে হলেও তাদের ওপর বর্তায়।

হুমায়ুন আজাদের ঘটনার পর সিভিল সমাজের মধ্যপন্থীদের চাপে সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ৬ মার্চের হরতাল ডাকতে বাধ্য হয়েছে। তারা বিকল্প/তৃতীয় ধারা, চতুর্থ ধারা খোঁজেন আপত্তি নেই। তবে মনে রাখতে হবে, এখন বিএনপি-জামায়াত, সেনা-পুলিশ এক ফ্রন্ট হয়ে গেছে। অন্য ফ্রন্টে আছে আওয়ামী লীগ। জোটের দ্বিতীয় ফ্রন্টে আছে বিভিন্ন ইসলামি দল, মাইক্রোস্কোপিক কিছু দল ও 'নিরপেক্ষ'রা। তৃতীয় ধারা তখনই বলবৎ হতে পারে, যদি বর্তমান ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে রক্ষা পান। মানুষ নিষ্পেষিত হবে আর তৃতীয় ধারা খোঁজার জন্য তারা ব্যাকুল থাকবেন আর পাবলিকের সমর্থন পাবেন, এটা বোধহয় হবে না। জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম 'আওয়ামীতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে না চান ভালো কথা, কিন্তু সেটা ঠেকাবার মতো ক্ষমতা তার থাকা চাই। ছোট ছোট দলের বড় বড় কথা আমরা অনেক শুনেছি। এবার যদি তারা আন্দোলনের বিকল্প খুঁজতে থাকেন, তারা বঙ্গবন্ধু এভিনিউ আর পল্টন অফিসেই থাকবেন। যারা আন্দোলন করছে তারা এগোবেই। দক্ষিণপন্থার সমর্থক অনেকেও বাধ্য হয়ে আন্দোলনে যোগ দেবে। কারণ তাদের সমর্থনে লিডাররা বাংলাদেশ প্রায় ভক্ষণ করে ফেলেছে। তাদের ভক্ষণ দূরে থাক, চাল-ডাল কেনাও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। পেটের দায়েই তারা আন্দোলনে আসবে এবং এটাও অবধারিত সত্য, যখন পেটে দানাপানি পড়বে তখন তারা আবার পুরনো ধান্দায় ফিরে যাবে।

বর্তমান অবস্থাটা আরেকবার দেখুন। হুমায়ুন আজাদকে হত্যার প্রচেষ্টা-বিপরীতে জামায়াতি এমপি পদপ্রার্থী খুন। পুলিশ কর্তৃক নিরীহ-নিরপরাধ ছাত্রী প্রহার- বিপরীতে খুলনায় পুলিশের প্রতি গ্রেনেড নিক্ষেপ, খুলনার জামায়াতি-বিএনপি মেয়রের প্রতি গ্রেনেড নিক্ষেপ-বিপরীতে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য তালুকদার খালেকের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ। এ অবস্থা আরো হিংসাত্মক হয়ে উঠবে। শোনা যাচ্ছে, জোটের অনেকে মনে করছে, শ'দুয়েক মানুষ মেরে ফেললে কী আর হবে। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। সুহার্তো এক লাখ হত্যা করে ৩০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। খালেদা-নিজামীর যা বয়স, তাতে ৩০ বছর দরকার নেই- ১০/১৫ বছর ক্ষমতা উপভোগ করতে পারলেই হয়। কিন্তু ধানের শীষ ভক্তসুবেশী ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা, নিরপেক্ষ ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা, দক্ষিণপন্থা যদি সব গ্রাস করে নেয়, তাহলে আপনার ও আপনাদের পুত্র-কন্যাদের আর পাশ্চাত্য পোশাক পরে পাশ্চাত্যের সুবিধা গিলে থাকতে হবে না। ওই জীবন ভালোবাসলে তো তারা আফগানিস্তান, ইরাক, সুদান গিয়ে বসবাস করতো, তাতো করে না। দুই পন্থার ভারসাম্য যে দেশে নেই বা যে দেশের দক্ষিণপন্থা ভারী হয়েছে, সে রাষ্ট্রই ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

আমাদের সব গণআন্দোলন সফল করতে একজন অধ্যাপক বা একজন পেশাজীবীর রক্ত লেগেছে। রাজনীতিবিদরা আশা করি এতে অনুধাবন করবেন সমাজে একজন পেশাজীবীর গুরুত্ব, সম্মান তাদের থেকে বেশি। ফ্যাসিস্ট হটানোর বর্তমান আন্দোলন এখনই সফল হবে কি-না জানি না, তবে আমাদের আরেকবার সুযোগ এসেছে '৭১-এর মতো পরিশুদ্ধ হওয়ার। অবস্থাটা একই রকম। তখন পাকিরা ছিল ক্ষমতায়। জামায়াত ছিল সহযোগী। এখন পাকিপন্থী বিএনপি ক্ষমতায়, জামায়াত সহযোগী। তখনো সেনা ও রাজাকারদের অত্যাচারে জীবন ছিল দুঃসহ। এখনো সেনা-পুলিশের অত্যাচার সেরকম (অপারেশন ক্লিন হার্ট)।

আন্দোলনে ওঠানামা আছে। তবে এটা বুঝি, রাস্তায় যখন লোক নেমেছে, তাদের ঘরে ফেরানো কষ্ট হবে। আর খালেদা-নিজামীর প্রভু সম্রাট বুশও রাস্তায় মানুষ দেখলে কেয়ার করেন। এর উদাহরণ হাইতির প্রেসিডেন্ট অ্যারিস্টিড। বেগম জিয়ার মতো তিনিও এতদিন বলেছিলেন, দুই-তৃতীয়াংশ 'ভোটে' তিনি 'নির্বাচিত' হয়েছেন [আসলে আমেরিকা তাকে বসিয়েছিল ভোট জালে সমর্থন দিয়ে, যেমনটি বাংলাদেশে তারা করেছে। বুশের নির্বাচনে ফ্লোরিডায়ও তারা একই কাজ করেছে]। রাস্তার মানুষদের ওপর অ্যারিস্টিডের ক্যাডাররা অত্যাচার চালাচ্ছিল, খুন করছিল। একদিন সকালে যুক্তরাষ্ট্রের হেলিকপ্টার তার 'প্রাসাদে' নেমে তাকে তুলে নিয়ে চলে যায়। ডোমিনিকান রিপাবলিকে বসে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অ্যারিস্টিড এখন ক্রন্দনে রত। তার ঘরবাড়ি জনতার ক্রোধে চূর্ণ-বিচূর্ণ। অনেকে বলাবলি করছে, বাংলাদেশে পাকি ও সউদি আরবের ভিসা নেয়ার সংখ্যা নাকি ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮.৩.২০০৪

আমরাও কি কমবেশি দায়ী নই?

একটি প্রশ্ন এখন অনেকেই করে থাকেন, মুক্তিযুদ্ধের কি খুব একটা দরকার ছিল? তার পরের প্রশ্নে, যদি হয়েই থাকে তো হয়েছিল, তা নিয়ে এখন আর এত মাতামাতি কেন? এ ধরনের প্রশ্ন যারা করেন, তাদের পরের প্রশ্নটি আঁচ করে নিতে তেমন কষ্ট হয় না। পরের প্রশ্নের ধরনটা হয় এরকম, এতদিন পর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ করা কি ঠিক? এতে তো দেশের মানুষই বিভক্ত হয়ে যায়। এতে দেশেরই ক্ষতি।

এসব প্রশ্নের উত্তর অনেকভাবেই দেয়া যায়। তবে একটা সোজা উত্তর হয়তো হতে পারে, ১৯৭১ সালেও অনেকে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল। তাদের উত্তরসূরিদের এখনো বাংলাদেশের পক্ষে থাকার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশে থাকতে হয় বলে তারা আছেন। অথবা, একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন তা ব্যবহার করছেন। ক্ষমতা থাকলে তারা আজ পাকিস্তানের ফ্রেমে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে দ্বিধা করতেন না।

মুক্তিযুদ্ধের এই যে অবমূল্যায়নের চেষ্টা চলছে গত ত্রিশ বছর, তার জন্য আমরাও কি কমবেশি দায়ী নই? আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী জেনারেশন ছিল মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭৫ সালের পর থেকে যখন বিতর্কিত করে তোলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে, তখন আমরা কোনো প্রতিরোধ করিনি? আমাদের সাথী যারা ছিলেন ১৯৭১ সালে, তারাই কি এই অবমূল্যায়ন প্রতিযোগিতায় যোগ দেননি নিজ স্বার্থে? সামান্য সুবিধার জন্য কি তারা সত্য বিসর্জন দেননি বা অন্য কথায় আত্মা বিক্রি করে দেননি? কিন্তু আমরা তাদের বন্ধুত্ব ত্যাগ করিনি, ভর্ৎসনাও করিনি। গোকুলে তারা বেড়েছে।

এই প্রতিরোধটি যে যার ক্ষেত্রে থেকেই গড়ে তুলতে পারতেন। আমি যুক্ত লেখালেখির সঙ্গে। বলতে দ্বিধা নেই, এ প্রতিরোধে লেখকরা ছিলেন সজীব এবং সক্রিয়। মুক্তিযুদ্ধের বোধ বা অনুভবকে যে কারণে বিনাশ করতে পারেনি শত্রুপক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি বাঁচিয়ে রেখেছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি।

গত তিন দশকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা নিয়ে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কোনোটিই ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা হয়েছে এই বলে যে, বিষয়টি বিতর্কিত এবং বৃহৎ দু'টি রাজনৈতিক দলের কোনো একপক্ষ হয়ে লিখতে হবে। অন্যদিকে অ্যাকাডেমিশিয়ানদের এ বিষয়ে অনাগ্রহ দেখার মতো। দেশের সবকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ আছে, কলেজে আছে; কিন্তু খুব কম শিক্ষক এসব উদ্যোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন। আজ বত্রিশ বছর পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় অভিলেখাগার,

জাতীয় গ্রন্থাগার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন চর্চাকেন্দ্র কেউই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোনো প্রবন্ধ/গ্রন্থপঞ্জি বা বিস্তারিত কোনো বিবরণ বা বই বের বা প্রকাশ করেনি। এটি শুধু দুঃখজনক নয়, লজ্জাজনকও বটে। আমাদের অ্যাকাডেমিশিয়ানদের মুক্তিযুদ্ধ বা সামগ্রিকভাবে দেশ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কী, তারও খানিকটা বিচার করা যাবে এ পরিপ্রেক্ষিতে। এটি প্রধান ঝোঁক। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। প্রায় এক দশক আগে, আমার সহকর্মী আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রকাশ করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি। 'একাত্তরের যাত্রী' নামে একটি সংগঠনও ওই সময় এ ধরনের একটি পঞ্জি প্রকাশ করেছিল। সামগ্রিক/আঞ্চলিক বা মুক্তিযুদ্ধের যে কোনো বিষয় নিয়ে লেখার আগে, যিনি লিখবেন তার জন্য এ ধরনের পঞ্জি প্রয়োজনীয়।

'পঞ্জি' না হোক মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে গত তিন দশকে বেশ বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এর একটা অংশ চর্বিতচর্বণ। অধিকাংশই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। স্মৃতিচারণ। বিশ্লেষণাত্মক রচনার সংখ্যা কম। মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যেসব বইপত্র আমার নজরে পড়েছে, সেগুলোকে আলোচনার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। অবশ্য বলে রাখা ভালো যে, এ বিভাগ খুব একটি বিজ্ঞানসম্মত কিছু নয়। এ বিভাজন করা যেতে পারে এভাবে– ১. মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস বা মূল্যায়ন, ২. অবরুদ্ধ দেশ, ৩. প্রবাসী সরকার, সংগঠন, ৪. রণাঙ্গন, ৫. স্মৃতিকাহিনী এবং ৬. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ। এই বিভাজন নির্দিষ্ট, ফ্রেমবদ্ধ কোনো বিভাজন নয়। কারণ রণাঙ্গন সম্পর্কিত গ্রন্থেও বর্ণনা আছে প্রবাসী সরকারের, আবার অবরুদ্ধ দেশ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণায় উল্লিখিত হয়েছে রণাঙ্গন সম্পর্কিত আলোচনা। তাই গত তিন দশকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত রচনাবলীর একটি গ্রন্থপঞ্জি তৈরি জরুরি হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যখন বলা হয় ৩০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিলেন, আজকাল অনেক বাঙালিই তা মানতে চান না। এ বিষয়েও বিতর্কে মেতে ওঠেন। আঞ্চলিকভাবে আমরা সামান্য যে হিসাব পাই, তাতেই বিস্মিত হতে হয়। কয়েকটি উদহারণ :

[অঞ্চলভিত্তিক নিহতদের হিসাব]

দিনাজপুর	৭৫ হাজার
চাঁদপুর	১০ হাজার
বরিশাল শহর	২৫ হাজার
ঝালকাঠি	১০ হাজার
রংপুর	৬০ হাজার
আখাউড়া	২০ হাজার
ঠাকুরগাঁও	৩০ হাজার
চট্টগ্রাম	১ লাখের উপর
সেতাবগঞ্জ	৭ হাজার
পাবর্তীপুর	১০ হাজার
সৈয়দপুর	১০ হাজার

কুড়িগ্রাম	১০ হাজার
কুষ্টিয়া	৪০ হাজার
নওগাঁ	২০ হাজার
নড়াইল	১০ হাজার
বগুড়া শহর	২৫ হাজার
জামালপুর	১০ হাজার
চৌদ্দগ্রাম থানা	১ হাজার
স্বরূপকাঠি ও বানরীপাড়া	৫ হাজার
মানিকগঞ্জ	১ হাজার ১০
নরসিংদী	১ হাজার ১৯
হাজিগঞ্জ	৩০ হাজার

এছাড়া হরিরামপুরে একটি পুকুরে পাওয়া গিয়েছিল ১০ হাজার নরমুণ্ড। কুমিল্লায় ১১ দিনে উদ্ধার করা হাজিগঞ্জ ৩০ হাজার চৌদ্দগ্রাম থানা ১ হাজার হয়েছিল ৭ হাজার কঙ্কাল। রাজশাহীর দু'টি গ্রামে এক রাতে হত্যা করা হয়েছিল ৫০০, জয়পুরহাটে স্বরূপকাঠি ও বানরীপাড়া ৫ হাজার একদিনের ৫০০-এর বেশি, দিনাজপুরের দু'টি গ্রামে ৩৭ হাজার, শেরপুর জেটিতে ২ হাজার। যারা স্বাধীনতার খবর আনা নেয়া করতেন বা কুরিয়ার হিসেবে কাজ করতেন, সেরকম ১৫০ জন গিয়েছিলেন বাঘের পেটে। মানিকগঞ্জ ১ হাজার, নরসিংদী ১ হাজার ১০ পরে হানাদার বাহিনীর পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিলেন ৯৬জন। আরো জানা যায় : হাজিগঞ্জ ৩০ হাজার নিয়াজী মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশে হত্যা করা হয়েছিল ১৫লাখ মানুষকে।

১৯৭৫-এর পর থেকে বুদ্ধিজীবী হত্যা তথা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়ে যায়। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটি তারপর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের দাবি তোলে এবং সে দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। তখন শেখ হাসিনাও এ দাবি সমর্থন করেন। সে দাবি থেকে আমরা এখনো সরিনি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পর আবার এ দাবি জোরদার হয়ে উঠছে। অনেকে শহীদ পরিবারের সদস্যদের বলছেন মামলা দায়ের করতে। আমরা এর বিরোধী। কারণ বিষয় দু'টি আলাদা।

বুদ্ধিজীবীদের যারা হত্যা করেছে, তারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। বর্তমান বিশ্বে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কোনো দেশের মধ্যে সীমিত রাখা যাচ্ছে না। চিলির একনায়ক পিনোশের ঘটনা এর উদাহরণ। প্রচলিত আইনে এই বিচার সম্ভব নয়। কারণ 'মওলানা' আবদুল মান্নান যদি বলেন, ডা. আবদুল আলীমকে তিনি হত্যা করেননি, তখন আজ এর প্রমাণ কী হবে? বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে হত্যার কথা স্বীকার করেছিল। মান্নানরা তো তা করেনি। বিচারক বলতে পারেন, সংগৃহীত প্রমাণ যথেষ্ট নয়। যদিও আমরা জানি, তৎকালীন কাগজপত্রে তা উল্লিখিত হয়েছে। এ ধরনের বিচারের জন্য সবসময় স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করা হয়। তাই সরকারকেও তা-ই করতে

হবে এবং সরকারকে বাদী হতে হবে। শহীদ পরিবারগুলো আজ নিঃস্ব। জীবন ধারণই তাদের জন্য কষ্টকর। বছরের পর বছর তারা মামলা লড়বেন কীভাবে? সংবিধানে কিন্তু স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা আছে।

সরকারিভাবে ২৫.১২.১৯৭১ সালে জানানো হয়, ২৫ মার্চের পর নির্দোষ মানুষের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের জন্য দায়ীদের বিচার করা হবে। ১৯৭২ সালের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ৪১ হাজার দালালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে ১৬ হাজারের বিরুদ্ধে, মুক্তি পেয়েছে ৫ হাজার জন এবং মামলা দায়ের করা হয়েছে ৩০০ জনের বিরুদ্ধে! এখানে মনে রাখা দরকার সে বিপর্যস্ত সময়ে, যেখানে ছিল বিচারক ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার অভাব, সেখানে কয়েক মাসের মধ্যে ৩০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা ও ১৬ হাজারে বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা সামান্য বিষয় নয়।

এর সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, ১৯৭২ সাল থেকেই দালাল আইন বাতিলের আবেদন/দাবি জানানো হয়। ৫.১২.১৯৭২ সালের প্রতিবেদন অনুসারে ভাসানী বলেছেন, 'দালাল আইন বাতিল না করলে আন্দোলন করবো' (দৈনিক বাংলা)। ৫.২.১৯৭৩ সালে 'দালাল আইনে অভিযুক্তদের ক্ষমা করার জন্য অলি আহাদ আহ্বান জানান।' ২.১.১৯৭৩ তারিখে 'দালাল আইন' অপপ্রয়োগ বন্ধ করার জন্য ন্যাপ (মো) দাবি জানায়। দালাল আইন সংশোধন করা হয় ১৯৭২ সালে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত নারীদের বিষয়টি সবসময় উপেক্ষিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাদের যথাযথ মর্যাদা দিতে চাইলেও তাতে সফল হননি। ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত পত্রিকায় নারী নির্যাতনের বিষয়টি এসেছে। কিন্তু ১৯৭২ সালের পর থেকে দেখি বিষয়টি সংবাদপত্রে উপেক্ষিত। বর্তমানে এ বিষয়টি আবার আলোচনায় আসছে এবং এ নিয়ে কিছু লেখালেখিও হয়েছে। সে কারণে বিষয়টির ওপর সামান্য আলোকপাত করবো।

নির্যাতিত নারীরা সবসময় অবমাননার শিকার। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটি প্রহর তাদের কেটেছে আতঙ্কে, যারা নির্যাতিতা হয়েছে তাদের ভাগ্য তখনই নির্ধারিত হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও নির্যাতিতাদের স্থান হয়নি। ট্র্যাজেডি এখানেই। আমরা নাকি 'মা-বোনদের ইজ্জত' করি। বস্তুত এ ধরনের ভণ্ডামি আছে খুব কম সমাজেই। বঙ্গবন্ধু এদের 'বীরাঙ্গনা' অভিধায় ভূষিত করে সমাজে সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, সমাজ তাদের গ্রহণ করছে না। ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর স্বামী আহসানউল্লাহর মতো মানুষের সংখ্যা দু-একজনের বেশি নয়, যিনি প্রকাশ্যে গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন। 'আমার সৌভাগ্য, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আছি। তিনি আমায় গ্রহণ করেছেন।' অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এমনকি পিতা-মাতাও। নীলিমা ইব্রাহিমের বইতে তার বিবরণ আছে। নির্যাতিত মহিলার সংখ্যা ছিল কেমন? এ সংখ্যা কখনো নির্দিষ্ট করা যায়নি, করা সম্ভবও নয়। আর আমরা যে সংখ্যাই বলি তাই চ্যালেঞ্জ করা হয়, এ দেশেও। তাই আমি বাংলার বাণীতে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত এক অস্ট্রেলিয়ান মহিলার প্রতিবেদনের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। তার নাম ডা. জিওফ্রে ডেভিস। ওই সময় সিডনি থেকে বাংলাদেশে

এসেছিলেন তিনি নির্যাতিত নারীদের সেবা প্রদানের জন্য। তার মতে, মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ৪ লাখের কম নয় এবং সেই হিসাবের তিনি একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন ধর্ষিতাদের চিকিৎসার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের হিসাবমতে, ধর্ষিত মহিলার আনুমানিক সংখ্যা ২ লাখ। ডা. ডেভিসের মতে, এই সংখ্যা অনেক কম করে অনুমান করা হয়েছে। তিনি মনে করেন, এই সংখ্যা ৪ লাখ ৩০ হাজারের মধ্যে হতে পারে। ডা. ডেভিস বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাই ২ লাখ।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য-সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হওয়ার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার মহিলা গর্ভপাত করেছেন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।...

ধর্ষিত মহিলাদের যে হিসাব সরকারিভাবে দেয়া হয়েছে ডা. ডেভিসের মতে, তা সঠিক নয়। সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশের জেলাওয়ারি হিসাব করেছেন। সারা দেশের ৪৮০টি থানা ২৭০ দিন পাকসেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ। এই সংখ্যাকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল অংকরূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু হানাদার বাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেয়ার সময় যেসব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে, তার হিসাব রক্ষণে সরকারি রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনঃপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য হানাদার বাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিত তরুণীর অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়তো হত্যা করা হয়েছে।

বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম। তার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বীরাঙ্গনা বলছি নামে দুই খণ্ডে তিনি গ্রন্থও রচনা করেছেন। তার বিবরণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকারদের নারী নির্যাতনের অনেক বিবরণ আছে। যেমন : আমাদের শাড়ি পরতে বা দোপাট্টা ব্যবহার করতে দেয়া হতো না। কোন্ ক্যাম্পে নাকি কোন্ মেয়ে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই আমাদের পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। যেমন ময়লা, তেমনি ছেঁড়া-খোঁড়া। মাঝে মাঝে শহরের দোকান থেকে ঢালাও এনে আমাদের প্রতি ছুড়ে ছুড়ে দিতো। যেমন দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় ভিক্ষা দেয় অথবা জাকাত দেয় ভিখারিকে। চোখ জলে ভরে উঠতো।

শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, বীরাঙ্গনাদের যে তালিকা ছিল, স্বয়ং বঙ্গবন্ধু তা বিনষ্ট করে ফেলার জন্য বলেছিলেন। কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ হলেও সমাজের মৌল কোনো পরিবর্তন হয়নি। সমাজ এদের গ্রহণ করবে না।

স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর নির্মূল কমিটি কয়েকজন বীরাঙ্গনাকে ঢাকায় নিয়ে

এসেছিল সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য এবং যুদ্ধাপরাধ এ মাটিতে কী পর্যায়ে গিয়েছিল, তার সাক্ষ্য হিসেবে। সেই মহিলারা এতদিন স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার পর সমাজপতি ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ তাদের প্রায় পরিত্যাগ করে। খুলনায় আমি একজন মহিলাকে পাগলিনীর বেশে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি, যিনি '৭১ সালে নির্যাতিত হয়েছিলেন। খুলনায় অনেকেই তা জানেন, কিন্তু কেউ তার পুনর্বাসনে এগিয়ে আসেননি। এই হচ্ছে বাংলাদেশ ও বাঙালির আসল রূপ।

দেশজুড়ে ১৯৭১ সালে ছিল অসংখ্য বধ্যভূমি। এখন সেগুলো কেউ স্বীকার করতে চায় না। যদি এগুলো রক্ষার দাবি তোলা হয়! কারণ সারা দেশে জমির দাম বেড়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছিলেন সারা দেশের বধ্যভূমিগুলো চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করার। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে ওই সরকারের এটিই ছিল সবচাইতে ইতিবাচক পদক্ষেপ। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করেছিল এবং কমিটির কয়েকটি বৈঠকও হয়েছিল। ৬৪টি জেলার ডিসির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাদের নিজ নিজ এলাকার বধ্যভূমি সম্পর্কে। পরের খবর আর জানা যায় না।

এখনো পাওয়া যাচ্ছে বধ্যভূমির খবর। তবে এখন অনেকে বধ্যভূমির খোঁজ পেলেও তার উল্লেখ করেন না। কারণ যদি কেউ স্মৃতি সংরক্ষণ করতে চায় বা সরকার অধিগ্রহণ করতে চায়। তাছাড়া জায়গাজমি দখলের হিড়িকে সেগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। মিরপুরের শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি বিখ্যাত। স্বাধীনতার পরপর সেখানকার বিরাট বটগাছের গুড়ি দেখা গেছে কসাইর ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। অর্থাৎ এখানে বাঙালিদের কুচিকুচি করে কাটা হতো। সেই বিখ্যাত বধ্যভূমিটি কোনো সরকারই রক্ষা করেনি। এখন বোধহয় তা দখল হয়ে গেছে।

বধ্যভূমির স্মৃতি সংরক্ষিত না হওয়ায় একাত্তরের স্মৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলো যদি সংরক্ষিত হতো, তাহলে একাত্তরের সেই দিনগুলোর কথা ভোলা যেতো না। আজ যারা খেয়ে-পরে বেঁচে বর্তে আছে, তারা তো আর ওই মানুষগুলোর কথা ভাবেনি। তাদের কথা দূরে থাকুক, যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথাও কি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বাঙালি? বাঙালির কৃতজ্ঞতা বোধের কোনো নজির ইতিহাসে নেই। যদি ওই বোধ থাকতো, তাহলে সরকারি উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর না হয়ে ঢাকা শহরের সবচাইতে দামি জায়গায় অসুন্দর সামরিক জাদুঘর হয় কীভাবে? বাঙালি খুব শিগগিরই শিকড়হীন জাতিতে পরিণত হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

২২.৩.২০০৪

মার্চের ভাবনা

ফাল্গুনের শুরুতে বা মার্চ এলেই যেন মুক্তিযুদ্ধ ফিরে আসে আমাদের জীবনে। এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং বিজয় এসেছে তিন যুগ আগে। বিশ-পঁচিশ বছরের তখনকার যুবক এখন প্রবীণ। তিরিশ বছরের যে যুবক সেতো জন্ম থেকেই স্বাধীন দেশের নাগরিক। পরাধীনতার গ্লানি তার বোঝার কথা নয়। বিজয়ের প্রথম কয়েক বছর মার্চ মাসে আবেগের যে জোয়ার থাকে এখন তা আশা করা দুরাশা। এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বলার বিষয় সেটি নয়। এখন আমরা যে মার্চ পালন করতে যাচ্ছি এ মার্চের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ মার্চে এখন যুদ্ধপরাধী মন্ত্রী, স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় এমন বিভিন্ন নাগরিক বিভিন্ন জায়গায় মার্চের ছালাম-গ্রহণ করবে, বক্তৃতা দেবে, তখন যদি বলি স্বাধীনতা দিবস পালন করছি, তাহলে ভুল হবে। ভূ-খণ্ডটি হয়তো স্বাধীন কিন্তু মানুষ পরাধীন, অন্তত আমরা যারা এখন ১৯৭১ সালের শুদ্ধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী বা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী যে কাউকে কয়েকটি শর্ত মানতে হবে। এসব শর্তের মধ্যে আছে ৭ মার্চের বক্তৃতায় বিশ্বাস এবং সেটি ছিল মানসিক প্রস্তুতির সময়, বিশ্বাস করতে হবে যে, বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তার নেতৃত্বে (অনুপস্থিত থাকলেও) জয় বাংলা হুংকার তুলে মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করেছেন। আরো মানতে হবে, ১৯৭১ সালের সরকারের (মুজিবনগর) নেতৃত্বে, সিভিল কর্তৃত্বের অধীনে যুদ্ধ হয়েছে . এসব শর্ত অসাধারণ কিছু নয়, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তাই মানা হয়েছিল। এরপর সামরিক শাসকরা এসব শর্ত বদলে দিয়েছেন, তাদের অনুসারী তৈরি করেছেন, দেশটিকে বা দেশের মানুষকে বিভক্ত করেছেন। একথাও মানতে হবে, কিছুটা অদলবদল করে স্বাধীনতার পক্ষ হওয়া যাবেনা।

এই যে অদলবদলের কথা বললাম, অনেকে বলেন, এটি সামান্য, এবং দু'পক্ষ খানিকটা সহনীয় হলে বা 'অ্যাডজাস্ট' করলেই আর সমস্যা থাকে না। অনেকে এটি মেনে নিয়েছেন কিন্তু এটি ছিল পাকপন্থী বা পাকসেনাদের কৌশল যে কৌশলে আত্মসমর্পণ করা হয়েছে।

প্রথমেই ধরা যাক, জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা। এখন এটিকে সত্যে পরিণত করা হচ্ছে, পাঠ্য বই-য়ের পাতায় তা লেখা হচ্ছে। আগামী ২৭ মার্চ হয়তো 'স্বাধীনতার ঘোষণার' জন্য জাতীয় দিবস ঘোষণা হতে পারে। কিন্তু এটার ক্ষেত্রে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে কীভাবে? ২৫ মার্চ মধ্য রাতে (বা ২৬ মার্চ) স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে তা উল্লেখ করা

হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন নিয়ে বিতর্ক করলেও, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তো মানতে হয়। সেটি না মানলে একজন বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানেন একথা কীভাবে বলা যাবে? তাছাড়া জিয়াউর রহমানের ঘোষণা বা ঘোষণা পাঠটি হলো চতুর্থ। প্রথম তিনটির ঘোষককে বাদ দিয়ে চতুর্থ জনের ঘোষণাকে কীভাবে মানা যায়? স্কুলে তো চতুর্থস্থান প্রাপ্তকে সান্ত্বনা পুরস্কারও দেওয়া হয় না। তাছাড়া আরো আছে। স্বাধীনতা ঘোষণাতো সামরিক আইন বা ফরমান জারির বিষয় নয় যে, তারিখ দিয়ে ঘোষণা করা হলো এবং সবাই সুর সুর করে তা মানতে লাগলো।

বঙ্গবন্ধুর ছবি নামানো বা কেউ তা দেয়ালে টাঙ্গালে হামলা করা, দু'জনকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেয়া, তার নামে নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম বদল এগুলোতো স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির কাজ হতে পারে না। যারা এগুলো করছে তারা হীনমন্যতার পরিচয় শুধু দিচ্ছে না, একটি ইলাসটিককে টেনে বড় করার চেষ্টা করছে। ইলাসটিক টানার পর ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে যায় বটে, কিন্তু এই ইলাসটিকঅলাদের স্বাধীনতার পক্ষ বলা যায় কীভাবে? এখানেই তো শেষ নয়। ওসমানীর নামে কিছুর নামকরণ হলে থাকবে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু দূরের কথা, সৈয়দ নজরুল ইসলামের নামাঙ্কিত একটি সেতুর নামও বদলে দেয়া হবে সেটি কেমন কথা? ওসমানী তো সৈয়দ নজরুলের অধীনে থেকে যুদ্ধ করেছেন। এগুলোতো একধরনের মতলববাজি।

বঙ্গবন্ধুর অবদান শুধু মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করাই নয়, ১৯৭২ সালে সংবিধান করে সেই যুদ্ধকে পূর্ণতা দেওয়াও তার অবদান। এ বিষয়টিকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। এই সংবিধান হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তির সনদপত্র। এবং সংবিধানের যে চারটি নীতি বিধৃত হয়েছিল তা কোনো আবেগজাত ব্যাপার ছিল না, আরোপিত ছিল না। ড. আনিসুজ্জামান তার প্রবন্ধ 'আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবং সংবিধানের মূলনীতি'তে পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছেন '১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে গৃহীত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি গুলোর সামাজিক ভিত্তি ছিল।' জিয়াউর রহমান সেগুলোকে সংশোধন করেন, যে ক্ষমতা কারও নেই। কারণ, সংবিধানের মূলনীতির ফরমান জারি করে কেউ বদল করতে পারে না। বাঙালির রাষ্ট্র বাংলাদেশের মূল উপাদানই যখন বিনষ্ট করা হয় তখনতো আর বাংলাদেশ থাকে না।

এধরনের অনেক উপাদানের কথা আমি উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু, উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ কি? সর্বশেষ দেখুন, গত আমলে শুরু করা স্বাধীনতা স্তম্ভের কাজও তো বন্ধ করে রাখা হয়েছে। পাকিরা যেখানে আত্মসমর্পণ করেছিল সেটি যাতে মানুষের মন থেকে মুছে যায় সেজন্য কি জেনারেল জিয়া সেখানে শিশুপার্ক করেননি?

এ কাজ গুলো করেছে বিএনপি। স্বাধীনতা বিরোধীদেরও পুনর্বাসন করেছে তারা। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী জামায়াতিদের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকারও গঠন করেছে তারা। সুতরাং কেউ যখন বলেন, বিষয়গুলো সামান্য, অ্যাডজাস্টমেন্ট করলেই মিটে যায় তখন বলতে হবে সে স্বাধীনতার পক্ষ নয়। এগুলো এ্যাডজাস্টমেন্টের বিষয় নয়।

এখনও অনেকে বিএনপিকে জামায়াত থেকে আলাদা করে বিচার করতে চান। এটিও এক ধরনের মতলববাজি। মান্নান ভুঁইয়া বা নিজামীর কথা বা কর্মকাণ্ডে পার্থক্য কোথায়? যদি পার্থক্য না হয় এবং মতাদর্শগত ভাবে মিল থাকে তাহলে আলাদা দল বলে সান্ত্বনা পেয়ে লাভ কি? আলাদা দল এ অর্থে যে একটির নেতৃত্বে বেগম জিয়া ও তারেক রহমান, আরেকটির নেতৃত্বে নিজামী। এবং দেশের শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ এদের অনুসারী। সুতরাং দেশ যে দু'ভাগে বিভক্ত– একথা কি ভুল? এবং দেশকে আবার স্বাধীনতার পক্ষে আনা বেশ দুরূহ।

মুক্তিযোদ্ধাদের আক্ষেপ করতে শুনি যে জামায়াতিরা ক্ষমতায়। অনেকে বলেন, এ স্বাধীনতা কি চেয়েছিলাম? যদি নাই চাই, তা হলে আমরা কি করেছি, মুক্তিযোদ্ধারা কি করেছে? আমরাই তো এদের সমাজে স্থান করে দিয়েছি। যে উপন্যাসিক জাসাস করেন, সাঈদীর মেয়ের বিয়েতে উপহার পাঠান, তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয় করে উপন্যাস লিখলে আমরা আপ্লুত হয়ে উঠি। যে বুদ্ধিজীবীরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিএনপি-জামায়াতি দল গঠন করেন, মুক্তবুদ্ধির পত্র-পত্রিকা কি তাদের পাবলিসিটি বেশি দেয় না? এদের অনেকের সঙ্গে আমরা আত্মীয়তা করি, বন্ধুবান্ধব হিসেবে গ্রহণ করি, একই মঞ্চে বক্তৃতা দেই, এবং এভাবে সমাজে, ব্যক্তি জীবনে তাদের অ্যাকোমোডেট করি। তারা কি করে? এভাবে আমরা তাদের সামাজিক ভিত্তি দিয়েছি।

যদি মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করেন, যদি মনে করেন এ বাংলাদেশ চান নি, তাহলে আর আপোস করা যায় না, যাবে না। যদি রাস্তায় নামতে ভয় লাগে তাহলে অসহযোগিতা করতে পারেন। সুফিয়া কামালের নামাঙ্কিত গ্রন্থাগারের নাম বদল হোক, আপনারা গণগ্রন্থাগারকে সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার নামেই অভিহিত করুন, যতই বলুক জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চ (এখন আবার ২৬ মার্চ) স্বাধীনতার ঘোষক ততই আপনারা সেটির বিরুদ্ধে বলেন, যারা এসব মতে বিশ্বাসী তাদের সঙ্গে একই মঞ্চে অংশগ্রহণ না করুন। এ সামান্য কাজগুলোও যদি করা যায় তাহলেও বলা যাবে এসব ভণ্ডদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। এবং সে প্রতিরোধ সফল হলে, বাংলাদেশ বাঙালিদের হবেই। সেই বাংলাদেশ চাইবেন কিন্তু ঘরে বসে শুধু আক্ষেপ করবেন, তাহলে তো আর সেই বাংলাদেশ পাবেন না।

মার্চ ২০০৪

ট্রাম্পকার্ড হারিয়ে যাওয়ায় এলো বাংলা ভাইয়ের শাসন

গত আড়াই বছরে বিভিন্ন সময় আমরা লিখেছিলাম, বাংলাদেশের পরিণতি হবে সামন্তযুগের মতো। কেন্দ্রে একজন রাজা বা রাণী থাকবেন বটে তবে দেশটি বিভক্ত হয়ে যাবে বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যে। এই মতামত অনেকের কাছে একপেশে এবং এক্সট্রিম মনে হয়েছে। আজ দেখা যাচ্ছে তা-ই ঘটছে। বাংলা ভাইয়ের উত্থান ও উত্তরাঞ্চলে তার সামন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা এর উদাহরণ।

দস্যু বাহরাম বা বনহুরের মতো এক রহস্যময় চরিত্র বাংলা ভাইয়ের। জনাব জলিলের গোল্ডকার্ড ট্রাম্পকার্ডটি হারিয়ে যাওয়ার পর বাংলা ভাইয়ের আবির্ভাব পত্রিকাগুলোকে সঞ্জীবিত করেছে। গত এক সপ্তাহ বিভিন্ন পত্রিকায় বাংলা ভাইয়ের কার্যকলাপের রহস্যময় সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে। অধিকাংশ পাঠক যেহেতু একটি পত্রিকা পড়েন, সেজন্য তার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ চিত্র পাবেন না। তাই কখনো তাকে হিরো, কখনো বা ভিলেন মনে হবে। আসল বাংলা ভাই কে, কী তার কাজ-সেটি অগোচরেই থেকে যাবে। বিভিন্ন পত্রিকা পড়ে আমি যা জানতে পেরেছি, নিচে তা তুলে ধরছি।

১. বাংলা ভাইয়ের পরিচয়

তিনি বিভিন্ন সময় নিজের বিভিন্ন পরিচয় তুলে ধরেছেন। কখনো বলছেন, ঢাকার এক কোচিং সেন্টারে পড়াতেন। তার জবান ও লেবাস এতো বাঙালিপনায় ভরপুর ছিল যে, তাকে সবাই বাংলা ভাই ডাকা শুরু করে। আবার কখনো বলছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাস করেছেন। আগে আমাদের ধারণা ছিল, বাংলা সাহিত্য নিয়ে যে পড়াশোনা করে, সে আর যা-ই হোক অসভ্য বা রাজাকারী ধ্যান-ধারণার হয় না। অবশ্য সে ধারণা এখন আর নেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাংলা পড়াচ্ছেন এরকম রাজাকারী চিন্তার শিক্ষক কম নয়। যা হোক, অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজশাহীর বাগমারা এলাকার লোকজন তাকে গত দু'বছর ধরে চেনে। কারণ 'এখানে মসজিদে মসজিদে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত কার্যক্রম পরিচালনা করতে এলে ধাওয়া খেয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।'... [তার] নাম সিদ্দিকুর রহমান। বাড়ি বগুড়ায়। সেখানে আযিযুল হক কলেজে পড়ার সময় ইসলামী ছাত্রশিবিরের সক্রিয় ক্যাডার ছিলেন। কথিত আছে, আফগানিস্তানের কান্দাহারে মৌলবাদী ট্রেনিং নিতে গিয়ে তিনি বাংলা ভাই' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সেই পরিচয়ে তিনি এখন আত্মপ্রকাশ করেছেন' (জনকণ্ঠ, ২৩ বৈশাখ)।

সুতরাং বিভিন্ন পত্রিকায় তার যেসব পরিচয় বেরিয়েছে, তা তার আসল পরিচয়

তুলে ধরেনি। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে বাংলা শব্দটা ব্যবহার করায়। বয়স তার একটু বেশি হলে অবশ্য পরিচয়ে বলা হতো সে মুক্তিযুদ্ধও করেছে। আজিজুল ওরফে বাংলা ভাই জামায়াতের একজন ক্যাডার এবং আফগানিস্তানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত তালেবানি ভাবধারায় বিশ্বাসী। তার কর্মকাণ্ডকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। না হলে আরো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

২. বাংলা ভাইয়ের উত্থানের কারণ

বাংলা ভাই যেসব এলাকায় তৎপরতা চালাচ্ছেন, সেসব কীভাবে চালাচ্ছেন বা সেখানে তার উত্থান কীভাবে হলো সে সম্পর্কে সবচাইতে ভালো প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠে। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, নওগাঁ, নাটোর, রাজশাহী ও বগুড়ার আটটি উপজেলায় বাংলা বাহিনী তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব এলাকায় প্রথম পর্যায়ে খাঁটি সর্বহারা যারা ছিল, তাদের বিলুপ্তি ঘটেছে অনেক আগেই। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর জলে সর্বহারাদের লালন শুরু করে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য। এসব উপজেলার কেন্দ্র বাগমারা যেখান থেকে জাতীয় পার্টির আমজাদ হোসেন ১৯৯১ সালে এমপি নির্বাচিত হন। সুতরাং জাতীয় পার্টিকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য 'সর্বহারা'দের উত্থান ঘটে। ১৫ বছরে খুন হয় ৫০ জন। এর প্রতিক্রিয়ায় বিএনপি নেতারাও খুন হতে থাকে। কিছুদিন আগে বিএনপি নেতা হামিদ খুন হয়। তার জানাজায় বাগমারা থেকে 'নির্বাচিত বিএনপি এমপি আবু হেনা বলেছিলেন, 'কোনো সর্বহারা নয়, স্থানীয় বিএনপি সন্ত্রাসীরা খুন করতে পারে' (জনকণ্ঠ)।

এসব এলাকা পরিণামে সন্ত্রাসীদের এলাকায় পরিণত হয়। সর্বহারা নামধারী সন্ত্রাসী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী সব মিলে এলাকায় চরম ত্রাসের সৃষ্টি করে। পুলিশদের কেউ সেখানে চেনে না। কারণ বাংলাদেশে পুলিশদের পরিচয় মাসলম্যান ও সন্ত্রাসীদের বন্ধু, জনগণের নয়। গত এক দশকে জামায়াতে ইসলামীরও সেখানে আধিপত্য বাড়তে থাকে। এ পটভূমিকায় বাংলা ভাই ওরফে আজিজুলের উত্থান।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলা ভাইয়ের সাক্ষাৎকার পড়ে তার উত্থান সম্পর্কে একটি ধারণা করেছি।

এসব এলাকার বিএনপি এমপি, নেতাদের দ্বন্দ্বে, একদলের উদ্যোগে বাংলা ভাইয়ের সৃষ্টি। বাগমারার এমপি আবু হেনা একদিকে, অন্যদিকে হাওয়া ভবন ঘনিষ্ঠ দুলু, রাজশাহীর মেয়র প্রভৃতি। প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য খুব সম্ভব এরা কাউকে খুঁজতে থাকে এবং জামায়াতের আজিজুলকে পেয়ে যায়। জামায়াতের সশস্ত্র ক্যাডাররা তো আছেই, তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় পুলিশ ও বিএনপির একটি অংশের সন্ত্রাসীরা। শুরু হয় অ্যাকশন।

৩. এই অনুমানের প্রমাণ কী?

বাংলা ভাই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'ভূমি উপমন্ত্রী নাটোর থেকে নির্বাচিত এমপি রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর সঙ্গে দু'দিন দেখা এবং কথা হয়েছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য আবু হেনা জনবিচ্ছিন্ন। তাকে এলাকার জনগণ চায় না বলে তার সঙ্গে কথা বলার

প্রয়োজন মনে করিনি (জনকণ্ঠ, ৫.৫.০৪)।

রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি নূর মোহাম্মদ জানিয়েছেন, 'তাদের প্রতি আমাদের সায় আছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। পুলিশের সম্মতি না থাকলে তারা মাঠে থাকতে পারে না' (ঐ)।

সুতরাং মূল বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়, বিএনপি-জামায়াত জোটের স্বার্থে, এলাকার বিরোধীদের এবং সর্বহারা নামধারী যারা জোটের নয় শায়েস্তা করার জন্য বাংলা ভাই ও তার সন্ত্রাসী দলকে মদদ দিচ্ছে। বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা প্রথম। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, আমেরিকা ও ইউরোপীয় দাতাদের এর পেছনে হয়তো সায় আছে। বিশেষ করে, আমেরিকার। তারা পৃথিবীর সব দেশে সন্ত্রাস ও মানবাধিকার হরণ করার পৃষ্ঠপোষক এবং তালেবানি শাসনের মদদদাতা। অতীত ইতিহাস তা-ই বলে। ভাইস রয় লর্ড হ্যারি বিভিন্ন বিষয়ে অযথা বক্তব্য রাখলেও এ বিষয়ে নিশ্চুপ। ইসি সুশাসন ও মানবাধিকার নিয়ে কথা বললেও এ বিষয়ে নিশ্চুপ। এখানে উল্লেখ্য, এদেশের বিরোধীদলীয় নেত্রী বা রাজনীতিবিদদের ক্যান্টনমেন্টে ঢুকতে সৈনিকরা বাধা দেয় কিন্তু লর্ড হ্যারিকে সালাম জানাতে জানাতে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে অনুষ্ঠান করেছে। ফলে সৈনিকদের আনুগত্য সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পাই। এসব কিছুও পরোক্ষভাবে মদদ দিচ্ছে বাংলা ভাইকে।

৪. বাংলা ভাই যা করছেন

বাংলা ভাই যা করছেন তা হলো ৪টি জেলায় তার বাহিনী নিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। সঙ্গে আছে পুলিশ ও জোটের ক্যাডাররা। সর্বহারা নিধনের নামে এলাকার সমস্ত মানুষকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি রেখে যা খুশি তাই করা হচ্ছে। টাকা পয়সা আদায় করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তাদের হাতে বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে প্রচুর। এসব বিষয়ে ৪/৫টি পত্রিকায় বাংলা ভাই বিশদ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। আমি সেসব সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। যা থেকে আপনারা তার কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন–

প্রথম আলো : আপনারা সর্বহারা সন্দেহে লোকজনকে ধরে এনে নির্যাতন করছেন, নির্যাতনের মাধ্যমে প্রাণে মেরে ফেলেছেন, পঙ্গু করেছেন। এসব কি আইনবিরোধী কাজ নয়?

বাংলা ভাই : আমরা নির্যাতন করে কোনো মানুষকে প্রাণে মেরে ফেলেছি, এটা ঠিক নয়। যারা মারা যাচ্ছে, তারা এনকাউন্টারে অথবা জনগণের রোষানলে পড়ে মারা পড়ছে। যারা পঙ্গু হচ্ছে, তারা জনরোষে পড়ে অবস্থার শিকার হচ্ছে।

প্রথম আলো আপনারা কীভাবে নির্ধারণ করেন কে সর্বহারা আর কে নয়? নিশ্চিতই বা কীভাবে হন? আর এই কাজ তো পুলিশের?

বাংলা ভাই : কেউ কারো সম্পর্কে অভিযোগ দিলে সেটা কয়েকদিন ধরে যাচাই করি বিভিন্ন সূত্র অনুসন্ধান করে। তারপর তাকে ডেকে আনি। সে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে অস্ত্র দিয়ে দিলে আমরা ভালো হওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকি। পুলিশও আমাদের সঙ্গে সহায়তা করে থাকে।

প্রথম আলো : জাগ্রত মুসলিম জনতা'র ব্যানারে আপনি বহু হত্যা মামলা এবং বড় অপরাধের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের আত্মসমর্পণ করাচ্ছেন। এই অঞ্চলের একজন পুলিশ সুপার বলেছেন, এ ধরনের কোনো কাজ করার আইনগত কোনো অধিকার আপনার বা জাগ্রত জনতার নেই। আপনি কী মনে করেন?

বাংলা ভাই : এটা উনারা হয়তো আপনাদের কাছে বলেছেন : কিন্তু আমাদের তারা বলেননি। বরং পুলিশ তো আমাদের কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। আর আমরা তো ভালো কাজ করছি" (প্রথম আলো, ৫.৫.০৪)।

বাংলা ভাই কীভাবে কী কাজ করছেন, এ সাক্ষাৎকারে তা পরিষ্কার। তিনি আরো জানিয়েছেন, দুলু ও এসপি মাসুদ তার কাজে মহাখুশি। দৈনিক জনকণ্ঠের প্রতিবেদন অনুযায়ী 'ইসলামি শাসন কায়েম করার পক্ষে ছাদকায়ে হাদিয়া হিসেবে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা দান-খয়রাত আদায় করছেন জোর করেই।' নির্মম নির্যাতন ছাড়াও পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, লোকজনকে নামাজ পড়তে বলা হচ্ছে ও বোরখা ছাড়া মহিলাদের পেটে-মুখে কাদা-কালি মেখে দেয়া হচ্ছে।

জামায়াত তাদের ফ্রন্ট হিসেবে বাংলা ভাইকে দিয়ে 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' নামে একটি ফ্রন্ট গড়ে তুলেছে। সংবাদের প্রতিনিধি বাংলা ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন :

"আপনার নেতৃত্বাধীন সংগঠন 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ" কি রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রকাশ্যে আসবে?

বাংলা ভাই : এ মুহূর্তে সেরকম কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই। তবে সাধারণ মানুষ চাইলে প্রয়োজনে রাজনৈতিক দল হিসেবে জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএসবি) প্রকাশ্যে আসতেও পারে।

সংবাদ : এ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত?

বাংলা ভাই : সঠিক সংখ্যা গুনে রাখা হয়নি, তবে প্রতিটি ইউনিয়ন, গ্রাম ও মহল্লায় একটি করে ইউনিট কাজ করছে। এ হিসাবে প্রায় ৩ লাখ।

সংবাদ : আপনাদের প্রতিপক্ষ কারা?

বাংলা ভাই : প্রতিপক্ষ হিসেবে কাউকে দেখছি না, কেউ আমাদের প্রতিপক্ষও নয়। তবে একথা ঠিক যে, কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে আমাদের এ কাজগুলো সরকার এবং বিরোধী দলের কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসীর স্বার্থবিরোধী হওয়ায় তারা গোপনে আমাদের বিরোধিতা করছে বলে খবর এসেছে। যারা আমাদের বিরোধিতা করছে, তাদের আমরা সংশোধনের সুযোগ দেবো। সংশোধন না হলে তাদের কঠিন শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে"। (সংবাদ, ৬.৫.০৪)।

আশা করি পাঠকরা আজিজুল ওরফে বাংলা ভাইয়ের উত্থান ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আভাস পেয়েছেন। কিন্তু কোনো প্রতিবেদনে বা কোনো কলামনিস্টের লেখায় সম্পূর্ণ বিষয়টি আসেনি, কেউ এ ঘটনাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করেননি।

মূল বিষয়টি হলো সরকার ও আইন। জোট সরকার কার্যত আছে কি-না? নেই। যা হচ্ছে তা আইনে অনুমোদিত কি-না? না। এটি সবাই জানে, বিএনপি যেখানে,

সেখানে আইন-সুশাসন থাকে না, সেখানে তাকে পেশী বা হাওয়া ভবনীয় শাসন। এটি জিয়াউর রহমান সৃষ্টিকৃত ঐতিহ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশবিরোধী, চরম মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট সংগঠন জামায়াতে ইসলাম। আরো আছে মওদুদ আহমদ নামক একটি লোক, যার প্রধান কাজই হচ্ছে আইনের শাসন বিনষ্ট করা। যে কারণে ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে বাংলাদেশে, তার কোনোটিই আইন অনুমোদিত নয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার। কেন্দ্রীয় সরকার দেশটাকে লিজ দিয়েছে জামায়াত-বিএনপির সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে। তারা বিভিন্ন এলাকার নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে দিচ্ছে। বর্গীদের মতো এলাকায় লুটপাট করে যা পাচ্ছে, তার একটা ভাগ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতাদের। এর ভাগ পাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে আইনি কিন্তু সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ বাহিনী। এই বাহিনী সশস্ত্রভাবে নিরস্ত্র লোকদের আক্রমণ করে গণগ্রেপ্তার করে এবং তারপর মহানন্দে চাঁদা তুলে মহাভোজ খায়। ওরস্যালাইন তৈরিতে যেমন এক চিমটি লবণ লাগে, তেমনি এসবের পেছনেও আছে খানিকটা আদর্শ আদর্শ ভাব। সেটি হচ্ছে পাকিপন্থী হওয়া ও তালেবানি হওয়া। বেগম জিয়া বা সাফারি পরিহিত কোনো মন্ত্রীকে দেখে মনে হতে পারে এরা তালেবানি নয়। না, তারা তালেবানি নয়, তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ মাদ্রাসায় পড়েনি বা বোরখাও পড়েনি। বাংলা ভাইয়ার বাবারও সাহস হবে না, এদের মেয়ে বা পুত্রবধূর পেটে-মুখে কালি মেখে দেয়ার। এরা ব্যবহার করছে ইসলামকে নিজেরা ইসলামের বাইরে থেকে; কিন্তু ইসলামি ভাব নিয়ে। আমাদের দেশে সবচাইতে ভালো ব্যবসা ধর্মব্যবসা বা ইসলাম ব্যবসা। এতে কোনো পুঁজি লাগে না। একটু দাড়ি আর মাথায় টুপি থাকলে তা বাড়তি বোনাস। অধিকাংশ মানুষ এদেশে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ এবং ডানপন্থী। সেখানে যে কোনো ইসলামি জোশ' চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। আর ধর্মব্যবসাকে বা ধর্মব্যবসায়ীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো সাহায্য করেছে সব ধরনের 'সেকুল্যার দল'।

১৯৯১ সাল থেকে বিএনপির স্ট্র্যাটেজি বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার। আর জামায়াতের উদ্দেশ্য, ফাঁক-ফোকর খুঁজে নিজেদের 'আদর্শগত' আধিপত্য কায়েম করে অন্তিমে ক্ষমতা দখল। বিএনপিতে এখন হাওয়া ভবনপন্থীরা ক্ষমতায়। তারা চাচ্ছে, হাওয়া ভবনপন্থী ছাড়া অন্যান্য বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বা বামপন্থী সমর্থকদের নিশ্চিহ্ন করা। এই স্ট্র্যাটেজিতে সঙ্গী হচ্ছে জামায়াত। বাংলা ভাই এর উদাহরণ এবং সংবাদের সাক্ষাৎকারে সেটি পরিস্ফুট। ওই এলাকার জনাব আবদুল জলিলের ট্রাম্পকার্ডটি যদি হারিয়ে না যেতো, তাহলে আজ হঠাৎ বাংলা ভাইয়ের উৎপত্তি হতো না। সরকার বা জোট বিরোধী প্রবল আন্দোলন এসব আনাচার রোধ করার প্রধান হাতিয়ার। যতদিন সরকার পতনের ডেডলাইন ছিল ততদিন অনাচারকারীরা খানিকটা সংযত ছিল। লক্ষ করবেন, জনাব জলিল নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ার পর বাংলা ভাইয়ের উত্থান। জনাব জলিলের আশাবাদে সারা দেশে ফ্যাসিবাদ নিপাতের আশা করা হয়েছিল। সেটি না হওয়াতে সারা দেশে হতাশা দেখা দিয়েছে। আওয়ামী লীগ এখন সংসদেও যাবে। শেখ হাসিনা ফেরার সময় যদি আরেকটি ট্রাম্পকার্ড এনে জনাব

জলিলকে দেন তাহলে অন্য বিষয়। কিন্তু সেটি হওয়ার নয়। পুরো বিরোধীদলীয় রাজনীতি মূলত হয়ে যাচ্ছে আবেদন-নিবেদনের। মানুষ এদের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। অন্যদিকে পুলিশের, 'সর্বহারা সন্ত্রাসীর অত্যাচার। সুতরাং এর এখন প্রতিকার হবে না, রাষ্ট্রে যখন কোনো আইন নেই এবং জনাব জলিলের পশ্চাৎগমনের পর যখন অনিশ্চয়তা তখন একটি বেআইনি শাসন মেনে নেয়াই ভালো। তাছাড়া বাংলা ভাই ও পুলিশরা সশস্ত্র। তারা নিরস্ত্র। আর এদেশে তো বঙ্গবন্ধু নেই আর হবেও না যে, নিরস্ত্রদের নিয়ে রুখে দাঁড়াবেন। সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাইয়ের উদ্ভব। অন্যদিকে জামায়াত সুযোগ বুঝে একটা কেস স্টাডি করছে। একটি এলাকায় তালেবানি শাসন প্রতিষ্ঠা করলে কী হতে পারে, তা-ই তারা দেখছে।

৫. যা হতে পারে

ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। কারণ আমরা জ্যোতিষ চর্চা করি না, তবে অনুমান করে নিতে পারি :

১. বলকানাইজেশন অফ বাংলাদেশ হতে পারে। অর্থাৎ এরকম বিভিন্ন এলাকায় বাংলা ভাই জাতীয় সামন্ত সর্দারদের উদ্ভব হতে পারে। তবে সব জায়গায় জোটীয় সামন্তরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে এমনটি হবে না। তারেক জিয়ার এলাকার লোক যেমন চারটি জেলা দখল করেছে, তেমনি গোপালগঞ্জ, টুঙ্গিপাড়া বা অন্যান্য এলাকার আওয়ামী শাসন কায়েম হতে পারে। বা যে ভাই টাকা-অস্ত্র জোগাড় করতে পারবেন, সে ভাই সে এলাকা দখল করবেন। আমেরিকা ও ভারত এটিকে সমর্থন করবে। এবং কে না জানে বিএনপি-জামায়াতের মতো মার্কিন-ভারতপন্থী দল খুব কমই আছে। কারণ, বিভক্ত বাংলাদেশ হবে দুর্বল ও নতজানু। ইতোমধ্যে সরকারি আচরণে তা স্পষ্ট। পাকিস্তানি পররাষ্ট্র সচিবের নৈশভোজে নাকি জনা পাঁচেক মন্ত্রী প্রটোকল ভেঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তবে সরকারি এই নীতি বুমেরাংও হতে পারে। বাংলা ভাইদের বিরুদ্ধেও হয়তো অস্ত্র ধরা হবে। শুরু হবে রক্তারক্তি যা কারো নিয়ন্ত্রণে থাকবে না।

২. ওই চার জেলায় তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠা হ[illegible]বিভিন্ন জেলাকে ওই ধরনের তালেবানি শাসনের অধীনে আনা হবে। আমেরিকার ভাইস রয় এই তালেবানদের সমর্থন করবে যেমন করেছিল আফগানিস্তানে তারপর মৌলবাদ দমনের নামে আফগানিস্তান বা ইরাকে যা করেছিল ঠিক তাই করবে। তবে, তালেবানি শাসন জামায়াত প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তারা বিএনপিকে ছুড়ে ফেলে দেবে। তখন সাফারি পরা, শিফন পরা, মৌলবাদী বিএনপির পালানোর পথ পাবে না। অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও তো জামায়াত বলতে পারবে তারা লক্ষ্যে পৌঁছেছে।

আমাদের অনুমান যে সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই লেখা শেষ করার পর দৈনিক সংবাদের রিপোর্ট 'গত ১৪ এপ্রিল বিকেলে মচমইলে জেএমবি'র ধর্মসভায় লুৎফর রহমান মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ড. হুমায়ুন আজাদকে 'কুত্তা' আখ্যা দেয়। জোরপূর্বক স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের দিয়ে এসব সভা আহ্বান করা হচ্ছে। স্কুল ও কলেজ প্রধানদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কালো পর্দার পার্টিশন

দিয়ে আলাদা বসার ব্যবস্থা করতে। মেয়েদের বোরকা পরা বাধ্যতামূলক। শিক্ষকদের প্রতিদিন ১০ মিনিট করে ইসলামি আলোচনা করতে হবে। সিগারেট-বিড়ি খাওয়া বন্ধ রাখতে বলা হচ্ছে। নামাজ আদায় করা হবে নিয়মিত। সর্বহারা পাওয়া মাত্র খতম করার জন্য জনগণের প্রতি নির্দেশ দিচ্ছে ক্যাডাররা। পুলিশ কোনো কিছু করলে আমরা ব্যবস্থা নেবো বলে প্রচার করছে জঙ্গি ক্যাডাররা (৭.৫.০৪)।

আরো জানা গেছে বাংলা ভাইয়ের পরিচয় হয়ে গেছে বা তার নির্দেশে বা প্রশ্রয়ে তাকে ঢাকা হচ্ছে পাকিস্তান ভাই বা পাকি ভাই। এ বিষয়ে আশা করি বিশদ আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। ওআইসিতে যুদ্ধাপরাধীকে মনোনয়ন দেয়া হবে আর দেশে পাকি শাসন হবে না এটা কি সম্ভব।

৬. পরিত্রাণ প্রয়োজন কি-না?

এদেশের অধিকাংশ মানুষই যেহেতু অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ এবং ডানপন্থী, সেহেতু তারা ফ্যাসিস্ট শাসন বা তালেবান শাসনে হয়তো আপত্তি করবে না। বর্তমান সময় তার প্রমাণ। এবং এই শাসনের ফলে সাফারি, স্যুট পরা মৌলবাদীরা সবচাইতে লাভবান হচ্ছে। এরা হচ্ছে মৌলবাদের অন্য মুখ, যা বিদেশিদের দেখানো হয়। এ অবস্থায় যারা বসবাস করতে পারেন করবেন, দেশত্যাগের ক্ষমতা থাকলে চলে যাবেন। না হলে পরিবার পরিজনসহ নিজেকে আল্লাহর জিম্মায় রেখে দিন গুজরাণ করবেন। ১০ মে দাতাদের বৈঠকের পর দেখবেন ফ্যাসিবাদ কাকে বলে। এই লেখা প্রেসে যাওয়ার সময় খবর এলো আহসানউল্লাহ মাস্টার নিহত হয়েছেন। বিরোধী দলের যারাই কমিটেড ও সৎ তাদের মেরে ফেলা হবে এ বিষয়টি এখন নিশ্চিত।

সংখ্যালঘিষ্ঠ যারা, লিবারেল বা মধ্যপন্থী যারা, ফ্যাসিস্ট বা তালেবানি শাসন তারা চান না। তাদের সফল হতে হলে দোদুল্যমান রাজনীতি ত্যাগ করতে হবে। স্পষ্ট ভাষায় বলতে হবে কী চান? সিস্টেম বদলানোর জন্য বিপ্লব দরকার, সে কারণে ৫০০ বছর অপেক্ষা করতে চান না, আগে মানুষ বাঁচিয়ে বিপ্লব করতে চান? সংসদে হাজিরা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন, না পাল্টা মার দেয়ার জন্য জনগণকে সংগঠিত করবেন, বোঝাবেন- সেটাও ঠিক করতে হবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে গত চার যুগ ধরে মানুষ যাদের চেহারা দেখে আসছে, তাদের অধিকাংশকেই মানুষ চায় না। বিকল্প এই একটিই আছে। প্রতিরোধের বদলে প্রতিরোধ এবং সেক্ষেত্রে জোট অহিংস হবে না সেটা ও মনে রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার, সবারই, কিছু অর্জন করতে হলে কিছু ত্যাগ করতে হয়।

তবে সাফারি ও শিফন পরা মৌলবাদীদের একটি কথা বলি, তালেবানরা পুরোপুরি ক্ষমতায় বসতে পারলে সাফারি আর শিফন পরে এদেশে ঘুরতে হবে না। সে বিষয়টি মনে রাখলেই খুশি হবো। আর আমাদের জন্য হয়তো অন্তিমে এটিই হবে সান্ত্বনা।

১০.৫.২০০৪

বোমা থাকবে না তো কি তবারুক থাকবে?

ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর ঘৃণ্য বোমা হামলার পর দেশব্যাপী প্রতিবাদ- বিক্ষোভ, নিন্দার তুফান শুরু হয়েছে এবং তা দেখে আশ্চর্য লাগছে! অন্তত যুদ্ধপরাধীদের যারা সমর্থন করে এবং জোট বাঁধে তাদের তো এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যারা নিরপেক্ষ তাদেরও তো ঘৃণা প্রকাশ করার কিছু নেই। তারা সবাই এত বিজ্ঞ, রাজনীতি বোঝেন, তাহলে তারা আশ্চর্য হন কেন? যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থন করবো, তাদের সঙ্গে যারা গাঁটছড়া বাঁধে তাদের ব্যাপারে উল্লাস প্রকাশ করবো আর বোমা হামলা হলে দুঃখিত হবো তা হতে পারে না। আপনারা কি আশা করেছিলেন তাদের আমলে মাজারে মসজিদে বোমা থাকবে না, তবারুক বিতরণ করা হবে। যারা এ ধরনের চিন্তাভাবনা করেছিলেন তারা হয় মুর্খ, নয় প্রতারক এবং এখনো সেই প্রতারণা করে চলেছেন।

ইতিহাস আমাদের কারো ভালো লাগে না জানি, যদি না তা নিজপক্ষে কিছু যুক্তি তুলে ধরে। কিন্তু, কোনো ঘটনা বিনা কারণে ঘটে না, একটা পটভূমিকা থাকে, থাকতেই হবে এবং বর্তমানে ঘটনার কারণ জানতে হলে পুরোনো কিছু ঘটনার পর্যালোচনা করতে হবে।

১৯৭৫ সালে জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখলের পর যখন যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি দিয়ে দোস্তি পাতালেন তখনই যুদ্ধাপরাধী, ক্যান্টনমেন্ট ও বিএনপির মধ্যে একটি যোগাযোগ গড়ে উঠলো। এটি তাদের জন্য ভালো হলো বটে কিন্তু, দেশের ঈশান কোণে যে মেঘ দেখা দিলো তা কেউ অনুধাবন করেনি। সেই মেঘ আস্তে আস্তে ছড়িয়েছে ক্যান্টনমেন্টের আরেক প্রতিনিধি এরশাদের আমলে। লক্ষণীয় ক্ষমতা উৎখাতকারী বা দখলকারী জিয়া-এরশাদ ক্যান্টনমেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে রাজাকার-আলবদরদের শুধু পুনঃপ্রতিষ্ঠাই করেননি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনর্বাসিত করেছেন। বেগম জিয়া তাদের আরব্ধ কাজটি সমাপন করেছেন মাত্র। তিনি রাজাকার-আলবদর যুদ্ধাপরাধীদের পার্টিকে আঁচলে বেঁধেছেন এবং ক্ষমতায় গেছেন। যেদিন এ কাজটি হয়েছে সেদিনই বাংলাদেশের পুরো আকাশে কালো মেঘে ঢেকে গেছে এবং ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। এই ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা এখন লাগলো ব্রিটিশ হাইকমিশনারের গায়ে।

ধর্মব্যবসায়ীদের উত্থান ১৯৭৫ থেকে শুরু হলেও নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় স্বৈরাচার থেকে মুক্তির জন্য রাজনীতিবিদরা জামাতের প্রতি নমনীয়তা দেখিয়েছেন। কিছু পত্রিকা এবং আমরা এর বিরোধিতা করেছিলাম এই যুক্তিতে যে হরিণ যেমন মাংস খায় না, বাঘ যেমন ঘাস খায় না, জামাতও তেমন রক্ত ছাড়া থাকতে পারে না। গণতন্ত্র তাদের কাছে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার একটি ধাপ

মাত্র। যেসব রাষ্ট্র নিজেদের ইসলামি বলে সেসব একটি রাষ্ট্রের উদাহরণ দেখান যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দেখা গেছে স্বাভাবিকভাবেই জামাতের রাজনীতি রগকাটা রাজনীতি নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

আওয়ামী লীগ আমলে ধর্মব্যবসায়ীদের বোমা হামলা শুরু হয়। তখনও আমরা বলেছি, এর পেছনে ধর্মব্যবসায়ী যাদেরকে মৌলবাদী বলা হয় তারা সক্রিয়। আমাদের এসব মন্তব্যে অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এমনকি আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাও। খুব সম্ভব, আওয়ামী লীগ আমলে ৬টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। তার মধ্যে অনেক ক'টির তদন্ত শুরু হয়, উদীচী বোমা হামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়, গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল অনেককে। কিন্তু যতটা কঠোর হওয়া উচিত ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের সে সময় তা হয়নি। তাদের অনেক নেতা শিশুর মতো। তারা মনে করেন ইনকিলাবকে তোয়াজ করলে ইনকিলাব তাদের পক্ষে লিখবে, মৌলবাদী বা সেনাবাহিনীকে তোয়াজ করলে তারা তাদের পক্ষে রাস্তায় নেমে পড়বে। সোনিয়া গান্ধীও নিতান্ত স্বল্প শিক্ষিত গৃহবধূ ছিলেন এবং তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন কংগ্রেসের প্রধান শত্রু মৌলবাদীরা এবং তাদের তোয়াজ করে যে ফল হয় না ইতিহাসেই তার সাক্ষী আছে। আমাদের শিশুর মতো আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকেই তা বুঝতে চাননি। এখন বুঝতে পেরেছেন কিনা জানি না! এ কারণে সামান্য তাও বিদেশী গৃহবধূ হয়ে ওঠেন অনন্য আর আমাদের অনন্য নেতারা হয়ে ওঠেন সামান্য।

এভাবেই ধর্মব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক দল, শক্তিশালী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশ্রয়ে শক্তিশালী হয়েছে। একটি উদাহরণ দিই, ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত যত রাজনৈতিক বা ধর্মীয় হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার জন্য দায়ী কোনো খুনির শাস্তি হয়নি। কিন্তু সেক্যুলার আদর্শে বিশ্বাসী, লিবারেল, গণতন্ত্রমনা অনেকে এ সময়টুকু শুধু শাস্তিই পাননি মৃত্যুবরণও করেছেন। শুধু তাই নয়, সেক্যুলার আদর্শে বিশ্বাসী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবীরা আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু বিএনপি-জামাত সমর্থক কেউই আক্রান্ত হননি বরং একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মানসিক গঠনের কথাও এসে যায়। মানসিকভাবে আমাদের দোস্তি হিপোক্রেসি এবং ডানপন্থার সঙ্গে। পারিবারিকভাবেও আমরা ধর্ম নিয়ে অতিশয়োক্তি করি, ভাবি বেহেশতের পথটা সুগম হলো, কিন্তু মর্ত্যে সামান্য মানবিকতাও দেখাই না। এখনও পাকিস্তানি হতে আমরা যত ভালোবাসি, তাদের ডিকটেটরশিপকে যত শ্রদ্ধা করি ভারতীয় গণতন্ত্রকে ততই ঘৃণা করি। ওরা যে হিন্দু! সেনাবহিনীতে এখনও প্রশিক্ষণের সময় বলা হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের বন্ধুরা হলো শত্রু, স্বাধীনতা হরণকারীরা হলো বন্ধু।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা সহজ কেন ২০০১ সালে চরম ডানপন্থী যুদ্ধাপরাধী জোট ক্ষমতায় এল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কলঙ্ক লতিফুর ও তার গং, বাংরেজ প্রধান নির্বাচনী কমিশনার সাঈদ ও তার গং জনগণের একাংশ, সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা ও সংবাদপত্রের জোশে যুদ্ধপরাধীদের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেলো। এর সঙ্গে ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সক্রিয় সমর্থন।

যুদ্ধাপরাধী জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেই, লতিফুর মুয়ীদ গংদের তত্ত্বাবধানে হিন্দু নির্যাতন, আওয়ামী নির্বাচন করেছে প্রকাশ্যে। সুতরাং ক্ষমতায় এসে প্রথম দিন থেকে তারা টার্গেট প্র্যাকটিস শুরু করেছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় প্রথমদিকে জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, সংবাদ ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্রিকা এসব টার্গেট প্র্যাকটিসের পক্ষে ছিল, অন্তত বিপক্ষে ছিল না। আমরা যারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিরোধিতা করেছিলাম তারা আওয়ামী লীগের 'দালাল' ও সরকার বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে মাশুল দিয়েছি। দুঃখের বিষয়, আজ যেসব রাজনৈতিক দল ঘৃণা প্রকাশ করছে তারাও সে সময় নিশ্চুপ ছিল। আজ কী প্রমাণিত হলো-

১. এখন সবাই বলছে মৌলবাদীদের প্রধান প্রতিষ্ঠান জামাত বা তার প্রভাবিত কেউ এ কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। আপনাদের খেয়াল আছে কিনা ১২ জানুয়ারি হযরত শাহজালাল (র.)-এর মাজারে বোমা হামলা হয়। তার তিনদিন আগে যুদ্ধাপরাধী সাঈদী 'মাজার ও ওরশকে হারাম এবং ধর্মবিরোধী' হিসেবে ফতোয়া দেন। পরবর্তী সময়ে এ ঘটনার নেপথ্যে সাঈদীর বক্তব্যকে দায়ী করে অনেক সংগঠন প্রতিবাদ জানালেও জামাতে ইসলামী অভিযোগের প্রতিবাদ করেনি। বরং ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার সুবাদে তদন্তকে প্রভাবিত করার অভিযোগ ওঠে জামাতের বিরুদ্ধে (ভোরের কাগজ, ২২.৫.০৪)। এর পর দরগাহর মাছ মেরে ফেলা হয়। বায়েজীদ বোস্তামীতে কাছিমের ওপর হামলা হয়, এখন ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলা হলো। সিলেটে সাঈদী টাইপের আরো কিছু লোক আছে যারা প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে এ ধরনের ফতোয়া দেয়। উল্লেখ্য, সাঈদীর একটি মন্তব্যের পরই অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা হয়।

২. এ ধরনের প্রতিটি ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং ত্রয়োদশ ভূঁইয়া আওয়ামী লীগকে দায়ী করে বিবৃতি দেন। তারপর কিছু ঘটে না। যেমন, ঘটেনি বাংলা ভাইয়ের ক্ষেত্রে। এবারও কঠোর নির্দেশ ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তদন্ত হবে বলে জানা গেছে এবং আওয়ামী লীগই এজন্য দায়ী বলে বিএনপি নেতারা ঘোষণা করেছেন। এ ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ই প্রমাণিত- এক. সরকার চাইছে কিন্তু পারছে না কারণ পুলিশ চরমভাবে অদক্ষ, দুই. সরকার চাইছে না। উল্লেখ্য, বোমা বিস্ফোরণের পর 'মাজারের লোকজন আলী আসগর নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশে সোপর্দ করলেও তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।' (জনকণ্ঠ ২২.৫.০৪)। এর আগেও অনেককে ধরলেও পরে তারা বিভিন্ন কারণে ছাড়া পেয়ে যায়।

আমরা মনে করি, দুই কারণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমান যে পুলিশ বাহিনী, অনেকের মতে তা পুরোপুরি জামাত-বিএনপি ক্যাডার বা প্রভাবে পরিপূর্ণ। দক্ষতা তাদের মাপকাঠি নয়। আর তারা জানে, তদন্ত সুষ্ঠু হলে নিজেদের অর্থাৎ সরকারকেই হয়তো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এরজন্যই বোধহয় আলী আসগররা ছাড়া পেয়ে যায়। এটা জোট নেতৃবৃন্দও ভালো জানে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় এবারো কোনো তদন্ত হবে না, কেউ ধরাও পড়বে না। যদি এ যুক্তি না মানেন তাহলে বলতে হবে জোট সরকারের

কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই দেশের ওপর। সুতরাং তাদের ক্ষমতায় থাকার বা রাখার যুক্তি কি?

বিদেশী শক্তির মধ্যে শুরু থেকে আমেরিকা ইংল্যান্ড জোটকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এটা তাদের গ্লোবাল পলিসির এক্সটেনশন মাত্র। বর্তমান, ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের অনুরোধ করবো, আপনাদের পুরোনো কাগজপত্র ঘেটে দেখুন, সাবেক রাষ্ট্রদূত কী সব রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। যখন হিন্দু নির্যাতন চরমে তখন শুনেছি এবং মনে হয় পত্রিকায় পড়েছিও যে দূতাবাস থেকে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে এ ধরনের নির্যাতন হয়নি। তারা দেখেও না দেখার ভান করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের দূতাবাস যদি এখন রিপোর্ট পাঠায়, এটি মডারেট মুসলিম দেশ, মডারেট একটা হামলা হয়েছে, রাষ্ট্রদূত মডারেটলি আহত হয়েছেন চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই- তাহলে আমরা অবাক হবো না। তবে ভাগ্যের কী পরিহাস যাদের পেছনে তাদের এত উৎসাহ এবং তারা ওদের কর্মকাণ্ডে এতই খুশি ছিল যে, বাংলাদেশকে সন্ত্রাসমুক্ত তালিকায় রেখেছে তাদেরই রাষ্ট্রদূত আজ বোমা হামলায় আহত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যতটুকু জানি, টনি ব্লেয়ার শাসিত দেশটি ছাড়া অন্যান্য দেশ কূটনৈতিকভাবে জোটীয় তৎপরতার বিরুদ্ধে বলেছে।

৩. আজমীর শরীফ যেমন ভু-ভারতে সেরা তীর্থস্থান, সব ধর্মের সব মানুষ সেখানে নিয়মিত যান। হযরত শাহজালাল (র.)-এর মাজারেরও বাংলাদেশে স্থান সেরকম। এর মধ্যে ধর্মসহিষ্ণুতার একটি ব্যাপার আছে। বিএনপি-জামাত ধর্মসহিষ্ণুতার পক্ষে নয়। আর এস এস মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছে, বিজেপি বাবরি মসজিদ ভেঙেছে কিন্তু আজমীরে বোমা বিস্ফোরণ হয়নি। সুষমা স্বরাজ এক মাথা ন্যাড়া করার কথা বলে বাড়ির বাইরে যেতে পারছেন না। অথচ গজার মাছের মৃত্যু ধরলে তিনবার এই মাজারে হামলা হয়েছে, মানুষ খুন হয়েছে। কিন্তু ধর্মব্যবসায়ী, জোট সমর্থক যারা এর জন্য দায়ী তারা বহাল তবিয়তেই আছেন। সুতরাং ধরে নিতে হবে এ ধরনের ঘটনায় মানুষের ব্যাপক সমর্থনও আছে। না হলে, যেখানে এসব ঘটছে সেখানে জনবিস্ফোরণ ঘটতো। মানুষজন এত কিছু জানে, আর তারা জানে না কারা কেন এসব ঘটাচ্ছে এবং জেনেও যখন মানুষ নিশ্চুপ থাকে তখন তাকে সমর্থক বলা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে।

৪. সেনাবাহিনী যে এখন বিএনপি-জামাতের, সাধারণ মানুষের আজ্ঞাবহ নয় তা আবার প্রমাণিত হলো এবং এ নির্বাচনে যে তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাও আবার প্রমাণিত হলো। দেখুন, সিএমএইচে যেতে, ক্যান্টনমেন্টে যেতে, মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জানাতে আওয়ামী লীগের যারাই গেছে তাদেরই বাঁধা দেওয়া হয়েছে। বাধা দেওয়া হয়নি জামাত-বিএনপির কাউকেই। গতকালও একই ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা শহরের মধ্যে এই ক্যান্টনমেন্ট এখন বিষফোঁড়ার মতো এবং জামাতি-বিএনপিরা খুশি যে আইনি সশস্ত্ররা তাদের পক্ষে। সুতরাং এটা হুমকির মতো যে, জামাতি-বিএনপির বিরুদ্ধাচরণ করলে অপারেশন ক্লিনহার্ট হবে এবং তারা যাতে এসব ঘটাতে পারে সেজন্য ইনডেমনিটি দেওয়া হয়েছে। ইঙ্গিতটা এরকম- তোমরা যাই করো তোমাদের ইনডেমনিটি আছে। শুধু বরাহ শাবক জনগণ যাতে মাথা তুলতে না পারে।

যদি গণতন্ত্র মানেন তাহলে মানতে হবে, পুলিশ-সেনাসহ জোটীয়রা একদলে।

তাদের জনসমর্থনও আছে বিদেশী সমর্থনও আছে। সুতরাং এসব চলবে। আর যদি মনে করেন, না স্বার্থান্বেষী কিছু গ্রুপ বা ব্যক্তি দেশটির ওপর সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো চেপে বসেছে এবং তাহলে সেই দৈত্য অপসারণের বন্দোবস্ত করতে হবে। ঘৃণা প্রকাশ, বিবৃতি, এমনকি আমার এই লেখাও এক্ষেত্রে বাতুলতামাত্র।

সে জন্যই বলেছিলাম, বোমা হামলার সমর্থক যখন এত এবং যখন কোনো হামলাকারীই ধরা পড়ে না তখন আমাদের পথে পথে বোমা বিছানো থাকবে না তো কি তবারুক থাকবে? আমাদের অনেকের ধারণা এ ধরনের ঘৃণ্য কাজের মাধ্যমে ইসলাম রক্ষা হচ্ছে, দেশে ইসলামি জোশ বলবৎ হচ্ছে, আখেরাতের পথ সুগম আছে এবং মানুষকে রক্ষা করা হচ্ছে। আর আমরা যদি মনে করি এ ধরনের হত্যার মাধ্যমে ইসলাম রসাতলে যাচ্ছে, দেশটি একটি বর্বর দেশে পরিণত করা হচ্ছে এবং মানুষকে রক্ষা নয় তার মনুষ্যত্ব নষ্ট করা হচ্ছে তাহলে সকল দোদুল্যমানতা ত্যাগ করে পথে নামতে হবে। সিন্দাবাদের দৈত্যকে আমাদেরই সরাতে হবে। আমাদের হয়ে কেউ সেই দৈত্য হটাবে না। আমাদের চুপ থাকা মানে এ ধরনের, ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড সমর্থন করা এবং এতে উৎসাহিত হয়ে এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটানো হবে। পথে পথে আরো বোমা বিছানো হবে ইসলামের নামে, তবারুক নিয়ে কেউ অপেক্ষা করবে না।

২৪.৫.২০০৪

অধ্যাপক-বিচারকরাও যখন অসত্যের বেসাতি করেন

কয়েক সপ্তাহ আগে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন আয়োজিত শুনানিতে বাঙলাদেশের পক্ষ থেকে চারজন যোগ দিয়েছিলেন। কমিশনে তাদের বক্তব্য ও আচার-আচরণ থেকে একটি বিষয় আবারো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, তাহলো- বাংলাদেশের অতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশ চরম হীনম্মন্যতাবোধে ভোগে। শুধু তা-ই নয়, অকারণে মিথ্যা কথাও বলে এবং এ অংশটি শাসক গোষ্ঠীতে জড়িয়ে গড়ে উঠেছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা শুনানিতে যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক রাজিয়া আক্তার বানু, তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান, একটি এনজিও প্রধান আরমা দত্ত ও মানবাধিকার কর্মী রোজালিন কোস্তা। তারা যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ এখন এক মানসিকভাবে বিভক্ত রাষ্ট্র। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু এখন সম্প্রদায়গত নিরাপত্তার প্রশ্নে এক নয়। সবচাইতে দুঃখ, সংখ্যাগরিষ্ঠদের দুই প্রতিনিধি সরাসরি সরকার বা জোট সরকারের বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং ধর্ম যে ব্যবসাযোগ্য পণ্য, তাও তুলে ধরেছেন।

অধ্যাপক রাজিয়া আক্তার বানু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত কি-না জানি না, তবে ধর্মনিরপেক্ষ বা আওয়ামীপন্থী বলে পরিচিত নীল দলের সঙ্গে যে যুক্ত নয়, তা জানি। তার পোশাক-আশাকে তাকে খুবই ধর্মানুরাগী বলে মনে হয়। তিনি মাথায় টুপি ও হেজাব পরে আসেন। না, ব্যক্তিগতভাবে আমি তা অপছন্দ করলেও পোশাকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আর অপছন্দের কারণ ধর্ম নয়, এটি প্রদর্শনমূলক, হীনম্মন্যতার ও ধর্ম ব্যবহারের প্রতীক বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। বাংলাদেশের মহিলারা গত দু দশকে ধরে এটি ব্যবহার করছে। আগে এই সংস্কৃতি এখানে ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত বাংলাদেশের শ্রমিকরা তা আমদানি করেন, তাদের স্ত্রীদের এটি পরতে বাধ্য করেন এটি দেখাতে যে, তারা আলাদা মর্যাদাধারক, ইসলামের বান্দা। সউদিতে এ পোশাক পরা হয়। সুতরাং তা উচ্চ ইসলামি বোধ ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। যাক সে প্রসঙ্গ। তার থিসিসটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে। অন্য কোনো লেখা তেমন চোখে পড়েনি। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'খ্যাতনামা' অনেক প্রফেসরের মধ্যে তাকে আহ্বান খানিকটা বিস্ময়জনক- এমনটি বলেছেন অনেকে। না আমি তা বিস্ময়জনক মনে করি না। বিস্মিত করেছে আমাকে অন্য একটি বিষয়।

দৈনিক সংবাদে উপযুক্ত চারজনের সচিত্র সাক্ষাৎকার (২৯.৫.২০০৪) প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আরমা ও রাজিয়া আক্তার বানুর ছবির পটভূমি একই। অর্থাৎ পিছে

একই বইয়ের র‍্যাক। অর্থাৎ ছবিটি তোলা হয়েছে নিউ ইয়র্কে। কিন্তু আশ্চর্য, নাছারাদের দেশে, ইসলামিদের ভাষায় যেখানে 'বেলেল্লাপনা'ই প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেখানে পর্দানশীন প্রফেসর বানুর মাথায় টুপি-হেজাব কোনোটিই নেই। কিন্তু এ ছবিতে তাকে সুদর্শন এবং অভিজাত অধ্যাপকের মতোই লাগছিল। তার হঠাৎ এই পরিবর্তন অনুধাবনের চেষ্টা করলাম। আমেরিকা এখন মুসলমানদের প্রতি ক্ষুব্ধ, তাদের রহস্যজনক ও সন্দেহজনক মনে করে। ইমিগ্রেশনে এ ধরনের 'ইসলামি' পোশাক দেখলে আটকাতে পারে, কমিশনের সদস্যরা ভাবতে পারেন তিনি কট্টর মুসলমান। এ কারণেই প্রফেসর বানু বাংলাদেশে যে ধর্মীয় লেবাস পরেন, তা ত্যাগ করে আবার চিরন্তন বাঙালি মহিলার পরিচয়ে ফিরে এসেছেন। এই দীর্ঘ পটভূমি দিলাম এটি বোঝাতে যে, আমাদের এখানে ধর্ম যে পণ্য সেটা তার এই পোশাক পরিবর্তন থেকে অনুমান করা যায়।

বিচারপতি লতিফুর রহমান প্রধান বিচারপতি ছিলেন বাংলাদেশে, সে সুবাদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান। তার আমলের নির্বাচনটি খুবই বিতর্কিত, তার শাসনামলও। এ সময়ই বিখ্যাত 'সালসা' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তার আত্মজৈবনিক গ্রন্থে তার বিতর্কিত আমল ডিফেন্ড করেছেন। তার লেখা ও বাস্তবে কোনো মিল নেই। তবে তার ডায়েরির কিছু কিছু অংশ অনেক সত্য তুলে ধরে অগোচরে। যেমন সেপ্টেম্বর ২০, ২০০১ সালে লিখেছেন : সেনাবাহিনী প্রধান লে. জে. হারুনুর রশীদ বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৭২-এর সংশোধনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে যে বাড়তি সুবিধা দেয়া হয়েছে, তার ফলে সেনাবাহিনী আসন্ন অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।' এবং তা করেছিলও। জোটপ্রার্থী ও সমর্থক ব্যতীত বাকিদের ওপর সেনাবাহিনীর প্রবল অত্যাচার জোট সরকারকে ক্ষমতায় এনে দেয়। এরপর অবসর নিয়ে সেনাপ্রধান রাষ্ট্রদূতের চাকরি পান। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জনাব সাহাবুদ্দীন সেনাবাহিনীকে এই ক্ষমতা দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, যে ক'জন বিচারক তাদের রায়ে জেনারেল জিয়ার সামরিক আইনকে বৈধতা দিয়েছিলেন, তিনি তার একজন। জিয়াউর রহমানের সামরিক আইনের বিধানাবলীই বাংলাদেশে পাকিপন্থী মৌলবাদী এবং বাঙালি ও বাংলাদেশ বিরোধীদের পুনর্গঠিত করে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদা দেয়, অন্তিমে ক্ষমতায় আসীন করে।

উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের হাতে নিহত মামলায় তিনি রাজাকারদের সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের খালাস করে এনেছিলেন। এতে তার আইনি ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য মনে রাখা দরকার আরেকজন প্রধান বিচারপতি রাজাকার-আলবদরদের মামলায় 'রাষ্ট্রীয় আক্রোশ' দেখেছিলেন এবং কোন্ স্তরের ছিলেন বোঝা যায় গোলাম আযমের কাছে দোয়া ভিক্ষা করতে যাওয়ায়। হাইকোর্টের বিচারকরাই গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদান করেছিলেন। সুতরাং বিচারকদের ঐতিহ্য সম্পর্কে যে আমাদের ধারণা নেতা তা নয়। ধর্মীয় কমিশনে জনাব রহমানের বক্তব্য সেই ঐতিহ্যই তুলে ধরে।

আরমা দত্ত ধর্মীয় পরিচিতিতে হিন্দু। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এখন প্রিপ ট্রাস্টের নির্বাহী। জোট সরকারের আক্রোশে সেটি বন্ধের পথে।

সুতরাং বর্তমান অবস্থান বোঝা যায়। হিন্দু ধর্ম কেন, কোনো ধর্ম নিয়েই তিনি মাথা ঘামান বলে শুনিনি। বাংলা ভাষা যে রাষ্ট্রভাষা, সেক্ষেত্রে তার দাদা ধীরেন দত্তের অবদান স্বীকৃত। রোজালিন কোস্তা, খৃস্টান ধর্মাবলম্বী। মানবাধিকার কর্মী হিসেবে পরিচিত। বোঝা যায়, কমিশন সব ধর্মের মানুষজনের কথাই শুনতে চেয়েছিল। বাদ পড়েছেন শুধু বৌদ্ধরা।

রাজিয়া বানু স্পষ্ট ভাষায় কমিশনকে জানিয়েছেন, 'আসলে যারা নির্যাতিত হয়েছে বলে দাবি তুলছে তারা সত্য নয়।' জোটের মন্ত্রী ও নেতারাও হরদম একথা বলে আসছেন। তারাই ইসলামি লেবাসধারী এবং স্যুট-সাফারি পরেন। আমেরিকা তো প্রায় সবাই-ই ঘুরে এসেছেন। রাজিয়া বানু আরো যা বলেছেন, তার সঙ্গে জামায়াত-বিএনপি নেতাদের বক্তব্যের কোনো অমিল থাকলে অনুগ্রহ করে কোনো পাঠক বা জোট সমর্থনকারীও যদি জানান, তাহলে আমার বক্তব্যে প্রত্যাহার করে নেবো। রাজিয়া বানু জানান, "একটি ঘটনায় তিনি একটি গ্রামে গিয়ে দেখেন মন্দিরে একটি মূর্তির হাত কে বা কারা যেনো ভেঙে ফেলেছে। এতে এলাকার হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। তিনি তদন্ত করে স্থানীয়দের কাছ থেকে তথ্য পেলেন যে, এ কাজ আসলে রাতের বেলায় হিন্দুরাই করে স্থানীয় বিএনপি কর্মীদের ওপর দোষ চাপিয়েছে। অন্য আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার নিজ এলাকা নোয়াখালীতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, সেখানে কয়েকটি হিন্দু পরিবার স্থানীয়ভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তিনি এর তদন্ত করতে গেলে স্থানীয় লোকজন তাকে জানায়, 'জানেন, এই হিন্দু পরিবারগুলো গত আওয়ামী লীগের আমলে এ এলাকার সব মুসলিমের ওপর ভীষণ অত্যাচার করেছে। তাই তাদের ওপর রাগে প্রতিশোধ নিতেই জনগণ তাদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেছে।'

তিনি বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বলে কিছু নেই এবং সেখানে সবাই তাদের মৌলিক অধিকার, নাগরিক অধিকারসমূহ ভোগ করে থাকে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে ধর্ম এবং রাজনীতিকে আলাদা করে দেখা যায় না। এ দু'টো বিষয় বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এক আঙ্গিকে চলে। শুনানিতে তার আলোচনার বিষয় ছিল বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলাম, পটভূমি, বর্তমান অবস্থা ও প্রবাহ।" [ঐ]

তিনি একজন গবেষক বলে জানতাম। কিন্তু কোনো গবেষক এ পদ্ধতিতে কাজ করেন বলে জানা ছিল না। স্থানীয় কয়েকজন জানালেন, হিন্দুরাই তাদের দেবীর হাত ভেঙে ফেলেছেন এবং তিনি তা বিশ্বাস করলেন। কোনো মুসলমান কোনো কোরআন শরীফ ছুড়ে মারতে পারে– এটি আমাকে বললেই আমি বিশ্বাস করবো? অবশ্য কথা আছে, বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই এ ধরনের কাজ করতে পারছেন স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এটা পাকিস্তান থেকে এসেছে। ১৯৭১ সালে মুসলমান সৈনিকরা মুসলমান নারীদের ধর্ষণ করেছে, কোরআন পুড়িয়ে দিয়েছে, মসজিদে হামলা করেছে। এখনো এ ধরনের কিছু ঘটনা ঘটছে এবং পরে দেখা যাচ্ছে, এর সঙ্গে জামায়াত বা উগ্রবাদী সংগঠনের যোগাযোগ আছে। আওয়ামী লীগ আমলে কয়েকটি হিন্দু পরিবার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করেছে, তাও আবার নোয়াখালীতে- এটি বিশ্বাসযোগ্য? রাজিয়া বানু প্রফেসর, না হলে জিজ্ঞেস করতাম এ নোয়াখালী কোথায়?

হিন্দুবিদ্বেষ বা মানববিদ্বেষ যে একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিষাক্ত রক্তের মতো প্রবাহিত হচ্ছে, আবার তা প্রমাণিত হলো। এদের লেবাস ধর্মের কিন্তু মন যে তা নয়, এর প্রমাণ ধার্মিক হলে তারা জানতো আল্লাহ সবার, খালি মুসলমানদের নয়।

রাজিয়া বানু সরাসরি বলেছেন, বাংলাদেশে ধর্ম আর রাজনীতিকে আলাদা করে দেখা যায় না। একদিকে কথাটা ঠিক। রাজিয়া বানুরা, খালেদা জিয়ারা, মতিউর রহমান নিজামীরা চাচ্ছেন ধর্ম আর রাজনীতিকে এক করে ব্যবহার করতে, যাতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখা যায়। তারা দেশে ধর্মপ্রচার অর্থাৎ মুসলমানত্ব প্রকাশ করেন আর বিদেশে কী লেবাস পরিধান করেন, তা তো টেলিভিশনেই দেখছেন।

লতিফুর রহমানের বক্তব্যও অনেকটা একই রকম। "বিচারপতি লতিফুর রহমান জানান, ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর বিজয়ী দল দেশের কয়েকটি স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে পরাজয়ী দলের ওপর কিছু হামলা করেছে। এক্ষেত্রে যেহেতু ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগের ভোটার, তাই তাদের ওপরও এর কিছুটা প্রভাব পড়েছে। কিন্তু তা কোনোমতেই পরিকল্পিত নয় এবং সরকারের এতে কোনো হাতও ছিল না। বাংলাদেশে যেহেতু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্দিষ্টভাবে কোনো অত্যাচার- নির্যাতন হয়নি, তাই এর জন্য কোনো তদন্তের প্রশ্নও ওঠে না। একাধিকবার এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেন, তিনি এ ব্যাপারে কোনো তদন্তের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন না, কারণ সেখানে এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। তিনি তার নির্ধারিত বিষয় : তত্ত্বগত ও প্রয়োগিক, সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়ে তার সরকার কী কী করেছে, তার চিত্র তুলে ধরেন।" [ঐ]

বিজয়ী দল কি কয়েকটি স্থানে 'বিচ্ছিন্নভাবে' হামলা করেছিল? ইনকিলাবীদের বক্তব্য অবশ্য অনেকটা এরকম। তবে সমাজের সুস্থ মানুষরা বিশ্বাস করেন, পরিকল্পিতভাবে জোট ক্যাডাররা প্রশাসনের সাহায্যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানে হামলা করেছিল।

সংখ্যালঘুরা খালি আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়? বিএনপিকে নয়? তাহলে গয়েশ্বর রায়, নিতাই রায়রা কোন্ জিনিস? সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হয়নি। বিচারক রহমানের কোনো কন্যা আছে কি-না জানি না। তাহলে তার স্ত্রীকে সেই সংবাদটি পড়তে বলতাম- বিএনপি- জামায়াতি ক্যাডাররা হামলা করেছে এক হিন্দুর বাসায়। উদ্দেশ্য কিশোরী মেয়েটি ধর্ষণ। কিশোরীর মা হাতজোড় করে বলছে, বাবারা, আপনারা একজন একজন করে আসুন, আমার মেয়েটি ছোট। বা পূর্ণিমার কথা এবং প্রশাসন কীভাবে পূর্ণিমার পক্ষের লোকদের আসামি বানিয়ে দিলো সে ঘটনা। যাক, এসব লোকের কন্যা বা পুত্র থাকা না থাকা সমান।

জনাব রহমানের মিথ্যার বেসাতি নিউ ইয়র্কেই বাঁধা পেয়েছে। সংবাদের রিপোর্ট অনুযায়ী- বিচারপতি লতিফুর রহমান তার বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, "বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ এবং এখানে সকলেই তাদের মৌলিক অধিকারগুলো পুরোপুরি ভোগ করছে। এ সময় গ্যালারি থেকে প্রতিবাদ ওঠে। দীর্ঘ প্রায় দশ মিনিট

সময় ধরে এই অশান্ত পরিবেশ চলতে থাকলে সভাপতি এক পর্যায়ে শুনানি বন্ধ করে দেয়ার প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন। পরে পরিস্থিতি শান্ত হলে তিনি আবার কথা বলতে শুরু করেন। তার বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বলতে কিছুই নেই, সকলেই সমান এবং সবাই সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করে। তবে গত ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর বিজয়ী জোটের প্রধান দল জাতীয়তাবাদী ও অন্যরা সামান্য কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু সেগুলো কোনো পরিকল্পিত আক্রমণ বা নির্যাতন ছিল না এবং এতে সরকারের কোনো সংশ্লিষ্টতাও ছিল না। আর বিজয়ীদের টার্গেট ছিল পরাজিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। কিন্তু যেহেতু ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এ দলটিকেই সমর্থন দেয়, তাই এদের ওপরও বিচ্ছিন্নভাবে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। কোনো পরিকল্পিত আক্রমণ বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো আক্রমণ বা নির্যাতনের ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেনি। আর এসবই ঘটেছে নির্বাচনের পর।" [ঐ]

এখন স্পষ্ট কেন লতিফুর রহমান নব্বই দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়েছিলেন, কেন চালিয়েছিলেন, কেন তিনি ওই ধরনের উপদেষ্টা বেছে নিয়েছিলেন?

আরমা আর রোজালিন নিজ নিজ সম্প্রদায়ের চিত্র শুধু উদাহরণ দিয়েই নয়, বাংলাদেশের 'সালসা' নির্বাচন ও তার পরবর্তী অবস্থার কথাও তুলে ধরেছেন। আমরা তাদের আলোচনা নিয়ে মন্তব্য করলাম না এ কারণে যে, আমরা ধরেই নিই তাদের বক্তব্যে সরকারের প্রশংসা থাকবে না। অন্যদের উদাহরণ দিই।

অধ্যাপক ও বিচারককে জিজ্ঞেস করি তারা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের নাম শুনেছেন কি-না? যদি শুনে থাকেন, তাহলে তারা কি জানেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি নাগরিক তদন্ত কমিশন হয়েছিল, যার ফলাফল বিশ্বের অনেক কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। আইন সালিশী কেন্দ্রসহ কয়েকজন বাদী হয়ে এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। যদ্দুর মনে পড়ে রুলও জারি হয়েছিল। সরকার জবাব দিয়েছিল কিনা জানিনা। জবাব না দিলে হাইকোর্টের কিছু করার নেই। জবাব না দেয়ার অর্থ আবেদনকারীদের আবেদন সত্য। অধ্যাপক ও বিচারক অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নাম শুনেছেন? তাদের রিপোর্টগুলো দেখেছেন? ইংরেজি পড়তে পারি না, এ কথাটা আমরা বললে সাজে, বাংরেজদের তো সাজে না। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষে আব্বাস ফয়েজ শুনানিতে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি মুসলমান, আবার ইরানি মুসলমান! তিনি কী বলেছেন- আর যা বলেছেন এই অধ্যাপক ও বিচারকদের সামনেই বলেছেন। 'তিনি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর, বিশেষভাবে হিন্দু ও আহমদিয়াদের ওপর জোট সরকারের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে বলতে গেলে হিন্দু মেয়েদের ওপর গণধর্ষণের ঘটনা উল্লেখ করতে হয়। আর আহমদিয়াদের বিষয়ে বলতে গেলে, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের একটি সহযোগী দলের দাবির মুখে আহমদিয়াদের সকল প্রকাশনা বন্ধের বিষয়টি বলতে হয়। এভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নানাভাবে আঘাত করে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এটা অবশ্যই সরকারি মদদেই হচ্ছে এবং কোনো

মৌলবাদী গোষ্ঠী বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করলে সরকার যখন এর প্রতিকারের কোনো পদক্ষেপ নেয় না, তখন এটাই বলা যায় যে, এসব ঘটনা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়ই ঘটছে।

মি. ফয়েজ পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে একই পরিবারের ১১ জনকে পুড়িয়ে মারার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, এভাবেই সংখ্যালঘুদের দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে নানা কৌশল অবলম্বন করে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। আর সরকার এ ঘটনাগুলো তদন্ত করে সত্য প্রকাশের পরিবর্তে সেগুলোকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে নানা আপত্তিকর বক্তব্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মহেশখালীতে প্রায় চারশ' আদিবাসী বৌদ্ধের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে প্রায় ২০ হাজার লোককে খোলা আকাশের নিচে স্থান করে দিয়েছে। এসব ঘটনা অবিরাম ঘটলেও সরকারের তরফ থেকে তেমন কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।" [ঐ]

অধ্যাপক ও বিচারক বাংলাদেশের খবরের কাগজ পড়েন? অবশ্য তারা যদি দৈনিক ইনকিলাব ও দৈনিক দিনকাল পড়েন, তাহলে তাদের দোষ দিই না। তাদের বক্তব্য এরকমই হবে। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য কাগজে গত তিন বছর এ ধরনের নির্যাতন, মৌলিক অধিকার হরণের খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

এ ধরনের অধ্যাপক ও বিচারকদের পোশাক- (স্যুট ও ইসলামি লেবাস ব্যতীত শাড়ি) আশাক ও ইংরেজি কথাবার্তা শুনে সাবেক বঙ্গেশ্বরী মেরি অ্যান পিটার্স বাংলাদেশকে 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি' আখ্যা দিয়েছিলেন, যা পাশ্চাত্য ও জোট সমর্থকরা লুফে নেয়। এখন দেখা যাচ্ছে, এদের একটু খোঁচা দিলেই গলগল করে মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার দুর্গন্ধ বের হয়। এখন আর মডারেট শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে না। ক্রিস্টিনা রোকা বাংলা ভাইয়ের কার্যকলাপ দেখার পর ভাইস রয় হ্যারিও আর বেশি কথাবার্তা বলছেন না।

ফকির ইলিয়াস গত সংখ্যায় মৃদুভাষণে লিখেছেন এই কমিশন সিনেটে কী সুপারিশ পাঠিয়েছে। তারা বাংলাদেশ সম্পর্কে যা বলেছে, তাতে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে মান-ইজ্জত বিপন্ন হওয়ার মুখে। আর মান-ইজ্জত আছেই বা কী যে বিপন্ন হবে? নেংটার আবার বাটপারের ভয়! মনে হয় কমিশন সদস্যরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন একজন অধ্যাপক ও বিচারকের মিথ্যার বেসাতিতে, সেখানে যা কল্পনাতীত। কারণ এ দু'টি পদের সঙ্গে বিত্তের সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার। এসব পদের মিসইউজ সেখানে কেউ করেন না। আমরা বিস্মিত হইনি। কারণ দেখা যাচ্ছে এখানেও এই পদের মানুষের মধ্যে শুধু মিথ্যা বলা নয়, সামান্য রুটির টুকরোর বিনিময়ে আত্ম বিসর্জনের ঐতিহ্য তৈরি হচ্ছে। এ জাতির কি আর ভবিষ্যৎ আছে?

৭.৬.২০০৪

দুই ভগ্নদূতের প্রত্যাবর্তন এবং ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ষড়যন্ত্র আবিষ্কার

এই প্রতিবেদন লেখার ইচ্ছে আমার ছিল না। আগের মতো নিয়মিত ঘটনাপ্রবাহ সঞ্জাত প্রতিবেদন এখন আর তেমন লিখছি না। কিন্তু ইস্তাম্বুল ফেরত জোট সরকারের দুই ভগ্নদূত এবং তাদের কথাবার্তা, বিশেষ করে একজনের নতুন ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের কারণেই লিখতে হচ্ছে। তাও হয়তো লিখতাম না, কারণ যা ছিল অনিবার্য তা নিয়ে লেখার কী আছে? কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর প্রিয়পাত্র, জোট সরকারের নয়নমণি, প্রবল পরাক্রমশালী বর্তমানে ভগ্নদূত সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ওরফে সাকাচৌ কিছু মন্তব্য করায় লিখতে হচ্ছে। অত্যন্ত আশার বিষয়, দেখলাম রাজনীতিবিদসহ আরো অনেকে সাকাচৌর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। সবাই তাকে 'নিম্নস্তরের মানুষ' বলে অভিহিত করেছেন। মঞ্জুরুল আহসান খান যা বলেছেন তার সঙ্গে দেশের সুস্থ চিন্তার মানুষরা একমত হবেন- "তার মতো নিম্নরুচির লোক রাজনীতি করছে এটাই রাজনীতিবিদদের জন্য লজ্জার।"

তবে, এটাও মেনে নিতে হবে যে, আমাদের অনেকের রাজনীতিবিদ ও মানুষজন সাকাচৌর কথায় আমোদ ও উৎসাহিত বোধ করেন। না হলে সাকাচৌ এত বছর এ দেশে রাজনীতি করতে পারতেন না এবং প্রতি আমলে মন্ত্রী হওয়াও সম্ভব হতো না। তার উক্তি থেকে আমাদের রাজনীতিবিদদের বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, চরিত্র ও রাজনীতির নিম্ন পর্যায়ের চিত্র ফুটে ওঠে। শুধু তাই নয়, জাতি হিসেবেও যে আমরা রুচি বিকারে আক্রান্ত তাও স্পষ্ট হয়েছে। কারণ, এসবের প্রতিবাদ না করে সাফাই গাওয়া বা 'নিরপেক্ষ' থাকার অর্থ হচ্ছে মেনে নেওয়া। আর এ দেশটা আমরা করেছি, সাকারা বা তাদের পৃষ্ঠপোষকরা করেনি। এটি কেন আমরা বারবার ভুলে যাই।

সাকাচৌ পরাজিত হয়েছেন সে নিয়ে কোনে মন্তব্য করতে চাই না। তিনি পরাজিত হবেন এটি সবাই জানতো, জোট সরকার ছাড়া। অস্ত্র ও অর্থের জোরে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে তো কেউ তাদের চাকরবাকর না যে, বেগম জিয়ার ভ্রুকুটি দেখে বা হাওয়া ভবনের নাম শুনে আঁতকে উঠবে। কূটনৈতিক দিক থেকে যে আমরা কত দুর্বল ও অনভিজ্ঞ তা ১৯ তারিখের সংবাদে প্রাক্তন সচিব মহিউদ্দিন আহমদের দীর্ঘ বিশ্লেষণমূলক লেখাটি পড়লে স্পষ্ট হবে। এছাড়াও সবাই জানতো যে, ষড়যন্ত্র বিশারদ জোট সরকারও একটি ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করবে। ইহুদিদের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশ পরাজিত হয়েছে- এ তত্ত্বের জন্য বিশ কোটি টাকা খরচ তহবিল তছরুপেরই শামিল।

ঢাকা ফিরে এসে সাকা যা বলেছেন তা সম্পূর্ণভাবে এসেছে ১৯ তারিখের 'প্রথম আলোয়'। ব্যক্তব্যটি এত অশালীন যে, অধিকাংশ পত্রিকা-ই তা ছাপতে চায়নি। কিন্তু ছাপা দরকার ছিল, তাহলে বোঝা যেতো বিএনপি কারা করে এবং প্রধানমন্ত্রী ও হাওয়া ভবন কাদের প্রশ্রয় দেয়। সাকার দীর্ঘ বক্তব্যটি দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে ওআইসি এবং বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে তার মন্তব্য যা অজ্ঞতাপ্রসূত। শুধু তাই নয়, এ বক্তব্য বাংলাদেশের ভাবমূর্তি প্রবলভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। দ্বিতীয় ভাগে শেখ হাসিনা ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সম্পর্কে অনাবশ্যক কিছু মন্তব্য করেছেন- যা শুধু অশালীন নয়, মানসিক বিকৃতিরও প্রতিফলন।

প্রথমাংশের বক্তব্যের সারমর্ম এরকম-

১. সরকারকে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়, যে কারণে বাংলাদেশ ইরাকে সৈন্য পাঠাতে পারেনি। ইঙ্গিতটা এরকম তুরস্ক শ্রদ্ধাশীল নয় দেখে সৈন্য পাঠিয়েছে।

২. "ইসরায়েলি সৈন্যরা প্যালেস্টাইনে পাখির মতো মানুষ মারছে। ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী।"

৩. "যে দেশ জিতেছে সে দেশের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। তুরস্কের ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। তারা ন্যাটোর সদস্য, ওআইসি সনদ তারা অনুমোদন পর্যন্ত করেনি। তুরস্কের বিজয়ে ওআইসির ভূমিকা ভিন্ন হবে।' অর্থাৎ তুরস্ক মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ দেখবে না।

৪. "এ সংস্থায় এমন কিছু সদস্য আছে, যাদের মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা পাঁচ ভাগ। বিশ্বেতো এমন অনেক দেশ আছে, সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বহু। সেসব দেশকেও সংস্থার সদস্য করা প্রয়োজন।"

৫. "সৌদি আরব বাংলাদেশকে ভোট দিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মুসলিম দেশগুলোর সমর্থন আমরা পেয়েছি।"

সরকারকে জনমতের ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল হতে হয়- এ কথা যিনি বলছেন, তার সরকার কি জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল? পত্রপত্রিকা যদি জনমতের প্রতিফলন হয় তাহলে বলতে হয় এ দেশে সরকার বলে কিছু নেই। জনমতের প্রতি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে কি ওয়ারেন্ট ছাড়া হাজার হাজার লোককে বিনা কারণে জেলে পোরা যায়, নান্দাইলে পুলিশ কর্মকর্তা মানুষ খুন করার পরও কিছু হয় না, নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশন কেলেঙ্কারি করে, উচ্চ আদালতের আদেশও উপেক্ষিত হয়। সাকাচৌ যে যা খুশি করছেন ও বলে বেড়াচ্ছেন তাতেই প্রমাণিত হয় যে, এ দেশে কার্যকর সরকার ও আইন নেই। সাকাচৌ বলতে চেয়েছেন, ইরাকে সৈন্য পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশের জনমত বিপক্ষে তাই সৈন্য পাঠানো হয়নি। তুরস্ক পাঠিয়েছে। তারা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। তুরস্কের কয় শতাংশ মানুষ যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে? সবচেয়ে বড় কথা, তুরস্ক শাসন করছে এখন ইসলামপন্থী দল। তারা ইসলামের স্বার্থ বোঝে না, বোঝে বাংলাদেশের রাজাকার আর চোরাকারবারিরা! এছাড়া পাকিস্তান, সৌদি আরব, তুরস্ক- এরা কি সক্রিয়ভাবে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন সমর্থন করেনি? তাহলে মুসলিম স্বার্থ তারা

দেখলো কোথায়? তাহলে তারা কি অমুসলিম দেশ?

প্যালেস্টাইনে ইসরায়েল যা করেছে তার নিন্দা হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। আমরা ছাত্রজীবন থেকে এ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে যা যা করা সম্ভব করছি। সাকাকে তো কোনো প্রতিবাদ মিছিলেও দেখা যায়নি। যা হোক, আরাফাত কি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেননি? মিসর কি কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখছে না? ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা দেশের স্বার্থ পরিপন্থী হলে আগেতো ইসরায়েল, মিসর- এদেরকে এই বৃত্ত থেকে বেরুতে হবে। অন্যদিকে, সাকার লজিক অনুযায়ী যারা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক রাখা সমীচীন নয়। বাংলাদেশের তাহলে অবিলম্বে মিসর, তুরস্কসহ সবদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। ওআইসি গত দু'দশকে প্যালেস্টাইনের পক্ষে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কেন? বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী একটি সংস্থার মহাসচিব হওয়ার জন্য সাকাচৌর অতীব আগ্রহ কেন? এর কারণ কি এই যে, ওআইসি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল এবং পাকিদের গণহত্যা সমর্থন করেছিল যাতে সাকাচৌ নিজেও যুক্ত ছিলেন। ইসরায়েল দাঁড়িয়ে আছে আমেরিকার ওপর ভর করে যেমন সাকাচৌ দাঁড়িয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রীর ওপর ভর করে। এতই যদি সাহস তাহলে মন্ত্রী সাকাচৌ বাধ্য করেন বেগম জিয়াকে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে। সাকাচৌ যেভাবে বাধ্য করেছেন 'তালাক দেওয়া বিবি'কে তাকে ফিরিয়ে নিতে, সেভাবে কি পারবেন না তাকে দিয়ে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে? ইসলাম যখন তিনি এতই ভালোবাসেন, মুসলিম উম্মাহর জন্য তখন দিনরাত তিনি অশ্রুপাত করছেন, ইসলামের স্বার্থে এই সামান্য কাজটা করতে পারবেন না? শুধু তাই নয়, সাকা লজিক অনুযায়ী আমেরিকার মতো খৃস্টান দেশগুলো থেকে বাংলাদেশের ভিক্ষা নেওয়া উচিত না। ভিক্ষা নেওয়া উচিত ইসলামী দেশ থেকে। কিন্তু মুশকিল হলো ইসলামিরা যে ভিক্ষাও দেয় না।

সাকাচৌ বলছেন বা ইঙ্গিত করেছেন, তুরস্ক জিতেছে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে দেখে এবং স্পষ্ট করে এ কথাও বলেছেন যে, ওআইসিতে এখন ইসরায়েলি পতাকা উড়বে। তিনি যখন এতটাই বুঝেছিলেন তখন বিশ কোটি (নাকি আরো বেশি) টাকা খরচ করে নির্বাচনী লড়াই হলো কেন? তুরস্ক ওআইসি অনুমোদন না করে ওআইসিতে থাকে কীভাবে? ইসলামের কনট্রাক্টর সৌদি আরব আর পাকিস্তান বাধা দেয় না কেন? তুরস্ক আর ওআইসির ভূমিকা কি বদলাবে? সারা বিশ্বে গত বিশ বছরে মুসলমানদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তাতে কোনো ইসলামি দেশ সাড়া দেয়নি। এতই নপুংসক তারা! এরকম একটা নপুংসক সংস্থাকে আর কতটা বলীয়ান করা যাবে?

ওআইসিতে কোন দেশগুলো আছে যাদের জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ মুসলমান? সেগুলো ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে কীভাবে স্বীকৃতি পায়? যাদের মুসলমান জনসংখ্যা বেশি (৫ ভাগের) তাদের ওআইসির সদস্য করার জন্য সাকা যে প্রস্তাব করেছেন তা উত্তম প্রস্তাব। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে ওআইসির সদস্য করার প্রস্তাব তিনি করেননি কেন? তার লজিক অনুযায়ী সেটিই হতো যুক্তিযুক্ত।

বাংলাদেশকে সৌদি আরব ভোট দিয়েছে না ব্যাম্বু দিয়েছে তা তিনি জানলেন কীভাবে? তিনি কি নিশ্চিত যে, মোরশেদ খানও তাকে ভোট দিয়েছেন। ভোট তো হয়েছে গোপন ব্যালটে। উত্তরে সাকা অবশ্যই বলতে পারেন, এখন তিনি ওহি পাচ্ছেন, সব কিছুই তার নখদর্পণে।

সাকার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এতটা লিখতে হলো। যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে তার কোনোটার উত্তর তিনি দিতে পারবেন না। এগুলোর উত্তর দিতে হলে বিশ্বরাজনীতি, আন্তঃদেশ সম্পর্ক জ্ঞান থাকা দরকার, পড়াশোনা দরকার, কমনসেন্স থাকা দরকার। মাস্তানি করে বাংলাদেশে উন্নতি করা যায়, এ দেশের সীমানার বাইরে মাস্তান প্রহৃত হয়।

সাকার বক্তব্যের দ্বিতীয়াংশে শেখ হাসিনা ও সুরঞ্জিত সেন সম্পর্কে তার কিছু বক্তব্য আছে। প্রথম আলো এটি ছাপায় আমরা সাকাচৌর পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি।

সাকাচৌ অট্টহাসি হেসে বলেছেন, "শুনলাম বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাকি পদত্যাগ দাবি করেছেন। এখন সুরঞ্জিত বাবু যদি অমুসলিম হয়ে মুসলিম সংস্থার নির্বাচনের ব্যাপারে মন্তব্য করেন, তখন আমার তো বলতে হয়, ছোটবেলায় আমরা যেটা কেটে ফেলে দিয়েছি, ওটা যদি উনি বুড়ো বয়সে কাটতে প্রস্তুত হন, তবে আমি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করানোর সব রকমের চেষ্টা করব।"

সাকাচৌর যখন জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি তখন থেকে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত রাজনীতি করে আসছেন। এ দেশ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান স্বীকৃত, সাকাচৌ এ দেশ সৃষ্টির বিরোধিতা করেছেন। এ দেশ সম্পর্কে যদি কিছু বলার অধিকার থাকে তবে তা আছে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের, সাকাচৌর নেই। গত ত্রিশ বছর সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সংসদে আছেন, কোনো সামরিক শাসকের বুটচেটে অস্ত্রবাজদের দিয়ে মাস্তানি করে তাঁকে জনপ্রতিনিধি হতে হয়নি। বিএনপির একজন মন্ত্রী ও সাংসদ যখন এ বক্তব্য দেন তখন বোঝা যায় বিএনপি কতটা সাম্প্রদায়িক এবং উগ্র মৌলবাদী। সাকাচৌ ছোটবেলায় কতটা কী ছেঁটেছেন জানি না। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেও সাকাচৌ মোর্শেদ খানকে পদত্যাগ করাতে পারবেন না। মোরশেদ খান সম্পর্কে সাকাচৌ বলেছিলেন, "আমি যখন রাজনীতি শুরু করি তখন মোর্শেদ খানরা লুঙ্গি গুটিয়ে কৈ মাছ ধরতেন" (জনকণ্ঠ ৬ আষাঢ়)। এরপরও মোর্শেদ খান সাকাচৌর জন্য দেড় বছর দূতিয়ালি করছেন। বেগম জিয়া ও বিএনপি সম্পর্কে সাকাচৌ কি বলেছিলেন ভুলে গেছেন? নিজের থুতু চেটে আবার বিএনপিতে ফিরে খালেদা জিয়ার মন্ত্রী হননি তিনি? আত্মমর্যাদাপূর্ণ খুব কম ব্যক্তিই বাংলাদেশে মন্ত্রী হয়।

শেখ হাসিনা সম্পর্কেও অট্টহাসি হেসে সাকাচৌ বলেছেন- 'সংসদে এসে শেখ হাসিনা কী করছেন? শেখ হাসিনা আমার সোনা-স্বর্ণ নিয়ে টানাটানি করছেন। এখন ওনার সোনার অভাব হলে, কোনো দুর্বলতা থাকলে তার তো সমাধান করতে পারবেন ওয়াজেদ সাহেব। আমার সোনা নিয়ে কেন টানাটানি করছেন তা বুঝলাম না।' শেখ হাসিনা কেন, বিরোধী দলের অনেকেই বলেছেন, সোনা আমদানির সঙ্গে সাকাচৌর

সম্পৃক্ততার কথা। আমরা অনেকেই তা বিশ্বাস করিনি। এতো বলশালী এবং পরাক্রমশালী লোক তার কিছু সোনাদানা থাকবে না তা কি করে হয়? তাকে কেন অবৈধভাবে সোনা আনতে হবে। তখন আমাকে একজন বলেছিলেন, ইতিহাসের ছাত্র হয়ে তুমি এ কথা বলছ? সুলতানী বা মুঘল আমলে হারেম যারা পাহারা দিত তারা কি প্রবল ও বলশালী ছিল না? অনেকে তো ক্ষমতায়ও গিয়েছিল। কিন্তু কেন তাদের হারেম পাহারার জন্য রাখা হতো? এখন সেই উক্তির যথার্থতা বোঝা যাচ্ছে। সালাহউদ্দিন উচ্চস্বরে দেশবাসীকে জানিয়েছেন তার কাছে সোনা আছে, কেউ যেন সন্দেহ পোষণ না করে। এ যেন, কাদম্বরী মরিয়া প্রমাণ করিলো যে সে বাঁচিয়া ছিল।

সাকাচৌ এবং বিএনপির এ রকম অনেক নেতা, মন্ত্রী, এমপি দেশ-বিদেশ ও ব্যক্তি সম্পর্কে এধরনের মন্তব্য করেন। এদের অনেকে হাওয়া ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ট বলে শোনা যায়। তবে তাদের এসব উক্তিতে বোঝা যায়, তাদের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড কি, তাদের শিক্ষাদীক্ষা কতটুকু, মানুষ হিসেবে তারা কোন পর্যায়ের। এখন মনে হয়, অনেকে যে বলেন, ভদ্র হলে, ভদ্র পরিবারের হলে বিএনপি করা যায় না এতে বোধহয় সত্য আছে। শ্রদ্ধেয় মরহুম কফিলুদ্দিন চৌধুরীর পুত্র ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী যা পরে বুঝেছেন। প্রধানমন্ত্রী এদের প্রশ্রয় দেন, এটি ভাবতেও দুঃখ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কি জানেন তাঁর সম্পর্কে কি বলা হয়? আমরা তা উপেক্ষা করি, কেননা সেগুলোর প্রমাণ আমাদের নেই। এবং আমরা মনে করি। এদেশে একজন মহিলা ক্ষমতাবান হলে তাকে ঘিরে কুৎসা রটনা হয়। তাছাড়া বয়স ও শালীনতাবোধেরও একটা ব্যাপার আছে। তিনি সাকাচৌর কথায় যদি আমোদ পেয়ে থাকেন এবং এগুলোকে প্রশ্রয় দেন তাহলে বলতে হবে পরিবেশ আরো নোংরা হবে। পরস্পরকে থুতু ছুড়লে কি তা নিজের গায়ে লাগে না? সাকাচৌ এর আগেও সংসদের ভেতরে এবং বাইরে এ ধরনের কথা বলে ও নানা দুষ্কার্য করে পার পেয়ে যাচ্ছেন। তিনি কি এ দেশের জমিদার, আমরা প্রজা। রাজনীতিবিদদের উচিত যদি তাদের আত্মমর্যাদা বলে কিছু থাকে তাহলে তার বিহিত করা। শুধু তাই নয়, সাকার সাম্প্রতিক বক্তব্য বাংলাদেশকে বিপদে ফেলতে পারে, ভাবমূর্তি তো আর দেশের কিছু নেই যে বিনষ্ট হবে।

সবশেষে মোরশেদ খানের বক্তব্য সম্পর্কে বলি। তিনি মুসলিম উম্মাহ উম্মাহ না করলে খুশি হবো। মোবাইল ফোন ব্যবসা আর মুসলিম উম্মাহ এক জিনিস নয়। ইসলামি উম্মাহ বলে কিছু নেই, আগেও ছিল না। থাকলে ওআইসিতে ভোটাভুটি হতো না, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আবিষ্কার করতে হতো না। পচা কথাবার্তা যত কম বলেন তত ভালো। তিনি যে কূটনীতিতে অজ্ঞ তার প্রমাণ ইস্তাম্বুলে যাওয়ার আগের দিন বাংলাদেশের জয় ঘোষণা করা ও ফিরে এসে বিপরীত বক্তব্য দেওয়া। বাঙালি সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে ইংরেজিতে তিনি যা বলেছেন তাতে বোঝা গেল, সাকা-এর বক্তব্য সরকারের নয়। তাহলেই বুঝুন আমাদের মন্ত্রীদের অবস্থা। সাকাচৌ জোটের একজন এমপি, মন্ত্রী পর্যায়ের উপদেষ্টা, তার বক্তব্য সরকারের হবে না তো কি আমারটা হবে? তিনি বলেছেন, সাকার বক্তব্য শুনে নাকি প্রতিনিধিরা বলেছেন সাকাচৌই ছিলেন সেরা। জনাব

খানের বোধহয় ধারণা, সব দেশেই এ দেশের মতো জোট সরকার আছে এবং তারা সবাই জোটের এমপি, মন্ত্রীদের মতো। সাকাচৌ সেখানে কি বলেছেন জানি না, তবে এগুলো যদি ইংরেজিতে বলতেন তাহলে ১১টি ভোটও পাওয়া যেতো না। সাকাচৌ সম্পর্কে প্রতিনিধিরা যা জেনেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ভোট না দিয়ে ওআইসির যতটুকু ইজ্জত ছিল রক্ষা করেছেন, আমাদেরও ইজ্জত বাঁচিয়েছেন। তারা ধন্যবাদের পাত্র।

উনিশ শতকে বাংলার ইতিহাসে ভদ্রলোকেদের সংজ্ঞা পড়েছিলাম যাদের বংশধর আমরা। ঐ সময় যারা সরকারের গোলামি করে বিত্ত অর্জন করেছিল তারা জাতে ওঠার জন্য বনেদি পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা শেখান শুরু করলো। কারণ সমাজে বিত্ত থাকলেই ভদ্রলোক হওয়া যেতো না তার সঙ্গে শিক্ষা সহবতও থাকতে হতো এবং বিত্ত না থেকে যদি বিদ্যা ও সহবত থাকতো তাহলেও সমাজে যে ভদ্রলোক বলে গণ্য হতো। এখন মনে হয় বিশেষ করে বিএনপির নেতাকর্মী, মন্ত্রী-এমপিদের কর্মকাণ্ড দেখে যে, কথাটা কতখানি সত্যি।

২১.৬.২০০৪

'বিচার পাই না তাই বিচার চাই না'

খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব হুমায়ুন কবীর বালুর হত্যার পর খুলনা সাংবাদিকরা এক বাক্যে যা মন্তব্য করেছেন, তা অনেককে আপ্লুত করেছে। অন্তত ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, গত তিন বছরে জোট শাসন সম্পর্কে এতো সুন্দর মন্তব্য আর করা হয়নি এবং আরো মনে করি, জোট সরকারের বিরুদ্ধে এটিই প্রবল স্লোগান হয়ে উঠবে।

বিচার চাই না কারণ বিচার পাই না- এ বাক্যটির মধ্যে এক ধরনের অভিমান আছে- মনে করতে পারেন অনেকে; আছে ক্ষোভ, হতাশা, বেদনাও। কিন্তু সামান্য, আপাত নিরীহ এ বাক্যটি তুলে ধরছে আজকের বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থা। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে একজন মানুষ আদালতে যান বা বিচার চান বা অন্য কথায় সামাজিক ন্যায় চান। একজন সাধারণ মানুষের এটাই সাধারণ এবং সর্বশেষ আকুতি। কিন্তু বিচারের প্রক্রিয়ায়ই বিচার হারিয়ে যায়। কখনো কখনো তা আদালতে পৌঁছলেও হারিয়ে যায়। বিচারকও বিচার করতে পারেন না। এক-দু'বার এ ঘটনা ঘটলে বলা যেতো যে, ব্যাপারটি অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সব ঘটনাই এরকম। তখন আর তা অনিচ্ছাকৃত থাকে না, সেটি হয়ে দাঁড়ায় ইচ্ছাকৃত। প্রসঙ্গটি যখন সাংবাদিকদের, তখন সংবাদপত্র/সাংবাদিকের মধ্যে আলোচনা সীমিত রাখতে চাই।

আমরা জানি, দেশের নব্বই ভাগ পত্রপত্রিকার মালিকানা ডানপন্থী ঘরানার। জোট শাসনের প্রথমদিকে এবং জোট শাসনের আগে তারা সূক্ষ্মভাবে মৌলবাদী ঘরানার পক্ষে প্রচার চালিয়েছে। এরা ক্লিন শেভড, স্যুট-টাই-সাফারি পরেন। মৌলবাদী চরিত্রের একটি ইমেজ আমাদের মনে আছে। তার সঙ্গে ওই ইমেজ মেলে না। জানি না, এতকিছু পরও মানুষের ধারণা বদলেছে কি-না। বাংলাদেশে এখন ক্লিন শেভড মৌলবাদীদের দাপট বেশি। এমনকি আসল মৌলবাদীদের থেকেও। এদের প্রভাব-বিত্তও অসাধারণ। বাংলাদেশে সর্বত্র এদের অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ছে। মাঝে মাঝে এরা কড়া প্রবন্ধ লেখেন সরকারের বিরুদ্ধে, সবাই ভাবেন- বাহ্ এই তো লেখা। কিন্তু পরবর্তী লেখায়ই তোষণ করেন সরকারকে।

প্রতিটি বিএনপি সরকারের সময়ই সাংবাদিকরা প্রবলভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। বিএনপির আমলেই সাংবাদিক সমিতি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, যার কারণে সাংবাদিকরা আজ দুর্গতির সম্মুখীন। বর্তমান সরকারের আমলে আহত-নিহত সাংবাদিকের সংখ্যার রেকর্ড কেউ ছুঁতে পারবে না। বিশ্বে সাংবাদিক দলনকারী হিসেবে বাংলাদেশ শিরোপা জিতেছে। কিন্তু এই সাংবাদিকদের একটা বিরাট অংশ তো জোটের সমর্থক, মৃদু বা

প্রবলভাবে এবং তারা যখন তাদের কাগজে সাংবাদিক নিগ্রহ ও হত্যায় দুঃখ প্রকাশ করেন, তখন অবাকই লাগে। আরো অবাক লাগে একটি দেশের জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ এদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শুধু তা-ই নয়, এদের সঙ্গে সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবসায়িক সব সম্পর্কই তো সবার প্রবল এবং এই সম্পর্ক প্রশ্রয়দানেরই সমার্থক।

এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কয়েকটি দিই। কয়েকদিন আগে টিভিতে দেখলাম, এনায়েতউল্লাহ খান এক সেমিনারে বলছেন দেশে মৌলবাদ নেই। শুধু ইনকিলাব বা যায়যায়দিন নয়, বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্রিকা এক সময় একই কথা বলেছে। কখনো সোজাসুজি, কখনো আকারে-ইঙ্গিতে। ওইদিন বিকেলেই মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রকাশ্যে এবং সবার প্রতি অবজ্ঞার সুরে বললেন, এদেশে মৌলবাদ তো আছেই, মৌলবাদীরা সবাইকে খুন করে ফেলবে। এত বড় বীর এনায়েতউল্লাহ খান একটা কথা বললেন না। এগুলো কী নির্দেশ করে? সাংবাদিকদের নিরপেক্ষতা? পক্ষপাতিত্ব? সুবিধাবাদ? ভণ্ডামি? নিজেরাই বিচার করুন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাই, তাহলে সব দলমত মানতে হবে। গণতন্ত্রের এ ধরনের সরল ব্যাখ্যা আজ অচল। যদি তা-ই হয়, তাহলে যুক্তরাজ্যে বা যুক্তরাষ্ট্রে ফ্যাসিবাদ, নাজিবাদের চর্চা নিষিদ্ধ কেন? কারণ এ ধরনের মতবাদ সভ্যতা বিনাশকারী। এদের প্রশ্রয় দেয়া বিপজ্জনক। সুস্থ বাম ধারা, মধ্যপন্থাকে ঘায়েল করার জন্য যারা মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয় বা তথা জোট সরকারকে সমর্থন দেয়, তাদের সমর্থন করাও এ কারণে বিপজ্জনক, নিন্দনীয়।

অনেকে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে পার্থক্য করেন। কী কারণে করেন? আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও মতিউর রহমান নিজামীর মধ্যে পার্থক্য কী? উভয়েই তো বাংলা ভাইকে অস্বীকার করেছেন। বাপের বেটা হলে এরা দু'জনই মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের বিরোধিতা করতেন। সেটা পারবেন না। কারণ মিথ্যাবাদীদের পায়ের নিচে শক্ত ভিত থাকে না। পার্থক্যটা দাড়ি আর পোশাক-আশাকের। একজন দাড়িওয়ালা মৌলবাদী, অন্যজন ক্লিন শেভড মৌলবাদী।

সাংবাদিকদের মধ্যেও ওই একই অবস্থা। ক্লিন শেভড মৌলবাদী সম্পাদক আর শ্মশ্রুশোভিত মৌলবাদী সম্পাদক। ক্লিন শেভডের পত্রিকার চাকচিক্য থাকে, যাকে বলে 'স্মার্টনেস', যা অনেক সময় ভালগারিটির পর্যায়ে পড়ে, যেমন যায়যায়দিন। এর বক্তব্য আর ইনকিলাবের মূল বক্তব্যে তফাৎ কী? দু'টিই কি জোটের সমর্থক নয়? অনেক পত্রিকায় অবশ্য এখন মৌলবাদীদের কথা আসছে, সরকারের দুষ্কর্মের খবর আসছে; তাতে ভাবার কোনো কারণ নেই যে, জোট বা মৌলবাদ থেকে তাদের সমর্থন হ্রাস পেয়েছে। এ কাজটি করতে হয় সার্কুলেশন ধরে রাখার জন্য। না হলে অধিকাংশ পত্রিকাই হয়ে যেত দিনকাল বা সংগ্রাম। আর কী যেনো বলে, 'রেসপেকটিবিলিটি' থাকে না।

আমরা বক্তব্য একটিই। একই সঙ্গে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, তোয়াব খান, এনায়েতুল্লাহ খান ও শফিক রেহমানকে শ্রদ্ধা করবেন, ভালোবাসা জানাবেন- তা হয়

না। কারণ এদের দু'জন লিবারেলপন্থী, অন্য দু'জন চরম বাম ও ডানপন্থী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের ভাষায় 'মৌলবাদী' এবং এ কারণেই তারা জোটের উগ্র সমর্থক। মৌলবাদ সমাজ-সভ্যতা বিনাশকারী। সুতরাং তাকে [বা জোট সরকারকে] আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া মৌলবাদেরই সমর্থন। দেশের অগণিত সাংবাদিক আছেন, যারা এর বিপরীত আদর্শের ধারক কিন্তু এদেরও আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন। এটি তাদের এবং সাংবাদিকতার জন্য ক্ষতিকারক। এটিই ছিল বলার মূল উদ্দেশ্য। এই প্রশ্রয়দানই আজ বিচারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ সমর্থন-অসমর্থনের মধ্যে কোনো ধূসর এলাকা নেই, যেখানে 'নিরপেক্ষতা'র নামে অবস্থান করবেন। যারা বলছেন বিচার পাই না, তাই বিচার চাই না- আমি মনে করি তারা আজ একটা সুনির্দিষ্ট সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। এই অবস্থানটাকে আরো দৃঢ় করাই হবে আমাদের একান্ত কর্তব্য।

দেশে যে সবকিছুতে একটা বড় পচন ধরেছে- এটি আর কোনো দার্শনিক বাক্য নয়। জনাব ফালু যখন এমপি হন, যখন তিনি জেতেন- তখন সুস্থ রাজনীতি পরাজিত হয়। জনাব ফালু যখন ভিকারুন নিসা নূনে যান এবং তরুণীরা যখন তার সম্মানে ভাংড়া সদৃশ্য নাচ নাচে বা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াররা যখন ফালুর জন্য ভোট ভিক্ষায় বের হন, তখন স্পষ্ট হয়ে যায় আমরা ডিগ্রি পাচ্ছি, শিক্ষিত হচ্ছি না। আশার কথা সমস্ত পত্রিকা লিখেছে, এ নির্বাচন হয়েছে লুটেরাদের, যা সমর্থন করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, সেনা এমনকি নির্বাচন কমিশনারও। এরা আবার যখন ঘরে ফেরেন, এদের স্ত্রী-পুত্ররা তাদের গ্রহণ করে, বন্ধু-বান্ধবরা তাদের আপ্যায়ন করে, এরা ধর্মকর্মও করে। অথচ সমাজে প্রকাশ্যে এরা মিথ্যা বলেছে, মিথ্যা সমর্থন করেছে। ফলে বিচার কেন হবে? হবে না। সেজন্য চেয়েও লাভ নেই এবং এ স্লোগান যখন দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে, তখন এটিই প্রতিভাত হবে যে, যে দেশের বিচার নেই সে দেশ অসভ্যদের এবং সে দেশে কোটি বিচারপ্রার্থী কত অসহায়। বিচার তখন চাইতে হবে না- যখন আমরা এ ধরনের প্রতারণা, ভণ্ডামি ত্যাগ করবো।

৫.৭.২০০৪

তিন অধ্যাপক কতল করলেই কি ইসলামি মূল্যবোধ জিন্দা হবে?

১৯৭১ সালে আমরা যখন ছাত্র, যখন চলছে মুক্তিযুদ্ধ, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৃত্যুদণ্ড [অবশ্য প্রকাশ্যে নয়] ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তা কার্যকর করা হয়েছিল ডিসেম্বরের প্রথম দু'সপ্তাহে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক-কর্মচারী, জামাতে ইসলামীর ডেথ স্কোয়াড আল-বদর যার প্রধান ছিলেন বর্তমানে জোট সরকারের দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী এবং হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর জেনারেলরা। যারা খুন করেছিল তারাও ছিল বাঙালি, তবে অন্য ধরনের বাঙালি, পাকিস্তানি বাঙালি।

আজ ৩৩ বছর পর আবার আমিসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো দু'জন অধ্যাপকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে এবং ইসলামের নামে। ১৯৭১ সালে আমার শিক্ষকদের তখনো তা করা হয়েছিল ইসলামের নামে। কারণ, মুক্তিযোদ্ধারা ছিল 'রুশ-ভারতের দালাল'। সৌদি-পাকি-আমেরিকার 'দালাল' নয়। তাই আজ প্রশ্ন জাগে, ১৯৭১ তাহলে সত্যিই আবার ফিরে এসেছে? এখনো আছে যে সরকার সে সরকার পাকি-মনা সরকার হিসেবেই পরিচিত যারা মুক্তিযুদ্ধের সংবিধান খারিজ করে পাকি-মনা সংবিধান সৃষ্টি করেছিল। সেই নিজামী এখনো ক্ষমতায় এবং ফতোয়া প্রদানকারীরা 'ইসলামী মূল্যবোধ পূর্ণজাগরন [বানান ভুল] সৃষ্টির লক্ষ্যে জরুরি দৃষ্টান্তমূলক নিম্নলিখিত মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবী প্রথম পদক্ষেপে প্রথম পর্বে তিন মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ঘোষণা করা হইল।'

ইসলামের নামে বাংলাদেশে যত লোক হত্যা করা হয়েছে গত এক হাজার বছরে এত লোক [প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া] অন্য কোনো কারণে প্রাণ দেয়নি। তাহলে প্রশ্ন জাগে, ইসলাম কি ভায়োলেন্স প্রচার করে? ইসলাম মানেই কি রক্তের হোলি খেলা? ইসলাম প্রতিষ্ঠা মানেই কি ১৯৭১? বিবেকবান মানুষের এই বিষয়গুলো ভাবা দরকার।

ফতোয়া প্রদানকারীরা চারটি অভিযোগ করেছে আমাদের সম্পর্কে।

১. আমরা বায়োডটাতে লিখেছি ধর্ম ইসলাম [সুন্নি]। কিন্তু 'উল্লিখিত ধর্ম অনুযায়ী' আমরা চলছি না। ফতোয়া প্রদানকারীদের কাছে জিজ্ঞাসা ইসলাম [শিয়া], ইসলাম [ওহাবি] এবং আরো ৭০টি ফিরকার মুসলমানরা কি অমুসলমান? কারণ, সুন্নি মতবাদ না মানলে বলা হচ্ছে 'মুরতাদ' হয়ে যাবে যে কেউ। নিরস্ত্র তিনজনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়ার আগে সুন্নি ছাড়া বাকি ৭২ ফিরকার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়াটা বোধহয় জরুরি। ফতোয়া প্রদানকারীরা সেটা পারলে বোধহয় ভালো হয়।

২. দ্বিতীয় অভিযোগের মূল বিষয় হচ্ছে- 'আল্লাহর আইন সমাজে বাস্তবায়ন করার জন্য জনগণ ভোট দিয়া এমপি, মন্ত্রী, পার্লামেন্টে পাঠাইয়াছেন তাদের পক্ষে কথা বলিয়া

তাদের বিরুদ্ধে তাদের কর্মকাণ্ডে দেশ-বিদেশে মিথ্যা প্রপাগান্ডার ও মিথ্যা অপবাদ দিয়া বেড়াইতেছেন।'

অর্থাৎ, বর্তমান জোট সরকারের বিরুদ্ধে আমরা বলছি। জোট সরকারের বিরুদ্ধে বলার অর্থ মুরতাদ হওয়া? এ বিষয়ে সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ-এ কয়েকটি প্রতিবেদন ও সোহরাব হাসানের নিবন্ধে বক্তব্য আছে, তাই আমি আর তা পুনরাবৃত্তি করলাম না এবং এখানে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ফতোয়াবাজরা কাদের পক্ষের। হ্যাঁ, জোট সরকারের অগণতান্ত্রিক, অধার্মিক, স্বৈরাচারী ও মানবতাহীন নীতির আমি বিরোধী কারণ, তাদের নীতি সমর্থন করলে মানবতাবোধ থেকে বিচ্যুত হতে হয় যা সমস্ত ধর্মের মূল নির্যাস। এ দোষে দোষী সাব্যস্ত হতে আপত্তি নেই। পাকিরাও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি- বুদ্ধিজীবীদের এভাবেই লেবেল দিতো। কিন্তু আমি বলছি মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি টমাসের কথা। তিনি প্রকাশ্যে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, মৌলবাদীরা এ দেশের সবাইকে খুন করবে। এটি কি দেশের পক্ষে প্রপাগান্ডা? বাংলা ভাষায় আমাদের বক্তৃতা-বিবৃতি ১ পার্সেন্ট বাঙালিও পড়ে না। বিদেশেতো নয়ই। হ্যারি টমাসের ইংরেজি বক্তব্য সারা দেশের মানুষতো বটেই বিদেশে সবাই জেনেছে। কই, কোনো বাপের ব্যাটাকে তো দেখলাম না বলতে যে, 'এ দেশে মৌলবাদ নেই' বা 'মৌলবাদীরা কাউকে খুন করবে না'। বা মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিথ্যা বলছেন? বায়তুল মোকাররমের বিখ্যাত খতিব কেন নিশ্চুপ? আমিনী বা শাইখুল হাদিসের এত লাফ ঝাপ হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে গেল কেন? মহিলার শাড়ির আঁচলের মোহ কি এতই মধুর?

৩. আমরা, ফতোয়াবাজদের ভাষায়- 'জনগনের [বানান ভুল] সঙ্গে প্রতারণা করিয়া তাদের সন্তানদেরকে সু-সম্পন্ন না বানাইয়া [ভুল শব্দ প্রয়োগ], বেনামাজি, বেপর্দা নারী, চোর, ডাকাত, চরিত্র অপহরনকারী, [ভুল বানান ও ভুল শব্দ প্রয়োগ] হত্যাকারী, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ নাগরিক বানাইয়া চরিত্রহীন দ্বারা চরিত্রের সার্টিফিকেট দিতেছেন [এর অর্থ কী?]। ফলে দেশকে ধ্বংস করিতেছেন। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে ১ নং দুর্নীতিবাজ হিসেবে পরিগনিত [ভুল বানান] করেছেন [মিশ্র ভাষা]।'

মনে হচ্ছে, ক্ষমতায় চারদলীয় জোট নয়, আমরা তিনজন আছি। আমাদের কারণে, বাংলাদেশ আজ বিপন্ন। ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ৩৫ বছর জড়িত। অধ্যাপক আজাদ তার চেয়ে কিছু বেশি ও অধ্যাপক আকাশ তার চেয়ে কিছুদিন কম জড়িত। আমার এবং আমাদের ছাত্ররা এখন সেনা, পুলিশ, বেসরকারি আমলাতন্ত্র, রাজনীতি, দেশের সব পর্যায়ে উচ্চপদে আছে এবং সে উচ্চপদ পেয়েছে আমাদের শিক্ষার কারণেই, মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য নয়। এ পর্যন্ত, তাদের কেউতো [সে যে দল-মতেই বিশ্বাসী হোক না কেন] আমাদের সম্পর্কে অভিযোগ তোলেনি। হয়তো পরিণত বয়সে তারা আমাদের মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নমত পোষণকারী ছাত্র-শিক্ষকরাও কখনো প্রকাশ্যে এ ধরনের মিথ্যা অপবাদ দেয়নি।

আজ, ভাবতে অবাক লাগছে এ ধরনের অপবাদ আমাদের দেওয়া হচ্ছে বেছে বেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো ১২০০ 'মুসলিম বুদ্ধিজীবী'কে এ অপবাদ দেওয়া হচ্ছে

না কেন? এর কারণ কি আমরা মৌলবাদের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে প্রকাশ্যে বলি?

৪. চতুর্থ অভিযোগ আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী এবং ধর্মদ্রোহী। ফতোয়াবাজদের মতে, 'দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ বলিতে কিছু নাই' সুতরাং, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী কথা বলছি। ১৯৭১-এর বিজয়ীরা সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা যোগ করেছিল। ১৯৭৫-এ পরাজিতরা অস্ত্রের জোরে তা বাতিল করে। আমি বিজিতদের দলে থাকতে ইচ্ছুক নই। ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্র উন্নতি করতে পারেনি। পারবেও না। ফতোয়াবাজরা সুরা 'তওবা'র আলোকে আমাদের 'খতম' করার 'নির্দেশ' দিয়েছে এবং তাদের ভাষায়, 'জল্লাদের পুরস্কার' হিসেবে 'জান্নাত' দানের কথা বলা হয়েছে। এভাবে কুরআন তথা ধর্ম বিকৃতকারী ফতোয়া আমি আর আগে কখনো দেখিনি। অবশ্য, এতে অবাক হওয়ার কারণ নেই। ধর্ম ব্যবহার করেই, ধর্মের ব্যবসা করেই আমাদের মতো দেশে রাজনীতিবিদ ও অন্যান্যরা আধিপত্য বিস্তার করতে চায়।

আগেই উল্লেখ করেছি আমাদের 'মৃত্যুদণ্ড' ঘোষণা করা হয়েছে সুরা 'তওবা'র কথা বলে বিশেষ করে ৬ নং আয়াত উল্লেখ করে। সাধারণভাবে এটি ৫ নং আয়াত ৬ নং আয়াত নয়।

এই সুরায় দু'টি নাম। 'তওবা' আর 'বারাকাহ'। তওবা নামকরণের কারণ- এ সুরার এক স্থানে কতিপয় ইমানদারের গুনাহ মাফ করার কথা বলা হয়েছে; আর শুরুতে মোশরেকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে বলে একে 'বারাকাহ' (সম্পর্কচ্ছেদ) নাম দেওয়া হয়েছে। একে 'তরবারির আয়াত' ও (Verses of the sword) বলা হয়, কারণ, তরবারি ব্যবহার করে মোশরেকদের দেখামাত্র কতল করতে বলা হয়েছে।

সুরাটি নাজেল হয় নবম হিজরির জিলকদ/জিলহজ মাস ও তার কাছাকাছি, দশম হিজরির শুরু দিকে (৬৩২ খ্রিঃ)। মুফতী শফীর মতে, এটি শেষ সুরা। এই সুরাতে 'বিসমিল্লাহ' নাই; নাজেল হয়নি তখনো আর নবীজীও তা লিখতে বলেননি। এরপরই তার ওফাত হয় (৮ জুন, ৬৩২ খ্রিঃ)। এটি একমাত্র সুরা যা বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু হয়নি; বোধহয় মোশরেক নিধনের জন্য।

সুরাটি তাবুক যুদ্ধের পরের ঘটনা (৬৩০ খ্রিঃ)। এটিই ছিল বাইজেনটিয়ান হেরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে। দুই পক্ষেই সৈন্য সমাবেশ হয় কিন্তু যুদ্ধ হয়নি। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তাবুক গমনকালে পথিমধ্যে প্রচণ্ড সূর্যতাপে ও পানির অভাবে খুব কষ্ট পায়। তাই একে 'কষ্টের যুদ্ধ' বলা হয়েছে।

সুরা তওবার শুরুতেই বলা হচ্ছে- 'সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা করা হলো'- অর্থাৎ মোশরেকদের সঙ্গে যেসব চুক্তি ছিল, সব বাতিল করা হলো। তবে, তাদের আরব দেশে থাকার জন্য সময় দেওয়া হলো চার মাস। এর মধ্যে তাদের দেশ ছাড়তে হবে, নয় মুসলিম হয়ে জিম্মি হতে হবে, নয় তরবারির নিচে ঘাড় পাততে হবে। এই ঘোষণা হয় ৯ হিজরি জিলহজ মাসের ১০ তারিখে (মওদুদী)।

ত ই ৫ নং আয়াতে (ফতোয়াবাজদের উল্লিখিত ৬ নং নয়) বলা হলো- 'নিষিদ্ধ মাস

অতিবাহিত হলে মোশরেকদের যেখানে পাও হত্যা কর’ ইত্যাদি। এই নিষিদ্ধ মাস হজের মাস নয়, ৪ মাস যে দেশ ছাড়ার সময় দেওয়া হয়েছে, সেই মাস। কারণ, ইসলামে নিষিদ্ধ মাস হলো- মহরম, রজব, জিলকদ ও জিলহজ। এই আয়াত সুরা বাকারার ১৯০ ও ১৯১ আয়াতের মধ্যে আবার আছে পরস্পর বিরোধিতা।

৫ নং আয়াত (উল্লিখিত ৬ নং) মোশরেকদের জন্য, যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে অংশীদার করে তাদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদ বা মোরতাদ) জন্য নয়। মুরতাদদের ফাসেক, মোনাফেক বা রাষ্ট্রদ্রোহী বলা যায় না।

যেকোনো মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করলে বা আল্লাহ ও রসুলে বিশ্বাস না করলে, হত্যা করার কথা কুরআনে নেই। উদাহরণ- ১. বাকারা (২) : ২১৭, ২. কাইফ (১৮)   ২৯, ৩. নাইল (১৬)   ১০৪ ও ১০৬, ৪. মুহাম্মদ (৪৭) : ২৫ ও ৩২, ৫. তওবা (৯) : ৬৩, ৬. আজহাব (৩৩)   ৫৭, ৭. নিসা (৪) : ১৪, ৪২, ১১৫, ৮. তালাক (৬৫) : ৮ ও ৯, ৯. মুজাদেলা (৫৮)   ৪ ও ২০, ১০. গাশিয়া (৮৮) : ২৩-২৬ ও হজ (২২)   ১১।

এখন বিবেচনা করুন ধর্মের নামে বিভ্রান্ত কারা করছে? তাদের ভাষায় আমরা ‘মুরতাদ’ হলে তারা কী? এরা ইসলামকে শান্তির ধর্ম না করে খুনোখুনির ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। কুরআনকে তুলে ধরছে খুনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য (নাউজুবিল্লাহ)। দেশে-বিদেশে ওরাই ইসলামের ও দেশের ভাবমূর্তি বিনাশ করছে এবং জেনে রাখুন, ধর্ম ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া অবস্থান করতে পারে না এবং এটাই সত্য যে, এরা নিরস্ত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের কতল করে। ক্ষমতাসীনদের নয়। সেই বুকের পাটা তাদের নেই। কখনো ছিলও না। নবীজী ও তাঁর সাহাবারা সশস্ত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, নিরস্ত্রদের বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং, এক হিসেবে এই ফতোয়াবাজরা ইসলামের মূল আদর্শকেই মানছে না। মানলে শক্তিমান জোটীয় নেতানেত্রীদেরকেই বলতো নামাজ, রোজা বা ধর্মকর্ম পালন করতে। নিরস্ত্র অধ্যাপকদের নয়।

আমি বা অধ্যাপক আজাদ মৃত্যুর একসটেনশনেই আছি। মৃত্যু তো আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আর মারা গেলে খারাপ কী। ধর্মের নামে এ অনাচার তো দেখতে হবে না। তথাকথিত দুই ফতোয়া প্রদানকারী কমিটির উদ্দেশে বলছি- তিন অধ্যাপক কতল করলেই কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাংলাদেশে? আমারতো মনে হয় তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার শিক্ষক ও দেশের ১৩ কোটিকে কতল করতে হবে। সেটি যদি লক্ষ্য হয় তো বলার কিছু নেই।

ইসলামের ঠিকাদারদের দৌরাত্মে আজ মানুষজনের জীবন অতিষ্ঠ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা যে কী তার প্রমাণ গত ৮০ বছরে এই প্রথম এ ধরনের ফতোয়া প্রকাশের পর এখনো ছাত্র-শিক্ষকরা নিশ্চুপ এবং শিক্ষক সমিতির নির্বাহী সভায় এই ভোরের কাগজের একজন নিয়মিত কলামিস্ট ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় বাধা দিয়েছেন। তা হলে বুঝুন অবস্থা। শিক্ষকদের বোধহয় ধারণা, তিনজন গেল আমরা তো বাঁচলাম। প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে, নিজের ঘর বেঁচেছে এমন কথা কখনো শোনা যায়নি।

১০.৭.২০০৪

চুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযুদ্ধ দখল

জোট সরকার অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের 'ড্রামতত্ত্ব'-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করেছে। জোট সরকারের প্রথম পক্ষ বিএনপি মনে করছে ১৯৭৭ থেকে তারা মুক্তিযুদ্ধ দখলের যে প্রকল্প গ্রহণ করেছিল তাতে সফল হয়েছে। একই সঙ্গে জামাতও বিএনপির সঙ্গে এ সহবাসে তীব্র আনন্দ পেয়েছে। কারণ, তাদের ধারণা এর ফলে তারাও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। অবশ্য, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তারা যুক্ত ছিল বিরোধী পক্ষ হিসেবে। এখন, শুধু বীরশ্রেষ্ঠ বা বীরবিক্রম ধরনের কিছু পদক আদায় করলেই ষোলকলা পুর্ণ হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে যারা বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন তাদের একটা অংশ স্বাধীনতার পর দেশের ভার গ্রহণ করবেন- এরকম একটা চিন্তাভাবনা করছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতিকথায় এর ইঙ্গিত আছে। মুক্তিযুদ্ধে সবাই স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিলেন একথা ভাবা ভুল। অনেকে বাধ্য হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তা প্রমাণিত হচ্ছে। এরাই, পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে [সাধারণের ভাষায় চুক্তিযোদ্ধা] ক্ষমতা দখল করে। তারা যে মুক্তিযুদ্ধের বীর- এ পটভূমি তৈরির জন্য বীরত্বসূচক উপাধির সিংহভাগ বিতরণ করা হয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের। একজন সিভিলিয়ানও বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি পাননি।

জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখলের পরই বঙ্গবন্ধুর স্পেসে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলেন। সাবেক সচিব বোরহান আহমদের স্মৃতিকথায় এর আভাস পাওয়া যাবে। তবে, তিনি সতর্ক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। জানতেন, স্বাধীনতার চার বছরের মাথায় একজন মেজরের পক্ষে এ ধরনের মেজর পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক হবে না। তিনি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এক দশকের মধ্যেই সে স্পেস পূরণ করতে পারবেন। ক্ষমতায় থাকার সময় সবাই এ ধরনের চিন্তাভাবনা করে। কিন্তু তাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। নিহত হলেন তিনি নিজের সতীর্থদের হাতে।

ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে জিয়াউর রহমান ক্যান্টনমেন্টে বসে রাজনৈতিক দল তৈরি করেছিলেন। আওয়ামী লীগ ও প্রগতিশীলদের নির্মূল করার জন্য জামাতিদের মুক্ত করেছিলেন। আওয়ামী ও ১১ দলে অনেক ব্যক্তি (নাকি জ্ঞানপাপী) আছেন যারা ভাবেন জামাত বা বিএনপি তাদের মিত্র হতে পারে। স্বদেশ রায় যেমনটি লিখেছেন, বলা যেতে পারে তাদের চোখে জামাত মৌলবাদী নয়, যেমন হিটলার ফ্যাসিস্ট নয়। অনেকের এক পদাঘাতে ঘুম ভাঙে। অনেকের শত পদাঘাতেও নয়।

শুরুতে বিএনপির প্রধান মূলধন ছিল মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান। তিনি নিহত হলে, তার এই ইমেজ সৃষ্টি প্রয়োজন হয়ে পড়লো। তখন থেকে বিএনপি একটি

মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এই পরিকল্পনার দু'টি দিক ছিল। এক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতি মুছে ফেলা, দুই. মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক ও নায়ক হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠা করা। জিয়াউর রহমান চাইলেও এ কাজটি শুরু করেননি। হয়তো বিবেকের কিছুটা তখনও ছিল, একেবারে নির্জলা মিথ্যা বলতে তিনি চাননি। কিন্তু, বিএনপি এখন সমাজের বর্জ্যদের নিয়ে গঠিত। সত্য-মিথ্যা, লজ্জা-লজ্জাহীনতার কোনো পার্থক্য তাদের নেই। তাদের লক্ষ্য হাসিল হলো কি না সেটাই তাদের কাছে বড়।

আজ স্বাধীনতার দলিলপত্র নিয়ে যে হইচই হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে এটি আকস্মিক একটি ঘটনা। তা'নয়, এটি পূর্বপরিকল্পিত, ধাপে ধাপে তারা এগিয়েছে মাত্র। তাদের কাজ তারা করেছে। এখন প্রশ্ন আমরা আমাদের কাজ করতে পেরেছি কি না? পারিনি। এসব বিষয়ে আগে বাঁধা দেওয়া হয়নি। রাস্তায় লোক নেই, সুতরাং তারা দলিলপত্র বদলেছে।

বিএনপির পরিকল্পনায় প্রথমেই বঙ্গবন্ধুকে নিষিদ্ধ করা হয় সরকারি প্রচার মাধ্যমে। ১৯৭৫-২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের পাঁচ বছর ছাড়া বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিষিদ্ধ। জেনারেলরা নয়। তারপর বঙ্গবন্ধু ও তার সহকর্মীদের নামাঙ্কিত সব স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নাম বদল। বর্তমান আমলে এটি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তৃতীয়, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব, গল্প, রূপকথা সৃষ্টি। চতুর্থ, পরবর্তী জেনারেশনের মন থেকে-যাতে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি লুপ্ত হয় সেজন্য এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নেয়। এর একটি হলো, পাঠ্যবই বদল ও মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংযোজন। পাঠ্যবইয়ের শুধু বঙ্গবন্ধুর অবদানই নয়, এমনভাবে তা উপস্থাপন করা যাতে পরিস্ফুট হয় জিয়াউর রহমানই মুক্তিযুদ্ধের নায়ক। শুধু তাই নয়, অন্য কৌশলটি হলো, তাদের পাকমিত্র যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে জোট বাধা ভয়ানক কিছু নয়। যুক্তরাষ্ট্র এ মর্মে সার্টিফিকেটও দিয়ে দিয়েছে যে জামাত মৌলবাদী নয়। অর্থাৎ রাজাকারদের রাজাকারের মতো তুলে না ধরা। আপনাদের অনেকের হয়তো স্মরণ নেই, তাই পুরোনো সে দিনের দু'একটি কথা বলছি।

১৯৭২ সালেই আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বঙ্গবন্ধু সাভার, রায়ের বাজার ও মিরপুরের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা নেন। সেগুলো তিনি সম্পূর্ণ দেখে যেতে পারেননি [সাভার ছাড়া]। কিন্তু, এসব ক্ষেত্রে কৃতিত্ব নিয়েছে বিএনপি ও এরশাদ। মানুষজনও ভুলে গেছে সে কথা। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না, মিরপুরের স্মৃতিসৌধ স্থাপনে একটি ফলক উদ্বোধন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। যাতে লেখা ছিল- 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ভয় নাই ওরে ভয় নাই/নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

বিএনপি আমলে তা নিঃশব্দে অপসারণ করা হয়। এ নিয়ে কিন্তু কেউ তখন প্রতিবাদ করেনি। এভাবে একটু একটু করে তারা এগিয়েছে শহীদদের স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য এবং এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্যরা। এখন সে বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করা যাক।

দুই

স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক শুরু করা হয় ১৯৭৫ সালের পর থেকে। তখন অনেকেই স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, দার্শনিক, তাত্ত্বিক, ঘোষক, পাঠক হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকেন। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে প্রথম নিশান উত্তোলনের সময় বাঁশটি কে এনেছিলেন তা নিয়েও বিতর্ক হয়। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছিলেন মরহুম জেনারেল জিয়াউর রহমান; কারণ তার হাতে ক্ষমতা ছিল, সংগঠন ছিল আর ছিল গণমাধ্যম। জেনারেল জিয়া নিজে এ বিষয়ে খোলাখুলি তখন কিছু বলেননি, তবে তার অনুসারীদের উৎসাহিত করেছিলেন।

এতদিন ব্যাপারটা ছিল এরকম। হ্যাঁ, শেখ মুজিবুর রহমান নামে একজন যাকে 'বঙ্গবন্ধু'ও বলা হয়, তিনি হয়তো বলেছিলেন স্বাধীনতার কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবং ফিল্ডে থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। এটি প্রমাণের জন্য আবির্ভূত হন বিএনপি নেতা লে. জে. মীর শওকত আলী। ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে এক সাক্ষাৎকার তিনি পেশ করেন স্বাধীনতা সম্পর্কে নতুন তথ্য যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল মান্নান এক লেখায় উল্লেখ করেছিলেন 'ড্রামতত্ত্ব' হিসেবে।

২৬ মার্চ (১৯৯৫) 'জনকণ্ঠে' এক সাক্ষাৎকারে মীর সাহেব বলেন- 'আমি বলব মরহুম জিয়াই স্বাধীনতার ঘোষক। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী রাতে আনুমানিক একটার সময় চট্টগ্রাম সেনানিবাসে একটি ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি [মেজর জিয়া] প্রথমবার স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।'

ঐ একই তারিখের পত্রিকায় বিএনপির নেতা ও সাবেক মন্ত্রী ও সহযোদ্ধা লে. ক. অলি আহমদ এর বিরোধিতা করে বলেন- 'যারা লেখাপড়া জানেন তাদের এমন ভুল হওয়ার কথা নয়।'

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও উপযুক্ত দুই সাবেক মন্ত্রীর প্রিয় 'স্যার' মরহুম জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে মেজর থাকাকালীন অবস্থায় স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ঘোষণা করেছিলেন–

ক. 'আমি ঘোষণা করছি, আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে সার্বভৌম বৈধ সরকার গঠন করছি।' [উদ্ধৃত স্টেটসম্যান, ২৭-৩-১৯৭১]।

খ. 'আমি শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত স্বাধীন বাংলা থেকে বলছি। আল্লাহর অনুগ্রহে পাঞ্জাবী দেশদ্রোহীদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করতে আমাদের সময় লাগবে মাত্র একদিন কিংবা দুইদিন।'

গ. 'মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ... এই দেশের মহামান্য জননেতা, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের দেবতা, বাংলার নয়নের মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হবে। অন্য কোনো কারও নির্দেশ বাঙালি কোনোদিন বরদাশত করবে না, কোনো মার্শাল ল' বাঙালিরা মানে না। ... আমরা স্বাধীন বাংলার নাগরিক। স্বাধীন বাংলার মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য। জয় বাংলা। স্বাধীন বাংলার জয়।' [স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ২৬.৩০, ৩.১৯৭১]।

উল্লেখ্য, এইসব ভাষণে বাংলাদেশী দূরের কথা, বাংলাদেশ শব্দটিই নেই, বরং শাশ্বত বাংলার উল্লেখ করা হয়েছে। জেনারেল জিয়ার নিজের স্বাধীনতার ঘোষণার কথাও নেই। প্রধানমন্ত্রী যে- সংবিধান সংরক্ষণের জন্য একান্ত আগ্রহী সে- সংবিধানেও এর উল্লেখ নেই। কিন্তু জিয়ার সহযোদ্ধার ঐ কথা অস্বীকার, সংবিধান এবং ইতিহাসে উল্লেখ না-থাকা সত্ত্বেও বিএনপি সরকার স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে লে. জে. মীর শওকত আলীর তত্ত্বই গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ এ দেশের স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক লে. জে. জিয়াউর রহমান। তার প্রমাণ ১৯৯৫ সালে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদেশের জন্য প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ডায়েরি ১৯৯৫'।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'বাংলাদেশ ডায়েরি ১৯৯৫' দেখুন। মন্ত্রণালয়ের 'এক্সটার্নাল পাবলিসিটি উইং' এটি প্রকাশ করেছে। ডায়েরির শুরুতে ইংরেজি ভাষায় 'ওভারভিউ' শিরোনামে বাংলাদেশ পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। 'হিসটোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড' অংশে মাত্র দু'জনের নাম আছে- একজন রবার্ট ক্লাইভ, আরেকজন মেজর জিয়াউর রহমান এবং পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মেজর জিয়াই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা দূরে থাকুক, তার নামটিও উল্লেখ করা হয়নি। প্যারাগ্রাফটি এরকম।

'The nationalist struggle of the people of Bangladesh took a new shape under Pakistani rule follower by armed crackdown by Pakistan army on the innocent people of Bangladesh which led to the declaration of independence of Bangladesh on 26th March 1971 by Ziaur Rahman ...'

এ বিষয়টির প্রতি কলামনিস্ট মহিউদ্দিন আহমদ প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছিলেন। আমরা কয়েকজনও লেখালেখি করেছিলাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ও সিভিল সমাজ চুপ ছিল।

আমরা জানি, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিএনপি ইতিহাস বিকৃতি শুরু করেছে। এর একটি কারণ, মনস্তাত্ত্বিক। জিয়াউর রহমান কীভাবে দল গঠন করেছিলেন তা সবার জানা। এক ধরনের বৈধতা অর্জনের তাগিদ থেকেই এ ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল, যার ভিত্তি হীনম্মন্যতা বোধ। কিন্তু পৃথিবীর সবদেশে জাতি, জাতির জনক, স্বাধীনতা ঘোষণা, সংবিধান- এসব কিছুকে সব ধরনের বিতর্কের উর্ধ্বে রাখা হয়। বাংলাদেশে তা হয়নি। কিন্তু এ ধরনের সরাসরি মিথ্যাচার বহির্বিশ্বের জন্য এক অমার্জনীয় অপরাধ। এটি শুধু সংবিধান বা দেশবিরোধী কাজই নয়, জিয়াউর রহমানকেও অসত্যবাদী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালি ও বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে অপমান করা হয়েছে। যেন স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধ ছিল এক ধরনের ইয়ার্কি এবং তা করা হয়েছে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীর শুরুতে।

সভ্য দেশ হলে, মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব বা কর্মকর্তার শুধু চাকরিই যেত না তাদের এবং সরকারকে জবাবদিহি করতে হতো। কিন্তু, আমরা জানি, এখানে তার কিছুই হবে না, কারণ বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ।

তিন

এখানেই শেষ নয়। এরপর স্ট্রাটেজির খানিকটা পরিবর্তন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য অনুষঙ্গও আনা হয় এবং এবারো শুরু করে বিএনপির বড় জিনিয়াস লে. জে. মীর শওকত ও জুনিয়র জিনিয়াস, বর্তমান মেয়র সাদেক হোসেন খোকা এবং মীর শওকত যে জিনিয়াস ও বিএনপির তাত্ত্বিক তা প্রমাণিত হলো মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র বদলে। জিনিয়াস কে? যিনি বারবার নিজের কর্মকে অতিক্রম করে যান। জিনিয়াস কে? জিনিয়াস হলেন পিকাসো, আইনস্টাইন- সবসময় যারা নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন।

বিজয় দিবস এলেই এই বীরোত্তম মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন এবং প্রতি বছরই তিনি নতুন নতুন তথ্য হাজির করেন।

মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তীতেও মীর শওকতের পুরোনো অভ্যাসটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তিনি বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন- 'আমরা যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে, সেক্টর কমান্ডাররা যখন দেশের এক অঞ্চলের জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠছেন, তখন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব প্রমাদ গুনলেন। জনগণ তাদের গ্রহণ করবে না এই ভয়ে তারা ভারতীয় বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে মিত্রবাহিনী গঠন করেন। সেক্টর কমান্ডারদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে মিত্রবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয় ...'

কোন কোন অঞ্চলে সেক্টর কমান্ডাররা জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন তা যদি জে. আলী জানাতেন তবে জাতি উপকৃত হতো। কারণ কোনো ইতিহাসে তা নেই। কোনো সেক্টর কমান্ডারও তা বলেননি। তবে এ ধারণা তারা মনে করতে পারনে যারা মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধ মনে করেন না। 'আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব প্রমাদ গুনলেন।' হায় ভাইজান, বলেন কি? আজীবন আওয়ামী লীগ, বিএনপি এমনকি স্বৈরাচার হিসেবে খ্যাত এরশাদের অধীনে চাকরি করে, অবসর নিয়ে আজ এ কথা বললেন? আপনার প্রিয় নেতা জে. জিয়া খুন হওয়ার পর কেন জে. এরশাদের সরকারে চাকরি নিয়েছিলেন? এ তেজ ছিল কোথায়?

মীর শওকত আরো বলেছেন- '৭১-এর ২৫ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রামে প্রেরণের কথা কল্পকাহিনী ছাড়া কিছু নয়।' [সংবাদ ৮.১২] জানলাম। তাতে কী প্রমাণ হলো, মুক্তিযুদ্ধের নায়ক শেখ মুজিব নন?

এদিকে সে সময় পুরোনো ঢাকার একজন এসে বললেন, খোকা ভাই এটা কী বললেন? খোকা মানে সাদেক হোসেন খোকা, তিনিও মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবের কোনো অবদান নেই। এ জন্যই বিএনপি অন্য নেতা ও বীরদের নামে রাজধানীতে তোরণ নির্মাণ করলেও শেখ মুজিবের নামে তোরণ করবে না।' [ঐ] তোরণ না করলে যেন শেখ মুজিবের মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল! আমার প্রশ্ন সেখানে নয়। বিএনপি আমলে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে দেখি শেখ মুজিবের নাম আছে। যদিও জানি তা অনেকের মনোকষ্ট সৃষ্টি করেছিল। কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে শুনলাম বিএনপির পিতা স্বয়ং জে. জিয়াউর রহমান বলেছেন, 'আই মেজর জিয়া অন বিহাফ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান...'। পিতাকে অস্বীকার করা কোন সভ্যতা তা জানি না। হয়তো

এটা জিনিয়াসতত্ত্ব প্রকাশের লক্ষণ। খুশির কথা বিএনপিতে জিনিয়াসের সংখ্যা বাড়ছে।

মীর শওকত বলেছেন, 'বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর অবদান যেমন রয়েছে, ভাসানী, জিয়াউর রহমানের কথাও সেভাবে থাকতে হবে। এই বাংলাদেশ সৃষ্টির পিছনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহরও অবদান রয়েছে... জিন্নাহ পাকিস্তান সৃষ্টি না করলে আজ বাংলাদেশ হতো না।' [সংবাদ ৮.১২.৯৬]। দেখুন, কয়েকদিনের ব্যবধানে একটি দেশের সৃষ্টি সম্পর্কে কত ধরনের তত্ত্ব দিলেন জে. আলী। প্রতিবারই নিজেকে তিনি অতিক্রম করছেন। খাঁটি জিনিয়াস। আপনি ভুলে গেলেন জিন্নাহর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পেয়েছেন বীরউত্তম? আপনার যুক্তি মানলে বলতে হয়, গান্ধীজীরও অবদান আছে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে। আরো পিছনে রবার্ট ক্লাইভের।

অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অলি আহমদ বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিব নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হলে জিয়া নেতৃত্ব দেন। জে. ওসমানী তাহলে সে সময় ভেরেন্ডা ভাজছিলেন? চাঁদ আছে, এখন আপনি যদি বারবার বলেন চাঁদ নেই, তাহলে মানুষ কী ভাববে আপনার সম্পর্কে? বিএনপি একটি সত্যকে বারবার অস্বীকার করছে। তাতে তারা যে হাস্যকর হয়ে উঠছে তা বোধহয় অনুধাবন করছে না। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে নিজেদের খাটো করার মানে হয় না।

একটি বিষয় কিন্তু লক্ষণীয়। লে. জে. জিয়া জামাতে ইসলামীকে এদেশে রাজনীতি করতে দিয়েছিলেন এবং যাবতীয় রাজাকার-আলবদরদের সসম্মানে পুনর্বাসন করেছিলেন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে নিকট-সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। লে. জে. এরশাদ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। এদেশে এসে মুক্তিযোদ্ধা বলে নিজেকে প্রচার করেছেন অনবরত। কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক যিনি আরেক পাকিস্তানি স্বৈরশাসক জে. জিয়ার কাছ থেকে নিশান-ই-পাকিস্তান পেয়েছিলেন। লে. জে. শওকত মুক্তিযুদ্ধের বীরউত্তম, কিন্তু তার মনে হয়েছে জিন্নাহকেও বাংলাদেশের স্রষ্টা বলা যেতে পারে সুতরাং যদি বলি, লে. জেনারেল হলেই এরকম হন তাহলে কি ভুল হবে? গত ২১ বছর তো আমরা লে. জেনারেলের শাসন দেখলাম। বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন করেছেন তারা। তাই লে. জেনারেল নাম শুনলেই ভয় লাগে।

যাক, খোকা বা জিনিয়াসদের স্বাধীনতাতত্ত্ব নিয়ে আর বেশি আলোচনা নয়। তাদের এসব আলোচনা শুনে আমার এক বন্ধু কী বলেছিলেন তাই বলি। তিনি বললেন, গল্পটি লিখেছিলেন প্রমথনাথ বিশী। এক রাজার মনে হলো তার দেশে পাগলের সংখ্যা বাড়ছে। ভালো, বড় দেখে একটি পাগলা গারদ তৈরি করতে হয়। প্রকল্প কার্যকর করার জন্য এক বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনা হলো। তিনি রাজা, প্রজা. মন্ত্রী, অনেকের সঙ্গে কথা বলে একমাস পর রিপোর্ট দিলেন। রিপোর্টের মূল বক্তব্য– সারা দেশটিই প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হোক। তাহলে পাগলা গারদের জন্য আলাদা খরচ লাগবে না। 'বিএনপির এসব তত্ত্ব শুনে মনে হলো, বললেন বন্ধুটি 'মনে হচ্ছে প্রস্তাব দেওয়া দরকার, ওনাদের চারদিকে একটি প্রাচীর তুলে দেওয়া হোক।'

চার

প্রাচীর তুলে দেওয়ার দরকার ছিল। দেওয়া হয়নি। শ্রদ্ধেয় আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী এদের কর্মকাণ্ডকে বলেছেন, 'কালেকটিভ ম্যাডনেস', বাংলায় বলতে পারি সমষ্টিগত পাগলামি। আসলে তা নয়। ভেবেচিন্তে তারা অগ্রসর হচ্ছে এবং যেহেতু কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই তাই সাহস দিন দিন বাড়ছে। আওয়ামী লীগের ক্ষমতা গ্রহণকালে তারা চুপ ছিল। জোট ক্ষমতায় আসার পর তারা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মনে হয়, কারো সঙ্গে তারা চুক্তি করে এ কাজটি করছে। মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে জালিয়াতি করতো না। আমি আরো কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি যাতে বোঝা যাবে যে, বিভিন্ন সময় তারা পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা বলছে। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কিছু বুদ্ধিজীবীও, নিশ্চয় চুক্তিভিত্তিক কাজ।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা যে কাজটি করেছে সেটি আমার কাছে ভয়ানক মনে হয়েছে। তারা পাঠ্যবইয়ে সম্পূর্ণ ইতিহাস বদল করেছে। এর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বা অসাম্প্রদায়িক নীতিতে বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠনগুলোর তীব্র আন্দোলন করা ছিল ফরজ, তারা তা করেনি। এমনকি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও। কে যে কার সঙ্গে চুক্তি করছে কে জানে। বিএনপি বা জোটের এ কাজটির লক্ষ্য ছিল এবার সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ দখল যার চূড়ান্ত পর্যায় দলিলপত্র বদল।

পাঠ্যবইয়ে তারা কী করেছিল, এর বিস্তারিত বিবরণ আছে আমার লেখা ছোট একটি বই 'ইতিহাস দখলের ইতিহাস'-এ। তাই এখানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখছি না। একটি সংক্ষিপ্তসার শুধু তুলে দিচ্ছি : প্রাক-১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিএনপি সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, নতুন শতকে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সেরকমই আছে। আগে বিএনপি খানিকটা সংযম দেখিয়েছে কারণ, বিরোধী দল হিসেবে সংসদে আওয়ামী লীগও ছিল শক্তিশালী। সেজন্য মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান আড়াল করতে চাইলেও তা আড়াল করা যায়নি এবং লিখতে হয়েছে জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চ 'স্বাধীনতা ঘোষণা' দিয়েছিলেন। এবার জামাত-বিএনপি সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে। ফলে পাঠ্যপুস্তকে তাদের মতাদর্শ প্রচারে আর রাখঢাক রাখা হয়নি। তারা যা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা-ই করা হয়েছে। এর ভিত্তি মিথ্যা না সত্য, তাতে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। জোট সরকার পরিবর্তন এনেছে যেখানে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু স্বাধীনতার নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও সে ঘোষণার তারিখ এবং বিতর্ক সেখানেই। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একটি কথাই বার বার ফিরে এসেছে। জিয়াউর রহমান, হ্যাঁ, সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং তারিখটা ২৭ মার্চ নয়, ২৬ মার্চ। গত শতক পর্যন্ত ছিল ঘোষক/পাঠক জিয়াউর রহমান এবং তারিখ ২৭ মার্চ। মনে হচ্ছে, পুরো জাতির ইতিহাস আটকে আছে একটি তারিখের হেরফেরের মধ্যে। এ জাতি এগুবে কীভাবে?

এছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানের আগে বাঙালির ভালোবেসে দেওয়া উপাধি 'বঙ্গবন্ধু' সব জায়গা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাকে যতটা সম্ভব তুচ্ছ করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। আমরা অনেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে অপছন্দ করতে পারি, সমালোচনা করতে পারি; কিন্তু তাকে তুচ্ছ করার দরকার কী? বাংলাদেশের ইতিহাস কি তাকে বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব হবে? এবং লিখলেও কি তা স্বীকৃত হবে? যেহেতু জোট সরকারের অংশীদার জামাতে ইসলামী, সেহেতু যেখানে আলবদর, আলশামস তাদের গণহত্যা বা বুদ্ধিজীবী হত্যার কথা আছে, সেসব অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে জোট সরকার ঘোষণা করেছে, 'প্রভিশনাল বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।' হ্যাঁ, মেজর জিয়া 'প্রভিশনাল কমান্ডার ইন চিফ অফ দি বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' নাম নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে তা ২৭ মার্চ, স্বাধীনতার দলিলপত্রে তা উল্লেখ করা হয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ১৫ খণ্ডের এই দলিলপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন লে. জে. জিয়াউর রহমান। প্রকাশিত হয়েছিল তা এরশাদ আমলে।

তবে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে পাঠ্যবইয়ের প্রসঙ্গটি শেষ করি, তাহলে বোঝা সম্ভব হবে ধারাবাহিকভাবে তারা দখলের কাজটি কীভাবে করছে।

পাঠ্যবইয়ে তথ্য বিকৃতকারী কাজী সিরাজউদ্দিনকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার এই তথ্যের ভিত্তি কী? তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি। তবে বলেছেন, সৈয়দ আলী আহসানের একটি লেখা তার তথ্যের ভিত্তি।

কী লিখেছেন সৈয়দ আলী আহসান? তিনি লিখেছেন, ২৬ মার্চ ছিল তার জন্মদিন। সেদিন 'কালুরঘাট ট্রান্সমিশন স্টেশন থেকে জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে পেয়েছিলাম।'

'সেই মুহূর্তটি আমাদের জীবনের আশা এবং উদ্দীপনার একটি তীব্রতম মুহূর্ত ছিল।' তিনি আরো উল্লেখ করেছেন সেই সময় তার সঙ্গে ছিলেন রশীদ চৌধুরী ও দেবদাস চক্রবর্তী।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সহকর্মী ছিলেন সৈয়দ আলী আহসানের। তিনি বলেন, ২৬ তারিখ তার জন্মদিনে কাউকে ডাকলে আমাকে ডাকতেনই। অন্তত রশীদ চৌধুরী বা দেবদাসের আগে। কিন্তু সেদিন তার জন্মদিনে আমাকে ডাকেননি। আর দেবদাস চক্রবর্তী ওই সময় ঢাকায় ছিলেন শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর বাসায়।

অধ্যাপক মনসুর মুসা এখন মতাদর্শের দিক থেকে বিএনপির কাছাকাছি; কিন্তু তিনিও বলেছেন, 'সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের স্মৃতিচারণ ঠিক নাও হতে পারে। ২৬ মার্চ ছিল কড়া কারফিউ। ঘরের দরজা-জানালা পর্যন্ত কেউ খোলেননি। তাই অনেকে ২৬ মার্চকে পূর্ণাঙ্গ দিবস হিসেবে দেখার সুযোগ পাননি। যে কারণে ২৭ মার্চের সঙ্গে

২৬ মার্চকে গুলিয়ে ফেলার এবং স্মৃতিবিভ্রম ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।' সৈয়দ আলী আহসান এখন মরহুম।

তবে এ কাজটি করার জন্য মৃত্যুর আগে বেগম জিয়া তাকে একটি স্বর্ণপদক দিয়েছিলেন। আমি সবসময় বলেছি, এখনো বলি, বেগম জিয়ার একটি দিক অভিনন্দনযোগ্য। তিনি সব সময় আনুগত্যকে পুরস্কৃত করেন। আর আলী আহসান তো স্বর্ণখণ্ডের বদলে কাজটি করেছিলেন, অনেকে তামার পাত্র পেলেও এ কাজটি করতো। আমরা আগেও বলেছি, এখনো বলছি- পাঠ্যবইয়ে ২৬ মার্চ জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন বলে যা সংযোজিত হয়েছে, তা মিথ্যা এবং অবৈধ। এ অংশটুকু যারা রচনা করেছেন, তারা অন্যায় করেছেন মিথ্যা তথ্য সংযোজন করে। ফলে কোনো শিক্ষক ও ছাত্র এ তথ্য গ্রহণে বাধ্য নয়। একজন শিক্ষক, তিনি যে মতাবলম্বীই হোন না কেন ক্লাসরুমে সৎ শিক্ষক হিসেবে এমন তথ্য ছাত্রদের দিতে পারেন না যা সংবিধানবিরোধী ও অসত্য। এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য আমি শিক্ষকদের অনুরোধ জানাবো। জোট সরকারের এই মিথ্যা তথ্যে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছাত্ররা। পরীক্ষার-খাতায় এই মিথ্যা উত্তর ভুল বলে বিবেচিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোনো অ্যাকাডেমীক পর্যায়ে এই তথ্য গ্রাহ্য হবে না। এরা সবাই জামাত ও বিএনপির ক্রীতদাস এটা ভাবা ঠিক হবে না। যারা গবেষণা করবেন, ইতিহাস লিখবেন দলিলপত্রের ভিত্তিতে, তাদেরও কোনো উপায় থাকবে না এই তথ্য ব্যবহারের। যেমন এক সময়ে আওয়ামী লীগার, তারপর জিয়াভক্ত, এরপর এরশাদের অনুসারী, বর্তমানে আবার বেগম জিয়ার দক্ষিণহস্ত মওদুদ আহমদ পর্যন্ত যখন শেখ মুজিবের সময়কাল শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটি লেখেন, তখন বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন এভাবে- 'শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ মুজিবের চেয়েও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তার চেয়ে বেশি অবদান রেখেছে, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। গবেষক হিসেবে তিনি বুঝেছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন করা যায় না।

এভাবে জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা একদিন পিছিয়ে ২৬ মার্চ করা হলো। মুশকিল হলো তারপরও ২৫ মার্চ (এক অর্থে ২৬ মার্চ) থেকে যাচ্ছে এবং বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাও থেকে যাচ্ছে। এর ফলে, তারা দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র পুনর্মুদ্রণে হাত দেয়। চিন্তা ছিল নতুন একটি দলিল সংযোজন করা যাতে প্রমাণ করা যায় জেনারেল জিয়া ২৫ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু, এর ফলে এক লেজেগোবরে অবস্থাই নয় কৌতুককর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, জেনারেল জিয়াকে তার দলই ভাঁড় হিসেবে উপস্থাপন করে অপমান করেছে। এ অবস্থা বোঝার মতো বোধ তাদের নেই। তারা এর অর্থনৈতিক দিকটিও বিবেচনায় রাখছে। অর্থাৎ প্রতিবার পাঠ্যবই বদল বা দলিলপত্র বদলে নতুন করে ছাপতে হলে বেশ বড় অংকের টাকার প্রয়োজন। এ টাকা

বা মালপানিও বিএনপির কর্মকর্তাদের পকেটে যাবে। অর্থাৎ তাদের 'আদর্শে'রও একটি অর্থনৈতিক দিক আছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার ১৫ খণ্ড দলিলপত্রের তারা পুনর্মুদ্রণ করেছে। এর পেছনে বাণিজ্য ও জিয়ার 'ঘোষণা' একদিন পিছিয়ে আনার পরিকল্পনা কাজ করেছে।

পাঠ্যবইয়ে ২৭ মার্চ থেকে একদিন পিছিয়ে আনাতে যে বাণিজ্য হলো, তাতে খুশি নন নীতিনির্ধারকরা। সুতরাং আরেকদিন পেছানোর প্রকল্প পেল নবগঠিত মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়। তারা পরিকল্পনা নিলো ১৫ খণ্ড দলিলপত্র পুনর্মুদ্রণের। এখানে উল্লেখ্য, বাংলা একাডেমী এ উদ্যোগ নিয়েছিল। এর কাজও অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছিল। বাংলা একাডেমীর উদ্যোগ ছিল, নতুন দলিলপত্র পেলে তা সংযোজনের। মন্ত্রণালয় জানাচ্ছে, তারা সংযোজন নয়, পুনর্মুদ্রণ করেছে। এ কারণে তারা একটি প্রত্যয়ন কমিটিও করেছিল। বাংলা একাডেমী ৬৪টি জেলার মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার কাজও সম্পন্ন করেছিল। মন্ত্রণালয় সেগুলো এক রকম বাজেয়াপ্ত করে সেক্টরভিত্তিক রচনার কাজও শুরু করে। অর্থাৎ যুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের তারা আক্ষরিক অর্থ করেছে অর্থাৎ যুদ্ধ। ফলে সামরিক বাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে অনায়াসে। আর সামরিক বাহিনীজাত হচ্ছে বিএনপি। অর্থাৎ সবাই বলে, বিএনপির সৃষ্টি ক্যান্টনমেন্টে। ফলে পরে বলা যাবে, যুদ্ধ করার সময়ই তারা বিএনপির কথা ভেবেছিল। তাহলে অন্তিমে আরো বলা যাবে, বিএনপি মুক্তিযুদ্ধজাত। যা হোক, পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছে কয়েকদিন আগে। এ বিষয়ে সব পত্রিকায় খবর এসেছে, তবে বিস্তারিত খবর দিয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠ (৯.৭.০৪)। পুনর্মুদ্রণ সংক্রান্ত তথ্য ও উদ্ধৃতি আমি দেবো জনকণ্ঠ থেকে।

পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী যা বুঝলাম, তাহলো তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পাতাটি সংযোজিত। পুরোনো দলিলপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি ছিল প্রথমে। এখন সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রত্যয়ন কমিটি এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পায়নি। এই ভিত্তি সম্পর্কে গত ২০ বছর অবশ্য তারা কোনো কথা বলেনি। এখন বলছে নিশ্চয়ই মালপানির ব্যাপার আছে। তারা এখন অথেনটিক একটি রিপোর্ট পেয়েছে, যার বলে জেনারেল জিয়াকে তারা প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণাকারী হিসেবে শনাক্ত করতে পেরেছে।

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (চট্টগ্রাম) থেকে জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা শিরোনামে ছাপা বক্তব্যে বলা হয়েছে 'আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চিফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। আপনারা যে যা পারেন সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে দেশছাড়া করতে হবে। ইনশাল্লাহ, বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।'

স্বাধীনতার এই প্রথম ঘোষণার নিচে তারকাচিহ্নিত ফুটনোট দিয়ে বলা হয়েছে, '২৬ মার্চ ১৯৭১ রাত ২-১৫ মিনিটে (২৫ মার্চ মধ্যরাতে) তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মেজর জিয়া

অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন অফিসার, জেসিও এবং জোয়ানদের একত্রিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাকে তা জানানো হয়।' এর সূত্র জানানো হয়েছে কিনা জানি না।

এবার ইতিহাসের ভাষ্য দেওয়া যাক এবং যুক্তি। এম এ হান্নান জানাচ্ছেন, '২৭ মার্চ বিকালে মেজর জিয়াউর রহমানও রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।'

১। '২৬ মার্চ ভোরে আমরা কালুরঘাটের আর একটু দূরে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আমরা বিশ্রাম নিলাম এবং রিঅর্গানাইজেশন করলাম। ২৬ মার্চ এভাবে কেটে গেল।

২৭ মার্চ সন্ধ্যার সময় মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে থেকে পড়ি।' (সূত্র : সাক্ষাৎকার ক্যাপ্টেন শমশের মুবিন চৌধুরী ২০.১০.৭৩। পরবর্তী সময়ে মেজর এবং বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব। তিনি ১৯৭১ সালে মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, পৃষ্ঠা-৫৯, ২য় ও ৩য় প্যারা, ৯ম খণ্ড)।

২। 'বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণা যেটা নিয়ে সব সময় বিতর্ক চলতে থাকে জেনারেল জিয়া করেছেন, না আওয়ামী লীগ থেকে করেছে। আমার জানা মতে সবচাইতে প্রথম বোধহয় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হান্নান ভাইয়ের কণ্ঠই লোকে প্রথম শুনেছিলেন। এটা ২৬ মার্চ '৭১ অপরাহ্ণ দু'টার দিকে হতে পারে। কিন্তু যেহেতু চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের প্রেরকযন্ত্র খুব কম শক্তিসম্পন্ন ছিল, সেহেতু, পুরো দেশবাসী সে কণ্ঠ শুনতে পাননি। কাজেই যদি বলা হয়, প্রথম বেতারের কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল, তাহলে আমি বলবো যে চট্টগ্রামের হান্নান ভাইয়ের সেই বিদ্রোহী কণ্ঠ। তবে এটা সত্য যে পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ '৭১ মেজর জিয়ার ঘোষণা প্রচারের পরই স্বাধীনতা যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়।

২৭ মার্চ '৭১ মনে হয় জেনারেল জিয়া বুঝতে শুরু করেন যে বেতারে একটা ঘোষণা প্রচার করা দরকার। ঐ তারিখেই সন্ধ্যায় প্রচার করা দরকার। ঐ তারিখেই সন্ধ্যায় কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে এটা করলেন তিনি। বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগের নেতাও ঐ সময় খুব তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর নূরুল ইসলাম, আতাউর রহমান খান কায়সার, হান্নান ভাই এবং এম আর সিদ্দিকী। তারাও সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কিছু প্রচারিত হওয়া উচিত। অপরদিকে জেনারেল জিয়া কী বলবেন তার একটি খসড়াও প্রস্তুত করে নিলেন। ২৭ মার্চ '৭১ সন্ধ্যার পর চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত হলো জেনারেল জিয়ার (তৎকালীন মেজর) ভাষণ'। (সূত্র : সাক্ষাৎকার মেজর মীর শওকত আলী, পরবর্তী সময়ে লে. জেনারেল ও বিএনপি মন্ত্রী। ১৯৭১ সালে তিনি মেজর জিয়ার সঙ্গে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, পৃষ্ঠা ১২১, প্যারা-২, ৯ম খণ্ড)।

৩। 'সবকিছু চিন্তাভাবনা এবং পর্যালোচনার পর আমরা সুপরিকল্পিতভাবে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র দখল করলাম। মেজর জিয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ২৭ মার্চ

বিকেলবেলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। আমি তার পাশেই বসা ছিলাম।' (সূত্র: কর্নেল অলি আহমেদের লেখা গ্রন্থ 'আমার সংগ্রাম আমার রাজনীতি'। পৃষ্ঠা-২৩, প্যারা-১।

প্রকাশকাল, ১ সেপ্টেম্বর ২০০১। ক্যাপ্টেন- পরে কর্নেল অলি আহমেদ বীরবিক্রম, মেজর জিয়ার সঙ্গে ১৯৭১ সালে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তিনি বর্তমানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য)।

৪। 'On 27 March 1971 Major Ziaur Rahman declared the independence of Bangladesh on behalf of Banga Bandhu Shaik Mujibur Rahman From 'Swadhin Bangla Bater Kendra' of Kalurghat Chittagang'. (Ref- Bangladesh fights for independence, written by Lt Gen ASM Nasim BB. Published in Feb- 2002. He was made Chief of Army staff by Begum Khaleda Zia, The Primeminister of Bangladesh 1991-96).

৫। '২৭শে মার্চ জিয়াউর রহমান নিজ নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। আমার মনে আছে তিনি বলেছিলেন, 'আই, মেজর জিয়া ডু হেয়ারবাই ডিক্লেয়ার' ইত্যাদি। (সূত্র: আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম, প্রকাশকাল ১৯৯৫। লেখক ড. এ আর মল্লিক। ভাইস চ্যান্সেলর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী)।

৬। 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই বিরাট শক্তির মোকাবিলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না এ কথা বাঙালি সৈন্যরা বুঝেছিলেন। তাই শহর ছেড়ে যাবার আগেই বিশ্ববাসীর কাছে জানিয়ে যাবার জন্য মেজর ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে যান।... প্রায় দেড়ঘণ্টা মোসাবিদার পর তিনি তৈরি করেন তার সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি। নিজেই সেটা তিনি বাংলা এবং ইংরেজিতে পাঠ করেন।' (সূত্র জিয়াউর রহমানের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক দলিল। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫, শেষ প্যারা)।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৪.৪.১৯৭১ তারিখে দেশবাসীর প্রতি বেতারে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন, '২৫ মার্চ মধ্যরাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্তলোলুপ সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নরহত্যাযজ্ঞের শুরু করেন, তা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।'

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? স্বাধীনতার ড্রামতত্ত্বের উদ্ভাবক জেনারেল শওকত ও অন্যান্য, এমনকি ইয়াহিয়া খান নিজেও বলেছেন, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ। এমনকি জেনারেল জিয়াও স্বীকার করেছেন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তিনি ২৭ মার্চ। আর ২৭ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত জিয়াউর রহমান যদি কার্যত বাংলাদেশের আন্দোলনের প্রধানই হন, তাহলে দেশ-বিদেশের সংবাদপত্র, রাষ্ট্রনায়করা কেন বারবার খোঁজ করে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়'? তারপর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত

কেন কোনো বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে জেনারেলের কথা নেই? ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল জিয়া বিজয় দিবসের এক বক্তৃতায় বলেন, 'এই পবিত্র মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে ২৭ মার্চের কথা, যেদিন চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আমার বলার সুযোগ হয়েছিল। সেই একই জাতীয়তাবাদী চেতনা, সাহস ও প্রত্যয় নিয়ে আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।'

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী বলেছিলেন, ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগর ঘোষিত ও জারিকৃত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। এই বীজমন্ত্র অস্বীকার করার অর্থ স্বাধীনতা অস্বীকার করা, যা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। সংবিধানে সংকলিত এই বীজমন্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে. 'যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান...' এবং 'আমরা আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।'

প্রত্যয়নকারীরা যা করেছেন, তা এক ধরনের প্রতারণা। তারা সমাজের নামীদামি ব্যক্তিত্ব। ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষজন এটিকে প্রতারক কমিটি বলছে, যাতে আরো খারাপ লাগছে। কারণ এদের অনেকে আমাদের শিক্ষকতুল্য, সহকর্মী ছিলেন। সারাদেশ প্রতারককে ভরে গেলে তো মুশকিল।

নীতিনির্ধারকদের মালপানি কামানোর জন্য আরেকটি পথ বাতলে দিচ্ছি। মালপানি না কামালেও এ কাজগুলো না করলে তারা অযোগ্য বলে চিহ্নিত হবেন। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

১. ১৫ খণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় জেনারেল শওকত বা অধ্যাপক মল্লিকের মতো আরো অনেকের বক্তব্য আছে। প্রথম পৃষ্ঠায় জেনারেল জিয়ার বক্তব্যের সঙ্গে ১৫ হাজার পৃষ্ঠার অসঙ্গতি থাকলে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। সুতরাং ১৫ হাজার পৃষ্ঠার এ ধরনের বক্তব্য বদলানো হোক। একবার হিসাব করে দেখুন- এসব পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে নতুনভাবে ছাপানো-বাঁধানো, কত মালপানি!

২. সঙ্গতি রাখার জন্য ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার আগে এক পৃষ্ঠা জুড়তে হবে। কারণ জীবিত থাকাকালীন জেনারেল জিয়া লিখেছেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের বক্তৃতা ছিল তার কাছে গ্রিন সিগন্যাল। এখানে ফুটনোটে বলা যেতে পারে, ৭ মার্চ সকালে জেনারেল জিয়া সৈনিকদের ঐ ধরনের একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রমনা রেসকোর্সে যাওয়ার পথে বঙ্গবন্ধু সেটি জেনেছিলেন এবং এটি ছিল তার কাছে গ্রিন সিগন্যাল। সেই ছোটখাটো মেজরের বক্তৃতায় এত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে তিনি ৭ মার্চের ভাষণটি দিতে পেরেছিলেন।

৩. আমেরিকার পর বাংলাদেশই ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনকারী

দেশ এবং জেনারেল জিয়ার নতুন তথ্য সংযোজনের কারণে এটিও বদলাতে হবে, সংবিধানও বদলাতে হবে। এই যে প্রক্রিয়া এতেও প্রচুর মালপানি পাওয়া যাবে।

৪. জোট সরকার এ কাজটি করলে নতুন এক বিরল কৃতিত্ব অর্জন করবে। বাংলাদেশই হবে প্রথম দেশ, যে ৩৩ বছরের মাথায় নিজের দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বদল করেছে। এ রকম ইউনিক চান্স আর পাওয়া যাবে না।

এ ধরনের খুঁটিনাটি আরো অনেক বিষয় আছে। আর এসব প্রত্যয়নের জন্য প্রচুর প্রতারক পাওয়া যাবে। তাদের মালপানি না দিলেও আজ্ঞাবহের কাজটি তারা করে দেবে।

এখানে আরেকটি সমস্যার কথা তোলা যেতে পারে। শোনা যায়, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে হাক্কানি পাবলিকেশন্স ইতিমধ্যে ১৫ খণ্ডের দলিলপত্র পুনর্মুদ্রণ করেছে। তাদের সেই ১৫ হাজার টাকা। কথা ছিল সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তা কিনবে। সেটি এখন বাজারে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে প্রকাশিত দলিলপত্রে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা নাকি নেই আর মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়েরটিতে আছে। ব্যাপারটা কেমন হলো! এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য হাক্কানিকে তাহলে বলতে হয় তাদের ছাপা সেটা প্রত্যাহার করতে। এ প্রত্যাহার পর্বেও কিছু লেনদেন হতে পারে। না হোক, এ অসঙ্গতি দ্রুত দূর করা উচিত।

আশা করি চুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টি স্পষ্ট করতে পেরেছি। জোটের কারণে চুক্তিযোদ্ধারা সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান সংহত করতে চাচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ হলে জোটের সহযোগী জামাত এগিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে তারা বলছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় তো তারা কিছু করেনি? হত্যা? এগুলোর পেছনে তো আওয়ামী লীগ ছিল।

ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি বুঝি চুক্তিযোদ্ধারা এখন মুক্তিযুদ্ধ দখল করে নিতে পারে কিন্তু আজীবন কোনো কিছু কারো দখলে থাকে না। আর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই স্বাধীনতার ঘোষণাকারী নয়, বাংলাদেশের স্থপতি বলতে হবে। ফুটনোটে জিয়াউর রহমান থাকলেও থাকতে পারেন।

আমি ওপরে যে সব তথ্য, যুক্তি দিয়েছি সেগুলো জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। চোর কখনো ধর্মের কাহিনী শোনে না। চুক্তিযোদ্ধারা একটি কাজের ভার নিয়েছে, তারা তা করছে। যারা চুক্তিযোদ্ধা নন, তারা কী করবেন তা এখন দেশের বিষয়। বাংলাদেশ তো সব সম্ভবের দেশ। বলা যায় না। এদের মধ্যে কে কোথায় কোন চুক্তি করে বসে আছেন।

এখনো হয়তো সব শেষ হয়ে যায়নি। অন্তত চুক্তিযোদ্ধাদের শেষ কর্ম সম্পাদনের পর সিভিল সমাজের প্রতিক্রিয়া দেখে। তবে, এখান থেকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যার প্রধান সাক্ষীকে র‍্যাব হত্যা করেছে। তারপর আছে গাজীপুর নির্বাচন। আমাদের হত্যার ব্যাপার। মুক্তিযুদ্ধ দখল তখন চাপা পড়ে যাবে। তবে, বাংলাদেশ থাকলে এ দখলদারিত্ব বেশিদিন রাখা যাবে না। আর বাংলাদেশ না থাকলে তো মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নটিই অবান্তর হয়ে যাবে এবং

চুক্তিযোদ্ধাদের মরহুম জিয়াকেও পরিত্যাগ করতে হবে। পুরোনো কথায় ফিরে যাই। আনন্দের বিষয় নতুন দলিল সংযোজন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সিভিল সমাজে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বেসরকারি প্রচার মাধ্যমে এর নিন্দা করা হচ্ছে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও দৃঢ়কণ্ঠে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তবে, ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, এই বিষয়টিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা না করে সামগ্রিকভাবে দেখা। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি মোছার যে আয়োজন তারা পাঠ্যবই ও স্থাপনা/প্রতিষ্ঠানের নাম বদলের মাধ্যমে করছে তারও প্রতিবাদ করা। এক কথায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সামগ্রিক বিকৃতায়নের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এর বিপরীতে জোট সরকার নতুন স্ট্রাটেজি গ্রহণ করবে। অর্থাৎ নতুন নতুন ইস্যু সৃষ্টি করবে যাতে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। যেমন চাপা পড়ে গেছে আগের ইস্যুগুলো। এর বিপরীতে সিভিল সমাজের উচিত হবে কোনোক্রমেই যাতে বিষয়টি ধামাচাপা না পড়ে তার দিকে লক্ষ্য রাখা।

আমার দুঃখ হচ্ছে প্রয়াত জেনারেল জিয়াউর রহমানের জন্য। জীবিতকালে সব সময় বলেছেন, তিনি ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছেন। জোটীয়রা এখন একবার বলছে তিনি ২৬ মার্চ, আবার বলছে ২৫ মার্চ 'ঘোষণা' দিয়েছেন। তারা প্রমাণ করতে চাচ্ছে জেনারেল জিয়া সত্য বলেননি। জেনারেল জিয়া ১৯৭৫-এর পর কী করেছেন, তা অন্য বিষয়। কিন্তু তিনি তো সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, বীরউত্তম ছিলেন, দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার সততা ক্ষুণ্ন হচ্ছে এ ধরনের জোটীয় আচরণে। তিনি এখন প্রয়াত, তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বলি, তাকে কবরে অন্তত শান্তিতে থাকতে দিন। তাকে অসত্যবাদী করে তোলা, তার চরিত্র হনন করা- এ অধিকার বিএনপিকে কেউ দেয়নি। জানি তিনি 'ড্রিম', রিয়ালিটি অন্য। তবু তার আর অসম্মান করবেন না।

সবশেষে বলতে চাই, জোটীয়রা কখনো ধর্মের কাহিনী শুনতে চায়নি, চাইবেও না। এখন অপেক্ষা করছি, কবে তারা একটি ডুকমেন্ট পাবেন, যেখানে দেখা যাবে- গোলাম আযম মেজর জিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ২৫ মার্চ বিদ্রোহ করার। কারণ জোটের একপক্ষ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করবে, অন্যরা করবে না- তা তো হয় না। এ বিষয়ে আমরা কিছু বলে দেশদ্রোহী খেতাব পেতে চাই না। তবে এ আশঙ্কা করেই কি ফেনীর প্রভাবশালী বিএনপি এমপি জয়নাল আবেদীন ওরফে ভিপি জয়নাল দলিলপত্র মোড়ক উন্মোচনের দিন অনুষ্ঠানের অব্যবস্থা দেখে বলেছেন, 'এ জন্য মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করেননি। তিনি আয়োজকদের গালি দেন 'রাজাকার' বলে। আর তখনই অনুষ্ঠানে উপস্থিত এবং অধৈর্য সকলে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান তাকে।'

৯.৭.২০০৪

সব সংবাদই দুঃসংবাদ

সকাল ৯ টায় শিল্পী হাশেম খান ফোন করেছিলেন আমার শরীরের খবর জানতে, খানিকটা অসুস্থ ছিলাম। আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, কোনো খারাপ খবর আছে কিনা? হাশেম খান বললেন, সব খবরই তো খারাপ খবর। তবে নিজেরা এখনো সুস্থ। ফোন রাখার ২ মিনিট পর আবার ফোন করলেন। বললেন, হুমায়ুন আজাদ মারা গেছেন। অধ্যাপক আজাদ তাঁর প্রতিবেশী খবরটা তখনই তিনি পেয়েছেন। হ্যাঁ, বাংলাদেশে এখন আর কোনো ভালো খবর একমাত্র যারা শাসন করছে তাদের। তারা যতদিন আছে বাংলাদেশে সুসংবাদ বলে কিছু থাকবে না, সব সংবাদই দুঃসংবাদ।

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে আমার পরিচয় তিন দশকের। আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করি তখন তিনি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে; তবে কিছুদিনের মধ্যেই সহকর্মী হয়েছিলেন। তিনি আমাদের সিনিয়র, আমাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা থাকলেও এক ধরনের দূরত্ব মেনে চলতাম। তবে, সাহিত্যচর্চার কারণে আস্তে আস্তে সম্পর্ক সহজ হয়ে এসেছিল। মধ্য আশি থেকে নব্বই দশকে পর্যন্ত তিনি ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়, মিটিং-মিছিলেও। এরশাদ আমলে তাঁর লেখা কলামগুলোর মতো জোরালো লেখা সেই সময় খুব কমই প্রকাশিত হয়েছিল। এরশাদ আমলের পর আরো দুঃশাসন গেছে, চলছে– বলেছিলাম, 'আপনার সে ধরনের লেখাগুলো চাই।' হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, না, সেগুলো আর লিখে লাভ নেই। উপন্যাস লিখবো। গত কয়েক বছরে তাঁর মনে হয়েছিল, উপন্যাসই তাঁর মাধ্যম। অন্যকিছু আর তেমন লিখতেন না। যদিও তাঁর সঙ্গে কখনো আমি এ বিষয়ে একমত ছিলাম না।

গত কয়েক বছর তিনি ক্রমেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে হলে আসতেন। আমি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো, ধন্যবাদ জানানোর জন্যই তাঁকে খুঁজছিলাম। আমাকে গ্রেপ্তার করার পর মুষ্টিমেয় যে ক'জন শিক্ষক প্রতিবাদ মিছিল করেছিলেন তিনি ছিলেন তার একজন। বললাম, কই, প্রতিবাদ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলেন না? না তিনি বলতেন এসব থেকে তিনি দূরে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যখনই কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সভা-মিছিল করেছি, তিনি তাতে যোগ দিয়েছেন। আর এ কারণে উপন্যাস ছাড়াও ২০০১ সালে লিখেছিলেন– 'আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম?'

মৃত্যুর হাত থেকে ফেরার পর দেখা করতে গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে। না, বিন্দুমাত্র নমিত নন। বরং বলছিলেন নতুন লেখালেখির কথা। মৃত্যুর সঙ্গে যখন তিনি লড়ছেন

সেই সময়কার খবরের কাগজগুলোর খোঁজ করছিলেন, 'কাটিং নয়, আমি আস্ত খবরের কাগজটা চাচ্ছি যাতে সে সময়টিকে ধরতে পারি।'

মাসখানেক আগে, সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি অধ্যাপক আজাদ, আকাশ ও আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে একটি ধর্মব্যবসায়ী গ্রুপ। সকালেই অধ্যাপক আজাদের ফোন পেলাম। বললেন, মুনতাসীর, বহুদিন পর আজ সকালে ওঠে ভালো লাগছিল, তাই ভাবছিলাম একটা কবিতা লিখবো। কিন্তু খবরটা পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। সেদিন বিকালে তাঁর বাসার নিচে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। আমরা দু'জনই নানাভাবে আক্রান্ত, তিনি আরো বেশি। অনেকক্ষণ কথা না বলে চুপচাপও ছিলাম দু'জনে। আসলে, ঐ একটি কথাই বারবার মনে হচ্ছিল, না বললেও–. এ কলুষিত দেশটি কি চেয়েছিলাম? অনেকেই বলেছেন, আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু ১৯৭১-এও যে দেশ ছেড়ে যাইনি, আজ চলে যেতে হবে? আমাদের অপরাধটি কী?

দ্বিতীয়বার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা ও কয়েকটি গ্রুপ কর্তৃক গ্রেপ্তারের দাবি তাঁকে বিষণ্ন করে তুলেছিল, ভীত নয় কিন্তু প্রতিদিন হুমকি, ছেলেমেয়েকে অপহরণ প্রচেষ্টা, একটা মানুষ কত নিতে পারে? বিষণ্নতাটা সে জন্য। যারা এ ধরনের হুমকি, মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হননি তারা বুঝতে পারবেন না, বিষয়টি কী রকম। শুধু একজন ব্যক্তি নয়, পুরো পরিবারকে তছনছ করে দেয়। তারপরও তো আমরা আছি, আমাদের কাজ করে যাচ্ছি।

হুমায়ুন আজাদ যা করেছিলেন সেটিই অর্থাৎ মন দিয়ে লেখার জন্যই অবশেষে বিদেশ গিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, সেখানে পা দিয়ে, বর্বরতা আর সভ্যতা, বন্দি জীবন আর মুক্ত জীবন, স্বর্গ ও নরকে বসবাসের বিষয়টি নতুনভাবে তাঁকে আঘাত করেছিল। তিনি কোন নরকে রেখে এসেছেন পরিবার-পরিজনকে-এই অনুভূতিও হয়তো অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। তিনি আর নিতে পারেননি।

মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছিলেন। কিন্তু তারপর যদি আরো হুমকি ও মৃত্যুদণ্ড, গ্রেপ্তারের দাবিতে মৌলবাদীরা মুখরিত না হতো এবং সরকারের নীরব প্রশ্রয় না থাকতো তাহলে হয়তো আরো কিছুদিন তিনি আমাদের উদ্দীপ্ত করার জন্য থাকতেন। একটি খোলা চিঠিতে সে মনোভাবও ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি গেলেন, হুমকি ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আমরা কয়েকজন রইলাম। কত দিনের জন্য জানি না। আমরা কেউ হুমায়ুন আজাদের মতো হতে পারবো না, অতোটা সাহস আমাদের নেই। বাংলাদেশে সে জন্যই তাঁর অকস্মাৎ চলে যাওয়া আমাদের স্তব্ধ করে দিয়েছে। বাংলাদেশে অন্যায়ের, মৌলবাদের হিংস্রতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানুষ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। সামনের ভয়ঙ্কর দিনগুলো হাঁ করে আছে, হুমায়ুন আজাদ নেই– এ দুঃখ বোঝাই কাকে?

২০০৪

আমাদের বিজয় দিবস, তাদের?

বাংলাদেশের পাকিদের সম্পর্কে আবেদ খানের গত দু'দিনের দু'টি লেখা অনেককে উজ্জীবিত করবে। জনাব খান যে একেবারে নতুন কিছু বলেছেন তা নয়। গত প্রায় তিনদশক বিভিন্নভাবে, বিভিন্নজন বলেছেন, লিখেছেন। এখন অনেকে হয়তো বলেন না, লেখেন না বা বলতে বলতে বলেন না, লেখেন না বা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। বাংলা-পাকিরা চায়, আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাই তাদের মিথ্যা সত্যে পরিণত করার জন্য তাদের প্রচারযন্ত্র অব্যাহত আছে। আবেদ খান আমাদের অনুচ্চারিত কথাগুলো সংহত এবং জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই লেখার গুরুত্ব এই যে, আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, আমরা যেন ক্লান্ত না হই। বিজয়ের মাসে এ ধরনের লেখা এবং রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাধারণের অংশগ্রহণ দেখে কিছু কথা মনে হলো। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে তাঁকে হত্যা করা হলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। এ দু'টি বাক্যই সত্য কিন্তু দু'টি সত্য আজ বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দিয়েছে।

আজ পিছন ফিরে কয়েকটি কথা মনে হয় যার সঙ্গে অনেকে একমত হবেন না। কারণ, রাজনৈতিক অধস্তনতা, সুবিধাবাদ, মূর্খতা ও বিভ্রান্তি। জেনারেল জিয়া মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ কী তা না জেনেই। অধিকাংশ সেনা অফিসারের বেলায়ই কথাটি প্রযোজ্য। যত যুক্তিই দেন, এটিতো সত্য যে, তারা বাংলাদেশের মুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, শেষ মুহূর্তে, অনেকক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই। যে কারণে জিয়া ও তার ভক্ত সামরিক অফিসাররা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামাননি। তারা ক্ষমতা নিয়ে ভেবেছেন। এই ক্ষমতা করায়ত্তকরণটি হচ্ছে নাকি আদর্শ। গায়ে ইউনিফরম থাকবে এবং থাকলেই ক্ষমতায় থাকতে হবে এবং আদর্শ ক্ষমতার অনুসারী হবে। জিয়াউর রহমান সম্পর্কে যত কথাই বলেন, মূল সত্য তিনি শেষ মুহূর্তেও 'সোয়াত' থেকে অস্ত্র খালাস করতে গিয়েছিলেন (২৫ মার্চ রাতে, ভাবুন একবার!) এবং ছাত্র-জনতার ব্যারিকেডে পরাস্ত হয়ে ফিরতে হয়েছে এ কথা বলে যে, 'উই রিভোল্ট'! রিভোল্ট ও লিবারেশনে অনেক তফাৎ। সেই সময় স্বাধীনবাংলা বেতারের কর্মকর্তারা ইউনিফরম পরা একজনকে খুঁজছিলেন। পেলেন মেজর জিয়াকে। তাকে দিয়ে ঘোষণা দেওয়ালেন। যারা শুনেছিলেন তারা উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তারপর তিনি আবার পশ্চাদপসরণ করেন। এখানেই একটা কথা সবাই ভুলে যান, মেজর জিয়ার কণ্ঠ সারা দেশবাসী শোনেনি। কারণ বেতারের সেই ক্ষমতাও ছিল না। কালুরঘাটে যদি আমাদের এ সময় সৌধ ও জাদুঘর করতেই হয় তাহলে সেটি হওয়া উচিত স্বাধীনবাংলা বেতার ও তার কর্মীদের স্মরণে। সেক্টর

কমান্ডারদের থেকে তাদের অবদান কম নয়। এ বিষয়ের প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল চট্টগ্রামেই। কিন্তু এ দেশের মানুষ যেন এখন সবজি হয়ে গেছে। নিজের গলার আওয়াজেই সে ভয় পায়।

যেসব সেনা অফিসার বাধ্য হয়ে গিয়েছিলেন দেখবেন তারাই পরবর্তীকালে বাঙালিবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এতো ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও বেঁচে আছেন এবং বহাল তবিয়তে আছেন। যারা বাঙালি আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশ আর বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলেও অনেক আগেই কর্মচ্যুত হয়েছেন এবং কবে মারা যাবেন সে অপেক্ষা করছেন। এতে একটি সত্য প্রমাণিত হয়, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা এ দেশে ছিল, পরাজিত হওয়ার পর তাদের শক্তি জুগিয়েছে আন্তর্জাতিক পরাজিত শক্তি (আমেরিকা, চীন ও মধ্যপ্রাচ্য বা 'মুসলিম' দেশসমূহ)। পরবর্তী সময়ে এরাই এ দেশে পরাজিত শক্তিকে পুষ্ট করে ক্ষমতাসীন করেছে।

জেনারেল জিয়া সে ধারারই প্রতিনিধিত্ব করছেন। না হলে মুক্তিযোদ্ধা কখনো ৫ বছরের মধ্যেই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে মিলে একজন স্বাধীনতাবিরোধীকেই প্রধানমন্ত্রী বানায়? এটি ছিল সমস্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এক ধরনের তাচ্ছিল্য প্রদর্শন। যেদিন আমরা সেটি মেনে নিয়েছি সেদিন থেকে আমরাও এক ধরনের কোলাবরেটর হয়ে গেছি। এই কোলাবরেশনের মাত্রায় শুধু ভিন্নতা থাকতে পারে এবং বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত, ধনীরা এই কোলাবরেশনের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যুক্ত। সেদিন থেকে বাংলাদেশ নষ্ট হওয়ার পথে এগুচ্ছে।

কোলাবরেশন মানে সুবিধা। এ কারণে গত ৩০ বছরে যারা রাজনীতি ও সমাজ নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাদের মধ্যে কোলাবরেটরের সংখ্যা বেশি। তারা ক্রমেই তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছেন এবং এখন সে আধিপত্য নিরঙ্কুশ করতে চাচ্ছেন। এখন তাদের সামনে একটিই মাত্র বাধা, তা হলো মুক্তিযুদ্ধ।

বাংলাদেশের এতো বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধই হচ্ছে একমাত্র যুদ্ধ যা তৃণমূল পর্যন্ত প্রতিটি পরিবারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এটিই একমাত্র যুদ্ধ যা ছিল জনযুদ্ধ। এটিই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে সাধারণ মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি। এটিই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে গরিব/সাধারণ মানুষ সর্বতোভাবে এলিটদের সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে। এটিই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে ৩০ লাখ নিহত হয়েছেন, আড়াই লাখেরও বেশি ধর্ষিত হয়েছেন। এটিই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে সারা দেশ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। এটিই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধ করা হয়েছে। এটিই একমাত্র যুদ্ধ যেখানে প্রায় ১ লাখ শত্রুসেনা আত্মসমর্পণ করেছিল। এ কথাগুলো অনেকে ভোলার চেষ্টা করলেও তো সত্য। এ কথা সত্যি যে, বর্তমান সরকার সেই পরাজিত শত্রুর প্রতিনিধিত্ব করছে এবং পরাজিতের আদর্শেরই আধিপত্য ঘটাতে চাচ্ছে। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ ও ১১ দল এর বিরোধিতা করছে। এসব আদর্শিক দ্বন্দ্ব, স্বাধীনতার ঘোষণা ও ঘোষক নিয়ে বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব নিয়ে সাধারণের মাথাব্যথা নেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কথা তারা ভুলে গেছে এটি ভাবা ভুল। বিএনপি-জামাত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ

ও চেতনা সম্মিলিত স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার জন্য গত ৩০ বছর চেষ্টা করেও পারেনি, তার একমাত্র প্রমাণ প্রতি ডিসেম্বর। এই মাসে বিএনপি-জামাতও নতজানু হয়ে যায় এবং বিভিন্নভাবে তারা যে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা চেতনাধারী তা বোঝাতে চায়। প্রমাণ করতে চায়। কারণ তারা জানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ জেনারেশনের মৃত্যু না হলে সম্পূর্ণভাবে পরাজিতের আদর্শ স্থাপন করা যাবে না। কিন্তু বেগম জিয়া, মান্নান ভুঁইয়া বা নিজামীর পক্ষে কি আরো ৫০ বছর কর্মক্ষম অবস্থায় বাঁচা সম্ভব?

সারা বছর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সব কর্মকাণ্ড করে ডিসেম্বরে বিএনপি-জামাতকে কি করতে হলো? বিজয় দিবস পালন করতে হলো, হাসিমুখে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলতে হলো, বিজয় র‍্যালি বের করতে হলো, জামাতকে বলতে হলো বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে তারা জড়িত নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী সরকার তো, এর জামাতি মন্ত্রীরা ডিসেম্বরে কেন সেনাবাহিনীর অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোনো পাবলিক অনুষ্ঠানে যেতে পারে না? এমনকি স্মৃতিসৌধেও? মেয়র সাদেক হোসেন খোকাকেও এমন কাজ করতে হলো যা তার আদর্শের পরিপন্থী। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্মিলনী করতে হলো। এমনকি তিনি পাঁচজন জীবিত সেক্টর কমান্ডারের নামে রাস্তার নামকরণ করলেন যা অভূতপূর্ব ও অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু, আমি কী করে ভুলবো তিনি নিজামীর দোস্ত, তিনি বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের সামনে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করেন, বঙ্গবন্ধুকে তাচ্ছিল্য করেন? তার ভালো এই কাজটি তো এসব চনার মাঝে হারিয়ে যাবে। কিন্তু কথা সেটি নয়, কথা হচ্ছে, বিএনপি-জামাত সরকার এগুলো করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ সাধারণতো এসব অবলোকন করছে শক্তির অন্তিম ফ্যাক্টর তো তারাই। এ কারণেই উপভোগ্য লাগে যখন স্বাধীনতার ড্রাম তত্ত্বের প্রবর্তক জেনারেল শওকত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান। আরো মুশকিল হলো পরাজিতদের যে শত সতর্কতা সত্ত্বেও বিজয়, স্বাধীনতা এসব প্রসঙ্গে কোনো না কোনোভাবে বঙ্গবন্ধু চলে আসেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আর জিয়াকে আরোপ করতে হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢল নামে স্মৃতিসৌধগুলোতে, মানুষ বিজয়ের আনন্দে রাস্তায় বের হয় এবং আমাদের নষ্ট পুলিশ বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। আরো ভালো লাগলো এতো সবের পরও গত পরশু টিভিতে দেখলাম, মান্নান ভুঁইয়া আফসোস করে বলছেন, জিয়ার এতবড়ো অবদানকে আওয়ামী লীগ-১১ দল (নাম ধরে বলেননি) স্বীকৃতি দিচ্ছে না, এসব কী ধরনের দল? মান্নান ভুঁইয়া কি জানেন না মিথ্যা স্বীকৃতি পায় না? জানেন। কিন্তু তিনি এখন পরাজিত শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছেন। পরাজিত ও কোলাবরেটরদের গুরুকে প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে তো নিজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন না।

জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিএনপি-জামাত সরকার আবারো মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধী সব কর্মকাণ্ড শুরু করবে। কিন্তু ডিসেম্বরে চুপ হয়ে যাবে। তাদের সমস্ত 'অর্জন' একবার মার্চ এবং একবার ডিসেম্বরে ধুয়েমুছে যায়। এ যেন তৈলাক্ত বাঁশের খেলা। জানুয়ারিতে আবার সব শুরু করতে হয়। আমি কি জানি না দেশের কি অবস্থা? জানি। কিন্তু এও জানি ইতিহাস খুন করে মিথ্যা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কয়েকদিন আগে

এক পাকিস্তানি অধ্যাপক আন্তর্জাতিক এক সম্মেলনে বলছিলেন, বাংলাদেশের সব ঘটনাতো গত ৩০ বছরে আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। তা সেই ইতিহাসই যদি এখন খুন হয় তাহলে ভবিষ্যতে কী হবে? এখন পাকিস্তানিরা পর্যন্ত বলছে, ভালো করেছিল এবং সারা (তৎকালীন পশ্চিম) পাকিস্তানের মানুষজনের তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। কারণ তারা বুঝেছে আমরা বিজয় দেখেছি, অনুভব করেছি এবং তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনটিকে বিজয় দিবস ঘোষণা করেছি। পৃথিবীর আর কোথাও বিজয় দিবস নেই এবং এটাও ঠিক পরাজিত শক্তিরাও ক্ষমতায় নেই। কিন্তু পরাজিতরা ক্ষমতায় আসীন থাকার পরও ট্র্যাজেডি এখানে যে, তারা পরাজয় দিবস বলে কিছু ঘোষণা করতে পারছে না। আমরা সোল্লাসে বিজয় দিবস ঘোষণা করতে পারছি এবং তাদের বাধ্য করতে পারছি বিজয় দিবস পালনে এবং এ সত্য তুলে ধরতে পারছি, পরাজিত শক্তি কোনো দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে না। কারণ আদর্শের যুদ্ধে সে আগেই পরাজিত।

১২.১২.২০০৪

বিসমিল্লাহ্ বলে ডিসেম্বর থেকে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু

বিসমিল্লাহ বলে ডিসেম্বর থেকেই শুরু হলো বুদ্ধিজীবী হত্যা। বিসমিল্লাহ ও হত্যা বিপরীতধর্মী দু'টি শব্দ। কিন্তু পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশে এ দু'টি শব্দ এক হয়ে যায়। কারণ, এখানে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করার মতো দল আছে তা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে আছে কি না সন্দেহ। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ যেহেতু অজ্ঞ। ধর্মান্ধ সুবিধাবাদী ও শক্তের ভক্ত সেহেতু ধর্ম ব্যবসায়ীরা এখানে রমরমা অবস্থায় আছে। ধর্মের নামে এখানে ক্ষমতায় যাওয়া, লুট-চুরি-ডাকাতি-হত্যা ধর্ষণ সব জায়েজ এবং এ সবই তারা আল্লাহর নাম নিয়ে করে যেটাতে আমাদের আপত্তি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সংবিধানের বিসমিল্লাহ বসানো হয়েছিল এটা ভুলে যান কেন? যদি তা না হতো এবং বাংলাদেশের মানুষ ধর্ম বুঝে ধর্মপ্রাণ হতেন তাহলে এ দেশটি বর্জ্যের দেশে পরিণত হতো না।

ডিসেম্বর এলে ভয়ও হয়। আনন্দও জাগে। ডিসেম্বরে আমরা ধর্ম ব্যবসায়ীদের হিংস্র নখদন্ত দেখেছি আবার বিজয়ও দেখেছি। এ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করি। এরকম এক ডিসেম্বর, শাহরিয়ার, সাবের, শফি ও আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। জামাতী-বিএনপি সরকারের নীতিনির্ধারকরা। গভীর শীতের রাতে ওয়ারেন্ট ছাড়া সশস্ত্র আদমীরা যখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমার এক প্রতিবেশী বন্ধু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ঘটনা জানতে। আমি তাকে নিষেধ করি। কারণ, তিনি না জানলেও পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টার বিষয়টি আমার জানা। সদর রাস্তায় সাদা মাইক্রোবাস দাঁড়ানো। এটি দেখে তিনি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কারা? তাকে কোথায় নিচ্ছেন? দাঁতমুখ খিঁচিয়ে একজন উত্তর দিলো, তাতে আপনার কী দরকার? আপনি কে?

বন্ধুটি নির্বোধের মতো উত্তর দিলেন দরকার আছে। এটা ডিসেম্বর মাস। পরিচয়হীন আপনারা কয়েকজন এসেছেন। সাদা মাইক্রোবাস করে। তুলে নিয়ে যাচ্ছেন একজন অধ্যাপককে। ১৯৭১-এও তাই হয়েছিল।

আমি ততক্ষণে মাইক্রোতে উঠে পড়েছি এবং দলনেতাকে বলছি, ওর কথা বাদ দিতে। যাতে এনকাউন্টার পরিস্থিতি না হয়। সুতরাং ডিসেম্বর এলে ভয় করাটা অমূলক নয়। ১৯৭১ সালে বর্তমানে সফেদ শ্মশ্রুর মতিউর রহমান নিজামী ছিল কিলার স্কোয়াড আলবদর বাহিনীর প্রধান। বর্তমান জামাতী নেতাদের অধিকাংশ এ ধরনের বিভিন্ন স্কোয়াডের সঙ্গে ছিল জড়িত। আমার শিক্ষকদের এ স্কোয়াডের খুনিরাই রাতের অন্ধকারে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সাদা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে খুন করেছে। ডিসেম্বর এলেই

তাদের হাত নিশপিস করে, যেমন রাত হলেই ভ্যাম্পায়ার জেগে ওঠে। ডিসেম্বর এসেছে তাই ভ্যাম্পয়াররা তাদের কাজ শুরু করেছে। জোট বা জামাতীয়-বিএনপি-আমিনী সরকারের আমলে রাজশাহী থেকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু হলো। আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এটা চলবে এবং এটি অস্বাভাবিক কিছু না। তাদের কাজ তারা করছে, আমাদের কাজ আমরা করিনি এবং করিনি দেখেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউনুসকে প্রাণ দিতে হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু চাকরি করি তাই অধ্যাপক ইউনুসের সঙ্গে আলাপ ছিল। সজ্জন ব্যক্তি। ছাত্রজীবনে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত। ধার্মিকও। তার কাছে ধর্ম শুধু ইবাদত ছিল না, ছিল মানবধর্ম- মানুষের কল্যাণ। যারা তাঁকে হত্যা করেছে তাদের ধর্ম হলো তাদের প্রতিবন্ধকতা দূর করে ক্ষমতায় যাওয়া, থাকা এবং তা ভোগ করা। মানব ধর্ম নয়।

জোট ক্ষমতায় গেছে সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা করে। ক্ষমতায় থাকার জন্য তারা আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে পগ্রোম শুরু করে। রাজনীতিবিদদের একরকম নতিস্বীকার করানোর পর তাদের মনে হচ্ছে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার জন্য বাকি প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা। নির্বাচন করেই তারা যাবে। তাদের বুথ পাহারা দেওয়ার জন্য র‌্যাব, চিতা, কোবরা ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে- যাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন সব তৈরি। বাকি শুধু শিক্ষা- সাংস্কৃতিক অঙ্গন, কিছু সাংবাদিক। এরা পাঁচজন হলেও প্রতিবাদ করে, কেউ তাঁদের রক্ষা করে না, তবুও তারা প্রতিবাদ জানিয়ে যায়। আন্তর্জাতিক মহলও তাদের বক্তব্য গ্রহণ করে। এই শেষ প্রতিবন্ধকতা দূর হলে জামাতি-বিএনপিরা আজীবন যা, খুশি তাই করতে পারবে।

পাকিরাও তাই ভেবেছিল। তাদের লেখা বইপত্রে দেখা যায়, পাকিস্তানের শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য তারা যতটা না দায়ী করছে রাজনীতিবিদদের তারচেয়ে বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের। কারণ, দেশের নাম বদল হতে পারে, দেশ নাও থাকতে পারে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যায় নিজ অবস্থানে। ১৯৭১ সালেও প্রতিরোধটা এসেছিল ছাত্র শিক্ষকদের কাছ থেকে।

১৯৭১ সালে পাকি জেনারেলরা ক্ষমতায় ছিল। তাদের তল্পীবাহক বা হুককাবরদার হিসেবে ছিল জামাত ও অগন্য ধর্মব্যবসায় নিয়োজিত দলগুলো। পাকিদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের নোংরা কাজগুলো সারতো জামাতীরা ইসলামের নামে। এখনো ক্ষমতায় সেনারা, যাদের রোল মডেল পাকিস্তান। তাদের হয়ে তাদের স্বার্থ দেখে দেশ শাসন করছে বিএনপি। নির্বাচনের সময় সেনাদের প্রবল অত্যাচার না হলে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে পারতো কী না সন্দেহ। সাবেক দুই প্রধান বিচারপতি সেনাদের সাহায্যেই 'সালসা' নির্বাচন করেছিলেন। বাংলাদেশ হওয়াতে বোধহয় তাদের একটা আক্রোশ ছিল। সুতরাং, বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃত্ব যে দল দিয়েছিল তাদের খানিকটা শায়েস্তা করা হয়েছিল। আর এখনো জামাতী ও 'ইসলামি' দলগুলো আছে শাসকদের তল্পীবাহক হিসেবে। সুতরাং, ১৯৭১ ও ২০০৪-এ তেমন কোনো তফাৎ নেই। একটি

উদাহরণ, সার্ক সম্মেলনে রাষ্ট্র প্রধানদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে নেওয়া হবে না। কারণ, তাহলে বাংলাদেশের বীর শহীদ ও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়। শ্রদ্ধা দেখানো হবে পাকি-বাংলার রূপকার জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর যে শুধু বুদ্ধিজীবী হত্যা হয়েছিল তা নয়। মার্চ ১৯৭১ থেকেই তা শুরু হয়েছিল, যা তুঙ্গে উঠেছিল ১৪ ডিসেম্বর। এখানেও লতিফুর রহমানের সময় থেকে হত্যা শুরু হয়েছে, নির্বাচনে 'জয়ী' হওয়ার পর ১৯৭১-এর মতো হত্যা, ধর্ষণ শুরু হয়েছে। পাকি সৈন্যদের স্থান নিয়েছে জোটের ক্যাডাররা। এখন নির্বাচন সামনে রেখে সেটা তুঙ্গে ওঠানো হবে। অধ্যাপক ইউনুস হত্যার মাধ্যমে সে শুরু হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হত্যার হুমকি গত তিন বছর ধরেই দেওয়া হচ্ছে। পগ্রোম, স্বৈরাচার ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অন্যসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রগতিশীল' শিক্ষকরাও পারেননি। এ কারণে ব্যক্তিগতভাবে আমি রাজশাহীর লড়াকু শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আর আমি তো ভুলিনি। ১৯৬৯কে শুধু জোরদার করেনি, বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম করেছিল। পুরো এরশাদ আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকরা লড়াকু ভূমিকা পালন করেছিল, আত্মাহুতি দিয়েছিল। গত তিন বছরও রাজশাহীর শিক্ষকরা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। আমি বিশেষভাবে চিন্তিত অগ্রজ অধ্যাপক খালেক বা সনৎ কুমার সাহা ও অনুজ অধ্যাপক আবু বকর, মলয়, কাশেম, বিধান বা মাহবুবের জন্য। তারা বারবার হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। সতর্ক থাকাটা তাদের জন্য জরুরি। ১৯৭১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেউ কেউ তাদের সহকর্মীদের হত্যায় সাহায্য করেছিল। অধ্যাপক ইউনুসের হত্যার পর পত্রিকায় দেখলাম কিছু শিক্ষক কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছিলেন। সে জন্যই ঐ কথা আবার মনে হলো।

অধ্যাপক ইউনুসের হত্যার বিচার হবে না। বরং তাঁর পরিবার বা আওয়ামী লীগের কাউকে জড়ানো হতে পারে। বলা হবে, বৈষয়িক বিষয় নিয়ে বিরোধ ছিল। রাজনীতির কোনো বিষয় এতে নেই। পুলিশ তদন্ত শুরু করবে কিন্তু কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি বর্তমান প্যাটার্ন। যেমন র‌্যাব, জামাত বা বাংলা ভাইয়ের মধ্যে সন্ত্রাস খুঁজে পায় না কিন্তু জনযুদ্ধে পায়। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, ১৯৭১ সালে যারা বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা করেছিল তারা আজ ক্ষমতায়। ১৯৭১-এর বিজয় দিবস তাদের পরিকল্পনা সমাপ্ত করতে দেয়নি। এখন বিএনপি-জামাত সেই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সফল করবে। আমাদের অনেককে এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে, প্রতিরোধ করলেই মৃত্যু হবে যারা ভাবেন তাদের বলি, বিছানায় শুয়েও মৃত্যু হতে পারে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্যদের মতো শুধু ফাঁকা গর্জন না করে কার্যকর কী করা যায় তাই আমাদের ভাবা উচিত। প্রতিরোধহীন মানুষ আর কাঁচা সবজির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

'নিরপেক্ষ' ও ধার্মিকরা সান্ত্বনা পেতে পারেন এ ভেবে যে, আল্লাহ অধ্যাপক ইউনুসের মতো ভালো মানুষকে উঠিয়ে নেন। গোলাম আযম, নিজামী বা মান্নান ভূঁইয়াদের রেখে দেন আমাদের পরীক্ষার জন্য। ১৯৭১ সাল থেকে এখন অবধি সেই

পরীক্ষা চলছে। হিসাব করে দেখুন, আল্লাহ কত ভালো মানুষদের নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন, খবিশ বান্দাদের রেখে দিয়েছেন বাংলাদেশে।

সংক্ষেপে দু'টি প্রসঙ্গ তুলে আলোচনা শেষ করবো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক মোকারম হোসেন আপত দৃষ্টিতে ধীর স্থির শান্ত মানুষ ছিলেন যে রকম হন খাঁটি অধ্যাপকরা। তখন মোনেম খাঁর সময়। ছাত্রদল/শিবির যা করছে এনএসএফও তাই করতো। এ রকম একদিন, তাঁর কিছু ছাত্র ধাওয়া খেয়ে তার ল্যাবরেটরিতে আশ্রয়ের জন্য ঢুকেছিল। এই প্রথম দেখা গেল তিনি ক্রুদ্ধস্বরে ছাত্রদের বলছেন, মেয়ে মানুষ নাকি, ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে এসেছো, লজ্জা করে না? এ ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন ধমক খাওয়া একজন ছাত্র। সেই ধমক তাদের এতো উজ্জীবিত করেছিল যে, মোনেম খাঁন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে আসতে পারেননি।

১৯৭১ সালে শিল্পী কামরুল হাসান একটি বিখ্যাত পোস্টার এঁকেছিলেন ইয়াহিয়ার মুখাবয়ব দিয়ে। সেখানে লেখা ছিল- তারা মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি। ঐ পশুরা ১৯৭১-এ যা করেছিল এখনো তাই করছে- যা আগেই উল্লেখ করেছি। ঐ সময় পশুদের হত্যা করা হয়েছিল বলে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল।

২৮.১২.০৪

নীল নকশা, ধর্ম ব্যবসা ও বুটের তলায় বাঙালি সংস্কৃতি

নীল নকশা শব্দ দুটির কথা বহুদিন ধরে শুনে আসছি। ইংরেজি ব্লু-প্রিন্ট শব্দটিরই অনুবাদ। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানী রাজনীতির বিরুদ্ধে বাঙালি দলগুলো এ শব্দ দুটি ব্যবহার করতো। নীল নকশা শুনলেই তখন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে বলে শঙ্কা হতো। স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত সবকটি রাজনৈতিক দল পরস্পরের বিরুদ্ধে নীল নকশা বাস্তবায়নের অভিযোগ করেছে। এতো সুন্দর নীল শব্দটির আজ এ পরিণতি। যাক, অতি ব্যবহারের ফলে শব্দ দুটি এখন বাত কে বাতে পরিণত হয়েছে। নতুন প্রজন্ম নীল নকশা শব্দটিকে গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু এখন মনে হয় গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে।

নীল নকশা কী তা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছিল ১৯৭১ সালে। পাকিস্তান ও পাকিস্তানপন্থী দল যেমন জামাত, মুসলিম লীগ নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা না দেওয়া, গণহত্যা কার্যকর করা ছিল সেই নীল নকশা। যারা এগুলো প্রণয়ন করে তারা আজীবন টিকে থাকবে। হিটলার, ফ্র্যাংকো, মুসোলিনী, আইয়ুব, ইয়াহিয়া, জিয়াউল হক ও জিয়া সবাই তাই ভেবেছিল। ঐ নীল নকশার সর্বশেষ ধাপ ছিল ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা যার নেতৃত্ব দিয়েছিল বর্তমান জামাত সরকারের প্রধান ব্যক্তি মতিউর রহমান নিজামী। গোলাম আযম তো ছিলই। ভাগ্যের পরিহাস বেগম জিয়ার স্বামী মেজর জিয়া তখন গোলাম আযম-নিজামী গংদের নিকেশ করার জন্য ঘুরছিলেন। আজ সেই সব ঘাতক বেগম জিয়ার সুগন্ধী আঁচলের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। তখন বুঝেছিলাম নীল নকশা কী।

জিয়া ও এরশাদ আমলে আরেকটি নীল নকশার রূপরেখা পরিষ্কার হয়েছিল। এরা দেশটি সেনাবাহিনীর কাছে বন্ধক রেখে সমাজকে জিম্মি করতে চেয়েছিলেন। তারা নেই কিন্তু তাদের উত্তরসূরিরা রয়ে গেছে যারা এখন ক্ষমতায়। বাংলাদেশ এখন মিনি পাকিস্তান। অনেকে মনে করেন, পাকি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের মাধ্যমেই সরকার পরিচালিত হয়। এ কথা বিশ্বাস করতাম না। এখন মনে হয় এর মধ্যে সত্য থাকলেও থাকতে পারে। কারণ, পাকিরা মধ্য ষাট থেকে যা করেছিল সে প্যাটার্নের সঙ্গে মিল আছে বর্তমান প্যাটার্নের। ঐ সময়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আঘাত করে সুবিধা করতে না পেরে তারা বাঙালি সংস্কৃতি বিনাশ করতে এগিয়ে আসে। সেটি অবশ্য জিন্নাহর নেতৃত্বে ১৯৫১ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। তাঁর সর্বশেষ ধাপ ছিল শহীদ মিনার ভেঙে মসজিদ করা এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা, কারণ আমাদের সংস্কৃতির মূল এরাই। এখন আবার নীল নকশা শব্দটি অবয়ব পাচ্ছে, তার অর্থ পরিষ্কার হচ্ছে।

জামাতের দুটি ফ্যাকশন, জামাত (নিজামী) ও জামাত (খালেদা) একটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। ডাণ্ডা মেরে 'আওয়ামী লীগ'কে হয়তো ঘরে ঢোকানো যাবে কিন্তু দেশের অগণিত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা বোধ নষ্ট করে দিতে হবে। বাঙালিদের বাংলাদেশী বানানোর এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এ জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে হরকাতুল জেহাদ থেকে বাংলা ভাই। বিজ্ঞজনদের অনুমান, এরা সরকারের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে নিজামীর নির্দেশে যে কারণে এদের কাউকে 'ধরা যাচ্ছে' না। এদের নীল নকশার প্রথম ধাপ হলো আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের বিনাশ। এ বিষয়ে তারা সম্মতি পেয়েছিল। ভারতের তৎকালীন বিজেপি সরকারের। নিজামীরা পাকিদের মতো বিশ্বাস করে, আওয়ামী লীগ ও হিন্দুরা ভারতের প্রতিনিধি। যদিও ভারতের কাছে বস্ত্র উন্মোচন করেছে বর্তমান সরকার যে কারণে নিজামীর আমন্ত্রণে ১২ হাজার কোটি টাকা নিয়ে টাটা এগিয়ে এসেছিল। হাসিনা আমলে আসেনি। যে কথাটা আমরা মনে রাখি না, তা হলো ধর্ম ব্যবসায়ীরা মূলত প্রতারক। যা হোক, তালেবানি রাষ্ট্রে আওয়ামী ও হিন্দু থাকতে পারবে না তবে পর্দা ছাড়া দুএকজন থাকতে পারবে। যেমন প্রধানমন্ত্রী। এখানেই, এদের প্রতারণা পরিষ্কার হয়ে যায়।

দ্বিতীয় স্ট্রাটেজি হচ্ছে, স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃতির যেসব মাধ্যম আছে সেগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া। ১লা বৈশাখে বোমা হামলা, এর আগে শামসুর রাহমানের ওপর হরকাতুলের হামলা দিয়ে এর শুরু। এরপর বোমা পড়েছে খ্রিস্টান চার্চে, ভাঙা হয়েছে মন্দির। তারপর শুরু হলো গ্রাম বাংলার প্রাণবন্ত সংস্কৃতি মেলায় হামলা। সিনেমা হলে বোমা হামলা। বাংলা ভাইয়ের নির্দেশে (যা সরকার মানতে বাধ্য) উত্তরাঞ্চলে খোলা জায়গায় সব ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। না এখানেই সব নয়। যুগ যুগ ধরে গ্রামবাংলার প্রধান বিনোদন যাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গ্রামবাংলায় এসব দমন করে, ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে এরা এখন এগুচ্ছে শহরের দিকে। টার্গেট ঢাকা শহর। ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার অন্যরূপ। একদিকে চলে প্রতিবাদী আন্দোলন, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক জাগরণ। এটিও একটি ঐতিহ্য যা সরকার দমন করতে চাইছে। এটিই এক ধরনের ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য নষ্ট করার জন্য দুটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একটি হলো ভূমি প্রতিমন্ত্রীর ভাষায় (যা সরকারের নীতি) 'আওয়ামী লীগকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে।' (সংবাদ, ১৫.০২.০৫)। আক্ষরিক অর্থে তাই করা হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক জাগরণের মূল কেন্দ্র শহীদ মিনার ও বইমেলা। দ্বিতীয় ব্যবস্থা, এ দুটিকে অপাঙক্তেয় করে তোলা। বইমেলায় প্রচুর র‍্যাব নিয়োগ করা হয়েছে যাদের সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসীদের মতোই ভয় করে কারণ এদের হত্যার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তো আছেই। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার নামে এ ব্যবস্থা, যাতে দর্শক কম হয়। তাহলে মেলা তার গুরুত্ব হারাবে। শুধু তাই নয়, র‍্যাবের মতো বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকাশককে বলছে অন্য প্রকাশকের বই না বিক্রি করতে। এটি 'নীতিমালা'। যতোক্ষণ জামাতের দুটি ফ্যাকশনের দোকান (তারা প্রকাশক ও বিক্রেতা কোনোটিই নয়) না ওঠানো হবে ততোক্ষণ 'নীতিমালা' মানতে কেউ বাধ্য নয়। তা ছাড়া এটি পুস্তক

প্রকাশক ও বিক্রেতাদের মেলা। শুধু পুস্তক প্রকাশকদের নয়। মেলা বিনষ্ট হলে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ও কমিটির সদস্য সচিবকে আমাদের কাছে এর জবাব দিতে হবে। মেলার গুরুত্বহ্রাসে এটি একটি পরোক্ষ কৌশল।

অন্যদিকে ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনে 'ভালোবাসা' দিবস পালনে উৎসুক শ্রোতা/দর্শকদের ওপর বোমা হামলা হয়েছে। দেশের এ অবস্থায় যারা এ ধরনের অনুষ্ঠান করে এদের মানসিকভাবে বাস্তুহারা ছাড়া কিছু বলার নেই। মূল বিষয় সেটি নয়। মূল বিষয় হলো, ভারতে শিবসেনারা এ ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে। সৌদি আরবে ঐ দিন গোলাপ ফুল বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল। সৌদি অনুরাগী এবং মৌলবাদীরা এ ধরনের অনুষ্ঠান পছন্দ করে না। যারা উদীচী, মেলা, সিনেমা, যাত্রায় বোমা হামলা করেছে, অনেকের অনুমান তারাই এ হামলা চালিয়েছে। অবশ্য, বলা হবে আওয়ামী লীগ করেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো স্যুটেডবুটেড এক বৃদ্ধ ব্রিটিশ বাঙালি সাপ্তাহিক সম্পাদক যিনি জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের অনুগত ছিলেন এসবের প্রবক্তা। এখন তার দলের অন্য ফ্যাকশন নাকি এসব করছে। দেখা যাক মৌলবাদী এই ক্লাউন সম্পাদক কী করে।

এখানেই শেষ নয়। সর্বশেষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (হ্যাঁ, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃপক্ষ শহীদ মিনারে একুশে অনুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে র‍্যাব ও পুলিশ যায় শহীদ মিনারে। (সংবাদ, ১৫.২.০৫)। ১৯৭১ সালে বুটঅলারা শহীদ মিনার গুঁড়িয়ে মসজিদ করেছিল। ২০০৫ সালে বুটঅলারা পদদলন করলো শহীদ মিনার। উল্লেখ্য, এখানে রাষ্ট্রনায়করাও আসেন নগ্ন পদে। শ্রদ্ধা জানানোর সেটিই রীতি।

এসব চলছে 'নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা'র নামে। বাংলাদেশে কিন্তু নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ভেতর অহরহ বোমা হামলা হয়, প্রেসিডেন্ট নিহত হয়। প্রশ্ন, দেশে সরকার থাকলে এবং তার হাতে দেশের নিয়ন্ত্রণ থাকলে 'নিশ্ছিদ্র' নিরাপত্তা দরকার হয় কি না। ২০০১ সালের জামাতের দুই ফ্যাকশন জেতার পর এসব শুরু হয়েছে। আসলে, বাঙালি খেদিয়ে বাংলাদেশী আনতে হবে। বাঙালি সংস্কৃতি থাকবে মৌলবাদ ও বুটের তলায়। আর বেয়নটের ডগায় প্রস্ফুটিত হবে তালেবানি সংস্কৃতি। যেমন, স্বৈরাচারী এরশাদের প্রশংসা করে কলকাতার সাপ্তাহিক 'দেশ' সম্পাদকীয় লিখেছিল বেয়নেটে এসে বসেছে প্রজাপতি।

পাকি আমলে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো লাভ হয়নি। কিছু মানুষ মারা গেছে। এদের এতোসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও বইমেলায় দর্শক কমছে না, যা ঢুকছে ঠিক সে পরিমাণ নিরাপত্তার কারণে ঢুকতে পারছে না। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শহীদ মিনারে অনুষ্ঠান করছে। আর বসন্তের প্রথম দিনে? সারা ঢাকা ডুবে গিয়েছিল হলুদ রঙে। হলুদ কাপড় পরে বসন্তকে স্বাগত জানাতে সবাই বেরিয়েছিল। আমার এক বন্ধু বলেছিল, সেই সাত সকালে দেখেছে সেজেগুজে, কপালে টিপ দিয়ে হলুদ কাপড় পরে মেয়েরা যাচ্ছে ফ্যাক্টরিতে। মুঘল [ইসলামি] আমল থেকেই এর চল। কেউ কাউকে বলে দেয়নি হলুদ শাড়ি পরতে। জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের অনেকেও

হলুদ কাপড় পরে বেরিয়েছে। কয়েক কোটি লোক না মারলে স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃতির এই প্রকাশ কি বন্ধ করা যাবে?

জামাতের খালেদা অংশের অনুসারী, তরুণ-তরুণীদের বলি, মৌলবাদ সমর্থন ও সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে একই সঙ্গে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। এই সাধারণ সত্যটি বুঝতে হবে। 'নিরপেক্ষ' 'বাস্তুহারা মনের' তরুণদের বলি, শুধু বাউল নয় ব্যান্ড সঙ্গীতও নিষিদ্ধ হবে। এবং তারপর কী হবে। তালেবানি রাষ্ট্রের এক ভাবমূর্তির সৃষ্টি হবে বাংলাদেশে। এবং তারপর কী হবে? এসব তরুণরা যাদের একমাত্র লক্ষ্য সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া সে লক্ষ্য আর পূরণ হবে না। এটি স্মরণ রাখতে হবে। বাংলাদেশের বাইরে জামাত-বিএনপি ক্যাডারের কোনো দাপট নেই। আর বুটঅলা ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের বলি, ৫০ বছরে যা সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও সেটি হবে না। বুট ও মৌলবাদী পোশাক ফেলে এক সময় দৌড়াতে হবে।

১৬.২.০৫

বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে লাফালাফি বন্ধ কেন?

বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটটা যেনো ধর্মব্যবসায়ীদের ইজারা দেয়া হয়েছে। পরিচ্ছন্ন বা সত্যিকারের ইসলামের পরিবর্তে ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ইসলামের কেন্দ্র হয়ে উঠছে বায়তুল মোকাররম এলাকা। এর খতিব মুক্তিযোদ্ধাদের 'গাদ্দার' উপাধি দেয়ার পরও বহাল তবিয়তে আসীন থাকেন। 'বুশকে থুতুতে ভাসিয়ে দেয়ার' কথা ঘোষণার পরও তারেক রহমানের মতো প্রবল ক্ষমতাধরও কুঁকড়ে থাকে খতিবের ভয়ে। জানি না তার শক্তির উৎস কোথায়। জামাত ক্ষমতায় আসার পর বায়তুল মোকাররম এলাকায় তাদের অবস্থান সংহত করেছে। কোনোকিছু তাদের মনঃপূত না হলে জুমার পর মিছিল বের করা, রীতিনীতি ভঙ্গ করে উত্তর গেটে মিটিং করে হুমকি দেয়া, নর্তন-কুর্দন করার ভয়হীন স্থান হচ্ছে ওই এলাকা। সর্বশেষ তারা লাফালাফি করেছে সার্ক স্থগিত হওয়ার পর। ভারতীয়দের মুণ্ডুপাত করার জন্য অবশ্য ওই এলাকা আগে থেকেই নির্ধারিত।

সার্ক নিয়ে মিথ্যা কথা উচ্চারণে দ্বিধা করেননি নীতিনির্ধারকরা। স্যুটকোট পরে প্রকাশ্যে মন্ত্রী হয়ে অবলীলাক্রমে মিথ্যা কীভাবে বলা যায়, তার উদাহরণ মন্ত্রীরা। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, এদের পুত্র-কন্যারা কি প্রকাশ্যে পিতৃপরিচয় দেয়? পিতা মিথ্যুক, এটি আর যা-ই হোক, গর্বের কোনো ব্যাপার নয়। সর্বশেষ কয়েকদিন আগে সার্ক নিয়ে আওয়ামী লীগকে দোষী করে সাইফুর রহমানও বোধহয় বক্তব্য রেখেছিলেন। হাতের কাছে পত্রিকা না থাকায় উদ্ধৃতি দিতে পারলাম না।

স্মৃতিশক্তি আমাদের দুর্বল। সেজন্য অনেক কথা বারবার মনে করিয়ে দিতে হয়। শেখ হাসিনার সরকার ন্যাম সম্মেলন আয়োজন করেছিলো। ন্যামের সদস্যসংখ্যা একশ'রও উপরে। এবং ন্যাম জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর বিশ্বজোড়া সংস্থা। এই আয়োজন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো। জামায়াত ক্ষমতায় আসার পরপরই, খালেদা ফ্যাকশনের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান মুখ কুঁচকে ন্যাম স্থগিত ঘোষণা করলেন। তার যুক্তি 'ন্যাম ডেড হর্স।' ন্যামের জন্য পয়সা খরচ করা যাবে না। শুধু তাই নয়, ন্যামের জন্য নির্মিত বঙ্গবন্ধু হলের নাম পাল্টে ফেলা হলো। ন্যামের জন্য নির্মিত ভবনগুলো নিজেদের নামে বাটোয়ারা করার প্রস্তাব হলো। পুরো ন্যাম সম্মেলন বন্ধ হয়েছিলো একটি ভবনের নাম বদলের জন্য! এত বড় নোংরামির প্রতিবাদ তো কেউ করেননি। টিভি চ্যানেলগুলো একটি প্রতিবেদনও পেশ করেনি। বায়তুল মোকাররমে নাচানাচি হয়নি। এতে একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, চ্যানেলগুলোর মালিকানা জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের হাতে। এরা মাঝে মাঝে কিছু সংবাদ পরিবেশন করে নিরপেক্ষতার ধূম্রজাল

সৃষ্টি করে মাত্র। এবং 'নিরপেক্ষ' থেকে শুরু করে বিরোধীরা পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তাদের সংবাদ পরিবেশনার পক্ষপাতহীনতা নিয়ে। এরা বুঝেও বুঝতে চায় না যে, অন্তিমে পক্ষ বেছে নিতে হলে তারা এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষেই থাকবে। একই কথা প্রযোজ্য অধিকাংশ সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে।

এবার যখন সার্ক স্থগিত হলো, জামাতি সরকার এতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো যে বলার নয়। বায়তুল মোকাররম ও এর উত্তর গেটে ভারত অর্থাৎ হিন্দুদের কারণে ইসলাম বিপন্ন রব উঠলো। মন্ত্রীরা প্রচ্ছন্ন ভঙ্গিতে একই কথা বলতে লাগলেন। অবশ্য তাদের বক্তব্য আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। কারণ আওয়ামী লীগ তো 'হিন্দু', তার মানে ভারতের এজেন্ট। সেজন্যই তো আওয়ামী লীগের কথা শুনে ভারত এলো না। পররাষ্ট্র সচিব যে ভঙ্গিতে কথা বলার কথা নয়, সে ভঙ্গিতে বললেন। তিনি বুঝলেন না ছোট দেশের পক্ষে এসব কথা মানায় না, বাইরে একে বলে ছোট মুখে বড় কথা। অনেক সাংবাদিক দুঃখ প্রকাশ করে লিখতে লাগলেন। মনে হচ্ছিলো, সারা বাংলাদেশ দুঃখ সাগরে নিমগ্ন।

এখন এ প্রশ্নটি করা যাক, সার্কের চাইতে বড় 'ন্যাম' বন্ধ করে দিলে তখন কেন বাংলাদেশের এসব পক্ষ দুঃখ সাগরে ভাসলেন না? সাংবাদিকদের অশ্রুজলে কেন নিউজপ্রিন্ট ভাসলো না? কেন, উত্তর গেটে 'দেশ বিপন্ন' ধ্বনি উচ্চারিত হলো না? কেন চ্যানেলে সেসব তালেব এলেমদের ভাষ্য শোনা গেলো না? কেন সেসব মূর্খের চিঠি দেখা গেলো না যে ভারত না এলেও সার্ক সম্মেলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য? যেখানে সার্ক সনদে লেখা আছে, কোনো দেশ না এলে সম্মেলন হবে না। কেন উল্লেখ হলো না বারবার যে, এর আগেও ছয়বার সার্ক স্থগিত হয়ে গেছে? কেন জনাব রহমান নিরাসক্ত স্বরে বললেন না, সার্ক ইজ এ ডেড হর্স? ন্যাম হয়নি দেখে বাংলাদেশের যেমন অনেক টাকা বেঁচেছে, সার্ক না হওয়ায়ও তো গরিব দেশের অনেক টাকা বাঁচলো।

সার্ক কি জীবন্ত অশ্ব? না, সার্ক মৃত অশ্ব। গত ২০ বছরে সার্ক কি কোনো ইতিবাচক কাজ করতে পেরেছে জাঁকালো চা খাওয়ার সম্মেলন ছাড়া? প্রতিটি দেশ তো দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতেই কাজ চালাচ্ছে। সার্ক ফ্রেমে তো কিছুই হচ্ছে না। করার স্কোপও নেই। গরিব দেশের কথা যখন উঠলো তখন বলি, সার্কের অধিকাংশ দেশই গরিব। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ৩০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠনের কথা ছিলো। এতো বছরে ৭টি দেশ তো ৩০ কোটি টাকার ফাণ্ডও গঠন করতে পারলো না। তা জনাব রহমানের কথা ধার করেই বলতে হয়, ডেড হর্সের জন্য এতো অশ্রুপাত কেন?

অনেকেই জানেন, অশ্রুপাত আসলে সুন্দর ফটো সেশনগুলো মিস হওয়ার জন্য। কালো মেয়েকে ফর্সা বানানোর জন্য। জামায়াতি সরকার গত চার বছরে দেশের যে ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে, তা এক কথায় ভয়ানক। ভাব ও মূর্তি দুটোই চুরমার করে দিয়েছে তারা। এখন আন্তর্জাতিক চাপে কিছু মেরামতি দরকার। সেটি হলো না দেখেই এতো অশ্রুপাত।

সার্ক কি বাংলাদেশের সম্মেলন ছিলো? তা হলে বিমান বন্দর থেকে বেরুবার সময় ধানের শীষের 'ভাস্কর্য' কেন গড়া হলো? সেখানে কেন স্থান পেলো না সার্ক বা রাষ্ট্রীয়

প্রতীক? সার্কের এজেন্ডা বিষয়ে কি বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছিলো সরকার? এ ঐতিহ্য না থাকলেও তো গণতন্ত্রের স্বার্থে তা করা যেতো। কারণ জামাতের খালেদা ও নিজামী- দুটি ফ্যাকশনই নাকি গণতন্ত্র ভালোবাসে। অন্যদিকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তো না আসার ব্যাপারে পরম শত্রু বিজেপির সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। কারণ, সেখানে ব্যক্তি থেকে দল বড়, দল থেকে দেশ বড়। আমাদের এখানে দল থেকে ব্যক্তি বড়, দেশ থেকে দল বড়।

সার্কের ভবিষ্যৎ কী? বাংলাদেশ সরকার যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে বা উত্তর গেটে সরকার সমর্থকরা যা করেছে, তাতে সার্কের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে তুলেছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সংবাদে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম শরনের বক্তব্যটি পড়ুন। এটি বোঝার জন্য কূটনীতিবিদ হওয়ার দরকার পড়ে না। শ্যাম শরণ বলছেন, 'এটাই আমাদের প্রত্যাশা হয়ে রয়েছে আজ, যদিও এক্ষেত্রে সার্কের রেকর্ড খুব বেশি উৎসাহজনক নয়। আসল কথা হচ্ছে, সার্ক এখনো একটি পরামর্শমূলক সংস্থা হিসেবেই রয়ে গেছে। গত ২০ বছরে একটিও সহযোগিতামূলক প্রজেক্ট সার্ক গ্রহণ করতে পারেনি। বস্তুত কোনো সহযোগিতামূলক কিছু করার ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতাও রয়েছে। বরং সার্কের কোনো কোনো সদস্য রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে অঞ্চলের বাইরের দেশ বা আঞ্চলিক অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য দিয়ে প্রায় প্রকাশ্যেই সার্কের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে ভারসাম্য তৈরির চেষ্টা করেছে অথবা সার্ককে এক ধরনের আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তির সংস্থা হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে।' ইঙ্গিতটি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের প্রতি।

না, এখানেই শেষ নয়। আরো আছে–'ভারত তার প্রতিবেশীদের এই মর্মে আশ্বস্ত করতে চায় যে, তাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু যে বিষয়টি ভারতকে খুব বিব্রত করে তা হচ্ছে, ভারতের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রদর্শন, যা প্রায়ই তাদের জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ স্বাভাবিক সম্পর্কের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এবং রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ও অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল একটি অঞ্চল হিসেবে আমাদের অঞ্চলের আত্মপ্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।'

দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের পড়ালেখার মান ও অভিজ্ঞতা নির্ণায়ক এই বক্তব্য। এ প্রতিক্রিয়ার পর হঠাৎ উত্তর গেটের গগনবিদারী চিৎকার বন্ধ। সার্ক নিয়ে হঠাৎ দুঃখবোধ ও অশ্রুপাত হাওয়া। আমাদের প্রশ্ন, এটি কেন হবে? হয় সাইফুর রহমানের বক্তব্য অনুযায়ী এটিকেও 'ডেড হর্স' বলতে হবে, নয়তো এটিকে জীবন্ত অশ্বে পরিণত করতে হবে। আমরা চাই তা জীবন্ত অশ্বে পরিণত হোক। সবার অশ্রুপাতও সে কথা বলে। তাই নয় কি? তাহলে প্রশ্ন, ভারতের পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে সার্ক বাঁচানো যাবে কি-না? যদি তা পারা যায় উত্তম। নিরস্ত্র জনগণকে না মেরে-ধরে অবিলম্বে উত্তর গেটে সমাবেশ শুরু করুন। সীমান্ত বন্ধ করে দিন। ভারতের রাষ্ট্রদূতকে ফেরত পাঠিয়ে দিন। আমাদেরকে যারা সরকারবিরোধী বলেন, তারাও থাকবো সরকারের পিছে। একথা বলছি এ কারণে যে, এক অসাংবাদিক বৃটিশ বাঙালি পরিচালিত সাপ্তাহিক

ইয়ার্কিতে ঘোষণা করা হয়েছে, আমরা দেশ বিরোধিতা করি। এনাফ ইজ এনাফ। একটা এসপার-ওস্পার হয়ে যাক। আর তা যদি করার মুরোদ না থাকে, তাহলে কীভাবে ভারতকে সক্রিয় করা যায় তা ভাবুন। সেটি করার প্রথম শর্ত, বোমাবাজি বন্ধে পদক্ষেপ নিন। অন্তত একবার হলেও কিছু দোষীকে গ্রেপ্তার করে বিচার করুন। আওয়ামী ও হিন্দু দলন বন্ধ করুন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করুন। সবচাইতে বড় কথা, মৌলবাদী উত্থান বন্ধ করুন। কিন্তু সরকার নিজেই যেখানে মৌলবাদে বিশ্বাসী, সেখানে এ সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে? এখন শুধু ইউরোপ বা আমেরিকা নয়, সার্কের দেশগুলোও ইসলামে মৌলবাদে ভীত। পাকিস্তানের জনগণের একটা বড় অংশও এ থেকে মুক্তি চায়। সেটি কি সম্ভব? কখনো কি জামাতের নিজামী ও খালেদা অংশের পক্ষে এই ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হবে– দল থেকে দেশ বড়? যদি তা প্রমাণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে বাংলাদেশের ভয়ে যে কেউ সার্ক ছেড়ে চলে যাবে না, তার গ্যারান্টি কে দেবে?

২১.২.০৫

১

প্রতিরোধ করুন অথবা দেশ ছাড়ুন নয়তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকুন

জামাতের খালেদা ফ্যাকশন সরকারে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী তাদের, গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোও তাদের হাতে। নিজামী ফ্যাকশনের হাতে মাত্র দুটি মন্ত্রণালয়। কিন্তু, তারা এখন এতোই বলীয়ান যে খালেদা ফ্যাকশনের হোমড়া-চোমড়াদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা মশকরা করে। এই ফ্যাকশনের একটি গোপন মেমো আবু সাইয়িদ তার সাম্প্রতিক গ্রন্থে ফাঁস করে দিয়েছেন যা দৈনিক সংবাদ সবিস্তারে উদ্ধৃত করেছে (১৯.০২.০৫)। এর উত্তর দেবে কি, বরং ভয়ে সেই ফ্যাকশনের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর লোকজন জনাব সাইয়িদের বাড়িতে ঢুকে বইগুলো জব্দ করেছে। তারা ভয় পাচ্ছে এ ভেবে যে, বইটি বাজারে গেলে যদি গোলাম আযম বা নিজামী চটে যায়। সেই মেমোতে উল্লেখ করা হয় 'দেশের শাসনে জোট সরকারের চরম ব্যর্থতা, জোটভুক্ত সংগঠনসমূহের প্রতি চরম অনীহা এবং অসদাচরণের তীব্র নিন্দা করা হয় (জামাতের সভায়)। সভায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অনৈসলামিক কার্যকলাপ, লাগামহীন কথাবার্তা, কথা ও কাজে অমিল এবং মন্ত্রী মান্নান ভুঁইয়া, মির্জা আব্বাস, ব্যারিস্টার মওদুদ, ড. মোশাররফ হোসেন, সাইফুর রহমানসহ প্রায় সব মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর সমালোচনা করা হয়। এমনকি মন্ত্রিপরিষদের জামাতি দুই মন্ত্রীর ব্যর্থতা ও অসচেতনতার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।'

প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছে নিজামীরা তা আমরা করবো না। নিজামীরা সরকারে আছে তারা ভালো জানে। কিন্তু যে ভাষায় এটি বলা হয়েছে সেটি বেয়াদবি। দুঃখ এই যে, এর চেয়ে সাধারণ ব্যাপার নিয়ে সংসদে, হ্যাঁ, সংসদে বেগম জিয়া আওয়ামী লীগের সাংসদদের বলেছিলেন, 'চোপ, বেয়াদব'। অথচ এতোবড়ো বেয়াদবির বিরুদ্ধে একবারও বললেন না তিনি 'খামোশ'।

আমরা নিশ্চিত নিজামীরা বলবে, এটি সর্বৈব মিথ্যা। একসময় নিজামীরাইতো বলেছে, নারী নেতৃত্ব হারাম। এখন সেই হারাম যদি হালাল হয় তাহলে যা উদ্ধৃত হয়েছে তাও সত্যি। ধরে নিলাম সেটি মিথ্যা কিন্তু শাহরিয়ার কবির মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলনের ১৩ ফেব্রুয়ারির গোলটেবিলে যেসব দলিল উপস্থাপন করেছে সেগুলো? ওগুলো তো তাদের কন্ট্রোলার পাকিদের লেখা।

জমিয়তে তালাবা ইসলামিয়ার মুখপত্র 'হাম কদাম' এ অক্টোবর ২০০৪-এর সংখ্যায় মুনিম জাফর খানের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা ঐ সময় বাংলাদেশ সফর করেন। যুদ্ধাপরাধী মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের সঙ্গে তারা দেখা করেন। মুজাহিদ তাদের জানান, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক

পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে আমরা এ কাজটি বাধ্য হয়ে করি নাই বরং এটার প্রয়োজন ছিল। সরকারের মধ্যে থেকে নিজেদের অনুকূল পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি সেগুলোকে তাবৎ পড়সব করার জন্য এ পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক ছিল।

আমাদের হাতে দুটি মন্ত্রণালয় আছে একটি সমাজকল্যাণ অপরটি শিল্প। এর আগে কৃষি মন্ত্রণালয়ও আমাদের হাতে ছিল। সেটা ফেরত নেওয়ার একমাত্র কারণ হলো আমরা এর মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ।"

ছাত্রদের মাঝে প্রভাব বিস্তারের জন্য তারা বিভিন্ন কোচিং সেন্টার স্থাপন করেছে। এ রকম দুটি সেন্টার হলো 'রেটিনা' ও 'কনক্রিট'। জামাতের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হলেন সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান যিনি ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা করছেন। জামাতের গোপন মেমোতে জামাতি আরেকটি ব্যাংকের নাম পাওয়া যায়- আল আরাফাহ।

এটা এখন পরিষ্কার যে জামাত একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। প্রশাসনের সবখানে তাদের লোক ঘাপটি মেরে আছে। ক্ষমতায় আসার পর তারা তাদের খুঁটি পাকাপোক্ত করেছে। এখন তাঁরা ও তাদের সেকেন্ড ফ্রন্ট অন্যান্য জঙ্গি গ্রুপগুলো সক্রিয় হয়ে উঠছে। তারা সারা দেশে গ্রেনেড ও বোমা ছুড়ে অরাজকতা সৃষ্টি করছে যাতে খুব সহজেই ক্ষমতা দখল করতে পারে। অন্যদিকে, সজীব বাঙালি সংস্কৃতির ওপর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে হামলা চালাচ্ছে। গত তিন সপ্তাহের খবরের কাগজগুলো দেখুন এবং পর্যালোচনা করুন তাহলে বুঝবেন আপনি এখন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে। আমি খবরের কাগজ থেকেই কিছু উদাহরণ দিচ্ছি–

১. সংগ্রামের রিপোর্টার বোমা হামলায় নিহত হওয়ার পর এএসপি মোফাজ্জেল গ্রেপ্তার। বোমা রাখা হয়েছিল যুগান্তরের সাংবাদিকের জন্য। লক্ষণীয়, মোফাজ্জল এসব কাজকর্ম বহুদিন করে আসছে। প্রায় পুলিশ কর্মচারী তাই করে এবং সরকারের অনেক লোক তা থেকে বখরা পায়। জামাতের কর্মী মারা যাওয়ায় মোফাজ্জেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে সম্পূর্ণ সরকারি সুবিধায় হেলিকপ্টারে এনে চিকিৎসা করা হয়। অন্যদিকে জনাব কিবরিয়া যাতে বিনা চিকিৎসায় মারা যান সে ব্যাপারে জামাতের নিজামী ও খালেদা ফ্যাকশন একমত ছিল। এবং এখন পর্যন্ত অন্যান্য সাংবাদিক হত্যাকারী কাউকে ধরা যায়নি।

২. লক্ষ্মীকানা গ্রামে নাট্যানুষ্ঠানে বোমা হামলায় জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশের বোমা স্কোয়াড সদস্যদের বিরুদ্ধে নথি গায়েব (সংবাদ, ১৮.০২.০৫)।

৩. আহলে হাদিস নেতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. গালীব যিনি বাংলা ভাইদের নেতা। তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতিদিনই তার কার্যকলাপের খবর ছাপা হচ্ছে পত্রিকায়।

৪. সবচেয়ে বেশি সরকারি বিজ্ঞাপন পেয়েছে কথিত পাকি ও গোয়েন্দা প্রভাবিত

দৈনিক ইনকিলাব, জামাতের নিজামী ফ্যাকশানের পত্রিকা, দৈনিক সংগ্রাম, জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের, তারেক জিয়ার মালিকানাধীন দৈনিক দিনকাল। এগুলোর সার্কুলেশন সর্বমোট ১ লাখও হবে কিনা সন্দেহ। সরকারি টাকা দিয়ে এদের ভিত্তি মজবুত করা হচ্ছে।

৫. বাংলা ভাইয়ের হাতে নির্যাতিত তিনজন আবার পুলিশের ক্রসফায়ারে নিহত (ভোরের কাগজ ৯.০২.০৫)। ক্রসফায়ারে আজ পর্যন্ত কোনো জঙ্গি সংগঠনের নেতা নিহত হয়নি।

৬. বাগমারায় বাংলা ভাই ক্যাডারদের সমাবেশ (সংবাদ, ৩০.০১.০৫)। মন্ত্রী থেকে শুরু করে পুলিশ সবাই বলছে, বাংলা ভাই বলে কেউ নেই। সুতরাং তাকে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

৭. চট্টগ্রামে ব্রাশফায়ারে ইউপি চেয়ারম্যান খুন। বিএনপি বলছে খুন করেছে জামাত (সংবাদ ৫.০২.০৫)। এ ধরনের খুন হরদম হচ্ছে।

৮. একই দিনে টাঙ্গাইলে বোমা, কুড়িগ্রামে গ্রেনেড, ঠাকুরগাঁওয়ে বোমা সরঞ্জাম উদ্ধার (ভোরের কাগজ ১৯.০২.০৫)।

৯. হাসিনার সফরের পর টুঙ্গিপাড়ায় ৬০টি বোমা উদ্ধারের কথা সরকার গোপন করেছে (ভোরের কাগজ, ১৯.০২.০৫)।

১০. জামালপুরের গ্রামে এখনো জঙ্গিরা তৎপর (ভোরের কাগজ, ১৯.০২.০৫)।

১১. ১৪ ফেব্রুয়ারিতে ভ্যালেনটাইন ডেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা হামলা এবং এর পরপরই আলামত সব ধুয়েমুছে সাফ। তখন র‍্যাব ও পুলিশ এলাকাটি পাহারা দিচ্ছিল।

১২. সরকার সমর্থক ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি এনজিওতে বোমা হামলা।

১৩. চট্টগ্রামের কালী মন্দিরের সামনে বোমা বিস্ফোরণ (ভোরের কাগজ, ২০.০২.০৫)।

কয়েকটি উদাহরণ দিলাম মাত্র, শুধু বোঝার জন্য। প্রতিদিনই এসব ঘটনা ঘটছে এবং ঘটবে। এই নিবন্ধ লেখার সময় খবর পেলাম মৌলভীবাজারে আশুরার মিছিলে বোমা হামলা হয়েছে। প্যাটার্নটি হচ্ছে-এসব ঘটনা ঘটবে, কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে না। একই কারণে, হাইকোর্টের বিচারকরা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করতে চাননি। আষ্টেপৃষ্ঠে রাষ্ট্রকে তারা বেঁধে ফেলেছে এবং এখন ক্ষমতায় বসার আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

'জামাতের গোপন মেমোতে বলা হয়েছে মহিলাদের ঘরে ঢোকাতে হবে এবং সরকারবিরোধী আন্দোলন তীব্র হলে তারা খালেদা ফ্যাকশনকে পরিত্যাগ করবে এবং ভারতের আগ্রাসী তৎপরতা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং ভারতবিরোধী বক্তব্য যুক্তি সহকারে অব্যাহত রাখতে হবে। প্রচারণার কৌশল হিসেবে বলা হয়, জামাত ক্ষমতায় গেলে যা করবে : সংবিধানের সংবিধানিক নাম হবে গণপ্রজাতন্ত্রের স্থলে ইসলামী প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন করে কোরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামি সংবিধান বাস্তবায়ন করা হবে। আর তা সম্ভব শুধু জামাত ক্ষমতাসীন

হলে। কাজেই স্বাভাবিক পন্থায় ক্ষমতাসীন না হতে পারলে বিকল্প ব্যবস্থা সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী ক্ষমতায়নের পরিকল্পনায় বাংলাদেশকে শীর্ষ স্থান দিয়ে কার্যক্রম ও পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে। সংবিধানে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা সংযোজন করতে হবে। সংবিধানের ৪নং অনুচ্ছেদের পরিবর্তন করে জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলার স্থলে সুরা ফাতিহা সংযোজন করতে হবে। জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামি অনুশাসন অনুযায়ী মহিলাদের চলতে হবে।

সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় যা ভারতে পূর্বাশা নামে পরিচিত (৮ বর্গকিলোমিটার), যা ভারতীয় নৌবাহিনী ১৯৮১ সালে জোরপূর্বক দখল করে নেয় তা অবশ্যই মুক্ত করে বাংলাদেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে হবে। (সংবাদ, ১৯.০২.০৫)।'

খালেদা ফ্যাকশনও এ বিষয়ে একমত। সার্ক স্থগিত হওয়ার পর থেকে তার ফ্যাকশনের সবাই এ ধরনের কথা বলে যাচ্ছেন। তিনি নিজেও কয়েকদিন আগে আওয়ামী লীগকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, ... 'যারা আল্লাহ খোদা বিশ্বাস করে না, তারাই ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করছে। তারা দেশের উন্নয়ন চায় না। আমরা যাতে উন্নয়ন করতে না পারি সে জন্য পরিকল্পিতভাবে হরতাল এবং জ্বালাও-পোড়াও কর্মসূচি দিচ্ছে। তারা বিদেশীদের সহায়তায় ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় আসতে চায়।' (জনকণ্ঠ ১৮.০২.০৫)। অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে।

সম্প্রতি বাইচান্স গ্রেপ্তারকৃত জঙ্গি শফিকুল্লাহ বলেছে, 'তাদের একটি যুব সংগঠন রয়েছে, তার নাম মুজাহিদীন যুব সংঘ। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবং এনজিওদের সভা সমিতিতে বোমা হামলা করাই এই সংগঠনের কাজ এবং তাদের একটি বোমা স্কোয়াড রয়েছে। তারা এই হামলাকে ইসলামি জেহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।' (ইত্তেফাক, ১৭.০২.০৫)।

সরকারের সেকেন্ড ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করছে এমন জঙ্গি সংগঠনের সংখ্যা এখন ৪৫। শাহরিয়ার ৪৩টি নাম উল্লেখ করেছেন। তারা এখন পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার জন্য কাজ করছে। শাহরিয়ার নেজামে ইসলামের একটি দলিলের উল্লেখ করেছেন। যেখানে আওয়ামী লীগ থেকে ইয়াহিয়া খানকে উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, 'যে অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য একদিন এদেশের মানুষ পাকিস্তান চেয়েছিল এবং ভোট ও রক্তের বিনিময়ে হাসিল করেছিল আজ দেশ, সেই অবস্থানের দিকে দ্রুত ফিরে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের বাঁচার পথ একটাই, আর তাহলো সারা উপমহাদেশে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হওয়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে এক মুহূর্ত দেরি না করে দুই দেশ এক জাতি হিসেবে পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করা। পাকিস্তান-বাংলাদেশ দুটি দেশ কিন্তু মুসলিম হিসেবে এক জাতি।' (০৯.০২.০৫)। ইতিমধ্যে জয়পুরহাটে জামাতের মিছিল থেকে শ্লোগান দেওয়া হয়েছে 'পাকিস্তানি বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' (সংবাদ ১৬.০২.০৫) মার্কিন রাষ্ট্রদূত জামাতের একটু সমালোচনা করায় যুদ্ধাপরাধী জামাত নেতা সাঈদী পল্টনে

পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা হলো শয়তানের বিধান।' সাঈদী ঘোষণা করে আমেরিকা বাংলাদেশকে নাস্তিকতা শেখাতে চায়। সমাবেশ থেকে শ্লোগান ওঠে, 'বাংলার আকাশে তালেবান পতাকা তুলবেই' ও এর ওপর ভিত্তি করে গজল পরিবেশন করা হয়। সমাবেশে খালেদা ফ্যাকশনের আখতার হামিদ সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংসদের ডেপুটি স্পিকার। (জনকণ্ঠ, ২০.০২.০৫) এরপর মার্কিন রাষ্ট্রদূত একদম নিশ্চুপ হয়ে গেছেন ভয় পেয়ে।

এসব যে নতুন খবর তা নয়। তবুও এই বিস্তৃত প্রবন্ধটি লিখলাম একটি কারণে। তিনটি বিষয় স্পষ্ট করার জন্য–

১. জামাত সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিগ বিজনেস (হরতালের কথা শুনলে অর্থাৎ বিরোধীদের প্রতিবাদের কথা শুনলে যারা ক্ষিপ্ত হয়ে যান), ও এনজিও এবং গণমাধ্যমের একটা বড়ো অংশ, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনের বড়ো অংশ এতে সহায়তা করেছে। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী। এরা ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে আগ্রহী এবং এসব কার্যকলাপ সে লক্ষ্যে পৌছার প্রক্রিয়া মাত্র।

২. এদের লক্ষ্য পাকিস্তানি বাংলাদেশ স্থাপন করা। এ কারণে তারা যাদের শেষ করে দিতে চাইছে তারা হলো–

১. সেক্যুলার ও বাম প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের, ২. আওয়ামী লীগ, সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ, বাসদ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী-সমর্থকদের, ৩. সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়, ৪. আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ৫. এনজিও (যারা জোটের পক্ষে নয়) মানবাধিকার আন্দোলনের নেতাকর্মী, ৬. গ্রামাঞ্চলে নারী এবং ৭. বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্প সংস্কৃতিসহ যা কিছু বাঙালিত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার সমর্থক। (শাহরিয়ার কবিরের ধারণাপত্র)।

৩. এ লক্ষ্যে জোট সরকার সব ব্যবস্থা নিয়েছে। যে কারণে কেউ গ্রেপ্তার হয় না, ভুল করে কাউকে গ্রেপ্তার করলেও ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সব দোষ আওয়ামী লীগের কাঁধে চাপিয়ে আওয়ামী কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ এক্ষেত্রে সব ধরনের সহায়তা করছে। যাদের শেষ করে ফেলতে হবে তারা অসহায় এবং অস্ত্রহীন। অন্যপক্ষ সশস্ত্র–ওপরের উদাহরণগুলো যা প্রমাণ করে। শুধু তাই নয় জামাতের ডকুমেন্টে আছে বিকল্প [অর্থাৎ সশস্ত্র] পন্থা অবলম্বনে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভও সর্বতোভাবে এদের সহায়তা করবে। এখন মানববন্ধন, হরতাল করে কোনো লাভ নেই।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য একটিই। যদি দেশে থাকতে চান এবং শান্তিতে পরিবারসহ গণতান্ত্রিক পরিবেশে থাকতে চান তবে, আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিরোধে, প্রতিবাদে। যদি ভাবেন, আমার কিছু হবে না আমি নিরপেক্ষ বা যদি ভাবেন আমি আওয়ামী লীগ করি না কিছু হবে না বা যদি ভাবেন, আমি জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের অনুগামী বা যদি ভাবেন রাজনীতিবিদরা সব করে দেবে তবে বোকার স্বর্গে বাস করছেন। খালেদা ফ্যাকশনের অনুরাগীদের বলি, নিজামী ফ্যাকশনের ডকুমেন্টটি

দেখুন। নেতারা সব অর্থশালী, বিপদে আপনাদের ছেড়ে যেতে কসুর করবেন না। মওদুদ আহমেদ বা সাকা চৌধুরী কতো বার দল বদলেছে বলতে পারবেন? যদি ভাবেন, প্রতিবাদ প্রতিরোধ না করলেও বেঁচে যাবেন তবে বললো ভুল করছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছাড়া শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়নি। আর যদি তা না করেন, তবে যারা পারবেন দেশ ছাড়ুন। তাও যদি না চান তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকুন।

এটুকু বলার পর বলবো, এতোকিছুর পরও শেষ হাসিটা আমাদেরই থাকবে। যেসব ব্যবসায়ী, এনজিও কর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী উৎসাহভরে জোট সমর্থন করেন এবং জামাতের খালেদা ফ্যাকশনের তরুণ-তরুণী-কেউই এদেশ ছেড়ে যেতে পারবেন না। আর যাহোক, তালেবানি বাংলাদেশের পাসপোর্ট পৃথিবীর সব দেশেই অগ্রহণযোগ্য হবে। আমরা শুধু মারা যাবো। আর বাকিরা সব সারা বছর ভ্যালেনটাইন দিবস পালন করবে সেটি হবে না।

২৬.০২.০৫

ক্ষমতায় আছেন মাসুদ মিয়ারা

ভাবছেন, বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী, জামাতপন্থী বিএনপির প্রধান, প্রবল ক্ষমতাশালী। না, আপনার ধারণা বোধহয় ঠিক নয়। খবরের কাগজের বিভিন্ন রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে, তার চেয়েও ক্ষমতাশালী একজনের আবির্ভাব হয়েছে বাংলাদেশে। তিনি একজন তরুণ। ভাবছেন, তারেক রহমান? না, আপনার ধারণা ঠিক নয়। তার নাম হচ্ছে মাসুদ মিয়া।

নামটি সাধারণ, আরো দশ-পাঁচটি নামের মতো। কিন্তু ব্যক্তিটি অসাধারণ। তার আগে এতো নিম্নপদে থেকে কেউ কখনো প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। সাধারণভাবে দেখলে, মাসুদ মিয়া বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিসের একজন জুনিয়র কর্মকর্তা, পদমর্যাদা এসপির। এরকম শয়ে শয়ে এসপি বাংলাদেশে ছিল এবং এখনও আছে বোধহয়। তাদের নামও কেউ জানে না। কিন্তু মাসুদ মিয়ার নাম ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে, রাজশাহী থেকে টেকনাফ পর্যন্ত। কারণ? কারণ আর কিছুই নয়। প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন এসপি হলেও তিনি ক্ষমতাধর, অন্তত তার মন্ত্রীর চেয়েও। তার কেশটিও কেউ স্পর্শ করতে পারে না। কেন তারা ক্ষমতাধর? সেটি অন্য বিষয়।

মাসুদ মিয়া প্রথমে খবরে আসেন বাংলা ভাইয়ের কল্যাণে। এবং তখনই তার ক্ষমতা বোঝা যেতে থাকে। বাংলা ভাইয়ের কথা মনে আছে তো? জামাতের সেকেন্ড ফ্রন্ট জাগ্রত মুসলিম জনতার নেতা। বাংলা ভাই এক সময় জামাতের ক্যাডার ছিলেন। বর্তমানে অন্য যেসব ইসলামি জঙ্গি ধরা পড়ছে, দেখা যাচ্ছে এদের অধিকাংশই ছিল জামাতের ক্যাডার। আমাদের অনেকের যে ধারণা ছিল জঙ্গিবাদী গ্রুপগুলো জামাতের সেকেন্ড ফ্রন্ট, এখন দেখা যাচ্ছে, সে ধারণা বেঠিক নয়।

'বাংলা ভাই' যখন রাজশাহীতে, বিশেষ করে বাগমারায় অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করেন তখন মাসুদ মিয়া খবরে আসেন। মানুষ তখন বলেছে বাংলা ভাইয়ের অত্যাচারে ঐ অঞ্চল বিপর্যস্ত কিন্তু সেখানকার বিএনপি সাংসদ বলেছেন এ নামে কেউ নেই। জামাতি মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, 'বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি।' মাসুদ মিয়াও বলেছেন, বাংলা ভাইটি আবার কে? বা থাকলেও তারা ভালো লোক। অথচ কাগজে বেরুচ্ছে বাংলা ভাইয়ের প্রতিনিধিরা এসপির অফিসে বৈঠক করেছে। বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা ট্রাকে করে শহর ঘুরে গেছে। সরকারের সব মন্ত্রী বলছেন, বাংলা ভাই নেই। অথচ খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণসহ তার ছবি বেরুচ্ছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যিনি সব সময় ব্যস্ত 'লুকিং ফর শত্রু' নিয়ে তিনি পর্যন্ত বললেন, কই বাংলা ভাই নামে তো কেউ নেই। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী তখন নির্দেশ দিলেন, বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করতে। অর্থাৎ বাংলা ভাই আছে। মাসুদ মিয়া নাকি অনেক খোঁজাখুঁজি

করছেন বাংলা ভাইকে পাচ্ছেন না। অথচ প্রতিদিন খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে বাংলা ভাইয়ের সচিত্র বিবরণ। মাসুদ মিয়া গ্রেপ্তার করলেন না বাংলা ভাইকে। বা তিনি 'খুঁজে' পেলেন না। একজন পুলিশ অফিসার তার এলাকার একজনকে খুঁজে পাচ্ছে না। যে নিয়ত সন্ত্রাস করছে। অথচ খুঁজে পায় বিরোধীদের। র‍্যাব যেমন, আওয়ামী-বিএনপি সন্ত্রাসী খুঁজে পায় কিন্তু খোঁজ পায় না জামাতি সন্ত্রাসীর। যেমন–বাংলা ভাই সম্পর্কেও তারা কিছু জানে না। তাজ্জব বাত। কিন্তু আপনারা তো এখন জানেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ। এখানে একজন সামান্য এসপিও অবলীলাক্রমে পারে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করতে। তখনই সবাই অনুধাবন করতে পারেন, আসলে বেগম জিয়ার হাতে ক্ষমতা তেমন নেই। অনেকে এ প্রশ্নও করতে লাগলো, তিনি কি আসলেই পুতুল? কোন দেশে প্রধানমন্ত্রীর আদেশ উপেক্ষা করতে পারে একজন জুনিয়র সাংসদ, একজন প্রতিমন্ত্রী বা একজন জুনিয়র এসপি?

ব্যাপারটি কিন্তু অন্যভাবেও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

এক. বাংলা ভাই আছে। কারণ, লোকটি তাদেরই সৃষ্টি। চরমপন্থী এবং আওয়ামী লীগারদের ইসলামের নামে ঠেঙ্গিয়ে দমন করার জন্যই ঐ এলাকায় এমপি, মন্ত্রীরা বাংলা ভাই শুধু সৃষ্টি নয়, সে যাতে শশীকলার মতো বৃদ্ধি পায় সেটি দেখাও ছিল তাদের নৈতিক দায়িত্বের অন্তর্গত। সুতরাং বাংলা ভাইয়ের বিষয়টি শাসক দল সব সময় অস্বীকার করেছে। অন্য অর্থে এরা আপাদমস্তক, প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় 'টপ টু বটম' মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদীরা দেশের শাসনে থাকলে আর যাই হোক দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় না।

দুই. বাংলা ভাই ছিল এবং আছে। বিষয়টি হচ্ছে সন্ত্রাস দমনে যে প্রধানমন্ত্রী অতি আগ্রহী সে বিষয়টি বারবার তুলে ধরতে হবে। সেজন্য তিনি বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করো, কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, বলে হুমকিধামকি দেবেন। কিন্তু যাদের গ্রেপ্তার করার কথা তারা সবাইকে গ্রেপ্তারের জন্য খুঁজে পেলেও বাংলা ভাইকে পাবে না। কিন্তু এই কৌশলের তাৎপর্য আমাদের কাছে কীভাবে প্রতিভাত হবে তা তারা ভাবেনি। মানুষের সামনে প্রমাণিত হচ্ছে, এতোবড়ো প্রধানমন্ত্রী, সামান্য একজন এসপিকে দিয়েও কাজ করাতে পারেন না। তার আর ইজ্জত থাকে কোথায়?

তিন. প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকভাবেই বলেছেন বাংলা ভাই ও জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে এবং এককভাবে মাসুদ মিয়া সে আদেশ অমান্য করেছে। এতে প্রমাণিত হয়, সরকারে কোনো একক কর্তৃত্ব নেই। ক্ষমতার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলয় আছে। যে কারণে প্রধানমন্ত্রীর এপিএস পাঁচ-ছ' হাজারের মসনবদার তিন কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি কেনে এবং তার কিছুই হয় না। এ ব্যাপারে 'স্বাধীন' দুর্নীতি দমন কমিশনও নিশ্চুপ। মেয়রের এপিএস চার-পাঁচ হাজারের মসনবদার কোটি টাকা লোপাট করে। তার চাকরি যায়, কিন্তু টাকা থেকে যায়।

মাসুদ মিয়া বাংলা ভাইদের প্রবল সাপোর্ট দিয়ে গেলো। এবং বাংলাদেশ একটি মৌলবাদী অভব্য দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত হয়ে উঠলো। মন্ত্রীরা মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত হলো, 'এছলামি' মন্ত্রীরাও। দেশের ভাবমূর্তি শেষ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দেশের

ভাবমূর্তি বিনাশকারী হিসেবে আমাদের চিহ্নিত করেন, গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করেন, কিন্তু এদের ব্যাপারে স্পিকটি নট। এর নিশ্চয় কিছু মাজেজা আছে।

মাজেজা যাই থাকুক কথা বলার চ্যাম্পিয়ন সাইফুর রহমানকে যখন দাতারা জানালো, ভিক্ষা দেবে না, তখন টনক নড়লো। আসলে বিদেশী সামান্য আমলাদের লাথিঘাটা না খেলে আমাদের অতি শিক্ষিত আমলা ও মন্ত্রীদের টনক নড়ে না। এখন হঠাৎ 'এছলামের' নিশানবরদার সাবেক আলবদর প্রধান নিজামী, অলঅয়েজ যিনি শত্রুদের 'লুকিং' (নাকি 'দেখভাল') করছেন, সেই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সবাই বলছেন, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীও আবার হুঙ্কার দিলেন। জেএমবিকে নিষিদ্ধ করা হলো। অর্থাৎ বাংলা ভাই আছে। সেই সব মন্ত্রী, সেই সব এমপি, সেই সব পুলিশরা এখন নিজের থুতু নিজেই চেটে খেলো। কে জানে, থুতু হয়তো চেটে খেলে মধুর মতো লাগে।

সব কথার শেষ কথা, বাংলা ভাইকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দুঃখ করে বলছেন, তিনি বিব্রত। কৌতুকময় ও নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা গেলো, সেই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলছেন, খবরের কাগজ পড়ে তিনি জেনেছেন বাংলা ভাই দেশে নেই।

তা মাসুদ মিয়ার ভূমিকা এখানে কী? সেটিতেই আসছি। গত এক বছরে পত্রপত্রিকার পাতা ওল্টালে দেখবেন, আইজি থেকে তার ওপর সংবাদ বেশি। জঙ্গিদের সমর্থন, টাকা-পয়সা এদিক-ওদিক করা, ওপরঅলার সব ধরনের আদেশ অমান্য করা, বাংলা ভাইয়ের ক্যাডার ছাড়া সব ধরনের মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা–সবকিছুর কেন্দ্রে মাসুদ মিয়া। হয়তো এসব কারণেই সম্প্রতি অনেককে ডিঙিয়ে মাসুদ মিয়াকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের এডিশনাল ডিআইজি হিসেবে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। হয়তোবা গোয়েন্দা সংস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য তাকে আনা হয়েছে। কারণ এখন যারা আছেন তারা তো বাংলা ভাইয়ের খবর মন্ত্রীকে দিতে পারেননি। খবরের কাগজ পড়ে মন্ত্রীকে জানতে হয়েছে। তবে আমাদের আশঙ্কা স্পেশাল ব্রাঞ্চের কী হবে জানি না। তবে আমাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। সেই বিখ্যাত এসপি কোহিনূর মিয়াকেও ঢাকায় আনা হয়েছে যিনি প্রকাশ্যে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমকে নিজের স্ত্রীর ছোট ভাই হিসেবে সম্বোধন করে লাঠিপেটা করেছিলেন এবং আমাদের অনেকের ওপর অকথ্য নির্যাতন করেছিলেন যাকে আব্দুল গাফফার চৌধুরী 'কোহিনূর থেরাপি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, এ কারণে নাকি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ তাকে বিদেশ যাওয়ার ভিসা দেয়নি। শুধু কোহিনূর মিয়া নন, ভবিষ্যতে হয়তো আরো অনেকেই-দেশত্যাগের ভিসা নাও পেতে পারেন।

না, ঘটনা এখানেই শেষ নয়। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিভিশনে প্রচারিত নির্দেশ শুনে (দর্শক হিসেবে যা দেখেছি ও শুনেছি) রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি নূর মোহাম্মদ ও বাগমারার ওসি কিবরিয়া ভেবেছিলেন, সত্যি সত্যিই এতো দিনে বোধহয় গ্রিণ সিগন্যাল পাওয়া গেলো বাংলা ভাইকে দুরস্ত করার। কাজে নেমে পড়লেন তারা। এবং তারপর? মাসুদ মিয়া ৫ তারিখে নিজের বদলির আদেশ পেয়ে ৭ তারিখে ওসিকে

ক্লোজ করেন। এটি জানতে পেরে ডিআইজি ঐ দিনই ওসিকে দায়িত্ব পালনের আদেশ দেন। ওসি তা মানলে ওসিকে শোকজ করেন মাসুদ মিয়া। শুধু তাই নয়, মিয়া সাহেব সেখানে আরেকজন ওসিকে পোস্টিং দেন। নতুন ওসি এ নির্দেশ পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পুরো বিষয়টি তদন্তের জন্য তখন মাসুদ মিয়া একজন এএসপিকে দায়িত্ব দেন। এএসপি এটি জেনে ছুটিতে চলে যান। মাসুদ মিয়াকে এতো ভালো ফর্মে আগে কখনো দেখা যায়নি। এসব বিষয়ে নাকি তিনি মন্তব্য করেছেন, এসপির কাজ এসপি করছে ডিআইজির কাজ ডিআইজি করছে (অবিকল উদ্ধৃতি নয়)। মূল কথা হলো, প্রধানমন্ত্রী যেখানে চুপ মেরে যান সেখানে নূর মোহাম্মদ ডিআইজি! একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কোনো থানার ওসিকে লাইনে ক্লোজ করার ক্ষমতা একজন এসপির নেই।...এসপি নিজের বদলির আদেশ পেয়ে এভাবে কোনো ওসিকে বদলি করতে পারে না। আর সব বিষয়ে ডিআইজিকে অবহিত করতে হয়। (ভোরের কাগজ, ১০.০৩.০৫) যে পুলিশ কর্মকর্তা এ মন্তব্য করেছে তার চাকরি যাওয়া উচিত। সে আপ টু ডেট নয়। এখন নিয়ম, নিয়ম বলে কিছু থাকবে না। থাকবে শুধু মাসুদ মিয়ারা।

১০ মার্চ বাগমারার শোকজপ্রাপ্ত ওসি থানায় একটি জিডি করে জানান, মাসুদ মিয়া তার কাছে এক লাখ টাকা ঘুষ চেয়েছেন এবং ওই পরিমাণ টাকা না দিলে তাকে ক্লোজ করা হবে বলে হুমকি দিয়েছিলেন। মাসুদ মিয়া ঘুষ চাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। এদিকে বাগমারার যুগীপাড়ার একজন সহকারী দারোগাসহ তিন পুলিশকে এসপি গত ৭ মার্চ ক্লোজ করে লাইনে রেখেছেন। এসপিকে (অর্থাৎ মাসুদ মিয়া) গালাগালি করার অভিযোগে এদের ক্লোজ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। (প্রথম আলো ১১.০৩.০৫)।

প্রতিদিন এ ধরনের খবর প্রকাশিত হওয়া শুরু করলে নিজামী থেকে সাইফুর সবাই বলতে লাগলেন, সাংবাদিকরা বাড়াবাড়ি করছে। এতো স্বাধীনতা ভালো নয়। কিন্তু মাসুদ মিয়ার কাজকর্ম যে প্রশাসনের লণ্ডভণ্ড চেহারাটা তুলে ধরছে এটি বোধহয় কেউ কেউ বুঝতে পেরেছেন। কারণ, দাতারা বলাবলি করছে দেশে সুশাসন নেই। অবশেষে আইজি তাকে স্ট্যান্ড রিলিজ করেন। এবং তার বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মদদ দেওয়া, ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে উৎকোচ আদায়, চোরাচালানি দলের সঙ্গে সখ্য, দালালের মাধ্যমে অর্থ আদায় ও বদলির ভয় দেখিয়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে।' (ঐ, ১৩.৩)

এখানেই কি এ কাহিনীর শেষ? না, এর মাজেজা কি? পত্রপত্রিকায় পড়েছি, বাংলা ভাই ও তার গুরুরা দেশেই আছে। দাতারা টাকার ছাড় দিলে অথবা নির্বাচনের আগে তার কাজ কারবার শুরু হবে। পত্রপত্রিকার কারণে মাসুদ মিয়া এখন লায়াবিলিটি। প্রয়োজনে তাকে বিসর্জন দেওয়া হবে। যেমন–গডফাদাররা এখন বিসর্জন দিচ্ছে তাদের সন্ত্রাসী শিষ্যদের। আর পত্রপত্রিকার হাউকাউ কমে গেলে বিভাগীয় তদন্ত হয় থেমে যাবে নয়তো কিছু পাওয়া যাবে না। পত্রপত্রিকার চাপ অব্যাহত থাকলে, তাকে চাকরিচ্যুত হয়তো করা হবে। তখন মাসুদ মিয়া বিএনপিতে জয়েন করতে পারেন এবং একজন ভালো বেনিফিশিয়ারিতে পরিণত হবেন। আর যদি কিছু অর্জন করে থাকেন তাও থেকে

যাবে। লোকে বলে, বিএনপির সবচেয়ে বড়ো গুণ এরা উপকারীদের মনে রাখে এবং পুরস্কৃত করে। আওয়ামী লীগ উপকারীদের পুরস্কৃত দূরে থাকুক, সুযোগ পেলে লাথি মারে। উল্লেখ্য, বিভাগীয় তদন্ত শুরু হলেও মাসুদ মিয়ার প্রমোশন কিন্তু ঠিক আছে।

পুরো ঘটনার মাজেজা হলো, পুরো প্রশাসন এ ধরনের মাসুদ মিয়াতে ভর্তি। কেউ কাউকে মানছে না। সবাই মুক্ত পুরুষ। আজকের পত্রিকায়ই দেখুন–'নিয়ন্ত্রণহীন রেলওয়ে : কেউ কারও নির্দেশ মানে না।' (যুগান্তর ১৪.৩.০৫)

ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে অত্যাচার-নিপীড়নের মাত্রা বাড়ছে এবং লুটের একটা মহোৎসব চলছে। জোটের নীতিনির্ধারকরা ভাবছে, এভাবে সবাই পুরস্কৃত হলে এরা নির্বাচনে তাদের জন্য লড়বে। কিন্তু সারা বিশ্বে, সারা বিশ্বে কেন আমাদের কাছেই প্রমাণিত হচ্ছে আসলে এখন আর দেশে শাসন নেই, সুশাসন তো পরের কথা। প্রধানমন্ত্রী সেজেগুজে বক্তৃতা দেবেন এ পর্যন্তই। মাসুদ মিয়াদের মতো বিএনপির তরুণ নেতা, মন্ত্রীদের বোলচাল শুনুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন দেশে এখন কী অবস্থা এবং কী অবস্থা হতে পারে। আজ প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ থাকতো, যদি এরকম অসংখ্য মাসুদ মিয়ার সৃষ্টি না হতো, নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে ও আওয়ামী দমনের নামে জোটের কর্তাব্যক্তিরা মাসুদ মিয়াদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন। যে অব্যবস্থার সূচনা করেছেন তারা এদের সাহায্যে অচিরেই তা প্রলয়ঙ্করী হয়ে তাদের ভাসিয়ে নেবে। মাসুদ মিয়াদের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, ঔদ্ধত্য, অভব্যতা একথাই প্রমাণ করে। এবং এটা এখন পরিষ্কার যে, শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, প্রশাসন এখন তাদের হাতে জিম্মি। হয়তো মাসুদ মিয়ারা একমাত্র দায়বদ্ধ তারেক রহমানের কাছে। তিনি যে ভঙ্গিতে এখন আঙুল উচিয়ে কথা বলছেন, এবং যেভাবে সব কাউন্সিল করছেন এবং দেশজুড়ে মাসুদ মিয়ারা যা করছে তাতে মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই সাইফুর রহমান, মওদুদ আহমদদের, আমাদের কাতারে এসে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আর যদি ক্ষমতা চিরস্থায়ী না হয় তাহলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মাসুদ মিয়াদের কী হবে তা দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। জোটের শাসন করার টেকনিক অক্ষরে অক্ষরে তখন তাদের পালন করতে হবে বা করানো হবে। মাসুদ মিয়ারা তখন যা বানিয়েছেন তা নিয়ে কেটে পড়বেন? শুনে রাখুন, যে ভারতের ভিসা যে কেউ অনায়াসে পায় সে ভারতও সাদেক খানের মতো জাঁদরেলকে নাকি ভারত যাওয়ার ভিসা দেয়নি।

১৫.৩.০৫

গ্রেনেড-বোমার দেশে

মৌলবাদী জোট সরকার অনেকদিন থেকে বোধহয় চাচ্ছিল 'গিনেস বুক রেকর্ডস'-এ তাদের নাম উঠুক। গত বছর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর হয়তো তারা আশা করেছিল নাম এবার উঠলো বলে, অথচ ওঠেনি, এবার আগস্টে তারা সফল হয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে একই সাথে পাঁচশরও বেশি বোমা ফাটেনি। অনেকে এ ধরনের আলোচনায় আপত্তি করবেন। বলবেন, জোটের অর্ধেক মৌলবাদী হতে পারে, বাকি ৫০ ভাগ তো মৌলবাদী নয়। এ যুক্তি যারা দেয় জানবেন তারা জোটের পক্ষে। মানুষের শরীরকে দুই অংশ যদি করেন, দুটি একরকম হলে, জোড়া লাগালে তো মানুষ হবে। জামাতের এজেন্ডা, বিএনপির এজেন্ডা কি ভিন্ন? বোমাবাজির পর সব অংশ কি একইভাবে বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়নি?

৫০০ বোমা হামলার পরও কিন্তু সরকার কেন্দ্রীয় বোমাবাজদের ধরতে পারেনি। আপনাদের খেয়াল আছে কি না, রাজশাহীর পুলিশ প্রধান মাসুদ মিয়া বাংলাভাইয়ের সাথে মিলে কাজ করত। পত্র-পত্রিকায় হৈচৈ হওয়ার পর মাসুদ মিয়াকে খালি ট্রান্সফার করা হয়েছে। সরকার বা তাদের আইনি সন্ত্রাসী বাহিনীগুলো এতো লোককে অবলীলাক্রমে ধরে, আর ওদের পারছে না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অনেকে বলবেন, অনেকেতো গ্রেফতার হচ্ছে। হচ্ছে, আবার ছেড়ে দেয়াও হচ্ছে। কতজনকে ধরা হলো আর কতজনকে ছাড়া হলো সে হিসাব কি আমাদের জানা? এতোসব ডামাডোলের মধ্যেও কিন্তু তাদের ভারতীয় অ্যাঙ্গেল দূর হয়নি। অবৈধভাবে বসবাসরত এক ভারতীয়কে ধরা হয়েছে। সে নাকি বলেছে, সব কিছুর সাপ্লাই এসেছে ভারত থেকে। অন্যদিকে জোট নেতারা খোলাখুলি বলেছেন, ভারত বোমা হামলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এ বক্তব্য থেকে কিন্তু এখনো তারা সরে আসেনি। জোট যে কিছু গ্রেফতার করেছে তার অন্য কারণ আছে। তাদের মুরব্বী আমেরিকাকে বোঝানো, তারা মৌলবাদী নয়, মৌলবাদী কার্যক্রম তারা সমর্থন করে না। এ সার্টিফিকেট তো আগেই পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। তাদের মতে, জামাত হচ্ছে সেক্যুলার পার্টি। এ যদি সেক্যুলার পার্টি হয় তা হলে নন-সেক্যুলার যে কী হবে তা ভাবতেই পারছি না।

অধিকাংশের মত স্বঘোষিত বোমা হামলাকারী জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) একটা ওয়ার্নিং দিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিগুলোকে, সরকারকেও। ম্যাসেজটা হচ্ছে, আমরা শক্তিশালী কি না নিজেরাই বুঝে দেখ। সরকারের প্রতি ম্যাসেজটা হচ্ছে, আমরা দ্বিতীয় ফ্রন্ট আছি, ঠিক আছি কিন্তু আমরা আর তা থাকতে চাইছি না। প্রকাশ্য ক্ষমতার ভাগ আমরা চাই। অনেকে বলবেন, জেএমবিতো সরকারের

প্রতিও হুমকি প্রদান করেছে। তাদের লিফলেটে লেখা হয়েছে–

"এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে আল্লাহ বিরোধী শক্তি। কারণ যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র প্রধান এবং রাষ্ট্রের অন্য পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হচ্ছেন তা একটি অনৈসলামিক পদ্ধতি। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে কোথাও প্রচলিত কাফির-মুশরিক বিরচিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতির স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এসব পদ্ধতিই হচ্ছে আল্লাহর বিধানের প্রতিপক্ষ এক একটি ব্যবস্থা এবং কাফির-মুশরিক ও ইহুদি মস্তিষ্কপ্রসূত এসব বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে শুধুমাত্র মুসলিম আকীদা ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করার মানসে। কাজেই এদেশের মুসলিম জনতার আজ ভাববার সময় এসেছে।"

উল্লেখ্য, সরকারের দায়সারা তদন্তেও প্রমাণিত হচ্ছে, জেএমবি'র অনেক সদস্য জামাতের সঙ্গে যুক্ত। এরা যদি সরকারের কোনো ফ্রন্ট না হতো তাহলে তো জোটের নেতারা তাদের বিপক্ষে বিবৃতি দিতেন। তাতো হয়নি। সে কারণে বলেছিলাম বিএনপি একটি মৌলবাদী দল। যারা তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের গন্ধ খোঁজেন তারা মতলববাজ।

শাহ্‌রিয়ার কবির বাংলাদেশে ৫৮টি ইসলামী মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাঁর মতে, 'এই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো আন্ডার গ্রাউন্ড অথবা আধা আন্ডার গ্রাউন্ড অবস্থায় সারাদেশে তৎপর রয়েছে। এই তালিকায় এদের মূল রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামি শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন ইত্যাদির নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।'

এদের অর্থনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ়। আবুল বারকাত এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বার্ষিক নিট মুনাফা ১২০০ কোটি টাকা। এদের এনজিওর সংখ্যা ৪৫০। গড়ে প্রতিটি এনজিও মৌলবাদী দেশ ও গোষ্ঠী থেকে সরকারি হিসাবেও বার্ষিক ১০ কোটি টাকা করে পেলে তাদের আয় দাঁড়াচ্ছে ৪৫০০ কোটি টাকা। সর্বমোট ৫৭০০ কোটি টাকা। জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ৫ শতাংশ। অনেক বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ বলতেন, এরা তেমন কোনো ফ্যাক্টর নয়। এগুলো এক ধরনের মিথ। যাদের আয় বছরে ৫৭০০ কোটি টাকা তারা কোনো ফ্যাক্টর নয়–একথা যারা বলে তাদের বিদ্যা-বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখা এখন মুশকিল। ওরা আসছে– না, চুপি চুপি নয়। ওরা জানান দিয়েই আসছে।

২.

ওরা আসছে। গন্তব্যে পৌছার যাত্রা শুরু করেছিল অনেক আগেই। তাদের পথটা গত এক দশকে সহজ করে দিয়েছে নীতিনির্ধারক, ক্ষমতাবান ও রাজনীতিবিদরা। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়, এসব লোকজন নিজেদের ভারি চালাক ভাবেন। আসলে প্রমাণিত হচ্ছে ওরা নির্বোধ অথবা তারা ওদের সঙ্গে জড়িত। ওরা যে আসতে পারে তা কিন্তু গত এক দশক ধরেই লেখালেখি হচ্ছে। ১৯৭৫ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান ও পরবর্তীকালে এরশাদের নেতৃত্বে এদের পথ চলা শুরু। প্রতিটি বিএনপি আমলে (অথবা সামরিক শাসনামলে) এরা আস্তে আস্তে বেড়েছে। একদশক আগে তারা গন্তব্য ঠিক করে

চলা শুরু করেছে। গত এক দশক এদের বিরুদ্ধে জনমত ও জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন শাহরিয়ার কবির। যে কারণে তাকে দু'বার রিমাণ্ডে নিয়ে অত্যাচার করে জেলে নেওয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগ আমলে যখন শামসুর রাহমানের ওপর হরকতুলরা আক্রমণ করে তখন জামাত-বিএনপি কিছু বলেনি। পুলিশ আক্রমণকারীকে গ্রেফতার করে। কিন্তু তখনো নীতিনির্ধারকদের অনেকে আমাদের লেখালেখিকে অতিরঞ্জিত বলেছেন। এমন মন্তব্যও করেছেন অনেকে, কবি আবার পাবলিসিটির জন্য এগুলো করেননি তো! এরপর বোমা হামলা শুরু হতে থাকে। বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও সংস্কৃতিসেবী এবং লেখকরা বারবার বলেছেন, সচেতন হোন, এরা বাংলাদেশকে গ্রাস করবে। যখন ফরিদপুরে শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য পুঁতে রাখা বোমা আবিষ্কৃত হলো, তখন তৎকালীন নীতিনির্ধারকরা বললেন, না অবস্থা তো গুরুতর। কিন্তু সচেতন হয়ে তখন আর কিছু করার ছিল না। আওয়ামী লীগকে সরানোর জন্য তখন মঞ্চ প্রস্তুত। আওয়ামী নেতারা সেটি না বুঝেই পরম তৃপ্তিতে সেই মঞ্চে তখন সমাসীন। আমরা শুধু সান্ত্বনা পেতে পারি এ ভেবে যে, আওয়ামী লীগের সময় কিছু জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার জোটের সমর্থকরা তখন জঙ্গিবাদের কোনো সমালোচনা করেনি বরং বলেছে, ইসলাম বিপন্ন।

এই ওরা নানা নামে পরিচিত। মাঠপর্যায়ে এদের নাম হরকাতুল জেহাদ, তালেবান, জামাআতুল মুজাহিদীন, বাংলাভাই ইত্যাদি। রাজনীতি বা প্রশাসনে পরিচিত সাকাচৌ, মান্নান ভূঁইয়া, নিজামী, মুজাহিদ, বাহাউদ্দিন বা আফতাব প্রভৃতি নামে। এ মন্তব্যে অনেকের আপত্তি হতে পারে, কিন্তু গত ১০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবেন মূলত একটি লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যই এরা কাজ করছে। কাউকে হয়তো আদর্শ, আর কাউকে হয়তো অর্থ প্রণোদনা যুগিয়েছে, এই যা পার্থক্য। পর্যালোচনা করলে দেখবেন, গত এক দশক এদের সমস্ত হামলার লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীর সমর্থক ও প্রগতিশীল লেখক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মীরা। কখনো জোটের কোনো কর্মী বা সমর্থকের বিরুদ্ধে নয়। আরো লক্ষ্যণীয়, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা (অর্থাৎ আমলা, পুলিশ গোয়েন্দা) সব সময় বলেছে, এসব করছে আওয়ামী লীগ ও তাদের 'মদদদাতা' রা অথবা ভারত। গ্রেফতার করা হয়েছে ঐসব দলের নেতাকর্মী বা প্রগতিশীলদের। জামাত-বিএনপি জঙ্গিরা যতো হত্যা-সন্ত্রাস, বোমাবাজিই করুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযান চালানো হয়নি। গ্রেফতারও হয়নি তেমন কেউ। কাউকে কাউকে গ্রেফতারে বাধ্য হলেও পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অথচ শাহরিয়ার, সেলিম সামাদ, প্রিসিলা, সাবের বা আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রিমাণ্ডে নিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে। এ দিকগুলো যারা দেখেও দেখেন না অথবা নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করেন, তারা অবশ্যই জোটপন্থী অথবা মতলববাজ। এসব কথা এখন পরিষ্কারভাবে বলার সময় এসেছে। একজন মান্নান ভূঁইয়া, নিজামী বা শাইখ আব্দুর রহমানের মধ্যে তফাত কী? দাড়ি ও পোশাকের। এই সত্য মেনে নিলে পুরো বিষয়টি

বুঝতে সুবিধা হবে। পার্থক্য যদি থাকে তাহলে তাদের ৩ জনের বক্তব্য এরকম হয় কেন? ১৮ আগস্টের যুগান্তর দেখুন, আমিনী, বায়তুল মোকাররমের খতিব, মুজাহিদ, মান্নান ভূইয়া সবার বক্তব্য এখন একই রকম। কেন? খতিব ওতো আরো এককাঠি সরেস। বলেছেন (অর্থাৎ ইঙ্গিত করেছেন) জামা'আতুল বোমাবাজির সঙ্গে জড়িত নয়। লোকটি এক সময় প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা গাদ্দার।' জোট ও দক্ষিণপন্থী এস্টাবলিশমেন্ট ২০০১ সালে ক্ষমতা দখলের পর এথনিক ক্লিনজিং শুরু করেছিল। হিন্দুদের ওপর সুপরিকল্পিতভাবে নির্যাতন শুরু হয়। কারণ এটি মুসলমানদের দেশ। আওয়ামী লীগের ওপরও আক্রমণ শুরু হয়। জঙ্গি সংগঠনগুলোকেও লেলিয়ে দেয়া হয়। কারণ তাদের মতে, আওয়ামী লীগ, বামপন্থী ও প্রগতিশীলরাও মুসলমান নয়। 'মুসলমান' নামধারী অমুসলমান। এই জঙ্গি নিজামী ও মান্নান ভুইয়াদের ইসলাম সম্পর্কে একটা পার্ভারসন আছে। তাদের বিবেচনায় পিছলেপড়া পাতলা রঙিন শিফন ও হীরক বা মুক্তার অলঙ্কারে রমণী হচ্ছে ইসলামের প্রতীক। আবরু রাখা, অলঙ্কারবিহীন নারী ইসলামের প্রতীক হতে পারে না। নিজামী ও আমিনীরা একসময় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল, নারী নেতৃত্ব হারাম। কিন্তু নারীর নেতৃত্ব ছাড়া এক কদম চলার মতো মুরোদও তাদের নেই। এরা মিথ্যাবাদীতো বটেই, এক ধরনের পার্ভারসনও কাজ করে তাদের মধ্যে। আর তাদের মুসলমানত্বের মাপকাঠি হলো কে কতোটা বেশি পাকিস্তানের গোলাম ও ভারতবিরোধী তা প্রমাণে। শান্তিচুক্তি করলে যদি ফেনী থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত ভারতের অধীনে চলে যায় (বেগম জিয়ার ভাষ্য) তাহলে বাংলাদেশে সেই ভারতীয় টাটা ১২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে কিছু হয় না কেন? বেগম জিয়ার অ্যাপলজিস্টরা কী বলেন তা শুনতে আমরা আগ্রহী। এ ধরনের ইসলামী লোকের হাতে ইসলাম বিপন্ন- এ কথা বারবার বলা হচ্ছে। কাজ কিছুই হয়নি।

গত ৬ বছরে বড় ধরনের ৪৭টি বোমা হামলা হয়েছে। বাংলাদেশের বিশাল গোয়েন্দা বাহিনী কোনো হামলাকারীকে আজ পর্যন্ত খুঁজে পায়নি। কেন তা বলারও সময় এসেছে। গোয়েন্দা বাহিনী কিছু করতে পারেনি বা কিছু করতে চায়নি কারণ তারা পাকিস্তানীমনা ও দক্ষিণপন্থায় বিশ্বাসী। আর জঙ্গিদের মদদদাতা যে পাকি আইএসআই ও সৌদি আরব এ কথা আজ অজানা নয়। আওয়ামী লীগের আমলে, পাকিমনাদের মুখপত্র ইনকিলাবে ৬/৭ জন ডিজিএফআই প্রধান সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, এদেশের লেখক ও সংস্কৃতিসেবীরা ভারতের দালাল ইত্যাদি। তখন আমি ও মনিরুজ্জামান সংসদের প্রতিরক্ষা বিষয়ক কমিটিতে আবেদন জানিয়েছিলাম, এদের শুনানির। কী প্রমাণে এসব তারা বলেছেন জানতে। কমিটি রাজিও হয়েছিল। এরপর আওয়ামী লীগ অপসারিত হয়। এ কারণেই হয়তো পরে আমাকে গ্রেপ্তার ও কিছুদিন আগে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কারণে) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আফতাব আহমদরা 'দুর্নীতির' অভিযোগে আমাকে পার্লামেন্টারি কমিটিতে নিয়ে যায়। সাব-কমিটির চেয়ারম্যানের দুই আত্মীয়াকে আফতাব ইতোমধ্যে চাকরি দিয়েছিল [পত্রিকায় প্রকাশিত]। ব্যক্তিগত হলেও উদাহরণটি দিলাম এ কারণে, পাকিমনাদের নিয়ন্ত্রণ সমাজ

ও রাষ্ট্রে কতোটা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বোঝাবার জন্যে। গোয়েন্দা দপ্তরগুলো প্রধানত বিএনপি ও জামাত সমর্থক। আত্মসন্তুষ্টি প্রবল হওয়ায় আওয়ামী লীগ তা বোঝেনি। সে সময়কার নীতিনির্ধারকদের অনেকের শিশুসুলভ ধারণা দেখে মনে হয়, এদেশে সবচেয়ে সোজা বোধহয় রাজনীতিবিদ হওয়া।

জোট আমলে বিশাল সব অস্ত্রের অবৈধ চালান শেখ হাসিনার ওপর হামলাসহ প্রায় ৫০টি বোমা ও গ্রেনেড হামলার জন্য দায়ী কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি গোয়েন্দারা। শাহ কিবরিয়াসহ আওয়ামী লীগের এমপি ও নেতাদের হত্যাকারীকে ধরতে পারেনি গোয়েন্দারা। বাধ্য হয়ে যে কয়জন জঙ্গিকে ধরা হয়েছিল তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে নিম্ন আদালত তাদের সম্পূর্ণ সহায়তা করে। ২০০১ থেকে এ পর্যন্ত আইনমন্ত্রী মওদুদ ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবরের কারণে ৭০ হাজারেরও বেশি ক্রিমিনাল ও জঙ্গিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পত্রিকায় দেখেছি বাংলাভাইকে মন্ত্রীরা আশ্রয় দিয়েছে। র‍্যাবের হাতে অনেকে মারা পড়লেও জঙ্গি কেউ ক্রসফায়ারে মারা পড়ে না। সেনাবাহিনীর অপারেশন ক্লিনহার্টেও একই অবস্থা। র‍্যাব সবাইকে খুঁজে পায় কিন্তু বাংলাভাই বা আব্দুর রহমানকে পায় না। এগুলো কেন হয় যদি কেউ বলেন বোঝেন না, তাহলে তাদের মাথায় মগজ পুনঃস্থাপন করলেও কিছু হবে না। এসব দায়হীন হত্যা ও কোনো বিচার না হওয়ার নিট ফল– সারা দেশে একযোগে ৫০০টির বেশি বোমা হামলা হয়, যা একটি বিশ্ব রেকর্ড।

এখনো বিভিন্ন জায়গায় বোমা পাওয়া যাচ্ছে। মুন্সীগঞ্জে পাওয়া গেছে ১০০টি বোমা। ৬৩টি জেলায় বোমা ফেলা হয়েছে সকাল ১১টা থেকে ১১.৩০টা মধ্যে। এর আগের রাতে মুন্সীগঞ্জে মনসা মেলায় শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে কি পরিমাণ লজিস্টিক সাপোর্ট ও সংগঠন লাগে? সরকারি প্রশ্রয় ও সাহায্য ছাড়া এটি সম্ভব? ডঃ কামাল হোসেনও তাই বলছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলেন, ১৪-১৬ তারিখে হামলা হতে পারে জানতেন কিন্তু ১৭ তারিখেরটা জানতেন না তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ১৪-১৬ তারিখের সম্ভাব্য হামলাকারীদের ধরা হয়নি কেন? বাংলাদেশের মতো এতো গোয়েন্দা সংস্থা তা কোনো দেশেই নেই। তারা কেন এ খবরটি দিতে ব্যর্থ হয়েছে? ৫০০ বোমা ফাটার পরও টিভিতে নীতিনির্ধারকদের কারো মুখে কোনো উদ্বেগ দেখিনি। বোমা হামলার সাথে সাথে ছাত্রদল আওয়ামী লীগকে দায়ী করে ক্যাম্পাসে ব্যানার সহকারে মিছিল করে। মান্নান ভূঁইয়ারা ও নিজামীরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেখ হাসিনা জবাব চাই– এ ব্যানার নিয়ে মিছিল করে। বক্তৃতায় আওয়ামী লীগকে দায়ী করে শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ মিছিল বেরুতে দেয়া হয়নি। আবার মান্নান ভুঁইয়ারা এও বলেছেন, বিরোধী দলের সহযোগিতা চাই। টিভিতে বলা হচ্ছে, খবরের কাগজ বলছে, এমনকি জামা'আতুল মুজাহিদীন বলছে–জামাআতুল বোমা হামলা করেছে। কিন্তু সরকার ও নীতিনির্ধারকরা বলছে আওয়ামী লীগ করেছে। চীন সফররত ঝলমলে পোশাকে সজ্জিত প্রধানমন্ত্রীকেও বিন্দুমাত্র বিচলিত মনে হয়নি। ছায়া

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান চলে গেছেন সঙ্গী-সাথীসহ অবকাশ যাপনে কক্সবাজারে। পত্রিকার খবর অনুসারে, বিএনপি ক্যাডারদের ধর্ষণ ও লুণ্ঠন অব্যাহত আছে। চট্টগ্রাম জোটের পক্ষে মেয়র নির্বাচনে হস্তক্ষেপকারী পুলিশ কর্মকর্তা ইতোমধ্যে প্রমোশন পেয়েছেন। বরং শিক্ষামন্ত্রীর সামনে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে পুরস্কার না নেওয়ায় পুলিশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। এসব বিষয় কিসের ইঙ্গিত করে তা যদি কেউ বুঝেও না বোঝার ভান করে তাহলে কিছু বলার নেই। হ্যাঁ, বোমা হামলার জন্য কিছু গ্রেফতার করা হয়েছে। আগেও মাঝে মাঝে হয়েছে। ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনো তাই হবে।

নীতিনির্ধারকদের মতে, আওয়ামী লীগ যদি এর সঙ্গে জড়িত থাকে তবে বলবো, ফালতু কথাবার্তা না বলে তাদের গ্রেফতার করুন। তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আওয়ামী লীগের লোকজন এখন দাড়ি রেখে টুপি ও আলখেল্লা পরা শুরু করেছে। আওয়ামী লীগ নেতারা এতো বড় কাজে সমর্থ হলে বলব, আগামীকালই এই জালিমদের উৎখাত করা হোক। এসব লুটেরা, ধর্ষক, অকর্মণ্য, ফালতুরা পুরো দেশ বিপন্ন করে তুলেছে। বাজারে এখন দুটি মত প্রচলিত। এক. জোট দেশের পরিস্থিতি এমন করে তুলেছে যে এর কদর্য চেহারা আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। নির্বাচন স্বচ্ছ হলে এদের ঘটিবাটি সব হারাতে হবে। সুতরাং এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে বলা হবে বেসামরিক সরকার আর কিছু করতে পারছে না, সামরিক সরকার আসা দরকার। এরপর সামরিক সরকার আগে যেভাবে এদের ক্ষমতায় বসিয়েছে সেভাবে আবার বসাবে। তাহলে আপাতত ক্ষমতাসীনদের ক্রাইসিস কাটবে। দুই. সন্ত্রাস করে ও সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দিয়ে অবস্থা এখন এমন হয়েছে যে, কাউকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। ক্লায়েন্টরাই এখন ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছে।

ওরা আসছে, না, চুপি চুপি নয়। জানান দিয়ে আসছে যে, ওরা সুসংগঠিত ও সুসংহত। এমন কি তাদের মদদদাতারা চাইলেও কিছু করতে পারবে না। দ্বিতীয় ফ্রন্টে তারা থাকতে আর রাজি নয়। আমরা শুধু নই, বেগম জিয়াও এখন বিপদগ্রস্ত। তাঁর রক্ষকরাও।

ওরা চলে এসেছে গন্তব্যে। আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি সফল হয়েছে। ওরা আফগানিস্তান ও ইরাকে যা করেছিল, এখন এখানেও তাই করবে। তাদের অপারেশনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো মাত্র। অবস্থা কেমন? বিদেশীরা বাংলাদেশ ত্যাগ করছে। জোটের অ্যাপলজিস্ট পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার খবরগুলো পড়ুন। তারা ও তাদের অ্যাপলজিস্টরা এখন নানা কথা বলছে, উদ্বেগ প্রকাশ করছে। আবার জোটের এসব প্রশ্রয় দেয়াকে লঘু করার জন্য এও বলছে, বোমা হামলা হয়েছে কিন্তু ক্ষতিতো তেমন হয়নি। সুতরাং বিপদ কিছু নেই। আমাদের ভাত ছেড়ে কপি খেতে বলা হয়েছিল, ওরা আসছে, কপিও খেতে হবে না। নাইকো থেকে শুরু করে ব্যারিস্টার নীতিনির্ধারকের ১৫ আগস্টের কাঙালিভোজ লুট করা সব টাকা-পয়সা এখন চলে যাচ্ছে বিদেশে। তাদের ভিসাও তৈরি। এখন তারা আমাদের ঘাস খেতে বলে চলে যাবে। দেশের যা অবস্থা করে তারা

যাচ্ছে তাতে ঘাসও পাবেন না, ভিসা তো নয়ই। ওরা আসছে, শিফন শাড়ি, ব্যান্ড আর ফ্যাশন শো, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া আর হৈহুল্লোড় করার দিন শেষ। ও লেভেল এ লেভেল নয়, এখন মাদ্রাসাই হবে বাধ্যতামূলক। জোট সমর্থকদের পরিণতি এরকম হতেই বাধ্য বিশেষ করে যারা ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো লাফায়।

৩.

বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী বোমা হামলার তদন্তের ফলাফল যে অন্তিমে অশ্বডিম্ব হবে সে বিষয়টি এখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বোমা হামলার পর জোটের বিভিন্ন শরিক দলের নেতা, মন্ত্রী ও আমলাদের বিভিন্ন বক্তব্যে সেটি টের পাওয়া যাচ্ছে। ২১ আগস্টে বোমা হামলার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। তদন্ত শেষে নাকি জানা গেছে, জজ মিয়া নামক এক দিনমজুরই ২১ আগস্টের বোমা হামলার হোতা। গত ৪ বছরে অজস্র বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলা, অস্ত্র চোরাচালান, এমপি হত্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যা ঘটেছে এ ক্ষেত্রেও তা ঘটবে। কেউ কেউ গ্রেফতার হলেও নিম্ন আদালত থেকে ছাড়া পাবে এবং মামলা ধামাচাপা পড়বে।

১৭ আগস্ট দেশজুড়ে বোমা হামলার পরপরই ছাত্রদল শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে দায়ী করে মিছিল করে। বিকেলে বিএনপি জনসভা করে শেখ হাসিনাকে দায়ী করে তাকে গ্রেফতারের দাবি জানায়। অন্যদিকে গণমাধ্যমে বারবার প্রচারিত হতে থাকে, বোমা হামলার স্থানগুলোয় যেসব লিফলেট পাওয়া গেছে তার সব জামা'আতুল মুজাহিদীনের। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা বলছে, তারা জামা'আতুলের সদস্য এবং তারাই জড়িত বোমা হামলার সঙ্গে।

জামাতে ইসলাম, ইসলামী ঐক্যজোট প্রভৃতি তথাকথিত আধুলি-সিকি ইসলামী দলগুলো একই বক্তব্য রাখে। বোমা হামলার বিরুদ্ধে তাদের মিছিল-মিটিং করতে দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ করতে চাইলে তাদের লাঠিপেটা করা হয়। কয়েকজন মন্ত্রী এর আগে বিরোধী দলের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। মনে হচ্ছে এর অর্থ আওয়ামী লীগ আলোচনায় এসে লাঠিপেটা খাক। জোটের অ্যাপলজিস্টরা, এমনকি কিছু কিছু বিদেশী কর্মকর্তাও বলা শুরু করেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের দোষারোপ বা কলহের কারণে বোমাবাজরা পার পেয়ে যাচ্ছে। এসব বক্তব্যে একটা ফাঁক আছে। কলহ কে করছে? গত ৪ বছরে, বোমাবাজদের ধরা হচ্ছে না, ধরলেও বিচার হচ্ছে না, কোনো গ্রেনেড হামলার বিচার হয় না এবং এর প্রতিবাদ করলেই বলা হচ্ছে কলহ। এসব 'বিজ্ঞজন' জোটের দ্বিতীয় ফ্রন্ট তা বলাই বাহুল্য।

বোমাবাজদের যে কিছু হবে না তার প্রমাণ ক্ষমতাসীনদের বিভিন্ন বক্তব্য। প্রধানমন্ত্রীর পর যে মন্ত্রী সবচেয়ে শক্তিশালী সেই মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী পরিস্কার ভাষায় বলেছেন, বোমা হামলার পিছনে আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। তিনি বলেন, 'এ ঘটনায় ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' সরাসরি জড়িত। এছাড়া ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (অর্থাৎ 'র') জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।' (সংবাদ

২১.০৮.০৫) জামাতিরা এর আগে জনসভায় বলেছিল, 'ঐসব বোমা হচ্ছে ভারতের এবং এ দেশের গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় তা ব্যবহার করা হচ্ছে।'

সরকারের মুখপাত্র যখন এ ধরনের বক্তব্য দেন তখন তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। আওয়ামী লীগ যদি জড়িত হয় তাহলে কীভাবে জড়িত? এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের জোরালো ব্যাখ্যা চাওয়া উচিত। মোসাদ জড়িত তিনি জানেন কীভাবে? বাংলাদেশের কোন কোন গোয়েন্দা সংস্থা বোমা হামলায় সহযোগিতা করেছে ভারতীয়দের? গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিজামীকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবেন। তদন্তের খুব একটা দরকার পড়বে না। তারা না পারলে, প্রধানমন্ত্রী তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই পারেন। অবশ্য সে হিম্মত কি আছে প্রধানমন্ত্রীর?

অন্যদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, কোনো দেশের জড়িত থাকার খবর তার জানা নেই। নিজামী যা বলেছেন, তা সরকারের বক্তব্য নয়। আর কে করেছে তাও স্পষ্ট নয়। সরকারের সোল এজেন্ট কি মোরশেদ খান? তার বক্তব্য যদি সরকারের হয় তাহলে নিজামীরটি হবে না কেন? মন্ত্রীর ক্রম অনুসারে তিনি নিজামীর অনেক নিচে।

এ প্রশ্নের জবাব কী দিতে পারবেন মি. খান? তার বক্তব্য লক্ষ্য করুন। জামা' আতুল মুজাহিদীন নয়, এখনো জানা যাচ্ছে না, বোমা হামলা কারা করেছে। আইজিপি কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, বোমা হামলায় জামা'আতুল মুজাহিদীনই জড়িত। (যুগান্তর ২১.০৮.০৫)

এদিকে চারদল অর্থাৎ জোটের বৈঠকে ইসলামী দলগুলোর নেতা জানান, 'জাম' আতুল মুজাহিদীনসহ আরো যে সংগঠনগুলোর বোমা হামলার সাথে জড়িত থাকার কথা বলা হচ্ছে তা সঠিক নয়। এরকম কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব আগে ছিল না, এখনো নেই। এই সংগঠনগুলোর ধারণার (ক্রিয়েটেড) জঙ্গিবাদী সংগঠন। একটি গোষ্ঠী বা সংগঠন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে।' তাহলে সরকার জামা' আতুল মুজাহিদীন নামে যে সংগঠনকে ২ বছর আগে নিষিদ্ধ করেছে তা কোন সংগঠন? যারা বোমা হামলা করেছে তারা বলছে তারা জামা'আতুল সদস্য। এরা বলছে না। উল্লেখ্য, জামা'আতুলের একটি বড় অংশ এসেছে জামাতে ইসলামী ও অন্য দলগুলো থেকে। উল্লেখ্য, এর আগে এরা ড. গালিবের বোমাবাজির নিন্দা জানিয়েছিল।

চারদলের অন্যতম নেতা, পান খেয়ে ঠোঁট লালকরা ফজলুল হক আমিনী পল্টন ময়দানে তালেবানি রাষ্ট্র ঘোষণা দেয়ায় বেগম জিয়া আগ্রহভরে তাকে জোটে নিয়েছিলেন। এতোদিন জামাতের বিরুদ্ধে কথা বললেও এখন তিনি বলছেন, জামাতের সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ নেই। তিনি বলছেন, মাদ্রাসা-মক্তবের দিকে যেন সরকার রোষকষায়িত লোচনে না দেখেন। তিনি বিমানবন্দরে কয়েক মাদ্রাসা ছাত্রকে গ্রেফতারের ব্যাপারে গোয়েন্দা ও পুলিশকে দায়ী করে বলেন, 'তাদের ছেড়ে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলগুলোর নেতাকর্মীকে ধরুন, তাহলে বোমা হামলার সমস্ত ঘটনা বেরিয়ে পড়বে।, (জনকণ্ঠ ২০.৮.০৫)। তারা নাকি টাঙ্গাইলের মিষ্টি কিনতে বিমানবন্দরে গিয়েছিল। টাঙ্গাইলের মিষ্টির দোকান সেখানে আছে এই প্রথম জানা গেল। জনসভায়

এরা বলছে, 'দেশব্যাপী বোমা হামলার ঘটনার দায়ভার ইসলামপন্থী দলগুলোর ওপর চাপানো হলে সরকারের জন্য বুমেরাং হবে।' (সংবাদ ২০.৮.০৫)। অর্থাৎ বেগম জিয়াকে সরাসরি হুমকি অথবা ব্লাকমেল। ২১ আগস্ট পর্যন্ত বক্তৃতা-বিবৃতি দেখে মনে হচ্ছে, সিদ্ধান্ত হবে যে, জামা'আতুলের কথা বলা হলেও এরা দোষী নয়, অন্য কেউ এদের দিয়ে হামলা করিয়েছে। সেই অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং দেশে প্রমাণিত হবে যে এই 'ইসলামী' দলগুলোই সাহসী। তারা কিছু একটা করার ক্ষমতা রাখে।

মূল বিষয় হচ্ছে, তথাকথিত এসব ইসলামী দলের নেতারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি। মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল ভারত। সেই থেকে তাদের আক্রোশ আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধে। ভারত হচ্ছে পরম শত্রু। অন্যদিকে জিয়াউর রহমান এদের রাজনীতিতে নিয়ে আসেন এবং সামরিক শাসকরা এদের ধারাবাহিকভাবে সহায়তা করে। কারণ সামরিক কর্মকর্তারা ছিলেন পাকিস্তান ফেরত। শুনেছি, এখনো সেনা প্রশিক্ষণে শত্রু হিসেবে ভারতকে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং তাদের সহানুভূতি পাকিদের প্রতি। এসব কিছুর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। যে কারণে বাংলাদেশে যেকোনো ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় 'র'- কে 'আইএসআই' কে নয়। অথচ এটা অজানা কোনো কথা নয় যে, দুটি এজেন্সিই নিজ স্বার্থে এখানে সক্রিয়। এভাবে এসব বাংলাদেশবিরোধী নেতা, সেনা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে অলিখিত এক ঐক্য গড়ে উঠে। যে কারণে এ ধরনের অপরাধীরা ধরা পড়ে না।

১৯৭১ সালে কৃষ্ণ শ্মশ্রুধারী নিজামী ছিলেন আলবদর বাহিনীর প্রধান। এই আলবদররা পাকিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অজস্র ধর্ষণ, লুট ও খুন করেছে। আমার শিক্ষকদের খুন করেছে আলবদররা। সেই সময় প্রতিদিন একবার ভারতকে গালিগালাজ করে অন্ন গ্রহণ করতেন। এখন শুভ্র শ্মশ্রুধারী নিজামীকে দেখে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমরা তো ইতিহাস ভুলতে পারি না। সুতরাং জানি নিজামীরা কী করবে। নিজামীরা মিথ্যে দিয়ে শুরু করবে। কোথায় ইসরাইল, কোথায় বাংলাদেশ। তাদের সমস্যা নিয়ে কূল নেই তারা বাংলাদেশে বোমা বিস্ফোরণ করাবে। কল্পনারও একটা দৌড় থাকে। এই নিজামী একসময় সংসদে বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা ঘোষণা কে করেন বা ঘোষক কে সে বিতর্কে জামাত জড়াতে চায় না। তবে একথা বলতে পারি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান' (আজকের কাগজ, ২৭.৭.৯২)। আরো বলেছিলেন, 'দেশে সন্ত্রাস বিস্তারে বিএনপি চ্যাম্পিয়ন' (বাংলার বাণী. ২৭.১০.৯৩) তাই নয়, 'এই সরকারের (অর্থাৎ বিএনপি) অধীনে ইসলাম তথা স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয় (ভোরের কাগজ ৭.৭.৯৪)। জামাত একবার বিবৃতি দিয়েছিল যে, নিজামী আলবদরের সঙ্গে জড়িত ছিল না। তথাকথিত দলগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য মিথ্যাচার, সুবিধা মতো স্থান পরিবর্তন। ধর্মের নামে তাদের এই মিথ্যাচার ও অপরাধীর পক্ষে সাফাই গাওয়া আমরা থামাতে পারব না। যদি আল্লাহ পারেন। আমাদের সান্ত্বনা কোরআনে আছে-'এদের আগে যারা এসেছিল

তারা মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাই তাদের ওপর শাস্তি কি কঠিন হয়েছিল (মুল্‌ক)।' কোরআনে আরো আছে,- আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টকর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী।' (আল-ই-ইমরান)।

এদের শক্তির প্রধান উৎস মাদ্রাসা। পশ্চাৎমুখী এই ব্যবস্থা কী তৈরী করেছে তা এখন পরিষ্কার। এদের রুটি-রোজগারের উৎসও তাই। মাদ্রাসা-মক্তব-মসজিদ এখন ধর্মের স্থানের বদলে ওদের কাছে বিশেষ স্বার্থের স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাকে বলা যেতে পারে 'ভেস্টেড ইন্টারেস্ট'। পাকিস্তানেও এমনটি হয়েছে। গত ২৫ বছর ক্ষমতার সঙ্গে থেকে তারা বিশাল বিত্তের মালিক। অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের মতে, তাদের বার্ষিক আয় ১২০০ কোটি টাকা। এ টাকা দিয়ে তারা এসব ক্যাডার পালন করে। এরা মাদ্রাসার ধজাধারী হলেও এদের পুত্র-কন্যারা কেউ মাদ্রাসায় পড়ে না। এদের মূল কাজ ইসলামী নয়, বরং অর্থ ও ক্ষমতা যা আরো অর্থ ও ক্ষমতা এনে দেবে।

বেগম জিয়া যুদ্ধাপরাধী ও এসব দলকে নিয়ে ক্ষমতায় গেছেন। সামরিক বাহিনী এতে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছে। কয়েকদিন আগে এক সামরিক অফিসার যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চেয়েছিলেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, ১৯৯৬ সালে বিএনপি যাতে জিতে সেজন্য তারা নির্যাতন চালিয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপি জেতেনি। সে কারণেই ২০০১-এর নির্বাচনে অত্যাচারের মাত্রা ১০০ গুণ করে বিএনপিকে ক্ষমতায় আনা হয়েছে। একথা কেউ আগে বিশ্বাস করেনি। এখন করছে। সেই নির্যাতনকারীকে আমেরিকা ছাড়তে হয়েছে। জোট গত ৪ বছর ধরে ধর্ষণ-লুট সমানে চালাচ্ছে। সরাসরি তারা জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিয়েছে যাতে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীদের শায়েস্তা করা যায়। এ কারণে তারা জঙ্গিদের মদদ দিয়েছে বিভিন্নভাবে। 'কয়েক বছরে পাঁচ শতাধিক জঙ্গি গ্রেফতার হলেও প্রশাসনের নমনীয় ভূমিকার সুযোগে বাংলা ভাইসহ জঙ্গিবাদের সমর্থকরা ছাড়া পেয়ে গেছে কারণ '১, মামলা সাজানো হয় দুর্বলভাবে, ২. নষ্ট করা হয় মামলার আলামত ৩. সরকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় নেই। ৪. ৬ বছরে পাঁচ শতাধিক গ্রেফতার ও মুক্ত।' (প্রথম আলো ২১.৮.০৫)। শুধু তাই নয়, পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তারা বলেছেন, 'জঙ্গি তৎপরতার খবরকে সরকার এতোদিন 'গণমাধ্যম'-এর অপপ্রচার কিংবা বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখে আসছিল। জোট সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও শরিক দলের নেতারা প্রকাশ্য বক্তৃতা-বিবৃতিতেও এসব কথা বলে আসছিলেন। ফলে পুলিশও জঙ্গিদের ব্যাপারে জোরালো কোনা পদক্ষেপ নিতে সাহস পায়নি। এখন কি অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে?

সরকারী নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি পড়ে কী মনে হয়? পত্রিকার খবর অনুযায়ী, 'সারা দেশে একযোগে নজিরবিহীন বোমা হামলার তদন্ত কাজ ভিন্ন খাতে ঘুরিয়ে দেয়া হচ্ছে। স্তিমিত হয়ে পড়ছে। হামলার ঘটনার প্রধান সন্দেহভাজন ইসলামী জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদীনের সদস্যদের গ্রেফতার অভিযান।' (জনকণ্ঠ ২০.৮.০৫)। ইতোমধ্যে পার্বতীপুরে ২ জামাত কর্মীকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও একই ঘটনা ঘটেছে। নিজামী দাবি করেছেন টুপি দাড়িঅলা কাউকে ধরা যাবে না। তারা বোমা

মারলেও। আমার এক বন্ধু জানালেন এক কর্মকর্তা তাকে জানিয়েছে, আমাদের অর্ডার পেয়ে গেছি। জঙ্গিদের আর ধরা যাবে না। ধরতে হলে অন্যদের ধরা হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাভাইয়ের কথা মনে পড়ছে। বাংলাভাই যখন উত্তরাঞ্চলে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করছিল তখন নিজামী-আমিনীরা বলেছিল, বাংলাভাই মিডিয়ার সৃষ্টি। বেগম জিয়া বাংলাভাইকে গ্রেফতারের হুকুম দিলেন বারবার। যে প্রধানমন্ত্রীর পদভারে বাংলাদেশ কাঁপে থরথর করে তিনি এতোবার হুকুম দিলেও বাংলাভাইকে কেন ধরা হয় না? এর অর্থ, তিনি বলার জন্য বলেন যা ইতোমধ্যে প্রমাণিত। অথবা তিনি এক পুতুল সরকারের প্রধান। এখন একটাই সমস্যা, দেশে যে জঙ্গি নেই তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

আগেই উল্লেখ করেছি, দেশে এখন একটি প্রচলিত মত, জোট প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীকে ডেকে আনবে। এটি জোটের বক্তব্য নয়। হাওয়ায় ভেসে আসা কথা। তবে, হাওয়াই কথারও যেন খানিকটা ভিত্তি আছে বলে মনে হয়।

হাইকোর্ট পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার পর, মধ্যরাতে বিচারকের ঘুম ভাঙিয়ে সরকার সে রায় স্থগিত করিয়েছিল। যদি জোট সামরিক বাহিনীর পক্ষে অর্থাৎ সামরিক শাসনের বিপক্ষে, তাহলে এতো চিন্তিত কেন? পঞ্চম সংশোধনী ছিল সামরিক বাহিনীর অপকীর্তিগুলো ঢাকা দেয়ার রক্ষাকবচ। শুধু তাই নয়, পরদিন দেখা গেল, এসবির লোক রায় দেয়া বিচারককে এজলাস থেকে নামিয়ে এনেছে। রোকনউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, বিকেলে আদালত ত্যাগ করার সময় তিনি র‍্যাবের গাড়ি দেখেছেন আদালতে। এ ধরনের অভূতপূর্ব ঘটনা পাকিস্তানী আমলেও ঘটেনি এবং প্রত্যেকটি ঘটনা একই যোগসূত্রে গাথা কি না তাই বা কে জানে?

একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। উপমহাদেশের যে কোনো দেশে যে কোনো ধরনের জঙ্গিবাদ অন্য দেশে অভিঘাত সৃষ্টি করবে। রাজনীতিবিদদের অঙ্ক অন্য রকম। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার সিভিল সমাজ এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হলে কয়েক জেনারেশনকে এর মাশুল দিতে হবে। ভারত ইতোমধ্যে বলেছে, সেক্যুলার ও গণতান্ত্রিক দেশ না হলে অগ্রগতি সম্ভব না। পাকিস্তানে মোশাররফও মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করেছেন। বাংলাদেশী পাকিরাতো সেটিও অনুসরণ করতে পারেন। পাকিস্তানের মতো দুর্বৃত্ত দেশ যা বুঝেছে বাংলাদেশ তা বুঝছে না। এখানকার বর্তমান নীতিনির্ধারকরা কী জিনিস এতেই বোঝা যায়। এটা স্পষ্ট যদিও তার প্রশ্রয়দাতারা উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব চায় না এবং মুসলমান ছাড়া কাউকে তারা মানতে রাজি নয়। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে নিজামী-আমিনী, তারা সার্ক সম্মেলন চাচ্ছেন না। ভারতকে বোমা হামলার জন্য দায়ী এর উদাহরণ। ভারত যতোক্ষণ বিষয়টি পরিষ্কার না করবে বা বাংলাদেশের কাছে এর প্রমাণ না দাবি করবে ততোদিন মন্ত্রী নিজামীর বক্তব্যই সত্য থাকবে। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রশ্রয় দক্ষিণ এশিয়ার জন্য বিপজ্জনক কি না তা অন্য দেশগুলোর বিবেচনা করতে হবে। আমাদেরও সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ ধরনের ধর্ম ব্যবসায়ী, টাউট,

খুনি, মিথ্যাবাদী, প্রতারকদের হাতে জিম্মি থাকব কি না। বেগম জিয়া এতে আনন্দ পেতে পারেন, আমরা পুলকিত কি না তাও অনুধাবন করার সময় এসেছে।

ওরা আসছে, জোট এখন নিন্দিত। তাদের সেকেন্ড ফ্রন্ট হিসেবে গড়ে তোলা বাংলাভাই. শাইখরা আসছে। বাংলাদেশ আর থাকবে না। আমরা যারা বাংলাদেশে থাকতে চাই, যারা সেনা, গোয়েন্দা ও জোটের নীতিনির্ধারকদের দুর্বৃত্তায়ন থেকে বাঁচতে চাই. তারা তাদের রাজনৈতিক সূক্ষ্ম হিসাব বাদ দিন। একাট্টা হয়ে কর্মসূচী দিন। কাঁদুনি না গেয়ে রাস্তায় আসুন। লোকের অভাব হবে না। না হলে এর দায়-দায়িত্ব আপনাদের ওপরও বর্তাবে।

জুলাই, ২০০৫

অন্ধদের দিয়ে বাংলাদেশের উন্নতি হবে না

ধর্মের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের শ্রদ্ধাভক্তি করা আমাদের ঐতিহ্য। ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের (পেশার) সঙ্গে যুক্ত তাদের পোশাক-আশাকও আলাদা। তিনি স্বল্প শিক্ষিত হন বা উচ্চ শিক্ষিত হন, তাতে কিছু আসে যায় না। তাদের আমরা 'হুজুর' বলে সম্বোধন করি। এই সম্বোধনই প্রমাণ করে সমাজে তাদের আলাদা মর্যাদা। তারা যদি এই মর্যাদা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন, তাহলে বলার কিছু ছিলো না। কিন্তু এই মর্যাদা ব্যবহার করে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হতে চান, আপত্তি এখানেই। এদের অধিকাংশই মাদ্রাসাশিক্ষিত। আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামো দু'শ বছর পেছনে পড়ে আছ। যারা এতে পড়ে বেরুচ্ছেন, তাদের অধিকাংশের চিন্তা-ভাবনা একরৈখিক, মধ্যযুগীয়, সংস্কারে ভরা। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত। তাদের ওপর 'হুজুর'দের প্রভাব যথেষ্ট। ফলে অন্ধ মানুষ আর আলোকিত হচ্ছে না। আর তারা চায় মানুষ অন্ধই থাকুক, কারণ অন্ধদের চালনা করা সহজ। এ মাদ্রাসাগুলো এখন আবার ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এদের নেতাদের এক ধরনের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা যুগোপযোগী করতেও তারা বাধা দিচ্ছেন।

আগেই উল্লেখ করেছি, ধর্মের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের শ্রদ্ধাভক্তি করা আমাদের ঐতিহ্য। অবশ্য সব দেশের মানুষই যারা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, তাদের শ্রদ্ধাভক্তি করেন। আমাদের এখানে ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিলো ভালোবাসা থেকে, যখন সুফি সাধকরা এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালক্রমে ধর্মের বিভিন্ন তরিকা নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছে। এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে ক্ষমতার রাজনীতি। ফলে আগের সেই পটভূমি আর নেই। তাই এসব বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে।

ঐতিহ্য অনুযায়ী, যারা ধর্মীয় পেশার সঙ্গে যুক্ত, আমরা তাদের 'আলেম, ওলামা-মাশায়েখ' হিসেবে অভিহিত করি। মিডিয়ার যত্রতত্র এই বিশেষণ ব্যবহারের ফলে তা গুরুত্ব পেয়েছে। এখন সত্যিকার আলেম, ধর্মব্যবসায়ী, মৌলবাদী (যারা ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী) সবাইকে আমরা 'ওলামা-মাশায়েখ' নামে অভিহিত করি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ধর্মব্যবসায়ী ও সত্যিকারের আলেমদের মধ্যে পার্থক্য টানা উচিত। যারা সত্যিকারের আলেম বা জ্ঞানী, তারা ধর্মের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের উন্নতি ও কল্যাণের চেষ্টা করে থাকেন। বিশ্লেষণ করলে দেখবেন, তারা সহজ-সরল জীবন-যাপনে বিশ্বাসী এবং রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে কখনো মাথা ঘামান না।

এ কথাগুলো মনে হলো দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি খবর

দেখে। খবরের শিরোনাম 'জামায়াতকে নিয়ে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে নতুন করে বির্তক' (৮.৭.০৫)। খবর অনুযায়ী, 'জামাতে ইসলামীকে কেন্দ্র করে দেশের ইসলামপন্থী দলগুলোর মধ্যে নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। এসব দল পরস্পরের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি যেমন অব্যাহত রেখেছে, তেমনি দেশের মাদ্রাসা শিক্ষকদের একক বৃহত্তম সংগঠন জমিয়াতুল মোদাররেছিনও বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই প্রথমবারের মতো পৃথক দুটি সংগঠনের জন্ম হয়েছে। ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সম্প্রতি শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখগণ সাক্ষাৎ করেছেন। জামায়াত সমর্থক আলেমগণ এই সাক্ষাতের সুযোগ পাননি। আবার শিক্ষামন্ত্রী একপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করলেও প্রতিমন্ত্রী গেছেন আরেকপক্ষের বৈঠকে। রাজনৈতিক অঙ্গনে তো বটেই, এ ঘটনাপ্রবাহ দেশের সচেতন মানুষের মধ্যেও কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে।

এই বাক্যগুলোই বলে দেয় যাদের এখানে 'ওলামা-মাশায়েখ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, এরা ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এদের একজন দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

সাঈদী জড়িত জামাতের রাজনীতির সঙ্গে। জামায়াত মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলো। লুট, খুন, ধর্ষণে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো, যে কারণে ১৯৭২ সালে জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৫-এর পর জেনারেল জিয়াউর রহমান জামায়াতকে শুধু রাজনীতির সুযোগ দেননি, পরিচর্যাও করেন। পরবর্তীকালে গণবিরোধী সামরিক সরকার ও দলগুলো এদের পরিচর্যা অব্যাহত রাখে। আওয়ামী লীগ নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। পরিচর্যার ফলে জামায়াত এখন ক্ষমতায়। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি জামায়াতকে সঙ্গী করে নেয়, এস্টাবলিশমেন্ট জামাতের অনেককে এমপি হতে সাহায্য করে। জামাতের দুজনকে মন্ত্রী করে বাংলাদেশের কলঙ্কজনক অধ্যায়ের শুরু করেন বেগম জিয়া। রাষ্ট্রক্ষমতার স্বাদ পেয়ে তারা ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের অবস্থান সংহত করে প্রাধান্য বিস্তার করছে। তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে। তারা বাংলাদেশের মুসলমানদের সোল এজেন্ট হিসেবে স্থান করে নিতে চায়। আর বিরোধ বাধছে সেখানে।

বাংলাদেশে যারা বসবাস করেন, তারা সাঈদীর উত্থানের খবরাখবর জানেন। সামান্য রাজাকার থেকে তিনি আজ শুধু সংসদ সদস্যই নন, অশ্লীল ওয়াজদাতা হিসেবেও 'খ্যাতি' অর্জন করেছেন। তার নামের আগে এখন 'আল্লামা' শব্দটিও তিনি ব্যবহার করছেন। দুঃখজনক যে, মিডিয়াও মাঝে মাঝে এই শব্দটি ব্যবহার করে।

ইত্তেফাক আরো যেসব 'ওলামা-মাশায়েখে'র কথা আলোচনা করেছে তারা হলেন- আজিজুল হক, ফজলুল হক আমিনি ও মুহিউদ্দিন খান। নির্বাচনের আগে বিএনপি যে জোট গঠন করে, তাতে শরিক ছিলো ইসলামী ঐক্যজোট। এরা ছিলেন তার নেতা। এখন তারা বিভক্ত। উল্লেখ্য এরা সবাই নারী নেতৃত্বের বিরোধিতা করলেও বেগম জিয়ার আঁচলের তলে একত্রিত হয়েছেন। বেগম জিয়া জোট গঠন করলেও শরিক দলের নেতা

হিসেবে এদের তেমন পাত্তা দেননি। এ নিয়ে তাদের ক্ষোভ আছে। আমিনী একবার শ্লোগান দিয়েছিলেন-'আমরা হবো তালিবান, বাংলা হবে আফগান'। এদেরও লক্ষ্য ক্ষমতার সক্রিয় অংশীদার হওয়া।

আলবদর হিসেবে খ্যাত আবদুল মান্নানকে জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত করেন, এরশাদ মন্ত্রী করেন। এ সময় মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে তিনি গঠন করেন 'জমিয়াতুল মোদাররেছিন'। সংগঠনের সদস্যদের অর্থ দিয়ে তিনি প্রকাশ করেন দৈনিক ইনকিলাব। এর মালিকানাও তিনি নিয়ে নেন। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বঞ্চিত করে। বাংলাদেশে অপসাংবাদিকতা শুরু দৈনিক ইনকিলাবের মাধ্যমে। আবদুল মান্নান সবসময় সামরিক শাসকদের সমর্থন করেছেন। আবদুল মান্নান এখন অসুস্থ। সংগঠনের ভার গ্রহণ করেছেন তার পুত্র বাহাউদ্দিন, যিনি ইনকিলাবের সম্পাদকও।

প্রান্তিক পর্যায়েও 'হুজুর' হিসেবে এই সংগঠনের সদস্যরা প্রভাব বিস্তার করেন। সুতরাং শাসকদের কাছে এদের গুরুত্ব অনেক। জামায়াত-বিএনপির মধ্যে এখন শীতল যুদ্ধ চলছে। জামায়াত নিজেকে শক্তিশালী হিসেবে প্রমাণ করতে চাইছে, যাতে বিএনপি তাদের ত্যাগ না করে। নিজেদের আরো শক্তিশালী করার জন্য তারা জমিয়াতুল মোদাররেছিনের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। সম্প্রতি দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নেতৃত্বে সংগঠনটি বিভক্ত হয়ে গেছে। 'মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ' নামে জামায়াতপন্থী মাদ্রাসা শিক্ষকদের নতুন সংগঠন জন্ম নিয়েছে।

বিরোধের সূত্রপাত এখানে। আবদুল মান্নানের কোনো পুত্রই মাদ্রাসায় পড়েননি, কিন্তু রাজনীতি করছেন তারা মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে। বাহাউদ্দিন টুপি মাথায় দিয়ে মোদাররেছিনের বাকি সদস্যদের নিয়ে সম্মেলন করছেন। তাকে সমর্থন দিচ্ছেন ঐক্যজোটের প্রার্থীরা। তারা আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চান। বাংলাদেশে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান তাদের দরকার রাজনীতি করার জন্য। এ সংঘাত কতোদূর যাবে কে জানে।

লক্ষণীয়, এ দলগুলো তখনই সতেজ হয়ে ওঠে, যখন তারা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পায়। বর্তমান সরকারের আমলে এরা শুধু প্রভাবশালীই নয়, জঙ্গিবাদ বিকাশের পেছনেও মদদ দিচ্ছে। বাংলাদেশের অসংখ্য সহিংস ঘটনার সঙ্গে এরা যুক্ত। বেগম জিয়া এখন জামাতের মাদ্রাসা সংগঠনের বিরুদ্ধে ঐক্যজোটের 'ওলামা-মাশায়েখ'দের সমর্থন করছেন। এদের অর্থের সূত্র কেউ জানে না। এরা ইনকাম ট্যাক্স দেয় কি-না, সে নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিলো। এদের একমাত্র লক্ষ্য কীভাবে শাসকদের অংশীদার হওয়া যায়। এই যখন তাদের মৌল বৈশিষ্ট্য, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে ধর্মকর্ম নিয়ে তারা এমন ভাবেন কখন? সত্যিকার ওলামা-মাশায়েখ হলে কি তারা ধর্ম নিয়ে এমন রাজনীতি করতে পারতেন? যাদের তারা সমর্থন করেন, তাদের আমরা 'হুজুর' বলি কীভাবে? তাদের অনেকেই নানা অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত, বিশেষ করে আবদুল মান্নান। তাকে যারা সমর্থন করেন, তারা ইসলামের খেদমতগার হন কীভাবে?

ধর্ম নিয়ে আমাদের বিরোধ নেই। আমরা চাই বাংলাদেশে সেই ইসলাম (যা আসল

ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত হোক, যার মূল বাণী সত্য, সুন্দর ও শান্তি। এরা যে ক্ষমতায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান, তার মূল বাণী অসত্য, অসুন্দর ও অশান্তি। ইসলামের নেতা তো আলবদর হতে পারেন না যা ছিলেন নিজামী, মান্নান প্রমুখ। আজ তাদের কারণে বাংলাদেশ পরিচিত হয়ে উঠছে মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে, যে কারণে বাংলাদেশের তরুণদের বিদেশ যাওয়া ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এদের মধ্যে যে বিরোধ, তা ইসলামের কোনো সূত্র নিয়ে নয়, ক্ষমতা নিয়ে। বিএনপি এদের সবসময় মদদ দেবে। এদের আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান না করলে বাংলাদেশের সত্যিকার আলেম-মাশায়েখগণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বেন। এরা সক্রিয় থাকলে বাংলাদেশের মানুষ আরো অন্ধ হয়ে পড়বে। অন্ধদের দিয়ে আর যা হোক বাংলাদেশের উন্নতি হবে না। মিডিয়ারও উচিত এদের 'আল্লামা', 'মাশায়েখ' না বলে যারা ধার্মিক, তাদের কথা তুলে ধরা এবং এদের প্রতিরোধের পথ প্রশস্ত করা।

১১.০৭.০৫

সাকাচৌ'র বিশাল গোস্‌সা

সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী ওরফে সাকাচৌ কয়েক মাস অন্তর অন্তর প্রচার মাধ্যমে আসতে চান। হয়তো পড়েছিলেন, না, পড়াশোনা না করলেই এদেশে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হয়। হয়তো শুনেছিলেন একজন রাজনীতিবিদ বলেছিলেন, প্রচারে থাকতে চাই, সেটা পক্ষে না বিপক্ষে, তা বড় কথা নয়। সাকাচৌ প্রচারে থাকতে চান। তবে তার পেছনে কখনও কখনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও থাকে। মিডিয়ায় জোটের কর্মকাণ্ডের জন্য যখন নেতারা চাপে থাকেন তখন সাকাচৌ বা সে ধরনের কেউ এমন অশালীন উক্তি করেন, যাতে মিডিয়া ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তা নিয়ে মেতে থাকে। মূল ইস্যু আড়ালে চলে যায়। সাকাচৌ শালীন ভাষায় কথা বলতে পারেন না। আমাদের দেশে এখনও একটা কথা আছে। বিয়ের আগে মুরব্বিরা বলেন, গরিব হলেও চলবে, খানদান ভাল হতে হবে। একজনের আচার-আচরণ বুঝিয়ে দেয় তার খানদান কেমন! সাকাচৌর আচরণ বুঝিয়ে দেয় কেমন পরিবার থেকে তিনি এসেছেন। তবে শুধু পরিবার নয়, সাকাচৌ'র এ ধরনের কথাবার্তার পেছনে কাজ করে গোস্‌সা, ভীষণ গোস্‌সা। কেন পাকিস্তান ভাঙল? এই পাকিস্তানের জন্য সাকাচৌ ও সাকাচৌর বাবা কী করেননি। ১৯৭১-এ খুনের দায়ে সাকাচৌর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, তাকে যুদ্ধাপরাধী বলা হয়, যে কারণে পাকি সমর্থকের পরও তিনি ওআইসিতে ভোট পাননি। কিন্তু তাকে বাংলাদেশে থাকতে হচ্ছে, থাকতে হচ্ছে, কারণ এখানে রাজনীতিবিদরা তাকে যেমন প্রশ্রয় দেন অন্য দেশে তা পারেন না, যে সম্পদ তিনি অর্জন করেছেন তাদের দোয়ায় তা বিদেশে হতো না। আসলে জিয়াউর রহমান না থাকলে নিঃস্ব ও ভবঘুরে অবস্থায় তাকে বিদেশে কাটাতে হতো। ভাগ্যিস হাইকোর্ট বর্ণিত অবৈধ দখলদার জিয়াউর রহমান ও এরশাদ ছিলেন। ভাগ্যিস জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনী করেছিলেন। সাকাচৌরা বহাল তবিয়তে রয়ে গেলেন বাংলাদেশে, সৃষ্টি করলেন এক ভায়োলেন্ট সমাজ, যেখানে তারাই থাকবেন অধিপতি।

বাংলাদেশ, বাঙালি, যা শুভ তার বিরুদ্ধে সাকাচৌ। এরই মধ্যে তিনি অনেকের বিরুদ্ধে, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্তর্গত, অশালীন মন্তব্য করেছেন। এরপর করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে। আমি তার মন্তব্যের কারণে এ লেখা লিখতে বসিনি, লিখছি এর অন্য প্রাসঙ্গিকতা দেখে। এতে বোঝা যাবে, আমরা যাকে এলিট সমাজ বলি, তাদের সদস্যারা কেমন, রাজনীতির বিষয় কী ইত্যাদি।

ঘটনাটি হল, সাবেক জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম চট্টগ্রামে ডাক্তার তৈরির একটি বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছেন, যার নাম সংক্ষেপে ইউএসটিসি। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন

গণ্ডগোল চলছে। কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধি দল সাকাচৌ'র সঙ্গে দেখা করে। কারণ? তাদের হয়তো মনে হয়েছে, বহিষ্কৃতদের পেছনে আছেন সাকাচৌ এবং ডা. ইসলাম যেহেতু সে পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল, সুতরাং সমস্যার অবসান হবে। সাকাচৌ তাদের যা বলেছেন তার নির্যাস হল-১. বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে প্রথম দুটি শব্দ বাদ দিতে হবে, কারণ 'বঙ্গবন্ধুর নাম কবরে দেয়ার জন্য আমি বেঁচে আছি'। (যুগান্তর. ১.৯.০৫) ২. ডা. ইসলাম বেশি ঝামেলা করলে তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। ৩. বহিস্কৃত ছাত্রদের বহিস্কারাদেশ বাতিল না করলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলতে থাকবে।

এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রপত্রিকায় বিবৃতি এবং মিছিল-বক্তৃতা শুরু হয়েছে। অনেকে ডা. ইসলামের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চাইছেন। আমি জানি না মিটিং-মিছিল থেকে যাকে 'বেয়াদব' বলা হচ্ছে তাকে শায়েস্তা করতে জানে না রাজনৈতিক কর্মীরা? আফতাবকেও বেয়াদব বলা হতো। তার অবস্থা এখন কী? অন্যদিকে ডা. ইসলাম কোনভাবেই আমাদের সহানুভূতি পেতে পারেন না। কেন নয়, সেটি পরে বলছি।

সাকাচৌ'র বক্তব্যে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশ পাকিস্তান হচ্ছে না, এখনও বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলা যাচ্ছে না, তার গোস্সা হবেই। তাছাড়া তার পুরো রাজনীতি এবং তিনি যে দল করেন তার রাজনীতির মূল বিষয়ই তো তা। অবৈধ উৎখাতকারী ও তার ল্যাংগুটদের দর্শন যদি এটি না হতো এবং হলেই বিস্মিত হতে হতো।

তার আগে দেখা দরকার সাকাচৌ এমন কথা বলার সাহস রাখেন কীভাবে? কেনইবা রাজনীতিবিদরা দু'একদিন তার বক্তব্যের বিরোধিতা করে চুপ করে থাকেন? বেগম জিয়া সম্পর্কে ২০০১-এর নির্বাচনের আগে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, আমি জোটের দর্শনের বিরোধী সত্ত্বেও সে মন্তব্য করব না। এরপর সাকাচৌ বিএনপির টিকিটে এমপি হয়ে উপদেষ্টা হয়েছেন। বেগম জিয়ার সঙ্গে বাতচিত করেছেন। আমাদের রাজনীতিবিদদের নির্লজ্জতার এটি একটি প্রমাণ। অনেকে বলেন, রাজনীতিতে শেষ কথা নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি তা সুবিধাবাদী রাজনীতির কথা। আর রাজনীতির লজ্জা-শরম থাকবে না, এটি কেমন কথা? তাহলে তরুণদের আমরা কী মেসেজ দিচ্ছি? এখানেই শেষ নয়। সাকাচৌ পর্নোগ্রাফির ভাষায় শেখ হাসিনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তখন আওয়ামী লীগ শুধু নয়, সিভিল সমাজের অনেকেই এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তারপর দেখা গেল, ছেলের বিয়ের দাওয়াত দেয়ার জন্য তিনি শেখ হাসিনার গৃহে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন এবং শেখ হাসিনা তাকে সাক্ষাৎ দিয়েছেন। যারা সাকাচৌর উক্তিতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাদের অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? প্রধান দু'দলের এবং অনেক বাম নেতার সঙ্গে নাকি সাকাচৌর ওঠাবসা ছিল। এখনও আছে কিনা জানি না। সাকাচৌ কি খুব শক্তিশালী? তার দেদার অর্থ আছে, অনুচর আছে এবং এখানে রাজনীতি যেহেতু অর্থ ও পেশিচালিত, সে কারণে তাকে শক্তিশালী পুরুষ বলেই অনেকে মনে করেন। কিন্তু শেখ হাসিনার আমলের শেষ পর্যায়ে যখন খুনের দায়ে সাকাচৌকে গ্রেফতার করে থানা

হাজতে রাখা হল তখন তার ভেউ ভেউ করে কান্নার ছবি কি কাগজে ছাপা হয়নি? তখন কেউ তাকে রক্ষায় এগিয়ে আসেনি বটে, কিন্তু তখনকার নীতিনির্ধারকরা কী কারণে যেন তাকে ছেড়ে দেন। সুতরাং শক্তিশালী নন তিনি, ওই অর্থে কিন্তু শক্তিশালীদের ওপর দয়ায় দাড়িয়ে আছেন। তাদের তিনি বাপ-মা তুলে গালাগাল দেন এবং তাদের গোসসা হয় না, তারা তাকে প্রশ্রয় দেন। এই নার্ভাসনেসের কারণ আমাদের জানা নেই।

এবার ডা. নুরুল ইসলাম প্রসঙ্গ। শোনা যায়, মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য অনেকের কাছ থেকে তিনি বিশাল অনুদান পেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য। এই অর্থ নিয়ে অনেক কথা চালু আছে, যা একেবারে অর্থহীন নয়। সেসব বিষয়ে আমি যাব না। সবাই আশাবাদী ছিল তার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে। ভাল হতো তিনি যদি তরুণ কাউকে বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর ভার দিতেন, দেননি। অশীতিপর ডা. ইসলাম উপাচার্য হলেন। সেই থেকে ইউএসটিসিতে ঝামেলা হচ্ছে এবং পারতপক্ষে কেউ সেখানে ভর্তি হতে চায় না। বিদেশী ছাত্ররাও চলে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনার আমলে তিনি আত্মজীবনী লেখেন। সেখানে তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তারপর সে বই পৌঁছে দিয়েছেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। এরপর জাতীয় অধ্যাপক হয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের নামকরণ করেছেন বঙ্গবন্ধুর নামে।

প্রায় একই সময়ে বা তার খানিক আগে তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য। সেখানে সাকাচৌর বাবা ফজলুল কাদের চৌধুরী ওরফে ফকাচৌর ওপর শোক প্রস্তাব তুলে ঘন্টা কয়েক লড়াই করেছেন সে প্রস্তাব পাস করার জন্য। সেজন্যই তিনি আশা করেছিলেন সাকাচৌ তাকে সমর্থন করবেন।

শেখ হাসিনার সময় শেষ হল। চট্টগ্রামে ১৯৭১ সালের বৃহৎ বধ্যভূমি পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা নিলেন। সে জায়গায় স্থাপন করলেন 'শহীদ জিয়াউর রহমান'-এর নামে আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। ওই সময় প্রজন্ম '৭১-এর সভাপতি ও শহীদ সন্তান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান গাজী সালাহউদ্দিন এর প্রতিবাদ করেন, এলিট সমাজের দ্বারে দ্বারে ঘোরেন, যাতে বধ্যভূমিতে স্থাপনা না করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের এলিট সমাজ তাকে সহানুভূতি জানায়নি। অধ্যাপক সালাহউদ্দিনকে বরং কর্তৃপক্ষ থেকে ভাল রকমের একটা টোপ দেয়া হয়েছিল। শহীদের সন্তান সেই টোপ গেলেন কীভাবে? উদাহরণ দিলাম এ কারণে যে, আমরা কী বলি আর কী করি। আমরা কাদের সম্মান করি? বা শ্রদ্ধা জানানোর লোক কি আর আছে সমাজে? আমরা কোথায় নেমে যাচ্ছি, তা বোঝানোর জন্যই এই উদাহরণ দিলাম।

সুতরাং সাকাচৌ'র বক্তব্যের প্রতিবাদ করবেন, তা ডা. ইসলামের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করবেন না? আগেই বলেছি, সাকাচৌ কিছু না ভেবে এ উক্তি করেন নি। চাটগাঁয় বিএনপি নেতা জামালউদ্দিনের হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। হত্যার দায় যারা স্বীকার করেছে তারা বলছে, বিএনপি এমপির ভাই হত্যার জন্য টাকা ও

নির্দেশ দিয়েছে। র‍্যাব বলছে, বিষয়টি অস্বচ্ছ। তাই তারা নিশ্চিত নয় এমপির ভাই-ই জড়িত কিনা। অথচ ক্রসফায়ারের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত।। অন্যদিকে মৌলবাদী সরকারের প্রশ্রয়ের কারণে বোমাবাজিতে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ছায়া ও ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী তারেক জিয়া বলছেন, বোমাবাজদের সঙ্গে আল কায়দার সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। পরে তিনি তা অস্বীকার করেছেন। এ বিষয়টি এতদিন সরকার অস্বীকার করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, সর্বহারা ও জেএমবি একত্রে এ কাজ করছে। জোটের দিশেহারা অবস্থা সবার চোখে পড়ছে। মিডিয়াও পরম উৎসাহে এসব তুলে ধরছে। সাকাচৌ এ সময় এ উক্তি করলেন যাতে হৈচৈটা তাকে নিয়ে হয়। হয়েছেও, তবে জোট প্রতিদিন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে তাতে সাকাচৌ আগের মতো সুবিধা করতে পারেনি। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে জোট নেতাদের দারুণ গোস্‌সা। কেন তারা তাদের 'ম্যান্ডেট' দিয়েছিল—এটাই কারণ।

খবরের কাগজে প্রতিদিন দেখছি বিশাল কোম্পানি থেকে ক্ষুদ্র কোম্পানি-সব মালিকরা খাবারে বিষ মেশাচ্ছে, ভেজাল মেশাচ্ছে; একটি জাতিকে হত্যা করছে। এই নিঃশব্দ হত্যাকারীদের কয়েক টাকা জরিমানা করা হচ্ছে মাত্র। স্বয়ং আইনমন্ত্রী ফাঁসির আসামিকে মুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেন। গোয়েন্দারা হাইকোর্টের আসন থেকে বিচারপতিকে নামিয়ে আনে। নিত্যদিনের লুট, ধর্ষণ, হত্যার কথা বাদই দিলাম। সরকারি আইনি বাহিনী নিত্য সন্ত্রাস করছে। একবার ভেবে দেখুন, রাজনীতি কোথায় চলে গেছে, আমরা কত অমানুষ ও নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছি। এই দেশটির পরিণতি কী, তাও বোঝা যাচ্ছে।

তারপরও মানুষ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকে, আন্দোলনে আসে না কেন? এ ক্ষোভ আমাদের অনেকের। কারণ, সেই আস্থার অভাব। সাকাচৌদের তারা চেনে। মান্নান ভুঁইয়ার মতো যাদের প্রতি অনেকের মোহ ছিল তারাও মান্নান ভুঁইয়াদের এখন হাড়ে হাড়ে চেনে। আগস্ট মাসে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের বিশাল শোকসভা হল। সেখানে বিশিষ্ট বক্তা ডা. নুরুল ইসলাম। মানুষ এতে কী সিগনাল পায়? আমরা এ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গবন্ধু বা তার সময়কালকে বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় যদি সামান্য সমালোচনা করি তখন শীর্ষস্থানীয় নেতারা ক্রোধে বাকরহিত হয়ে যান। আর বধ্যভূমিতে (আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী) জিয়াউর রহমানের নামে (যাকে আওয়ামী লীগ মনে করে অবৈধ উৎপাতকারী) হাসপাতাল যিনি করেন তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় শোক দিবসে বক্তৃতা দিতে। আওয়ামী লীগের কেন বিশাল গোস্‌সা হয় না? তাদের না হলে আমাদের মতো দর্শকদের গোস্‌সা হবে কী করে? সাকাচৌ এত দারুণ গোস্‌সায় ফেটে পড়েন, প্রতিপক্ষের কেন তার চেয়ে তীব্রতর গোস্‌সা হয় না? আমরা কি সব বিশ্বাসের জায়গাগুলো নষ্ট করে ফেলছি? এ নিয়ে কি আমাদের ভাবার সময় এসেছে?

জঙ্গিরা এ দেশে থাকবে

মিডিয়া এখনও ক্লান্ত হয় নি। ইসলামী জঙ্গিদের খবর নিত্য বেরুচ্ছে। মাঝে মাঝে হেড লাইন হয়ে, টিভিতেও আসছে। জোট সরকার যাকে বলে গ্যাঁড়াকলে পড়েছে। একসঙ্গে ৫০০ বোমা ফাটানোর ব্যাপারটা বেশি বেশি হয়ে গেছে। জোট যে এদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সেটা দেখতে হচ্ছে। বাইরের পৃথিবী আর যাই হোক, এখন জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে। সরকার এখন এ ধারণাই সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, তারা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে খুবই তৎপর। জোট সরকার গত চার বছরে দেশের যে ভয়ঙ্কর ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছে, তা থেকে বেরুতে হলে খানিকটা তৎপরতা দেখাতেই হয়। এরই সূত্র ধরে তারা দুই জঙ্গি নেতা শায়খ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আপনারা ভাবছেন, সরকার খুবই সিরিয়াস, হা হা হা। লিখেছিলাম, যা মানতে অনেকে অরাজি যে, এ দেশের ৪০ ভাগ লোক এখন জঙ্গিবাদের সমর্থক। এ ধরনের মন্তব্য অনেকের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। রাজনৈতিক নেতারা প্রায়ই বলেছেন, জঙ্গিবাদ এখানে সমস্যা নয়, দেশের লোক ধর্মান্ধ নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই যদি হয়, তাহলে আর পুরস্কার ঘোষণা কেন, আর ফরহাদ মজহারও কেন জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে বলবেন মুক্তিযোদ্ধারাও সন্ত্রাসী। যেমন, এ রকম বলেন বায়তুল মোকারমের খতিব,মুক্তিযোদ্ধরা গাদ্দার। জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে গত এক দশক ধরে। গত পাঁচ বছরে এ প্রশ্রয় পৃষ্ঠপোষকতায় রূপ নিয়েছে। মৌলবাদী দল, রাজনৈতিক নেতা, কিছু পত্র-পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবি এবং প্রশাসনের সাহায্যে জঙ্গিবাদের বিকাশ ঘটানো হয়েছে। সে কারণে বাংলাদেশে মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের প্রতি সমর্থন আছে, থাকবে এবং যে সরকারই আসুক, তারা ও মানুষ যদি জঙ্গিবাদের বিপক্ষে শূন্য সহিষ্ণুতা বা জিরো টলারেন্স না দেখায় তাহলে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই।

বলতে চাই, জঙ্গিবাদ নিয়ে যা চলছে এ দেশে তা একেবারে ভাঁওতাবাজি। জঙ্গিবাদের বিকাশের সময় থেকে কিছু পত্রপত্রিকা বাদে অধিকাংশ পত্রপত্রিকা এদের খবর তুলে ধরেছে এবং এর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে লেখালেখিও হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এর গুরুত্ব দেননি। বলেছেন, এগুলো মিডিয়ার অতিরঞ্জন। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, প্রান্তিক দুটি সংগঠন-নির্মূল কমিটি ও কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র এ ব্যাপারে ছিল সোচ্চার। আওয়ামী লীগ আমলের শেষ দিকে সরকারের খানিকটা টনক নড়ে। জঙ্গি নেতা মুফতি হান্নানকে গ্রেফতার করা হয়। জোট ক্ষমতায় এলে ৭০ হাজার সন্ত্রাসীকে ছেড়ে দেয়। যার মধ্যে জঙ্গির সংখ্যা কম ছিল না।

এ পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বলতে চাই–জঙ্গি, জঙ্গিবাদ থাকবে। আমার মন্তব্য এখানে

বেশি থাকবে না, তবে ২০০১ থেকে এ পর্যন্ত নীতিনির্ধারকদের মন্তব্যের উল্লেখ থাকবে–এ প্রতিপাদ্যের প্রমাণ হিসাবে।

প্রথমে স্বীকার করে নেয়া ভাল, জোট মৌলবাদী তো বটেই, জঙ্গিবাদীও। জামায়াতী ও ইসলামী ঐক্যজোটের কয়েকটি অংশ মৌলবাদের বিশ্বাসী। একথা তারা অস্বীকার করে না। তাছাড়া জামায়াত যুদ্ধাপরাধীদের দলও বটে। তাদের সঙ্গে যারা জোট করে বা করবে এ কথা জেনেই করবে। অনেকে, বিশেষ করে বিএনপির সমর্থকরা এটি মানতে রাজি হবে না। বিএনপির সাদা গলাবন্ধ বা ভদ্রলোকরা এ মন্তব্যে বিব্রতবোধ করেন কিন্তু গত কয় বছরে সরকারি নীতি রচনা করেছে জোট এবং কার্যকরও করছে তারা। শুধু তাই নয়, এক সময়ের লেফটিস্ট মান্নান ভুইয়াও যুদ্ধাপরাধী বলে আখ্যায়িত নিজামী বা ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? রাশেদ খান মেননও লিখেছেন, 'বিএনপি যদি ধড় হয়, জামায়াত এখন তার মাথা' (যুগান্তর ১৮.৯.০৫)। এখন পরিষ্কার যদিও ২০০১ সালেও কমিউনিস্টরা স্বীকার করেনি যে, তৎকালীন সেনাপ্রধান জে, হারুনের কর্তৃত্বাধীন সেনাবাহিনী প্রাণভরে পিটিয়েছিল বিরোধী ভোটারদের। এ কাজে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছিলেন তৎকালীন আইজি যিনি ছিলেন একজন সাবেক সৈনিক। এসব কথা যারা ভুলে যান, তাদের জ্ঞানপাপী বললে প্রশংসা করা হয়। লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে পুরো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসনকে ব্যবহার করে মৌলবাদী চরম ডানপন্থী জোটকে ক্ষমতায় এনেছিল।

২০০২ সালে বগুড়ায় বিশাল অস্ত্র চালান ধরা পড়লে (অনুমান করা যায়, এগুলো জঙ্গিরা কিছু ব্যবহার করছে) বেগম জিয়া বলেছিলেন–'প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগই আল কায়দা, তালেবান। তারা ছাড়া দেশে আর কোন তালেবান কিংবা আল কায়দা নেই' (প্র. আলো ১.৮.০২)। মাত্র কয়েকদিন আগে নিউইর্য়কেও বিএনপির সভায় আওয়ামী লীগের নাম উল্লেখ না করে প্রায় একই কথা বলেছেন। এমনকি ভীষণ নীরবতার পর সপ্তাহখানেক আগে সংসদেও তিনি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কিছু বলেননি। জাতিসংঘেও তিনি বলেছেন, সন্ত্রাস দমন করা হবে। কিন্তু বাস্তব কি তা আমরা ভুক্তভোগীরাই জানি।

আওয়ামী লীগ আমলে কোটালীপাড়ায় বোমা হামলায় মুফতি হান্নান গ্রেফতার হয়েছিল। তার সমর্থনে ২০০৩ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বায়ু সেনা আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছিলেন, 'মুফতি হান্নানের নিজের ওজন হতে পারে বড়জোর ৪৫কেজি, সে কিনা এ বোমাটি সবার চোখের আড়ালে পকেটে করে হেলিপ্যাডে নিয়ে গিয়েছিল? (প্র. আলো ৩১.৩.০৩)। আলতাফ হোসেন দুর্নীতির দায়ে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। জোট তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে। দৈর্ঘ্যে তিনি বড়জোর সাড়ে পাঁচ ফুট বা সামান্য বেশি। ওজন না হয় ৮০/৯০ কেজি। তিনি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও ওজনে তার চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি ওজনের বিমান চালাতেন কীভাবে নাকি চালাননি? বাংলাদেশে সবই সম্ভব। উল্লেখ্য, তিনি এখনও মন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার একজন প্রভাবশালী সদস্য।

২০০৩ সালে মহিলা ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় নামলে সরকারের নীতি (জোট) নির্ধারক

শায়খুল হাদিস এদের প্রত্যাহারের দাবি জানান (এরা নিজেদের নামের আগে অদ্ভুত সব উপাধি ব্যবহার করেন। কারণ এরা বেপর্দা আওরত। এসব আওরতের সামনে তো মোমিন মুসলমান (তারা নিজেদের দাবি করেন) যেতে পারে না। তারপর দেখলাম, মখমলের আলখাল্লা পরে, বোরখা না পরা প্রধানমন্ত্রী সন্দর্শনে যাচ্ছেন। মহিলা ট্রাফিক পুলিশ এখন রাস্তায় নেই। জনাব হাদিসরা এখনও বলছেন, ইসলামীরা বোমা হামলা করেনি। তিনি জোটের শরিক।

'আমরা হবো তালেবান' স্লোগান দিয়ে খ্যাত, রক্তিম দাঁতের ফ. হ. আমিনী ২০০৩ সালে বলেন–'দেশের মানুষ বিএনপি ও জামায়াত বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে জামায়াত তো একটি গাদ্দার রাজনৈতিক দল, যদিও আমরা তাদের সঙ্গে জেটি করেছি। তবে সেটা আদর্শিক কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণে' (ভোরের কাগজ ৩.৭.০৩)। অর্থাৎ একটি ইসলামী দল অন্যটিকে গাদ্দার বলছে এবং দাবি করছে ইসলাম কার্যকরই তাদের লক্ষ্য। আদর্শ না থাকলে ধর্ম থাকে কী করে? এজন্যই এদের আমরা ইসলামের ঠিকাদার বলি। রাশেদ খান মেননের ভাষায়, 'আমিনী কসম খেয়ে বলেছেন যে, এর পেছনে আওয়ামী লীগ ও ভারত আছে। বিএনপির অন্য মন্ত্রীরাও পিছিয়ে নেই। নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল আকবর ১৭ আগস্ট বোমাবাজিকে পটকাবাজি ও ফোঁড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন' (যুগান্তর ১৮.৯.০৫)। তারা দাবি করেছেন, দাঁড়ি-টুপিঅলাদের ধরা যাবে না। আমিনী এখনও প্রায় একই কথা বলছেন। তিনি জোটের সংসদ সদস্য।

জোটের সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্রী নিজামী ১৯৯৪ সালে বলেছিলেন, ইসলামী জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না' (ইত্তেফাক ২৪.১.১৯৯৪)। তারপর তিনি এখন জোটের মন্ত্রী।

১৯৭১ সালে সারা পাকিস্তান আলবদর প্রধান, যাদের প্রধান মিশন ছিল বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা, সেই নিজামী প্রায়ই এমনসব উক্তি করেন। যার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক নেই। অথচ শুভ্র শ্মশ্রুধারী নিজামী এখানে ইসলামের প্রধান প্রবক্তা। তিনি জঙ্গিবাদের সমর্থক, ২০০৪ সালে ক্রিস্টিনা রোকাকে তিনি বলেছিলেন, 'আহমদিয়া সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম পালন করতে পারবে না। (জনকণ্ঠ ২০.৩.০৪)। বাংলা ভাই সম্পর্কে বলেন, আমি তাকে চিনি না, তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিদের কোন অস্তিত্ব নেই। (ঐ) বাংলা ভাই ছিল জামাতে ইসলামীর ক্যাডার। ১৭ আগস্টের বোমা হামলার পর নিজামী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন–'বোমা হামলার সঙ্গে ভারতীয় ও ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ও 'মোসাদ' জড়িত। তিনি এখনও প্রায় একই রকম বক্তব্য দিচ্ছেন।

যুদ্ধাপরাধী হিসেবে পরিচিত জামাতের নেতা ও জোটের মন্ত্রী মুজাহিদ ২০০৩ সালে ঘোষণা দেন, 'বাংলাদেশ এখন মৌলবাদীদের শক্ত ঘাঁটি (জনকণ্ঠ ২১.১২.২০০৩)। পরে তিনি বলেছেন, এ কথা তিনি বলেননি। জামাতের নীতিনির্ধারক গোলাম আযম লিখেছেন-'নির্বাচন ছাড়া জিহাদের মাধ্যমেও তা হতে পারে যেমন আফগানিস্তানে হয়েছে (স্টাডি সার্কেল ২.১৬৮)।

জোটের শরিকরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারত ও আওয়ামী লীগকে দায়ী করেছেন ১৭ আগস্টের বোমা হামলার জন্য। ২০০১ থেকে এ পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রেই একথা বলা হয়ে থাকে। অথচ অনেকের অনুমান জঙ্গিদের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য আসে মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তান থেকে। জোট পাকিদের এখানে স্থাপন করতে চায়। আপনারা জানেন কিনা জানি না, বোমা হামলার পর একমাত্র পাকিস্তানকেই বাংলাদেশে ব্যাংক (কোম্পানি হিসেবে) স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে (ড. আলমগীর জনকণ্ঠ, ১৮.৯)। মন্ত্রী পটল শ্রীলংকায় বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের আইয়ুব খানের বক্তৃতা দিয়ে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন (যুগান্তর ১৮.৯)।

ইতিমধ্যে যোগাযোগমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১৯৭১ সালে জামায়াত কোন অপরাধ করেনি। জামাতের পাকিকরণ এজেণ্ডাও যে সমাপ্তির পথে তার প্রমাণ পাকিস্তানের সিনেটে মুত্তাহিদা মজলিসই আমলের সংসদীয় নেতা মওলানা গুল নাসির খান বলেছেন, তারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন এবং বাংলাদেশের সংসদে তাদের তিনজন এমপি আছে, এরা হলেন–ওয়াক্কাস, আমিনী ও শহিদুল। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের অবস্থান খুবই সুদৃঢ় এবং দেশের প্রতিটি শহরে দলটির সংগঠন রয়েছে। এবারের বোমা হামলা তারই প্রমাণ। শুধু তাই নয়, যারা বোমা হামলা করছে জামাআতুল, আহলে হাদিস বা অন্যরা–এদের অধিকাংশই জামাতের সদস্য ছিল। পত্রপত্রিকাই সে খবর দিচ্ছে।

আমিনী ২০০৩ সালে পাকিস্তানে নেমে বলেন, 'তাকে সেখানে রাষ্ট্রীয় প্রটোকল দেয়া হয়। তিনি জানান, এখানে খুব আরামে সাদরে আছি। সর্বক্ষণ সামনে পেছনে থাকে আমার গাড়ি' (জনকণ্ঠ ২২.১২.০৩)। পাকিস্তানে নেমে একইভাবে বলেন, 'যেন নিজ দেশেই আছি।' (ঐ) আরও পাকিপন্থী ও যুদ্ধাপরাধী বলে পরিচিত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে বেগম জিয়া ওআইসিতে মনোনয়ন দিয়েছিলেন এবং পাকিস্তান তার পক্ষে ক্যানভাস করেছিল। সর্বশেষ ঘটনা ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের স্ত্রীকে লাঞ্ছনা। পুলিশ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে গ্রেফতার করেনি। পাকিস্তানের হাইকমিশনারের স্ত্রীকে লাঞ্ছনা করলে কী হতো তা ভাবতেই পারি না। পাকি ধারার বিকাশই এর কারণ।

বাংলা ভাই যখন রাজশাহীতে গৃহযুদ্ধ শুরু করে ইসলামী রাজ প্রতিষ্ঠায়, তখন সরকার ও প্রশাসন তাকে মদদ দেয়। বাংলা ভাই বলে, 'ভূমি উপমন্ত্রী, নাটোর থেকে নির্বাচিত এমপি রুহুল কুদ্দুস তালুকদারের সঙ্গে দুদিন দেখা এবং কথা হয়েছে (জনকণ্ঠ ৫.৫.০৪)। আরও বলে, 'পুলিশ আমাদের সঙ্গে সহায়তা করে থাকে' (প্র. আলো ৫.৫.০৪)। তার মতে তাদের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ (সংবাদ ৬.৫.০৪)। রুহুল কুদ্দুস এখনও উপমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্য।

২০০৪ সালে বাংলা ভাই ৩ হাজার সশস্ত্র লোক নিয়ে রাজশাহীতে প্রবেশ করে। রাজশাহীর তৎকালীন এসপি মাসুদ মিয়া সশ্রদ্ধভাবে জঙ্গিদের জানান, 'আপনারা আমাকে সহযোগিতা করছেন, আমরাও আপনাদের সহযোগিতা করছি' (সংবাদ

২৪.৫.০৪)। সশস্ত্ররা প্রকাশ্যে রাস্তায় পুলিশ প্রটেকশনে ঘুরতে পারে কিনা এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রাজশাহী সহকারী পুলিশ কমিশনার ওয়াজেদ আলী। কেউ শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করলে আমরা বাধা দেব কেন? হকিস্টিক, রামদা, লাঠিসোঁটার ব্যাপারে তার মন্তব্য-এগুলো আবার অস্ত্র নাকি (প্র. আলো ২৪.৫.০৪)।

সেই সময় প্রধানমন্ত্রী দু'বার বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের আদেশ দেন। সে আদেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাবর পালন করেননি। এর অর্থ, হয় প্রধানমন্ত্রীর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই মন্ত্রিসভার ওপর, নয় এটি ছিল কথার কথা। বরং বাবর বাংলা ভাইকে ইংলিশ ভাই বলে ঠাট্টা করেছেন। উল্লেখ্য, সেই মাসুদ মিয়াকে প্রমোশন দিয়ে একেবারে গোয়েন্দা বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে যেসব পুলিশ, মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতার যোগাযোগ ছিল তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। বাবর এখন বলছেন, '১৭ আগস্টের বোমা হামলার সঙ্গে জামা'আতুল মুজাহিদীন ও জনযুদ্ধ জড়িত। তিনি ছাড়া এ মন্তব্য আর কেউ করেনি। বরং এক জঙ্গি পুলিশকে বলেছে, আপনারাই তো আমাদের জনযুদ্ধের বিরুদ্ধে নামিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন র‍্যাব অনেক সন্ত্রাসীকে হত্যা করলেও কোন জঙ্গিকে সন্ত্রাসী বলেনি, হত্যাও করেনি। বরং দুইজন অবসরপ্রাপ্ত সেনার নাম পাওয়া গেছে—যারা জঙ্গিদের বিভিন্নভাবে মদদ দিয়েছেন। সিলেটে বোমা হামলার পর 'মাজারের লোকজন আলী আসগর নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশে সোপর্দ করলেও তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে' (জনকণ্ঠ ২২.৫.০৪)। অথচ ময়মনসিংহে কথিত যোগাযোগের জন্য শাহরিয়ার কবিরসহ আমাদের অনেককে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। বাংলা ভাইয়ের উপদেষ্টা লুৎফর রহমান হুমায়ূন আজাদকে 'কুত্তা' আখ্যা দেয়ার পর তার ওপর হামলা হয়। এখন ধরে নিতে পারি হামলাকারীরা ছিল জেএমবির। যে কারণে তাদের ধরা হয়নি। লুৎফরকে এখনও পুলিশ ধরতে পারেনি—যদিও সংবাদে তার সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। ৪/৫ দিন আগে দুই জঙ্গি ২৫টি ইসলামী সিডি ও ৩১টি জেহাদি বই নিয়ে সংসদ হোস্টেলে জামাতের এমপির সঙ্গে দেখা করতে এসে ধরা পড়ে (সমকাল ১১.৯.০৫)। তাদের বিরুদ্ধে ৫৪ ধারায় মামলা করা হয়। আর শাহরিয়ারসহ আমাদের অনেকের বিরুদ্ধে হয় রাষ্ট্রদোহি মামলা। গ্রেফতারকৃত কোন জঙ্গির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করা হয়নি। তিনদিন আগে 'জামায়াত নেতার বাড়িতে আবিষ্কৃত হয় বোমার কারখানা।' শুধু তাই নয় 'জামায়াত-শিবিরের নামে বেরিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিরা অথবা ধরা পড়ার পর জামায়াত শিবিরের কথা বললেই সব জঙ্গির অপরাধ মাফ হয়ে যাচ্ছে' (জনকণ্ঠ ১৭.৯)। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, বোমাবাজরা জোটের বোমা ফ্রন্ট। এখন বেকায়দায় পড়ে কিছু জঙ্গিকে ধরতে হচ্ছে। উপর্যুক্ত বক্তব্য তাই প্রমাণ করে। বরং প্রশ্ন করতে পারেন, নিজেদের নিজেরা ধরবে কীভাবে?

এ ধরনের অজস্র উদাহরণ দেয়া যায়। এসব প্রমাণ করে বিএনপি, জামায়াত বা জোটের কেউ সত্য বলতে অক্ষম। তারা জঙ্গিবাদের সমর্থক। উল্লিখিত ঘটনাবলী কি প্রমাণ করে না, সব সেটআপ আগের মতোই আছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, অন্যান্য

বোমা হামলার মতো ১৭ আগস্টের বোমা হামলার নীতিনির্ধারকরা ধরা পড়বে না। পড়বে কীভাবে? এদের অধিকাংশ জামাতের সঙ্গে যুক্ত এবং জামায়াত এখন ক্ষমতায়। মিডিয়াও একসময় এসব খবর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে বা মিডিয়ার দৃষ্টি ফেরানোর জন্য নতুন কাণ্ড ঘটানো হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলতে হয়–জঙ্গি, জঙ্গিবাদ বাংলাদেশে ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কেননা, এর সমর্থক এ দেশের ৪০ ভাগ মানুষ। এটি ভুললে বাস্তবকে এড়ানো হবে মাত্র। এদের সমূলে উৎখাত করার মতো মানসিকতা বিরোধী রাজনীতিবিদ, লিবারেলদের আছে কী না সেটাই বিচার্য। আমরা সিরিয়াস কিনা সেটাই বিবেচ্য। যারা সরকারের এসব হম্বিতম্বি-পুরস্কার ঘোষণায় ভাবছেন, জঙ্গি ইস্যুর সমাধান হয়ে যাচ্ছে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। জঙ্গিবাদ নির্মূল করবে এ সরকার, যারা এর স্রষ্টা– হা হা হা!

২১.৯.০৫

নিজেরা নিজেদের ধরবে কীভাবে?

যে কথা আমরা বলছি গত ৬-৭ বছর, আজ অনেকে সে কথা বলছেন বাধ্য হয়ে। বাধ্য না হলে বলতেন না, যেমন বলেননি গত ৫-৬ বছর। আমরা যারা বারবার এ কথা বলেছি এবং বলার জন্য লাঞ্ছিত হয়েছি, উপহাসিত হয়েছি, আজ সে কথা ফলে গেছে দেখে যে তৃপ্তি পাচ্ছি তা নয়। কারণ বিষয়টি এখন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি জঙ্গিদের আক্রমণে আবার নিহত আইনজীবী/দর্শনার্থীদের প্রসঙ্গেই বলছি। যখন এথনিক ক্লিনজিং-এর নামে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার শুরু হলো, বিরোধী দল নিশ্চিহ্নকরণের নামে আওয়ামী লীগের ওপর নির্যাতন, হত্যা শুরু হলো, সাংবাদিকদের যেনতেনভাবে মেরে ফেলা হতে লাগলো তখন ভদ্রলোকদের একটা বড়ো অংশ ছিলেন নিশ্চুপ। আজ আদালতে হামলায়, বিচারক আইনজীবীরা (তাদের একাংশ বহুদিন থেকে এইসব অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছেন) ভীত। বস্তুত, ২৯ তারিখের ঘটনায় দেখলাম যারা নিশ্চুপ ছিল, এমনকি বিএনপি-জামাতের অনেকেই আতঙ্কিত। কারণ বোমাতে বিএনপি জামাত চিনবে না।

বাংলাদেশে এই নষ্টামীর, ধ্বংসের রাজনীতি শুরু করেছে বিএনপি-জামাত। আমরা যখন এ কথা বলেছি তখন আমাদের আওয়ামী লীগ বলা হয়েছে। আজ বিএনপি-জামাতের কট্টর সমর্থকরাই সে কথা বলছে। যেমন, সাংসদ আবু হেনা। তিনি স্পষ্ট করে জঙ্গি উত্থানের জন্য সরকারকে দায়ী করেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, এমন কট্টরপন্থী জিয়াপ্রেমী হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন? বলছেন দায়ে পড়ে। কারণ, বিএনপি-জামাত মিলে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দিচ্ছে। অবস্থা এমন যে, তাকে এসপার ওসপার করতে হবে। তবে, আবু হেনার খানিকটা সাহস আছে যেটি বিএনপি কর্নেল জেনারেলদেরও নেই। বিএনপিতে চালু হলো ভৃত্যতন্ত্র। রানীমার সামনে চোখ তুলে কথা বলার সাহস কারো নেই। যুবরাজ একটু হাসলে সেদিন সাইফুর রহমানের ঘুম ভালো হয়। বাকিরা রানীমায়ের পরিচারিকা হবু যুবরাজের পার্শ্বচরকে সালাম দিয়ে গর্ববোধ করেন। আওয়ামী লীগেও সে ব্যবস্থা চালু। তবে, দলের বিভিন্ন ফোরামে বা বাইরে তারা বিভিন্ন বক্তব্য দিতে পারেন। ফোরামের দলীয় নীতি বা অলিখিত সিদ্ধান্তে এ ব্যাপারে কথা বলতে পারেন, যেমন বলছেন মোহাম্মদ হানিফ বা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। শেখ হাসিনা সে সব কথা/পরামর্শ শোনেন কী শোনেন না সেটি অন্য ব্যাপার। সে পরিস্থিতিতে আবু হেনা নিজেকে বিপন্ন করে কথা বলছেন। আমরাতো জানি, আবু হেনা নিজেও জানেন তার জোট ছিল মনুষ্য নামধারী হিংস্র পশুদের আস্তানা। আবু হেনা নিজেও কী ৪ বছরের কম গিবৎ গেয়েছেন। আবু হেনা বহিস্কৃত হয়েছেন জঙ্গিদের

বিরুদ্ধে বলার জন্য নয়। তিনি বলেছেন বিএনপিতে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র চলছে। হাওয়া ভবন অঘোষিত সরকার। দলের চেয়ারপারসন দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন (প্র. আলো ২৫.১১.০৫)। এমন নতুন কথা নয়। কিন্তু জামাত-বিএনপির কোনো সদস্যের এহেন বেয়াদপি সহ্য করবেন কেন মালিকান। অন্যরা এক-আধটু বলতে চাচ্ছিলেন ভবিষ্যতের বিকল্প তৈরির জন্য। কিন্তু, এক ধমকে সব খামোশ হয়ে গেছেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মতো ভিটেমাটি হারাতে চান না তারা। তবে, নির্বাচন যতো ঘনিয়ে আসবে এ ধরনের কথা ততোই শোনা যাবে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি প্রমাণ করছে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জঙ্গি নিজামী ও খালেদার কার্যকলাপে সায় দিতে আর রাজি নয়।

আবু হেনার মতো যাদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন, তারা হয়তো গা বাঁচাতে এগিয়ে আসবেন। অবাক হবেন না মওদুদের মতো লোকও যদি কয়েকদিন পর একই ধরনের কথা বলেন।

একটা বিষয়ে আমরা ভুল করি, মানুষকে বিভ্রান্ত করি। চরম নচ্ছারকে তার মৃত্যুর পর প্রশংসাবাণীতে ডুবিয়ে দিই। ফলাফল ওই নচ্ছার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তার নষ্টামি স্বীকৃত হয়। এ রকম ঘটনা ঘটছে। যেমন, বিএনপি-জামাতকে আমরা আলাদা করে দেখি। আজকাল অনেক সুবেশী ‘ভদ্দরনোক’ ও মহিলাকে বলতে শুনবেন, আমি জামাত করি না, বিএনপি করি। কারণ জামাত করা এখন নষ্টামি হিসেবে পরিচিত। বিএনপি-জামাত এখন একই দলের দুঅংশ-এ বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার হতে হবে। এক ফ্যাকশনের লিডার মান্নান ভূঁইয়া, অপর ফ্যাকশনের নিজামী। জাপানের এলডিপি যেমন বহুধা ফ্যাকশন বিভক্ত। আলাদা আলাদা অফিসও আছে সবার। খালেদা জিয়াকে আপাতত দুই ফ্যাকশনই নেত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছে। নিজামী-মান্নান ভুঁইয়ার বক্তব্যের কোনো পার্থক্য থাকলে জানাবেন। মেনে নেবো তারা ভিন্ন আদর্শের লোক। সে হিসেবে জোটের সমর্থকরা বিএনপি-জামাতেরই সমর্থক।

যারা বিএনপি-জামাতকে আলাদা হিসেবে দেখতে চান তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। সংসদীয় কমিটিতে বিজ্ঞ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত যখন বলেন, জামাতকে বের করে দিলে জঙ্গিবাদ থেকে মুক্তি পাবো, সেখানে অবাক হই। কারণ, এতে বিএনপির সমস্ত অপকর্মকে আড়াল করা হয়। অথচ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কথিত বিএনপির সদস্যরাই তা মানতে রাজি নন। যে মওদুদ বিচার ব্যবস্থা ধ্বংসের আয়োজন শুরু করেছিলেন (স্বাভাবিকভাবেই জঙ্গিরা সেটিকে ধ্বংসের জন্য নেমেছে), তিনিই সেই সভায় বলেছেন, ‘এখন যারা আল্লাহর আইন কায়েমের নামে সন্ত্রাস করছে তাদের সাথে জামাতকে এক করে দেখার কোনো অবকাশ নেই’ (জনকণ্ঠ ২৯-১১) যুদ্ধাপরাধী সাঈদী বলেছে, ‘বিএনপি-জামাত এক মায়ের দুটি সন্তান। যারা এর মধ্যে পার্থক্য খোঁজে, এক ভাইকে পরিত্যাগ করার জন্য অন্য ভাইকে উসকে দেয় তারা আর যাই হোক, বিএনপি-জামাতের বন্ধু নয়, আওয়ামী লীগের অনুচর ও ভারতের দালাল’ (সংবাদ, ২৯-১১)।

জোটের সমর্থকরা বিএনপি-জামাতেরই সমর্থক। তাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে, এ

কথা বলা যে, এটি একটি জাতীয় সমস্যা, ঐক্যবদ্ধভাবে এর মোকাবিলা করা উচিত। এ কথা বলে তারা ২০০১ থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত বোমা ও গ্রেনেড হামলার প্রশ্রয় ও আশ্রয়দাতা হিসেবে নিজেদের আড়াল করতে চাইছে। তারা এখন মাঠ-ঘাট দাপিয়ে মিটিং মিছিল করে বোমা হামলার প্রতিবাদ করবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। গতকাল থেকে টিভিতে এসব ভালমত দেখা যাচ্ছে। অবাক হই ভেবে কোনো সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন না যেসব মন্ত্রী ও আমলা প্রকাশ্যে জঙ্গিদের আশ্রয় দিয়েছে সমর্থন জুটিয়েছেন, এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন না কিন্তু সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন? জোটের সমর্থকরা বলেন, এ সরকার জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না, সে কারণেই তো প্রতিদিন কমপক্ষে একজন করে জঙ্গি গ্রেপ্তার হচ্ছে। কিন্তু আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন, মাঠে যারা জঙ্গি নিয়ন্ত্রক তাদের গায়ে কিন্তু ফুলের টোকাও পড়ছে না। মাঠ পর্যায়ে কিছু বাহক ধরা পড়েছে মাত্র। ড. আলমগীর, শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে প্রবল উল্লাসে পুলিশ রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে কিন্তু ড. গালিব, আবদুর রহমান বা মুফতি হান্নানের বিরুদ্ধে নয়। বরং এদের বিরুদ্ধে এমন দুর্বল চার্জশিট দেওয়া হয় বা হবে যে এরা জামিন পেয়ে যায়। জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ বা জেএমবি কী? নানাজন নানা ব্যাখ্যা দেবেন। কিন্তু মূলত বিষয়টি একটি জায়গায় গিয়েই ঠেকবে। জেএমবি একটি জঙ্গিবাদী সংগঠন। এর সদস্য কারা? অধিকাংশ সদস্য জামাত, এক্যজোট বা এদের নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসার ছাত্র। শাহরিয়ার কবির দেশে ৫৮টি জঙ্গি সংগঠনের তালিকা তৈরি করেছেন। আসলে সংগঠন মূলক একটিই: বিভিন্ন কারণে নাম বদল করা হয় মাত্র। যেমন- হরকাতুল জেহাদ নিষিদ্ধ হলো, জেএমবি এলো: জেএমবি নিষিদ্ধ হলো, বাংলাভাই এলো। লক্ষ্য করবেন ৫৮টির আদর্শে, লক্ষ্যে কোনো তফাত নেই।

এদের মাতৃসংগঠন হচ্ছে জামাত, যাদের মূল হচ্ছে পাকিস্তানে। এর পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ও সৌদি আরব। জেএমবি, হরকাতুল জেহাদ নিষিদ্ধ হলেও জামাত তাদের বক্তব্যই বিভিন্ন জায়গায় পেশ করছে। নিজামীর সাম্প্রতিক বক্তব্য ও সাঈদীর ওয়াজ তার প্রমাণ। সরকারের অন্য অংশীদার তালিবান সমর্থক আমিনীর ঐক্যজোটের সঙ্গে জামাতের দ্বন্দ্ব আছে তবে তা হচ্ছে ক্ষমতা, অর্থ ভাগাভাগি নিয়ে। তবে লক্ষ্য তাদের এক।

বিএনপি এসব যুদ্ধাপরাধী নিয়ে জোট করছে এটি স্বাভাবিক। বিএনপির পৃষ্ঠপোষকরা জিয়ার আমলে লুট করে বড়োলোক হয়েছে। জিয়া অনেক মাস্তানকে দলে জায়গা দিয়েছিলেন। যে কারণে বিএনপির মৌল বৈশিষ্ট্য লুটেরা চরিত্র। জিয়া যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং জোট তাদের সমর্থক। একজন জোট সমর্থকের চেহারা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। উদ্ধত, হিংস্র ধরনের, সৌজন্যবর্জিত, বোধ-বিবেকশূন্য। বেগম জিয়া/নিজামী থেকে তৃণমূলে তাদের সর্মথকদের লক্ষ্য একই-যে কোনোভাবে কর্তৃত্ব বজায় রেখে নিজেদের সম্পদশালী করা। ১৯৭১ সালে পাকিরা বলেছিল, মানুষ চাই না–মাটি চাই। জোটের বক্তব্যও ওই একটিই। যে কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রাম বিরোধী রাজনীতির সমর্থকশূন্য।

এভাবে এরা সম্পদশালী হয়েছে। বিএনপির ছয়-সাতজন সাংসদ টিভি চ্যানেল খুলছেন। এদের অধিকাংশ ছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত। ৪ বছরের মাথায় তারা যদি কাগজ, টিভি চালাতে পারেন, তাহলে লুণ্ঠনের পরিমাণটা বোঝা যায়। ক্ষমতা দখলের আগে এ দর্শনে বিশ্বাসী রাষ্ট্রপতি, লতিফুর রহমান, জেনারেল হারুন সবাইকে একত্র করতে পেরেছিল। এটিই তাদের সাফল্য। তাদের সমর্থকদের তারা দিয়েছে-থুয়েছে তাই এখনো সমাজে তারা পোক্ত। আওয়ামী লীগ করতে পারেনি এটিই তাদের ব্যর্থতা। আর আওয়ামী নেতারা নেন, দেওয়ার ব্যাপারে তাদের কুণ্ঠা বেশি; তাই তারা সমাজ থেকে হটে যাচ্ছেন। জোটের কৌশল হলো অত্যাচার ও ধর্ম। অশিক্ষিত জনগণের কাছে ধর্মে আসক্তির মতো। আর প্রশাসন হচ্ছে তাদের নিপীড়ন যন্ত্র। সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশের মানুষের চরিত্রও বদলে গেছে। গত ৪ বছরের উদাহরণ। একটি সামান্য কথা বলি–একটি দেশে একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে অমুসলমান বলে কীভাবে? তারা যাদের হত্যা করছে বা করতে চাচ্ছে, তারা সবাই মুসলমান। ইসলামের দেশে তারা কী ইসলাম প্রচার করে? অন্য মুসলমানদের ওপর তারা অত্যাচার চালিয়েছে, যেটি স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দ.) নিজেও করেননি। এটা কীভাবে সম্ভব? সাধারণ মানুষকে এ কথা কেউ বুঝিয়ে বলেনি। আমি শুনেছি, এরা রিক্রুটদের বলেছে, অমুসলমান মারলে তারা বেহেশতে ভোগ করতে পারবে এমন ১৮টি জিনিসের কথা বলেছে। সমর্থকও সৃষ্টি করা হয় এভাবে। অভাবী অভুক্ত মানুষ এসব বক্তব্য গিলছে। উত্তরাঞ্চল হচ্ছে জেএমবির উর্বর ঘাঁটি। এবং সরকার ইচ্ছে করে সেখানে ৫ বছর মঙ্গা সৃষ্টি করেছে যাতে রিক্রুমেন্টটা ভালো হয়। আওয়ামী লীগ আমলে ৫ বছর উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা হয়নি।

এক কথায় মাঠপর্যায়ে এদের নাম হরকাতুল, জামা'আতুল, বাংলাভাই, তালিবান, শায়খ রহমান; কেন্দ্রীয় রাজনীতি বা প্রশাসনে এরা পরিচিত সাকাচৌ, মান্নান ভুঁইয়া, নাজমুল হুদা, নিজামী, মুজাহিদ বা আফতাব নামে। এ মন্তব্যে অনেকে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন; কিন্তু গত ১০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবেন মূলত একটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যই এরা কাজ করছে। কাউকে হয়তো আদর্শ আর কাউকে হয়তো অর্থ প্রণোদনা জুগিয়েছে, এই যা পার্থক্য। পর্যালোচনা করলে দেখবেন, গত এক দশক এদের সব হামলার লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগ ও বামপন্থার সমর্থক এবং প্রগতিশীল লেখক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা। কখনো জোটের কোনো কর্মী বা সমর্থকের বিরুদ্ধে নয়। এমনকি তাদের হত্যার যেসব তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে, সেখানেও জোটের কেউ নেই। একেবারে নেই বললে সত্যের অপলাপ হবে। মাঝে মাঝে দু'একজনের নাম থাকে। আরো লক্ষ্যণীয়, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা (অর্থাৎ আমলা, পুলিশ, গোয়েন্দা) জোট সমর্থক, সবসময় বলেছেন, এসব করেছে আওয়ামী লীগ ও তাদের মদদদাতা 'র' অথবা ভারত। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওইসব দলের নেতাকর্মী বা প্রগতিশীলদের। জামাত, বিএনপি বা এদের সেকেন্ড ফ্রন্ট জঙ্গিরা যতো হত্যা-সন্ত্রাস-বোমাবাজিই করুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কখনো কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযান চালানো হয়নি। গ্রেপ্তারও হয়নি তেমন কেউ। কাউকে কাউকে গ্রেপ্তারে বাধ্য হলেও পরে ছেড়ে

দেওয়া হয়েছে। আর বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বাদ দিই-আমাকে, শাহরিয়ার কবির বা সালিম সামাদ বা প্রিসিলার মতো অল্পবয়সী মেয়েদের রিমান্ডে নিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে। এ দিকগুলো যারা দেখেও দেখেন না অথবা নিজেদের নিরপেক্ষ বলে দাবি করেন, তারা অবশ্যই জোটপন্থী অথবা মতলববাজ।

একজন মান্নান ভুঁইয়া, নিজামী বা শায়খ রহমানের মধ্যে তফাতটা কী? দাড়ি ও জোব্বার। এই সত্য মেনে নিলে পুরো বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। পার্থক্য থাকলে তাদের সব বক্তব্য এক রকম হবে কেন? তাদের মতে, আওয়ামী লীগ, বামপন্থী বা প্রগতিশীলরা মুসলমান নয়। নাজমুল হুদাও একসময় পার্লামেন্টে এদের নব্য মুসলমান বলেছেন। আমরা হচ্ছি মুসলমান নামধারী অমুসলমান। এদের পারভারশনও লক্ষণীয়। তাদের বিবেচনায় পিছলে গড়া পাতলা রঙিন শিফন ও হিরক বা মুক্তার অলঙ্কার এবং চড়া মেকআপে ভূষিত হচ্ছে ইসলামের প্রতীক। আব্রু রাখা, অলঙ্কারবিহীন নারী ইসলামের প্রতীক হতে পারে না। নিজামী ও আমিনীরা একসময় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন নারী নেতৃত্ব হারাম। কিন্তু নারীর নেতৃত্ব ছাড়া এক কদম চলার মতো মুরোদও এদের নেই। জোব্বা পরিহিত এরা যখন বেগম জিয়াকে ঘিরে আলোচনা করেন, তা দেখার মতো এক দৃশ্য বটে। তাদের মুসলমানিত্বের মাপকাঠি হলো কে কতোটা বেশি পাকিস্তানের গোলাম ও ভারতবিরোধী। শান্তিচুক্তি করলে যদি ফেনী থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত ভারতের অধীনে চলে যায় (বেগম জিয়ার ভাষ্য,) তাহলে বাংলাদেশ টাটাকে আনার জন্য খালেদা-নিজামীর এতো টানাটানি কেন? আর মিথ্যা না বলে এরা থাকতেও পারেন না। এ ধরনের লোকের হাতে আমরা, দেশ শুধু নয়–ইসলামও বিপন্ন, এ কথা পরিষ্কারভাবে বলার সময় এসেছে। এভাবে কখনো মূল জামাত-বিএনপি, কখনো তাদের ছায়া জঙ্গিদের দিয়ে উৎখাত করার কাজটিই তারা গত ৪ বছর ধরে করে আসছে।

এখন জেএমবির একটি অংশের মনে হয়েছে, তারা যথেষ্ট শক্তিশালী। সুতরাং সামনের নেতৃত্ব হটিয়ে রাষ্ট্রকে আয়ত্তে আনতে হবে। বিএনপিতে তারেক জিয়া যে কাজটি করছেন। গণ্ডগোলটা লেগেছে এখানেই।

সমস্যা হচ্ছে এদের কীভাবে দমন করা হবে? কারণ, সরকারের ভেতরে বাইরে তো জঙ্গিরা। আলতাফ হোসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন, তাকে জানিয়ে মুফতি মান্নান গা ঢাকা দেয়নি? শায়খ রহমান তো ঢাকায়ই ছিলেন গত দুতিন মাস। বাংলাভাইও দেশে। এদের গ্রেপ্তার করতে গেলে কীভাবে যেন তারা জেনে যায়। রংপুরে জঙ্গিদের একটি ঘাঁটিতে বোধ হয় ভুল করে পুলিশ হানা দেয়। কিন্তু পত্রিকায় দেখলাম, যাদের হত্যা করা হবে বলে তালিকা করা হয়েছিল সেই তালিকাটা খোয়া গেছে। সার্কের তিনদিন জঙ্গিরা নিশ্চুপ থাকে। 'সরকার' বা তাদের বড়ো ভাইদের প্রেস্টিজ রক্ষায় আর সম্মেলন শেষ হলেই বিচারক হত্যা করা হয়। র‍্যাবের ক্রসফায়ারে সব রকমের মানুষ নিহত হয় কিন্তু নিহত হয় না কোনো জঙ্গি। তিন-চারদিন আগে, বাংলাভাইয়ের অন্যতম সহযোগী মাহতাব খামারুকে র‍্যাব ধরে গল্পটল্প করে ফের জামাই আদরে মাইক্রোবাসে করে বাড়ি পৌঁছে

দেয়। কারণ, এক উপমন্ত্রী ও বিশেষ ভবনের নির্দেশ' (জনকণ্ঠ, ২৯-১১)। আমরা আগেই বলেছিলাম র‌্যাব হচ্ছে জামাত-বিএনপির ঠেঙারে বাহিনী যাদের দিয়ে নির্বাচনের বৈতরণী পার হবে জামাত-বিএনপি। ব্রিটিশ মন্ত্রীও একই কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন। চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে বোমা হামলার পর জোটের নীতিনির্ধারক খন্দকার মোশাররফ বলেছেন, 'হঠাৎ করে দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান [মিথ্যাটা লক্ষ করুন] ও বিরোধী দলের সরকারবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার' (প্রথম আলো)। বোমা হামলা খতিয়ে দেখার কোনো কারণ নেই। বার সমিতির প্রেসিডেন্টের কাছে জঙ্গিরা হুমকি দিয়ে চিঠি দিলে সরকারি আইনজীবীদের নেতা জয়নাল আবেদিন বলেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভীতি সৃষ্টির জন্য এ ধরনের চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিটি ভীতিকর 'নয়' (জনকণ্ঠ. ঐ)। তার পরদিনই দুই আদালতে বোমা হামলা। আইনজীবীরা তার প্রতিবাদ জানালে সরকারি আইনজীবীরা ভন্ডুল করে দেন। এগুলো কি বোমাবাজদের প্রশ্রয় দেওয়া নয়? 'জঙ্গিদের মদদদাতা এনজিওগুলি এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে' (ইত্তেফাক ২৯-১১)। প্রশিকা বা অন্যদের ফান্ড কিন্তু সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যে এনজিও ফেডারেশন হয়েছিল তারাও কিন্তু এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ।

বোমা হামলার পর আবদুল মান্নান ভুঁইয়া শুকনো মুখে একটা ভালো কথা বলেছেন- এক মাসের মধ্যে বোমা হামলা বন্ধ হবে। জানি না, তিনি নিজামীর পারমিশন নিয়ে একথা বলছেন কিনা। নিয়ে থাকলে, বোমা হামলা নিশ্চিত বন্ধ হবে। তিনি পারমিশন নিয়েছিলেন কি নেননি তা বোঝা যাবে কয়েকদিনের মধ্যে।

আবু হেনা একটি কথা বলেছেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বলার জন্য তাকে বহিষ্কার করা হয় কিন্তু যারা জঙ্গির পৃষ্ঠপোষক তাদের কিছু বলা হয় না। এতে প্রমাণ হয় এ সরকার জঙ্গিদের দ্বারা গঠিত, জঙ্গিদের জন্য গঠিত। বস্তুত আবু হেনার বহিষ্কার, পূর্বের সব ঘটনা, এমনকি বোমা হামলার পরও জামাত-বিএনপি নেতাদের কথাবার্তা পুরো বিষয়টিকে নগ্ন করে দিয়েছে। সুতরাং, নিশ্চিত থাকতে পারেন যতোদিন জোট ক্ষমতায় থাকবে, ততোদিন জঙ্গিরা বাংলাদেশে শুধু মুক্তভাবে বিচরণ করবে না, শাসনও করবে। কারণ, নিজেরা নিজেদের ধরবে কীভাবে?

১.১২.০৫

জঙ্গিবাদ, বোমাবাজি পছন্দ করলে অবশ্যই জোটকে সমর্থন করুন

তাহলে বাংলাদেশে এখন হিন্দুরাও ইসলামি শাসন প্রচলনের জন্য আত্মাহুতি দিচ্ছে! অসম্ভব শোনাচ্ছে? বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ। বিএনপিপন্থীরা বলবেন, কেন খ্রিস্টানরা কি ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপ-আমেরিকায় আত্মাহুতি দিচ্ছে না? বিএনপি-জামায়াতি বা তাদের সমর্থকরা যখন কোনো মন্তব্য করে, তখন খেয়াল করে শুনবেন। এরা হয় মিথ্যা বলে, না হয় ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে যাতে বিপদে পড়লে পার পাওয়া যায়। তারা কিন্তু কখনো বলবে না, ওইসব খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। অনেকে বলতে পারেন, গয়েশ্বর-নিতাইরা কি জামায়াত-বিএনপি করছে না যারা বাংলাদেশে ইসলামি শাসন কায়েম করতে চাচ্ছে? হ্যাঁ, এই যুক্তির কাছে আমি পরাস্ত। আক্ষেপ করে শুধু বলতে পারে, 'ইসলামি' দেশে হিন্দু রাজাকারের শুধু সৃষ্টি নয়-বাড়ছেও। আর এটা সম্ভব হচ্ছে বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ বলে।

একথা মনে পড়লো বেচারা যাদবের কাহিনী পড়ে। নেত্রকোনায় ভয়াবহ বোমা হামলার খবরগুলো সন্ধ্যা থেকেই বিভিন্ন বাংলা চ্যানেলে দেখছি। এনটিভির আগে যাদবের প্রসঙ্গ কেউ তোলেনি। এনটিভিই খবর দেয় যাদব জঙ্গি, কারণ তার শরীরে তার পেঁচানো ছিলো। বাংলা এবং ইংরেজী বলতে না পারা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও আধো বাংলা আধো ইংরেজীতে বলেন, যাদবের শরীরে তার পেঁচানো ছিলো। জনকণ্ঠের খবর অনুযায়ী, তার প্রহরীরা বিশেষভাবে যাদবের পুরুষাঙ্গ পরীক্ষা করে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এরপর এনটিভির সাথী এটিএনও একই খবর পরিবেশন করে। চ্যানেল আই তখনো দাবড়ানি খায়নি দেখে বলে, যাদব একজন মেকানিক। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে, আত্মঘাতী বোমাবাজ সাইকেলে চড়ে এসেছিলো। মনে রাখা দরকার, এনটিভির মালিক হচ্ছেন বেগম জিয়ার ডানহাত মোসাদ্দেক আলী ফালু, যাকে জোর করে বেগম জিয়া 'নির্বাচিত' করে সংসদ সদস্য করেছেন। বিএনপি আমলে তিনি একটি দৈনিক ও দুটি টিভি চ্যানেলের মালিক হয়েছেন। সাইফুর রহমান কিন্তু এসব ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেন না। যদিও ক্লাউনসুলভ নানা মন্তব্য করেন প্রতিদিন। তা বাংলাদেশ দুর্নীতিতে ফার্স্ট হবে না কি লাস্ট হবে? ফালু টিভি বিনা কারণে এটি করেনি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব বোমাবাজি চলচে তার বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষ দেখে এমন একটা রূপ দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে—কে বলছে জেএমবি বোমাবাজি করছে? জেএমবি করলে তো সেখানে হিন্দু থাকতো না। এরা আসলেই দুষ্কৃতকারী। এবং হিন্দু যেহেতু, সেহেতু ভারতীয় এবং ভারতীয় মানেই তো আওয়ামী লীগ। মান্নান ভুঁইয়া, নিজামী, আমিনী এখন যেসব বক্তব্য রাখছেন, তাতে হয়তো হিন্দু বোমাবাজের ঘটনাটা খাবে।

মুশকিলটা হচ্ছে জামাত-বিএনপির নোংরা খেলাটা দিনকে দিন স্পষ্ট হয়ে বেরুচ্ছে। জামায়াত-বিএনপি যারা করে, তারা পিঁপড়ের পেট পিষেও শেষ রসটুকু নিংড়ে নিতে চায়; যে কারণে বাংলাদেশকে দুর্নীতির চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে নড়ানো যাচ্ছে না। এদের ভেতরটাও এমন যে, তাদের শরীরে কোথাও আঁচড় দিতে গলগল করে পুঁজ বের হয়। আত্মঘাতী বোমায় দেশ ছারখার আর তাদের নেত্রী সেজেগুজে মক্কায় গিয়ে আমাদের উপদেশ ঝাড়ছেন সন্ত্রাস কমানোর জন্য। তার মন্ত্রিসভায় জঙ্গি সমর্থকরা সমানে আওয়ামী লীগ ও একটি বিদেশি রাষ্ট্রকে দোষী করে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা না হয় বিএনপি-জামাতের বিরুদ্ধে কিন্তু লিডাররা কী বলছেন? বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অলি আহমদ জামাতের নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন, জামাত পরাজিত হয়েছে এবং তিনি বলেছেন, 'বোমাবাজদের সঙ্গে' আপস করতে পারি না' (সংবাদ, ৪.১২.০৫)। স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য ওবায়দুর রহমান বলছেন, 'এককভাবে বিএনপির নির্বাচন করা উচিত।' শুধু তা-ই নয়, তিনি আরো বলছেন, '১৯৭১ সালে যারা ধ্বংসাত্মক কাজ করেছিলো, তারাই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। জাতিকে তারা ধ্বংস করতে চায়' (জনকণ্ঠ, ৯.১২.০৫)। ওই তারা হচ্ছে জামাতিরা। জামাতি নামটা নেয়া যাচ্ছে না আর কী যেমন, ভাসুরের নাম নেয় না অনেকে। দিনাজপুরে জোটের প্রার্থী, যার টাকা খাওয়ার বেশ একটা সুনাম নাকি ছড়িয়েছিলো [গুজবও হতে পারে কারণ জামায়াতিরা নাকি সৎ] তিনি আধলাখেরও বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছেন, তাও বিদিশার জাতীয় পার্টির কাছে। সে প্রার্থী আবার মুসলমান নয়। তার মানে, মানুষ মাত্রই মনে করছে জামাত মানেই বোমাবাজ, ভন্ড ও মিথ্যাবাদী। আর বিএনপি তাদের সাপোর্টার। সুতরাং এদের থেকে দূরে থাকাও শ্রেয়। তবে যদি জামাতিদের ছেড়ে কেউ কিছু করে, তাহলে হয়তো তাকে কিছুটা দেয়া হতে পারে। এমনকি জোটের শরিক ইসলামী ঐক্যের সংসদ সদস্য ওয়াক্কাসও বলছেন, জামাতিরাই বোমাবাজির জন্য দায়ী। তার ভাষায়, 'জামায়াত মানেই জেএমবি, বিএনপির ভাড়া করা দল' (জনকণ্ঠ. ৮.১২.০৫)। তারপরও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 'লুকিং ফর শত্রু'র কাজ মহাউদ্যমে চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরই মধ্যে সংলাপ নামে এক মহাতামাশার সৃষ্টি করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, পতিত এরশাদ ছাড়া আর কেউ বেগমের সঙ্গে যেতে রাজি নয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোও মনে করে জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষক খালেদা জিয়া ও নিজামী। অন্তত এক্ষেত্রে শেখ হাসিনা যথার্থই বলেছেন, এদের সঙ্গে বসা আর জঙ্গিদের সঙ্গে বসা একই কথা। বিএনপির প্রতি খানিকটা সহানুভূতিশীলদের মতে, জামায়াত বাদ দিলে সংলাপ হতে পারে। যেনো জামায়াতই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী। ইসলামী ঐক্যজোট আর বিএনপি নয়। বিএনপি-জামায়াত যে মিলেমিশে একাকার, এটা জানলেও তারা স্বীকার করতে চান না। এখন প্রেস্টিজে লাগে।

সংলাপ নামক মহাতামাশার পক্ষে এস্টাবলিশমেন্টের চাকর-বাকরও ক্যাবল টিভিগুলো বেশ প্রচার চালাচ্ছে। যেনো সংলাপ হলেই ঐক্যমত্য হয়ে যাবে। এসব জ্ঞানপাপীর কাছে প্রশ্ন, যারা সংলাপে যাবে তাদের অধীনে কি পুলিশ, র‍্যাব বা সেনাবাহিনী আছে? নাকি জামাত-বিএনপির মতো সশস্ত্র ক্যাডার আছে যে তারা একত্র

হয়ে সব রিসোর্স এক করলে জঙ্গি রোখা যাবে? যদি তা না হয়, তাহলে সংলাপে বসে কি ঐকমত্য হবে? আচ্ছা, ধরে নিলাম, সব দলে সংলাপে গেলো এবং ঐকমত্য হলে জঙ্গি দমন হবে; কিন্তু সরকার করলো না বরং বিরোধী দলকেই দায়ী করতে লাগলো, যেমন এখন করছে– তখন কী হবে? তাহলে জ্ঞানপাপীরা এতো তড়পাচ্ছেন কেন? আগেই বলছি, নরমপন্থীরা (অর্থাৎ বিএনপির প্রতি সহানুভূতিশীল) বলছে, জামাত না থাকলে তারা যাবে। কিন্তু ঐক্যজোট, যারা জামাত থেকে কম ভয়ঙ্কর নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি, তাদের সর্ম্পকে জ্ঞানপাপীরা নিশ্চুপ কেন?

দেখা যাচ্ছে, যেসব কিশোর ধরা পড়ছে, তারা অধিকাংশ কওমি মাদ্রাসার ছাত্র। কেউ তো বলছে না এদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মাদ্রাসাগুলো এখন বোমাবাজ সৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে উঠছে। তালিবানপন্থী আমিনী বলছেন, 'বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না, এমন ধাক্কা দেবো খুঁজেও পাওয়া যাবে না' (জনকণ্ঠ, ৯.১২.০৫)। শুধু তা-ই নয়, 'গত চার বছর সরকার মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে কিছু করেনি; কিন্তু এখন কোথাও কোথাও তল্লাশি চালাচ্ছে। দেশে এখন ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসায় ৫০ লাখ ছাত্র-শিক্ষক আছে। এদের পাশ কাটিয়ে ধোঁকা দিয়ে কেউ ক্ষমতায় যেতে পারবে না। ...কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে জিহাদ শুরু হবে' (প্রথম আলো. ২.১২.০৫)। কই জেল মাখা চুলের বাবর তো এখন আর লুকিং ফর শত্রু'তে ব্যস্ত নন। বরং 'সরকার মাদ্রসায় জঙ্গি আস্তানা অনুসন্ধানে তালিকা তৈরির আদেশ জারি করে তা আবার নিজেরাই প্রত্যাহার করে নিয়েছে' (জনকণ্ঠ. ৯.১২.০৫)। এর অর্থ জোট সরকারই পৃষ্ঠপোষক জঙ্গিদের।

বাবর এখন আধো ইংরেজীতে জানাচ্ছেন, 'ইট ইজ গ্লোবাল।' এর মানে কী? তার আধো আধো কথার অর্থ যা ধরতে পেরেছি তাহলো, অনেক দেশেই তো বোমা হামলা হচ্ছে, ফলে এটি আর এমন কী বিষয়! সাইফুর রহমানও চান্স পেলে একই কথা বলেন। তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, সেসব দেশে সরকার জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকতা করে কি-না যা কি-না করছে এখানকার সরকার। তাছাড়া তারা তো জঙ্গিদের ধরে। এখানে তো বাংলাভাই, শায়খ রহমান, খামারুকে সরকার ধরে না। ভুল করে ধরে ফেললে পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়। এদের মধ্যো তারা শত্রু খোঁজেন না। বরং আজ নেত্রকোনার যাদবের কথা বলে, সংলাপের কথা বলে এদের ও নিজেদের আড়াল করতে চাচ্ছেন। গত পরশুই জঙ্গিরা বলেছে, 'মহিলাদের বোরখা পরেই রাস্তায় নামতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের মেয়েরা সন্ধ্যার পর বেরুতে পারবে না' (জনকণ্ঠ. ৯.১২.০৫)। ঢাকা ও মফস্বলের বিএনপি ঘরানার মহিলা ও ছাত্রীদলের সদস্যরা কী বলে দেখা যাক। অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করা যাবে: কিন্তু মোদ্দা কথাটা হলো- বোমা খেতে চান কি-না, পরিবার-পরিজন বোমা হামলায় অক্কা পাক চান কি-না, শিফন-লেহেঙ্গা ছেড়ে বোরখা পড়তে চান কি-না, চাইলে অবশ্যই জামায়াত-বিএনপি-ইসলামী ঐক্যজোট বা নিজামী-খালেদা-আমিনী বা জোট সরকারকে জোর সমর্থন করে যান। আমাদের আপত্তি নেই। আমরা তো চার বছর ধরে অর্ধমৃত, এখন না হয় পুরোপুরিই মৃত হবো!

১২.১২.০৫

জঙ্গি কেন হয়, জঙ্গি কেন থাকবে?

১৯৭১ সাল থেকে জঙ্গি বলতে আমরা একটি রাজনৈতিক দলকেই বুঝতাম, সেটি হচ্ছে জামাতে ইসলামী। এর আগে পাকিস্তানি আমলেও জঙ্গি বলতে জামাতকেই বোঝানো হতো। গত শতকের মধ্য পঞ্চাশে আহমদিয়াদের হত্যার জন্যা তারা লাহোরে দাঙ্গা শুরু করেছিল। তৎকালীন সরকার তখন জঙ্গিবাদী নেতা মওদুদীকে গ্রেফতার করে ও সন্ত্রাসের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। পরে অবশ্য মার্জনা চাইলে মওদুদী দণ্ড থেকে অব্যাহতি পান।

জামাত তাদের সেই ঐতিহ্য থেকে কখনও বিচ্যুত হয়েছে-এমন দাবি কেউ করতে পারবে না। জামাতের প্রধান লক্ষ্য, যে করেই হোক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং পেশী ও অর্থের সাহায্যে কর্তৃত্ব বিস্তার। এ কারণে তারা তাদের মতো করে ব্যবহার করে। এ কারণেই তারা অনবরত মিথ্যা বলে। আমাদের দেশের মানুষের একটা বড় অংশ অশিক্ষিত নয় এবং শিক্ষিতদের একটি অংশ ডানপন্থী। আর এজন্যই ...নায়াত মিথ্যা ও ধর্ম ব্যবহার করে বহাল তবিয়তে টিকে আছে।

জামাতের জঙ্গি রূপটা আমরা ভালভাবে অনুধাবন করি ১৯৭১ সালে। বেগম জিয়া সেটি অনুধাবনে অক্ষম। পাকিদের সহযোগী ভৃত্য হিসেবে জামাতিরা এমন কোন নারকীয় কাজ নেই যে করেনি। তাদের কিলিং স্কোয়াড আলবদরদের প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। সহযোগী ছিলেন জামাতের বর্তমান নেতৃবৃন্দ। এ বিষয়ে যথেষ্ট লিখিত তথ্যপ্রমাণ বিদ্যমান। তাদের হাত, জোব্বা এখনও রক্তে রঞ্জিত। আমাদের দুর্ভাগ্য, ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদদের জন্য আমরা সেই কিলিং স্কোয়াডের প্রধান ও সদস্যদের বিদায় করতে পারিনি। প্রধানত জিয়াউর রহমানই এজন্য দায়ী। মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ব্যালান্স করার জন্য কিলার জামায়াতিদের তিনিই সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুর্নবাসন করেছিলেন।

আগেই বলেছি, জামাত তার হত্যার ঐতিহ্য সবসময় বজায় রেখেছে। ১৯৭১-৭৫ পর্যন্ত শুধু তা বন্ধ ছিল। সেনাবাহিনী (কারণ পরবর্তী দেড় দশক তারা ক্ষমতায় ছিল) ও জিয়া এবং এরশাদ অনুসারী নষ্ট রাজনীতিবিদদের প্রশ্রয়ে তারা তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য ১৯৭১ সালে লুকিয়ে রাখা এবং ১৯৭৫ সালের পর সরবরাহকৃত ও সংগৃহীত অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। গেরিলা পদ্ধতিতে তারা ছোট ছোট এলাকা 'দখল' শুরু করে। এর উদাহরণ রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরোধীদের রগ কেটে দিয়ে তারা আনন্দ করত। খুন, জখমও তারা কম করেনি রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে। অস্ত্রবাজ জামাতদের কখনও সেনা ভজনাকারী জিয়া বা এরশাদের দল কিছু

বলেনি। এভাবে জামাত বিখ্যাত হয়ে ওঠে রগকাটা দল হিসেবে। অবৈধ বৈদেশিক সাহায্য ও অন্যান্য পন্থায় গড়ে তোলা হয় দলের অর্থনৈতিক ভিত্তি। অস্ত্র ও অর্থ এভাবেই জামাতকে প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম তো সঙ্গে ছিলই।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, বিএনপি জামাতের সঙ্গেই জোট বাঁধবে। এখন অবস্থা এমন যে দুটি দলকে আলাদাভাবে দেখতে হলে সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। যে কারণে নিজামী, মান্নান ভুঁইয়ার লেবাস ছাড়া কথাবার্তা বা চালচলনে পার্থক্য নেই। তবে এক সময় বিএনপি ছিল সিনিয়র পার্টনার। এখন জামাত সিনিয়র পার্টনার। জুনিয়ারদের অবস্থা এখন এত খারাপ যে, ওঠবস করতে বললেও জুনিয়র তাই করবে। কারণ বিএনপির মধ্যেও জামাত/জঙ্গি সমর্থক বেড়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এর প্রমাণ।

সরকারে এসে জামাত তার জঙ্গি পরিচিতি আড়াল করার প্রয়াস নেয়। কারণ আন্তর্জাতিকভাবে জঙ্গি ইমেজ ইতিবাচক নয়। কিন্তু জঙ্গিরা না থাকলে সমাজ ও রাষ্ট্রে জামাতের অস্তিত্ব থাকে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় বিভিন্ন দল। সরকারি মুখপত্র হিসেবে পরিচিত এনটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন আসলে জেএমবিরই অংশ। কাজের সুবিধার জন্য তারা বিভিন্ন নাম গ্রহণ করে। বাংলাদেশে এরকম প্রায় ৬০টি দল আছে। যে যত অজুহাত বা ব্যাখ্যাই প্রদান করুন না কেন, আজ এ বিশ্বাস জন্মেছে এগুলো কোন বা কোনভাবে জামাতের সঙ্গে জড়িত।

যত জঙ্গি ধরা পড়েছে, তারা সবাই যুক্ত ছিল মাদ্রাসার সঙ্গে। অনেকে মাদ্রাসা পাস করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মাদ্রাসার শিক্ষকরা এমন কিছু শিক্ষা দেয় যাতে একটি ছাত্র জঙ্গি হয়। বিভিন্ন জঙ্গি তাদের কনফেশনেও একথা বলেছে। সিলেবাসেও গণ্ডগোল আছে নিশ্চয়। সরকারি ও কওমি মাদ্রাসায় কর্তৃত্বের তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু অন্তিমে মূল বিষয়টি এক। যেমন–আমিনী-নিজামী কর্তৃত্বের ব্যাপারে একে অপরকে অপছন্দ করলেও একই জোটে আছেন এবং জঙ্গিবাদের সমর্থনে বিভিন্ন সময় বক্তব্য রেখেছেন। মাদ্রাসা সম্পর্কে কোন কথা উঠলেই আমিনীর হুঙ্কার শোনা যায়। জঙ্গিবাদ না চাইলে মাদ্রাসা শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে হবে। একই আধুনিক শিক্ষার অন্তর্গত করে এর সংস্কার করতে হবে। কিন্তু তা রাজনীতিবিদরা করবেন কিনা সন্দেহ। প্রতিটি সরকারের সময় মাদ্রাসার বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ আমলে আরও বেশি। এর কারণ, সেক্যুলার রাজনীতিবিদদের একটা বড় অংশ ধর্ম ব্যবহার করতে চেয়েছে। এভাবে রাজনীতিবিদরা স্রেফ সুবিধাবাদী পলিটিশিয়ান হয়ে রইলেন, স্টেটম্যান হলেন না। পাকিস্তানের মতো দেশেও জেনারেলরা এখন মাদ্রাসা রেজিস্ট্রিকরণসহ কিছু নিয়ম-কানুন আরোপ করছেন। আমাদের রাজনীতিবিদরা সে সাহসও অর্জন করেননি। মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রাখলে তাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ বা সময়োপযোগী করতে হবে। এর সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। না হলে জঙ্গি সৃষ্টি হবেই। জঙ্গি থাকবেই। আজ এ সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সাহস আমাদের দেখাতে হবে।

যতজন জঙ্গি ধরা পড়েছে তাদের অধিকাংশ বলেছে, কখনও না কখনও তারা জামাতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ সূত্রে এই তত্ত্বই পাই যে, জঙ্গি সংগঠনগুলো জামাতের অঙ্গসংগঠন। যেমন–বিএনপি তাঁতি দলের সদস্যরা বলতেই পারে তারা বিএনপির নয়। কিন্তু আসল সত্যটি কী? নিজামী যদি বলেন, ১৯৭১ সালে আমি জামাত করিনি তখন কিছু বলার থাকে না। কারণ নিজামী তখন ছাত্র (শিবিরের) নেতা ও আলবদরের প্রধান। সে কারণে বলা যেতে পারে, সব জঙ্গি সংগঠনেরই মাতৃসংগঠন জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ, তারা স্বীকার করুক বা না করুক।

জঙ্গি নেতা আবদুর রহমান বলছে, তার আদর্শ হল 'সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী, অধ্যাপক গোলাম আযম, আহমেদ আবদুল কাদেরসহ বেশ কয়েকজন ইসলামী লেখক। এদের লেখা বই নিয়মিত পড়া ছাড়াও জেএমবির মজলিস-ই-শূরা সদস্যের পড়া ছিল বাধ্যতামূলক।' (ইত্তেফাক ৬-৩-০৫)। অধিকাংশ জঙ্গির কাছে এ ধরনের বই ও সাঈদীর ক্যাসেট পাওয়া গেছে। জামাত বলতে পারে, এসব বই পড়ার অধিকার সবার আছে। আছে, কিন্তু ধর্মব্যবসায়ীদের দলের সমর্থক ছাড়া কেউ এদের বই পড়ে না। কিছু একাডেমিশিয়ান গবেষণার জন্য পড়তে পারেন। প্রধানমন্ত্রী থেকে প্রায় সব মন্ত্রী জঙ্গি কর্মকাণ্ডের জন্য এখনও আওয়ামী লীগকে দোষী করেন। মওদুদী, গোলাম আযম, সাঈদী কি আওয়ামী নেতা?

জঙ্গিদের টাকা আসে কোথা থেকে? ইনকিলাবের মতো চরম ডানপন্থী পত্রিকাও শিরোনাম করেছে-'জামাতে ইসলামী পরিচালিত ব্যাংকে জেএমবির অর্থ লেনদেন' (৮-৩)। দেশের ৬টি পূর্ণাঙ্গ ও ৭টি সনাতন ব্যাংক পরিচালিত হয় শরিয়া কাউন্সিল দ্বারা। যার প্রধান সরকারি কর্মচারী বায়তুল মোকাররমের খতিব। এই কাউন্সিলের কোন জবাবদিহিতা নেই এবং তা অবৈধ (জনকণ্ঠ ৮-৩)। অর্থমন্ত্রী কি তা জানেন না? জানেন। কিন্তু করার কী আছে, জঙ্গি তো জোটেরই সৃষ্টি। আর অবৈধ কাজকামের সংখ্যা এ আমলেই বেশি।

জঙ্গিরা যদি জোট সরকারের প্রশ্রয় না পেত বা সমর্থন না থাকত তাহলে গত ৪ বছরে এতসব নিষ্ঠুর অমানবিক কাণ্ড ঘটত না। আজ যদি আবদুর রহমান বা সিদ্দিকুল ইসলামকে ধরা যায়, তাহলে ৪ বছর আগে তারা যখন হত্যাকাণ্ড শুরু করে তখনও তাদের ধরা যেত। এদের দু'জনকে ধরতে বাধ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত সরকারের প্রতিটি মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, নেতা, র‍্যাব, পুলিশ তাদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছে। গত ৪ বছরের পত্রপত্রিকায় এর অজস্র উদাহরণ আছে। কয়েকটি উদাহরণ–

১. প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া থেকে জোটের নিম্নতম কর্মী পর্যন্ত বলেছেন, বাংলাদেশে জঙ্গি বলে কিছু নেই। আছে কিছু সন্ত্রাসী, যার মদদদাতা আওয়ামী লীগ ও ভারত। নিজামীর ক্লাসিক উক্তি স্মরণীয়-বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি। এখন তাহলে জঙ্গি এলো কোথা থেকে? অর্থাৎ জোটের সবাই মিথ্যাচার করেছে। এটি খুবই লজ্জার বিষয়। দুইদিন আগেও প্রধানমন্ত্রী এক জনসভায় একই ধরনের ইঙ্গিত করেছেন।

২. অথচ জঙ্গিরাই বলেছে সরকার তাদের সমর্থন করছে। কিছু উদাহরণ–

ক. কথিত বাংলা ভাইয়ের অস্তিত্ব নেই- ভূমি উপমন্ত্রী দুলু (প্রথম আলো ২৩.৫.০৪)।

খ. 'বাংলা ভাই ঠিক কাজই করেছে'– নূরুল হুদা, রাজশাহী জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি (ওই, ২৫.৫.০৪)

গ. তথাকথিত বাংলা ভাইয়ের যদি কোন অস্তিত্ব না থাকে, বাংলা ভাই যদি একটা কাল্পনিক চরিত্র হয়, তাহলে পুলিশের কী করার থাকতে পারে (মন্ত্রী ও জামাত প্রধান নিজামী (ওই, ২৩.৬.০৪)।

ঘ. 'সর্বহারাদের সন্ত্রাসের মধ্যে বাংলা ভাইয়ের কর্মকাণ্ড সিন্দুর মধ্যে একটা বিন্দু মাত্র'-১৯৭১ সালে আলবদর প্রধান, বর্তমানে জামাত নেতা ও মন্ত্রী নিজামী (ওই, ২৩.৬.০৪)।

ঙ. 'বাংলা ভাই সম্ভবত বাংলাদেশের বাইরে পালিয়ে আছে'–স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর (ওই, ৮.৩.০৫)। সরকারের মন্ত্রীরা বিশেষ করে বাবর, মান্নান ভুঁইয়া ও নিজামী পুরো বিষয়টি নিয়ে ঠাট্টা করে বাংলা ভাইকে ইংলিশ ভাইও বলতেন।

এছাড়া ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন পত্রিকায় খবর অনুযায়ী মন্ত্রী আমিনুল হক, আলতাফ হোসেন, আলমগীর কবির, সংসদ সদস্য নাদিম মোস্তফা প্রমুখ জঙ্গিদের সমর্থন দিয়েছেন। এরা সব বিএনপির। বাবর এতদিনে এই প্রথম বুদ্ধিমানের মতো বলেছেন, 'বাংলা ভাইকে নিয়ে সংবাদপত্রের খবর সত্য'। এটি না বললে সরকারের নজিরবিহীন সাফল্যের কথা আবার বলা যায় না।

সিদ্দিকুল ইসলাম রাজশাহীতে নজিরবিহীন সমর্থন পেয়েছিল বিএনপি সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, নেতা, পুলিশ অফিসার, জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে। মাত্র কয়েক মাস আগে প্রথম আলোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সিদ্দিকুল বলেছিল–'প্রথম আলো। আপনি নাটোরের উপমন্ত্রী দুলু, রাজশাহীর এসপি মাসুদ মিয়াসহ এ অঞ্চলের বড় বড় নেতা এবং পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। কি কথা হয়েছে তাদের সঙ্গে? তারা কীভাবে আপনাকে সাহায্য করেছেন?

বাংলা ভাই : এদের সঙ্গে আমার সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে, তারা আমাদের কাজে খুশি' (৫.৫.০৪)

সুতরাং, বিরোধী দলসহ অনেকেই যদি একে সাজানো নাটক বলে তাতে অতিশয়োক্তি নয়। জোট দেশে-বিদেশে প্রমাণ করতে চায় তারা জঙ্গিবাদের সমর্থক নয়। কিন্তু তা ধোপে টিকছে না। সরকার সত্য অস্বীকার করতে পারেন, নিজামী পারেন, কিছু কিছু কলামিস্ট তাদের হয়ে কলম ধরতে পারেন কিন্তু সবাই তো আর পুতুল নয়। জোট কি ধরত বাংলা ভাই বা রহমানকে? মোটেই না, আন্তর্জার্তিক সম্প্রদায়ের আলটিমেটামের কারণেই ধরতে হয়েছে। সে কারণে দু'মাস আগে মান্নান ভুঁইয়া বলেছিলেন, দু'মাসের মধ্যে জঙ্গি নেতা ধরা পড়বে। আড়াই মাসের মধ্যে ধরা হল। বাবর দেশে ফিরে বললেন, কয়েকদিনের মধ্যে বাংলাভাইকে ধরা হবে। দু'দিনের মধ্যে বাংলা ভাইকে ধরা হল। এতসব কাকতালীর ঘটনা ঘটতে পারে না। সরকার ধরতে

বাধ্য হয়েছে। কারণ জনজীবনে সঙ্কট এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। বিরোধী দলকে টাকা খরচ করতে হচ্ছে না তেমন, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিরোধীদের বিশাল বিশাল সমাবেশ হচ্ছে। ফলে লোকজনের দৃষ্টি, মিডিয়ার দৃষ্টি অন্যদিকে নেয়া দরকার। মিডিয়াকে অনুরোধ, জঙ্গিদের ছাড়াও সার-বিদ্যুৎ সঙ্কট, কৃষকদের বিক্ষোভগুলো যথাযথভাবে তুলে ধরার। এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেছেন 'বর্তমান ইসলামী জঙ্গীকে কেন্দ্র করে আমরা যে সমস্যা দেখছি তা আসলে সৃষ্টি করা একটি ইস্যু। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই জঙ্গিদের সৃষ্টি করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।... এখন এই জঙ্গিবাদকে ক্ষমতার স্বার্থেই নানাভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কখনও এদের ব্যবহার করে ইস্যু সৃষ্টি হচ্ছে, কখনও শাসকরা নিজেদের স্বার্থেই এদের নির্মূল করছে। দুভার্গ্যজনক হচ্ছে এর চরম মূল্য দিতে হচ্ছে মানুষকে। (জনকণ্ঠ ৮.৩.০৫)। তিনি আরও বলেছেন, পাকিস্তানি মৌলবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এখানকার জঙ্গিদের। এটি নতুন কথা নয়। আমরা এসব কথা অনেকবার বলেছি। শুধু পাকিস্তান নয়, ভারত, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশের মৌলবাদীদের সঙ্গেও এদের সর্ম্পক আছে। এসব দেশের কিছু সংস্থা বিশেষ করে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এদের মদদ যোগাচ্ছে এটিও অনেকবার পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে। শায়খও জিজ্ঞাসাবাদে তাই বলছে।

সরকারের সঙ্গে যে জঙ্গি নেতাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এর প্রমাণ আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের সময় অনেক আলামত নষ্ট করা। সিজার লিস্টে অনেক কিছু বাদ দেয়া হয়েছে। এগুলো পত্রপত্রিকার খবর। আবদুর রহমান প্রশ্নোত্তরে বলেছে, 'জোট সরকারের এক প্রভাবশালী নেতার টিনটেড গ্লাসের গাড়িতে সপরিবারে তাকে সিলেট শহরে পৌছে দেয়া হয়।... একটি পতাকাবাহী গাড়ি কাঁচপুর ব্রিজ পর্যন্ত তাদের গাড়িটিকে গার্ড করে পৌছে দেয়' (জনকণ্ঠ, ৮.৩.০৬)। জানা গেছে, পত্রিকার খবরে প্রশ্নোত্তরের সময় জোট নেতাদের নাম বললে টেপ বন্ধ করে দেয়া হয় (এত গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তারপরও সব খবর পত্রিকায় আসছে কীভাবে?)। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে কিনা গোয়েন্দাদের এই প্রশ্নে (এ সময় ভিডিও বন্ধ ছিল) 'শায়খ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, জেএমবির সঙ্গে কারা জড়িত তা কেবল সরকার ও সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন জানে! এছাড়া গোটা দেশবাসীই জানে। শায়খ এ সময় বলেন, দলের গঠনতন্ত্র পাল্টে জোটে যোগ দিয়ে যারা ক্ষমতায় আসীন রয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে সংসদ নির্বাচনের সুযোগ আদায়ের লোভে এতদিন তারাই জেএমবিকে মদদ দিয়েছে।... জামাত দেশের অন্যান্য ইসলামী সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ভয়ে সভা-সমাবেশ করে জঙ্গিবিরোধী মতবাদ প্রচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে।' (ওই) একটি পরিসংখ্যান দেখুন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ২২৮টি মামলার রায় হয়েছে ৪টি। দ্রুত বিচারে কোন মামলা নেই। চার্জশিট হয়েছে ১২২টির মধ্যে ১০৬টির। তদন্তে ত্রুটি ৯০টি (অনেক জঙ্গি ছাড়া পেয়েছে এ কারণে। সিদ্দিকুল ইসলামকেও একবার ধরে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল)। বিচারাধীন আছে ৬১টি (যুগান্তর, ৮.৩.০৬)। এসব পরিসংখ্যান কি তুলে ধরে সরকার জঙ্গিবিরোধী? এরা

এবং জোটের চামচারা জানে না, প্রয়োজনে জোটের নীতিনির্ধারকরা এদের ছেঁটে ফেলবে। শায়খকে ধরিয়ে দিল সে, যে আশ্বাস দিয়েছিল তাকে ধরা হবে না, শায়খ ধরিয়ে দিল বাংলা ভাইকে, এরা আবার ধরিয়ে দিচ্ছে তাদের অনুচরদের, জামায়াতি নেতারা এখন তাদের অস্বীকার করছে, মাসুদ মিয়াদের চাকরি যাচ্ছে, প্রয়োজনে মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদেরও যাবে।

র‍্যাব-পুলিশদের দৃষ্টিভঙ্গিও লক্ষণীয়। র‍্যাবের ক্রসফায়ারে অনেকে নিহত হলেও কোন জঙ্গি নিহত হয়নি। 'সন্ত্রাসী'দের হত্যার পর র‍্যাব তাদের তুমি বলে সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করে আর আবদুর রহমানদের বলে আপনি। তাদের ভালভাবে নাশতা পানি খাওয়ানো হয়। ডাক্তার দেখানো হয়। বাংলা ভাইকে ধরার পর পাখার বাতাস করা হয়। অথচ মনে পড়ে, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীরকে গ্রেফতার করে অমানুষিক নির্যাতনের পর প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও দেয়া হয়নি। বাংলা ভাই রুটি-হালুয়া পছন্দ করে বলে তাকে তা দেয়া হয়েছে। আরও লক্ষ্য করুন, বাংলা ভাইয়ের শরীর সামান্য ঝলসে গেছে ও দুটি স্প্রিন্টার ঢুকেছে। তাকে বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেছে। এমনকি সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারও। অথচ নির্বিরোধী শাহ কিবরিয়া স্প্রিন্টারে ঝাঁঝরা হয়ে ছয় ঘন্টা বেঁচে রইলেন। তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না, বেসরকারি বা সরকারি হেলিকপ্টারেও না। অথচ তিনি যে সাবেক অর্থমন্ত্রী ছিলেন তাই-ই নয়, বর্তমান সংসদের সদস্যও ছিলেন। সুতরাং এ ধরনের পুলিশ, র‍্যাব থাকলে, জোট থাকলে, ইসলামের ঠিকাদার হিসেবে পরিচিত দলগুলো থাকলে, মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়লে জঙ্গি শুধু থাকবে না, সংখ্যাও বাড়বে।

এ জঙ্গিরা এ পর্যন্ত বিচারক, পুলিশ, আইনজীবীসহ ২৯ জনকে হত্যা করেছে, আহত হয়েছেন ৯ শতাধিক আর চির পঙ্গুত্ববরণ করেন ২ শতাধিক (ইত্তেফাক, ৫.৩.০৬)। এসবের জন্য শুধু শায়খ/বাংলা ভাই বা জঙ্গিদের দায়ী করলে অবিচার হবে। যারা এদের প্রশ্রয় দিয়েছে এসব প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ডের, যেসব পুলিশ অফিসার এসব হত্যাকাণ্ডের মামলা নেয়নি, যেসব সংসদ সদস্য, মন্ত্রী এদের প্রকাশ্যে সহায়তা করেছে তাদেরও গ্রেফতার করতে হবে। না হলে ন্যায্যবিচার হবে না এবং জোট যে জঙ্গিদের সমর্থক তাও আবার প্রমাণিত হবে। জঙ্গি দমন হতে পারে, জঙ্গিবাদ দূর হতে পারে যদি বিরোধী দল ঘোষণা করে, তারা ক্ষমতায় গেলে দ্রুত নয় অতি দ্রুত বিচারালয় স্থাপন করে জঙ্গি ও এর সমর্থকদের বিচার করবে এবং ২৯ জন নিহত, ৯০০ আহত ও পঙ্গু হয়ে যাওয়া ২০০ জনকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে জঙ্গি ও তাদের সমর্থকদের। এতে তাদের লুটের কিছু টাকা নির্যাতিত গরিবরা পাবে। তাহলে জঙ্গিবাদ নির্মূল হওয়ার আশা করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, ঘোষণা করতে হবে (যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী হন) বাংলাদেশ হয়েছিল জঙ্গি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসেবে এবং বাংলাদেশ তা-ই থাকবে। জানি না, বিরোধীদের সে মুরোদ বা সৎসাহস আছে কিনা।

১.৬.০৬

‘কই উনি তো শহীদ হলেন না’

শায়খ আবদুর রহমানকে যখন গ্রেফতারের পাঁয়তারা চলছে তখন আমি দেশের বাইরে। চ্যানেল আইটা সেখানে দেখা যায়। খবর দেখে মধ্যাহ্নভোজের সময় রাজনীতিমনস্ক একজনকে বেশ উচ্ছাসভরেই বললাম, ‘যাক দ্বিতীয় সারির প্রধান জঙ্গিকে তাহলে ধরা গেল।’ তিনি মৃদুস্বরে বললেন, ‘ধরা হল কি বাই কনসালটেশন?’ আমি একটু থমকে যাই। এবং মুহূর্তে গত কয়েক বছরের ঘটনা ভেসে ওঠে এবং আবারও অনুভব করি, বর্তমানে দেশে যেমন ঘটনা ঘটছে তার কোনটাই আকস্মিক নয়। এবং প্রতিটি ঘটনার পেছনে কোন না কোন রাজনীতি কাজ করছে। গত দু'দিন পত্রপত্রিকা জুড়ে সেসব রাজনীতির কথা বলা হচ্ছে এবং বিদেশেও যারা বাংলাদেশের খোঁজখবর রাখেন তাদের ধারণাও এ বিষয়ে বেশ স্বচ্ছ।

আবদুর রহমানকে এখন ধরা হল কেন? ওই যে ‘বাই কনসালটেশন’, মন্তব্য সেটি বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ৬৩টি জেলায় বোমা ফাটার পর স্বদেশী-বিদেশী চাপে সরকার কিছু জঙ্গিকে ধরতে বাধ্য হয়। তবে, তারা বাংলা ভাই ও আবদুর রহমানকে পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সময় দেয়। এতদিন তৃতীয়-চতুর্থ সারির জঙ্গিদের ধরা হয়েছে। তখনই পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে, আবদুর রহমান ও বাংলা ভাই কোথায় সরকারি কর্তাব্যক্তিরা তা জানে। তাদের সময়মতো ধরবে। সময়টা নির্ধারিত হল মার্চ মাস।

গত এক মাসে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ডিজেল, সারের অভাবে চাষীরা চাষ করতে পারছে না। উত্তরাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ অবস্থা বিরাজ করছে। লোডশেডিং, জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধিতে মধ্যবিত্ত ক্রুদ্ধ। চতুর্দিকে এক অরাজক অবস্থা, মন্ত্রীরা টাকা খেয়ে দেশে আর পরবর্তী সরকারের খাওয়ার জন্য কিছু রেখে যাচ্ছে না-তা সবাই বিশ্বাস করছে। নির্বাচন কমিশনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন কমিশনের সদস্য বিচারকরা। বিরোধীরা আন্দোলনে প্রস্তুত। বিদেশীরাও সরকারের পক্ষে নয়। পরিস্থিতি এরকম চললে, আন্দোলনের দরকার পড়বে না, সরকার আপনিই পতিত হবে। অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট বুশ ভারত-পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, আবদুর রহমানকে এখন ধরলে কমপক্ষে দু'সপ্তাহের একটা বিরতি পাওয়া যাবে। সরকারের অনুমান বেঠিক নয়। পত্রিকা থেকে অন্যান্য খবর এখন উধাও। প্রধানমন্ত্রী আমাদের মহাজন আমেরিকাকে বলতে পারছেন, আমরা জঙ্গি ধরছি। তাছাড়া এক তারিখে চট্টগ্রাম শহর যে পুরোটা মিছিলের শহরে পরিণত হবে সেটিও সরকারের

অজানা ছিল না। আবদুর রহমানকে ওইদিন গ্রেফতার করে বিরোধী দলের বিশাল, অতি বিশাল সমাবেশের খবর হটিয়ে দেয়া গেছে।

এসব যুক্তি উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু শায়খের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য বিষয়ে যুক্তি নাকচ করা যাবে কীভাবে? পরিবার-পরিজন নিয়ে কেউ আন্ডারগ্রাউন্ডে যায়-এই প্রথম জানলাম। শুধু তাই নয়। ছেলেকেও রহমান স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। এতদিন জানতাম, আন্ডারগ্রাউন্ডে একজনই যায়। শুধু তাই নয়, রহমানকে সসম্মানে গ্রেফতার করা হল। জেলা প্রশাসক, র‍্যাব কর্মকর্তারা সমসময় তাকে 'সাহেব' বলে সম্বোধন করছিলেন। অথচ এ লোকের নির্দেশে কত লোক খুন হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে। তার মাথার দাম ধরা হয়েছে পঞ্চাশ লাখ টাকা। আমি, শাহরিয়ার কবির বা সাবের চৌধুরী কি কাউকে খুন করেছিলাম না নির্দেশ দিয়েছিলাম? রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মর্যাদা (যদি সেটিকে বিবেচনায় ধরেন) কি আবদুর রহমান থেকে আমাদের কম ছিল? আমাদের মধ্যরাতে তুলে নেয়া হয়েছে, হাজতে দাগী খুনির সঙ্গে ফেলে রাখা হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা শুধু নয়, রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা আনা হয়েছে। হাজতি ভ্যানে করে আনা-নেয়া হয়েছে। আবদুর রহমানকে গ্রেফতার করে যত্ন করে নাস্তা খাওয়ানো হয়েছে, আরামদায়ক পাজেরো জাতীয় গাড়িতে ঢাকায় আনা হয়েছে। আবদুর রহমানের নামে বিস্ফোরক আইনে মামলা হয়েছে। অথচ রহমান শুধু ক্রিমিনাল নয় নিষিদ্ধ ঘোষিত একটি সংগঠনের নেতা। সরকার কাকে কী দৃষ্টিতে দেখছে এতেই তা পরিষ্কার।

আবদুর রহমান কেমন নেতা? ধার্মিক হলে সে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করত না। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে আবদুর রহমান ক্ষমতার অধিকারী হতে চেয়েছে। এজন্য প্রচুর টাকা বিদেশ থেকে পেয়েছে। সরকারি প্রশ্রয় পেয়েছে। তার অনুসারীদের শায়খ জেহাদের জন্য শহীদ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তার কাজকর্ম সব এর বিপরীত। প্রথমত রহমান আত্মসমর্পণের আগে বলেছে, সে জীবিত ধরা দেবে না অর্থাৎ আত্মহত্যা করবে যা ইসলামে নিষিদ্ধ। কিন্তু সুড়সুড় করে পরে সে আত্মসমর্পণ করেছে। লোক দেখানোর জন্য হাতে কোরআন শরিফ ছিল আবার! সোহরাব হাসান ঠিকই লিখেছেন, 'যে শায়খ সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করে শিষ্যদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল, সেই শায়খ জীবন বাঁচাতে কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ করল র‍্যাবের হাতে। তার কথা ও কাজে মিল ছিল না। বিশ্বাসে ফাঁকি ছিল।' (যুগান্তর, ০৩.০৩.০৬)। ডেইলি স্টারের শিরোনামটিও ছিল যথোপযুক্ত 'টেরর ডন সারেন্ডারাস মিকলি' (০৩.০৩.০৬)। আমার খারাপ লেগেছে শায়খের স্ত্রীর আর্তি। মহিলা একদিন স্বামী সম্পর্কে যা বিশ্বাস করেছিলেন এখন দেখেন তার পুরোটা মিথ্যা। এ বিশ্বাস ভঙ্গ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমাদের বের করে দিয়ে উনি না বলেছিলেন শহীদ হবেন। আমি আমার মেয়ে, নাতনী এবং কোলের বাচ্চা নিয়ে কাঁদানে গ্যাসের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করলাম।..... কই উনি তো শহীদ হলেন না।' (ইত্তেফাক ০৩.০৩.০৬) এর কারণ, শায়খ অন্যের হয়ে ভাড়া

খাটছিল যেখানে ক্ষমতা দখলটাই ছিল মূল কথা, ইসলামী আদর্শ নয়। অথচ এই লোকটির কারণে অনেক তরুণ বিপথগামী হয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, আহত হয়েছে। এবার তার অনুসারীরা দেখুক তাদের নেতা কী রকম! আরও উল্লেখ্য, ধরা পড়ার পরপরই শায়খ তার অনুসারীদের সম্পর্কে খবরাখবর দেয়া শুরু করেছে। বেগম জিয়া এই মুহূর্তটি কাজে লাগাতে চেয়েছেন পরিকল্পনামাফিক। হঠাৎ তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি সব ইসলামী দল ও রাজনৈতিক দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাকে সহযোগিতা করার জন্য, শুধু একটি দল ছাড়া। নামোল্লেখ না করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দলটি আওয়ামী লীগ। তার অভিযোগ আওয়ামী লীগ 'উল্টো মদদ যুগিয়েছে সন্ত্রাসীদের।' কিভাবে সেটি বলেননি। তারা কিভাবে সহযোগিতা করবে সরকারি দলকে যেখানে সবসময় বলা হয়েছে তারা সন্ত্রাসীদের মদদ যুগিয়েছে, না, সরকারি প্রশাসন তাদের হাতে? মনে হয়, সরকার যা করবে তা সমর্থন করাই হচ্ছে সহযোগিতা। তাহলে তো সন্ত্রাসীদের সমর্থন করতে হয়। গত চার বছর সরকারের যে কর্মকাণ্ড তা সন্ত্রাস ছাড়া আর কি? শুধু তাই নয়, জোটের মন্ত্রীরা তো সবসময় মিথ্যা বলছে। সারের জন্য কৃষকরা বিক্ষোভ করছে আর ইসলামের আরেক ঠিকাদার নিজামী বলছে, সারের মজুদ যথেষ্ট। এই লোকটিই বলেছিল, বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি। তাহলে তার সরকার মিডিয়া সৃষ্ট লোকের জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে কিভাবে? চারদিকে বিদ্যুতের হাহাকার আর বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলছেন, কোথাও বিদ্যুতের কোন অভাব নেই। আরও আছে, ২২ আগস্ট গ্রেনেড হামলা বা রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরীকে যারা গ্রেনেড ছুড়েছিল তাদের কি গ্রেফতার করা হয়েছে?

প্রধানমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেছেন, এখন এ ধরনের জঙ্গি সন্ত্রাস বন্ধ হবে। সত্য নয় এমন কথা তিনি বলেন কিভাবে? চারদলীর জোটের দুটি দল তো সবসময় জঙ্গিবাদের সমর্থন করছে। যাদের জঙ্গি হিসেবে ধরা হচ্ছে, 'তাদের অধিকাংশ বলেছে, তারা ছাত্র শিবির বা জামাতে ইসলামীর সঙ্গে জড়িত বা কোন সময় জড়িত ছিল। জঙ্গিদের আস্তানা থেকে যেসব বই-পুস্তক উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক বই-ই হচ্ছে গোলাম আযম বা মওলানা মওদুদীর। (যুগান্তর ০৩.০৩.০৬) আর পাওয়া যাচ্ছে সাঈদীর ক্যাসেট। জামাত হচ্ছে প্রথম সারির জঙ্গি প্রবক্তা। শায়খরা হচ্ছে দ্বিতীয় সারির। যে কারণে, শায়খের বাসা থেকে গোলাম আযম বা মওদুদীর বই পাওয়া গেলেও তা সিজার লিস্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জামাত, ঐক্যজোট সবসময় বলছে শায়খের মতো (বা শায়খ বলেছে তাদের কথামতো) তারা আল্লাহর আইন চায়। ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন করতে চায়। কয়েকদিন আগেও আমিনীরা বলেছেন, তারা হামাসের মতো বিজয় চান। সুতরাং জঙ্গিদের সঙ্গে রেখে জঙ্গি দমনের কথা বলা নিত্যন্ত হাস্যকর, মতলববাজি। এরা সরকারের হয়ে সমাজে সরকারের কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চাচ্ছিল। যে কারণে, গত তিন বছর প্রকাশ্যে জঙ্গিদের উত্থান, অত্যাচারে সাড়া দেয়নি সরকার। মাত্র কয়েক মাস হল বাধ্য হয়ে জেএমবিকে নিষিদ্ধ করেছে। সরকারি প্রশাসন

প্রকাশ্যে এদের সহায়তা করেছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. তাহের হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত শিবির নেতা সালেহীকে গ্রেফতার না করা। পত্রপত্রিকায় তাকে গ্রেফতারের কথা বললেও সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি।

প্রশাসন শুধু নয়। সরকারি মন্ত্রীরাও প্রকাশ্যে জঙ্গিদের সমর্থন করেছে। ডেইলি স্টার একটি রিপোর্টে এ ধরনের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছে (০৩.০৩.০৬)। তারা হলেন–টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আমিনুল হক, ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস দুলু, বিএনপি সাংসদ নাদিম মোস্তফা ও মিজানুর রহমান মিনু, বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী ও গোপালগঞ্জ বিএনপির সভাপতি, জামাত মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী, বিএনপির মন্ত্রী/সাংসদ ও গ্রেফতারকৃত জঙ্গিরা এসব নাম উল্লেখ করেছে। অবশ্য, উপরোল্লিখিতরা এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে (ডেইলি স্টার, ০৩.০৩.০৬)। এ হিসেবে বিএনপিকে জঙ্গিদের মদদদাতা বা জঙ্গি সমর্থক বা জঙ্গিও বলা যেতে পারে। অবশ্য, তাদের মহাজন আমেরিকা মনে করে, তারা মডারেট ইসলামিক বা ডেমোক্রেটিক দল। আমেরিকা তালেবানদেরও তাই মনে করত। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, মহাজনরা দুষ্কর্মের সহায়তাকারীদের বিপদে পড়লে ত্যাগ করে। পুলিশের মাসুদ মিয়ারা সরকারি নির্দেশে আইন অমান্য করে জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিয়েছিল। তাদের চাকরি গেছে। শায়খের অনুসারীরা মারা যাচ্ছে, আত্মগোপন করে আছে আর শায়খ ধরা দিয়ে তাদের নাম বলে দিচ্ছে। যে শায়খ সরকারের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করছিল সরকার এখন তাকে ধরেছে। যে আমেরিকা তালেবানদের মদদ দিয়েছিল আজ তাদের তারা হত্যা করছে। সুতরাং, জোট যতদিন থাকবে ততদিন জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে না, হতে পারে না। এ কারণেই শায়খকে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে দেয়া হয়নি। যদি সে বেফাঁস কোন কথা বলে দেয়।

আরেকটি থিউরি হচ্ছে, সরকারের এখন বিভিন্ন গ্রুপ। এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে নাজেহাল করতে চাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এখন সিঙ্গাপুর হয়ে জাপানে। তিনি দেশে থাকলে শায়খ ধরা পড়ত কিনা সন্দেহ। কারণ, এক সময় বাংলা ভাইকে তিনি পরোক্ষভাবে হলেও সমর্থন করেছেন। বলা হয়ে থাকে তিনি তারেক জিয়ার নমিনি। তারেক জিয়াও এখন সিঙ্গাপুর হয়ে জাপানে।

অনেকে হয়তো খুশি যে, শায়খের বিচার হবে, শাস্তি পাবে। অদূর ভবিষ্যতে নয়। মওদুদ আহমদের কথাবার্তা শুনে কী মনে হয়? এসব কারণেই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে দুর্বল চার্জশিট দেয়া হচ্ছে। তাদের কারও বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হয়নি যা করা হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী, ইতিমধ্যে অনেক জঙ্গি জামিনও পেয়েছে। সরকার দিন গুনছে, কখনও অন্য খবর আবার বড় হয়ে উঠবে। এসব খবর চাপা পড়ে যাবে। দরকার হলে তারা ঘটনা সৃষ্টি করবে। সরকার হয়তো মনে করছে, জনসমর্থন এখন তাদের দিকে যাবে। এটি একটি 'সাফল্য'। হতে পারে, কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। অধিকাংশ পত্রপত্রিকাই জানাচ্ছে, এ গ্রেফতার 'বাই কনসালটেশন'।

যে কৃষক ফসল বুনতে পারছে না তার কাছে শায়খ রহমান গ্রেফতার হওয়া না হওয়া কোন ঘটনা নয়। যেসব গার্মেন্টিস কর্মী পুড়ে মারা পড়ছে মালিকদের কারণে, তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে এ গ্রেফতার কোন খুশির বার্তা বয়ে আনবে না। যে মধ্যবিত্ত দু'বেলা ভাত খেতে হিমশিম খাচ্ছে তার কাছে এ 'খুশির খবর' ইতিমধ্যে অতীত। মন্ত্রীরা যে মিথ্যা স্তোক দিচ্ছেন এটিও হোয়াইট কলারদের কাছে স্পষ্ট। সমস্ত সমাজ ফুঁসছে। প্রশ্ন উঠছে, বাংলা ভাই গ্রেফতার হচ্ছে না কেন? লাভা উদ্গিরণের ঠিক আগে নয়তো নির্বাচনের আগে (যদি নির্বাচন হয়) আবার বাংলা ভাই গ্রেফতার হবে। তার আগে নয়।

যুগান্তর, ৫.৩.২০০৬

ধর্ম, হেরোইন ও রাজনীতি

উপরের শিরোনামে অনেকে বিভ্রান্ত হতে পারেন। বিচলিতও বোধ করতে পারেন। কারণ ধর্ম শব্দটি শুনলেই আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি ভয়ে। অথচ ধর্ম শব্দ শুনলে সন্ত্রস্ত নয়, আমাদের আনন্দিত হওয়ারই কথা ছিল। কারণ ধর্ম তো ভয়ের হতে পারে না, ধর্ম হবে ভালবাসার। কিন্তু কেন তা নয় সেটিই আমাদের অনুধাবন করার সময় এসেছে। অবশ্য পুরনো মার্কসবাদীরা আমার এই শিরোনামে বিচলিতবোধ করবেন না। কারণ তাদের মারফত আমরা জেনেছিলাম, ধর্ম হচ্ছে আফিমের মতো।

বাংলাদেশে ধর্ম ছিল, বাংলাদেশের মানুষেরও ধর্ম মানার ধর্ম ছিল এবং তা ছিল সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের ধর্ম ছিল, অন্য ধর্মকে সহ্য করার ও অন্য কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার। উর্নিশ শতকে ওহাবিদের বার্তা পৌছল গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে। শুরু হল তর্ক-বিতর্ক, কোনটি ইসলাম কোনটি ইসলাম নয় তা নিয়ে। সে সময়ও ওহাবিদের প্রচার নিছক ধর্মভিত্তিক ছিল না। তাতে রাজনীতিরও ব্যাপার ছিল। বিশ শতকে, ধর্মের ব্যবহার শুরু হল রাজনীতিতে। পরিণতিতে পাকিস্তান। এর পরের ইতিহাস সবার জানা।

পাকিস্তান আমলে ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি, অন্যকথায় ব্যবসা শুরু করে তাদের মধ্যে অন্যতম জামাতে ইসলামী। এর চরিত্র সম্পর্কে আমরা অবহিত নই বললে মিথ্যা বলা হবে। পাকিস্তানে তাদের উদ্ভব হলেও পাকিস্তানে তারা ক্ষমতায় পৌছতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশে পরাজিত শক্তি হয়েও তারা ক্ষমতায় এসেছে। জামাতে ইসলামীর প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে বাংলাদেশীরা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে জামাত ছিল কোলাবরেটর। এখন বলা যেতে পারে যারা জামাত সমর্থন করছে তারাও কোলাবরেটর। সে হিসেবে বাংলাদেশে এখন কোলাবরেটর সংখ্যা কম নয়।

১৯৭১ সাল থেকে জামাতে ইসলামী যা কিছু বাংলাদেশের পক্ষে, তার বিপক্ষে কাজ করেছে। জেনারেল জিয়াউর রহমান জামায়াতিদের অবমুক্ত করেন, এরশাদ আমলে তারা লালিত হয়, বেগম জিয়া তাদের পুষ্ট করেন। বাংলাদেশে জামাত-বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সব সময় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যে জোট থাকবেই। মাঝে মাঝে ব্যক্তিক বা স্বার্থগত কারণে খানিকটা মনোমালিন্য হয়তো হতে পারে। নিজামীরা কি বলেননি তারা নারী নেতৃত্ব মানেন না, নাজায়েজ? কিন্তু তাই বলে মর্ত্যে বেগম জিয়ার নেতৃত্ব অস্বীকার করতে পেরেছেন? জামাতের মতো একই রকম দল আমিনীর ইসলামী ঐক্যজোট। এখন এটি চার ভাগে বিভক্ত। তাদের আদর্শ, চরিত্র জামাতের মতো, স্বার্থগত কিছু বিরোধ আছে মাত্র। এটি বললে অনেকে আপত্তি তুলবেন কিন্তু এই তিনটি দল মোটামুটি একই

রকম। একদলের লোক টাকা-পয়সা করেছে খানিকটা বেশি, কোট-স্যুট পছন্দ করে এই যা। মানুষকে এতে বিভ্রান্ত করা যায় সে কারণেই এই লেবাস। গত পাঁচ বছরে বেগম জিয়া, মান্নান ভূঁইয়া, নিজামী আর আমিনীর বিভিন্ন বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করুন, দেখবেন, সুর মূলত একই রকম-আওয়ামী লীগ বিধর্মীদের পার্টি, ভারত খারাপ, পাকিস্তান ভালো, ইসলাম রক্ষা করতে হবে ইত্যাদি। রাজনৈতিক অবস্থা যত খারাপ হয় তত ইসলামের অবস্থা যেন খারাপ হতে থাকে। এবারও নির্বাচন এগুলে দেখা যাবে ইসলাম বিপন্ন।

এ দলগুলোর মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতায় কোন রকমে টিকে থাকা। এদের সমর্থকরাও তাই। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমএ আজিজ বা অন্যান্য কমিশনার মাহফুজুর রহমান বা স ম জাকারিয়া এর সাম্প্রতিক উদাহরণ। অপমান করুন, গালাগাল করুন, কিছু আসে যায় না। পদটা থাকলেই হল।

বিরোধী দল ক্ষমতায় এলে এবং কোন আন্ডারহ্যান্ড ডিলিং না করলে হয়তো, এই পাঁচ বছরের চিহ্নিত লুটেরাদের বিচার হবে। অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না যখন দেখা যাবে এই লুটেরাদের অধিকাংশ বিএনপির। কিন্তু লুটেরা কি শুধু বিএনপির? জোটের অন্যরা নয়? জোটের অন্যরাও আছে তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী জামাতের অর্থের উৎস অন্য। সেটি হচ্ছে ড্রাগ, যা বিএনপির লুটের টাকা থেকেও বেশি এবং এ ক্ষেত্রে প্রটেকশন দিয়েছে বিএনপি। সামান্য কিছু প্রটেকশন মানি হয়তো তারা পেয়েছে। জামাত একদিকে সাধারণ মানুষকে বশ করার জন্য ধর্মের সবক দিচ্ছে, অন্যদিকে হেরোইন পাচার করে হাজার কোটি টাকা জমা করছে, অস্ত্রভান্ডারও হয়তো গড়ছে, যা ক্ষমতার লড়াইয়েই লাগবে। জঙ্গি উত্থান ছিল তাদের জন্য টেস্ট কেস।

সাপ্তাহিক ২০০০ সম্প্রতি জামাতের হেরোইন পাচার নিয়ে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী করেছে। লিখেছেন তরুণ সাংবাদিক গোলাম মোর্তোজা। তার প্রথম প্যারাটি আমার ভালো লেগেছে, 'ইসলামের সঙ্গে অপকর্মের কোন সম্পর্ক নেই, জামাতে ইসলামীর সঙ্গে আছে। বলা যায়, জামাতে ইসলামী এবং অপকর্ম একে অপরের পরিপূরক শব্দ। হত্যা, ধর্ষণ, মাস্তানি, চাঁদাবাজি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক, চোরাচালানি, যুদ্ধাপরাধ.... অপকর্ম- এ জাতীয় যতগুলো শব্দ আছে, তার সবগুলোর সঙ্গেই সম্পৃক্ততা রয়েছে জামাতের। জন্মের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এই সবগুলো কাজই জামাত করেছে।'

অস্ত্রের মাধ্যমে সমাজে আধিপত্য বিস্তারের নীতি জামাত ১৯৭১ সালে গ্রহণ করে। পাকিস্তানিদের সহযোগী হিসেবে তারা প্রথম অস্ত্র ও রক্তের স্বাদ পায়। স্বাধীনতার পর নিশ্চয় তারা সব অস্ত্র ফেরত দেয়নি। জিয়াউর রহমান তাদের অবমুক্ত করার পর অস্ত্র নিয়ে তারা মাঠে নামে। আপনাদের খেয়াল আছে কিনা জানি না, সে সময় থেকে তাদের ছাত্র সংগঠন শিবির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারের কাজ শুরু করে। সরকারি প্রশ্রয়ে তারা চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র হাতে নামে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অস্ত্র তারা পেল কোথায়? সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, তারা প্রধানত

মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তান থেকে টাকা পেত। সেই টাকার হয়তো একটা অংশ খরচ হতো অস্ত্র জোগাড়ে। পত্রপত্রিকা পড়ে জেনেছি, পকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই মাদক ব্যবসা প্রশ্রয় দিয়ে হিসাবের বাইরে বিপুল অর্থ পায়, যা তারা খরচ করে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বিনষ্টে। জামাত এবং তারা ১৯৭১-এ পরাজিত পক্ষ। সুতরাং প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তারা জামাতকে বেছে নেবে সেটাই স্বাভাবিক। পরে জামাত নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি আরও জোরদার করার জন্য হয়তো মাদক ব্যবসাকেই বেছে নেয়। বিডি ফুডসের জামায়াতি মালিকের হেরোইন পাচার বিদেশী চাপের কারণে ধরা পড়লে এসব কানেকশন আরও স্পষ্ট হচ্ছে। এর সঙ্গে সীমান্ত চোরাচালানের সম্পৃক্ততার বিষয়টি উড়িয়ে দেয়া যায় না। একটি পত্রিকার খবর অনুযারী, 'বিডি ফুডসের বদরুদ্দোজা মোমিন 'হেরোইন' সংগ্রহ করেছেন পাকিস্তান থেকে। পাকিস্তানের জামাতে ইসলামী নেতাদের সঙ্গে রয়েছে তার সখ্য। এভাবে জামাত এনজিও, ব্যাংক, ইন্সুরেন্স, সংবাদপত্র প্রকাশ করে নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করেছে।

জামাতের সেকেন্ড ফ্রন্ট হিসেবে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের উত্থান হয়েছে। সংবাদপত্র অনুসারে, জঙ্গি হিসেবে সরকার যাদের ধরতে বাধ্য হয়েছে তাদের সিংহভাগ জামাত কর্মী। হেরোইন পাচারের টাকা, সীমান্ত চোরাচালান, বিদেশী সাহায্য-এসবের মাধ্যমে জঙ্গিরা শুধু সংগঠিত নয় বিপুলভাবে অস্ত্রও সংগ্রহ করে, যার নমুনা আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। জামায়াতিদের ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক টাকা পাচারে সহায়তা করে। একথা প্রমাণিত হয়েছে। অন্য দেশ হলে এই ব্যাংক বন্ধ হয়ে যেত, যেমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিসিএসআই ব্যাংক। কিন্তু এটি যেহেতু জামায়াতি ব্যাংক সেজন্য মাত্র এক লাখ টাকা জরিমানা দিয়েই সে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারছে।

এ কথা আজ আর মিথ্যা নয় যে, জোট সরকারের মদদে জঙ্গিদের উত্থান হয়েছিল। বিদেশী চাপ না থাকলে আর নির্বাচন ঘনিয়ে না এলে সরকার জঙ্গিদেরও ধরত না, হেরোইন পাচারের খবরও আমরা জানতাম না এবং এটিও নিশ্চিত এদের শাস্তিও হবে না, যেমন বিএনপি ক্ষমতায় এসে সব সন্ত্রাসীকে মুক্ত করে দিয়েছে এ কারণ দেখিয়ে যে, এদের রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার করা হয়েছিল। যদি পরের বার জোট ক্ষমতায় আসে, তাহলে একই কারণে জঙ্গি, হেরোইন ব্যবসায়ী সব মুক্তি পাবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আমরা আল্লাহর ধর্ম, মানুষের ধর্মে বিশ্বাস করি তাহলে জামাতকে ইসলামী দল হিসেবে আমরা মানতে পারি কিনা। যদি মানি এবং সমর্থন করি তাহলে আমরাও হেরোইন পাচার, অস্ত্রবাজি, জঙ্গি সবকিছুর কোলাবরেটর বা যোগসাজশকারী। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ১৯৭৫ সালের পর যারা সরকারে এসেছে তারা প্রত্যেকে জামাতকে প্রশ্রয় দিয়ে আজ এ অবস্থায় নিয়ে এসেছে এবং এ অবস্থা সৃষ্টিতে তারাও যোগসাজশকারীর ভূমিকা পালন করেছে। জামাত নেতারা সব সময় মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত। এতসব কিছুর পরও তারা বলছেন, তাদের জঙ্গি কানেকশন নেই, হেরোইন পাচারের সঙ্গে তারা যুক্ত নন। এমন কথা বলতেও তারা পিছপা হননি যে, তারা ১৯৭১ সালে হত্যার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন না। নির্বাচনের ঠিক আগে তারা আবার ভারত-

বিরোধিতায় নেমেছেন। অথচ জামাত প্রধান মতিউর রহমান নিজামীই ভারতের টাটাদের এখানে নিয়ে এসেছেন। সঙ্গত কারণেই মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিজামীকে জিজ্ঞেস করেছেন, জঙ্গিদের আবার উত্থান হবে কিনা? লক্ষ্য করুন, এ প্রশ্ন রাষ্ট্রদূত আর কাউকে করেননি। অর্থাৎ আমেরিকা ৩০ বছর পর বিশ্বাস করা শুরু করেছে যে, জামাত জঙ্গিবাদী। নিজামী বলেছেন, সে সম্ভাবনা নেই। মার্কিনিরা জানে না–এই আশ্বাস অক্টোবর পর্যন্ত। যদি তারা ফের ক্ষমতায় আসে, যার জন্য তারা নানা তোড়জোড় করছে (যেমন এমএ আজিজের নির্বাচনী ইঞ্জিনিয়ারিং), তাহলে আগামী বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে জোট সরকার তালেবানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। তালেবানি রাষ্ট্রে তো রাষ্ট্রের কর্তাদের সব সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ন থাকে, মারা যায় গরিবরা।

জঙ্গিরা এখনও বুঝতে পারছে না কী করবে। সেজন্য আদালতে পরিষ্কার ভাষায় বাংলা ভাই বলেছে, 'সরকারের সাজানো নাটক চলছে, এ নাটকে কে নায়ক আর কে খলনায়কের ভূমিকায় আছে, তা পরিষ্কারভাবে জাতিকে জানাতে চাই। আমাদের কাছে হ্যামিলনের বাঁশি আছে। সে বাঁশি বাজালে একটা ইঁদুরও গদিতে থাকতে পারবে না।'

শায়খ রহমান বলে, 'আমরা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে কারও মান ক্ষুণ্ন করতে চাই না। সবাই সত্য কথা বলুন। নয়তো জাতির সামনে সবার মুখোশ উন্মোচন করে দেব।' (প্র. আলো, ৩০.৫.০৬)।

কিন্তু বাঁশিও তারা বাজাচ্ছে না মুখোশও উন্মোচন করছে না। কারণ ডিসেম্বর পর্যন্ত জঙ্গিরা দেখতে চায়। অবস্থা অনুকূলে গেলে তারা মুখ খুলবে না, মুক্তি পাবে। প্রতিকূলে গেলে মুখ খুলবে। জোট সরকার যে তাদের জামাই আদরে রাখছে এটি তারও একটি কারণ।

নিজামী কয়েকদিন আগে বলেছেন, এতদিন আওয়ামী লীগ তাদের সাথে আন্দোলন করেছে, একসঙ্গে বসেছে, এখন বসবে না কেন? কেন বসবে না তা আওয়ামী লীগ বলেছে। সে বিতর্কে আমরা যাব না। আমরা সবাই বলি, সংবিধানে আমরা বিশ্বাসী। কিন্তু বিশ্বাসী হলে, ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করে তাদের কারও সঙ্গেই অন্য রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্ক রাখতে পারে না।

আপনাদের খেয়াল আছে কিনা জানি না ২০০০ সালে দায়ের করা একটি রিট মামলার রায় এ বছর দিয়েছেন বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির। গত কয়েক বছরে এমন সাহসী রায় হাইকোর্ট দেননি। কারণ বিচারকের একটা বড় অংশ সব সময় সহযোগিতা করেছে সামরিক সরকারকে। যুগান্তকারী রায়ে তারা বলেছেন, ১৫ এপ্রিল ১৯৭৫ থেকে ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত সামরিক সরকার (অর্থাৎ জিয়া সরকার) যেসব নির্দেশ দিয়েছে সব 'illegal, void and nonest'। অর্থাৎ এ সময় বন্দুকের জোরে সংবিধানের যেসব পরিবর্তন হয়েছে তাও বাতিল। এর ফলে ১৯৭৮ সালে প্রক্লেমেশন (এমেন্ডমেন্ট) অর্ডার ১৯৭৮-এ যে ১২ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়েছিল তা এখন পুনরুজ্জীবিত ও বলবৎ। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২-তে আছে-

'ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার,

(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।

তাই যদি হয় তাহলে এখন বাংলাদেশে শুধু জামাত নয় ইসলাম ব্যবহারকারী সব রাজনৈতিক দলেরই রাজনীতি করতে দেয়া যায় না। আওয়ামী লীগ বা ১৪ দল শুধু এ কারণেই এদের সঙ্গে বসতে পারে না এবং যাতে হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করা হয় তা দেখা সরকারের কর্তব্য। এ রায় বলবৎ হলে (যা এখন বলবৎ থাকা উচিত) বাংলাদেশ আবার ধর্মের ঠিকাদার ও তাদের হেরোইন ব্যবসা, অস্ত্রবাজি ও ভুল ইসলাম থেকে রক্ষা পাবে। আমার ঠিক খেয়াল নেই সরকার এর বিরুদ্ধে আপিল করেছে কিনা। আপিল যদি করে থাকে এবং এ রায় যদি স্থগিতও থাকে তারপরও ধর্ম ব্যবহারকারী দল কর্মকাণ্ড চলাতে পারে না যতক্ষণ না সুপ্রিমকোর্ট রায় দেন। করলে তা সাবজুডিস হতে বাধ্য। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা কী বলেন?

২০০৬

নিজামী এখন কী করছে?

ক্ষমতার বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ হলেই আমাদের ভূখণ্ডে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেন, ইসলাম খুবই নাজুক। অন্তত আমাদের দেশের স্বঘোষিত ইসলামের ঠিকাদাররা তাই প্রমাণের চেষ্টা করেন। পকিস্তান আমলে ঘনঘন ইসলাম বিপন্ন হতো। ১৯৭১ সালে আমরা নই, তারাই ইসলামকে শুধু বিপন্ন নয়, ধর্মের নামে ত্রিশ লাখ হত্যা করলো। এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম সহায়ক শক্তি ছিল জামাতে ইসলামী। ১৯৭১ সালে কিলিং স্কোয়াডের প্রধান ছিল মতিউর রহমান নিজামী নামে এক জামাতী যুবক। আজ বাংলাদেশে সেই পাকিস্তানিমনা, মুসলিম লীগ ধাঁচীয় দল হচ্ছে বিএনপি এবং তাদের প্রধান সহায়ক শক্তি সেই কিলিং স্কোয়াড জামাত। ১৯৭৫ সালে প্রকৃতপক্ষে তারা ক্ষমতা দখল করে। সেই থেকে আবার দেখা যাচ্ছে এক বছর পরপরই ইসলাম বিপন্নের ধুয়া তোলা হয়। যিনি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলেন, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে মহিলার সাজ-পোশাকের সঙ্গে ইসলামের তাহজিব-তমুদ্দনের কোনো সম্পর্ক নেই। তার চালচলনের সঙ্গেও এবং তিনি অনবরত মিথ্যা কথা বলেন। তার অন্যতম সহযোগী জামাতের আমির মতিউর রহমান নিজামীর চালচলনে একটা ইসলামী ভাব আছে। তবে সেই কিলিং স্কোয়াডের ভাবটাও আছে। জঙ্গি সৃষ্টি ও মদত দেওয়া এর উদাহরণ। নিজামীরও প্রধান বৈশিষ্ট্য মিথ্যা বলা, অনবরত মিথ্যা বলা। এ দুজনই ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করছে। সুতরাং এক হিসেবে প্রকৃত ধর্মপ্রেমীদের তারা শত্রু। যারা এদের সমর্থক তারাও বিকৃত ইসলামের সমর্থক, যদিও ক্ষমতার জায়গাগুলো তাদের করায়ত্ত।

নিজামী কী ধরনের বস্তু তা বোঝা যাবে এখন তার ভাষ্য আর কয়েক বছর আগের ভাষ্য মেলালে। এই সব লোকদের একটা সুবিধা হলো আমরা তেমন পড়াশোনা করি না, খোঁজখবর করি না, ভুলে যাই। না, হলে যে কোনো সাধারণ রিপোর্টারই তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দিতে পারতো।

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার কানসাটে গণহত্যা চালিয়েছিল। ঐ এলাকার এমপি আবার জামাতের। হতেই হবে। এ ঘটনার পর তারা খানিকটা শঙ্কিত। ফলে শিফন, মুক্তার মালা পরিহিতা মহিলা আবার ইসলাম বিপন্নের ডাক দিয়েছেন। সাবেক আল বদর প্রধান নিজামীও সেই সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, 'আওয়ামী লীগকে ইসলামের দুশমন আখ্যায়িত করে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ঠেকাতে খতিব ও ইমামদের সহযোগিতা চেয়েছে নিজামী।' বিএনপি ও জামাতের কাছে আওয়ামী লীগ ইসলামের দুশমন এ কারণে যে তারা মনে করে, পাকিস্তান ইসলামের

ঝাণ্ডা বরদার আর আওয়ামী লীগ পাকিস্তান ভেঙেছে। এটি গোলামের গোলামদের কাছে অমার্জনীয় অপরাধ।

এই নিজামী সে সভায় বলেছে, '১৯৭২ ও ১৯৯৬ সালে দুবার ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামের নামে বোমাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য দেশের ইসলামী আন্দোলনের যে চরম সর্বনাশ হয়েছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আওয়ামী লীগ কিছু আলেম-ওলামাকে তাদের পক্ষে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। তাদের এই প্রচেষ্টায় কোনো আলেম যেন শরিক না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য খতিব ও ইমামদের সতর্ক থাকতে হবে। আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যেন বর্তমান নাজুক পরিস্থিতির কোনো সুযোগ না নিতে পারে সে জন্যও খতিব-ইমামদের সহযোগিতা প্রয়োজন।' (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৬.০৪.০৬)।

প্রথম কয়েক লাইনের অর্থ বিচার করুন। ১৯৭২-৭৫ ও ১৯৯৬-২০০০ সময়টুকু ছাড়া যারা ক্ষমতায় ছিল তারা ইসলামি বেরাদর। ১৯৯১-৯৬ ক্ষমতায় ছিল বিএনপি। শ্বেত শ্মশ্রুশোভিত তথাকথিত ইসলামি লেবাস ও টুপি পরিহিত ইসলামের এই ব্যবসায়ী তখনকার কিছু বক্তব্যের উদ্বৃতি দিচ্ছি–

১. 'বিএনপি সরকার ইসলামি রাজনীতি নিষিদ্ধের তৎপরতা চালাচ্ছে।' (মিল্লাত, ২৫.০৯.৯৩)।

২. 'ইসলামি জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না। ঐ দিনের সংবাদটি খানিকটা বিশদ আকারে উদ্বৃত করছি যাতে মতলববাজ এই ঠিকাদারের চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।' তিনি সরাসরি দলের উপনেতা কর্তৃক আসন্ন নির্বাচনে জামাত বিএনপিকে শেষ পর্যন্ত সমর্থন দেবে এই মর্মে-প্রচারণের জবাব দিয়ে বলেন, বি চৌধুরীর এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক। শুধু জামাতে ইসলামি নয়, এ দেশের কৃষক-শ্রমিক ও ইসলামি জনতা আর বিএনপিকে সমর্থন দিতে পারে না। (ইত্তেফাক, ২৪.০১.৯৪) ডা. ব. দ. চৌধুরী ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেননি। জামাত সে সময় অপ্রকাশ্যে পরে প্রকাশ্যে বিএনপিকে সমর্থন করে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দুটি মন্ত্রীর পদ তারা লাভ করে।

৩. 'এই সরকারের [বিএনপি] অধীনে ইসলাম তথা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব নয়, গত সাড়ে তিনবছরের শাসনই এ কথায় প্রমাণ বহন করে।' (সংগ্রাম ৭.৮.৯৪)

৪. 'অতীতে নমরুদ, ফেরাউন, আবু লাহাব, আবু জেহেলরা সন্ত্রাস, নির্যাতন, হত্যা করিয়া যেমন ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করিতে পারে নাই, তেমনিভাবে এই সন্ত্রাসী বিএনপি সরকারও ইসলামি আন্দোলনের নেতাকর্মীদের হত্যা করিয়া ও দেশের ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করিতে পারিবে না। তিনি বলেন, 'বিসমিল্লাহর দোহাই দিয়া ইসলাম প্রিয় জনতার সমর্থন লইয়া ক্ষমতায় গিয়া এই সরকার ইসলামের সামান্যতম মর্যাদাও রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহারা এই দেশ হইতে ইসলামকে মুছিয়া ফেলার ইহুদি ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের চেষ্টা করিতেছে।' (ইত্তেফাক, ১৯.১২.৯৫)

বিএনপি যদি বাংলাদেশে 'ইহুদি ষড়যন্ত্র' বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থাকে তা হলে আজ জামাত কি তার অংশীদার? যদি তাই হয় তা হলে মুসলমানরা কি জামাতকে সমর্থন দিলে তা 'ইহুদি ষড়যন্ত্রে বাস্তবায়নে' সাহায্য করা হয় না? বিএনপি যদি এতো ইসলামবিরোধী হয় তা হলে জামাত কেন বিএনপিকে সমর্থন করছে? এগুলোর কোনো উত্তর পাবেন না। কারণ, এ দলগুলো এমন দল যারা যা খুশি তা করতে পারে। বিএনপি দুই আমলে ৪০ জন কৃষক হত্যা করেছে। অন্যান্য হত্যার কথা বাদ দিলাম। অবশ্য জামাতকে এ বিষয়ে পিছে ফেলতে পারেনি। জামাত বলেছিল, নারী নেতৃত্ব তারা মানে না, নাজায়েজ। কিন্তু বেগম জিয়ার সুগন্ধী আঁচলের তলায় দুই জামাতি 'লিডার' পোষা মুরগির মতো ধান খুঁটে খাচ্ছে। নিজামীদের সাহস থাকলে বলুক তারা এসব বক্তব্য দেয়নি? আর যদি দিয়ে থাকে তাহলে এখন বলুক 'ইহুদি ষড়যন্ত্র' বাস্তবায়নকারীদের সঙ্গে তারা কীভাবে আছে?

আমাদের সবসময় সবশেষে বাংলা প্রবাদের কাছে ফিরে যেতে হয় যার ভিত্তি শ শ বছরের অভিজ্ঞতা। এ ধরনের একটি বাক্য- পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়। আমাদের ৫০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, নিজামীরা কী না বলে, জামাত কী না করে।

বীরশ্রেষ্ঠের প্রত্যাবর্তন ও নষ্টামীর রাজনীতি

বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ। এ মন্তব্য আগেও অনেকবার করেছি। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনা ও শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুর এক যুগ পর জাহানারা ইমাম স্মৃতিপদক প্রদান অনুষ্ঠানে গিয়ে এ কথা ফের মনে হলো।

জাহানার ইমাম স্মৃতিপদক অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, ড. খান সারওয়ার মুরশিদ, ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং আরো অনেকে কোনো কোনো সময় বিএনপি কর্তৃক দেশদ্রোহী মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন। স্বয়ং জাহানারা ইমাম-কে দেশদ্রোহী মামলা মাথায় নিয়ে পরলোকগমন করতে হয়েছে। এঁরা গত অর্ধশতক বাংলাদেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এখন অসাম্প্রদায়িকভার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। কোনো সরকার এঁদের স্বীকৃতি দেয়নি। সমাজ থেকেও তারা তেমন কিছু লাভ করেন নি। অথচ, যারা সাম্প্রদারিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য তখন এবং এখনও নিবেদিত, পাকিস্তান রক্ষার লড়াই করেছেন আলবদর, রাজাকার হিসেবে, তারা এখন ক্ষমতায়, বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণ করেন তারা এবং একুশ বা স্বাধীনতার পদক লাভ করেন। দেশদ্রোহের মামলাও তাদের বিরুদ্ধে হয় না। অর্থাৎ, রাষ্ট্র/সরকার তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে, এমনকী সমাজও। নয়ত তারা নির্বাচিত হল কী ভাবে বা পতাকা উড়িয়ে ঘুরে বেড়ান কী ভাবে? পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে যেখানে স্বাধীনতার পরও থাকে স্বাধীনতার পক্ষের এবং বিপক্ষের শক্তি? সব সম্ভবের দেশ না হলে এটি সম্ভব?

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অনেকদিন ধরে হয়েছে। এখন, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকায় তা সম্ভব হয়েছে। এই সরকার দেশের ছেলেকে দেশের মাটিতে নিয়ে এসেছেন সে জন্য ধন্যবাদর্হ। আমরা আনন্দিত। তাঁর দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনতে পারায় অনেকে আপ্লুত। কিন্তু, এসবই কি নিঃস্বার্থ? মোটেই নয়।

বাংলাদেশে জোট সরকার শাসন করছে পাঁচ বছর। দেশ-বিরোধী, সাম্প্রদায়িক এবং জঙ্গিবাদে সমব্যাথী জামাতের সাহায্যে বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে। বিএনপি নেতৃবৃন্দ জানেন, দেশের অধিকাংশ মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে ধরে রেখেছেন বুকের গহীন কোণে। তারা হয়ত নীরব কিন্তু হৃদয় দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করবে এমন মানুষ কম। সুতরাং, মুক্তিযুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি করতে হবে। এর ফলে, প্রচারণা চলল, বিএনপি মুক্তিযোদ্ধাদের দল। হ্যাঁ, এমন অনেকে আছেন যারা '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করেছেন কিন্তু এখন জোট সমর্থন করেন গ্লানিহীনভাবে। মুক্তিযোদ্ধা হলে, সে চেতনা অক্ষুণ্ন

থাকলে তারা জামাতের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারতেন, রাজাকার আলবদরদের রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক করতে পারতেন? সে চেতনা অক্ষুণ্ন থাকলে মান্নান ভুঁইয়া বা নিজামীর কথা একই রকম হয় কেন? খন্দকার মোশাররফ কেন জামাতের সভায় গোলাম আজম এলে শুধু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নয় আপ্লুত হয়ে ওঠেন? তাদের তরুণ নেতা তারেক রহমান যখন জামাত ও বিএনপিকে একই পরিবারের লোক বলে তখন খুশিতে বাগ বাগ হয়ে ওঠেন কীভাবে? ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন যারা কঠিন অপকর্মে লিপ্ত ছিল না তাদের। জিয়াউর রহমানের ভেতর মুক্তিযুদ্ধের বোধ থাকলে কীভাবে তাদের ক্ষমা করেন ও রাজনীতির সুযোগ দেন? এরাই না তাঁর স্ত্রীকে ন' মাস ক্যান্টনমেন্টে আটকে রাখতে সহায়তা করেছিল। এতে প্রমাণিত হয় অনেকে বাধ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন। এসব ঘটনা এ মন্তব্যই প্রমাণ করে, একবার মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায় কিন্তু চিরজীবন মুক্তিযোদ্ধা থাকা কঠিন।

জোট ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় গঠন করল মুক্তিযুদ্ধের সেই বাতাবরণ তৈরি করতে। কী করেছে এই মন্ত্রণালয়? কোটি টাকা খরচ করে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত দলিল প্রকাশ করেছে যা কেউ কিনছে না। চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় গণহত্যার জায়গা পাহাড়তলি বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ করার কথা এক বিঘায়, এখন তা নাকি করা হবে নর্দমার পাশে দু'গণ্ডায়। আরো উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু জায়গার অভাবে দিলাম না।

রাতে, আমরা অনেকে টিভি খুলে রেখেছিলাম মতিউরের 'ফিরে আসা' দেখার জন্য। গণ্যমান্য ছিলেন অনেকে, বিশেষ করে যারা 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে খ্যাত। সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী কফিন গ্রহণ করবেন, তাই মন্ত্রীসভার সদস্যরা উপস্থিত। কিন্তু জোটের প্রধান, তারেক রহমান উল্লিখিত তার পরিবারের মতিউর রহমান নিজামী কোথায়?

এই নিজামী ১৯৭১ সালে ছিল আলবদর প্রধান যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খুন করেছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর শহীদ হলে এই তরুণ আলবদর নেতা মিনহাজ রশীদের (মতিউরের ছাত্র, যাকে দিয়ে তিনি উড়াল দিয়েছিলেন) পিতাকে একটি টেলিগ্রাম পাঠান। তাতে সোল্লাসে তিনি ঘোষণা করেন—"ভারতীয় হানাদার ও এজেন্টদের মোকাবেলায় মিনহাজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে" তারা বদ্ধপরিকর। (সংগ্রাম ৪.৩.১৯৭১) অর্থাৎ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর ছিলেন ভারতীয় হানাদার ও এজেন্ট। নিজামী এখনও তা বিশ্বাস করে দেখে যায় নি বিমানবন্দরে। যায়নি তার আলবদর দিনের ডেপুটি মুজাহিদ যে এখন সরকারের তৃতীয় প্রভাবশালী মন্ত্রী। কারণ, জামাত ইসলাম এখনও বিশ্বাস করে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর ভারতীয় এজেন্ট যার কারণে তাদের কলিজার টুকরা মিনহাজ শহীদ হয়েছিল।

মতিউরের কফিন রাখা হলো। প্রধানমন্ত্রী তা গ্রহণ করলেন এবং চলে গেলেন। তিনি আমন্ত্রণ জানাতে পারতেন শহীদ জায়া মিলি রহমানকে কারণ সেই কফিন প্রথমে গ্রহণ করার অধিকার একমাত্র তার। অনেকে বলবেন প্রটোকলের ব্যাপার। তা'হলে

প্রেসিডেন্টের প্রটোকল মানা হচ্ছে না কেন? আসলে তা' নয় পুরো ব্যাপারটায় ছিল লোক দেখাবার ব্যাপার।

বীরশ্রেষ্ঠের কফিন রাখা হয়েছে প্যারেড গ্রাউন্ডে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিম কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুহাস্যে জানালেন, ৩৫ বছর পর কে কোথায় কী করেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ কি? সব ভুলে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ও বর্তমানে স্বাধীনতা বিরোধীদের কোলাবরেটর বিএনপি এ যুক্তি সবসময়ই দেয় যাতে তাতে কোলাবরেশনের ব্যাপারটা চাপা পড়ে। প্যারেড গ্রাউন্ডে শ্রদ্ধা জানাতে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন কিন্তু যায় নি বিএনপি পরিবারভুক্ত জামাতে ইসলামী। কী ভাবে যাবে? মতিউর যেদিন শহীদ হন জামাতে ইসলাম সেদিন ঘোষণা করে, "পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পাইলট অফিসার রশীদ মিনহাজ জাতির জন্য নিজের জীবন কোরবানি দিয়ে দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধের এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন আমাদের সামনে রেখে গেলেন।" (সংগ্রাম, ৩০.৮.১৯৭১) অর্থাৎ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর, বাঙালী মতিউর ছিলেন গাদ্দার। শুধু তাই নয় যাকে দেখে তারেক রহমান আনন্দে প্রায় কেঁদে বলেছিলেন, আমরা একই পরিবারের, যাকে দেখে খন্দকার মোশাররফের আকর্ণ বিস্তৃত হাসি আর থামছিল না, যার কথা শুনলে মান্নান ভূঁইয়ার বুক স্ফীত হয়ে ওঠে সেই গোলাম আজম যেদিন মতিউর শহীদ হলেন সেদিন গর্বভরে বক্তৃতা দিয়েছিল করাচীতে, "রশিদ মিনহাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গোলাম আজম বলেন, এই আত্মত্যাগের নিদর্শন থেকে তরুণরা উপকৃত হতে পারবে। রাজাকাররা খুবই ভাল কাজ করেছেন উল্লেখ করে গোলাম আজম আরও বলেন, কোন ভাল মুসলমানই তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থক হতে পারে না।" (দৈ. পাকিস্তান. ২.৯.৭১) গোলাম আজমরা এখনও তাই মনে করে সে জন্য প্যারেড গ্রাউন্ডেও তারা যায় নি। তাদের কাছে এখন বিএনপি ছাড়া সবাই খারাপ মুসলমান, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর তো বটেই। কয়েক বছর আগে এই গোলাম আজমরাই বিএনপিকে দেশের সবচেয়ে খারাপ মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। নষ্টামীর রাজনীতি আর কাকে বলে।

সুতরাং, শ্রদ্ধা জানানোর জন্য নয়, নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যই বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছিল এ সরকার। কিন্তু, তাতে আমাদের লাভ হয়েছে। আমরা আবার বহুদিন পর গর্ব বোধ করেছি। জামাত সরকার বাধ্য হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে।

একটা বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার। বিএনপি-জামাত আপাত দৃষ্টিতে দু'টি দল মনে হলেও এরা মূলত একই আদর্শে বিশ্বাসী। নিজ স্বার্থে ধর্মকে তারা ব্যবহার করে ও অহরহ মিথ্যা বলে। অসংখ্য উদাহরণ দেখাতে পারব যে, খালেদা ও নিজামী অজস্র মিথ্যা বলেছেন। লালবাগের পিন্টু কি কবরস্থান ভেঙ্গে রাস্তা করছে না? তখন কিন্তু ধর্মবোধ থাকে না। ধর্ম নিয়ে যারা বেসাতী করে তারা ভয়ঙ্কর হয়। গত পাঁচ বছরের ইতিহাস কী বলে ?

আমরা অধিকাংশই ভিতু সেটা মানি। চুপচাপ পরিবার পরিজন নিয়ে থাকতে চাই।

কিন্তু, জোট যেভাবে এগুচ্ছে এবং ক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে তা যদি প্রতিহত না করা হয় তা'হলে এই নষ্টামীর রাজনীতি থেকে মুক্তি পাবেন না। দেশকে যদি ভালোবাসেন তা'হলে দেশ-বিরোধীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করুন, প্রকাশ করতে না পারলে অন্তত অন্তরে পুষে রাখুন। বাংলাদেশের পাকিস্তানিদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন। সম্প্রতি নিজামীর নির্বাচনী এলাকা সাথিয়াতে এমন ঘটনা ঘটেছে। নিজামী যেখানে গিয়েছিল টাকা পয়সা বিতরণ করতে। জেলার ১২ টি ইউনিয়নের কোন চেয়ারম্যান সেখানে যায় নি, নিজামীকে ফিরে আসতে হয়েছে। যারা বলে বিএনপি-জামাত আলাদা (যেখানে দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী বা ছায়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলছেন না) তারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। রাস্তায় নামতে না পারুন, নির্বাচনে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করুন। যারা এ রাজনীতিকে, জামাতের মতো পাকিমনা দলকে ক্ষমতায় রাখতে চায় তারা কোলাবরেটর। যেমন, জামাত ১৯৭১ সালে ছিল কোলাবরেটর বা যোগসাজসকারি। আমরা যদি জোটের নষ্টামী রাজনীতির, শাসনের প্রতিবাদ কোন না কোন ভাবে করি তা'হলে আমরাও ইতিহাসে পরিচিত হবো কোলাবরেটর হিসেবে। আপনি কি চান কোলাবরেটর হতে?

২০০৬

তারা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

খান শামসুর রহমানের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যাপক ওয়াদুদুর রহমান ছিলেন আমার শিক্ষক। নিপাট ভালো মানুষ এই শিক্ষক বিভাগীয় চেয়ারম্যান থাকার সময় আমি ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ার সুযোগ পাই। খান শামসুরের সঙ্গে সেই সুবাদে আমি ও অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার রায় দু'দিন দেখা করি আমাদের একটি গবেষণার প্রয়োজনে। দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়েছিল সে সময়। 'প্রশাসনের আন্দরমহল' নামে আমাদের লেখা বইটি পাঠকের কিঞ্চিৎ প্রীতি লাভ করেছিল। খান শামসুর প্রশাসন তো বটে রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়েছিলেন, নয়তো আগরতলা মামলার প্রথম দশ জন আসামির মধ্যে একজন হবেন কীভাবে? বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী মানুষটি নিভৃতচারী। তার একটি লেখা প্রকাশিত হচ্ছে যুগান্তরে। সে কারণে তা উল্লেখযোগ্য।

শামসুর রহমান সেখানে উল্লেখ করেছেন, ১৯৬৯ সালের দিকে যখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে একটি শাসনতন্ত্র রচনার কাজ করছিলেন, তখন রাজাকার শ্রেষ্ঠ, জামাতের ভূতপূর্ব আমীর গোলাম আযম তার সঙ্গে দেখা করে শাসনতন্ত্রে যেন ইসলামী আইনের বিষয়টি থাকে সে বিষয়ে অনুরোধ করেছিলেন। গোলাম আযমকে তিনি একটি লিখিত খসড়া দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, যা তিনদিনের মধ্যে গোলাম আযম দেবেন বলে বিদায় নিয়েছিলেন। আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল গোলাম আযম আর সে বিষয়ে পরামর্শ নিয়ে ফেরেননি।

কেন ফেরেননি? অথচ নিয়ত তারা ইসলাম, ইসলামী আইনের কথা বলছেন। গোলাম আযমের পড়াশোনা তার পরবর্তী যেসব বায়তুল মাল এখন দলে আছে তাদের থেকে বেশি। তিনি জানেন, এ বিষয়ে কিছু করার নেই। কিন্তু তবুও কেন জামাত বা অন্য 'ইসলামী দল'গুলো এসব বলে? কারণ আর কিছু নয়, তাদের পুঁজি ধর্ম আর এই ধর্ম বিনিয়োগ করে তারা কিছু ফায়দা লুটতে চায়। প্রকৃত ধর্মের অনুসারী অর্থাৎ কথায় ও কাজে ঠিক থাকলে আমরা তাদের সমালোচনা করতাম না। কিন্তু আমরা করি, কারণ আমরা জানি তারা হচ্ছে ভণ্ড। ধর্মব্যবসায়ীদের দল।

জামাত, ইসলামী ঐক্যজোট প্রভৃতিকে আমি 'ইসলামী দল' বলার বিরুদ্ধে। জেনে না জেনে, কথার কথা হিসেবে আমরা এদের 'ইসলামী দল' বলে এদের ধর্মের সংরক্ষক হিসেবে গণ্য করছি এবং এরা বলার সুযোগ পাচ্ছে, এরাই ইসলামের ধারক, অন্যান্য সত্যিকার ইসলামের ধারক নয়, অতএব আমাদের হেদায়েতের অধিকার তাদেরই আছে। যে কাজটি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিরা করেছিল। এদের ইসলাম ব্যবসায়ী দল বলা বেশ যুক্তিযুক্ত।

বাংলাদেশে এ ধরনের ইসলামী ব্যবসায়ী দল অনেক। এর কারণ, ইসলাম নিয়ে কথা বললেই দু'একজন খাদেম জুটে যায়, মেইন স্ট্রিমের দলগুলো এদের ঘাঁটায় না আর এ সুযোগে এরা বিত্ত-ক্ষমতা যতটুকু পারে সংগ্রহ করে ও প্রয়োগ করে। তাদের লক্ষ্য আখেরাত নয়, দুনিয়ায় বেহেশত নির্মাণ। আর রাজনৈতিক ক্ষমতা পেলে এই নির্মাণ কাজ সহজ। লাভ বেশি, ব্যয় কম। বাংলাদেশে ইসলাম ব্যবসায়ী দলগুলোর প্রধানদের ইনকাম কত? ট্যাক্স দেন কিনা—এর হদিস আপনারা পাবেন না। দুনিয়ার এসব ঝামেলা থেকে তারা মুক্ত। আর যেহেতু রাজনীতিবিদ প্রশাসকদের একটা বড় অংশের সঙ্গে যোগ আছে দুর্নীতির, সেজন্য তারা এসব ব্যাপারে কথা বলার সাহসও রাখেন না।

বাংলাদেশের ইসলাম ব্যবসায়ী দলগুলোর কিছু কথা আপনারা প্রতিনিয়ত শুনে থাকবেন। সেগুলো হল, আল্লাহর আইন কায়েম করা, খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামী উম্মাহ, ইসলামী অর্থনীতি বিশ্বাসের নামে জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। এগুলো নিয়ে আমরা কোন প্রশ্ন করি না এবং করি না দেখে তারা অবলীলাক্রমে পার পেয়ে যায়। কয়েকদিন আগে মরহুম অধ্যাপক সফিউদ্দিন জোয়ারদারের পুরনো একটি প্রবন্ধ আবার পড়ে এ প্রশ্নগুলো মনে জাগল। ইসলামে ইজতিহাদের পথটি এগিয়ে নিতে পারতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষকরা। কিন্তু মনে হয়, এরা তাকলিদে বেশি বিশ্বাসী।

বিশ্বাসীর সঙ্গে তর্ক হয় না, কিন্তু তার বিশ্বাসের কতটুকু সত্য, কতটুকু নয়, সে বিষয়ে বিতর্ক চলতে পারে। আল্লাহ, রাসুল (সা.) মেনেই ইসলামের বিভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা চলতে পারে এবং হাজার বছর ধরে চলেছে প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও। ইসলাম অনুসরণ করে সহজ-সত্য পথের এবং সহজ-সরল পথ অনুসরণ করলেই ইহলোক তো বটেই পরলোকেও শান্তি। এই পথ ত্যাগ মানে বিদাআ'ত বা ধ্বংস। এটি হচ্ছে সাধারণ ধারণা। কিন্তু এই বিদাআতের মীমাংসা নিয়েও বিরোধ আছে। কট্টরপন্থীরা বিশ্বাস করেন, পূর্বসূরিরা যা বলেছেন বা যে পথ অনুসরণ করেছেন তার বাইরে গেলেই বিদআ'ত। সেখানে যুগের দাবি, বাস্তবতা বিচার্য নয়। কিছুদিন পরপর কিছু কিছু ইসলাম ব্যবসায়ী নেতা যে আমাদের অনেককে 'মুরতাদ' ঘোষণা করেন তা এই বিশ্বাস থেকেই। অথচ কোরআনের পথ অনুসরণ করলে নিশ্চয় তারা আমাদের 'মুরতাদ' ঘোষণা করতে পারতেন না, কারণ খোদা তাদের সেই অধিকার দেননি। এজন্যই বলি, এরা ইসলামের ঠিকাদার বা ইসলাম ব্যবসায়ী দল।

ধর্মবিশ্বাস জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু কট্টরপন্থী বিশ্বাসীদের বিশ্বাস সম্পর্কিত সব ব্যাখ্যা বা প্রচার মেনে নিলে কি সভ্যতা এতটা পথ আসতে পারত? যারা ধর্মের সৃজনশীল ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্মের মূল বিশ্বাস ছাড়া আনুষঙ্গিক উপাদানগুলো যুগোপযোগী করেছেন সেসব ধর্মের মানুষরাই এগিয়ে গেছে। যারা পারেনি, তারা পিছিয়ে গেছে এবং এক সময় লুপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীর অনেক বিশ্বাস এভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। সফিউদ্দিন জোয়ারদার যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন-'কোনও সমাজই বৃত্তাবদ্ধ থাকতে পারে না—ধর্মীয় আইনকানুনের বৃত্তেও নয়।'

আমাদের দেশের 'ইসলামপন্থী'রা মনে করেন ইসলামই মানব সম্ভাবনা বিকশিত করতে পারে, অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়। জামাত, অন্যান্য ইসলাম ব্যবসায়ী দল ও অধুনা জঙ্গিরা একথাই বলছে–আল্লাহর আইন চাই, এ আইন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণীয় নয়। তাহলে অনিবার্য প্রশ্ন এসে যায়– কবে, কখন এই আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই আইনের রূপরেখা কি কোরআনে আছে? নেই। অন্যান্য উৎস ইজতিহাদ, কিয়াস বা ইজমার ওপর ভিত্তি করেও যদি আইন হয়ে থাকে তা কি সব মুসলমানের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য? কারণ, মুসলমানরা তো ৭৩টি ফিরকায় বিভক্ত। জোয়ারদার মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুর রাযিকের কিছু লেখা ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছেন। রাযিক লিখেছেন, ইসলামকে বলা হয় সার্বজনীন ধর্ম। 'যুক্তির খাতিরে ধরা যাক যে, বিশ্বের সব মানুষই এই ধর্মের অনুসারী, তাহলে কি সমগ্র বিশ্বে একই শাসন ব্যবস্থা হবে? কার্যত সেটি অসম্ভব। সুতরাং কোন বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থা ইসলামের অনিবার্য অনুষঙ্গ নয়।' আর খিলাফত। সুন্নিরা এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেন, অন্যরা নয়। না, কোরআনেও খিলাফতের উল্লেখ নেই। রাযিক উল্লেখ করেছিলেন, খলিফার শাসন নির্ভরশীল ছিল সামরিক শক্তির ওপর। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে 'ঐশী অনুমোদন' লাভ করতে পারে? বলা বাহুল্য গোঁড়া অধ্যাপকদের কারণে রাযিক বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

আরও উল্লেখ্য, যে চারজন খলিফা রাজত্ব করেছেন তাঁরা বিভিন্নভাবে ক্ষমতায় এসেছেন। তারা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি। ফলে তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন সময় বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। অভিন্ন ইসলামী আইন অনুসারে হলে তো সেই আদি যুগে তাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হতো না।

আমাদের এখানে জামাত বা ইসলাম ব্যবসায়ী দলগুলো কেন এ কথা বলে তা সহজেই অনুমেয়। জামাত কি বলেনি নারী নেতৃত্ব হারাম? কর্ণেল অলি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, কিন্তু মন্ত্রিত্ব পেলে তা হালাল। এমনকি তারা যে মজলিস-উস-শূরার কথা বলে তার উল্লেখও কোথাও নেই। প্রশ্ন আরও আছে, আল্লাহর আইনই যদি তাদের কাম্য তাহলে তারা কেন বাংলাদেশের সংবিধান মেনে সরকার গঠন করেছে?

অর্থনীতি সর্ম্পকেও বা সুনির্দিষ্ট কী বিধান আছে? সাদ্‌কা, যাকাত বা এ ধরনের কয়েকটি বিষয় ছাড়া অর্থনীতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন বিধান ধর্মগ্রন্থে নেই। সুতরাং প্রশ্ন করা যায়, 'ইসলামী ব্যাংকিং' কী জিনিস? জোয়ারদার এ বিষয়ে সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তার মতে, ইসলামের আদি ও মধ্যযুগে তাই অনেকে হিয়াল বা আইনের ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিত। যেমন সুদ। এক্ষেত্রে বিকল্প গ্রহণ করত। ধরা যাক, তিনি লিখেছেন, ক ৪০০ টাকা ধার নেবে খ থেকে। খ তা দিতে রাজি। একটি পণ্য, তার দাম যাই হোক না কেন, ক বলল খ কে কিনে নিতে। খ তা কিনে নিল। ক তখন আবার ৫০০ টাকা দিয়ে তা কিনে বলল, তিন মাস পর টাকাটা সে দেবে। খ রাজি হল অর্থাৎ সে ১০০ টাকা সুদ পেল। যে নামেই ইসলামী ব্যাংক ব্যবসা করুক না কেন মূল ব্যাপারটা হিয়াল। আজ তো প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী ব্যাংক জঙ্গিদের টাকা নাড়াচাড়া

করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, এ ধরনের বিশটির মতো প্রমাণ তারা পেয়েছে। আমাদের জানামতে, এ ধরনের লেনদেনের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। আমাদের ভুল হলে বাংলাদেশ ব্যাংক যেন প্রতিবাদ করে। তবে কর্তৃপক্ষ এটিও মনে রাখবেন, সরকার বদল হলে যদি তদন্ত রিপোর্ট ঠিকঠাক থাকে, তাহলে তাদের বক্তব্যের সত্যতা ফের যাচাই করা হতে পারে। সরকার ইসলামী ব্যাংককে মাত্র এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে। কারণটা অনুমেয়, কারণ জঙ্গিরাই তো সরকারের। আরও জানা গেছে, এসব ইসলামী দলের টাকার জোগানদাতারা অন্য উপায়ে টাকা রোজগার করে। যেমন, হেরোইন ব্যবসা। হে 'ইসলামী নেতৃবৃন্দ' হেরোইন ব্যবসা কি ইসলামে অনুমোদিত?

আলেমরা ধর্মের রক্ষক হিসেবে কাজ করছেন বা আমরা তাদের সে হিসেবেই দেখি। আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সব সময় স্বাধীন চিন্তার বিরোধী। কিন্তু মানুষ তো মানুষই তার চিন্তা কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করা যায়? এ কারণেই ইজতিহাদের সৃষ্টি এবং তার বিপরীতে তাকলিদের। আব্বাসীয় যুগে ইজতিহাদের পথ ধরেই সৃষ্টি হয়েছিল মু'তাজিলাদের। ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয় যুগের একটি সময়কে 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অ্যাখ্যা দেয়া হয়। সেটি ছিল মু'তাজিলদের যুগ। এদের পরে দমন করা হয়। এরপর এক হাজার বছর ইসলামের ইতিহাসে রক্তপাত, হানাহানি এসেছে কিন্তু স্বর্ণযুগ আর আসেনি। এ বিষয়টি আমাদের মনে রাখা উচিত। এ প্রসঙ্গে বলি, অনেকে ইসলামী রেনেসাঁর কথা বলেন। কখন হয়েছিল সেই ইসলামী রেনেসাঁ? রেনেসাঁর সঙ্গে যুক্ত মানবতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা আর যুক্তি। কখনও শুনেছেন শাস্ত্রীয় ইসলামের প্রবক্তাদের এর বিরুদ্ধে কথা বলতে? বরং তারা পাশ্চাত্যের যুক্তিনির্ভরতা, ধর্মনিরপেক্ষতাকে আক্রমণ করে, বিজ্ঞানকে আক্রমণ করে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই শুনবেন তারা সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশ বা নব-উপনিবেশবাদের নিন্দা করে। সৌদি আরব বা পাকিস্তান, যাদের আমরা ইসলামের ধারক-বাহক মনে করি, তারা কি কখনও আমেরিকার বিরোধিতা করেছে? এই যে কয়েকদিন আগে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বাউচার এলেন, জামাত কি একবারও একটি মিছিল করেছে তার বিরুদ্ধে বা ইসলামী ঐক্যজোট? বরং লেবাননে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 'মুসল্লি'রা যে মিছিল বের করলেন তারা সেখানে স্লোগান দিলেন, হান্টারের বিরুদ্ধে যার উৎপাদন এই সরকারই অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে এই স্লোগান দেয়ার অর্থ কী? এর অর্থ স্বৈরশাসন বা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের একটা গোপন সমঝোতা আছে, বোঝাপড়া আছে। তালেবান কি পাকিস্তান আর আমেরিকার সৃষ্টি নয়? অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না যদি আমাদের নির্বাচনের সময় বুশ-ব্লেয়ার প্রশাসন জঙ্গিবাদের স্রষ্টা ও সরকারকে সমর্থন করে। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ভালো একটি মন্তব্য করেছেন। তার মতে, 'ইজতিহাদ হচ্ছে স্বতন্ত্র, স্বাধীন লিগাল যুক্তিশীলতা আর তাকলিদ হচ্ছে ঐতিহ্যের ভাবনাহীন পুনরুৎপাদন। গোঁড়া ইসলাম বেড়ে উঠেছে তাকলিদ থেকে আর ইজতিবাদ থেকে তৈরি হয়েছে ইসলামের আধুনিকতা (সমকাল, ৩০.৭.০৬)। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় চরম ও নমনীয় গোঁড়ারা সব সময় সুফিসাধক।

যুক্তিবাদীদের কোণঠাসা করে রেখেছে। যেমন, বাংলাদেশে জামাত ও বিএনপি। যৌথভাবে এরা সমাজ-রাষ্ট্র যুক্তিবাদীদের কোণঠাসা করে রেখেছে বা অপদস্থ করছে। মাহমুদুর রহমান নামে জামাত-বিএনপি সরকারের এক উপদেষ্টার সিপিডির বিরুদ্ধে মামলা এর উদাহরণ। জামাত 'ইসলামী শাসনে' বিশ্বাসী। বিএনপিও 'ইসলামী ব্যবস্থা'য় বিশ্বাসী। এই ইসলামীরা মিলে গত চার বছর এথনিং ক্লিনজিং থেকে শুরু করে হত্যা, লুটের মহোৎসব চালিয়েছে, চালাচ্ছে। ইসলামে যার কিছুই অনুমোদিত নয়।

প্রতিটি দেশে ইসলাম সে দেশের ভূগোল, ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যে কারণে প্রতিটি দেশের ইসলামে কিছু লৌকিক অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে। যেমন, বাংলাদেশে মাজার, মিলাদ প্রভৃতি। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থার নাম হিন্দু মিথলজির গরুড়। কিন্তু দেশজ সংস্কৃতির এ বিষয়টা এসব ইসলামের ঠিকাদাররা পছন্দ করে না। ভাষার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। তাদের চিন্তাধারার বিকাশ ঘটায় তারা মাদ্রাসার মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোশাররফ মাদ্রাসার যে সংস্কার করেছেন তা অনুসরণ করতে চাচ্ছে। আর আমাদের এখানে জঙ্গিবাদের প্রবর্তকরা কামিল ডিগ্রিকে এমএ ডিগ্রির সমাধানের ঘোষণা করতে চাচ্ছে। বিএনপির স্যুটধারীরা কি বিপদটা বুঝতে পারছেন? মনে রাখবেন, শিক্ষামন্ত্রী বা বিএনপির মহাসচিবের পুত্র-কন্যারা এদেশে থাকে না। আমাদের ছেলেমেয়েদের কী হবে তা নিয়ে তারা চিন্তিত নন। ধর্মের এই ঠিকাদাররা মনে করে, ধর্ম হবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। যে কারণে জিয়াউর রহমান প্রবর্তন করেছেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তান তো হয়েছিল ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে? টিকেছে? ধর্ম কখনও জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হতে পারে না। যদি তাই হতো তাহলে 'মুসলিম দেশগুলো' পরস্পরের প্রতি বিরূপ কেন? এর সঙ্গে ওঠে উম্মাহর প্রশ্ন। এখানকার ইসলাম ব্যবসায়ী দলগুলোও প্রায়ই মুসলিম উম্মাহর কথা বলে। তা, এই উম্মাহ থাকলে লেবানন যখন খ্রিষ্টান মদদে ইহুদি আগ্রাসনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তখন ইসলামের ঝাণ্ডাধারী সৌদি আরব, পাকিস্তান চুপ কেন? সৌদিরা নিজের দেশকে তো ইসলামী বলে ঘোষণা করেনি, করেছে কিংডম অব সৌদি আরব হিসেবে। বাঙালি কেন সৌদিতে গেলে তাকে মিসকিন বলা হয়? পাকিস্তানে এ রকমভাবে ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছিল- দেখে মানুষ তিতিবিরক্ত হয়ে বাংলাদেশ এনেছিল। আজ যদি এ দেশে স্বচ্ছ নির্বাচন হয় তাহলে ইসলাম ব্যবসায়ী দলগুলো ১০/১৫টির বেশি আসন পাবে বলে মনে করি না। কারণ এ দেশে মোল্লাদের ইসলাম কখনও সুবিধা করতে পারেনি, জোরজবরদস্তি ছাড়া। এদের ভণ্ডামি কী পর্যায়ে গেছে দেখুন। বিএমপিকে জামাতের আমীর নিজামী একসময় মুসলমান নির্যাতনকারী থেকে সন্ত্রাসী-কি-না বলেছেন। কিন্তু ক্ষমতার লোভে যেসব মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তারা বলে, সৎ লোকের শাসন চায়। এখন দেখা যাচ্ছে, তাদের কাছে সৎ লোকের মডেল এরশাদ। এই জামায়াতিরা ধর্মের নামে ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল এ দেশে। হিসাব করলে দেখবেন, মুসলমানরা ধর্মের নামে যত মুসলমানকে হত্যা করেছে অমুসলিমরাও তা করেনি। অথচ ইসলামের মর্মবাণী হচ্ছে শান্তি।

রাযিকের শিষ্য খালিদ মুহম্মদ খালিদ লিখেছিলেন, 'মোল্লাদের মতে ইসলামী ব্যবস্থা পরিবর্তনীয় নয়। যদি আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে পরিবর্তন অনিবার্য। 'সুতরাং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার তাদের কাম্য হতে পারে না। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র অসাম্যের, অবিচারের ও স্বৈরাচারের সূতিকাগৃহ। খালিদকেও আল আজহার ত্যাগ করতে হয়েছিল। সৌদি আরব, পাকিস্তান, ইরান এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের এখানকার ইসলাম ব্যবসায়ী দলগুলোর মডেলও এসব রাষ্ট্র। উল্লেখ্য, জিয়াউর রহমান সামরিক শাসক হিসেবে, স্বৈরাচারী ও ক্ষমতা দখলকারী হিসেবে জামাতকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর স্বৈরাচারী এরশাদ মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করেছিলেন। সামরিক শক্তি আর ইসলাম ব্যবসায়ী দলগুলোর মধ্যে সব সময় এক ধরনের গোপন বোঝাপড়া থাকে এবং এ কারণেই জামাত-বিএনপি-জাতীয় পার্টি জোট স্বাভাবিক। লক্ষণীয়, স্বৈরাচারী 'ইসলামী' দেশগুলোতেই 'শরিয়া আইন' প্রচলিত।

অন্যান্য ধর্ম মূল বিশ্বাস অটুট রেখে ধর্মীয় অনুষঙ্গকে যুগোপযোগী করেছে, সেজন্য সেসব ধর্মাবলম্বীরা সৃজনশীল এবং মোল্লা/স্বৈরাচারী শাসকরা এর বিরোধী। বাঙালি যদি বাঁচতে চায় ও দেশের অস্তিত্ব অটুট রাখতে চায় তাহলে ইসলাম ব্যবসায়ী দল থেকে দূরে থাকতে হবে। এরা ভণ্ড। উপর্যুক্ত উদাহরণগুলো এর প্রমাণ। ভণ্ডামি যারা ভালবাসে তারা ভণ্ডদের সমর্থক। ভণ্ডরা যাই হোক দেশ-দশকে এগিয়ে নিতে পারবে না, পিছিয়ে দিতে পারবে বটে। আমি ধর্মজ্ঞ নই। হলে 'ইসলামী দল নিয়ে আলোচনার সাহস পেতাম না। কিন্তু যেহেতু জানি এখানকার 'ইসলামী দলগুলো' সরল ইসলাম নয়, ক্ষমতার ইসলামে অভিলাষী এবং এ কারণে গ্রহণ করেছে ইসলামের ঠিকাদারি, তাই এদের সম্পর্কে লেখার সাহস পেলাম। বোরহানউদ্দিন খান যথার্থই লিখেছেন, 'বাংলাকে বদলাতে হলে এবং বাঙালি মুসলমানকে সমসাময়িক সময়ের মধ্যে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে হলে ইজতিহাদের পথে অগ্রসর হতে হবে।'

১৩.৮.০৬

৩২ বছর পর শাস্তির মুখোমুখি বঙ্গবন্ধুর খুনি মহিউদ্দিন

খবরের কাগজে দেখলাম সার্বিয়ার পুলিশ বাহিনীর সাবেক জেনারেল ভ্লাদিমির দরদেভিচকে মন্টিনিগ্রোয় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে হেগে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে সোপর্দ করা হবে। ১৯৯৮-৯৯ সালে কসোভো যুদ্ধের সময় যে গণহত্যা/নির্যাতন চালানো হয় সে সময় পুলিশ প্রধান ছিলেন এই জেনারেল। লুকিয়ে ছিলেন এতোদিন। কতোদিনের ঘটনা, আমরা অনেকেই তা ভুলে গেছি কিন্তু পৃথিবীর কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ গণহত্যা/নির্যাতন/হত্যার কথা ভোলে না। বিষয়টিকে তারা বাঁচিয়ে রাখে এবং অপরাধীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। রুয়ান্ডায় অনেকে ধরা পড়েছে।

কম্বোডিয়ায় পলপটের অনুসারীদের বিচার হবে। দারফুরের ঘটনাবলিরও বিচার হবে। পিনোশে চিলিতে কী করেছিলেন তা সবার জানা। তার আমলে লোক হারিয়ে যেতো, খুন হতো, আর্জেন্টিনায়ও তা ঘটেছে, তা ও তো ৩৫/৪০ বছর আগের ঘটনা। পিনোশে স্মরণশক্তি রহিত, তবুও তাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে। আর্জেন্টিনায়ও সামরিক জান্তা ও তার অনুচরদের খুঁজে খুঁজে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া মানুষদের মা-বোনরা রাস্তায় মিছিল করছে। হালে, পাকিস্তানে, মুশাররফের বিরুদ্ধে লোকজন রাস্তায় নামছে। সেখানেও মানুষজন হারিয়ে যাচ্ছিল। আর পাকিস্তানের মতো দেশে প্রধান বিচারক তার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। বরখাস্ত হলেন প্রধান বিচারক এখন তিনি সাধারণ মানুষের হিরো। বিশ্বায়নের কারণে, কোনো দেশে কোনো অপরাধের ঘটনা আর কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার থাকছে না। অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়েরকৃত মামলা শুনানির জন্য গৃহীত হয়েছে। এ ব্যবস্থা না হলে পৃথিবী থেকে সভ্যতার বৈশিষ্ট্যটি হারিয়ে যেতো। আমাদের দেশে এখন ব্যারিস্টার মইনুল হাসানের নেতৃত্বে রিফর্মিস্টদের আন্দোলন চলছে। রিফর্ম এখন স্মার্ট ও হট টপিক। রিফর্ম নিয়ে এতো মাতামাতি কিন্তু যুদ্ধাপরাধের মতো এতো বড়ো বিষয় নিয়ে রিফর্মিস্টদের কোনো বক্তব্য নেই। একমাত্র, হ্যাঁ, একমাত্র জেনারেল মইন যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। এ বক্তব্য তার রাখার কথা নয়। রাখার কথা রাজনীতিবিদদের। রিফর্মিস্টদের এতো নাচানাচি কোথায় ছিল যখন তারা দলে, সরকারে ক্ষমতায় ছিলেন? এখন সব পেয়ে রিফর্মের ঢোল পেটাচ্ছেন। রিফর্ম নিয়ে তো আমাদের নাচানাচি করার কথা যারা দল ও সরকারে ক্ষমতায় ছিলাম না। আমরা রিফর্ম চাই এরকম যারা দু'বারে নির্বাচিত হয়েছেন বা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন তারা আর নির্বাচন করতে পারবেন না। তারা সবাই প্রচুর পয়সা খরচ করে দু'বার নির্বাচন করেছেন।

নির্বাচন কমিশন নাকি রিফর্ম করে ইলেকশন থেকে টাকা-পয়সার সংশ্লিষ্টতা দূর করবেন। করুন, তাহলে আমরা নির্বাচনে দাঁড়াবো।

যাক, যা বলছিলাম, এ দেশেই একমাত্র খুনি যুদ্ধাপরাধীরা বহাল তবিয়তে আছে। রাজনীতিবিদদের অনেকের বাইরে যাওয়া নিষেধ কিন্তু সবাইকে কাঁচকলা দেখিয়ে সাবেক মন্ত্রী, যুদ্ধাপরাধী মুজাহিদ তুরস্কে গেছে। জরুরি অবস্থায় মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় বটে, কিন্তু, মনের প্রশ্ন তো বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু, সব কিছুই অন্ধকার নয়। দেখা যাচ্ছে, অপরাধ ইনডেমনিটি দিয়ে চাপা রাখলেও বিচার একদিন হচ্ছেই, হবেই। বঙ্গবন্ধুর খুনি হিসেবে পরিচিত মেজর মহিউদ্দিন ৩২ বছর পর বিচারের মুখোমুখি হচ্ছে গ্রেপ্তার হয়ে। অনেক চেষ্টা করেছিল মহিউদ্দিন, পালিয়েও গিয়েছিল সপরিবারে কিন্তু ফিরে আসতে হলো ঢাকায়। আর এ পরিপ্রেক্ষিতেই এসব কথা মনে হলো।

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিলো তারা এই হত্যাকে 'গ্লোরিফাই' করে একটি 'আদর্শ' তৈরি করে। এই আদর্শের ভিত্তি হলো হত্যা। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত না হলে এ আদর্শ দাঁড় করানো যেতো কিনা সন্দেহ। ঐ আদর্শ দাঁড় করাতে হয়েছে জোর জবরদস্তি করে, শক্তিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। যারা বিষয়টি গ্লোরিফাই করেছিল এবং খুনিদের সূর্যসন্তান হিসেবে অবহিত করেছিল তারা কখনও ভাবেনি এই খুনের বিচার হবে। খুনিরা বিদেশে উল্লাসে আনন্দে চাকরি/ ব্যবসা করে জীবনযাপন করেছে। কিন্তু, বিচার করতে হয়েছে, এদের শাস্তিও প্রদান করা হয়েছে। অনেক আগেই এদের দন্ডাদেশ হয়তো কার্যকর হতো যদি না তাদের আদর্শের প্রতিনিধি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এদের রক্ষা করতে কোর্ট-কাচারি তছনছ করতেন। এখন দেখি সেই মওদুদ মোটা এক ফাইল নিয়ে বিষণ্ন মুখে কোর্টে আসা যাওয়া করছেন। মওদুদরা যখন বিনা দোষে আমাকে ও শাহরিয়ারকে গ্রেপ্তার করে তখন বিবিসির এক অনুষ্ঠানে মাহফুজ আনাম তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন জানতে, কেন এই গ্রেপ্তার, কেন ৫৪ ধারার এই অপব্যবহার। দুষ্টুমির হাসি হেসে এই লোকটি বলেছিল, না কারণ তো আছে, ৫৪ ধারার অপব্যবহার হয়নি। জিয়াউর রহমান ও এরশাদের পর সিভিলিয়ান হিসেবে এই লোকটি বাংলাদেশের কাঠামোগত যতো ক্ষতি করেছেন তা আর কেউ করেনি। এখন মাদক দ্রব্যের মামলায় বন্দী হয়ে তার কেমন লাগছে, যে মামলায় তার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা নয়। ব্যাপারটি হাস্যকর বটে কিন্তু তাকে যে পুলিশ প্রহরায় কোর্টে আসা যাওয়া করতে হচ্ছে এটাই সান্ত্বনা। তবে, অবাক হবো না, যদি এই ব্যারিস্টার বেরিয়ে এসে আরেক ব্যারিস্টারের জায়গা দখল করেন। মওদুদের পক্ষে সব সম্ভব। এবং বাংলাদেশ একটি সব সম্ভবের দেশ।

মেজর মহিউদ্দিন প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে ঢাকায় ফেরত পাঠানো না হয়। তার জন্য প্রভাবশালীরা লবিং করেছে কিন্তু তাকে ফিরতে হয়েছে ৩২ বছর আগে করা অপরাধের শাস্তি পাওয়ার জন্য। কারণ, বঙ্গবন্ধুর খুনও যুদ্ধাপরাধের মতো হত্যা। নিছক সাধারণ খুনি হলেও হয়তো তাকে ফেরত পাঠানো হতো। কারণ, সব কিছুর মাফ আছে,

খুন/নির্যাতন করার মাফ নেই। মেজর মহিউদ্দিন অবশ্য বলেছেন, তিনি খুনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত নন।

সেশন আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যার দায়ে যে ক'জন অভিযুক্ত হয়েছে এ মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে মহিউদ্দিন তাদের একজন। হাইকোর্টে আপিল হলে, কয়েকজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয় বটে কিন্তু মহিউদ্দিনের প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন তিন বিচারকই। তারা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মহিউদ্দিনের সম্পৃক্ততা খুঁজে পেয়েছিলেন। সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তিনজন বিচারক যে বিবরণ দিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্তসার এরকম ক্যান্টনমেন্টে মহিউদ্দিনের বাসায় গভীর রাতে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা মিলিত হয়, অস্ত্র নেওয়া হয়।

মহিউদ্দিন একজনকে ইউনিফর্ম সরবরাহের কথাও বলে এবং সৈন্য্য ভর্তি কয়েকটি ট্রাক নিয়ে ৩২ নম্বরের দিকে এগোয়। রাস্তার মোড়ে গাড়ি রেখে মেজর মহিউদ্দিন কোমরে আগ্নেয়াস্ত্র রেখে গুলি করতে করতে ভেতরে ঢোকে। একজন সাক্ষী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে মহিউদ্দিনই ধরে এনেছিল। গুলি করার পর মহিউদ্দিন ও অন্য খুনিরা বাইরে এসে বলে, সব শেষ। মেজর মহিউদ্দিনকে পরে বাংলাদেশ বেতারেও দেখা গেছে।

বিজ্ঞ বিচারক খায়রুল হক তার রায়ে এ প্রসঙ্গে বলেন, লে, কর্ণেল সৈয়দ ফারুক রহমান তার স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, রাত ১ টায় (১৫ আগস্ট) মেজর মহিউদ্দিন ল্যান্সার ইউনিটে উপস্থিত ছিল। মেজর বজলুল হুদা ও মেজর নূর চৌধুরীর সঙ্গে মেজর মহিউদ্দিনকে বঙ্গবন্ধুর বাসায় 'মেইন অপারেশন' চালাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অন্য সাক্ষীরাও নানাভাবে তার সম্পৃক্ততার কথা বলেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে ও তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখা হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারক মোহাম্মদ ফজলুল করিম এ বক্তব্য সমর্থন করেন। বিজ্ঞ বিচারক জে. মো. রুহুল আমিনও একই রায় দিয়েছেন। তার রায়ে তিনি বলেন, মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে আসামিপক্ষ তার অসত্যতা প্রমাণ করতে পারেনি (`nothing material has been elicited to shake the credibility of the witness.") তার রায়ে তিনি আরো বলেন, প্রতিরক্ষা সার্ভিসের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অপরাধী ও অন্য কয়েকজন অপরাধীর চাকরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছিল কারণ তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত ("... in its entirety leads to one conclusion that for maintaining the discipline of the Defence Service, service of the convict and some other convicts was placed in the Ministry of Foreign Affairs because of their being involved in the incident.") শেষ ব্যাখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, যারা এ চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করেছিল তারা বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল দেখে তাকে (ও অপরাধীদের) বিদেশে চাকরি দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। এ মন্তব্যের সত্যতা আরো প্রমাণিত হয় এ কারণে যে, যারা সাধারণ্যে খুনি হিসেবে পরিচিত ছিল তাদের সবাইকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। এর মানে তৎকালীন ক্ষমতাধর লে, জেনারেল জিয়াউর রহমান এ সব বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন এবং জেনেও খুনের আসামিদের বাঁচিয়েছেন যে আরেক ধরনের অপরাধ। তিনি

আজ মৃত, বিএনপি ও ডানপন্থীরা এবং তাদের হালের রিফর্মিস্টরাও যখন জিয়া বন্দনা করেন তখন তারাও পরোক্ষভাবে এ খুনকে গ্লোরিফাই করেন।

মেজর মহিউদ্দিনকে ৩২ বছর পর, তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করার জন্য ঢাকায় ফিরতে হয়েছে। সে সময় যে ছিল শিশু, আজ সে মধ্যবয়সী। মহিউদ্দিনও কখনও ভাবেনি বৃদ্ধ বয়সে ৩২ বছর আগে গ্লোরিফাই করা অপরাধের জন্য দেশে ফিরতে হবে। বাংলাদেশে তো এমন হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু হয়েছে। ভবিষ্যতেও অনেককে নানা কারণে হয়তো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, তবে বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে ৩২ বছরের সময়সীমা কমে আসবে। আমরা যেন তা মনে রাখি ও আশাবাদী হই। তবে, দুঃখ লাগে এসব খুনি/যুদ্ধাপরাধীদের সন্তানদের কথা ভাবলো। তারা জীবনে হয়তো অনেক উন্নতি করবে কিন্তু পিতার নাম বলতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী সম্প্রতি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাকে গান শোনার আমন্ত্রণ জানান এক মহিলা। সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে লন্ডনে পরিচিত। কিন্তু জনাব চৌধুরীকে তার নাম জানাননি। পরে, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী জানতে পারেন, তিনি খোন্দকার মোশতাক আহমদের মেয়ে। কারো কাছে পিতৃ পরিচয় দেন না।

২০.৬.০৭

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা ঃ উচ্চতর আদালত ও সরকারের দায়বদ্ধতা

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত 'মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস' আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করে এক যুগান্তকারী রায় প্রদান করেছেন বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

উচ্চতর আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, 'একজন মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ৩০০ টাকা অর্থাৎ দৈনিক ১০ টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদানকে 'ভাতা' না বলে 'ভিক্ষা' বলাই যুক্তিযুক্ত।' বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ও বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ প্রদত্ত এ রায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলা হয়, একজন মুক্তিযোদ্ধাকে এতো স্বল্প পরিমাণ ভাতা প্রদান জাতি হিসেবে আমাদের মানসিক দেউলিয়াত্বই প্রমাণ করে, যা কোনো গৌরব বহন করে না।

রায়ে ২০০২ সালে ১৬৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তকে 'বেআইনী' ঘোষণা করে এর আগের সিদ্ধান্ত সঠিক সাব্যস্তি করে তা পুনর্বহালের আদেশ দেওয়া হয়। (ভোরের কাগজ, ৮ জুলাই ২০০৭)

উচ্চতর আদালতের এই রায়কে যুগান্তকারী বলছি এই কারণে যে, ইতিপূর্বে বহুবার আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী বৃদ্ধি এবং যথাযোগ্য মর্যাদার পুর্নবাসনের দাবি জানিয়েছি, কিন্তু অতীতে কোনো সরকারই আমাদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি। বরং '৭১-এর ঘাতক-দালাল-যুদ্ধাপরাধী অধ্যুাষিত খালেদা-নিজামীদের জোট সরকারের জামানায় আমরা দেখেছি মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাবিনাশী বহুমাত্রিক কার্যক্রম। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি দূরে থাক, সেই সময় বহু মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারদের বরাদ্দকৃত বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছনার বহু ঘটনাও ঘটেছে, পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধে ইতিহাসের ভয়ঙ্কর বিকৃতি ঘটানো হয়েছে এবং '৭১-এর চিহ্নিত ঘাতক, দালাল ও যুদ্ধাপরাধীরা ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে রঞ্জিত জাতীয় পতাকা তাদের-গাড়িতে-বাড়িতে উড়িয়েছে। শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি সনাক্তকরণ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধের কমপ্লেক্স নির্মাণ, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সন্তানদের জন্য সরকারি চাকরির কোটা প্রভৃতি চালু হয়েছিল-খালেদা-নিজামীরা যথারীতি সেসব বাতিল করে দিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাবিনাশী কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রশাসনের তালেবানিকরণ, জঙ্গি মৌলবাদের রেকর্ড উৎপাদন, সংখ্যালঘু অমুসলিম নির্যাতন এবং রাজনীতির নামে ইসলামধর্ষণ আমরা খালেদা-নিজামীদের জমানায় প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করেছি।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বগ্রহণের পর প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছেন, শিক্ষা উপদেষ্টা পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজনের কথা বলেছেন, সেনাপ্রধান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের কথা বলেছেন–দুর্ভাগ্যের বিষয় ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এসব বিষয়ে কোন প্রাথমিক পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে এমন তথ্য আমাদের জানা নেই।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানকে আমাদের অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। তবে সরকারের সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযান মূলতঃ দেশের প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়ায় এবং জামাতে ইসলামীর কোনো শীর্ষ নেতাকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার না করায় এই প্রশ্ন সরকার সমর্থকদের মনেও জেগেছে- তাবৎ দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী শুধু বিএনপি ও আওয়ামী লীগে, জামাতের সবাই ফেরেশতা, সরকার কেন এ ধরনের সংকেত পাঠাচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে, এমনকি দেশের বাইরেও? জামাতের দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিসম্পৃক্তি সম্পর্কে বহু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও গবেষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পরও '৭১-এর ঘাতক-দালাল-যুদ্ধাপরাধীদের দল জামাতে ইসলামীর প্রতি সরকারের সদয় মনোভাব তাদের ইতিবাচক কার্যক্রমকেও প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

আমরা এখনও জানি না জামাত সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদয় মনোভাবের রহস্য কী। একই অভিযোগে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং জামাতের সাধারণ সম্পাদক আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ অভিযুক্ত হলেও হাসিনাকে দেশের বাইরে যেতে দেয়া হবে না, তার সঙ্গে কেউ দেখা করতে পারবেন না, তার চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা হবে অথচ মুজাহিদরা বগল বাজিয়ে দেশের বাইরে যাবেন, দেশের ভেতরে অবাধে ঘুরে বেড়াবেন, দাওয়াতের নামে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাবেন-এর শানে নযুল সরকারের নীতিনির্ধারকরা ভাল বলতে পারবেন, তবে আমরা যারা ঘরপোড়া গরু তারা যারপরনাই উদ্বেগ বোধ করছি।

এ হেন সরকারের জমানায় উচ্চতর আদালত-মুক্তিযোদ্ধাদের উপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শন এবং পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজনের নির্দেশ প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী চৌদ্দ কোটি বাঙালিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আদালতের উক্ত রায়ে বলা হয়েছে–'মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জাতি হিসেবে আমাদের যে অনীহা ও অবহেলা, তার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ও নির্লিপ্ততাই দায়ী।

কিন্তু জাতি হিসেবে আমাদের গর্ব এই মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে নতুন প্রজন্মকে অবহিত করা জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন।'

তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করার জন্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গত বারো বছর ধরে যে পাঠাগার আন্দোলন পরিচালনা করছে–শত বাধাবিপত্তি ও হামলা সত্ত্বেও পাঠাগারের গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোট সরকারের জমানায়ও অব্যাহত ছিল। বর্তমান সরকারের জরুরি অবস্থা সেই সব কার্যক্রম কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ কয়েকটি জায়গায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মাসে দু মাসে এক আধটি আলোচনা সভার অনুমতি পাওয়া গেলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের যাবতীয় কার্যক্রম স্থবির হয়ে গেছে। কখন কাকে কোন অজুহাতে গ্রেফতার করা হবে সেই ভয়ে মফস্বলের অধিকাংশ পাঠাগার বন্ধ হয়ে গেছে, যদিও জামায়াতিদের দাওয়াতি কর্মসূচি এবং ফেরদৌস কোরেশীদের দল গঠনের কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চলছে।

আমরা কেউ চাই না বর্তমান সরকার এ দেশের ইতিহাসে জামাততোষণকারী মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও মানবাধিকারলংঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত হোক। আমরা এই সরকারকে প্রকৃত অর্থেই দলনিরপেক্ষ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার হিসেব দেখতে চাই। এ কারণে আমরা বর্তমান সরকারের নিকট দাবি করছি–

১. উচ্চতর আদালত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধির যে সুপারিশ করেছেন–অবিলম্বে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ৩০০ টাকা থেকে অন্ততপক্ষে ৬০০০ টাকায় উন্নীত করা হোক। সম্মানীর এই অঙ্ক মোটেই অস্বাভাবিক মনে হবে না যদি আমরা প্রতিবেশী ভারতের দিকে তাকাই। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি মাসে তিন থেকে চার হাজার ভারতীয় টাকা (বাংলাদেশের টাকার বর্তমান মানের প্রায় দ্বিগুণ) দেয়া হয়। প্রবাসী মুক্তিসংগ্রামীদেরও মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা সম্মানী দেয়া হয়। এর সঙ্গে মাগ্‌গি ভাতা রয়েছে মূল সম্মানীর ২৪%। অর্থাৎ যাঁর মূল ভাতা মাসে চার হাজার টাকা তিনি এর সঙ্গে অতিরিক্ত পাবেন নয়শ ষাট টাকা, যা বাংলাদেশী টাকায় নয় হাজারেরও বেশি। মুক্তিযোদ্ধার অবিবাহিত তিন কন্যা (যদি থাকে) পাবেন জ্যেষ্ঠজন ছয়'শ টাকা, কনিষ্ঠ দুই জন মাথাপ্রতি সাড়ে তিনশ টাকা। মুক্তিযোদ্ধার বাবা-মা জীবিত থাকলে প্রত্যেকে পাবেন মাসে এক হাজার টাকা। মুক্তিযোদ্ধা মারা গেলে তাঁর বিধবা স্ত্রী আমৃত্যু পাবেন মাসে তিন হাজার টাকা। এ ছাড়া প্রত্যেক মুক্তিসংগ্রামী একজন সঙ্গীসহ ট্রেনে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের 'ফ্রি পাস' পাবেন, সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা, অর্ধেক খরচে টেলিফোন (স্থাপনা বিনামূল্যে) এবং যাঁদের দেখার কেউ নেই তারা নির্দিষ্ট সরকারি বাড়িতে বিনাভাড়ায় থাকতে পারবেন। পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের শতকরা ২ ভাগ ডিলারশিপ/পরিবেশনা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত। আন্দামানে যারা বন্দি ছিলেন প্রতিবছর সেখানে যাওয়ার জন্য তারা জাহাজ বা বিমানে বিনামূল্যে টিকেট পাবেন। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত ভাতা দেয় মুক্তিসংগ্রামীদের। পশ্চিমবঙ্গে এই ভাতার পরিমাণ বর্তমানে মাসিক সাড়ে বারোশ টাকা। শুধুমাত্র

পশ্চিমবঙ্গেই ভাতাপ্রাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংখ্যা ২২,৪৪৭ জন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে এই ভাতাও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান মোটেও অযৌক্তিক হবে না। তারেক, বাবর, ফালু আর গিয়াস মামুনদের কাছ থেকে অবৈধভাবে উপার্জিত যে হাজার হাজার কোটি টাকা জব্দ করার কথা শুনছি তার সামান্য অংশ নিয়ে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা যেতে পারে। সরকারের এই বিশেষ খাত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ও পুর্নবাসনের অর্থ ব্যয় করা হলে জামাত এবং তাদের দোসর ছাড়া অন্য কেউ নিশ্চয় আপত্তি করবে না।

২. হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অবিলম্বে স্কুল ও মাদ্রাসাসহ বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যমের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখানে একটি কথা বলা দরকার। ইংরেজী স্কুলগুলোতে কিছু ইংরেজ তৈরি হচ্ছে। অভিভাবকরা দেশের সম্পদ খরচ করে বিদেশে বসবাসের জন্য কিছু নাগরিক তৈরি করছেন, যাদের দেশ সম্পর্কে ধারণা অপ্রতুল। জাতির জন্য তা শুভ নয়। একই সঙ্গে শুভ নয় মাদ্রাসায় মধ্যযুগীয় পাঠ্য বিষয়ে পাঠ দান। সেখানকার ছাত্ররা জামাত ও জেহাদ সম্পর্কে হয়ত অনেক কিছু জানে কিন্তু নিশ্চিত যে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু জানে না। ফলে, স্বদেশপ্রেমে ছাত্রদের খানিকটা যে গোলযোগ থাকবে তা স্বাভাবিক। এ কারণে হাইকোর্টের রায়টিকে আমলে নেয়া আরও বেশি জরুরি বলে আমরা মনে করি। খালেদা-নিজামীদের জোট সরকারের আমলের মিথ্যা কদর্য ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সে বিষয়েও সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

৩. সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জাতির জনক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের যে আশ্বাস দেশবাসীকে দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তমান সরকারের এবং এ কাজেও জামাত ও তাদের দোসর ছাড়া অন্য কেউ অখুশি হবে না। বরং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

৪. জঙ্গি মৌলবাদীদের গডফাদারদের বহাল তবিয়তে রেখে জঙ্গি নির্মূল অভিযান কখনও সফল হবে না। আমাদের দাবি–জঙ্গি মৌলবাদীদের গডফাদার জামাতের শীর্ষ নেতাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এবং জিজ্ঞাসাবাদের বিবরণ জলিল-বাবরদের জবানবন্দির মতো পত্রিকায় প্রকাশ করা হোক। একই সঙ্গে ইতিপূর্বে গ্রেফতারকৃত জঙ্গিরা জামাতের সঙ্গে এবং প্রশাসনের জামাতে কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্তি সম্পর্কে যা বলেছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক।

৫. যে সব ব্যাংক, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও জঙ্গি মৌলবাদীদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করেছে এবং এখনও করছে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

৬. জোট সরকারের আমলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের উপর নজিরবিহীন নির্যাতনের জন্য যারা দায়ী অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার ও বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে

হবে। যারা সংখ্যালঘুদের জমি, বসতবাটি ও মন্দির দখল করেছে তাদের কাছ থেকে তা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফেরত দিতে হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যে সব মসজিদ জামায়াতিদের সহযোগী সংগঠনগুলো দখল করেছে সেগুলো অবিলম্বে দখল মুক্ত করতে হবে।

৭. প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর থেকে জামাত ও তাদের সহযোগীদের বিতাড়ন করতে হবে, অন্যথায় আগামী নির্বাচন কখনও শান্তিপূর্ণ অথবা নিরপেক্ষ হবে না।

আশার বিষয়, সরকার এখনও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করেন নি। এটি সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ এর আগে ২০০১ সালে বিচারপতি রাব্বানীর দেয়া ফতোয়া নিষিদ্ধকরণ এবং ২০০৫ সালে বিচারপতি খায়রুল হক প্রদত্ত ৫ম সংশোধনী সংক্রান্ত দুটি যুগান্তকারী রায় সরকারের আপিলের কারণে স্থগিত হয়ে যায়। সরকার এ বিষয়ে আপিল করলে বর্তমান রায়টি যে স্থগিত হবে সে সম্পর্কে আমরা প্রায় নিশ্চিত। সরকার এ বিষয়ে আপিল না করলে এটি প্রমাণিত হবে যে, তারা কারো প্রতি দুর্বল নয়। এখন সরকারি একটি বিজ্ঞাপন দেখি যার শিরোনাম 'এখনই 'সময়'। আমরা মনে করি হাইকোর্টের এ রায় কার্যকর করার এখনই সময়। এটি কার্যকর করা হলে জেনারেল মইনকে মুক্তিযুদ্ধ প্রেমীরা যে দীর্ঘদিন মনে রাখবে তা বলাই বাহুল্য।

সরকার যদি জামাতের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল না হয়, তাদের যদি গোপন কোন এজেন্ডা না থাকে তাহলে এ সব দাবি পূরণ করা তাদের পক্ষে মোটেও কঠিন বা সময়সাপেক্ষ হবে না।

১১.৭.০৭

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা জরুরি

বর্তমান প্রতিদিন কেউ না কেউ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তুলছেন। যারা এক সময় যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে ক্ষমতা ভোগ করেছেন, তাদের অনেকেও এগিয়ে এসেছেন। এসব দেখে নতুন প্রজন্মের অনেকের মনে হতে পারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটা বোধহয় নতুন বা এ বছরই তা জোরালোভাবে তোলা হয়েছে, আসলে তা নয়। ১৯৭১ সাল থেকেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তোলা হয়েছে।

যুদ্ধাপরাধী কে? সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা দেশের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড, লুট, ধর্ষণ বা বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত ছিল, তারাই যুদ্ধাপরাধী। হানাদার পাকি বাহিনীর নীতিনির্ধারক বা যারা এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত তারা যুদ্ধাপরাধী। স্থানীয় যেসব অধিবাসী তা বাঙালি হোক বা অবাঙালি হোক- এসব কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছে তারাও যুদ্ধাপরাধী। এর সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার হত্যা। কারণ, যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থকরাই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল।

ভুলে যাওয়ার এক অসম্ভব ক্ষমতা আছে বাঙালির। অনেকে বলেন, বাঙালি ক্ষমাশীল। আমি মনে করি, না, তা সুবিধাবাদ, নিষ্ঠুরতা। ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকার বিবর্ণ ফাইল খুলে দেখুন। প্রতিটি পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, খুন হওয়া মানুষের খবর, খুনিদের তালিকা, বিচারের দাবি আর সরকারি প্রতিশ্রুতি। তৃতীয় বছর থেকে এসব খবর কমতে থাকে এবং এক সময় তা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে ২৫ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায়। হয়তো এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক নয়, খুনিদের বিচার না হওয়া, সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মিত্র করা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়নে আমরা ব্যস্ত থেকেছি কিন্তু যারা শহীদ হলেন, খুনি যারা তাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। এখনো সে চেষ্টা নেওয়া হয়নি। এসব যখন মনে হয় তখন নিজেদের প্রতি ধিক্কার জানানো ছাড়া করার কিছুই থাকে না। একবার ভেবে দেখেছেন কি, প্রত্যেক জাতির জাতীয় বীর থাকে, আমাদের নেই। থাকলেও স্বীকার করি না। আমরা স্বীকার করি তাদের, যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং যারা বিজাতীয়। পৃথিবীর সব দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রথম যে কাজটি করা হয় তা হলো জাতীয় বীরদের প্রতি স্মৃতি তর্পণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একমাত্র ব্যতিক্রম।

এ সমস্ত কর্মকাণ্ড হয়েছে আমাদের একাংশের সহযোগিতার কারণে। এর ফলে দেশে দীর্ঘদিন কায়েম থেকেছে প্রজাবিরোধী শাসন। থাবা বিস্তৃত হয়েছে মৌলবাদের।

প্রায় সময় আমাদের নিশ্চুপ থাকার কারণ, আমাদের অনেকে এর বিনিময়ে ইউনিফর্মধারী ও ইউনিফর্মহীন বা ইউনিফর্ম-প্রভাবিত শাসকের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছি। তবে একথা বলা ভুল হবে যে, নিরস্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা এতে অপমানিত বোধ করেনি। তাদের ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছিল জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে।

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকেই বাংলাদেশে গণহত্যা বিশেষ করে বুদ্ধিজীবি হত্যাকারীদের বিচার দাবি করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, শহীদ বুদ্ধিজীবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল 'চারুকলা ও সাহিত্য সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল' গঠন করা হবে। সেটির কী হলো? না, রাজনৈতিক নেতা বা আমরা, কেউ তার খোঁজ করিনি।

বিজয়ের পর থেকেই পত্রপত্রিকায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য আলবদরদের দায়ী করে বিচারের দাবি তোলা হয়। ২৫ ডিসেম্বর বেগম সুফিয়া কামাল ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনসহ ৫২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার দাবি করেন। ২৮ ডিসেম্বর (১৯৭১) ১৩ জন লেখক শিল্পী ও আইনজীবীর যুক্ত বিবৃতি যোগসাজশকারীদের খুঁজে বের করুন।... বিবৃতিতে এসব বুদ্ধিজীবী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ও তাদের এজেন্টদের আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে এখন বেঁচে আছেন–ব্যারিষ্টার (বিচারপতি) মোস্তাফা কামাল, আহমদ রফিক, ফেরদৌসী রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, আমিনুল ইসলাম বেদু ও মুস্তাফা জামান আব্বাসী। এদের মধ্যে মোস্তাফা কামাল পরবর্তীকালে বিচারপতি হিসেবে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব অনুমোদন করেন।

১৯৭২ সালে দেখি কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে শহরে বিক্ষোভ সভা ও মিছিল হচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ৫ জুন ১৯৭২ ঘোষণা করেন– যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে।

জহির রায়হান এসব আন্দোলন সংগঠন করেছিলেন এবং হত্যার তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

জহির রায়হান নিখোঁজ হওয়ার পরবর্তী ঘটনা বিবৃত হয়েছে 'একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়' গ্রন্থে। আমি সেখান থেকে উদ্ধৃত করছি– '৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির উদ্যোগ থামিয়ে দেওয়া হয়। কমিটি ইতোমধ্যে যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ উদ্ধার করেছিল কলকাতার একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক ভারতে নিয়ে চলে যান। ২১ ডিসেম্বর তারিখে আকাশবাণী কলকাতার কেন্দ্র থেকে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট সমর্থক ব্রিটেনের সাবেক মন্ত্রী জন স্টোনহাউস বলেন যে, বাংলাদেশের শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার ব্যাপারে পাকবাহিনী যে জড়িত ছিল, তার প্রমাণ তার কাছে রয়েছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন এই

হত্যাকাণ্ড চলছিল তখন মি. স্টোনহাউস ঢাকাতেই ছিলেন। সাক্ষাৎকারে মি. স্টোনহাউস বলেন, বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল পদমর্যাদার ১০ জন সামরিক অফিসারকে তিনি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অফিসারদের নাম প্রকাশে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করার জোর দাবি জানান। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মুখ্য দালালদের নামও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন বলে তিনি জানান। এই দশজন অফিসারের পরিচয় এবং বুদ্ধিজীবী হত্যাসংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র আর কখনোই আমাদের হস্তগত হয়নি।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবি করে '৭২ সালের ৭ মার্চ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ শহীদ মিনারে গণজমায়েত করেন। এরপর মিছিল করে বঙ্গভবনে যান। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন। পরে মিছিলকারীরা বঙ্গভবনের ফটকে অবরোধ করে বসে পড়লে অনেকক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিছিলকারীদের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে তিনি জানান যে, তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে। ইতিপূর্বে ৮ ফেব্রুয়ারী জহির রায়হানের অন্তর্ধানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিন সপ্তাহের ভেতর তাকে রিপোর্ট করা হবে। সেই তদন্তের ফলাফল দেশবাসী কখনো জানতে পারেননি।

২.

এ ধরনের মুক্তিসংগ্রামের পর বা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সব সময়ই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে। বাংলাদেশেও হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়নি। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জে এন দীক্ষিত জানিয়েছেন, হানাদার বাহিনীর ৪০০ জনকে যুদ্ধাপরাধের জন্য শনাক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭২-এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু সে সংখ্যা হ্রাস করে ১৯৫ এবং তারপর তা ১১৮-তে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই ১১৮ জনের বিচারের জন্যও বাংলাদেশ সরকার মামলা তৈরি করতে পারেনি।

এই যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট চাপ ছিল। ভারতও তাই দিল। দীক্ষিতের বই পড়ে তা-ই মনে হয়, যদিও কোথাও তিনি স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করেননি। শেখ মুজিব যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে প্রত্যর্পণে সম্মতি দিয়েছিলেন। এবং দীক্ষিত মনে করেন, সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। মুজিব পিএন হাকসারকে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা মুশকিল এবং তিনি এ কারণে সময় ও এনার্জি নষ্ট করতে চান না। দীক্ষিতের মতে, "The substantative motivation for Mujibs decision might have been his long-term strategy of not doing anything which would prevent recognition of Bangladesh by normalcy in the sub-continent Mujibur Rahman's approach was valid." কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যুদ্ধাপরাধীদের

বিচার না করায় ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশে কি সেই প্রার্থিত 'stability' এসেছে? না, উপমহাদেশে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরেছে?

আবু সাইয়িদ তার 'সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম' গ্রন্থে লিখেছেন– দেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তৎকালীন 'সরকারের উদ্যোগের অভাব ছিল না।' এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখিয়েছেন, রাজাকারদের বিচার শুরু হয়েছিল এবং দালাল আইন জারির পর ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে ৩৭৪৭১ জন দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এরপর তিনি অনেক কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, যার ফলে রাজাকার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সামাজিক চাপ, একই পরিবারে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার দুই-ই ছিল এবং রক্ত সম্পর্কের কারণে অনেকে রাজাকারদের বাঁচাতে চেয়েছিল। রাজাকাররাও তাদের আত্মজীবনী এ ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন।

আজ ৩৭ বছর পর প্রশ্ন জাগছে, ওইসব যুক্তি সত্ত্বেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করায় কি সমাজে, রাজনীতিতে শান্তি এসেছে? আসেনি। কারণ, রাজাকারদের চরিত্র-বিচার সে সময় করা সম্ভব হয়নি। এ প্রশ্ন সোচ্চারিত হয়ে ওঠেনি যে, যে অনুকম্পা রাজাকারদের প্রতি দেখানো হয়েছে সে অনুকম্পা কি রাজাকাররা প্রদর্শন করেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি? সবচেয়ে বড় কথা, যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি আমরা অনুকম্পা প্রদর্শন করেছি। তাদের পুর্নবাসিত করেছি এবং আজ আবার তাদের বিরুদ্ধে প্রায় সম্মুখসমরে আমাদের নামতে হচ্ছে। কিন্তু যে ৩০ লাখ শহীদ হলেন, তাদের প্রতি কি এ পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায়বিচার করা হয়েছে? তাদের প্রতি কি যথাযথ মর্যাদা দেখানো হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তরও হচ্ছে- না। এ প্রসঙ্গে দীক্ষিত উল্লেখিত একটি ঘটনার কথা বলা যায়। যুদ্ধাপরাধী রাও ফরমান আলীকে যখন কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে, তখন তিনি বলেছিলেন ভারতীয়রা ভাবছে, বাঙালিদের সাহায্য করেছে দেখে বাঙালিরা তাদের পক্ষে থাকবে? থাকবে না। কারণ, "They had no capacity for gratitude" এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন ; কিন্তু ১৯৭১ সালের পরবতী ঘটনাবলি কি এ মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে না?

৩.

১৯৭৫ সালের পর থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়। চালু করা হয় কাবুল এবং লাহোর কালচার। এরশাদ জিয়াউর রহমানের আর্দশকে আরো পুষ্ট করে গেলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য একটি গণতদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। এর সদস্য ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, খান সরোয়ার মুরশিদ, দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, কেএম সোবহান, শামসুর রাহমান, অনুপম সেন, এমএ খালেক, সালাহউদ্দিন ইউসুফ, সদরুদ্দিন ও শফিক আহমেদ। ইতিমধ্যে গঠিত হয়

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও জাতীয় সমন্বয় কমিটি।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আবার ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ জাহানারা ইমামকে সভাপতি করে ১২ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত হয় গণআদালত এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্মরণাতীতকালের বিশাল সভায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় ঘোষণা করা হয়। 'গণআদালতের মাধ্যমে সৃষ্ট একাত্তরের ঘাতক দালালবিরোধী আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠেন গোলাম আযমসহ একাত্তরের অন্যান্য ঘাতক, দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে।'

কীভাবে গণআদালত হয়েছিল এবং এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ আছে শাহরিয়ার কবিরের 'গণআদালতের পটভূমি' গ্রন্থে। গণআদালতের পর বেগম জিয়ার সরকার এর সঙ্গে যুক্ত ২৪ জনকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করে। হাইকোর্টে বিচার চলে। ২৪ জন জামিনে মুক্তি পান। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহী'র তকমা এখনো এঁটে আছে তাদের শরীরে। বাংলাদেশের মানুষ যদি একবার সুস্থ হন তাহলে ভাবুন-এই বাংলাদেশে রাষ্ট্রদ্রোহী হচ্ছে তারা, যারা দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছে। যারা বিরোধিতা করেছে তারা রাষ্ট্রদ্রোহী নয়।

৪.

আমরা কেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। এর একটি কারণ এই যে, তারা যে যুদ্ধাপরাধ করেছে তা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সাবেক রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউল ইসলাম বলেছিলেন, ১৯৭২ সালে যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে আলোচনার জন্য জার্মানি থেকে এক আইনজ্ঞ এসেছিলেন। নুরেমবার্গ বিচারের একজন প্রসিকিউটরের তিনি ছিলেন সহকারী। তিনি ওয়ালিউল ইসলামকে বলেছিলেন, যেভাবেই হোক তোমরা এদের বিচার করো। আর কিছু না হোক, তারা যে অপরাধী সে কথা প্রমাণিত হোক।

এ বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি দেখে বাঙালি যুদ্ধাপরাধীরা বলতে পারে তারা কোনো অপরাধী নয়। পাকিস্তানিরাও বলতে পারে তারা অপরাধ করেনি এবং '৭১-এর জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত না হয়ে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াতে পারে। সুতরাং আমরা সভ্যতার কারণে হলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা পিএন হাকসার শাহরিয়ার কবিরকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধের বিচার বাংলাদেশেই করতে হবে। সেটাই নিয়ম। কিন্তু সে নিয়ম এখন আর নেই। এখন যে কোনো দেশের যুদ্ধাপরাধীর বিচার আন্তর্জাতিক আদালতেও হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন নাগরিক ফোরামের উচিত, যুদ্ধাপরাধী বিশেষ করে পাক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়া, আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে সে দাবি উত্থাপন করা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, বিচারের অনেক ধারণা বা নোশানও চ্যালেঞ্জ করা উচিত। একটি উদাহরণ দিই। শহীদুল্লা কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত খালেক

মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়। হাইকোর্ট সে রায় বাতিল করে। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী তাদের রায়ের উপসংহারে বলেন, "In the circumstances, therefore, the opinion that doubt has crept into the prosecution case and this doubt goes in favour of the accused and we accordingly give benefit of doubt..."

যে কথা বলছিলাম, জনসমক্ষে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সমসাময়িক পত্রিকায় যার বিবরণ ছাপা হয়েছে তার আবার সাক্ষ্যপ্রমাণ কী? আইন মানুষের সৃষ্টি। মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন-যাপনের ফ্রেমে নিয়ে আসার জন্য। যে আইনে বিচার পায় না সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যে আইন আবার কিসের আইন?

অনেকে বলেছেন শহীদ পরিবারের সদস্যদের মামলা দায়ের করতে। আমরা এর বিরোধী।

যারা হত্যা করেছে তারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। বর্তমান বিশ্বে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কোনো দেশের মধ্যে সীমিত রাখা যাচ্ছে না। চিলির একনায়ক পিনোশের ঘটনা এর উদাহরণ। প্রচলিত আইনে এই বিচার সম্ভব নয়। কারণ, 'মাওলানা' আবদুল মান্নান বলেছিলেন, ডা. আবদুল আলীমকে তিনি হত্যা করেননি। আজ এর প্রমাণ কী হবে? বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে হত্যার কথা স্বীকার করেছিল। মান্নানরা তো তা করেনি। বিচারক বলতে পারেন, সংগৃহীত প্রমাণ যথেষ্ট নয়।

বিএনপি বলে, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দল। এরশাদ বলেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধা। আওয়ামী লীগ বলে, তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল। সুতরাং, তিন পক্ষই তো স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করতে পারতো। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করলে তো এমনটিই হওয়া উচিত। আর খুনের মামলা বা খুনের বিষয় কখনো তামাদি হয় না। সব রাজনৈতিক খুনের বিচার সব দল দাবি করছে। বাংলাদেশের উজ্জ্বল সন্তানদের ঠাণ্ডা মাথায়, পরিকল্পিতভাবে হত্যা কি রাজনৈতিক নয়? আপনাদের বিবেক কী বলে?

৫.

বর্তমানে যখন এ লেখা লিখছি তখন আবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে মানুষ। এর কারণ জামাতে ইসলামী ও সমর্থকদের ঔদ্ধত্য। ১৯৭১ সালে আলবদরদের ডেপুটি প্রধান, বিএনপি-জামাত জোটের মন্ত্রী মুজাহিদ ঘোষণা করেছেন, 'বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই।' আরেক যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ভারতীয় স্বার্থে। আবার কেউ সুন্দরী নারীর লোভে আবার কেউবা লুটতরাজের জন্য যুদ্ধ করেছিল। তাদের সমর্থক এক সময়ের চরম কমিউনিস্ট সাদেক খান বলেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলে মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিচার করতে হয়। অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারাও যুদ্ধাপরাধী। আজ স্বাধীনতাবিরোধীদের হুঙ্কার এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জামাত নিজের জোরে এসব বক্তব্য রাখছে, তা নয়। এ কারণেই পাকিস্তান ও

বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান হয়েছে এবং মৌলবাদ আজ এমন পর্যায়ে যে পাকিস্তানের অস্তিত্বই হুমকির মুখে।

শুধু তা নয়, নিজামী-মুজাহিদরা সারা দেশের মানুষকে যে কষ্ট দিয়েছিল তা অবর্ণনীয়। আমিনুর রহমান খানের স্মৃতিকথায় আছে, দুই মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে রাজাকাররা বড়শি দিয়ে তাদের চোখ উপড়ে ফেলেছিল। তারা যখন ক্যাম্পে তখন সুবেদার মেজর মফিজ ছিলেন সেখানে সবচেয়ে বয়সী। তিনি তাদের বলতেন তাকে হারামজাদা, কুত্তার বাচ্চা ডাকতে। অন্য নামে ডাকলেই ক্ষেপে যেতেন। একদিন অসতর্ক মুহূর্তে আমিনুর এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, "মানুষই যদি হতাম তাহলে বেঁচে থাকলাম কেন? মরলাম না কেন সেই দিন? আমারই চোখের সামনে আমার স্ত্রীকে গুলি করে মারলো। আমার হাত পা বেঁধে রেখে চোখের সামনে দুই ছেলেকে মারলো, জামাইকে মারলো। ছেলের বৌকে ও মেয়েকে ধর্ষণ করলো, শেষে, শেষে আমার নাতনী উঃ তো চিৎকার করে বললো নানু, আমাকে বাঁচাও... দেখ আমি কত বড় হারামজাদা। কিছুই করতে পারলাম না। যাবার সময় শুয়োরের বাচ্চারা সবাইকে গুলি করে মারলো। ছেলের বৌটা মরার আগে কত পানি পানি করলো। এক ফোঁটা পানিও দিতে পারলাম না আমার মায়ের মুখে। আমি মানুষ? না জানোয়ার, তুই বল। বল, আমি কী? আমি কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা। হারামজাদা ছাড়া আর কিছু?"

এ রকম লাখ লাখ ঘটনা ঘটেছে। এর কোনো বিচারই হবে না এবং কাদের মোল্লা ও তাদের সমর্থকরা দাপিয়ে বেড়াবে। এটা মেনে নিতে পারি না। এ সরকার বলছে, এটি তাদের কাজ নয়। দু'জন প্রধানমন্ত্রী বন্দি, শিক্ষক-ছাত্রদের গ্রেফতার নির্যাতনও তাদের কাজ ছিল না। ম্যান্ডেটবিহীন বহু কাজ তারা করেছে। যদি তারা বিচারের প্রক্রিয়া শুরু না করে তা হলে ধরে নিতে হবে, তারা পূর্ববর্তী সরকারগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে, নতুন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আসলে যুদ্ধাপরাধীরা অত্যন্ত শক্তিশালী। শুনেছি, দেশে তাদের বিচারের দাবি ওঠায় সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া বাংলাদেশের শ্রমিকদের হেনস্তা শুরু করেছে। সরকারের পক্ষ থেকেই অনেকে তাদের পক্ষে ওকালতি করছে।

আজ ৩৭ বছরের মাথায় মুক্তিযুদ্ধ যেন প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের এসব কথা সোনালি শস্যের মতো বেড়ে উঠবে। ঘিরে ধরবে এক সময় নতুন প্রজন্মকে। মনে করিয়ে দেবে তাদের, যখন আমরা থাকব না, যে, স্বাধীনতা চার অক্ষরের একটি শব্দমাত্র নয়। মনে করিয়ে দেবে তাদের, কীভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।

২৬.৩.০৮

দুটি বিষয় ও সামান্য ক'টি প্রশ্ন

প্রাক্তন কমিউনিষ্ট, জোট সরকারের সমর্থক, বর্তমানে সরকারি প্রেস ইন্সটিটিউটের সভাপতি জনাব সাদেক খান সম্প্রতি এক সভায় কিছু মন্তব্য করেছেন। সভাটি হয়েছিল তার ইন্সটিটিউটে ১৪ নভেম্বর। সেখানে জোট সমর্থক বিভিন্ন ব্যক্তি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এখন যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করছেন তাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব বক্তব্য তারা দিয়েছেন। একটি মাত্র দৈনিক সভার রিপোর্টটি করেছিল। সাদেক খান বলেন, 'একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারাও যুদ্ধাপরাধ করেছেন, বিচার করতে হলে দুই পক্ষেরই করতে হবে' (প্রথম আলো)।

এই প্রথম সরকারি পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি এ ধরনের মন্তব্য করলেন। এ মন্তব্য অনেকগুলো প্রশ্নের অবতারণা করেছে। প্রশ্ন বলাতে যদি কারও আপত্তি থাকে তবে প্রাসঙ্গিক বিষয়ও বলতে পারি।

১. আমাদের মূল সংবিধান বা জনপ্রতিনিধিদের তৈরি, তাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইকে 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম' ও যারা এ লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছেন তাদের 'বীর শহীদ' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

২. যারা বীর শহীদ বীর যোদ্ধা ছিলেন, তাদের ৬৭৬ জনকে বাংলাদেশ সরকার বীরশ্রেষ্ঠ থেকে বীরপ্রতীক উপাধি দিয়েছেন।

৩. ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি, ৭ ফেব্রুয়ারি ও ২ জুন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগীদের বিচারের জন্য বিভিন্ন আদেশ/আইন জারি করা হয়, যা এখনও বলবৎ।

৪. সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধান তছনছ করে দিলেও যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তাদের 'বীর জনগণ' যে যুদ্ধ হয়েছে তাকে 'জাতীয় স্বাধীনতা' যুদ্ধ এবং যারা নিহত হয়েছেন তাদের 'বীর শহীদ' বলে উল্লেখ করেছেন সংবিধানেই।

৫. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে যারা বাংলাদেশের পক্ষে লড়েছেন, তাদের স্মরণ করে নবম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-'যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করিয়াছে...

জনপ্রতিনিধি, সামরিক প্রতিনিধি সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে একমত এবং উভয়ই হানাদারের সহযোগীদের বিচারের ব্যবস্থা রেখেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সে রকম কোন

ব্যবস্থা কেউ করেনি, বরং তাদের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা, উপাধি দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং জনাব খানের মন্তব্য-

১. রাষ্ট্র, সংবিধান, আইনবিরোধী কিনা? আইনবিরোধী হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় কিনা?

২. সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এবং কর্মরত ও বেসামরিক অনেক ব্যক্তি ওই ৬৭৬টি পদক পেয়েছেন। সাদেক খানের উক্তি তাদের কাছে অপমানজনক মনে হয়েছে কিনা? তারা কি চান তাদের বিচার হোক? এই উক্তি করে জনাব খান তাদের সহযোগী যোদ্ধা ও ৩০ লাখ শহীদের অবমাননা করেছেন কিনা?

সরকারের প্রতি প্রশ্ন-

১. সরকার সংবিধান, রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গকে অপরাধ বলে মনে করে কিনা? যারা এ ধরনের বক্তব্য রাখেন তাদের রাষ্ট্রীয় পদে রাখা জরুরি বলে মনে করে কিনা?

২. দুর্নীতি যদি অপরাধ হয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলা অপরাধ কিনা? ছাত্র-শিক্ষকদের 'জরুরি আইন প্রত্যাহারের দাবি' জনাব সাদেক খান ও তার সহযোগিদের দাবি থেকে বেশি অপরাধ কিনা?

৩. জনাব সাদেক খান জোটের মহাসমর্থক ছিলেন দেখে কি তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না? যেমন যাচ্ছে না জামাতের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের বিরুদ্ধে?

৪. রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বক্তব্য কি আর্থিক দুর্নীতির থেকেও বড় অপরাধ নয়?

জনাব সাদেক খানের প্রতি একটি অনুরোধ। তিনি নিশ্চয় জানেন (দান খয়রাত) নিজের বাসা থেকেই শুরু করতে হয়। (চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম)। তার কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওই দুই জনের বিচার আগে দাবি করে জনাব খান বক্তব্য দিলে তার আন্তরিকতা প্রমাণিত হবে। সম্প্রতি নির্মূল কমিটি থেকে বিদেশী দূতাবাসগুলোকে চিঠি দেয়া হয়েছে তারা যেন ঘাতকদের নিমন্ত্রণ না জানান। জানালে সে অনুষ্ঠান বয়কট করা হবে। ঘাতকদের বন্ধু ও দালালদের যারা বন্ধু, তারাও ঘাতকদের সমর্থক। তাদের কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করলে আপনারা যাবেন কিনা তা নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করুন।

মৌলবাদী জঙ্গিরা স্বীকার করেছে রমনা বটমূল, ময়মনসিংহ বোমা হামলা, শেখ হাসিনার সভার ওপর গ্রেনেড হামলা ও সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদকে হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে তারা জড়িত। অথচ এ চারটি ঘটনায় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরী ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর এবং জামাতি অপকর্মের রক্ষক বলে পরিচিত (এ পরিচিতি ভুলও হতে পারে) সচিব ওমর ফারুকের নেতৃত্বাধীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাগুলোর কর্মকর্তারা বিভিন্ন জনকে গ্রেফতার করেছিল। ম্যাজিস্ট্রেটদের সহায়তায় তাদের রিমান্ডে নিয়ে অকথ্য অত্যাচার এবং তারপর জেলে পাঠানো হয়েছিল। নিজেদের কথা বলার দরকার নেই। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে দেশত্যাগী সাংবাদিক সেলিম সামাদের কথা। তিনি আমাকে বলেছিলেন- তখন ছিল রোজার দিন। ডিবির কর্মকর্তা কোহিনূরের সামনে নেয়া হলে কোহিনূরের নিদের্শে তাকে মেঝেতে শুইয়ে দেয়া হয়। কোহিনূর তার বুকে সবুট

পা রেখে প্রশ্ন করতে থাকে। তারপর মেরে তার হাত ও পায়ের জয়েন্ট প্রায় অকেজো করে দেয়া হয়েছিল। ডিবির গারদে আমাকে যার সঙ্গে রাখা হয়েছিল কোহিনূরের নির্দেশে, সেই ব্যাঙ্গা বাবু বলেছিল, সেলিমকে আনার পর তার ফাটা পা থেকে রক্ত বেরুচ্ছিল। সে দাঁড়াতে পারছিল না। আমার আগে সেলিম ছিলেন ব্যাঙ্গার সঙ্গে। সেলিম সামাদকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন। সাংবাদিক এনামূল হক 'আইন-শৃংখলা' রক্ষাকারীদের হাতে নির্যাতিত হয়ে প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। এখনও তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। আমাদের ছাত্র আব্বাস জানিয়েছিল তাকে কী অসম্ভব অত্যাচারই না করেছে পুলিশ। গত কয়েক মাসে এরকম অনেক নির্যাতিত প্রকাশ্যে নির্যাতন ও নির্যাতনকারীদের নাম বলেছে। এখন প্রশ্ন-

১. সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে আছে-'আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তি হানি ঘটে, ৩৫ অনুচ্ছেদের ৫-এ আছে–'কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

২. আলতাফ-বাবর ও ফারুকের নেতৃত্বে যাদের গ্রেফতার, অত্যাচার ও জেলবাস করতে বাধ্য করা হয়েছে, এটি সংবিধান, রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপন্থি কিনা? 'আইন-শৃংখলা' বাহিনীর সদস্য না কর্মকর্তা তাহলে সংবিধান ও আইন পরিপন্থী কোন কাজ করতে পারেন কিনা? সরকারের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত চাই।

আমরা জানি সুপ্রিমকোর্টের কয়েকজন প্রাক্তন বিচারপতি সামরিক আইনকে বৈধতা দিয়েছিলেন আরও কয়েকজন প্রাক্তন বিচারপতি যুদ্ধাপরাধ উপেক্ষা করে গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও এসব কখনও নৈতিক ও সাংবিধানিক বৈধতা পায়নি। আমরা এও জানি বিচারপতি শাহ নাঈম, বিচারপতি খায়রুল হক সবাই নন, কিন্তু এখন যে বিচার বিভাগ স্বাধীন? আমরা তো সুপ্রিমকোর্টে অতি সাধারণ মানুষ। ব্যারিষ্টারদের ধরে আমরা বিচারকদের সামনে পৌছাতে পারব না। কিন্তু আদালতে একজন সহৃদয় বিচারক নেই যিনি এই অত্যাচার প্রতিবিধানে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন?

একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কাছে জিজ্ঞাসা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের কাছে–

আর্থিক দুর্নীতি কি সংবিধান, রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ ও উপেক্ষা করার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

একজন ভুক্তভোগী হিসেবে আমার মনে হয়েছে, এর অত্যাচারীরা সব সময় প্রবল ছিল, আছে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে অত্যাচারের ক্ষমতার হাতবদল হয়। আমরা সাধারণদের কোন আশ্রয় নেই রাষ্ট্রে। অতএব তখনই থাকবে যখন আমরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখব এবং গণমাধ্যমের সব দুর্বলদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে এষ্টাবলিসমেন্টের স্বার্থ রক্ষায় নয়।

পাকিস্তানবাদ বনাম বাংলাদেশ

বাংলাদেশে পাকিস্তান যা করেছে সে সম্পর্কে বাঙালি ইসলামী চিন্তাবিদ আজরফ এককথায় বলেছেন, তা হল–'ইসলামের নামে ইসলামের এতো বড় অপমান এ বিংশ শতাব্দীতে আর কোথাও হয় নি।' শত শত বছর ধরে শোষিত বাঙালি বিদেশী এবং কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনে এতটাই বীতশ্রদ্ধ ছিল যে, ১৯৭১ সালেই যুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে 'গণপ্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, উপমহাদেশে এ ধরনের ঘটনা ছিল এই প্রথম। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, বাঙালি সব সময় ১৯৭১-এর যুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেছে। প্রত্যয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে তফাৎ আছে। শত বছরের অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশ সব ধরনের শৃংখল থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল দেখেই এই অভিধা দেয়া হয়েছিল এবং বিজয়ের পর এ অভিজ্ঞতার রূপান্তরণ ঘটিয়েছিল সংবিধানে।

পৃথিবীতে বাংলাদেশই দ্বিতীয় দেশ যা একটি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং এই ঘোষণার মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির আশা-আকাঙ্খা। পৃথিবীতে বাংলাদেশই বোধহয় একমাত্র দেশ যে স্বল্পতম সময়ে দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রস্তুত করেছিল। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি এ সংবিধানের মাধ্যমে তার অধিকার ও ইতিহাসের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে চেয়েছিল। এ কারণে, রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে চারটি উপাদান বেছে নেয়া হয়েছিল–গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

এ চারটি উপাদান বেছে নেয়া হয়েছিল ইতিহাসের আলোকে। বাঙালি সব সময় নিজেকে শাসন করার অধিকার সে অর্থে না হলেও অপর কর্তৃক শাসিত হওয়ার পক্ষপাতী ছিল না এবং পাকিস্তান আমলের পুরোটাই ছিল গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। বলেছি, কীভাবে জাতিসত্তার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল এবং সে কারণেই এ ভূখন্ডের অধিবাসীরা বাঙালি হিসেবে পরিচিত হতে চেয়েছিল, যেখানে ধর্মের connotation থাকবে না। বাঙালি কখনও সম্পন্ন ছিল না এবং গরিষ্ঠ বাঙালি সব সময় নিপতিত ছিল অর্থনৈতিক ও শ্রেণীবৈষম্যে। তাই সমাজতন্ত্রের আলোকে একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ দাবি করেছিল, যেখানে আইনের চোখে সবাই সমান এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট নয়। আর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা তো আগেই বলেছি, যা ছিল বাঙালি সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সময় ধর্ম সংস্কারক থেকে শাসকরা যা চাপা দিতে চেয়েছিল। পাকিস্তান আমলে ধর্মের অপব্যবহার তাকে এই নীতি গ্রহণে আরও উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তবে এর আগে তুরস্ক বা ইন্দোনেশিয়াও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সামরিক শাসক সুহার্তো পর্যন্ত ১৯৮৩ সালে ঘোষণা করেছিলেন, 'ইন্দোনেশিয়ার ধর্মনিরপেক্ষতার এই নীতি অনুযায়ী দেশের সব রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে। বাংলাদেশে শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাই নয়, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, যা এর আগে কোন সংবিধানে উল্লিখিত হয়নি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আবুল মাল আবদুল মুহিতের সিদ্ধান্ত থেকে উদ্বৃত করতে চাই, তা একটু দীর্ঘ হলেও–'বাংলাদেশে জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের মহাকাব্য সত্যিই অনন্য। প্রায় হাজার বছরের আগে শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া। ভাষা হয়েছে জাতি গঠনের একটি প্রধান উপাদান। যৌগিক সমাজ যেখানে রেখেছে বিশেষ অবদান। আবার নিস্পেষণ ও অর্থনৈতিক শোষণের অভিজ্ঞতা জাতিকে দিয়েছে ঐক্য এবং উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা। ধর্ম হয়তো পাকিস্তানের উদ্ভবে রেখেছে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সেই বিনিশ্চায়ক ভূমিকা রেখেছে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের নিধন, গণহত্যা ও ধ্বংসলীলায় সামরিক উদ্যোগ, অর্থনেতিক শোষণ, ধর্মান্ধতা ও আঞ্চলিক কৃষ্টির নিবর্তন এবং ভাষা ও বাকস্বাধীনতার ওপর আক্রমণ। স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে কিন্তু পাকিস্তানি প্রভাব এখানো শক্তিশালী।'

মুহিতের উদ্বৃতির শেষ লাইনটি বাদ দিলে বলা যেতে পারে, (১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) পঁচাত্তর-পূর্ব ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলাদেশ একটি জাতি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন করা যায়, জাতি রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার উত্থাপিত সব প্রশ্নের কি নিরসন হয়েছিল বা সে প্রক্রিয়া কি সম্পূর্ণ হয়েছিল? মুহিতের শেষ লাইনটি বিশ্লেষণ করলে বলা যেতে পারে, ১৯৭৫-২০০৫ এর ঘটনাবলী আবার প্রমাণ করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু জাতি রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। বিষয়টি হয়তো তাত্ত্বিক দিক থেকে জটিল কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও বাস্তব মেলানো মাঝে মাঝে দুরূহ।

এর সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন জড়িত। অধুনা বিশ্বে মুসলিম মানসকে পশ্চাদগামী অন্ধবিশ্বাসে ভরপুর, সংকীর্ণ হিসেবে পরিচিত করে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও উপমহাদেশের অনেক ঐতিহাসিক মুসলিম মানসকে আলাদাভাবে একই অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। মূল তত্ত্ব হল, মুসলিম মানস ও আধুনিকতা বিপরীতগামী। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান। এই তত্ত্ব অনুসারে, তাহলে কি বাংলাদেশ ও আধুনিকতাও পরস্পরবিরোধী এবং এর সঙ্গে কি জড়িত জাতি রাষ্ট্র সম্পূর্ণ না হওয়ার বিষয়টি?

এসব প্রশ্নের উদ্ভবের কারণ ১৯৭৫-এর পরবর্তী ঘটনাবলী। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত পাকিস্তানের আদলে বাংলাদেশ আবার সামরিক আমলা দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৯১-এ গণতান্ত্রিক দল হিসেবে বিএনপি ক্ষমতায় এলেও এটি ইতিহাসের সত্য

যে, দলটি ক্যান্টনমেন্টে গঠিত এবং এর শেকড় সেখানে রয়ে গেছে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ৯ বার সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রের মূল উপাদান ও আদর্শ বিনষ্ট করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা বদলে গেল। বাঙালির বদলে তা হয়ে গেল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, যার মধ্যে ধর্মের উপাদান মিশ্রিত। জিয়ার ভাষায়, এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হল, 'বেস বা জনগোষ্ঠী,' স্বাধীনতা যুদ্ধ, বাংলা ভাষা, ধর্ম, ভৌগোলিক এলাকা (মাটি) সংস্কৃতি, অর্থনীতি।' এখানে লক্ষণীয়, মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেল স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ধর্ম হল ইসলাম।

সমাজতন্ত্র অবশ্যই অর্ন্তহিত হল, এর সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাও। শুধু তাই নয়, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের রাজনীতি করার স্বাধীনতা দেয়া হল এবং কোলাবরেটরদের মুক্তি দেয়া হল। এর ফলে, বাংলাদেশে নতুন এক দলের বা গ্রুপের সৃষ্টি হল যাদের বলা হয় স্বাধীনতাবিরোধী। এতে অন্তর্গত জামাতে ইসলামী, বিভিন্ন ছোট ছোট দক্ষিণপন্থী দল ও ব্যক্তি বা সংগঠিত ছোট ছোট গ্রুপ। একটি স্বাধীন দেশে স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে একটি বড় গ্রুপের আর্বিভাব খুব সম্ভবত বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ তিন দশকের সামরিক ও দক্ষিণপন্থী শাসনে তা পুষ্ট হয়ে প্রভাবশালী একটি দলে পরিণত হয়েছে।

মূলত জিয়াউর রহমান এ প্রক্রিয়া শুরু করে বিকশিত করেন এবং তার পত্নী খালেদা জিয়া তা সম্পন্ন করেন। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন-'এই প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের কলোনিয়াল অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবকে বিচ্যুত করা হয়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সশস্ত্র সহযোগিতাকে 'ক্ষুদ্র বিচ্যুতি' বলে চিহ্নিত করা হয়। যুদ্ধাপরাধকে বৈধতা দেয়া হয় 'অতীতের ঘটনা' হিসেবে এবং অতীতের ঘটনা 'বর্তমানের' সমস্যা নয়।..... আওয়ামী লীগকে বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার বিরোধিতা করা শুরু করেন ও মুক্তিযুদ্ধকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব থেকে বিচ্ছিন্ন করেন।... মুক্তিযুদ্ধ ধর্ম নষ্ট করার যুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ধর্ম রক্ষা করার যুদ্ধ, জেনারেল জিয়ার আমলে রাষ্ট্রীয় প্রচারে এই বক্তব্য সুকৌশলে ছড়ানো হয়।'.....

জিয়াউর রহমানের মতো এরশাদও সামরিকায়নের পক্ষে ছিলেন। তার সময়েও বারবার সংবিধান সংশোধন করা হয় যাতে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধগুলো অবাস্তব হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে কয়েকশ' বছরে যে কাজটি কেউ করেনি তা তিনি করেছিলেন। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেছিলেন। ফলে আইনগতভাবে অন্য ধর্মকে অবদমনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বেগম জিয়া পরবর্তী সময়ে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গণআদালত গঠন করলে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করেন। এ কারণে, যুদ্ধাপরাধ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়। এ ধারাবাহিকতাই নতুন শতকে জামাত, বিএনপি, ইসলামী ঐক্যজোট প্রভৃতি দলের মধ্যে (যারা ধর্মকে রাজনীতির জন্য ব্যবহার করতে চায়) এক ধরনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আঁতাত গড়ে ওঠে। নিজ কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য জোট

সরকারের প্রশ্রয়ে জঙ্গিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে সেক্যুলার গণতন্ত্রী হিসেবে যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, ২০০৫-এর মধ্যে তা জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে।

ভোটার হিসাব ও অন্যান্য অনুষঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে বা আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, সমাজ-রাষ্ট্র দুটি ভাগে বিভক্ত। যদি কেউ এদের সমর্থক নাও হন, যেহেতু তিনি প্রতিবাদ করেননি, তিনিও এর সহযোগী। সুতরাং, সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন দাঁড়ায়, একটি দেশের একটি বৃহৎ অংশের জনসমষ্টি যদি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে এবং অপর অংশ বাঙালি জাতীয়তাবাদে তাহলে কি জাতি-রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলা যায়? দুশ' বছর আগে এ ভূখণ্ডের মুসলমান এলিটদের যে প্রশ্ন আলোড়িত করেছিল অর্থাৎ ব্যক্তি আগে বাঙালি না মুসলমান, সে প্রশ্ন যদি একুশ শতকে তোলা হয় তা এ রাষ্ট্র আধুনিক হবে কিনা বা এ রাষ্ট্রের জনগণের মানসিকতায় আধুনিকতা স্থান পাবে কিনা সে প্রশ্ন দেখা দেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে একে মুসলিম মানস আখ্যা দেয়া ঠিক নয়। কারণ, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে কলোনি যুগের সে ধারা যার প্রতিভু জামাত-বিএনপি জোট ছিল তার সমর্থক। আধুনিকতাকে আমরা সব সময় পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে বিচার করতে অভ্যস্ত। কারণ, আমাদের মানসিক জগতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে পাশ্চাত্যের লেখকদের শত শত বর্ষের রচনা-দর্শন বা যা পাশ্চাত্য আধুনিক বলেনি তা আধুনিক নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলকেই রেনেসাঁর পর থেকে অনাধুনিক আখ্যা দেয়া হয়েছে। পাশ্চাত্যের ক্রমাগত প্রযুক্তি উন্নয়ন এ ধারনাকে আরও বদ্ধমূল করেছে।

আধুনিকতা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। অবশ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির পার্থক্যও দৃষ্টিভঙ্গির বাত্যয় ঘটাতে পারে। তবে, বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্য থেকে উৎসারিত হোক বা না হোক কিছু বিষয়কে আধুনিকতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেগুলি হল–গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, অর্থনীতির গতিশীলতা এবং সবার ওপর ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মসহিষ্ণুতা। তালাল আসাদের ভাষায়, 'Modernity is a project - or rather, a series of interlinked projects- that certain people in power seek to achieve. The project aims at institutionalizing a number of (sometimes conflicting, often evolving) principles constitutionalism moral autonomy, democracy, human right, civil equality, industry, consumerism, freedom of the market and - secularism.'

এ মাপকাঠিতে বর্তমান বাংলাদেশকে বিচার করলে অবশ্যই বাংলাদেশকে আধুনিকতার মাপকাঠিতে ফেলা যাবে না, বরং ১৯৭১-এর বাংলাদেশ সে মাপকাঠিতে হয়তো উতরে যেতে পারে। প্রশ্ন আরও আছে, ক্রমাগত যদি এভাবে পিছাতে থাকে বাংলাদেশ এবং মানুষ তা সমর্থন করে তাহলে বাঙালির রাষ্ট্র এবং বাঙালি মানস বলে কিছু থাকবে কিনা। এক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মসহিষ্ণুতা একটি বড় ফ্যাক্টর, কারণ এর বিপরীতই হচ্ছে জঙ্গিবাদ।

বাঙালি মানস সজীব। কখনও কখনও পিছু হটে গেলেও, প্রতিরোধের যে শক্তি তা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। প্রথমে যদি ধর্মের কথা আসে (ইসলাম) তাহলে বলতে হয়, রাষ্ট্রীয় পোষকতা ছাড়া ইসলামকে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সামরিক শাসকরা এটি করেছিল ধর্ম ও শক্তি (অস্ত্র) দিয়ে মানুষকে দমানের জন্য। ১৬ বছর আগে সামরিক শাসকদের উৎখাত করে সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপন করা হয়েছিল। নানা দোলাচালে থাকলেও সংসদ আর উৎখাত করার সাহস কেউ দেখায়নি এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানুষ তা মেনে নিয়েছে। সজীবতার ও জনমানুষের শক্তির এটি একটি উদাহরণ। রাষ্ট্রীয় পোষকতা না পেলে এবং জঙ্গিদের (ও এর সহায়ক শক্তি) বিচার হলে জঙ্গিবাদও আর প্রভাব বিস্তার করবে না। ধর্মের প্রবল প্রচারের কারণে অনেকে ধর্মীয় গোড়ামি মেনে নিচ্ছেন, মন থেকেই কিন্তু দেখা যায় দৈনন্দিন জীবনে তা পুরোপুরি কার্যকর করা যাচ্ছে না। এখনও বিয়ের অনুষ্ঠানে আলপনা না থাকলে বিয়ে সম্পূর্ণ হয় না (জঙ্গি বা চরম ডানপন্থী ছাড়া) একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে আল্পনা থাকেই। জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন জারির পর ১৯৭৬ সালে তা বন্ধ ছিল কিন্তু পরের বছরই শিল্পী হাশেম খানের নেতৃত্বে গভীর রাতে শহীদ মিনারে আল্পনা আঁকা হয় এবং বিগত জোট সরকারও তা বন্ধ করার সাহস দেখায়নি। ১ বৈশাখ পালন আইয়ুব আমলে শুরু হয়েছিল বাঙালির প্রতিবাদ হিসেবে, আজ যা বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। জঙ্গিরা বোমা মেরে, মানুষ মেরেও তা বন্ধ করতে পারেনি। একুশ শোকের মাস হলেও তা সাংস্কৃতিক উৎসবের মাস। এখনও লৌকিক ইসলামের অনেক উপাদান যেমন, মিলাদ, মাজার, চেহলাম কিছুই উৎখাত করা যায়নি, এমনকি মাজারে, মেলায় বোমা মেরেও।

হাজার বছরের ইতিহাসে তা সম্ভব হয়নি তা ১৯৭৫ পরবর্তী সামরিক ও আধা-সামরিক বা জঙ্গি সমব্যথী সরকারের ত্রিশ বছরের 'প্রজেক্ট' কিভাবে সম্ভব হবে? যদি মুসলিম মানসের ওপরও কেউ জোর দেন তাহলে ইটনের ভাষায় বলতে হয়, 'What made Islam in Bengal not only historically successful but a continuing vital social reality has been its capacity to adopt to the land and the culture of its people, even while transforming both,' বাঙালির জীবনে এসব ঘটনা আগেও ঘটেছে। কিন্তু বাঙালি মানসে তা গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, করবেও না। সময়ের ব্যাপার মাত্র। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, ঐতিহাসিকরা বাংলাদেশের যে বিবরণ দিয়েছে তার অনেক বদল হয়েছে। নদী মরে যাচ্ছে, গ্রাম-শহরের পার্থক্য কমেছে, জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি, নগরায়ন হচ্ছে দ্রুত। কৃষি এখনও অর্থনীতির ভিত্তি, তবে এর পদ্ধতি ও সম্পর্কের বদল হচ্ছে। ফলে, এখানে গোড়া ধর্মবাদের আধিপত্য আরও হ্রাস পাবে। দু'দশকের মধ্যে যারা স্বাধীনতা বিরোধিতায়, ধর্মীয় গোড়ামি ও দ্বিখণ্ডিত জাতীয়তার প্রবক্তা ও প্রভাবশালী তারা থাকবেন না বা অকার্যকর হয়ে পড়বেন। বাংলাদেশ এখনই গোলকায়নের সঙ্গে যুক্ত, তখন সেই যুক্ততা বৃদ্ধি পাবে। তখন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব হ্রাস পাবে বা থাকবে না। থাকতে পারে না।

বাংলাদেশকে বাঙালির রাষ্ট্র হয়েই থাকতে হবে। এ ভূখন্ডের ইতিহাস হচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায় এখানে বাস করেছে, বৈরীভাবে নয়। হয়তো স্বতন্ত্রভাবে কিন্তু পারস্পরিক আদান-প্রদান রহিত ছিল এ সাক্ষ্য ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। সেই ইতিহাসই রূপান্তরিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে, যা হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের মুলধারা। ইতিহাসের পরম্পরা তাতে ব্যাহত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই ইতিহাসের মুখোমুখি হতেই হবে এবং এর ভিত্তি সেই ১৯৭১ সালের মতো অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক, যা হচ্ছে আধুনিকতার মাপকাঠি। ইতিহাসের সত্য হল, বাংলাদেশ কখনও সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের দেশ হয়ে থাকতে পারবে না। বাংলাদেশ কখনও সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দেশ হয়ে থাকতে পারবে না।

২৯.৯.০৭

গণতন্ত্র ও যুদ্ধাপরাধ একসঙ্গে নয়

জামাত ও তাদের সমর্থকদের সাম্প্রতিক বিষোদগার হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন বিষয় নয়। এর একটা প্যার্টান আছে এবং প্রায় তিন সপ্তাহ আগে এই প্রথমবার তারা এ ধরনের বক্তব্য রাখল, তাও নয়। অতীতেও রেখেছে, দেশে যখন কোন সংকটের আশংকা দেখা দেয় বা তাদের ওপর মনোযোগ বেশি দেয়া হচ্ছে বলে মনে হয় তখনই তারা এ ধরনের উক্তি করে। এর একটা কারণ আছে। দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সংবেদনশীল। এ ধরনের মন্তব্য প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যারা, কিছু রাজনীতিবিদ, সিভিল সমাজের বিভিন্ন গ্রুপ এ প্রতিবাদে অংশ নেয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তোলে। কিছুদিন পর সবাই আবার আগের অবস্থানে ফিরে যায়। এরই মধ্যে দেখা যায় আশংকিত সংকট আর কোন ইস্যু নয়। জামাত থেকেও দৃষ্টি সরে যায়। লক্ষণীয় এ সময় সরকার [সব সরকার] রেফারির ভূমিকায় বা 'নিরপেক্ষ' থাকে। এর অর্থ, জামাত যে এসব মন্তব্য করে তার পেছনে পৃষ্ঠপোষকতা বা নির্দেশ আছে বলেই সে করে। সেই সিভিল সমাজের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী গ্রুপ বা রাজনৈতিক দল যে-কেউ হতে পারে।

সম্প্রতি জামাত যে এসব মন্তব্য করেছে এর অনেক কারণের একটি হতে পারে। চারদিক থেকে বলা হচ্ছে, জামাতকে অনেক বিষয়ে ছাড়া দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে সরকার পক্ষ থেকেও স্বীকার করা হচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, সার সংকট প্রকট। বিশ্ববিদ্যালয় আপাতত মনে হচ্ছে শান্ত, কিন্তু সেটি নাও হতে পারে। যেভাবে সরকার চেয়েছিল (উপদেষ্টার মতে) সেভাবে রাজনীতি চলছে না, চারদিকে অস্বস্তি। হয়তো এসব কারণে জামাতের এসব মন্তব্য। জামায়াতি মন্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ধারাবাহিকভাবে এগুলো দেয়া হচ্ছে এবং এমনভাবে দেয়া হচ্ছে যেন মানুষজন অসন্তুষ্ট হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আপনারা হয়তো এসব মন্তব্য দেখেছেন। তবুও কিছু উল্লেখ করছি–

১. মুজাহিদ : 'যুদ্ধাপরাধী বলে কিছু নেই।'

২. কাদের মোল্লা 'কেউ সুন্দরী নারীর লোভে, কেউ ভারতীয় স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধ করেছে।' (মোল্লা অবশ্য বলেছেন, তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেননি)।

...হ হান্নান : ১৯৭১ সালে যা হয়েছিল তা 'গৃহযুদ্ধ'।

৪. মাহমুদুর রহমান 'এমনিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপে জনগণের এখন দিশেহারা অবস্থা। এর ওপর দেশে কোন কর্মসংস্থান নেই। বর্তমান সময়ে জনগণের জন্য এর

চেয়ে বড় কোন সংকট নেই। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি করার মতো বিলাসিতা এখন জনগণের নেই। (প্রথম আলো, ১৩.১১.০৭)

৫. বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদের ডিন এবিএম মাহবুবুল ইসলাম : 'যুদ্ধাপরাধী হতে হলে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে যুদ্ধ হয়েছে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। বাংলাদেশ সেই যুদ্ধের অংশ ছিল না। এ কারণে বাংলাদেশে কখনোই যুদ্ধাপরাধী ছিল না।' (ঐ)

৬. চট্টগ্রামের ইসলামিক ইউনির্ভাসিটির ড. মোঃ আবদুস সামাদ যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলে এদেরই বিচার করা উচিত। কারণ, এরা গত ৩৬ বছরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেনি। (ঐ) এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অপরিচিত শিক্ষকও এ ধরনের মন্তব্য করেছেন।

৭. ১৪ নভেম্বর আরেক সভায় গিয়াস কামাল চৌধুরী : অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ, জামাত, খেলাফত মজলিশ ও তাদের সমর্থকরা আরেকটি সভায় 'বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিদারদের প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন।' [প্রথম আলো, ১৪.১১.০৭]

৮. জামাতের সহকারী সচিব ব্যারিষ্টার আবদুর রাজ্জাক। 'সংবিধান পরিবর্তন না করে এই দাবি পূরণ করা সম্ভব না। সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে গণভোট করতে হবে।' (ঐ)

৯. অ্যাডভোকেট মসিউল আলম : যারা বিচার দাবি করছে তাদের উদ্দেশ্যে–'ধরে নিয়ে বিচার করলে আপনাদেরও তো ধরে নিয়ে যেতে পারে। ধরাধরি শুরু হয়ে গেলে তো কেউ রেহাই পাবেন না।' (ঐ)

১০. সাদেক খান : 'একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারাও যুদ্ধাপরাধ করেছে, বিচার করতে হলে দুই পক্ষেরই করতে হবে।' [প্রথম আলো, ১৫.১১.০৭] উল্লেখ্য, প্রেস ইন্সটিটিউটের এক সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। তিনি এর সভাপতি।

১১. সেই মাহবুবুল ইসলাম : 'সংবিধান জারি হয়েছে ১৯৭২ সালে। কাজেই '৭২ সালের পর থেকে দেশের কোন নাগরিক যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেই কেবল তার বিচার করা যাবে।'

এখান থেকেও প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সেনাধাক্ষ্যকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয়া হয়। প্রশংসা করা হয় ব্যারিস্টার মইনুলের।

একই সঙ্গে সমান্তরালে চ্যানেল আইয়ে বঙ্গবন্ধুর খুনি কর্নেল রশীদের সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছে। বিচারের সম্মুখীন করার জন্য নাকি তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করে, তার খুনের সঙ্গে জড়িত হিসেবে জেনারেল জিয়ার কথা বলেছেন। তার মেয়ে তথাকথিত ফ্রিডম পার্টির স্বঘোষিত সভাপতি মেহনাজও একই কথা বলেছেন।

দুই

এসব মন্তব্যের সার কথা হল –

১. বঙ্গবন্ধুর অবান্তর প্রশংসা

২. যুদ্ধাপরাধী নেই, কারণ, যুদ্ধ হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে

৩. বঙ্গবন্ধু সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, সুতরাং এসব প্রশ্ন ওঠানো উদ্দেশ্যমূলক।

৪. সংবিধান/বিধি না বদলালে বিচার করা যাবে না।

৫. যারা বিচারের দাবি তুলছে তাদের প্রতি দেয়া হয়েছে প্রচ্ছন্ন হুমকি।

আইনবিদ ও অন্যরা ইতিমধ্যে এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে। শুধু বলা যেতে পারে জামাত ও জামাত সমর্থকরা যা বলেছে তা ডাহা মিথ্যা। এটি তাদের ট্রেড মার্ক, নতুন কিছু নয়। যুদ্ধ ভারত-বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর সঙ্গে হয়েছে। সে কারণে আত্মসমর্পণ দলিলে বাংলাদেশে আত্মসমর্পণের কথা লেখা হয়েছে। সুতরাং এটি গৃহযুদ্ধ তো নয়ই, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধও নয়। সংবিধান ও ১৯৭৪ সালের জরুরি আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিধি এখনও বলবৎ। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী দেশে ফিরে গেছে চুক্তি মোতাবেক। তাদের বিচারের দাবি তোলা যায়, কিন্তু তা করার দায়িত্ব পাকিস্তানের। কিন্তু তাদের সহযোগী বাঙালি যুদ্ধাপরাধীরা এ দেশেই আছে, সুতরাং স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচার করা যাবে। দেশী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি বা বঙ্গবন্ধু তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এটিও মিথ্যা, তবে অনেকে তা বিশ্বাস করেন।

আমার কাছে এখন একটি বিচারের রায়ের কপি আছে। ময়মনসিংহের তৃতীয় স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারের রায়। বিচারক কেএ রউফ। কোলাবরেশন কেস নং ৩২, সাল ১৯৭২। রাষ্ট্র বনাম রজব আলী ওরফে আমিনুল ইসলাম, মৌলভী কুতুবুদ্দিন আহমদ। রায় দেয়া হয়েছে ১৩.১.১৯৭৩ সালে।

আলীনগর গ্রামের আলবদর প্রধান রজব আলী ২০ আশ্বিন ১৩৭৮ সালে আলবদর ও রাজাকারদের নিয়ে আবু তাহের মিয়া ও বাড়ির কয়েকজনকে থানায় সোপর্দ করবে বলে ধরে নিয়ে যায়। এছাড়া ঘরে তৈজসপত্র, টাকা-পয়সা লুট করে। স্বাধীনতার পর আবু তাহেরের পিতা থানায় এজাহার দেন। থানার তদন্ত রিপোর্টে রজব আলীর কোন দোষ পাওয়া যায়নি। বাদী নারাজি দরখাস্ত দেন। কিশোরগঞ্জের তৎকালীন এসডিও-ও এটি প্রত্যাখ্যান করেন। এসডিওটি কে কিশোরগঞ্জের কেউ জানালে খুশি হব। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল এই আবেদন গ্রাহ্য করে বিচার শুরু করে। রায়ে বলা হয়, রজব আলী আবু তাহেরকে ধরে নিয়ে যায় এটি সবাই দেখেছে, তবে রজব আলী তাকে হত্যা করেছে এমন চাক্ষুষ প্রমাণ নেই। কিন্তু আবু তাহের ফেরেননি, সাক্ষীরা বলেছেন, তার লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হয়। সুতরাং আবু তাহেরকে হত্যার জন্যই রজব আলী ধরে নিয়ে গিয়েছিল। রজব আলীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।

রায়টি উল্লেখ করলাম কয়েকটি কারণে –

১. জামায়াতিরা যে বলছে, বিচার হয়নি বা ক্ষমা করা হয়েছে তা ঠিক নয়।

২. জামায়াতিরা বলছে, তারা হত্যা করেছে এর প্রমাণ কী? সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, জামায়াতি মুখপত্র দৈনিক সংগ্রামে' নিজামী-মুজাহিদ কাদের মোল্লা গংয়ের কীর্তি কাহিনী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য আছে এবং গত ৩৬ বছরে নিজামী-মুজাহিদ গং এগুলো অস্বীকার করেনি। ট্রাইব্যুনালে এসব তথ্য-প্রমাণই যথেষ্ট, রজব আলীর মামলা এর প্রমাণ। নিজামী বা মুজাহিদ নিজ হাতে খুন করেছে কিনা এমন প্রমাণের দরকার নেই।

৩. নিজামী-মুজাহিদরা ঢাকায় থাকলেও তাদের অনুসারী রজব আলীরা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং সারাদেশে এদের হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, রাজাকার-আলবদর সব একজোট হয়ে বাঙালি নিধন করেছিল এবং তা ছিল ব্যাপক।

৪. কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থানার আলীনগর বাসিন্দাদের অনুরোধ করব, আপনারা আলবদর রজব আলীর খোঁজ করুন। দেখবেন, তাকে যাবজ্জীবন খাটতে হয়নি, সে ছাড়া পেয়েছে ১৯৭৫ সালে। জেনারেল জিয়া এক ফরমানবলে এদের মুক্তি দেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সুযোগ দেন। সামরিক শাসক জিয়া ও এরশাদ এদের পুর্নবাসন করেন ও জিয়ার স্ত্রী বেগম জিয়া এদের শুধু প্রশ্রয় নয়, ক্ষমতায় বসিয়েছেন। সুতরাং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়ার কারণ তারা। গণআদালতে এদের প্রতীকী বিচার হলে বেগম জিয়া গণআদালতের উদ্যোক্তাদের দেশদ্রোহী ঘোষণা করে আদালতে সোপর্দ করেন। এর অর্থ জামাতকে রাষ্ট্রীয় পোষকতা দেয়া হয়েছে গত ৩০ বছর। নইলে তাদের দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না।

তিন

যেসব বক্তব্য দিয়েছে জামাতি ও তাদের সমর্থকরা সে বিষয়ে সরকার নীরব। এসব বক্তব্য দেশদ্রোহিতার শামিল। এর চেয়ে কম অপরাধের জন্য অনেককে দণ্ডিত করা হয়েছে। জরুরি অবস্থায় যদি দেশদ্রোহিমূলক বক্তব্য জায়েজ হয় তাহলে ১২ জন শিক্ষক জেলে কেন–এ প্রশ্ন আজ উঠেছে। পিআইবির চেয়ারম্যান সাদেক খান এত মারাত্মক বক্তব্য দিয়েও স্বপদে। বাংলাদেশবিরোধী বক্তব্য দিয়েও জামাতি শিক্ষকরা স্বপদে বহাল। মঞ্জুরি কমিশন নিশ্চুপ। এসব নীরবতার অর্থ যে আমরা বুঝি না তা নয়। হ্যাঁ, সরকারের তিনজন উপদেষ্টা ও সিইসি বলেছেন, বিচার হওয়া উচিত। সিইসি বলেছেন, এ দায়িত্ব সরকারের। যুদ্ধাপরাধ ও যুদ্ধাপরাধীদের কথা স্বীকার করেও প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, বিচার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে উপেদেষ্টা মইনুল হোসেন বলেছেন, সরকার অনেক দায়িত্ব হাতে নিয়েছে আর বাড়তি দায়িত্ব নেবে না।

আদালতে যাওয়ার কথা যারা বলছেন তারা প্রচ্ছন্নভাবে জামাতকেই সমর্থন

করছেন। আদালত গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দিয়েছিলেন, যার ফলে জামাত বাংলাদেশে শক্তিশালী শুধু হয়েছে তাই নয়, পরোক্ষভাবে যুদ্ধাপরাধকে গ্রাহ্য করা হয়নি। যাঁরা যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য প্রচলিত আদালতে যাবেন, তারা জামাতকেই সাহায্য করবেন। সংবিধান, আইন অনুযায়ী সরকারকেই বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এদের বিচারের বন্দোবস্ত করতে হবে। এটিই বর্তমান সরকারের কাজ নয়–এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, সরকারের দায়িত্ব ছিল শুধু নির্বাচন করা, হাটবাজার, দালানকোঠা ভাঙা, রাজনীতিবিদদের জেলে পোরা, পৌর নির্বাচন করা, স্বায়ত্তশাসন দেয়া–এগুলো তাদের দায়িত্ব ছিল না। শুল্ক ফাঁকি, কর ফাঁকি, চাঁদাবাজি, জরুরি আইন 'ভঙ্গ' করার জন্য গ্রেফতার ও বিচার করা যাবে, কিন্তু খুনের জন্য নির্বাচনে নিষিদ্ধ বা গ্রেফতার করে বিচার করা যাবে না এটা কোন লজিক নয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ওইসব ব্যবস্থা জরুরি হলে, যুদ্ধাপরাধের বিচারও জরুরি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য। সরকার ওইসব কাজ হাতে না দিলে এ দাবি উঠত না। আগে কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ওঠেনি।

তবে এই প্রথম কোন সরকারের একাংশ স্বীকার করল যে, যুদ্ধাপরাধ হয়েছে এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা উচিত। জামাত এতে খানিকটা বিচলিত। জনমতও প্রবল হয়ে উঠছে। তাই জামাত বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করেছে। এভাবে যদি সরকারের একাংশ ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের তুষ্ট করে প্রতিরোধটা নমনীয় করা যায়। আবার একই সঙ্গে ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কনফনট্রেশন যেতে চাইলে এবং এ জন্যই বুদ্ধিজীবী হত্যার ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এতে যদি নির্বাচন স্থগিত হয় তা হলে তারাও বাঁচবে আর যারা সরকারের স্থায়িত্ব চাচ্ছে তাদের কৌশলও সফল হবে। এটি জামাতের দ্বিমুখী স্ট্র্যাটেজি। আমরা যেহেতু নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তাই আমাদের উচিত হবে কোন রকম প্ররোচনায় উত্তেজিত না হয়ে ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি জোরদার করে তোলা।

জামাত যে গত ৩০ বছরের মতো এখনও পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে তার একটি প্রমাণ নিজামী-মুজাহিদের বিরুদ্ধে এখনও দুর্নীতির কোন অভিযোগ না তোলা বা তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তব্যে প্রতিক্রিয়া না জানানো। গণতন্ত্র ও যুদ্ধাপরাধ একসঙ্গে চলতে পারে না। অন্যান্য অনেকবারের মতো এবারও এ দাবি ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে সাম্প্রতিক দুর্যোগের কারণে। আগেও এ রকমটি হয়েছে। আমাদের উচিত, দুর্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে এ দাবি প্রতিদিন তোলা, যাতে নিজামী-মুজাহিদ, রজব আলীদের দুষ্কর্ম বিস্মৃতিতে তলিয়ে না যায়। সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতেও অটল থাকা। এই বিচার ও নির্বাচন পরস্পরবিরোধী নয়। সত্তরের মহাদুর্যোগের পরপরই নির্বাচন হয়েছিল। এ বিচার সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করবে। এ দাবি আবার হারিয়ে না গেলেই আমরা আশাবাদী হতে পারি। গণমানুষ চাইলে বিচার হবেই। রাষ্ট্রে লজিক ফিরিয়ে না আনলে এ রাষ্ট্র অস্বাভাবিকই থাকবে যেমন আছে মিয়ানমার বা পাকিস্তান। দুর্নীতি দমনে কিছুই

হবে না। চুরি ও খুন দুটিই অপরাধ। কিন্তু কোনটি বড় অপরাধ তা নির্ণয়ের দায়িত্ব শাসকদের এবং এটিই সুশাসনের একটি নিরিখ।

গ্রামের লোকেরা রজব আলীদের ভোলেনি, তাদের কথাও সবার মুখে মুখে। আমরা শহুরেরা (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান) নিজামী-মুজাহিদ-কাদের মোল্লাদের ভুলি কিভাবে? তাদের এবং তাদের কৃতকর্ম ভুলে যাওয়া আরেকটি বড় অপরাধ। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনও এ ধরনের অপরাধ ক্ষমা করে না। এটিই ইতিহাসের সাক্ষ্য।

২৩.১১.০৭

রাজাকারদের জন্য আলাদা গোরস্থান চাই

বেশ কয়েক বছর আগে লন্ডনে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। বিলেতে আছেন বছর পঞ্চাশেক হলো। আলাপের এক পর্যায়ে জানালেন, তিনি তার সন্তানদের বলেছেন, তাঁর মৃত্যু হলে তাঁকে যেন বাংলাদেশে তাঁর গ্রামের মাটিতে দাফন করা হয়। জানতে চাইলাম, কোন গ্রাম? তিনি আর গ্রামের নাম মনে করতে পারেন না। এটুকু মনে আছে তা নোয়াখালীতে। কিন্তু গ্রামটি আছে না নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে তা তার জানা নেই। কারণ প্রায় ৫০ বছর তার সঙ্গে গ্রামের কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ঘটনাটি বিস্ময়কর বটে কিন্তু সত্য। আমার কাছে আরো বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, তাঁর সঙ্গে সেই গ্রাম বা গ্রামের কেউ বা আত্মীয়স্বজন কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই, কিন্তু গ্রামে তিনি সমাহিত হতে চান। একেই বোধহয় বলে মাটির টান বা জন্মভূমির মায়া। আর এর জন্যই ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ শহীদ হয়েছিল। এ কারণেই জন্মভূমিকে অনেকে বলেন 'মা' বা মায়ের সঙ্গে তুলনা করেন। যদ্দুর মনে পড়ে গোলাম আযম একবার বলেছিলেন যে দেশে থাকেন সেটিই দেশ। এখানেই আমাদের সঙ্গে জামাতিদের পার্থক্য। এখানেই বাঙালির সঙ্গে জামাতিদের পার্থক্য। যে দেশে জন্মেছি; সে দেশকেই দেশ বলে জানি।

এ ঘটনা মনে পড়লো পত্রিকায় একটি খবর দেখে। তিনদিন আগে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক রেজাউল করিমের মৃত্যু হয়েছে (ইন্নলিল্লাহে... রাজেউন)। এই রেজাউল করিম ১৯৭১ সালে পরিচিত ছিলেন রিজু রাজাকার নামে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের একাংশ এক সময় তাকে বরখাস্ত করার দাবিতে আন্দোলন করেছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিত রাজাকার আধ্যুষিত এলাকা হিসেবে এবং তখন ক্ষমতায় ছিল বিএনপি-জামাত। তাই আন্দোলনকারী শিক্ষক-ছাত্ররা নাজেহাল হয়েছিলেন কিন্তু 'রিজু রাজাকারের' কিছু হয়নি। কিছু হলো তার মৃত্যুর পর। রিজুর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক গত পরশুর ভোরের কাগজ ও সমকাল দেখতে পারেন।

রিজু রাজাকারের মৃত্যুর পর ঘটেছে চমকপ্রদ ঘটনা। তার দেশের মাটিতে তার কবর হয়নি। কিন্তু তার আগে দেখা যাক এই রিজু রাজাকার কে?

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় রেজাউল করিম ওরফে রিজু রাজাকার ছিল মাগুরার কুখ্যাত খুনি রাজাকার। তার অন্যতম সহযোগী ছিল রাজাকার হাসান কবির। তাদের ডাকা হতো রিজু কবির নামে। মাগুরার মানুষজন তার হত্যাযজ্ঞের কথা ভোলেনি। রিজু বিচিত্র সব উপায়ে মানুষকে কষ্ট দিতো। লুৎফুন্নাহার হেলেনা ছিলেন একসময় ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী, ১৯৭১ সালে ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা। তার দুবছরের শিশুসন্তান ছিল

একটি। রিজু একদিন তার দলবল নিয়ে হেলেনাকে বাড়ি থেকে তুলে নেয়। অভিযোগ তার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যোগ আছে। হেলেনাকে রিজু তুলে দেয় স্থানীয় পাকিস্তানি কমান্ডারের হাতে। সেখানে তিনি চরমভাবে লাঞ্ছিত হন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। লাঞ্ছনার পর হেলেনাকে জিপের পেছনে বেঁধে সারা শহর ঘোরানো হয়। তারপর মৃত হেলেনাকে খালের পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁকে দাফন করতে পর্যন্ত দেয়নি রিজু রাজাকার। এ ছাড়া মাগুরার লুৎফর রহমান, গোলাম কবির, হামেদ মীর, লিটু-এ রকম প্রগতিশীল অনেককে মোট ১৩৬৫ জনকে হত্যা করে রিজু। তার বিশেষ আনন্দ ছিল মানুষ 'জবেহ' করা। রিজু কবির গং যে ১৩৬৫ জনকে হত্যা করেছিল তাদের তালিকা মাগুরার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্মূল কমিটির কাছে পাঠিয়েছে। নির্মূল কমিটির সম্পাদক কাজী মুকুলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে তালিকা পেতে পারেন।

গোলাম আজম-নিজামী-মুজাহিদদের মতো ১৯৭৫ সালের পর জিয়াউর রহমানের কল্যাণে রিজু পার পেয়ে যান। সসম্মানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সওয়ার হন।

এহেন রিজুর মৃত্যু হয়েছে দিন তিনেক আগে। তাকে দাফনের জন্য মাগুরা নিতে চেয়েছিল তার পরিবার-পরিজন। এ খবর পাওয়ার পর পুরো মাগুরা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এরকম রাজাকারের লাশ মাগুরার মাটিতে তারা দাফন করতে দেবে না। তখন তার লাশ নিয়ে যাওয়া হয় ফেনীতে তার শ্বশুরবাড়ীতে। সেখানে তাড়াহুড়ো করে তার লাশ দাফন করা হয়। কিন্তু ঘটনার এখানেই শেষ নয়। ফেনীবাসী মুক্তিযোদ্ধারা খবর পেয়ে দাবি তুলেছেন, 'রিজুর লাশ ফেনী থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এ বিষয়ে আগামী সাতদিনের মধ্যে [ফেনীর] ফরহাদনগরের মাটি থেকে রাজাকারের লাশ প্রত্যাহার না করা হলে তারা স্থানীয়ভাবে আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হবেন।' (যুগান্তর, ১৯.১২.০৭) রিজুর লাশের যদি এ অবস্থা হয় তাহলে বড়ো আল-বদরদের মৃত্যুর পর তাদের কী হবে?

দেয়ালের লিখন সবাই পড়তে পারেন না। যারা পারেন তারা উৎরে যান। রাজাকারদের আস্ফালনের পর সারা দেশে তৃণমূল পর্যন্ত রাজাকারবিরোধী ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে। রিজুর ঘটনা এর প্রমাণ। এ বছর রাজাকারবিরোধী ঘৃণা এখন আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। রাজকাররা সঙ্গত কারণেই ভেবেছিল দেশে এখনো তারা ক্ষমতায় আছে। সে কারণেই ছিল তাদের আস্ফালন। কিন্তু আন্দোলনের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, বঙ্গভবনের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে রাজাকারসমর্থক ছাড়া কোন রাজনৈতিক দল/ব্যক্তি যায়নি। এরশাদের মতো মানুষ বঙ্গভবনে যাননি, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী যাননি। এমনকি সরকারসমর্থক বলে পরিচিত ড. কামাল হোসেনও যাননি। বঙ্গভবনের অনুষ্ঠান বয়কটের আহ্বান জানিয়েছিল সেকটর কমান্ডারস ফোরাম এবং নির্মুল কমিটি। শুধু তাই নয়, বঙ্গভবনেও ঘটেছে অশ্রুতপূর্ব ঘটনা। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, তারা যদি জানতেন এখানে জামাত নেতারা আসবে তাহলে তারা আসতেন না। পূর্বোক্ত দুটি সংগঠন সরকারকে আহ্বান জানিয়েছিল এ বলে যে, বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে যেন যুদ্ধাপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের দল জামাতকে আমন্ত্রণ জানানো না হয়। রাষ্ট্রপতি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু বলবো, সরকার দেয়ালের লিখন

বুঝতে অক্ষম। আর যারা দেয়ালের লিখন পড়তে অক্ষম তাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল–এমন কথা ইতিহাস বলে না।

মৃত্যু বা মৃতকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু খুনি যুদ্ধাপরাধীরা বাধ্য করছে মন্তব্য করতে। কারণ তারা মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি করে। বিশেষ করে ডানপন্থীরা। আপনাদের অনেকের এসব কথা শুনতে ভালো লাগবে না। কিন্তু সত্যের মুখোমুখি হওয়া দরকার। বাংলা একাডেমীর উল্টোদিকে তিন নেতার মাজারের কথা ধরুন। সেখানে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর কবর দেওয়া হয়েছিল। খাজা নাজিমুদ্দিনের মৃত্যুর পর এ দুজনের মাঝে নাজিমউদ্দিনকে সমাহিত করা হলো যিনি ছিলেন বাঙালিবিরোধী যাতে ঐ দুজনের স্মৃতির মহিমা ম্লান হয়। স্বাধীনতাবিরোধী খান এ সবুরের কবর দেওয়া হলো জাতীয় সংসদ চত্বরে জাতীয় কবরস্থানে বিএনপি আমলে। ভাবা যায়! শুধু তাই নয়, খুলনা শহরে ঢোকার মুখে প্রধান সড়কের নাম তার নামে। এটি দেখে খুলনা আর যাইনি। আমি জানি না, খুলনাবাসী কীভাবে এই অমর্যাদাকর বিষয়টি মেনে নিলেন। জাতির জনক রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে শুধু নৃশংসভাবে হত্যা-ই করা হলো না তাকে কবর দেওয়া হলো টুঙ্গীপাড়ায়। অথচ জিয়াউর রহমানকে জাতীয় সংসদ চত্বরে। শুধু তাই নয়, সুদৃশ্যভাবে তা সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেখানে যাওয়ার জন্য ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। ঐ সময় এ নিয়ে দুর্নীতির কথা উঠেছিল। কিন্তু, আমরা জানি দুদক তা গ্রাহ্য করবে না কারণ জিয়া সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি। অথচ যার অধীনে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, যিনি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই তাজউদ্দিন আহমদকে দাফন করা হয়েছে নিতান্ত অবহেলায় বনানী কবরস্থানে। এভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থীরা বাংলাদেশবিরোধী রাজাকার ও রাজাকার সমর্থকদের মহিমা তুলে ধরতে চেয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। আমরা নিতান্ত নপুংসক, অকতৃজ্ঞ জাতি দেখে এর প্রতিবাদ করিনি।

এখন মনে হচ্ছে জাতির ঘুম ভাঙছে। নিজেদের মহিমা ও আত্মসম্মান তারা আবার ফিরে পেতে চাইছেন। মাগুরা-ফেনীর ঘটনা এর প্রমাণ। আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের এ আন্দোলন ও স্পিরিটকে সমর্থন জানিয়েছে নির্মূল কমিটি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সরকারসমর্থক কয়েকটি দল ছাড়া সবাই ঐকমত্যে পৌছেছেন- খুনিদের বিচার করতে হবে। না করলে হবে তা নৈতিক দুর্নীতি ও সুষ্ঠু নির্বাচনবিরোধী। এরপরও সরকার তা অনুধাবন না করলে আমাদের কিছু বলার নেই।

এটিও লক্ষণীয় যে, এই প্রথম একটি দাবিতে ডান-মধ্য-বাম সবাই একমত। এ ধরনের ঐকমত্য হয়েছিল ১৯৭১ সালে। এবং আমরা জানি, এ ধরনের ঐকমত্য হলে কী হয়। শুধু সমাসীন সরকার তা বোঝে না।

রিজুর ঘটনার পর অনুমান করে নিচ্ছি, ভবিষ্যতে এ ধরনের রাজাকারের মৃত্যু হলে নিজ এলাকায় তার দাফন করা মুশকিল হবে। প্রতিদিন এ ঘটনা ঘটলে সরকার তা থামাবেন কী করে? কারো মৃত্যু নিয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটুক তা আমরা চাই না। আমি তাদের উত্তরাধিকারীদের কথা ভাবি। তাদের কী হবে? সম্প্রতি, সেনাপ্রধান একটি উত্তম

প্রস্তাব দিয়েছেন। সাভার স্মৃতিসৌধে বীরশ্রেষ্ঠ সাতজনকে দাফন করার। সবাই এ প্রস্তাবকে সানন্দে অভিনন্দন জানিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি নির্মূল কমিটির নেতা শাহরিয়ার কবিরের সঙ্গে আলোচনা করেছি। রাষ্ট্রের স্বার্থে, সরকারের স্বার্থে, জরুরি বিধিমালার স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে, সরকার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। প্রস্তাবটি হলো, রাজাকারদের জন্য আলাদা গোরস্থান হোক। এখানে কুখ্যাত রাজাকারদের কবর দেওয়া হবে সরকারি প্রটেকশনে। তাহলে স্থানীয় জনগণের ক্ষোভ থাকবে না। রিজুর ঘটনার মতো ঘটনা ঘটতে থাকলে সরকার বা রাজাকার পরিবারগুলো তা সামাল দেবে কী করে? সবার লাশ তো সৌদি আরব বা পাকিস্তানে পাঠানো যাবে না। এতে যে পরিমাণ অর্থ অপচয় হবে তার চেয়ে কম খরচে রাজাকার গোরস্থান কমপ্লেক্স করা যাবে। এতে রাজাকারদের উত্তরসুরিদের এবং আমাদেরও সমস্যার সুরাহা হবে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি হবে না। তা না করলে, রাজাকারদের প্রতি ঘৃণা সরকারের প্রতি চলে যেতে পারে যেটি আমরা চাই না। এমনিতেই সরকার সব করবে অথচ রাজাকারদের বিচার করবে না-এ মনোভাবে সবাই ক্ষুব্ধ। আমরা মনে করি অরাজনৈতিক সরকারের উচিত, বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়া। পরবর্তী সরকার যদি সে কাজ সম্পন্ন না করে তাহলে ঘৃণার দহনে তারাই জ্বলবে। এ সরকার কেন যুদ্ধাপরাধীদের দায় নেবে? মইনুল হোসেন বলেছেন, ৩৬ বছর যারা বিচার করেননি তাদের বিচার জরুরি। [ব্যারিস্টার সাহেব নিজে এক সময় সরকারদলীয় সাংসদ হিসেবে ক্ষমতায় ছিলেন] এ সরকার বিচার প্রক্রিয়া শুরু না করলে তাদেরও যে এ ধরনের বক্তব্যের সম্মুখীন হতে হবে না তার নিশ্চয়তা কে দিলো।'

স্মৃতিসৌধে বীরশ্রেষ্ঠরা সমাহিত হলে সেখানে দেশবাসী এই বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। সেটি একটি দ্রষ্টব্য স্থানও হবে যা এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সাহায্য করবে। তেমনি রাজাকার গোরস্থান হলে সেটিও দ্রষ্টব্য হবে। এবং বিভিন্ন এলাকার মানুষজনেরও ক্ষোভ থাকবে না। আমরা যেহেতু মৃতদের নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না তাই এই প্রস্তাব। শুধু সরকারই নয় রাজাকাররাও এ প্রস্তাব ভেবে দেখতে পারে। ১৯৭১-এ তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল, মৃত্যুর পরও তারা একত্রে থাকবে। রাজাকাররা রাজাকারদের না দেখিলে আর কে দেখিবে? এ কথা যে কতো সত্য তার প্রমাণ, রিজুর মৃত্যুর পর শোক জানিয়েছে একমাত্র জামাতের চট্টগ্রাম শাখা এবং বলেছে এ ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়। সারা দেশের আর কেউ এমনকি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির শোক জানায়নি। কেউ ভাবেনি যে তার ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়, একমাত্র রাজাকাররা ছাড়া। এবং সেটি খুবই স্বাভাবিক।

২০.১২.০৭

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতেই হবে

যুদ্ধাপরাধী প্রত্যয়টিই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এ বলে যে, বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী বলে কেউ নেই। এর মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের সৃষ্টি বা এর স্বাধীনতাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন। যুদ্ধাপরাধী না থাকার মানে বাংলাদেশে কোন যুদ্ধ হয়নি। যদি যুদ্ধ না হয় তাহলে ১৯৭১ সাল বলে কিছু ছিল না। এ প্রত্যয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন জামাত সমর্থক সাবেক সচিব ও ইসলামী ব্যাংকের সাবেক সভাপতি শাহ হান্নান। তিনি বলেছেন, ১৯৭১ সালে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৭১ সালে গৃহযুদ্ধ হলেও তা চুকেবুকে গেছে যেমন, অনেক গৃহযুদ্ধই চুকেবুকে যায়। অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ধারাবাহিকতা ও পাকিস্তান সৃষ্টির পরের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন আছে। এটি যে বাস্তব সেটি প্রমাণের জন্য জামাতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল কাদের মোল্লা বললেন, যারা যুদ্ধ করেছিল তারা সুন্দরী নারীর জন্য গিয়েছিল। এ উক্তির দুটি তাৎপর্য আছে। সেটি হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ যারা করেছেন বা বিশ্বাস করেন তারা মূলত ধর্ষক, লুটেরা। তার এটি বলার উদ্দেশ, যদি সরকার সত্যি সত্যি বাংলাদেশ প্রত্যয়ে বিশ্বাস করে তাহলে প্রতিক্রিয়া দেখাবে কারা সরাসরি বাংলাদেশ সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করে, যেই সংবিধানের বলে সরকার ক্ষমতা ভোগ করছে। যদি তারা কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখায় তাহলে এটি প্রতীয়মান হবে, তারাও ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী। এই নেশনটি কতটা শক্তিশালী তা প্রমাণের জন্য, জামাতের সহযোগী ও বিএনপিপন্থী সাদেক খান ঘোষণা করলেন, যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায় বা অন্য কথায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলে তাদের প্রতিপক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের বিচার করতে হবে। সাদেক খান সরকারি প্রেস ইন্সটিটিউটের সভাপতি। তাকে অপসারণ দূরে থাক সরকার ভর্ৎসনাও করেনি। উপদেষ্টা মইনুল হোসেন দাবি করেছেন, যারা বিচার করেননি গত ৩৬ বছর তাদের বিচার আগে করতে হবে।

সরকার যখন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শীর্ষনেতাদের গ্রেফতার শুরু করে নানা কারণ দেখিয়ে, তখনই বারবার প্রশ্ন উঠেছিল কেন জামায়াতিদের ধরা হবে না। এ দাবি জোরদার হয়ে উঠেছিল দেখেই জামায়াতিরা একথাগুলো পরিকল্পনামাফিকই বলেছে, পরীক্ষা করতে যে সরকারের ঝোঁক আসলে কোন দিকে? তারা এখন নিশ্চিত। সরকার তার নীরবতার মাধ্যমে তার ঝোঁক স্পষ্ট করেছে।

২.

এ মূল্যায়নের অন্যদিকটাও বিবেচ্য। মুজাহিদ ও কাদের আলবদর হিসেবে 'খ্যাতি'

অর্জন করেছিলেন। তাদের খুনখারাবির কথা মিডিয়ায় এসেছে ও আসছে। ইসলামী ব্যাংক জঙ্গিদের অর্থ নাড়াচাড়া করেছে, মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। সাদেক খান এক সময় মার্কসবাদী ছিলেন এবং জঙ্গিবাদ তো বটেই জামাতের প্রত্যক্ষ সমর্থকে পরিণত হয়েছেন। প্রশ্ন জাগতে পারে, সরকারের উপদেষ্টারা, সেনা কর্মকর্তারা রাজনীতি পরিচ্ছন্ন করার জন্য আমাদের হিতোপদেশ দিচ্ছেন এবং আকারে ইঙ্গিতে বলছেন, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজনীতি পরিচ্ছন্ন করার জন্য। রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রায়নের জন্য। এসব হিতোপদেশ দিচ্ছেন যারা তারা যেন প্রতিনিধি নন, আমলা হিসেবে যারা সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমাদের পিটিয়েছেন ও সামরিক সরকারের অধীনে আনন্দে চাকরি করছেন। সেটিও সহ্য করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা প্রশ্ন করেন দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নিয়ে, তখন টেলিভিশনে প্রচারিত মোল্লাসল্টের বিজ্ঞাপনের বংশবদ কর্মচারীর মতো বলতে হয়, সব মানলেও এটা মানতে পারলাম না। ১৯৭১ সালের পরীক্ষিত খুনি, নির্যাতনকারী, লুটেরা, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের মদদদাতারা কিভাবে পরিচ্ছন্ন হলেন? বা তাদের দল কিভাবে পরিচ্ছন্ন হল? এর উত্তর এখন না দিলেও পরে দিতে হবে না এমন নিশ্চয়তা কেউ দেয়নি। বিএনপিতে গণতন্ত্র যদি না থাকে তাহলে জামাতে গণতন্ত্র আছে কিভাবে? তাদের তো ইউনিয়ন থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত কমিটি আছে। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম ও অন্যান্য কমিটির যত মিটিং হয়েছে ইলেকশন কমিশন নিজেরা তত মিটিং করেছে কিনা সন্দেহ। এগুলো অশিক্ষিত সব মন্তব্য। সরকার যদি মনে করে তাদের ভাষায় চাঁদা নেয়া বা টাকা চুরি করা খুন বা ধর্ষণের চেয়ে বড় অপবাধ তাহলে নিশ্চয় আমাদের বলার কিছু থাকে না। কিন্তু, মানুষের মুখও এই বলে বন্ধ রাখা যাবে না যে, তা হল জোট সরকারের সঙ্গে এর মৌল কোন পার্থক্য আছে কিনা? বা ডিটেলসে অমিল থাকলেও মৌল বিষয়ে অমিল নেই। তাহলে ঘুরে-ফিরে এটিই দাঁড়ায়-১৯৭১ সালে যেমন পাকিস্তানিরা জিজ্ঞেস করত মুক্তি হ্যায়, আওয়ামী হ্যায়? সেই ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়নি। নির্বাচনের ভবিতব্য নিয়ে সন্দেহ জাগাও এ পরিপ্রেক্ষিতে অবাঞ্ছনীয় নয়।

এস্টাবলিশমেন্টপন্থীরা এ পরিপ্রেক্ষিতে কখনও কখনও যে প্রশ্নটি করছেন তাহল, মুক্তিযুদ্ধের কি খুব একটা দরকার ছিল? তার পরের প্রশ্ন, যদি হয়েই থাকে তো হয়েছিল, তা নিয়ে এখন এত মাতামাতি কেন? এ ধরনের প্রশ্ন যারা করেন তাদের পরের প্রশ্নটি আঁচ করে নিতে তেমন কষ্ট হয় না। পরের প্রশ্নের ধরনটা এরকম, এতদিন পর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ করা কি ঠিক? এতে তো দেশের মানুষ বিভক্ত হয়ে যায়। শুধু তাই না, বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়, এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি নির্বাচন না হতে দেয়ার ষড়যন্ত্র। অর্থাৎ নির্বাচনের কারণে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি উচিত নয়। আর এতদিন এ দাবি ওঠেনি। এখন কেন উঠছে।

এসব দাবির কোন সারবত্তা নেই। আর শেষোক্ত দাবিটি সর্বৈব মিথ্যা। তবে এসব প্রশ্নের উত্তর অনেকভাবে দেয়া যায়। একটা সোজা উত্তর হয়তো হতে পারে–১৯৭১ সালেও অনেকে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল। তাদের উত্তরসূরিদের অনেকের এখনও

বাংলাদেশের পক্ষে থাকার কোন কারণ নেই। বাংলাদেশে থাকতে হয় বলে তারা আছেন। অথবা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন তা ব্যবহার করছেন? ক্ষমতা থাকলে, তারা আজ পাকিস্তানের ফ্রেমে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে দ্বিধা করতেন না। তারা সে ক্ষমতা এখনও অর্জন করতে পারেননি। সে ক্ষমতা এখনও নিরস্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে এবং তাদের থেকেই আজ ঐক্যবদ্ধ দাবি উঠছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই নির্বাচনের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই।

মুক্তিযুদ্ধের এই অবমূল্যয়নের প্রচেষ্টা ১৯৭২ সাল থেকেই শুরু। এর জন্য কমবেশী আমরাও দায়ী। আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী জেনারেশন ছিল মুক্তিযুদ্ধের। ১৯৭৫ সালের পর সচেতনভাবে জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেন। তার সময় থেকেই ফিরে এসেছে ১৯৭১ সালের সেই প্রশ্ন তুমি মুক্তি হ্যায়? তুম আওয়ামী হ্যায়? আমাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন আওয়ামীবিরোধীরা সমর্থন করল জিয়ার সেই প্রশ্ন। দেশ বিভক্ত হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে। আমরা দেশকে বিভক্ত করিনি। যেহেতু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উঠেছে তাই এ সত্যের মুখোমুখি হতে হবে নি:সংকোচে এবং এই সত্যের মুখোমুখি হয়েই ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, লে. জেনারেল এরশাদ, লে. জেনারেল শওকত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাচ্ছেন এবং তাদের এ সত্য স্বীকার প্রশংসাই, তাদের রাজনীতি পছন্দ করি না। আমরা আমাদের আত্মা বিক্রি করেছি—এ মন্তব্য এ কারণে যে, যারা দেশ বিভক্ত করল, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে গেল, খুনি ও ধর্ষকদের পক্ষ নিল, আমরা তাদের বন্ধুত্ব ত্যাগ করিনি, ভর্ৎসনাও করিনি। গোকুলে তারা বেড়েছে। এখন সময় এসেছে এ পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের পুনর্মূল্যায়ন।

এ প্রতিরোধটি যে যার ক্ষেত্র থেকেই গড়ে তুলতে পারতেন। আমি যুক্ত লেখালেখির সঙ্গে। বলতে দ্বিধা নেই, এ প্রতিরোধে লেখক, সাংবাদিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ও সংস্কৃতিসেবীরা ছিলেন সজীব এবং সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধের বোধ বা অনুভবকে যে কারণে বিনাশ করতে পারেনি শত্রুপক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি, নাটক, চলচ্চিত্র, গান বাঁচিয়ে রেখেছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি।

আজকে জামাতের ঔদ্ধত্য ও সরকারের নীরবতার কারণে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সক্রিয় হয়ে উঠছে সিভিল সমাজ, তাদের প্রতিনিধি অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং এ দাবি নতুন নয়। ১৯৭২ সাল থেকেই এ দাবি উঠেছে।

আজ ৩৭ বছর পর ৭১টি সংগঠন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শুধু খুনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নয়, মৌলবাদী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার, যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে দেয়ার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ। এ দাবিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নানা ঘটনা ঘটতে পারে, ঘটানো হতে পারে, বিভিন্ন মন্তব্য করা হতে পারে আমরা মনে করি, যতদিন আমাদের দাবি আদায় না হবে ততদিন এসব কথা আমাদের বলে যেতে হবে আপনাকেও বলতে হবে আপনার সন্তানদেরও। মনে করিয়ে দেবে তাদের, যখন আমরা থাকব না, যে, স্বাধীনতা চার অক্ষরের একটি শব্দমাত্র নয়। মনে করিয়ে দেবে কিভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। আমাদের প্রধান কাজ

হওয়া উচিত যুদ্ধাপরাধী ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগ্রত রাখা ও তা ছড়িয়ে দেয়া। যাতে এ সমাজে মন্ত্রী হোক, ধনী হোক, প্রভাবশালী হোক, একজন রাজাকারের ছেলে যেন মাথা উঁচু করে বলতে না পারে আমি রাজাকারের পুত্র। এ সমাজে সাধারণ হোক, গরিব হোক, প্রভাবহীন হোক কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধার ছেলে যেন বুক ফুলিয়ে বলতে পারে আমি মুক্তিযোদ্ধার পুত্র আর এ কারণেই নতুন বছরের শপথ হোক, দাবি হোক প্রত্যয় নিয়ে আমরা বলব–দেশের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এ দেশে হতেই হবে।

একাত্তরের গণহত্যার বিচার

এই ঢাকায় কয়েকদিন আগে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ নিয়ে আন্তর্জাতিক একটি সম্মেলন হয়ে গেল। ঢাকায় যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে আন্দোলন-কথাবার্তা বলছেন তাদের অনেকেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাছাড়া ভারত, কম্বোডিয়া, জাপান ও জার্মানি থেকে এসেছিলেন প্রবন্ধ পাঠক এবং পর্যবেক্ষকরা। দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

আলোচনার একটি অধিবেশনে আমি ছিলাম। যার বিষয় ছিল 'ডকুমেন্টিং অ্যান্ড আর্কাইভিং জেনোসাইড'। সাদা বাংলায় গণহত্যা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ-সংকলন এবং সংরক্ষণ। কম্বোডিয়ায় এখন পলপট আমলের গণহত্যার বিষয়ে আলোচনা শুধু নয়, বিচার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। পলপটের আমলের বিভীষিকাময় দিন ও গণহত্যার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন 'ইউক চাং ডকুমেন্টেশন সেন্টার অব কম্বোডিয়া' গঠিত হয়েছে। কিভাবে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়লেন ফারিনা সো। তার প্রবন্ধের উল্লেখ করছি এ কারণে যে, গণহত্যার বিচারের জন্য এসব বিষয় জরুরি। কারণ আমরাও এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার।

সে তার প্রবন্ধে বলেছেন, তারা যেসব তথ্য-দলিল সংগ্রহ করছেন সেগুলো দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হল প্রাথমিক, অন্যটি সেকেন্ডারি। সরকারি নথিপত্র হচ্ছে প্রাথমিক দলিল। এছাড়া বাকিগুলো সেকেন্ডারি। ১৯৯৫ থেকে এ পর্যন্ত সেন্টার ৬,০০,০০০ দলিলপত্র সংগ্রহ করেছে।

গণহত্যার বিচারের জন্য আমাদের কাছে কিন্তু প্রাথমিক দলিলপত্র তেমন নেই। অন্যান্য দেশে নিজ দেশীয়রাই [সরকার] গণহত্যা করেছে, ফলে নথিপত্র সেখানেই ছিল। যেমন-জার্মানি, কম্বোডিয়া। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল ইসলামাবাদে। এখানে গণহত্যা চালানোর সময় শুধু হত্যা করা হয়েছে, কোন নথিপত্র রাখা হয়নি। দ্বিতীয়ত, ফরেনসিক এভিডেন্স যদি না থাকে তাহলে কি হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য আইন বিশেষজ্ঞরাই দিতে পারবেন। তবে সেকেন্ডারি তথ্যের অভাব আর এখন নেই বললেই চলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কথা উঠেছিল যে, এত বড় একটি গণহত্যা কিন্তু ঠিক ১৯৭২ সালের পর সবাই তা ভুলে গেল কেন? অধ্যাপক রওনক জাহান বললেন, আমেরিকায় তার ছাত্রছাত্রীদের তিনি গণহত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়টি তারা জানে না। এটি শুধু তারা নয়, অনেকের কাছেই তা আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে।

এই নৈঃশব্দের কারণ কি? বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদি নিধন সবাই মনে রেখেছে কেন? এর প্রধান কারণ গণমাধ্যম। পৃথিবীর শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলো আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে এবং তা ইহুদি গোষ্ঠীদের প্রভাবাধীন। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শিখণ্ডি হিসেবে আমেরিকা-ইউরোপ দাঁড় করিয়েছে ইসরাইলকে। হিটলার ইউরোপের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ফলে ইউরোপ-আমেরিকা নাজিবাদের বিরুদ্ধে যতরকম স্মৃতি সংরক্ষণ করা যায় তা করেছে এবং উজ্জীবন করেছে। বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে পাকিস্তান। পরোক্ষভাবে তাকে সমর্থন করেছে আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো এবং চীন। বাংলাদেশে গণহত্যার বিচার হলে এসব বিষয় সামনে চলে আসবে। তখন বিষয়টি সুপারপাওয়ারদের জন্য স্বস্তিদায়ক হবে না। তারা ভাবেনি বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, সে কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় গণহত্যা সম্পর্কে এ সোনালি নৈঃশব্দ। আমেরিকা নিজে গণহত্যা সংক্রান্ত কোন কনভেনশনে স্বাক্ষর করেনি। কিন্তু আমেরিকা বা ইউরোপ যখন প্রয়োজন মনে করে তখন গণহত্যার বিচারে সহায়তা করে। কম্বোডিয়ার কথা ধরা যাক। পলপটের বিরুদ্ধে ছিল আমেরিকা। পলপটের বিচারে তারা আগ্রহী। ফারিনা সো জানালেন, তাদের সেন্টারকে ইউএস এইডও সাহায্য করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সাহায্য করবে ইউএস এইড?

আমাদের এবং আমাদের সরকারগুলোর মনোভাবও যুদ্ধাপরাধ বিচারের অন্তরায়। ১৯৭৫ সালের পর প্রায় সব সরকারের একটাই কথা ছিল পাকিস্তান। সামরিক সরকারগুলো সব সময় ডানপন্থাকে সমর্থন করেছে। এখনও করছে। সুতরাং দেশের সরকার ও সুপারপাওয়াররা না চাইলে বিচার করা দুরূহ। পলপটের বিচারের আয়োজন করেছে কম্বোডিয়া সরকার। সে কারণেই 'ইউক চাং' সেন্টার কাজ করতে পারছে।

সুতরাং গণহত্যার বিচারের জন্য দেশ ও বিদেশের সম্মতি থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে দেশের জনগণ এ দাবিতে উত্তাল হলে দেশী সরকারকে নতি স্বীকার করতেই হবে এবং তখন কোন না কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমর্থন আসবেই। আমেরিকার এখন চাপেটাঘাত খাওয়ার সময়, দেয়ার নয়।

এ প্রসঙ্গে অনেকে 'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিশন' কমিশনের কথা বলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় সেটি হয়েছিল ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। আগে 'অপরাধীদে'র বিচার হবে, দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি হবে এবং তারপর ক্ষমা বা সমঝোতার প্রশ্ন আসবে। যারা সমঝোতা বা ক্ষমার কথা বলেন, তারা পরোক্ষভাবে সমন্বয়ের রাজনীতিকেই সমর্থন করেন।

সরকার বিচার করবে কি করবে না সেটি অন্য প্রশ্ন। কিন্তু বিচারের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর আয়োজন তো করা যেতে পারে। সেটি হল প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্য সংরক্ষণ। আমাদের এখানে অনেকে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং অনেকগুলো সংস্থা [কেন্দ্র] যুদ্ধাপরাধের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছে। প্রাথমিকভাবে এসব ব্যক্তি-সংস্থা মিলে একটি ফেডারেটিভ সংস্থা হতে পারে, অন্তিমে যা একটি কেন্দ্রীয় সংস্থায় পরিণত হবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে। বিষয়টি জরুরি। কারণ

হত্যাকারী এবং যারা নিহত-আহত হয়েছে তারা মারা যাচ্ছে। আর বিচার হোক না হোক ১৯৭১ সালের গণহত্যার স্মৃতি তো অক্ষুণ্ন রাখতে হবে পরবর্তী গণহত্যা রোধের জন্য।

ভারতের আশীষ নন্দী বিভিন্ন নজির দেখিয়ে বলেছিলেন, একটি গণহত্যার বিচারে দেড় প্রজন্ম লেগে যায়। মন্তব্যটি উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে চাইলে দ্রুতও হতে পারে। যেমনটি নুরেমবার্গ বিচার হয়েছিল বা টোকিও বিচার। সে জন্য প্রচারটাও জরুরি। পৃথিবী পরিবর্তিত হয়েছে অনেক; অসম্ভব অনেক কিছু সম্ভবও হচ্ছে। হয়তো ১৯৭১ সালের গণহত্যার বিচার আমরা দেখে যেতে পারব। যেটা জরুরি সেটা হল আমাদের কাজ আমাদের করে যাওয়া।

২০০৮

নিজামী 'ওলি' হলে আমরা সবাই ফেরেশতা

জামাতে ইসলামীর লিডারদের কাউকে না ধরাটা খুব দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সরকারের সময়ের শেষ দিকে (আমাদের আশা) নিজামী গ্রেফতার হলেন। খালেদা-নিজামী সরকারের প্রতি আমার সমবেদনা থাকার কোনো কারণ নেই। গত ৫ বছরে তাদের অপশাসন এরশাদের শাসনকেও ম্লান করে দিয়েছে। এরশাদ ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লুটতরাজের অভিযোগ আছে বটে, কিন্তু দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে কিছু কাজও করেছে। আর নিজামীরা ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের স্লোগান তুলে যথেচ্ছ লুটপাট করেছে; কিন্তু দেশের মানুষকে কিছুই দেয়নি। আমাকে ও আমার বন্ধু শাহরিয়ার কবিরকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জুলুম করেছে, জেল দিয়েছে। তারপরও আমি বলব, যে মামলায় নিজামীকে বা মান্নান ভূঁইয়াকে ধরা হয়েছে তা যৌক্তিক হয়নি। ক্রয় কমিটির সব সদস্য কোনো বিষয়ে একমত হলে পুরো কমিটিকে দায়ী করা যায় না। এখানে আবার কেবিনেট সচিবকে বাদ দিয়ে অন্য সচিবদের ধরা হয়েছে। এ রকম পক্ষপাতমূলক মামলা করা হয়েছে, রায়ও হয়তো সরকার পক্ষে যাবে তবে যে উদাহরণ সৃষ্টি হলো তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকারের জন্য শুভ নয়। একই দায়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কেবিনেট মন্ত্রীকে ধরা হবে। কেউ আর তাহলে ক্রয় কমিটিতে থাকবে না। সরকারও চলবে না। কিন্তু নিজামী নিজের দলের প্রচুর লোককে অন্যায়ভাবে চাকরি দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে, যে কাজটি জামাতের অপর মন্ত্রী মুজাহিদও করেছেন। অর্থাৎ প্রশাসনের জামায়াতিকরণ হয়েছে। এমনভাবে তারা সব সাজিয়েছেন যে, একজন গেলে আরেকজন জামায়াতি আসবে। এটিও বড় ধরনের দুর্নীতি। আর্থিক দুর্নীতির কথাও শোনা গেছে। আমরা ভেবেছিলাম, ১৯৭১ সালে খুন-খারাবির দায়ে তাকে ধরা হবে। তা হয়নি। অনেকে সান্ত্বনা পাচ্ছেন এই ভেবে যে, ৩৬ বছর পর লোকটিকে জেলে পোরা হলো তো, সেটিই সান্ত্বনা। না, সান্ত্বনা পাওয়ার কিছু নেই। আমরা চাই জামাতের চিহ্নিত এই ব্যক্তিদের হত্যার জন্য বিচার হোক।

জেনারেল মইন উ আহমেদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যৌক্তিক বলে ঘোষণা করার পর জামাতিরা বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রবিরোধী যেসব বক্তব্য দিয়েছে তার সারকথা হলো– ১. যুদ্ধাপরাধী নেই, কারণ যুদ্ধ হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে; ২. বঙ্গবন্ধু সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন সুতরাং এসব প্রশ্ন ওঠানো উদ্দেশ্যমূলক; ৩. সংবিধান/বিধি না বদলালে বিচার করা যাবে না। এছাড়া যারা বিচার দাবি করেছেন তাদের প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়েছেন। সচেতন মহল মাত্রই জানেন তাদের উপর্যুক্ত বক্তব্য সবই মিথ্যা। এটি তাদের ট্রেডমার্ক, নতুন কিছু নয়। যুদ্ধ ভারত-বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর সঙ্গে হয়েছে। সে

কারণে আত্মসমপর্ণ দলিলে বাংলাদেশে আত্মসমর্পণের কথা লেখা হয়েছে। সুতরাং এটি গৃহযুদ্ধ তো নয়ই ভারত পাকিস্তান যুদ্ধও নয়। সংবিধান ও ১৯৭৪ সালের জরুরি আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিধি এখনো বলবৎ। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীরা দেশে ফিরে গেছে চুক্তি মোতাবেক। তাদের বিচারের দাবি তোলা যায় কিন্তু তা করার দায়িত্ব পাকিস্তানের। কিন্তু তাদের সহযোগী বাঙালি যুদ্ধাপরাধীরা এ দেশেই আছে। সুতরাং স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচার করা যাবে। দেশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়নি বা বঙ্গবন্ধু তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এটিও মিথ্যা। এর উদাহরণ জামাতের বর্তমান আমিরের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার ও শাস্তি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

যুদ্ধাপরাধীদের যতদিন মামলায় ফেলা হয়নি ততদিন তারা সরকারের অনুগত ছিল। অনেকেরই ধারণা হচ্ছিল সরকারটা বোধহয় তাঁদেরই। বিএনপির দুর্যোগের সময় ও তারা নিশ্চুপ থেকেছে। নিজামী গ্রেফতার হওয়ায় দৃশ্যপট বদলে গেছে। এখন তারা সরকারের সমালোচনা করছে। এসব সরকারের পিঠে ছুরি মারার মতো, যা আমাদের পছন্দের নয়। একই কাজ করেছেন মেজর হাফিজ ও সাইফুর রহমান। হাফিজ তো বলেই ফেললেন, এ সরকার দেশকে ২০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে। সরকার যে তাদের জন্য এত করল তা মনেই রাখলেন না। হয়তো ফেরদৌস কোরেশীও একই কাজ করবেন। আসলে সরকার লোক চিনতে ভুল করেছে।

যা হোক, নিজামী ধরা পড়ার পর জামাত এখন দুই নেত্রী ও নিজামীর মুক্তি চাচ্ছে। এরশাদের আমলের কথা স্মরণ করুন। আওয়ামী লীগ বিএনপি কর্মসূচী দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে জামাতও দিচ্ছে এবং এক সময় বলা হলো তিন দল আলাপ করে কাজ করেছে। জামাত বৈধতা পেল ও আন্দোলনকারী হিসেবে নাম কুড়ালো। বলা হলো, আওয়ামী লীগ তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করেছে, এখানেও তাই। তারা এখন শহীদ শহীদ ভাব করছে। বড় দুই দল যা বলছে যা করছে, তারাও তা অনুকরণ করছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে দাবি এখন সারাদেশে সেই দাবির তীব্রতা হ্রাস করার জন্য জামাত এসব করছে। নিজামী গ্রেফতার হওয়ার পর যুদ্ধাপরাধীদের গলার স্বর কীভাবে বদলে গেছে দেখুন। ঢাকা মহানগর আমির বলছেন, 'মতিউর রহমান নিজামীকে গ্রেফতারের মাধ্যমে দেশে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান আজ রাজনীতিবিরোধী অভিযানে পরিণত হয়েছে' (জনকণ্ঠ ৩১-৫-০৮)। এতদিন এত নেতা-নেত্রী গ্রেফতার হয়েছেন তাতে কিন্তু তা রাজনীতিবিরোধী অভিযান হয়নি। যুদ্ধাপরাধী সাঈদীর মতে, মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন একজন আল্লাওয়ালা মানুষ। তাকে গ্রেফতার করা সরকারের কাজটি ভালো হয়নি। সেনাবাহিনীকে ব্যারাকের বাইরে বেশিদিন রাখা হলে তাদের পবিত্রতা বজায় থাকবে না। তাদের প্রতি জনগণের ও জনগণের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা থাকবে না। (ঐ) দেখা যাচ্ছে নিজামীকে ছেড়ে দিলেই দেশের সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। পবিত্রতা ফিরে আসবে।

জামাত যদি যুদ্ধাপরাধের জন্য অনুতপ্ত হতো তবুও না হয় তাদের প্রতি নমনীয় হওয়া যেত। কিন্তু তারা সেদিকে যায়নি। বরং তাদের কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে ঘোষণা

করেছে, যুদ্ধাপরাধ এমন কোনো বড় অপরাধ নয়। তোমরা কী করতে পারো করো। এর উদাহরণ নতুন ভারপ্রাপ্ত আমির হিসেবে যুদ্ধাপরাধী ইউসুফের নাম ঘোষণা। মুজাহিদ যদি গ্রেফতার হন সেজন্য রেডি রেখেছেন একজন ব্যারিস্টারকে। মিছবাহুর রহমান তো ঘোষণা করেছেন, ওই ব্যারিস্টার যে যুদ্ধাপরাধ করেছে তার দলিলপত্র তার হাতে আছে। গোলাম আযম আবার ফিরে এসেছেন দৃশ্যপটে। এরপর কামরুজ্জামান, কাদের মোল্লা, সাঈদী-কত নাম বলব, সবাইকে তৈরি করে রাখা হয়েছে। এবং সবাই যুদ্ধাপরাধী। জামাত যেন যুদ্ধাপরাধী তৈরি করার মেশিন। তাদের পাইপলাইনে আর কত যুদ্ধাপরাধী আছে কে জানে। তৃণমূলে যারা জামাত করেন তাদের জন্য এ সংবাদ শুভ নয়। দেশ আজ যুদ্ধাপরাধী গ্রহণে অনিচ্ছুক। গোলাম আযম ফের মাঠে নেমেছেন। পত্রিকার খবর অনুযায়ী দেশ-বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করছেন। তিনি বলেন 'আমি যদি গ্রেফতার না হতাম তাহলে নাগরিকত্ব ফিরে পেতাম না, তাই নিজামীর বিচারেও হয়তো আমরাই সুফল পাব। কেননা বিচার বিভাগ আমাদের সঙ্গে অন্যায় করবে মনে হচ্ছে না' (আমাদের সময় ২৯.০৫.০৮) আসলেও কথাটা ঠিক। এখন পর্যন্ত উচ্চ আদালত সমবেদনার চোখেই দেখেছে এ গণহত্যাকারীদের। গোলাম আযম তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। না গণহত্যাকারীরা এখানেই থেমে থাকেনি '৭১-এর দুর্ধর্ষ আলবদর মুজাহিদ ঘোষণা করেছেন, নিজামীকে গ্রেফতার করতে সরকারের দিল কাঁপেনি, আশ্চর্য, কারণ নিজামী হচ্ছেন 'আল্লাহর ওলি' (ঐ) '৭১-এর আলবদর স্কোয়াডের প্রধান, জোটের বহু অপকর্মের সহযোগী, প্রশাসন জামায়াতিকরণ উদ্যোক্তা, পত্রপত্রিকায় যার দুর্নীতি নিয়ে লেখা হয়েছে তিনি যদি আল্লাহর ওলি হন তাহলে বাংলাদেশে বসবাসরত আমরা সবাই ফেরেশতা মুজাহিদদের বক্তব্য দেখুন, আল্লাহর ওলিদের নিয়ে কীভাবে ঠাট্টা করছেন এবং একই সঙ্গে ধর্মকে ব্যবহার করছেন। একজন আলবদরকে আল্লাহর ওলি বলা চলে? আল্লাহর ওলিরা কি খুনি ছিলেন?

রাষ্ট্রের কর্তারা এদের প্রশ্রয় দেবেন এটি জানা কথা। অন্তিমে এরা-সবাই ডানপন্থি। আমরা যদি যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম ব্যবস্থা না নিই তাহলে সরকার এদের পৃষ্ঠপোষকতা দেবেই। আমাদের ব্যবস্থাটি হলো সামাজিকভাবে তাদের বয়কট করা। এবং প্রতিনিয়ত তাদের দুষ্কর্মগুলো বয়ান করা ও বিচার দাবি করা। সরকার যতই ক্ষমতাশালী হোক জনমানুষ চাইলে বিচার হবেই। জনদাবি না মানলে কী হয় পাকিস্তান ও এর প্রেসিডেন্ট মোশারফ এর সাম্প্রতিক উদাহরণ। যুদ্ধাপরাধ বিচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের লজিক ফিরিয়ে না আনলে এ রাষ্ট্র স্বাভাবিক হবে না। দুর্নীতি দমনেও কিছু হবে না। চুরি ও খুন দুটিই অপরাধ। কিন্তু কোনটি বড় অপরাধ তা নির্ণয়ের দায়িত্ব শাসকদের এবং এটিই সুশাসনের একটি নিরিখ।

২.৬.০৮

যে দেশে রাজাকার বড়

এদেশে, যে দেশের নাম বাংলাদেশ, সে দেশে এখন রাজাকার বড়, মানুষ নয়। নিজামীর জামিনে মসৃণ মুক্তির পর এ কথা বিশেষভাবে মনে হলো। রাজাকার আর মানুষে তফাৎ আছে। মানুষ এ দেশে হাজার বছর ধরে ছিল, হয়তো থাকবে আরও হাজার হাজার বছর। হয়তো, শব্দটি ব্যবহারে যুক্তি আছে। কারণ এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতো রাজাকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বস্তরে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে সে সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

একটা সময় কিন্তু ছিল যখন এ দেশে রাজাকার ছিল না। রাজাকার বিষয়টি দূরে থাকুক, শব্দটি ছিল অপরিচিত। নতুন ফসলের মতো এই শব্দটির বীজ বোনা হয়েছিল ১৯৭১ সালের সেই সব ভয়াবহ দিনগুলোয়। 'রাজাকার' শব্দটির অর্থ স্বেচ্ছাসেবী। কিন্তু সুন্দর একটি শব্দের অর্থ কীভাবে বদলে ভয়ঙ্কর হয়ে যায় তার উদাহরণ এই শব্দটি।

বর্তমান প্রজন্মের জ্ঞাতার্থে বলি, মুক্তিযুদ্ধের মরণপণ দিনগুলোতে রাজাকার কিসের স্বেচ্ছাসেবী ছিল? সে ছিল হানাদার বাহিনীকে বাঙালি রমণী ধর্ষণে সহায়তা করার স্বেচ্ছাসেবী। সে ছিল আলবদর ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বাঙালি নিধনে সহায়তাকারী। সে ছিল এসব লুটেরার লুট করতে সাহায্য করার স্বেচ্ছাসেবী।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী থেকে এদের অবস্থান ছিল অধস্তন। মূলত এদের কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেওয়া ও হানাদার পাকিস্তানি 'মোছুয়া'দের ক্রীতদাস হিসাবে তাদের সেবা করা। 'রাজাকার'-এর পাশাপাশি সে সময় ছিল আরেক ধরনের রাজাকার, যাদের সে সময় বলা হতো আলশামস, আলবদর-সরাসরি এদের উল্লেখ করা হয় 'ডেথ স্কোয়াড' হিসাবে। কিছু রাজাকার এবং আলবদর-আলশামস এখন আমাদের কাছে পরিচিত যুদ্ধাপরাধী হিসাবে।

এখানে উল্লেখ্য, রাজাকার উৎপাদনের মূল ফ্যাক্টরি ছিল জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ, পিডিপি প্রভৃতি ছোট কিছু দল। পুরো জামাতই ছিল পাকিস্তানিদের সহযোগী। তখন এবং এখনও, এমন একজন জামাতি পাওয়া যাবে না, যে পাকিস্তানের পক্ষে নয়। এ দিক থেকে দেখলেও তারা বাঙালি থেকে ভিন্ন।

স্বাধীনতার পর রাজাকার শব্দটির অর্থ বদলাতে থাকে। আলশামস, আলবদর থেকে রাজাকার শব্দটি উচ্চারণ করা যায় সহজে। তাছাড়া যুদ্ধের সময় আলবদর-আলশামস থেকে রাজাকারের সংখ্যা ছিল বেশি এবং তৃণমূল পর্যায় রাজাকার সৃষ্টি করায়, শব্দটি পরিচিত ছিল বেশি। ফলে আস্তে আস্তে শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। প্রাক-স্বাধীনতার পর্বে 'রাজাকার' শব্দটি ব্যবহৃত হতো সংকীর্ণ অর্থে। এখন

শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাপক অর্থে। এখন পাকিস্তানিমনা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অস্বীকার, পুরনো রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী ও এদের সমর্থনকারী-সবাইকেই রাজাকার অভিধায় অভিহিত করা হয়।

দুই

এ পটভূমিকা দিতে হলো সাম্প্রতিক একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতারকৃত যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। এ ঘটনায় হার্ডকোর জামাতি বিএনপির ক্যাডাররা ছাড়া সবাই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাদের ভাষ্য অনুসারে, একই ধরনের মামলায় অন্যরা দণ্ড পায়, জামিন পায় না, পেলেও তাদের বিরুদ্ধে ত্বরিত আপিল করা হয় কিন্তু নিজামীর বেলায় কিছুই হয় না। শুধু তাই নয়, তিনি মুক্তি পেলে তার সমর্থকরা রাস্তা আটকে রেখে মিছিল করে, কিন্তু জরুরি আইন ভঙ্গ হয় না। এই ঘটনায় সরকারের অর্জন যদি কিছু থেকেও থাকে তা ভেস্তে গেছে এবং সরকারের দ্বৈত চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, জামাত যে শক্তিশালী তাদের অনুগত সমর্থক বিএনপি থেকেও, তাও প্রমাণিত হয়েছে। কারণ একই ধরনের মামলায় খালেদা জিয়া জামিন পাননি।

জামায়াত কী এবং নিজামী কে? হয়তো এ প্রশ্নের উত্তর অনেকে জানেন। কিন্তু অনেকে হয়তো জানেনও না বা ভুলে গেছেন তাই এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে জামাতের সৃষ্টি। যে পাকিস্তানের এখন এরা সমর্থক এবং যে পাকিস্তান ও সৌদি আরবকে তারা ইসলামের প্রতীক মনে করে ১৯৪৭ সালের আগে তারা সেই পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিল। তারা ছিল ঔপনিবেশিক প্রভুদের পক্ষে।

পাকিস্তান হওয়ার পর জামাতের প্রধান মওদুদী পাততাড়ি গুটিয়ে পাকিস্তানে চলে আসেন এবং পাকিস্তানের দুই অংশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তাদের প্রথমদিককার একজন রিক্রুট হচ্ছে রাজাকারশ্রেষ্ঠ যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম। মওদুদী ইসলামের অপব্যাখ্যা করে, দাঙ্গা লাগিয়ে অর্থাৎ রাষ্ট্রে অরাজকতা সৃষ্টি করে ক্ষমতায় যেতে ইচ্ছুক ছিলেন। সৌদি অর্থপ্রাচুর্যের কারণে জামাত ওয়াহাবিবাদের সমর্থক হয়ে ওঠে। এখানে উল্লেখ, ১৯ শতকেও যে পূর্ববঙ্গে ওয়াহিবিবাদের প্রচলনের চেষ্টা হয় নি তা নয়, কিন্তু তখন সৌদিদের ওয়াহাবিবাদ প্রচারের জন্য অর্থ ছিল না। একক রাষ্ট্র ছিল না আর এখানকার 'ভেতো বাঙালি' এই ইসলাম পছন্দও করেনি। পাকিস্তান হওয়ার পর জামাতি ওয়াহাবিদের কাছে সে সুযোগ খুলে গেল।

মওদুদীকে দাঙ্গা করার অপরাধে গ্রেফতার, বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু সামরিক শাসকদের অধীনে মিত্র থেকে কাজ করার আঁতাত করলে তা রদ করা হয়। সেই থেকে শুরু। আইয়ুব-ইয়াহিয়া খানের সময় জামাতিরা তাদের অনুগত হয়ে দাঁড়ায়। শাসকরা ধর্ম ব্যবহার করে মানুষকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল। জামাত তাতে পরিপূর্ণভাবে সাহায্য করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে গোলাম আযমের নেতৃত্বে

জামাত হানাদার বাহিনীর অংশ হয়ে দাঁড়ায়। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের ছিটে আসে তাদের হাতে। চার লাখ ধর্ষণের দায়ও তাদের। অসংখ্য লুটপাটের কথা আর নাই বা বলা হলো।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুই উপমহাদেশে প্রথম ব্যক্তি যিনি ধর্মের অপব্যবহার রোধে ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। জামাতের মৃত্যু তখনই প্রায় হয়েছিল। খুনিরা যত্রতত্র পালিয়েছিল। খুনিদের বিচার শুরু হয়েছিল। সামরিক বাহিনীকে তার জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছিল। আর এসব কারণেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল সেনাবাহিনীর একাংশের সেনা কর্মকর্তারা।

সেই সেনা কর্মকর্তাদের পথ ধরে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন জিয়াউর রহমান। যেহেতু তিনি ছিলেন বীরউত্তম সে জন্য প্রথমে মানুষ তাকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু অচিরেই তার আসল রূপ প্রকাশ পেয়েছিল।

জিয়াউর রহমান এসেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চালু করলেন। যত্রতত্র খাল কাটার সঙ্গে সঙ্গে রাজাকারদেরও ধরে আনতে লাগলেন। মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ বছরের মাথায় জিয়াউর রহমান একজন রাজাকারকে প্রধানমন্ত্রী ও কয়েকজন যুদ্ধাপরাধী খুনিকে মন্ত্রী করলেন। রাজাকার শব্দটি পুনঃপ্রবর্তন, সমাজে রাজাকারদের গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা এবং পরিণামে সমাজকে সংঘাতময় করে তোলার ক্ষেত্রে জেনারেল জিয়াউর রহমানের অবদান ভোলার নয়। জেনারেল জিয়া এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় প্রমাণ করেছিলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য যা গুরুত্ববহ, তা হলো মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সহজ, মুক্তিযোদ্ধা থাকাটাই কঠিন। শুধু তাই নয়, স্বেচ্ছায় নয়, তাদের অনেকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। কারণ সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশে বিশ্বাসী কেউ আর যাকেই সমর্থন করুক জামাতকে সমর্থন করতে পারে না।

জামাত জিয়াউর রহমানের প্রচেষ্টায় তাদের কাজ শুরু করে। জেনারেল এরশাদ তাদের সমর্থন জানান ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে। এ সময় জামাত ধীরে ধীরে তার অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করে। প্রশাসনের সব পর্যায়ে অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা নেয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ করে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের সহায়তায় 'দখল' করে। এ সময় তারা আবার হত্যা-জখমের রাজনীতি পুনঃপ্রবর্তন করে। আইএসআইয়ের হয়ে বাঙালি ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করে। জিয়া-এরশাদের কারণে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রেও তারা স্থান করে নেয়। এ সময় তারা বিরোধীদের দমন করার জন্য পায়ের রগ কেটে দিত। রগ-কাটা রাজনীতি বাংলাদেশে তারাই চালু করে।

এরশাদের পর খালেদা জিয়া একজন রাজাকারকে প্রেসিডেন্ট করে যাত্রা শুরু করেন এবং জামায়াতিদের গুছিয়ে সতে সহায়তা করেন। ২০০১ সালে জামাতিদের রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার করেন। জামাত বিরোধীদের নির্মম হস্তে দমন করে তার পরিবার, বিএনপির সমস্ত মন্ত্রী ও তাদের আজ্ঞাবহ সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র। বস্তুত শেষোক্তরাই জোরদবরদস্তি মানুষের অধিকার দমন করে ক্ষমতায় আনে জোটকে।

বিনিময়ে তারা প্রত্যেকে পায় খুন ও লুট করার লাইসেন্স। অতিরঞ্জন নয়, জোটের হাতে কতজন নিহত, আহত, ধর্ষিত হয়েছে হতার হিসাব নিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। বেগম জিয়ার আমলেই গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব ফেরত দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট, ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, সব সময় সামরিক বাহিনীর তল্পিবাহক হয়ে কাজ করেছে। এটি আদালত অবমাননাকর মন্তব্য নয়, এটি 'ফ্যাক্ট'। সামরিক আইনকে বিচারকরা এ দেশে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনে গিয়ে নির্বাচনে কারচুপিতে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সামরিক প্রতিনিধিদের হয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন যেমন, আহসান উদ্দিন। বস্তুত বাংলাদেশই হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম দেশ যেখানে জেনারেল ও জাস্টিসদের আঁতাত দেশকে সংঘাতময় করে তুলেছিল এবং তুলেছে।

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন জামায়াতের হিংস্র ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি। ১৯৭১ সালে সেই সূত্রে হানাদার বাহিনীর ডেথ স্কোয়াড আলবদরদের প্রধান। এই আলবদর বাহিনী আমার শিক্ষকদের, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত আমরা নিজামীর কোনও খোঁজ পাইনি। তার এই পর্বটি রহস্যাবৃত। আমরা জানি এই সময় রাজাকারদের একটা বড় অংশ, আলবদর ও আলশামস যারা সুযোগ পেয়েছিল তারা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। নিজামীর দল থেকে বলা হয় তিনি আলবদর ছিলেন না। তাহলে ওই সময়টা কোথায় ছিলেন? জিয়া ক্ষমতায় পাকাপোক্ত হলে নিজামী গোলাম আযমের সহকারী হিসাবে কাজ শুরু করেন। গোলাম আযম অবসর গ্রহণ করলে তিনি হন জামায়াত প্রধান বা আমির। বেগম জিয়া তাকে নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। শুধু তাকে নয়, ১৯৭১ সালের সহকারী আলবদর লিডার মুজাহিদকেও মন্ত্রী করা হয়। জিয়ার সময় জামায়াত ক্ষমতার অংশীদারী ছিল না। বেগম জিয়ার সময় তারা ক্ষমতার অংশীদার হয়। এভাবে বেগম জিয়া তার স্বামীর আরব্ধ কাজ সমাপন করেন।

ক্ষমতার অংশীদার হয়ে বিএনপি যতটা ফায়দা লুটেছে তার চেয়ে বেশি ফায়দা লুটেছে জামাত। জোটের অংশীদার হিসাবে তারা প্রবল লুটপাট, খুন-খারাবিতে অংশ নিয়েছে একদিকে, অন্যদিকে প্রশাসন থেকে অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে তাদের সমর্থক/ক্যাডারদের বসিয়েছে। বিচারালয়ও বাদ দেয়নি। জোটের শাসনের শেষ দিকে প্রধান বিচারপতি মোদাচ্ছিরের কর্মকাণ্ড এবং কিছুদিন আগে জামাতের জাল মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের সভায় তার উপস্থিতি এর বড় প্রমাণ।

তবে জোট আমলে জামাত বাংলাদেশ-চেতনাবিরোধী সবচেয়ে বড় কাজ করেছে সেটি হচ্ছে জঙ্গিবাদকে সহায়তা করা এবং জঙ্গিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া। 'বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি' এ উক্তি নিজামীর। জঙ্গিদের দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনাকে কয়েকবার খুনের চেষ্টাও করা হয়েছে। ভাগ্যের পরিহাস, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর, যিনি নিজামীদের ক্ষমতা সংহতকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, তিনি আজ জেলে। নিজামী মুক্ত। এবং নিজামীর মুক্তি গারদের জানালা দিয়ে দেখতে হয় বাবরকে।

এ অধ্যায়ের উপসংহারে বলা হয় যে, জন্ম থেকেই জামায়াত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। ১৯৭১-৭৫ ছাড়া। বিশেষ করে সামরিক শাসকদের। এদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া জামাতের বাংলাদেশবিরোধী ভাবধারা প্রচার, জঙ্গিবাদের উত্থান কিছুই সম্ভব হতো না। শুধু তাই নয়, জামাত পাকিস্তানি ভাবধারা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়নি। অর্থাৎ জামাতি বা রাজাকারী ধ্যানধারণার বিপরীত হলে তাকে হত্যা বা পঙ্গু বা ভীত করতে হবে। তাদের ধর্মদ্রোহী বা মুরতাদ ঘোষণা করতে হবে। জামাতের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে 'আন্দোলন' সৃষ্টি করবে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের সঙ্গে তারা কোরআন পুড়িয়েছিল। বছর কয়েক আগে আহমদিয়াদের কোরআন সংগ্রহ পোড়ানো হয়েছে। জামাতের অর্থ রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক করে তুলতে হবে। সংখ্যালঘুকে জিম্মি রেখে ফায়দা লুটতে হবে। নারীদের ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করতে হবে। জামাতের অর্থ সৌদি আরবের আনুকূল্য পেতে হবে। পাকিস্তান না চাইলেও তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। সেটি সম্ভব না হলে পাকিস্তান ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে হবে। নায়েব, আমির এসব নামে মধ্যযুগীয় লোকদের মতো রুলিং এলিট তৈরি করতে হবে। লক্ষ করুন, নেতাদের পদের নামকরণ এভাবে করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ ভয় পায়। কারণ বাঙালির ওপর এসব নামধারী মানুষ যুগযুগ ধরে অত্যাচার করে আসছে। এককথায় মুক্ত মনের মানুষকে পাথর চাপা দিয়ে রাখতে হবে।

এ কারণে দেখা যায়, জামাতের কার্যকরী সংসদের অধিকাংশ সদস্য যুদ্ধাপরাধী।

নিজামী যৌবন থেকে জামাতের এই ধারণা কার্যকর করেছেন। ১৯৭১ সালে তার খুন-খারাবি ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এলাকার মানুষ তার নাম দিয়েছিল মইত্যা রাজাকার। ধীরে ধীরে জামাতের সেই মইত্যা রাজাকার আমির হয়েছেন, রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়ে বিএনপির সঙ্গে ১৯৭১ সালের মতো হত্যা ধর্ষণ লুটের নেতৃত্ব দিয়েছেন, জঙ্গিবাদের ভিত্তি দৃঢ় করেছেন।

তিন

বর্তমান সরকার ওয়ান ইলেভেন নামে মার্কিনি ঢংয়ে একটি শব্দ চালু করেছিল মিডিয়া যা লুফে নিয়েছিল। ওয়ান ইলেভেনকে তারা একটি প্রত্যয়ে রূপ দিয়েছিল। এই প্রত্যয়টি অর্থ তাদের মতে, দুর্নীতির অবসান, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র দৃঢ়করণ, অপরাধীদের শাস্তি প্রধান এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে সুষ্ঠু নির্বাচন। বলা হয়েছিল এটি সেনাসমর্থিত সরকার। সেনাপ্রধান পরে একবার বলেছিলেন, এটি সেনাসমর্থিত নয়, কারণ সেনারা তো সরকারের অধীন। এটিকে বরং তত্ত্বাবধায়ক-সামরিক সরকার বলাই বাঞ্ছনীয়। তবে সেনারাও সেনাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা পরিচালিত যা পত্রিকায় বেরিয়েছে এবং এ বিষয়ে কোনও রাখঢাক নেই। মিগ-২৯ মামলায় শেখ হাসিনার কৌসুলি ব্যারিস্টার শফিক আহমদ বলেছেন, "ডিজিএফআই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এ মামলা করা হয়েছে। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর ডিজিএফআইর

রিপোর্ট দেওয়ার এখতিয়ার নেই।....এ মামলায় মনে হচ্ছে ডিজিএফআইর মতামত ছাড়া সরকার কোনও কাজ করতে পারে না। তিনি বলেন, এমনও তো হতে পারে অন্য কোম্পানির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে গোয়েন্দা সংস্থাটি রিপোর্ট দিয়েছে।" (সমকাল ১৭.০৭.০৮)

ব্যারিস্টার শফিক আহমদ প্রকাশ্য আদালতে যা বলেছেন সাধারণ মানুষ সেটি জানে। সেটি বিশেষভাবে পরিষ্কার হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত তাণ্ডবের মাধ্যমে।

অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটিয়ে যখন ড. ফখরুদ্দীন ক্ষমতা নিলেন তখন সবাই ভেবেছিল তিন মাসের মধ্যে গণতন্ত্র ফিরে আসবে এবং জরুরি অবস্থা স্থিরতা ফিরিয়ে আনবে। সবাই ভেবেছিল, জোটের ভয়ঙ্কর শাসকদের লুটপাট হত্যার জন্য গ্রেফতার করা হবে। গ্রেফতার শুরু হলো, তারপর দেখা গেল গত দু দশকের হিসাব ধরে আওয়ামী লীগ নেতাদেরও গ্রেফতার করা হচ্ছে। দুদক পুনর্গঠিত হলো ঠিকই কিন্তু সেখানে সেনাকর্মকর্তা বসান হলো, যিনি প্রধান হলেন তার নেতৃত্বে জোট আমলে ক্লিনহার্ট অপারেশনে ৫২ জনের মৃত্যু হয় সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে যার প্রচুর উল্লেখ আছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা, বিবিসি ও সংবাদপত্রের রিপোর্টে। এবং এর যাতে বিচার না হয় সে জন্য দায়মুক্তি পাস করানো হয়েছিল মওদুদ আহমদকে দিয়ে। এর আগে আরেকবার সেনা কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার জন্য ১৯৭৫ সালে। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত হলো কিন্তু সেখানেও সেনা কর্মকর্তা, উপদেষ্টামণ্ডলী, প্রশাসনের বিভিন্নখানে বসান হলো ভারতবিরোধী সেনাকর্মকর্তাদের। দুর্নীতিবাজদের ধরার দায়িত্বও দেওয়া হলো তাদের।

কিছু দিনের মধ্যে দেখা গেল বিএনপির তাদেরকেই ধরা হয়েছে যাদের না ধরলেই নয়। কিন্তু অধিকাংশকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ সাইফুর রহমান বা মেজর হাফিজ, খোন্দকার দেলোয়ার যাদের নামে 'প্রথম আলো' ও অন্যান্য পত্রিকা ভূরিভূরি দুর্নীতির রিপোর্ট ছেপেছে। আওয়ামী লীগের অনেককে গ্রেফতার করা হলো। কিন্তু জামাত ও তাদের [নাম বলা যাবে না] ধরা হলো না। শেখ হাসিনা ডিজিএফআইয়ের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় তাকে গ্রেফতার করা হলো। তারপর বাধ্য হয়ে বেগম জিয়াকে। কিন্তু নিজামী বা মুজাহিদকে নয়।

ব্যবসায়ীদের প্রাথমিকভাবে ধরলেও তাদের ছেড়ে দেওয়া হতে লাগল। সিন্ডিকেট করে ব্যবসায়ীরা এগোতে থাকলেন। তথাকথিত ওয়ান ইলেভেনের পর এমন এক সপ্তাহও যায়নি যখন পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়েনি। এখন তা এমন পর্যায়ে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রায় না খেয়ে থাকছে। কিন্তু শাসকদের [নাম বলা যাবে না] এ নিয়ে মাথাব্যাথা ছিল না; কারণ চাল তাদের প্রায় বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। এরপর ধুয়া উঠল, মাইনাস টু থিয়োরি। তারা নিশ্চিত ছিল মাইনাস টু হয়ে যাবে। যে কারণে ফেরদৌস কোরেশীকে মাঠে নামান হলো। দুদক, নিজের আইনেরও তোয়াক্কা না করে অনেককে

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে। কাউকে শুধু গ্রেফতারই নয়, অনেকের, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও তাদের না পছন্দের বিএনপির নেতাদের দণ্ডও দেওয়া হয়ে গেছে। এবং সম্প্রতি ঘোষণা করা হলো নিম্ন আদালত দণ্ড দিলেই তারা নির্বাচন করতে পারবে না। এতে পরিষ্কার যে এই উদ্দেশ্যেই সব কাজ করা হয়েছে। অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন তাঁর 'রিমান্ড ও কারাগারের দিনলিপি' বইতে লিখেছেন কামরুল নামে এক মেজর তাকে বলছিলেন, রায় আবার কী? আমি যা বলি তাই লেখা হয়। আদালতে আদালতে বিশেষ লোকদের [নাম বলা যাবে না] বসে বিচারক ও পিপিকে নির্দেশ দিতে আমি দেখেছি। দুদক প্রধান প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে ইঙ্গিতে বলেছিলেন, কোনও আইনজীবী যাতে সমর্থন না করে অভিযুক্তদের। এভাবে এই সরকার আইনের শাসন প্রবর্তন করতে থাকল।

সমস্যা হলো, মানুষজন মাইনাস টু উপেক্ষা করে প্রশ্ন তুলতে লাগল, জামাত নেতাদের কেন ধরা হচ্ছে না? এখন, মাইনর দু'একজন জামাতি নেতাকে ধরা হলো। জামায়াত বিএনপিকে ছেড়ে গত দেড় বছর ঘাপটি মেরে ছিল। সরকারের কোনও সমালোচনা করেনি। ক্রমে, জনরব হলো যে, এই সরকারের প্রবল ঝোঁক জামাতের প্রতি এবং অরাজনীতির প্রতি। তাদের রাজনীতি হচ্ছে, দেশে আমলাতন্ত্রের প্রবল প্রতিপক্ষ কেউ থাকবে না, বিশেষ করে তাদের [যাদের নাম বলা যাবে না] কিন্তু বহির্বিশ্বে সেনা রফতানি যাতে বন্ধ না হয় ও বৈদেশিক সাহায্য অক্ষুণ্ন থাকে সে জন্য কিছু রাজনীতি থাকবে যে রাজনীতির কর্ণধাররা হবেন মেজর হাফিজরা, নিজামীরা, কোরেশীরা। একমাত্র প্রবল প্রতিপক্ষ তারা মনে করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কারণে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মতো ২০০৬ সালের ২০-২৩ আগস্ট আক্রমণ চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর–এই উক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যদের এবং সিনেটে প্রস্তাব পাস হয়েছে যে, প্রতি বছর ওই দিনটি নির্যাতন প্রতিবাদ দিবস হিসাবে পালিত হবে।

এসব বিষয়ে যখন জনমনে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয় তখনই হঠাৎ কর্ণধাররা মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে কথা বলা শুরু করেন। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও মুক্তিযুদ্ধ মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি, সে জন্যে তারা জামাতকে ঘৃণা করে। এদের বিরূপ করে বাংলাদেশে এগোনো মুশকিল। হঠাৎ এক সকালে লক্ষ করা গেল, সেনাপ্রধান, প্রধান উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশন প্রধান মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু বিষয়ে মন্তব্য করতে লাগলেন। তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন। মিডিয়ায় তাদের প্রশংসার বান ছুটল। আমাদের অগ্রজ ও বন্ধু কলামিস্টরা কীভাবে তাদের স্তুতি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আমি তাদের অনেককে বলেছিলাম, আমাদের দেশের তারা [নাম বলা যাবে না] মানসিকভাবে উদ্বাস্তু। তারা বাঙালিদের কখনই সমর্থন করতে পারে না। যদি সমর্থন করতেই হয় তাহলে ফ্রন্ট হিসাবে বিএনপি-জামাতকেই করবে। যারা একই নীক্তিতে বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমান এবং শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া এবং নিজামীকে মাপে তারা আর যাই হোক সৎ নয় অথবা বিভ্রান্ত। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ঘোষণার পর পুরনো সামরিক কর্মকর্তারা 'সেক্টর কমান্ডার ফোরাম' গঠন

করলেন। সবই হলো কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু হলো না। রাজাকাররাই সব ধরনের সহায়তা পেতে লাগল। একটি উদাহরণ দিই। আইয়ুব মিয়া নামে একজন সচিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি আলবদর ছিলেন। এই খবর পাওয়ামাত্র সরকার তাকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করল। ইসলামী কয়েক জঙ্গির টাকা নিয়মিত পাচার করছে প্রমাণিত হওয়ার পর ইসলামী ব্যাংককে মাত্র এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। আর অন্য [ব্যক্তি] পাচারকারী হিসাবে অভিযুক্তদের ছাড়া ব্যাংকিং ব্যবসা করছে কিন্তু সরকার নীরব। ফলে এ ধারণা আনুমোদন সঙ্গে সঙ্গে জেলে পোরা হয়। জামাতের ফয়সাল ইনভেস্টমেন্ট কোনও রকম অনুমোদন করা মুশকিল হয়ে পড়ল যে, সরকার স্থায়ভাবে থাকতে আসেনি। এখন সেক্টর কমান্ডাররা প্রকাশ্যে বলেছেন, সরকারের ওই ঘোষণায় তারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। সরকারের দ্বিচারিতা এখন তারা বুঝতে পেরেছেন। রাজনীতিতে তারা [নাম বলা যাবে না] নিজামী, হাফিজ, ড. কামাল হোসেন, কোরেশীদের দেখতে চায় বিশেষ করে দলগতভাবে বিএনপিকে যাদের আদর্শের সঙ্গে জামাতের আদর্শের তেমন অমিল নেই।

চার

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি নতুন নয়। ১৯৭২ সাল থেকেই এ দাবি করে আসা হচ্ছে। বিচার শুরুও হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের পর থেকে সব ভেস্তে গেছে। গত শতকে নব্বইয়ের দশকে জাহানারা ইমামে নেতৃত্বে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন তুঙ্গে পৌঁছে গণআদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে। ঝিমিয়ে পড়া যুদ্ধাপরাধীদের দাবি আবার গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দল সম্পৃক্ত না হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভব নয়।

স্বাভাবিকভাবেই ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিকে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাষ্ট্রের গভীরে পাকিস্তান কীভাবে লুকিয়ে আছে তার একটি উদাহরণ দিই। ডিজিএফআইয়ের প্রাক্তন এক অফিসার আবু রুশদ 'র ইন বাংলাদেশ' নামে একটি বই লিখেছেন এবং সেখানে এই আন্দোলনকে ভারতীয় 'ষড়যন্ত্র' ('র অ্যাক্টিভিটিজ ইন বাংলাদেশ') বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ আন্দোলনে অনেক সময় অনেকে যোগ দিয়েছেন, পরে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন। এ আমলে 'সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম' হয়েছে এবং তারাও একই লক্ষ্যে কাজ করেছেন। আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি যাই হোক, যুদ্ধাপরাধ ও যুদ্ধাপরাধী প্রত্যয়টি আমাদের ডিসকোর্সে এসেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখন বিচারের পক্ষে। বিএনপি ছাড়া প্রায় সব রাজনৈতিক দলই ঘাতক দালাল বা যুদ্ধাপরাধী বা খুনিদের বিচারের দাবি করছেন। সরকারের ওপর ক্রমাগত কিছু করার একটা চাপ পড়ছিল। তা ছাড়া জামাত পরিচিত হয়ে যাচ্ছিল সরকারের এজেন্ট হিসাবে বা উল্টোটা। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিজামীকে গ্যাটকো মামলায় গ্রেফতার করা হয়। জামায়াত আবার

প্রকাশ্যে সরকার বিরোধিতার সুযোগ পায় এবং বিএনপির সঙ্গে জোট বাঁধে। সরকার যে কাজটি ইচ্ছাকৃত করেছে তার প্রমাণ প্রকাশ্যে মৌলবাদীরা মিছিল করে, ভাঙচুর করে কিন্তু জরুরি আইন ভঙ্গ হয় না, সরকারি কর্মচারী খতিবের নেতৃত্বে বিভিন্ন সংগঠন জামাতের গোপন সহযোগী সরকারের নারী নীতির বিরোধিতা করে, সরকারের উপদেষ্টা প্রায় হাত জোড় করে নারী নীতি স্থগিত রাখেন, জামাতিরা বিভিন্ন জায়গায় মিছিল করে, সরকার নিশ্চুপ। নিজামী ঘোষণা করেন, সরকার পাঁচ হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে আগের সরকারের মতো। সরকার তাতে ক্ষুব্ধ হয় না। নিজামীর মুক্তিতে রাস্তা বন্ধ করে মিছিল সমাবেশ হয়, জরুরি আইন ভঙ্গ হয় না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার অবমাননার বিরুদ্ধে প্রাক্তন উপদেষ্টা সুলতানা কামালসহ ছোট একটি মিছিল পুলিশ আটকে দেয়।

নিজামী যখন গ্রেফতার হয় তখন আমরা অনেকেই লেখালেখি করেছিলাম, এই বলে যে, নিজামীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতেই এই গ্রেফতার। নিজামী নিজেও স্বীকার করেছেন, জীবনে অনেক কিছু করেছেন কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গ্রেফতার হননি। এখন তার আর ক্ষোভ নেই, জীবনে পূর্ণতা এসেছে। এ মামলা যে টিকবে না এ নিয়েও লেখালেখি হয়েছিল। এ মামলা টিকলে বাংলাদেশে কেউ সরকার চালাতে পারবে না। কারণ এর ফলে ড. ফখরুদ্দীনসহ সবাইকেই পরবর্তীকালে মামলার মুখোমুখি হতে হবে। তবে সুযোগটা জামাত কাজে লাগিয়েছে। নিজেকে তারা এখন সরকারবিরোধী বলে প্রমাণ করতে চাইছে। কারণ সরকারের গ্রহণযোগ্যতা এখন প্রায় বিলীন। সরকার নিজামীর বিরুদ্ধে অন্য অনেক মামলা দিতে পারত, যার ফলে জামিনও কষ্টসাধ্য হতো যেমনটি হয়েছে অন্যদের বেলায়। অন্য যারা গ্রেফতার হয়েছে কমপক্ষে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অর্ধডজন মামলা আছে। নিজামীর বিরুদ্ধে একটি মাত্র দুর্বল মামলা।

সুতরাং নিজামী জামিন পেলেও অবাক হইনি। পূর্বাপর সব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এটাই স্বাভাবিক। বর্তমান সরকার তার এজেন্ডা থেকে একচুলও নড়েনি আওয়ামী লীগ বা ১৪ দল যত খুশিই হোক না কেন শেখ হাসিনার মুক্তিতে? এর একটি উদাহরণ, উপজেলা নির্বাচনের ঘোষণা। সরকার এ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের এজেন্টদের স্থান করে দিতে চায় রাজনীতিতে। মিডিয়ায় এই খবর এসেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করলেন, জরুরি অবস্থার মধ্যে নির্বাচন হবে। জামাত ও তার সহযোগীরা আবার ভারতবিরোধী প্রচারণায় নেমেছে। জোট আমলে জামাত ও তার কোনও অঙ্গসংগঠন ভারতের বিরুদ্ধে কিন্তু কোনও কথা বলেনি।

নিজামীর বর্তমান আশু মুক্তির ব্যাপারে যে সরকারের হাত আছে তা প্রথম আলোর ১৮ জুলাইয়ের রিপোর্টে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে দেখানো হয়েছে। পত্রিকাটি মন্তব্য করেছে, 'জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ভাগ্যবান। গত বছর দেশে জরুরি অবস্থা জারির পর তার মতো করে আর কোনও রাজনৈতিক নেতা এত দ্রুততার সঙ্গে জামিন পাননি।' নিজামী এতই ক্ষমতাধর যে, জামাতের জাল সংগঠন জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের সভায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নিন্দার প্রতিবাদ করায়

একজন মুক্তিযোদ্ধাকে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা লাথি মারে, প্রহার করে। নিজামীর মুক্তি ও এ ঘটনা সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা তো বটেই বাংলাদেশের মুখেও লাথি মারার শামিল এবং সরকার স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চুপ। এমনকি ড. কামাল হোসেনও বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। বিবিসিতে তিনি নিজামীকে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ও যুদ্ধাপরাধী' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। আসলেও তাই। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, আমাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে প্রাক্তন আলবদর নেতা মুজাহিদ ঘোষণা করতে পারেন, 'বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী নেই, এ ধরনের চিন্তাও বানোয়াট।' যুদ্ধাপরাধী না থাকলে মুক্তিযুদ্ধও থাকে না। আর বাঙালী কী থাকে? সভা-সমাবেশে মুক্তিযোদ্ধারা একটি স্লোগান দেন, যা ত্রিশ বছর শুনে আসছি, 'মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার।' হাতিয়ার গর্জাবে না, তাতে মরচে পড়ে গেছে। হাতিয়ার চালু করতে চাইলে স্লোগান না দিয়ে তার মরচে পরিষ্কার করাই যুক্তিযুক্ত।

নিজামী মইত্যা রাজাকার থেকে জামাতের আমির হয়েছেন। সংসদে যখন প্রথম প্রবেশ করেন তখন সংসদ সদস্যরা 'রাজাকার' 'রাজাকার' বলে তাকে সম্বোধন করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে নিজামী প্রায় কাপড়চোপড় খুইয়েছেন, কিন্তু তারপরও মন্ত্রী হয়েছেন। রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণতা আনার জন্য কিছুদিনের জন্য গ্রেফতার হয়েছেন এবং তারপর সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কারণে বেরিয়েছেন। তার 'মুক্তি'র আনন্দে তার ক্যাডাররা সরকারি প্রশ্রয়ে রাজপথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং সবশেষে তার ক্যাডাররা প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাকে লাঞ্ছিত করেছে। শুধু তাই নয়, নিজামী ঘোষণা করেছেন সরকার টাকা পাচার করছে। এ ক'টি মন্তব্য থেকে আশা করি বোঝা যায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি নৈতিকভাবে কতটা অধঃপতিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রে বাংলাদেশ চেতনাবিরোধী রাজাকার বা জামাতিরা কতটা শক্তিশালী। বেগম জিয়া অনেক বিষয়ে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দেখা যায় যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে তিনি আপসহীনভাবে নীরব।

নিজামী ও জামাত এখন যুদ্ধাপরাধের প্রতীক। আমরা তাদের বিচার চাই অন্তত একটি কারণে, সেটি হচ্ছে খুন, ধর্ষণের বিচার না হলে, রাষ্ট্রে খুন বা ধর্ষণ করা বৈধ হয়ে যায়। তখন আর সমাজের নৈতিকতা বলে কিছু থাকে না। এটি অস্বাভাবিক ঘটনা যা রাষ্ট্রের জন্য শুভ নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে অন্যের খুনের বিচার করা পক্ষপাতমূলক আচরণ হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে এ সমাজে, রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা, শান্তি কীভাবে আসবে?

আমরা প্রায় নিশ্চিত যে, এ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে না, করতে পারে না। কারণ তারা তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের সামনে এখন একটিই সুযোগ আছে, জামাতিদের রাজাকারতন্ত্র বা নষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠা রোধ করা। যদি নির্বাচন হয় তাহলে ভেদাভেদ ভুলে এবং ভোটের বাক্স রক্ষা করে যুদ্ধাপরাধী ও তাদের সমর্থকদের ভোট না দেওয়া। যারা বলেন বিএনপিতে মুক্তিযোদ্ধা আছে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেন।

জামাতিদের সাহায্য নেব, জামাত আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করব, অথচ নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলব এরকম তত্ত্ব একমাত্র সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশেই সম্ভব। বিএনপি এ কাজটি জেনেশুনেই করছে শুধু ক্ষমতার লোভে।

আমরা যারা নিজেদের মানুষ মনে করি, তাদের বেছে নিতে হবে জামাত ও তার সমর্থকদের (সে যেই হোক না কেন) রাজাকারতন্ত্র চাই, না গণতন্ত্র চাই। রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেও দেশে শান্তি আসবে সে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে রাজাকাররাও। কিন্তু তা হবে কবরের শান্তি। আর মানুষ যদি মানবেতর হতে না চায়, নিজের দেশের পতাকা লুকাতে না চায়, তাহলে গণতন্ত্রের উষ্ণতার জন্য সব ভুলে একযোগে রাজাকারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হতে হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনে রাজনীতিবিদ ও তাদের সমর্থকদের বাধ্য করতে হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে যে জনমত সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু আলিঙ্গনই নয়, ছড়িয়ে দিতে হবে। সিভিল সমাজই একমাত্র এ কাজটি করতে পারে। আর ক্রীতদাস হতে চাইলে মেনে নিতে হবে নিজামীদের অর্থাৎ রাজাকারতন্ত্রকে, মেনে নিতে হবে এ দেশে রাজাকার বড়, মানুষ নয়। এখন যার যা ইচ্ছা।

২৫.৭.২০০৮

১৯৭১ সালে বিজয়ীদের সঙ্গে থাকতে চাই

গত দু'সপ্তাহ ধরে দেশে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। মাস দেড়েক দেশের বাইরে ছিলাম। সে জন্যই হয়ত পরিবর্তনটা চোখে পড়ছে। গণমাধ্যমে প্রতিদিন যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে সংবাদ থাকছে। ১৯৭১ সালে তারা কী করেছিল তা মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিশোর, তরুণ, প্রবীণ সবাই এক সুরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করছেন। জামায়াত-বিএনপি জোট ছাড়া সব দল তাদের ঘোষণায় যুদ্ধাপরাধীদের ভোট না দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে এবং মহাজোট ঘোষণা করেছে ক্ষমতায় গেলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে। এমন কি চরমোনাইয়ের পীরও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করছেন। ১৯৭২ সাল থেকে আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে দাবি করছি, আজ ৩৭ বছর পর ডিসেম্বরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সমস্ত বিভ্রান্তি কাটিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির যৌক্তিকতা অনুভব করছেন। আজ যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে আছেন বেগম জিয়া ও তার দল বিএনপি বা এক কথায় চারদলীয় জোট। শুধু তাই নয়, দেখে শুনেই তারা প্রচুর যুদ্ধাপরাধীকে মনোনয়ন দিয়েছে। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে বেগম জিয়ার কল্যাণে ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় সংসদে যুদ্ধাপরাধীরা কালসাপের মতো কিলবিল করবে।

চারদলীয় জোট বিশেষ করে জামাত বিজয়ের মাসে নির্বাচন চায়নি। ডিসেম্বর এলেই তাদের পাগল পাগল লাগে। এরপর সেনাপ্রধান, প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। এতে জামাত খানিকটা বিচলিত। জনমতও প্রবল হয়ে উঠছে। জামাতী নেতাদের মাথাও বোধহয় খানিকটা আউলে গেছে। গত এক সপ্তাহে তারা বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। এসব মন্তব্য দেখে বোঝা যায় পৃথিবী এগিয়ে গেলেও জামাত ১৯৪৭-৭১ এর মধ্যেই আছে। জামাতের প্রাক্তন আমীর গোলাম আযম ও বর্তমান আমীর মতিউর রহমান নিজামী বোধহয় এ কারণেই আবারও ১৯৪৭ সালের যৌক্তিকতা বা দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছেন।

আটখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে গোলাম আযমের আত্মজীবনী 'জীবনে যা দেখলাম'। কী দেখেছেন জীবনে? পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য ইয়াহিয়া ভুট্টোকে তিনি দায়ী করেছেন ঠিকই তবে শেখ মুজিবের প্রতি তার ক্ষোভও ছিল কারণ, "স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার যখন কোন সিদ্ধান্ত ছিলো না, তখন ইয়াহিয়ার সাথে সংলাপকে ব্যর্থ হতে দিলেন কেন? প্রয়োজনীয় ছাড় দিয়ে হলেও সমঝোতায় পৌছা উচিত ছিলো।" অর্থাৎ বাংলাদেশের দরকার ছিল না, পাকিস্তান থাকাটাই ছিল জরুরি। রাজাকার ও শান্তি কমিটির

যৌক্তিকতা তিনি তুলে ধরেছেন, তাদের খুন খারাবি তার চোখে পড়েনি। মুক্তিযুদ্ধ হতো না বা পাকিরা এত নৃশংস হতো না যদি না মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ 'নির্বিচারে' অবাঙালিদের হত্যা করতো। পাকি জেনারেলদেরও মতও তা। কিন্তু, প্রশ্ন 'নির্বিচারে' হত্যা হলো কখন? আর নির্বিচারে হত্যা হলে দেশ বিদেশের পত্রিকায় তার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হলো না কেন? স্বাধীনতার পর আলবদর মঈনুদ্দীন (যে বুদ্ধিজীবীদের নিজ হাতে জবাই করেছে) আবদুস সুবহান প্রমুখের সঙ্গে বিদেশের মাটিতে তার যোগাযোগ ছিল এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের জামাতীদের সাহায্য করতেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, তার মতে, এখনও দ্বিজাতিতত্ত্বই ভালো। একথা এখনও তিনি বিশ্বাস করেন।

নিজামীর যুক্তি আরো সরেস। তার স্পষ্ট ঘোষণা 'কায়েদে আজমের দ্বিজাতিতত্ত্বে ভুল ছিল না।' তার মতে, শেখ হাসিনা বলেছেন, কোরান সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন করা হবে না। আবার '৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। তার এই বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। জামাতীরা কীভাবে বিভ্রান্তি ছড়ায় এটি তার উদাহরণ। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো যার যার নিজ ধর্ম পালনের অধিকার। মুসলমানের ধর্মবিরোধী আইন যেমন হবে না, হিন্দুরও হবে না। এ দেশে সবার নাগরিক অধিকার সমান থাকবে, এটিই নিজামী মানতে পারছেন না।

নিজামী ১৯৭১ সালে খুনীদের স্কোয়াড আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন। তার নেতৃত্বে এ দেশে বেছে বেছে বুদ্ধিজীবীদের [গণহত্যা সহ] হত্যা করা হয়েছে। একথা যখনই আমরা বলি তখনই জামাতের পক্ষ থেকে বলা হয় আলবদর বাহিনী ছিল না এবং সে কারণে নিজামীর আলবদর বাহিনীর প্রধান হওয়ার কথা ওঠে না। জামাতীরা যে বড় রকমের মিথ্যাবাদী এই উক্তি তার প্রমাণ। তাদের মুখপত্র 'সংগ্রামে'ই আলবদরদের কাহিনী লেখা আছে। উল্লেখ্য পাকিস্তানের সন্ত্রাসী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের টাকায় ১৯৬৯ সালে পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। '৭১-এ 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে পাঠানো পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার গোপন প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে জামাত কীভাবে আলবদর গঠন করেছে। পাকিস্তানি এক জেনারেলও উল্লেখ করেছেন–আইএসআইয়ের সঙ্গে জামাতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং ১৯৭১ সালে তারা কীভাবে আইএসআইয়ের হয়ে কাজ করেছে এবং যে নীতি থেকে এখনও তারা বিচ্যুত হয়নি।

যে পাকিস্তানিদের জামাতীরা পিতা মনে করে সে পাকিস্তানিরা আলবদর সম্পর্কে কী লিখছে? পাকিস্তানি গবেষক সৈয়দ ডালি রেজা নসর সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ করেছেন, নাম 'দি ভ্যানগার্ড অফ দি ইসলামিক রিভ্যুলেশন দি জামাত ই ইসলামি অব পাকিস্তান'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি লিখেছেন, জামাতের ছাত্রসংগঠন 'ইসলামি জামাত-ই তুলাবা' (বাংলা নাম–'ইসলামী ছাত্র সংঘ') সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা শুরু করে। এর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। মে, ১৯৭১ সালে

আইজেটি পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। সেনাবাহিনীর সহায়তায় তারা আলবদর বাহিনী গঠন করে। এর অধিকাংশ সদস্য ছিল আইজেটির সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অবাঙালি সম্প্রদায় থেকে প্রধানত সদস্য সংগ্রহ করা হতো। আইজেটির নাজিম ই আলা নিজামী এই বাহিনী সংগঠিত করেন। [পৃ. ৬৬] এরপর আর কত প্রমাণের দরকার জানি না। খুনিদের সংগঠনের প্রধানকে আরেক যুদ্ধাপরাধী মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহর 'ওলি'। শাহরিয়ার কবিরের 'যুদ্ধাপরাধ ৭১' দেখুন। পাবনার সাঁথিয়ার মানুষজন নিজামীর খুন বর্বরতার কী চিত্র তুলে ধরেছে দেখুন। এ রকম খুনী ও মিথ্যাবাদী 'ওলি' হলে বাংলাদেশের সব মানুষ ফেরেশতা।

আসলে জামাত প্রমাণ করতে চায়, ১৯৪৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমাদের দেশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আছে, ১৯৭১ একমাত্র বিচ্যুতি। অবশ্য এখন জনমতের চাপে পড়ে, নিজামী স্বীকার করেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি, শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু নন কিন্তু জিন্নাহ কায়েদে আজম।

১৯৭১ সালে আলবদর বাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান, জামাতের ছাত্র সংগঠনের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক, যুদ্ধাপরাধী মুজাহিদ বলেছেন 'যুদ্ধাপরাধী বলে কিছু নেই।' তার মানে কি মুক্তিযুদ্ধ হয়নি? এখনও আমরা পাকিস্তানে আছি? এই মুজাহিদের নির্মম বিভৎস আচরণের বিবরণ পত্র-পত্রিকায়ই প্রকাশিত হচ্ছে। নির্মম সত্যের মুখোমুখি হয়ে ১৪ ডিসেম্বর তিনি বলছেন, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মূল্যায়ন করতে হবে। কিন্তু তার এই মূল্যায়নে আমরা ভীত। এই মূল্যায়ন কি আবার বুদ্ধিজীবী হত্যা? আরেক যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছেন "কেউ সুন্দরী নারীর লোভে, কেউ ভারতীয় স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধ করেছে।" ভারত-বিদ্বেষ নিজামীর সাম্প্রতিক উক্তিতেও প্রকাশিত, আমাদের প্রশ্ন পাঁচ বছর নিজামী মুজাহিদ ক্ষমতায় ছিল, একটি দিনও ভারতের বিরুদ্ধে কেন টু শব্দটি করে নি।

এই যুদ্ধাপরাধী জামাতীরা ১৯৭১ সালে কীভাবে লুট, ধর্ষণ, হত্যা করেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। নিজামী মুজাহিদরা ১৯৭১ সালে কী করেছিল নতুন প্রজন্মকে তা মনে করিয়ের দেয়ার জন্য দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করব। আমিনুর রহমান খান নামে এক মুক্তিযোদ্ধা তার স্মৃতি কাহিনীতে লিখেছেন–দুই মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে রাজাকাররা বড়শি দিয়ে তাদের চোখ উপড়ে ফেলেছিল। তারা যখন ক্যাম্পে তখন সুবেদার মেজর মফিজ ছিলেন সেখানে সবচেয়ে বেশি বয়সী। তিনি তাদের বলতেন তাকে হারামাজাদা, কুত্তার বাচ্চা ডাকতে। অন্য নামে ডাকলেই ক্ষেপে উঠতেন। একদিন অসতর্ক মুহূর্তে আমিনুর এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, "মানুষই যদি হতাম তা'হলে বেঁচে থাকলাম কেন? মরলাম না কেন সেই দিন? আমার চোখের সামনেই আমার স্ত্রীকে গুলি করে মারলো। আমার হাত পা বেঁধে রেখে চোখের সামনে দুই ছেলেকে মারলো, জামাইকে মারলো, ছেলের বৌকে ও মেয়েকে ধর্ষণ করলো, শেষে, আমার নাতনী উঃ সে চিৎকার করে বললো, নানু আমাকে বাঁচাও। কিছুই

করতে পারলাম না। যাবার সময় শুয়োরের বাচ্চারা সবাইকে গুলি করে মারলো। আমি মানুষ না জানোয়ার, তুই বল?" মফিজ কিছুই করতে পারেন নি দেখে তার এই ক্ষোভ।

লুৎফুন্নাহার হেলেন ছিলেন ছাত্রনেত্রী, মাগুরার স্কুল শিক্ষিকা, শিশু সন্তানের মা। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এই অভিযোগে তাকে লাঞ্ছনার পর রাজাকার আলবদররা জিপের পিছনে বেঁধে সারা শহরে টেনে হেঁচড়ে ঘোরায়। মৃত্যুর পর তাকে দাফন করতে দেয়া হয় নি। তার লাশ নদীতে ছুঁড়ে ফেলে ওরা। একইভাবে পিরোজপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের ইনফরমার ভগিরথীকে হত্যার জন্য জামাত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী দায়ী বলে জানিয়েছেন সেখানকার মুক্তিযোদ্ধারা।

জামাত সব সময় সরকারি সাহায্যে পুষ্ট হয়েছে। পাকিস্তানি আমলে সামরিক সরকার, ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী, ১৯৭৫ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান পরবর্তীকালে তার পত্নী খালেদা জিয়া সব সময় তাদের সহায়তা করেছেন। জেনারেল জিয়া জামাতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে নতুনভাবে রাজাকারবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বেগম জিয়া তাদের সরকারে নিয়ে আমাদের অপমান করেছেন। বস্তুত এ দুটি দলে এখন পার্থক্য খুব কম।

২০০১ সালে ক্ষমতায় গিয়ে জামাত বিএনপি যে পরিমাণ দুর্নীতি করেছে, সে পরিমাণ দুর্নীতি বাংলাদেশে আর কখনও হয়নি। ১৯৭১ সালের পর তাদের সামনে যত খুন, ধর্ষণ হয়েছে, বাংলাদেশে এর আগে তা কখনও হয় নি। এথনিং ক্লিনজিং চালিয়েছে। শেখ হাসিনাকে কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করেছে। জেল জুলুমের কথা না হয় বাদই দিলাম। তারা জঙ্গী মৌলবাদীদের নিয়ে জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই নিজামী তখন বলেছিলেন, 'বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি।'

বর্তমান সরকারও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছে। নির্বাচনী আইনের পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান নির্বাচন কমিশন জামাতকে নিবন্ধন দিয়েছে।

আমরা সহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই এবার নির্বাচনে সুযোগ এসেছে তাদের অপকর্মের প্রতিশোধ নেয়ার। ১৯৭১ সালে নিজামীরা খুন করেছে এর বিচার হয়নি। প্রশ্ন, তা'হলে অন্য খুনের বিচার হবে কেন? যুদ্ধাপরাধীরা এখনও পাকিস্তানে বিশ্বাস করবে এবং তা আমাদের মেনে নিতে হবে কেন? গণতন্ত্রেও পাকিস্তানের পক্ষে বলার কোন অধিকার তাদের নেই। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হলে এ দেশে গণতন্ত্র, শান্তি ফিরবে না, বিশ্বদরবারে আমরা কাপুরুষ জাতি হিসেবে পরিচিত হবো, ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মাও শান্তি পাবে না। ইসলামের নামে তারা ইসলামকে অপবিত্র করেছে অথচ আমরা বলি আমরা ধর্মপ্রাণ।

এই বিজয়ের মাসে জামাতের 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র' থেকে দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এ বই দুটিতে জানান হয়েছে, 'মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ হন নি, হয়েছেন ১০ হাজার। শুধু তাই নয়, যেহেতু ১৬ ডিসেম্বরের আগে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ বলে কোনো রাষ্ট্র ছিল না, অতএব ১৬ ডিসেম্বরের আগে এর অস্তিত্ব স্বীকার বা অস্বীকার

করায় কিছু আসে যায় না। যে শিশুর জন্মই হয়নি, শতবার স্বীকার করলেও তা অস্তিত্বহীন।" [প্রথম আলো, ১৭-১২-০৮] গ্রন্থের লেখক মুক্তিযোদ্ধাদের দোষী করেছেন কারণ, হানাদার বাহিনীর হাতে যত মানুষ নিহত হয়েছে তার চেয়ে বেশি নিহত হয়েছে আলবদর, আলশামস, রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যরা। এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের জন্য দায়ী কে? কে আবার আওয়ামী লীগ, শুধু তাই নয়, "আওয়ামী লীগ কখনই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক বাহক ছিল না। বরং ইতিহাস প্রমাণ করে, আওয়ামী লীগই একমাত্র দল, যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার হন্তারক।"

এই ভাবে বিজয়ের মাসেও মিথ্যাচার করে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অপমান করে, জামাত, তথা পরাজিত শক্তির দোসর বিএনপি তথা চারদলীয় জোট আমাদের একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে পাকিস্তানি বাংলাদেশ সৃষ্টি করার। আমাদের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিত আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের প্রার্থীদের ভোটের বাক্স ভরে দিয়ে।

জামাত বিএনপি এবার ক্ষমতায় এলে, বিরোধীরা, গণতন্ত্রমনা, প্রগতিশীলরা এ দেশে থাকতে পারবেন না। তারা আবার ২০০১-২০০৬ সালের মতো খুন লুট ধর্ষণ এথনিং ক্লিনজিং চালাবে, ৪০ টাকা কেজি চাল ও ১৩০ টাকার সয়াবিন খেতে হবে। জামাত বিএনপিরা এমন লুট করবে যে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ইসলামের নাম করে জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা করবে। নারীরা ঘর ছেড়ে বেরুতে পারবেন না। যারা ডিজিটাল বাংলাদেশ চান, ধর্মনিরপেক্ষ, উন্নত প্রগতিশীল বাংলাদেশ চান, নিজের সন্তানদের '৭১ এর মতো আলবদরদের হাতে খুন হতে দিতে চান না, নিজের স্ত্রী কন্যাকে ধর্ষিত দেখতে চান না তাদের এখন বেছে নিতে হবে মধ্যযুগীয় জামাতকে ভোট দেবেন না স্বাধীনতা এনেছে যে দল তাদের ভোট দেবেন। বেছে নিতে হবে ১৯৭১ সালে যারা পাকি ও পাকি বাঙালিদের হাত থেকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল সেই পরাজিত শক্তির পক্ষে থাকবেন না ১৯৭১ এর বিজয়ীদের সঙ্গে থাকবেন।

আমরা ১৯৭১ সালের বিজয়ী শক্তির সঙ্গেই থাকতে চাই।

১৮ ডিসেম্বর ২০০৮

পরিশিষ্ট

বরাবর তারিখ : ১ নভেম্বর ২০০৮

নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলানগর, ঢাকা

সূত্র : স্মারক নং নিকস/প্র-৩/রাদ/৫(৪৪)/২০০৮/৮৬৩

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বিষয়ে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক লিখিত আপত্তি।

নিম্ন উল্লেখিত কারণসমূহের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত হওয়ার অযোগ্য, কারণ

১। যেহেতু কমিশন কোন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন না এমন কোন গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে, যাহা বাংলাদেশের সংবিধানের সহিত আসামঞ্জস্য (প্রধানত অনুচ্ছেদ ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৯, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৬৫, ৯৪, ১০১-১১২, এবং ১১৪-১১৭) সেহেতু কমিশন এমন কোন সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে না রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের যে সার্টিফিকেটটি আইনী দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে না ও বাতিল হিসেবে গণ্য হইবে; কারণ সংবিধানের ৭(২) এবং ২৬ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২। কমিশন যেহেতু একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, ইহা এমন কোন কাজে যুক্ত হইবে না যাহা বাংলাদেশের প্রচলিত আইন যথা ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ২০ ধারা লঙ্ঘনের প্ররোচনার সামিল। নিবন্ধনের আইন কমিশনকে এমন কোন ক্ষমতা প্রদান করে নাই যাহাতে দেশের প্রচলিত আইন লঙ্ঘনকারী এমন কোন সংগঠনকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের সার্টিফিকেট প্রদান করিতে পারে। ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনে পরিস্কারভাবে উল্লেখিত আছে যে 'অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইন প্রাধান্য পাইবে'। অর্থাৎ নিবন্ধনেকরণের আইনের প্রয়োগ এবং ইহার অধীনে সার্টিফিকেট প্রদান বাংলাদেশে বিদ্যমান ও প্রচলিত বিশেষ ক্ষমতা আইনের সাপেক্ষেই মাত্র, উহার উর্ধ্বে নয়। তাই কমিশন এমন কোন কাজে লিপ্ত হইবেন না যাহা বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০ ধারা লঙ্ঘনে ও প্ররোচনার সামিল। যাহা গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধও বটে। তাই কমিশন কখনও ইহার ক্ষমতা (Mandate) বর্হিভূত কাজে

বা গুরুতর দন্ডনীয় অপরাধের কাজে লিপ্ত হইবেন না এবং হইতেও পারে না।

৩। কমিশনের সুপারিশেই বর্তমান সরকার ১৯৭২ সনের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে সংশোধন করিয়াছেন এবং সেখানে সংযোজনের মাধ্যমে 90C(1)-তে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের যোগ্যতার বিষয়ে ৪টি শর্ত যুক্ত করিয়াছেন। উহাতে উল্লেখ আছে যে উক্ত শর্তের ১টি লঙ্ঘিত হইলে কোন দল নিবন্ধনের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। নিবন্ধনপ্রার্থী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেবল মাত্র একটি নয়, 90C(1) এর ৪টি শর্তই লঙ্ঘন করেছে। যথা–

ক) 90C(1)(a)-এর পরিপন্থী কারণ এই দলের গঠনতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য ও সাংঘর্ষিক বিধায় রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য। উপরে উল্লেখিত ১ নং প্যারা, সংযোজিত লিখিত বিস্তারিত আপত্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য।

খ) 90C(1)(b) অনুযায়ী কোন নারী এবং কোন অমুসলিম এই দলের প্রধান, কেন্দ্রীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে কোন অংশ গ্রহণ বা সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বারিত। সুতরাং দলের সকল সদস্য তাহাদের গঠনতান্ত্রিক আইন, বিধি ও নিয়মের দৃষ্টিতে সমান নয়। তাই দলের সদস্য হওয়ার শর্ত, যোগ্যতা ও শপথ সকল সদস্যের সমান নয় অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রেই লিঙ্গ ও ধর্মভিত্তিক বৈষম্য বিদ্যমান। বিধায় জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য।

গ) 90C(1)(c) অনুযায়ী নিবন্ধনপ্রার্থী এই দলটি বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অর্থাৎ সার্বজনীন ধর্মীয় অসাম্প্রদায়িক অনুভূতির প্রতি হুমকিও বটে এবং তাহাদের এ ধরনের হুমকি ও কর্মকান্ড যদি প্রতিহত না করা হয় তা হলে রাষ্ট্রের সীমানা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হইবে। বিধায় রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য।

ঘ) 90C(1)(d) নিবন্ধন প্রার্থীর স্বীকৃত মতেই নিজেদের দায়েরকৃত রীট পিটিশন ৬৭৯২/২০০৮ তে নিজেরাই স্বীকার করেছেন তাহাদের দলের জন্ম হয়েছে ভারতে। অতএব বাংলাদেশের সীমানার বাহিরে তাহদের অনুরূপ, অনুকুল এবং শাখা জন্মলগ্ন থেকেই বিদ্যমান। বিধায় এই সংগঠন রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধন পাওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান ও বিগত গঠনতন্ত্রের ধারা-২, সাবধারা-১ ও ৫ রাষ্ট্রের সংবিধান সম্মত বিচার ব্যবস্থা, প্রক্রিয়া, সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা অস্বীকার করে বিধায় রাষ্ট্রের সংবিধনের মৌলিক কাঠামোর সবচেয়ে মৌলিক অনুচ্ছেদ ৭, ৬৫ এবং ৯৪-এর সাথে কেবল অসামঞ্জনস্যপূর্ণ নয় সরাসরি সাংঘর্ষিকও বটে। যাহা ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০ ধারায় একটি গুরুতর অপরাধও। জামায়াতের সাথে সাথে নিষিদ্ধ ইসলামী জঙ্গী সংগঠন হরকতুল জিহাদের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে নতুন লেবাসে সুসজ্জিত করে আরেকটি ইসলামিক দল 'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি' (আইডিপি) যে খসড়া গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে নিবন্ধন

চেয়েছে সেটাও তাদের গঠনতন্ত্রের ধারা ১০ (খ) সংবিধানের ৭, ৬৫ ও ৯৪ অনুচ্ছেদ-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আইডিপি-র গঠনতন্ত্রের ধারা ৯(ঘ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর হুমকি স্বরূপ যা RPO-90C(1)(c)-এর পরিপন্থী বিধায় নিবন্ধনের অযোগ্য এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০ ধারা অনুযায়ী গুরুতর দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ। এবং নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য।

যুদ্ধাপরাধীদের দল বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীকে নিবন্ধন দেয়া যাবে না। কেননা পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির রাজনীতি করার অধিকার থাকে না। যেহেতু জামায়াত বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতাকারী, যেহেতু তারা এদেশের প্রতি কখনোই আনুগত্য প্রকাশ করেনি, উপরন্তু পদে পদে তাদের গঠনতন্ত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছে–আর এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন দেয়া হলে আইন ও সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জাতির আস্থা আর ভরসার স্থল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন সংবিধান লঙ্ঘনের এই দায় কখনো নেবে না।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধনপ্রার্থীতার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন বরাবর সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত লিখিত আপত্তি

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বা 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' যে নাম হোক এদের উদ্দেশ্য, কর্মকাণ্ড কখনোই বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সংবিধানকে সমর্থন করেনি। জামায়াত যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির দল। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী শক্তি। এরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় পতাকা, সংবিধান কিছুই মানে না। ৩৭ বছর পরও তারা বলছে দেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই, স্বাধীনতাবিরোধী নেই; এমনকি তাদের কেউ কেউ বলতে দ্বিধা করছে না '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধই হয়নি, হয়েছিল গৃহযুদ্ধ। এসব কারণে দেশের স্বাধীনতাকামী মুক্ত মনের ও চেতনার প্রতিটি মানুষ মনে করে জামায়াতসহ অপরাপর ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন পাওয়ার অযোগ্য।

মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস ঘটনা এবং সংখ্যার হিসেবে সর্বাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা সরকারি হিসেবে ৩০ লক্ষ নিরীহ, নিরস্ত্র, শান্তিকামী মানুষকে হত্যা করেছে, ২ লক্ষ নারীর উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে, দেশের কলকারখানা, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ধ্বংস করেছে, গৃহে অগ্নিসংযোগ করেছে, নির্বিচারে লুটতরাজ করেছে এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেছে ১ কোটি বিপন্ন মানুষকে। প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ তাদের দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন এবং দেশের অভ্যন্তরে কয়েক কোটি মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছেন। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কখনও এত ভয়াবহ যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করতে পারতো না, যদি না তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতো জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামের নেতাকর্মীরা। এই গণহত্যায় যে দলটি সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিতভাবে প্রথম থেকে পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীকে নৈতিক শক্তি যুগিয়ে, সহায়ক বাহিনী গঠন করে, মিটিং, মিছিল, সমাবেশ করে এবং পত্রিকায় অনবরত মিথ্যা লিখে প্ররোচনা করে–সে রাজনৈতিক দলটি হচ্ছে গোলাম আযম ও মতিউর রহমান নিজামীদের নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামী, যারা কেবলমাত্র নিবন্ধন পেতে তাদের খোল পাল্টে নাম রেখেছে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকালে জামায়াত নেতারা যে কী অপরাধ করেছে তার সাক্ষী রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। ২৫ মার্চ '৭১ কুখ্যাত

পাকিস্তানী জেনারেল খুনী টিক্কা খান যে গণহত্যা আরম্ভ করেছিল সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে তার বিরুদ্ধে নিন্দা ও ধিক্কারের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ঘাতক টিক্কা-নিজামীদের হাত শক্তিশালী করার জন্য ৪ এপ্রিল জামায়াতের তৎকলীন আমীর গোলাম আযম তার সঙ্গে দেখা করে পুর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন (পূর্বদেশ ৫ এপ্রিল ১৯৭১)।

পাকিস্তানের বর্বর ঘাতক বাহিনীকে সাহায্য করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে '৭১-এর ১০ এপ্রিল গোলাম আযমরা শান্তি কমিটি গঠন করেন। এই শান্তি কমিটি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করা। কমিটির প্রথম বৈঠকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতম নরমেধযজ্ঞ পরিচালনার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং মুক্তিযেদ্ধা ও মুক্তিকামী জনগণকে আখ্যায়িত করা হয় ইসলামবিরোধী একাত্তরের দালাল হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে গোলাম আযমদের কাছে পাকিস্তান, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলাম্ একই অর্থ বহন করে। যে কারণে তাদের কাছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যেমন ইসলামবিরোধী কাজ, জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতাও ইসলামবিরোধী কাজ। এভাবেই জামায়াত শান্তির ধর্ম ইসলামকে সব সময় খুনী, সন্ত্রাসী বোমাবাজ ও ধর্ষকের ধর্মে পরিণত করতে চেয়েছে।

১২ এপ্রিল ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি কমিটির মিছিলে গোলাম আযম নেতৃত্ব দেন এবং মিছিল শেষে গোলাম আযম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। (দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১)

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে আসছে তাদের আন্দোলনের শুরু থেকে। এখনও সেই যৌক্তিক দাবিতে জামায়াতকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন না দেয়ার দাবি জানানো হচ্ছে। কেননা, ১৯৭১-এ জামায়াত যে যুদ্ধাপরাধ করেছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে এখনও তাদের সেই তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে সে দায়েই তারা এদেশে রাজনীতি করার কোন অধিকার পেতে পারে না।

'৭১-এ জামায়াতে ইসলামীর বর্বরতার আরেকটি নৃশংস উদ্যোগ হচ্ছে হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর কায়দায় আলবদর, আলশামস বাহিনী গঠন, বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন এবং জামায়াতের ঘাতকদের দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের হত্যা। বর্তমানে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের উদ্যোগে ও তাদের তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত এই বাহিনীর নেতাদের প্রধান কাজ ছিল পাকিস্তানী জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে বৈঠক করে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করা। একই সঙ্গে স্বাধীনতাকামী বাঙালীদের খুঁজে বের করে হত্যা করা, হিন্দুদের বলপূর্বক মুসলমান বানানো, সেমিনার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে পাকিস্তানী ও জামায়াতী চিন্তাধারা প্রচার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্রভাবে মোকাবেলা করা ছিল আলবদর বাহিনীর নৃশংস তৎপরতার উল্লেখযোগ্য দিক। মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, কামরুজ্জামান, মীর কাশেম আলী প্রমুখ তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতাদের

প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই ঘাতক বাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয় বরণের প্রাক্কালে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের যে পৈশাচিক বর্বরতায় হত্যা করেছে বিশ্বের ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যাবে না। দেশের প্রখ্যাত লেখক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, ক্রীড়াবিদ ও সমাজকর্মীসহ বিভিন্ন পেশার মত শত বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য দায়ী এই আলবদর বাহিনী। ১৪ সেপ্টেম্বর '৭১ 'আলবদর' শিরোনামে এক নিবন্ধে জামায়াতীদের মুখপত্র 'সংগ্রাম' লিখেছিল, 'আলবদর একটি নাম! একটি বিস্ময়। আলবদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল-বদর সেখানেই।'

'৭১-এর ৭ নভেম্বর 'বদর দিবস' উদযাপন করতে গিয়ে ঢাকার বায়তুল মোকাররমের প্রাঙ্গণে ইসলামী ছাত্র সংঘের এক সমাবেশে আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ চার দফা ঘোষণা প্রচার করেন। এই ঘোষণায় বলা হয়, '...যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে হিন্দুস্তানের নাম মুছে দেয়া না যাবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেবো না।...আগামীকাল থেকে হিন্দু লেখকদের কোন বই অথবা হিন্দুদের দালালী করে লেখা পুস্তকাদি লাইব্রেরীতে কেউ স্থান দিতে পারবেন না, বিক্রী বা প্রচার করতে পারবেন না। যদি কেউ করেন তবে পাকিস্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী স্বেচ্ছাসেবকরা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী 'বদর দিবসের শপথ' হিসেবে ঘোষণা করেন–ক) ভারতের আক্রমণ রুখে দাঁড়াবো। খ) দুষ্কৃতকারীদের খতম করবো, গ) ইসলামী সমাজ কায়েম করবো।' (দৈনিক পাকিস্তান, ৮ নভেম্বর ১৯৭১)

বদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মতিউর রহমান নিজামী ১৪ নভেম্বর দৈনিক সংগ্রাম-এ লিখেছেন–'সেদিন আর খুব দূরে নয় যেদিন আলবদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে, হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।' বদর বাহিনীর অপর দুই প্রধান নেতা আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ এবং মীর কাশেম আলী ২৩ নভেম্বর এক বিবৃতিতে সৈনিক হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার জন্যে সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই সময়ে প্রকাশিত তাদের এক প্রচারপত্রে বলা হয়–'মনে রাখবেন আপনারা পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্যই কেবল যুদ্ধ করছেন না। এ যুদ্ধে ইসলামের। নমরুদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য আমাদের আমীরের (গোলাম আযমের) নির্দেশ পালন করুন।'

জামায়াতে ইসলামী যুদ্ধাপরাধীদের দল। আন্তর্জাতিক আইন এবং দেশীয় আইনে এরা যুদ্ধাপরাধী। আর যুদ্ধাপরাধীদের কথা উঠলে জামায়াত এবং তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতারা সব সময় যে সব কথা বলে এর বিরোধিতা করে তা হচ্ছে–১) জামায়াত কখনও যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল না, ২) বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোন সুযোগ নেই, ৩) ৩৭ বছর ধরে যেহেতু কোনো সরকার তাদের বিচার করেনি এবং ৪) কেউ তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা করেনি।

তাদের এসব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং নির্জলা

মিথ্যা ছাড়া যে আর কিছু নয়—জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র '৭১-এর দৈনিক 'সংগ্রাম' ও অন্যান্য পত্রিকা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বঙ্গবন্ধুর সরকার কখনও যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করেনি। বরং তাদের বিচারের জন্য তখন একাধিক আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, এমনকি সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২৪ জানুয়ারি '৭২ 'দালাল আইন (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল)' আদেশ জারি করেন। এরপর এই আদেশ ৬ ফেব্রুয়ারি, ১ জুন ও ২৯ আগস্ট '৭২ তারিখে তিন দফা সংশোধনীর পর চূড়ান্ত হয়। দালাল আইনের আওতায় ৩৭ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিভিন্ন আদালতে তাদের বিচার আরম্ভ হয়।

সরকারি চাকুরিতে কর্মরতদের কেউ দালালী ও যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল কি না তা যাচাই করার জন্য সরকার ১৩ জুন ১৯৭২ তারিখে আরেকটি আদেশ জারি করে, যা তখন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের সহযোগীদের বিচারের জন্য ২০ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে জাতীয় সংসদে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩' পাশ করা হয় এবং সংবিধানের প্রথম সংশোধনী হিসেবে এটি ৪৭(৩) অনুচ্ছেদে সংযোজিত হয়।

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর দালাল আইনে আটক যে সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই তাদের জন্য সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। তবে সাধারণ ক্ষমার প্রেসনোটে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—'ধর্ষণ, খুন, খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা জাহাজ-অগ্নিসংযোগের দায়ে দণ্ডিত ও অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রদর্শন প্রযোজ্য হইবে না।' সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তির ভেতর প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পেয়েছিল। তারপরও ১১ হাজারের বেশি ব্যক্তি এ সকল অপরাধের দায়ে কারাগারে আটক ছিল এবং তাদের বিচার কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে '৭৫-এর ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেন।

জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল করলেও এই আইন বাতিল করেন নি। 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনালস) অ্যাক্ট ১৯৭৩' অনুযায়ী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যার সাথে জড়িত পাকিস্তানীদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস-এর সদস্যদের বিচার এখনও করা সম্ভব। এই আইনে কীভাবে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে, কারা ট্রাইবুন্যালের বিচারক ও আইনজীবী হবেন, ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা এবং এই ট্রাইব্যুনাল কত ধরনের যুদ্ধাপরাধ তথা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার করতে পারবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত বলা আছে। এই আইন প্রণয়নের জন্য তখন বাংলাদেশের সংবিধানও সংশোধন করতে হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ২৫ জুলাই জাতীয় সংসদে সংবিধানের প্রথম সংশোধনী [৪৭(৩)] গৃহীত হয়। এতে বলা হয়—"এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং

আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।" সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটি এখনও বলবৎ রয়েছে।

বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দায়িত্ব ছিল সরকারের। কিন্তু এই দায়িত্ব স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার উদ্যোগ নিয়েও করতে পারেনি, আর তারপরের সরকারগুলো উদ্যোগই নেয়নি এ দায়িত্ব পালনের। তবে, দেশের আপামর জনসাধারণ তাদের বিচারের পক্ষে। তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ ১৯৯২ সালে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত গণআদালতে লক্ষ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণ। শুধু তাই নয়, আর্ন্তজাতিক পরিসরেও এখন '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উঠছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ জানে যুদ্ধাপরাধী কারা। দেশের আপামর জনসাধারণের মতো নির্বাচন কমিশনও জানে যুদ্ধাপরাধী কারা, কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত হয়েছে এবং কোন কোন রাজনৈতিক দল দেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছে।

বর্তমান নির্বাচন কমিশন শুরু থেকেই বলে এসেছে যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য হবে। কিন্তু কারা যুদ্ধাপরাধী তাদের সরকারীভাবে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা কেউ গ্রহণ করে নি। ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণে নির্বাচন কমিশনের বর্তমান আইন-এ যদি যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পায় তা হলে চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের যুদ্ধাপরাধের দায় থেকে মুক্ত করার অপচেষ্টার দায় নির্বাচন কমিশনের উপরও বর্তাবে। আর স্বাধীনতার বিরোধীতাকারীদের এই দেশে রাজনীতি করার নৈতিক অধিকারই থাকে না। স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন কমিশনের কাছে নিবন্ধন পাবার জন্য তার গঠনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন এনে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের কথা ঢুকালেও এই পরিবর্তন আদর্শিক নয়, কেবলই কাগজে কলমে, তার প্রমাণ অতি সম্প্রতি দিয়েছে জামায়াত। যেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একাত্তরে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটের একটি বড় বিষয় ১৯৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন আর তাতে স্বাধীনতাকামী বাঙালীর ভোটের বিজয়। ঐ নির্বাচন নিয়ে এক বিন্দু বিতর্ক নেই। আর সেই সত্য কথাটিই আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছিলেন।

'গত ২৮ অক্টোবর জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে এক বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা বলেছিলেন, 'বর্তমান নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা এবং আগামী সংসদে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আমরা ১৯৭০ সালের মতো একটি নির্বাচন করতে চাই, যে নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে না।' (প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০০৮)

আর তার পরই ঐতিহাসিক '৭০-এর নির্বাচনকে গত ৩০ অক্টোবর জামায়াতের

নেতারা কলঙ্কিত করতে চেষ্টা করেছেন, তাদের বক্তব্যে।

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে–১৯৭০ সালের নির্বাচনকে 'একতরফা নির্বাচন' আখ্যা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটির সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে বলেছেন, সেই নির্বাচন যারা দেখেছেন তাদের সবাই জানেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ভোটকেন্দ্রে ঢুকতেই দেয়নি এবং সেই নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জাল ভোট পড়েছিল। বলতে গেলে সেই নির্বাচন ছিল একতরফা।

'১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন নিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সেই নির্বাচনে জামায়াত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) কোনো আসন পায়নি। নির্বাচনে জয়লাভের পরও তখন আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী। এ ঘটনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন আরও বেগবান হয় এবং তার সূত্রে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। জামায়াত মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ নেয়। তারা রাজাকার, আলবদর, আল-শামস, শান্তি কমিটি প্রভৃতি গঠন করে গণহত্যা চালায়। দলটির দুজন কেন্দ্রীয় নেতা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে গঠিত মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং স্বাধীনতার পর দালালির অভিযোগে তাঁদের বিচারও হয়।

'নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য জামায়াত সম্প্রতি তাদের দলের গঠনতন্ত্রে সংশোধনী আনে।....

'সমালোচকেরা জামায়াতের এই গঠনতন্ত্র সংশোধনকে নিবন্ধন পেতে আদর্শিক নয়, কাগুজে পরিবর্তন বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।' (প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০০৮)

এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সংবিধান, ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের বিরোধী একটি সংগঠন হিসেবে এখনও কাজ করছে। এ জন্য নির্বাচন কমিশনের উচিৎ জামায়াতে ইসলামীকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন না করা এবং সরকারের কাছে যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা প্রকাশের দাবি জানানো।

২.

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অস্বীকার, মানবাধিকার লঙ্ঘন, যুদ্ধাপরাধ, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যহীনতা এবং উপযুক্ত ঐতিহাসিক পটভূমি ছাড়াও বিদ্যমান সংবিধান, বিশেষ আইন, দণ্ডবিধি, জরুরী আইন ও ১৯৭২ সালের গণ প্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধির আওতায় ও নির্বাচন কমিশন জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধন দিতে পারে না।

১. বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(১), ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৯, ২৩, ২৪

এবং ৩৮ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রার্থী 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' নিবন্ধন যোগ্য নয়, যেহেতু

ক) ৭(১) দফায় বলা আছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা কার্যকর হবে, কিন্তু তর্কিত নিবন্ধনপ্রার্থীর-গঠনতন্ত্রে উল্লেখ এই যে রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অর্থাৎ সকল ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কার্যকর করতে হবে;

খ) ১০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই;

গ) ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রজাতন্ত্র হবে এমন একটি গণতন্ত্র যেখানে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের' অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে নিশ্চিত করার বিষয়টি নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই;

ঘ) ১৩ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট মালিকানার নীতির সাথে নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব ও ভিন্নতা আছে;

ঙ) ১৪ অনুচ্ছেদে ধর্মনির্বিশেষে কৃষক, শ্রমিক ও অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান করা নিশ্চিত থাকলেও নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে তার কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত;

চ) ১৯ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত থাকলেও নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে সমতা নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় নি;

ছ) ২৩ অনুচ্ছেদে 'জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' নিশ্চিত করা হলেও নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্রে একটি মাত্র ধর্মাবলম্বীর সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে;

জ) ২৪ অনুচ্ছেদে জাতীয় স্মৃতি নির্দেশক তাবৎ বস্তু বা স্থানকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দেয়া থাকলেও নিবন্ধনপ্রার্থীর গঠনতন্ত্রের সেমত সংস্কৃতি রক্ষার কোনোই নিশ্চয়তা নেই; এবং

ঝ) ৩৮ অনুচ্ছেদের প্রদত্ত সংগঠনের স্বাধীনতা আইনের দ্বারা অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা অ্যাকট সীমিত করায় নিবন্ধন প্রার্থীর সংগঠনের নাম ধর্মীয় নামযুক্ত হওয়ায়, উক্ত অ্যাকটের ২০(১) ধারা অনুযায়ী নিবন্ধনপ্রার্থী নিবন্ধন যোগ্য নয়।

১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ (২০০৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ) অনুযায়ী

১. ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন (১৯৭৪ সনের ১৪নং আইন) The Special Power Act 1974 (An Act No. XIV of 1974) ইংরেজী ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সন থেকে কার্যকরী)-এর Section-20 prohibition of formation of certain associations or unions-

1) No person shall form, or be member or otherwise take part in the activitites of any communal or other association or union, which in the name

or on the basis of any religion has for its object, or pursues, a political purpose.

2. নং-৪২ (মুঃপ্রঃ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ০৪ ভাদ্র ১৪১৫ বাং মোতাবেক ১৯ আগস্ট, ২০০০ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত ও প্রকাশিত ২০০৮ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশ Representation of the people order, 1972—(Registration of Political Parties with the Commission) Article 90A-For the purpose of this Order, any political party willing to participate in election under their order shall be registered with the commission subject to the condition laid down I Article 90B.

Article : 90C(1)-A political party shall not be qualified for registration under this chapter, if

a) the objectives laid down in its constitution are contrary to the Constitution of the peoples Republic of Bangladesh; or

b) any discrimination regarding religion, race, caste, language or sex is apparent in its constitution; or

c) by name, flag, symbol or any other activity it threatens to destroy communal harmony or leads the country to disintegration; or

d) there is any provision in its constitution for the establishment or operation of any office, branch or committee outside the territory of Bangladesh.

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের উপরোক্ত চারটি শর্তের কোনটিই নিবন্ধন প্রার্থীর গঠনতন্ত্র আদৌ পূরণ করে না, অথচ যে কোনো একটি শর্তের অপলাপেই কোনো সংগঠন নিবন্ধনের চূড়ান্ত অযোগ্য, যথা,

৯০সি(১)(এ) ধারার লঙ্ঘন যেহেতু নিবন্ধনপ্রার্থীর গঠনতন্ত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৯, ২৩, ২৪ তৃতীয় ভাগের ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৬৫ অনুচ্ছেদের ও চতুর্থভাগের ৬৫ অনুচ্ছেদের সাথে অসমঞ্জস্য।

৯০সি(১)(বি) ধারার লঙ্ঘন–যেহেতু নিবন্ধনপ্রার্থীর গঠনতন্ত্রে কোনো নারী কিংবা অমুসলিম দলটির প্রধান কিংবা নির্বাহি কমিটির সদস্য হতে বারিত।

৯০সি(১)(সি) ধারার লঙ্ঘন–যেহেতু নিবন্ধন প্রার্থর গঠনতন্ত্রে কোনো ধারাই সাম্প্রদায়িক কিংবা ধর্মীয় শৃঙ্খলার নিশ্চিত করে না, বরং সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার উস্কানি ও প্ররোচনা দেয়।

৯০সি(১)(সি) ধারার লঙ্ঘন–যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নিবন্ধনপ্রার্থী ২০০৮ সালের ৬৭৯২ নং যে রিট পিটিশন দায়ের করেছে সেখানে স্বীকার করেছে যে ভারতে নিবন্ধনপ্রার্থী দলটির জন্ম হয়েছিল এবং তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সংগঠনটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ও একে অপরের সহায়ক অর্থাৎ জন্মলগ্ন থেকে সংগঠনটির শাখা ও কার্যক্রম বাংলদেশের সীমানার বাইরে বিদ্যমান আছে।

৩. সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদির ১৪ ক্রম অনুযায়ী তর্কিত নিবন্ধন প্রার্থীর মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম-এ প্রকাশিত আত্মস্বীকৃত প্রতিবেদনগুলি বা সাক্ষ্য আইনে আদালত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য অকাট্য প্রমাণ বিধায় নিবন্ধনপ্রার্থী জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ দণ্ডবিধির ১২০ক ধারা অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ করায় নিবন্ধনপ্রার্থী নিবন্ধন যোগ্য নয়।

যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতকে নিবন্ধন দেয়া যাবে না। কেননা পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে যুদ্ধাপরাধী, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তির রাজনীতি করার অধিকার থাকে না। যেহেতু জামায়াত বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতাকারী, যেহেতু তারা এদেশের প্রতি কখনোই আনুগত্য প্রকাশ করেনি, উপরন্তু পদে পদে আমাদের গঠিত সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছে–আর এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন দেয়া হলে আইন ও সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জাতির আস্থা আর ভরসার স্থল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন সংবিধান লঙ্ঘনের এই দায় কখনো নেবে না।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি